VOL. 6. No. 1.

APRIL 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Pres

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling
Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation o lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and it accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refractio and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system a invariably found satisfactory and curative. The latest and most approve apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination b appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

THE DACCA REVIEW

CONTENTS FOR 1916-17.

Vol. VI.

Subjects.	Names of Authors.	Pages.
Art of Tibet.	Percy Brown A. R. C. A. (Principal, Government School of Art Calcutta.)	1
Arctic Home in the Rig-Veda An untenable position (iii).	Prof. N. K. Datta M.A.	23, 90, 132
Alauddin Khiliji—The benevolent Despot.	Bama Charan Chatterjee M.A.	150
Common origin of the Religion of India. (Journal of the East India Association.)	Sir Guilford Molesworth K.C.I.E.	175
Ceremonial of Tea or Chano-ya of Japan.	Rai Sarat Chandra Das Bahadur C.I.E.	200
Christmas.	Moulavi Bahar-uddin Ahmed.	294
Coming of Summer England.	D. G. D.	322
Dacca forty years ago.		66, 95
Days of the Hindu Calendar.	Rai Bahadur Prof. Jogesh Ch. Roy M.A.	114
Despondency of Arjuna.	N. Mukherjee M.A. Bar-at-law.	147
Eighteenth Century Bengali Manuscript.	Prof, J. N. Das Gupta M.A. (oxon).	39
East Bengal Notes and Queries (Notes on Antiquarian remains on the Lakshya and the Brahmaputra.)	Nalini Kanta Bhattasali M.A. Curator, Dacca Museum.	323
Greek and Gothic Elements in the Hindu Population.	Prof. Hem Chandra Roy Choudhury M.A.	78
Glories of the Sanskrit Literature.	Govinda Chandra Mukherjee M.A. B.L.	160
Guns.	D. G. D.	259
Heaven and Hell.	Bahar-uddin Ahmed.	75
H. E. Lord Carmichael.	C.........	June 1916 Feb, Mar. 1917

Subjects	Names of Authors.	Pages.
Indian Student Sketches.	Prof. Thos. F. O'Donnell (Agra College)	81 157, 239
Indian Art Ideals.	Hemendra Prasad Ghosh B A.	223
Introduction to the Study of Archaelogy.	Monomohan Ganguly B.E.	229, 286,
	... ...	309
Indian Scientific Wizard.		246
Jurisdiction of the District of Dacca from the earliest times.	F. D. Ascoli M.A. I.C.S.	15
Jessore Antiquities.	Abani Chandra Chatterjee (Dy. Magistrate).	305
Language and Literature appendices.	J. R. Barrow B.A. (Cantab) (Fellow of the Calcutta University).	33
Life of Pestalozzi and his method.	Kunjabehari Har M.A. B.L.	207
Law and Human Progress.	Dr. Naresh Chandra Sen Gupta M.A. D.L.	295
Milton's Message.	Rev. Harold Bridges B.D.	55
Matter and consciousness.	Sir John Woodroffe.	June 1916
Need of Agricultural Education in the Schools.	S. K. Mitra (University of Californea)	277
Old friends and new faces.	... .	Jan. 1917
Pitfalls in Juvenile Education.	Khan Sahib Sayed Abdul Latif B.A. B L.	29
Pre Pseudo Callisthenes.	Prof. J. N. Das Gupta M.A. (Oxon)	141, 197 307
Problem of Moral Evil.	Prof. G. H. Langley M.A.	185
Peep into the Intelligence Department of the Moghul Period.	Khan Sahib Syed Abdul Latif B.A. B.L.	204
Paribrajaka and Pre-Buddhist India	Prof. Sukumar Datta M A.	261
Study of Geography.	P. Leo Faulkner F.R.G.S., F.R.S.A.	86
Scope of Biogeography.	P. Leo Faulkner F.R.G.S., F.R.S.A.	127
Sir William Ramsay.	... .	174
Vedas and the Puranas.	S. C. Sarkar M.A., M.R.A.S. Dy. Magistrate.	105
Vilayatnamah.	Khan Bahadur Syed Aulad Hasan M.R.A.S.	327
Weather Folklore.	... ...	153

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ।

গল্পের নাম।	লেখক ও লেখিকাদিগের নাম।	পৃষ্ঠা।
অজ্ঞাত পদ কর্ত্তৃগণ	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ	২০৩, ২২৭
অন্ধ বিশ্বাস	শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সরকার	২৫১
অভাবে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব চৌধুরী	১৭১
অশোক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম	২৭৫
অশোক চরিত	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১৭৩
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ	২৮০
আকাশের নীল রঙ	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ বিদ্যানিধি	৯১
আবার ভাষার কথা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ	১৯১
উত্তরাপথ ভ্রমণ	" ভবঘুরে	৪৯, ১২৪
উদ্বোধন (কবিতা)	" পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ	৭০, ১৬৩
উদ্বোধন (কবিতা)	" শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	১৮৮
ঋগ্বেদে লিখন প্রণালীর অভাব	" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম, এ	২৯৬
এক বিন্দু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	২২৭
কবিতার প্রাণ	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৮
কণ্ঠহার (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্ত	৩১৬
কাব্যের ভবিষ্যৎ	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ	১২৯
কাব্যে মিত্র কবি হরিশ্চন্দ্র	শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ	২১১
গ্রন্থ পরিচয়	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ	২৮৭
গায়ক পাখী	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬২
গীতার সহজ তপস্যা বা আত্মোৎকর্ষের সহজ সাধন প্রণালী		১৮৮

গল্পের নাম	লেখক ও লেখিকাদিগের নাম	পৃষ্ঠা
চীন ও ভারত সন্তান	শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ	৩১০
চীনা ও জাপানী সমাজদ্বয়ের আবহাওয়া	শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ	২১৫
চীনা শিল্পশাস্ত্র	শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ	১০৩
ছোট কথা	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ	২০৫
জাপানের যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে	৩০৪
ঢাকায় রথযাত্রা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দে	১০৯
তুমি (গান)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	৮৭
দুজনে (কবিতা)	শ্রীমতী বিভাবতী সেন	১০২
পরেশনাথ পাহাড়	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	২৭২
পল্লীবন্দনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	২৩৪
পুরীধাম (কবি)	শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দেবী	১৯৬
পুষ্কর	শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ	৮৭
প্রত্নতত্ত্ব মাহাত্ম্য	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী	২৫
প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় কৌশল	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ	২৬০, ৩০৬
প্রাচীন চতুষ্পাঠীর শিক্ষা	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩৫
প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	১১৯
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)	শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব	২৭
ফুল শয্যা (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্ত	৫৭
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস	১৯৭, ২৪৬, ৩২১
বঙ্গের কুলবধূ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	৫৬
বঙ্গীয় গৃহশিল্প সমিতি	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৮৯
বন্দনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭১
বর্ষ আবাহন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৪৫
বর্ষ বিদায়	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩২৭
বর্ষ বোধন	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১
বর্ষ প্রভাতী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস্ সি,	১১৯
বসন্ত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	৩১১
বসন্ত-ভারতী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ	২৫৩
বসন্ত-লক্ষ্মী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ	৩০৪
বাঁশীরাজ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ	২৭৭
ব্যাকরণের দরখাস্ত	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী	৭৮
বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টী	৬৪
বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর তিন দিনের প্রবাস	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সরকার	২৩৫

গল্পের নাম।	লেখক ও লেখিকাদিগের নাম	পৃষ্ঠা।
বৃন্দাবন অন্ধকার	,, প্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত ...	৩০৬
বৃষ্টিবিন্দুর অভিভাষণ (কবিতা)	,, কুলচন্দ্র দে	৭৭
ভাদ্রে (কবিতা)	,, জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	১৬৭
ভাষার আকার ও বিকার ...	,, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ডি এল	১৬৪
ভূতের বাহন	,, অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম, এ ...	১২০
মগধের রাজবংশ	,, রামপ্রাণ গুপ্ত	২৫৩
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ...	,, সমালোচক	২৮৪, ৩৩২
মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান ...	,, বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর ...	৪৫
যশোধর্ম্ম দেব	,, রেবতীমোহন গুহ এম, এ, বি, এল	৭১
রঙ্গপুরের আত্মনিবেদন (কবিতা)	,, কালিদাস রায় বি, এ, ..	২২১
রাক্ষস (কবিতা)	,, কালিদাস রায় বি, এ, ...	১৯১
রাঙ্গা ফাঁসী (কবিতা)	,, কুলচন্দ্র দে	৯
রাজা ও প্রজা ...		১১৫
রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর ...	,, অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা ও উপেন্দ্রকুমার গুহ	৯৪
লক্ষ্মী (কবিতা)	,, কালীদাস রায় বি, এ	২৯৫
লুকোচুরি (কবিতা)	,, কুলচন্দ্র দে	১৭১
শারনাথ	,, মণীন্দ্রকিশোর সেন	১৪৪
শ্যামের বাঁশী (কবিতা) ...	,, পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ	১০২
সখা (কবিতা)	,, কুলচন্দ্র দে	৩১৫
সভাপতির অভিভাষণ	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	১৪৮
সমালোচনা	... ...	১৩৪
সাংখ্য দর্শনে ক্রম বিকাশ বাদ ...	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বিদ্যানিধি ...	২২২
সাগরের প্রতি (কবিতা) ...	,, পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ	১২৪
সাঁজে (কবিতা)	,, কুলচন্দ্র দে	২৭৭
সাহিত্য ও সাহিত্যিক	অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ ...	৪
সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা ...	,, কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস	১০
স্বপ্ন মিলন (কবিতা)	,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৩৭
হরিশ্চন্দ্রের কীচকবধ কাব্য ...	,, গিরিজাকান্ত ঘোষ	২৮০

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Raad, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C.S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. A. Evans Esq., M.A., M. Sc., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The Maharaja Bahadur of Shushung.
The Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr. N. Bonham-Carter I.C.S.
„ Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M.A.
Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
Rankin Esqr., I.C.S.
C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.,
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
, Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
, Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
. Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

The Arts of Tibet	Percy Brown, A. R. C. A, Principal, Government School of Art, Calcutta.	1
The Jurisdiction of the District of Dacca —from the earliest times.	F. D. Ascoli, M. A., I. C. S. ...	15
The Arctic Home in the Rig-Veda : An Untenable position (iii).	Prof. N. K. Dutt, M. A.	23
Pitfalls in Juvenile Education. ...	Khan Sahib Syed Abdul Latif, B. A, B. L. ...	29
Language and Literature, Appendices.	J. R. Barrow, B. A., (Cantab) Fellow of the Calcutta University. ...	33

সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা।
১। বর্ষবোধন	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১
২। সাহিত্য ও সাহিত্যিক ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বিএল,	৪
৩। রাঙ্গা ফাঁসী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	৯
৪। সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্, আর এ এস্,	১০
৫। প্রত্নতত্ত্ব মাহাত্ম্য	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী	২৫
৬। প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) ...	শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব	২৭

A letter of IXth Guru, written about 1660 A.D

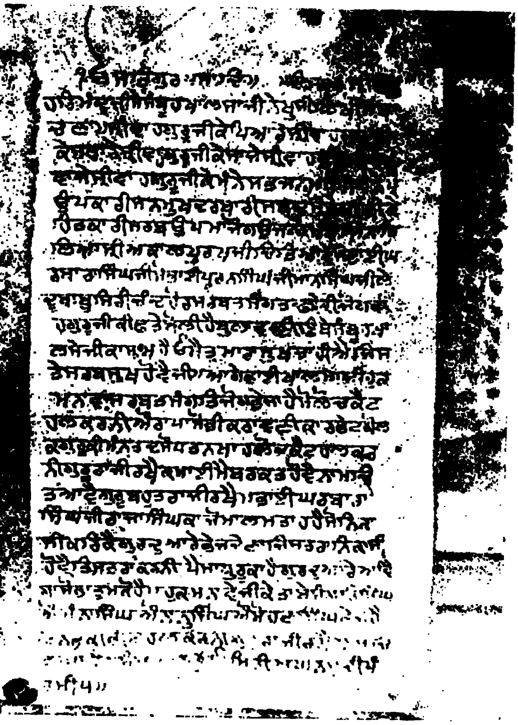

A letter from the temple at Patna written in 1792 A.D.

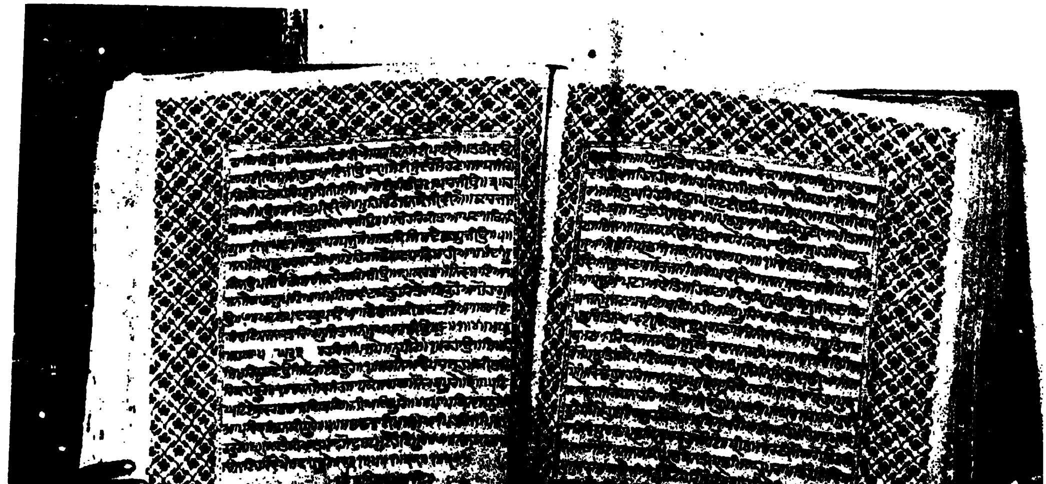

Two pages of an illuminated copy of the Granth Sahib, made about 1745 A. D.

THE DACCA REVIEW.

Vol. VI.	APRIL, 1916.	No. 1.

THE ARTS OF TIBET.

The history of Tibet is reflected in its arts. Until the iutroduction of Buddhism in the 7th century A. D., the people, from all accounts appear to have been rapacious savages aud reputed cannibals, without a written language, and practising a devil-dancing or Shamanistic religion which still survives under the name of the Bon-pa. Distinct traces of this cannibalism or at least human sacrifice in its most revolting form are atill observable in much of the art of Tibet at the present day. A remarkable fabric known as a "Kangzey," now in the Art Section of the Museum, pictures this in a particularly graphic fashion. The central feature of the design consists of a collection of Buddhist symbols, but these are held in position by flayed creatures—men and animals—besides dissected portions of human beings, which place the meaning of this unique temple-hanging beyond doubt. A few illustrations from this fabric will serve to explain this.

It would take too long even to outline the wealth of allegory which this wonderful textile displays, but some of the main features may be referred to. Skull-cups containing offerings of blood are frequent in the design, while lamps with lights burning are also seen. Then there are two figures holding the *norbu* or jewel, the Mother of All Gems, the Wish-procuring Gem, which figures in almost all Tibetan designs. The Victorious Wheel of a Thousand Spokes, which also represents the Symmetry and Completeness of the Law. The conch-shell, the emblem of victory, and also on account of its white sheen the "Symbol of Purity", the skull-offering of the Five Powers, hearing, smelling, speaking, seeing and thinking, an offering to prevent disease or accident. Musical instruments will also be noticed, the Damaru or skull-drum, tied with the colours of the five powers, and the Thigh-bone trumpet the sound of which is supposed to summon the demons. As in the Tibetan

death-ceremonies the body is usually destroyed, these are generally manufactured from the bones of criminals, and the more wicked the individual the more powerful the blast and its effect. I am also informed that the thigh-bones of *mahouts* of the plains of India were much sought after for this purpose on account of their size and strength. The elephant-driver is brought up from childhood at his business and his femurs probably develope a subtle twist which give the note from these trumpets an added quality. In any case the life of a mahout anywhere on the borders of Tibet must have been full of interest whenever the neighbouring temple band required to replenish its instruments.

Besides the decorative and pictorial examples found in the temples, the Tibetan's religious dramas also exhibit this feature in a most realistic manner. In the course of the devil-dance, a human dummy is dragged about by skeletons and finally despatched by means of daggers, the dismembered portions being afterwards distributed among the demons taking part in the dance. Of course large areas of Asia practised Shamanism previous to the introduction of Mahomedanism and Buddhism, but in Tibetan art we find this morbid religion still much in evidence, and observed in the otherwise picturesque form of the Devil-dance.

During the 7th century, however, a change comes over the scene. On each side of this great country, which was still steeped in barbarism, were two other powerful empires which had for centuries observed Buddhism, and whose enlightened condition must have appealed to the ruling powers of Tibet. These two countries were, on the one hand China, and on the other, India with Nepal. The situation therefore, required but the moment and the man, and the latter was revealed in Sron Tsan Gampo, a king of great character, who mounted the Tibetan throne about 635 A. D. This monarch took unto himself two wives, a princess of China and a princess of Nepal, both of whom were ardent Buddhists. These two women speedily effected the conversion of their husband to Buddhism, and under their advice, he sent to India, Nepal, and China, for Buddhist book and teachers. The enormous change therefore of this great area from barbarism to Buddhism centres round these women, and specially to the Nepalese princess Bhrikuti. I have her portrait which is a small metal figure I obtained from Tibet and which depicts in a most realistic and beautiful form this historical personage. It is doubtful whether this work of art is Tibetan—it is Indian in character and feeling—and was probably made in India some considerable time ago. The influence of the princess Bhrikuti, however, extended far beyond her earthly record—the great good her personality did for Tibet led to her consecration as a saint, and she is now worshipped as the "Green Tara,"

the Saviouress or Goddess of Mercy." In this incarnation Bhrikuti is sometimes depicted by Tibetan artists of a fierce appearance, as sad to relate she is recorded as having been of a fiery temper and the cause of frequent brawls on account of the precedence given to the Chinese princess. From this date therefore, and the succeeding six centuries, Tibet looked to India for its art, in the same way that it went to that country for its religion, its script, and everything appertaining to its new civilization. Some idea of the situation may be gained from the actual words of Sron Tsan Gampo when he sued for the hand of the Nepalese princess "I, the king of barbarous Tibet, do not practise the ten virtues, but should you be pleased to bestow on me your daughter, and wish me to have the Law, I shall practise the ten virtues with a five-thousand—fold body * * * though I have not the arts * * * if you so desire * * * I shall build 5000 temples."

And, judging from the artistic records of Tibet, Sron Tsan kept his word and in every sense this period corresponds to what may be defined as the Indo-Buddhist period of the country. The arts particularly bear witness to the Indian influence and conclusively demonstrate that these were fundamentally of Indian origin.

Then in the 13th century another epoch commences with the great Asiatic invasion of Kublai Khan, the founder of the Mongol Dynasty in China. From this date Tibet severed its connexion with India and until the present day has gone to the Far-East for its inspirations, the effect of which is seen in all the institutions of this time. The reason for this great change is not far to seek. Kublai Khan favoured the culture of the Chinese. In Tibet he saw in the organized force of Buddhism the readiest instrument in the civilization of that country, and that system received his special countenance. An early act of his reign had been to constitute a young lama of intelligence and learning of the name of Phagsa the head of the Lamaite Church, and eventually also Prince of Tibet. In this act lay, in a precursory form, the rule of the "Grand Lamas" of Lhassa, and, subsequenetly, the whole system of Lamaic rule in Tibet. From its close association with India therefore the whole trend of national life in Tibet gravitated bodily to China and has remained there even since. If this great movement were not observable in the other institutions of the country it is plainly written in its art which shows it unmistakeably in every aspect of its design.

We are, therefore, presented with three periods:

(1) The Barbaric up to the 7th century.

(2) The Indo-Buddhist from the 7th to the 13th century.

(3) The Mongol from the 13th century to the present day.

And there is now every sign that a fourth period is in the course of formation, and that the pendulum is swinging back again Westward, but this the future alone will see.

Having made this brief review of the country's history, and indicated the great influence this has had on Tibetan art, we may now turn to an examination of the underlying principles which have guided the artist in the production of his work. It is hardly necessary to state that Tibetan art is essentially religious, but it may be useful to point out that it is religious in a very noticeable particular. This is that the entire character of the art is expressed in the word "symbolism." In other words the religion is translated into symbols, and these symbols, and they alone, are the elements which the artist uses in his art. No selected example of Tibetan handicraft is needed to explain this. Any religious article may be taken at random, and a key to the character of the art is at once observable. One illustration will suffice.

The well-known devil-dagger or "Phurbu" may be selected. This is a special weapon for expelling demons, and is used extensively in various forms of the ritual. At the top is the Thunderbolt or "dorji," which is the sign of a special sect known as the "Followers of the Thunderbolt." It is symbolic of the thunderbolt of Indra (Jupiter) by which he shattered his supernatural adversaries. This is a thunderbolt of the 5 powers, it has 5 bars and these 5 powers, are somewhat equivalent to our 5 senses. Below are three marks representing the 3 types of divinities. the mild, the angry and the most terrible. The power of these three groups is transmitted into the blade of the dagger which has 3 flanges, and thus, when the victim is killed by this these three gods convey his spirit to paradise. Below is a complete thunderbolt of 10 powers, the arms of which represent the points of the compass, the fifth or central arm constituting the atmosphere. This joins on to a monster know as a "*chu sing*" or water lion, the fiercest and most terrible of all supernatural animals, and he holds the point of dagger in his mouth. There is much more to be read in this weapon, but this is the bare outline of the symbolism connected with a common implement known to most collectors of Tibetan art.

But the question may be asked, on what is this symbolism founded? The answer is Lamaism, which is the special form of Buddhism practised in Tibet. This however does not entirely explain that a great mass of this symbolism is in no wise associated with the religion of Buddhism, some other outstanding influence is indicated to account for the innumerable and complicated allegories which form the basis of the country's art. And it is not difficult to see that this particular influence is a thick cloud of superstition

which permeates the secular and domestic life of the people, and affects the whole of the institutions of the country. The reason for this state of affairs is not at once visible, for this superstition is not like that which is found in other countries of the East—a collection of mysterious beliefs appended to the local creed, but it is a very real and very terrible array of supernatural creatures who live and have their being in the land of Tibet. And the weird and unnatural configuration of the country, and its peculiar situation, are probably responsible for much of this.

Let us briefly review its physical features and try to understand what it is that causes the country to lie under a spell, for the people to live in a world over which brood all kinds of devils and monsters, evil beings who require propitiation at every turn.

It is not an uncommon trait in the ordinary individual, when gazing at a range of distant mountains, to speculate on what lies beyond. Those who have cast their eyes in a north-easterly direction from Observatory Hill, Darjeeling with this thought in their minds, may have also reflected that beyond these distant mountains lies the vast tableland of Tibet. And the only way to reach this elevated country is by a narrow path which corkscrews its way laboriously through the mountains, and crawls painfully through a fifteen thousand feet high gap, the only place of access to the great plateau beyond. No wonder the British soldier attached to the Tibetan Mission of 1903-4, as he scrambled breathlessly up this route, observed that he had always understood Tibet was a table-land and that this must be one of its legs! And the stories of the Pass, the death that overtakes the traveller when caught in a snow-storm, form the subject of conversation around the camp fire whenever this route is traversed. No wonder the simple Tibetan regards the blizzard, the frost, and the avalanche, in the light of powerful spirits to be feared and propitiated on all occasions. Then, having gained the plateau, he is daily confronted with that mysterious wind of Tibet, which, rising every day between twelve and two, with the regularity of clockwork, blows with merciless vigour often carrying with it sleet and hail, until the darkness forces it to rest. Those vast solitudes of Tibet inhabited only by this tearing wind are sufficient in themselves to cause man to regard these ever-constant and terrifying forces of nature as an overworld of supernatural beings to whom he is but a plaything or a slave. It is the ruthlessness, the overwhelming character of Nature, where in other climes her harmony, her adaptability to human needs are her chief features, it is this aspect of the country which may be regarded as largely reeponsible for the great mass of the superstitions of Tibet. Other influences are also

at work, the religious system undoubtedly does much to encourage this, but it seems more than likely that the fundamental cause may be traced to the geographical position and physical configuration of this great central Asian plateau.

To sum up, therefore, Tibetan art is built up on a great array of symbols, pictorial elements expressing in concrete form the mysteries that lie behind them. As I have endeavoured to explain the primary inspiration for thsse may be traced to the peculiar character of the country, added to the many centuries of barbarism which lasted well into the Christian Era. Then the influence of Buddhism becomes observable and the remainder of the story is comparatively simple. Tibetan art, with this religion originally came from India, but before it appeared in Tibet it went via Nepal and made a long stay among the Newar craftsmen of that country. These artistic Nepalis then carried it into Tibet, and for some centuries the arts of that country were Indian—Indo-Buddhist as introduced and interpeted by the Newars of Nepal. In the 13th century, the connection with India was severed, and Lamaism, a system originally evolved from China, entirely influences the art. Tibetan art, may therefore be briefly defined as a Chinese strata overlying a bedrock of Indo-Buddhism.

The arts of Tibet being largely secular, the best examples are to be found in the temples and monasteries. These institutions are, in a sense, the museums of the country. The main features of the temple accessories are the painted plctures and frescos, and the metal-work. A brief description of these two arts of painting and sculpture will therefore be undertaken.

Tibetan painting is essentially an art of the country and takes two forms. On the walls of the temples and monasteries it is seen as fresco painting, and hanging about the same edifices it is expressed in the Tangka or temple banner. Both these forms of the art are carried out entirely by Tibetan artists, so that in painting at least we are presented with a true indigenous form of expression. The origin of painting in Tibet is not far to seek. The mural frescos in the first instance bear no little resemblance to the cave paintings of Ajanta in India, which date from the first centuries of the Christian Era. Again we pick up the clue in Khotan at a slightly later date, where the explorations of Stein and Le Coq reveal wall paintings of a kindred character. In the same way the prototypes of the temple banners come into view. In technique these Tibetan tangkas are not unlike the miniature pictures of the Rajput School of miniature painting which flourished in the Middle Ages of India, but a most interesting link is a reference by a Chinese connoisseur in the 11th century. He states that "In India, at the temple of Nalanda, the

priests paint many Buddhas, Bodhisatvas, and Lohans, using the linen of the West." This is a brief but accurate description of the Tangka of Tibet as painted at the present day. This theory is confirmed by turning to the result of the excavations in Khotan already mentioned, which have revealed 8th century Tangkas almost identical with these well-known products of the Tibetan painter's brush.

As the Tangka is such a characteristic expression of the art of the country, a closer investigation of this production may enable us to realize the conditions under which art is produced in the land of the Lama. It seems hardly necessary to state that the Tangka is essentially a religious picture associated entirely with the ritual of the country's creed. These pictures are to be seen hanging in numbers in almost every religious edifice in Tibet. The story of the Tangka is as follows :—

As may be expected horoscopes form an important feature in the life of a Tibetan, and the presentation of a religious object to the neighbouring temple is often an item in this scroll of life. In other words "it is written" that such an offering at such a time or event must be made, and accordingly on this occasion the individual concerned consults the family priest or lama. After unimportant preliminaries, the Lhabri-pa, or artist, is called in and the commission placed with him, the lama prescribing the general form on which this work of art is to be designed. As a rule the Tangka is planned on certain lines laid down in the religious writings of the priests, and governed by canons similar to the Shilpa Shastras of the Hindus. Further the figures are worked out by a system of measurements which correspond to those used in India from early times down to the present day. The Lama knows these rules and the Lhabri-pa, is well versed in their application, so that the design is made hieratically correct. The Lhabri-pa, as in the good old mediæval fashion, is often a sculptor as well as a painter. This individual was originally a priest but deserted his order so that he might carry on his art. Occasionally this is found to be done, in which case the artist has a higher value on account of his expert religious knowledge. The commission for Tangka having been placed with the painter, this individual proceeds to the house of his patron and begins the work there, carrying it out under the eye of the donor of the picture. All materials as well as food are provided by the patron, the artist practically living in his house except that he retires everynight to his own home to sleep. Before doing so however he is treated to as much "chang" or native beer, as he is disposed to drink, a harmless arrangement in view of the comparatively mild character of this national beverage. Over and above this his wages are approximately a rupee a day, varying of course according to the

talent of the artist and the quality of the picture. Under these homely conditions the work of art is produced, and on its completion the custom is for the patron to make an artist a little present of coin wrapped in a fine cloth and handed to him with a few words of praise. This completes the actual painting of the pictures, but much more follows before the article at last finds a resting place in the temple. A "durzi" is employed to mount the picture in the manner of the well-known Japanese "kakimona," chinese brocaded silks (Tson-dan) being used for this work, and the selection of these require considerable taste. Tibetan connoisseurs of the present day value the Tangka for its exquisite mounting, because these brocaded silks are becoming very rare and are now of more value than the actual picture. This particularly applies to the small square of special brocade, often introduced into the lower margin of this silk mounting, which is usually a very choice piece of silk. This inset is called "Kat-di." The picture itself is always framed with a "jamasir" of red and yellow silk symbolising the rainbow border. Over the whole is placed the "memsi," a silk cover dyed in soft colours and which protects the painting when it is not in use, and above this are two strips of thicker silk called "loongne" which act as weights and keep the silk "memsi" in its place. The durzi's work is now complete but the Tangka is then entrusted to the carpenter to mount it on rollers, "tangto," and the best pictures are those which have black wooded ends to the "tangto," instead of brass or other metal. The Tangka, now, as far as art is concerned is finished, but it still is only the work of man's hands; a special ceremony is required to consecrate it and "give it a spirit." This is most essential to convert it from a work of man to a symbol of god, and this the Lama performs with all the necessary ritual. The Tangka is now ready to be hung in the temple and this is undertaken with considerable formality and the picture displayed in its allotted place.

Many of these Tangkas however are not intended to be exposed throughout the whole of the year; they relate to certain seasons and festivals, so that they are only brought out on these occasions, exhibited for a limited period, and then packed up and placed away until the next year. This is the case with many of the temple accessories so that it becomes almost impossible to judge their age from their condition. For instance often the oldest "tangkas" bear the best-preserved appearance, because they have been carefully stored and protected. The smoke-dried specimens frequently hawked about Darjeeling are usually comparatively recent productions, cheap in quality, and thus left uncared for in the temple until they are ready to drop to pieces from neglect. The Tangka should be judged not from

its apparent age, but by the fineness of its brushwork, not a difficult task if a little trouble is taken to examine the technique.

This technique or process of production is an interesting one. One interesting picture shows a Tibetan artist's studio. On the easel, so to speak, is his "canvas," a piece of cloth stretched when damp on a wooden frame. Around are a variety of pots, pestles, and mortars, in which he prepares his colours. As in the mediæval days of all countries, the Tibetan artist prepares his own pigments although now, alas, he is obtaining most of these from Europe. Most of his old colours, however, were extracted from minerals, some from local earths, others from distant countries such as Mongolia and China. When applied to the surface of the cloth they are mixed with an animal gum called "Ting." The cloth is called "song" and obtained from China. This is first primed with a coating of prepared chalk and gum which is afterwards burnished with an agate. On this eggshell-like surface the artist paints his picture. The brushes, having to be very fine, are made of cat's hair.

The larger paintings on the walls of the temples are substantially executed in the same manner.

There are other pictures, similar in general character to the painted "tangkas," except that they differ in the materials used and are not executed in the same techinque. Some of these are embroidered, others are applique, and some appear to have been woven on a loom. None of these however are likely to be of Tibetan manufacture, as there are no textiles of any importance or artistic merit made in the country except a few rather commonplace rugs and carpets and some coarse wool weaving. These woven and piece-made tangkas are the work of Chinese fingers and so, strictly speaking, do not come within our subject.

The actual subject-matter of the painted Tangka opens up a large field of investigation, and only a very general classification of these interesting pictures can be attempted. The bulk of them are representations of the various divinites worshipped in Tibet, and, as such, may be divided into three classes of gods.—The mild, The Angry, and the Most Terrible. The uses to which these tangkas are put are in conformity with the subject depicted, the *Mild* are for blessing and benevolence, the others are utilized in destroying enemies and for similar devastating purposes. It may be noted that the Terrible gods are mostly *in* evidence, the Tibetan evidently pinning his faith more to the destructive forces than to the powers of good. Another class of subject represents superior Lamas and other pillars of the Church who have achieved great distinction and eventually become sanctified. The stories of their lives and their various incarnations are also shewn in the picture. These may be said to

be in the "Narrative style" or are historical, but the Tibetans themselves have no classification for their Tangkas, although it is just possible to resolve them into broad divisions. A very popular class is the picture of the Mandala or Magic Circle, a mysterious arrangement of squares and circles, understood in a vague way by the ordinary Tibetan, but very difficult for the outsider to grasp. Briefly these Magic Circles are based on certain charmed sentences supposed to have been composed by the several divinities concerned, and by worshipping the mandala these divinities are coerced into assisting the votary to reach "the other shore." These particular pictures will not hawever appeal to the ordinary connoisseur, but the other subjects, especiallp the stories of the various semidivines who have built up the Lamaistic church, will always have a special on account of the spiritual feeling which they undoubtedly express, and the story they so artistically illustrate.

A short description of one form of applique picture should not be omitted. Every important monastery possesses a very large piece-work picture called a "Kiku," which is exhibited at a particular place for a short time once a year in order to ward off pestilence famine. These great works of art are a feature of monastic life in Tibet and need special reference. The Art Section of the Museum has acquired a comparatively small but very rich specimen which is now on view. But some of these, as for instance the one at Gyantse, exhibited only for two hours once a year, are remarkable fabrics. This one is made of the richest pieces of Chinese brocade, and is 40 yards in height and 26 yards across, exclusive of the side panels. One of these wings it will be noticed is missing and is believed to be in Berlin. The ceremony of displaying this work of art is an important one, and entrusted to a staff of some 16 local "durzies," who wear special uniforms for this occasion, and are held responsible for the protection of this great picture. The devotees perform certain ceremonies before the Kiku, and incidentally make a present to the durzies for their labour in handling the picture. The great pylon on which it is hung, called the Kiku-pay, is specially built for this purpose and faces the West. This enables the picture to be exhibited in the morning in the shade, so that no sunlight may fall on the Kiku and cause it to fade. As the sun works round the picture is lowered, and by nine o'clock in the morning the ceremony for the year is over.

The subject of the picture is the Buddh with begging bowl, and some idea of the size of the central figure may be gained by realizing that the hand holding the bowl is 8 feet long, while the eye is 2 feet 6 inches across.

Apart from the painting the other outstanding feature of Tibetan art is the metal-work. It differs from the

pictures however by being domestic as well as secular. The domestic utensils, although very picturesque in design. do not form a very important section of this art, but nevertheless appear prominent in small private collections of Tibetan art. But it is in the production of metal figures for the temples that the metal worker excels, and in these he has reached a very high standard of workmanship as the examples I will pass before you may demonstrate. These metal divinities vary considerably but may be roughly divided into two main classes (a) the smaller ones, up to about 9 inches in height, which are cast, and (b) larger ones some of which are colossal in size, and are all hammered work. All are made hollow, the larger ones on account of the process, and the smaller ones to accommodate small sanctified offerings which are enclosed in the interior. Another picture illustrates a small staff of subordinate lamas, in a side-chapal, arranging and sorting written prayers and other consecrated objects previous to sealing them up inside these metal statuettes. The metals used are brass and copper only, any figures in bronze, or other mixtures, may be traced to Chinese foundries. The smaller cast figures are moulded in a manner similar to the Indian productions of the same nature, that is the well-known "cire-perdue" or "lost wax" process, which is employed all over the East. But the large hammered metal statues are made in a way which is unusual, although at the same time effective and not unworkmanlike. The fragment of a large statue on the table will explain this better than any description. Briefly, each detail and member of the figure is hammered out separately, arms, legs, head, hands and fingers, each is beaten out as a distinct part by itself. Then all these parts are assembled and brazed together thus forming the statue.

This process sounds simple and is really simple as far as details are concerned, but the skill lies in getting these various parts so to fit together as to make a presentable work of art. Much of this is undoubtedly achieved by means of rules and laws laid down in the Kutsay-ki-Paicha, an ancient compilation in which all the measurements and proportions are most minutely tabulated, but a great deal of art is also necessary to produce these very artistic and remarkably fine statues, and the workmen responsible for these are thoroughly experienced craftsmen as their productions unmistakeably testify. A key to some of this success may be found in the large number of life-size figures built up of a clay composition which are found in the temples. It seems more than likely that the metal figure is first modelled up in clay and this is used as a pattern from which the final metal statue is copied in sections. The larger figures are always constructed of copper and are heavily gilt.

The various articles of religious use may be best seen in these pictures of the monastic interiors, which will show these objects in situ. The vessels of offerings, the lamps, and other temple furniture, may be seen in actual use. This is a shrine containing a "chorten" placed by a devotee before a statue of the Buddha. It will be noticed that this figure has been draped by a votary to show his reverence, and thus to gather merit for his act. The next depicts a chorten by itself, giving the details, and the jewelled decoration. This is a picture of a monastery with a very richly ornamented altar. At the entrance to the hall, on the left, will be seen a holy water vessel, and on the right a utensil known as "the Everlasting Vessel". The latter is filled with consecrated water which is sprinkled before the god, or over sinful men, by means of the ornamental spray at the top.

This is the interior of another monastery, with an altar covered with small votive figures and devil-daggers in the foreground. These pictures may give an idea of the arrangement of these institutions and the conditions under which these articles of ritual are utilized. Here is one of censers, and shows these picturesque objects being held by priests preparatory to a processional. This is a holy water vessel designed out of the two golden fish, one of the "Eight glorious Emblems". It is particularly graceful in design and proportions. This is a brass lamp to be placed before the altar. These lamps are generally burning night and day in the temples. The design of this one is very refined and the ornament is beautifully executed. This is a conch trumpet silver-mounted, a very handsome musical instrument. These conch trumpets are used in the monasteries to call the lamas to prayer.

The domestic utensils of Tibet, being often seen in private collections, need a reference. The commonest receptacles are the tea, beer, and butter pots, which are often very artistically designed. The tea-pot illustrated is too well-known to need description, but genuine specimens are becoming rare in these days. The beer or "chang" pots are a little different in design, a good series in actual use will be seen in this photograph, held by waiting maids, who served at a luncheon party at which I was present in Tibet. When it is realised that the colouring of their ornaments was turquoise, coral, amber, and pearl, it will be understood that it was like being waited on by stained-glass windows. This is a chang-pot still more elaborately decorated with silver ornament on a copper body.

In domestic metal work, chiefly in decorated iron, artizans of a country in Eastern Tibet of the name of Kham have made considerable reputation. This distant country borders on China and the designs and workmanship denote no little Chinese influence but at the same time, like all the arts of Tibet, the Kham work has fundamentally

a character of its own. The Khambas are the fighting people of Tibet—the illustration depicts a typical swash-buckler from this part—and are generally well armed. In the manufacture of armaments therefore the Kham artizans no doubt first distinguished themselves in the preparation of swords, knives, daggers, guns and other weapons of war, in all of which iron played an important part. Then probably in times of peace they turned their attention to tea and beer pots, cup-covers, saddles, &c. all largely carved and hammered out of iron, and these articles are now a feature of the Kham country. This specimen is a Kashoo or cup-cover, most elaborately carved out of iron, and this is a "chang" pot, artistically inlaid in brass, copper and silver, on a body of iron with a brass spout and handle.

The jewellery and personal ornaments of the Tibetans, especially of the women, are so profuse as to require special mention. The turquoise is the favourite stone, as all visitors to Darjeeling are aware, and the variety of designs worked out in this artistically coloured mineral are bewildering. These stones are obtained mainly from Persia, the other favourite ornaments being coral, seed-pearls and amber, all of which it will be noted are imported from far countries, hence of additional value to the Tibetan. The colours of all these products are not the least of their attractions, and the Tibetan jewellers work them up into very beautiful combinations which, when worn against a background of Benares "cloth of gold," present a very striking effect. This depicts an aristocratic Tibetan lady in full costume and it will be observed that jewellery plays an important part in the scheme. She wears at least 4 charm-boxes, and these are undoubtedly the commonest form of personal adornment, as apart from their beauty of design and intrinsic value-largely turquoise set in gold—they have their spiritual and practical use in warding off accidents, illness, and all kinds of evil influences. The back view is almost as ornate as the front, and the lady had to be followed around by an attendant to keep her jewellery in position and also to arrange it for her according to her movements.

A certain amount of jewellery is also worn by the men, especially by the Khams already mentioned who deck themselves out with very massive rings. Some of this Tibetan jewellery is however of an official character, such as the button on the hat, and the ear-ring, which are often of quaint and elaborate design. The long pendant worn in the left ear is one of the signs of office, and is constructed of a series of turquoise beads with a pearl in the centre. The pear-shaped drop at the lower end in the real article is not a turquoise, as appears at first sight, but a blue glass bead, and unless this is so the ear-ring is a spurious one, not a proper official

badge, but a sham, made up in order to impose on the tourist. His Excellency Lord Carmichael whose valuable loan collection of jewellery now exhibited in the Museum bears witness to an extensive knowledge of this subject, informs me that the reason for this combination of turquoise, pearl and glass bead is as follows. All information which finds its way to the ears of the wearer of this official emblem regarding his superiors first concentrates on the ear-ring Before entering the ear, it is purified by passing through the pearl, and the evil information, in the form of dross, drops down through the false bead at the base on to the ground. It has been suggested that this earring, and the system that is connected with it, might be adopted with considerable success in communities other than those of distant Tibet.

Time has only permitted me to bring before you a few of the main aspects of Tibeton art. I trust, however, that I have enabled you to form some idea of its general character, and the principal purposes for which it has been produced. Those of us who live in Bengal see much of this art; it is a feature of the bazars of Darjeeling, and is also very noticeable in local private collections. The Art Section of this Museum contains a unique collection of Tibetan workmanship which is well worthy of study. For those who desire to make a further acquaintance with this subject I can only recommend a visit to the Museum which I am sure will cause all those who do so to admire and appreciate the art of Tibet.

PERCY BROWN.

THE JURISDICTION OF THE DISTRICT OF DACCA.

At the time of the settlement of Raja Todār Māl in 1582, the present district of Dacca was not an administrative unit but was included mainly in Sarkārs Bazuhā and Sonārgàon with small portions in Sarkàrs Futtehabad and Mahmudabad. On its selection as the capital of the Suba of Bengal in 1608, Dacca became the headquarters of the administration of the province, but there is no trace of any local administration corresponding with the present district. During the administration of Murshed Kuli Khan as Dewàn and Nazim of Bengal, Behar, Orissa between the years 1701 and 1725, a complete reorganisation of the internal administration of the provinces was made, the Sarkàr being abandoned as as the unit in favour of the larger Chakla. Of the 13 Chaklas, adopted as the units of administration, amongst the most important was the Chakla of Jahangirnagar or Dacca. This comprised the whole of the Sarkars of Sonargaon, Bakla, Udaipur (Tipperà) and Muradkhàna (the Sundarbans) with portions of Bazuha and Fatehabad. This tract covered the present districts of Dacca, Tippera, Noakhàli, Bakarganj with portions of Khulna, Faridpur and the greater part of Mymensingh. Prior to the year 1765, the greater part of Tipperà was separated from this Chakla; on the other hand a large portion of the modern district of Sylhet, Mymensingh and Faridpur were added. The Chakla of Jehàngirnagar (or the Neàbat or Province of Dacca, as it was commonly known,) comprised an area of 15,397 square miles as surveyed by Major Rennell, and it was this area that was taken over at Dacca by Lieutenant Swinton on behalf of the East India Company on the grant of the Dewani in 1765.

The district from 1582-1765.

At the commencement of British administration, the extent of the province was maintained, and the first Supervisor of Dacca, Thomas Kelsall was appointed in 1769 as Supervisor of Dacca and its dependencies; assistant Supervisors were appointed to the dependencies of Sylhet, Tipperà* and Bhuluà (Noakhali). When the Company stood forth as Dewàn in 1772, these three dependencies were created into separate districts or Collectorates, but on the creation of Provincial Councils of Revenue in 1773 both Bhuluà and Sylhet were re-annexed to Dacca, Tippera remaining a district dependent on Chittagong. The area under the

District Jurisdiction 1765-1785.

* The Tippera referred to up to 1789 corresponds to the present Hill Tippera with only a small portion of the present District of Tippera, east of Commilla. The South, West formed part of Bullua, and the North part of Sylhet.

control of the Dacca Provincial Council was further increased by the inclusion of the Parganas of Attià, Càgmàri and Bara Bàzu from Dinajpur. These boundaries were maintained until the dissolution of the Provincial Councils in 1781. On the recreation of Collectorships, Sylhet was finally separated from Dacca under the control of the Hon. Robert Lindsay, but a proposal to separate Bhuluà from Dacca in the following year was rejected Till the year 1786 this jurisdiction was maintained; the jurisdiction was however fiscal rather than territorial; the districts had been framed with the object of collecting the revenues rather than for administrative advantages. For example, the parganà of Makimàbàd, the whole of which lay within the territorial limits of Dacca was included in Murshedàbàd doubtless due to the fact that it was the property of the Sadar Kanungo, Lakshmi Nàràyan Ray.

District Jurisdiction 1786-1787.

The year 1786 is an important date in the administrative development of Bengal. Under the orders of the Governor-General in Council dated the April 7th, it was decided to divide the provinces of Bengal and Bihar into 35 compact districts each with a revenue of about 8 lakhs of rupees; these 35 districts were allotted to major divisions. The Dacca district, as it then existed, was treated as a major division and subdivided into 4 districts.

District.	*Collector.*	*Revenue.*
(i) Dacca	M. Day	Rs. 8,16,117.
(ii) Mymensingh	H. Burrowes	Rs. 6,02,872.
(iii) Bhulua	W. Wroughton	Rs. 6,86,472.
(iv) Buzrogumedpur	H. Lodge	Rs. 8,38,227.

The details of the reform were short-lived, and as a result of a minute of John Shore dated March 13th 1787 it was decided to redistribute the territories of Bengal and Behar into 23 districts, the major divisions being abandoned. The 4 districts carved out of the Dacca Division were re-shuffled into the 2 districts of Dacca Jalalpur and Mymensingh, each with a revenue slightly exceeding 15½ lakhs of rupees. The new district of Dacca Jalalpur comprised rather more than half of the former district of Dacca, practically the whole of Buzrogumedpur, ⅛ of the former district of Mymensingh, ⅐ of the former district of Bhulua, and small additions from the districts of Jessore, Murshidabad and Mahammedshahi.

District Jurisdiction 1788-1793.

Though some attempt appears to have been made in 1787 at geographical cohesion, the main idea appears to have been the equalisation of the revenues of the 2 districts. The district of Mymensingh extended from Pargana Susang and the Garo Hills in the North to the island of Sundwip in the South; so great was its extent that until 1790, after the creation of the new District of Tipperà in 1789, the headquarters of the Collector of Mymensingh were located

at Dacca, as being the most central and convenient situation. The new district of Dacca formed a fairly compact geographical unit but contained a vast protuberance on the bank of the Meghna, which seriously affected the continuity of the district of Mymensingh; the Western boundary of Dacca was ill-defined. From 1787 to 1793 a continuous process of consolidation took place. In August 1789, all lands west of the Meghna were declared to belong to Dacca, and in December 1789, the new district of Tipperà was created for all lands lying east of the River Meghna, including the Bhulua portion of Mymensingh. These re-adjustments in the district boundaries were consequent on the decision of Government in 1789, that every Collectorship should be as compact as possible, a decision confirmed in 1793 when the large rivers were definitely adopted as the inter-district boundaries. Between 1787 and 1793 the parganas of Baradàkhat and Noàbad and Tappa Panchbhóg were in a constant state of transfer, but by 1793, the only extensive area West of the Meghna that belonged geographically to Dacca but had been included in Tippera, was Tappà Pànchbhàg. On the Western boundary, the rivers Conoi (corresponding generally with the present Jamuna River) and the Ichhàmati were adopted as the boundary between Rãjshàhi on the West and Mymensingh and Dacca on the East; pargana Atia formed the Southern boundary between Mymensingh and Dacca. This re-adjustment of the Western boundary of the district resulted in the inclusion in Dacca of several important Rajshahi parganas *i. e.* pargana Kasimnagar, Sujabad Kutubpur, Tappa Sakhini and Tappa Ibrahimpur, Tappa Bankipur.

District Jurisdiction 1793 to the present day.

At the end of the year 1793, evidently to relieve the heavy pressure of work in Dacca, the Collector of Mymensingh proposed to take over from Dacca the whole of that part of Dacca lying to the North of the Dhaleswari River, evidently including the towns of Dacca and Narayanganj, but owing to the strong objections of the Collector of Dacca the proposal was negatived. In the year 1797, however, detailed proposals were formulated for the partition of the Dacca district along a line following the the course of the River Padma as far as its junction with the Nayabhangani River, thence along the course of the latter river to the Meghna, the land to the N. and E. of the Padma to remain in Dacca, the remainder in Bakarganj. These proposals appear to have been abandoned largely owing to the discrepancy of revenue in the 2 parts; the revenue of Dacca Jalalpur would have amounted to Rs. 3,28,207 against Rs. 9,13,015 in Bakarganj. In the year 1801 a considerable number of petty estates appear to have been transferred to Tippera and Mymensingh; in 1811 a

part of Busna was transferred to Dacca Jalalpur: by the year 1814 the difficulty of collecting the revenue of the 12,476 estates then on the revenue roll became so acute that Government proposed to adopt the magisterial jurisdictions of Bakarganj and Faridpur as revenue units for collection purposes. The registrars of the Courts were given powers as assistant Collectors and were deputed to collect the revenue of estates, the revenue of which was less than Rs. 5000. The result was not however satisfactory and in 1817 the district of Bakarganj was finally separated from Dacca; it appears that the original district of Bakarganj comprised the whole area included in the jurisdiction of the Magistracy of Bakarganj, the District of Dacca comprising the jurisdiction of the Magistrates of Dacca City and Dacca Jalalpur (or Faridpur) under a single Collector. By Regulation V of 1833 the districts of Dacca City and Dacca Jalalpur were amalgamated, and it appears that in 1835, when the offices of Collector and Magistrate were amalgamated, a Deputy Collector, was placed in charge of the Faridpur area subordinate to the Collector of Dacca. In 1856 Faridpur was separated definitely from Dacca, all the area lying to the N and E of the River Padma viz Thanas Sealo, Harirampur, Manikganj and part of Nowabganj being included in Dacca; at the same time transfers were made from the Rajshahi division to Dacca to maintain the Jamuna as the inter-district boundary. In 1871 Mulfatganj thana which had been left in Dacca on the separation of Bakarganj, in 1817 was transferred to Bakarganj the Padma River being declared as the boundary between the 2 distircts. In 1874 a complete notification of the district boundary was made by the Boundary Commissioner, covering the transfer of 2 small areas from Mymensingh to Dacca made in 1873. In 1891 a fresh notification was issued, which clearly defined the main streams of the Jamuna, Padma and Meghna Rivers as the boundaries of the Dacca District on the W. S and E. Beyond several inconsiderable changes made on the common boundary between Dacca and Mymensingh in the course of the present settlement proceedings, the only further changes have been due to the never-ending fluctuations in the course of the main streams of the big rivers.

Magisterial Jurisdiction 1781-1833.

The jurisdiction of the Collector and Magistrate are now the same, but the above account deals only with Collectorate jurisdiction; the Magisterial jurisdiction of Bakarganj and Faridpur were both independent of Dacca before the creation of separate Collectorates, the distinction between Dacca City and Dacca Jalalpur (Faridpur) being as early as 1787, while Bakarganj possessed a separate Judge and Magistrate as early as 1781. By Reg VII of 1797 Bakarganj was

finally created a magisterial unit, separate from Dacca Jalalpur. Originally the area comprised within Dacca City covered the tract bounded by the River Buriganga and Torag River, the Tangi Khal, the Balu River and the Dholai Khal with an extension as far east in 1787 as Fatulla, but in 1802 only as far as Pagla. In 1811 however the area of Dacca City was extended to include the whole of the present district including Thana Mulfatganj, but excluding the Manikganj subdivision and part of Thana Nawabganj,—the boundary maintained until the amalgamation of the 2 districts in 1833.

Thana Jurisdicion 1793-1818.

The thana was not in origin a revenue unit, but was adopted as the police unit of administration in the Cornwallis code of 1793, being subsequently adapted for revenue purposes. Originally exclusive of five thanas, viz. Chauk Nikas, Faridabad, Sultanganj, Merpur and Naraindia into which the City was divided, the district as then constituted was divided into 16 thanas, each unit averaging approximately 400 square miles in area. These thanas were situated at Pitalganj, Dhamrai, Haziganj, Mohanganj, Bhojeswar, Bokainagar, Baufal, Khulsakhali, Angaria, Baroikoran, Tugra, Kachua, Khellakhali, Serikul, Sibchar and Sungram. The first 4 thanas in this list constituted with the thanas of Dacca City the present district of Dacca; they are detailed as follows :—

Thana	*Boundaries*	*Present thanas*	*Remarks*
Pitalganj	N. Sagurdea dependent on Pargana Makimabad E. Tappe Maheswardi to River Megna S. N. bank of River Berajul and Ichhamati W. Pubail	Raipura Kapasia Rupganj Narayanganj	The Berajul River appears to correspond with the lower course of the River Buriganga.
Dhamrai	N. N. boundary of pargana Talepabad S. N. bank of River Dhaleswari E. W. of Pubail W. W. bank of River Gazekhali	Sabhar Karaniganj (excluding the Paschimdi area)	

Thaua	*Boundaries*	*Present thaua*	*Remarks.*
Haziganj	N. S. bank of River Dhaleswari	Manikganj	Nurullaganga is the Padma,
	and Budri S. of Khalsi	Sealo	
		Harirampur	Ghaukepur, I cannot identify
	S. Nurullagang	Nawabganj and	
	E. E bank of Nulla Churain	parts of Thanas Goalundo and	
	W. Ghankipur	Faridpur now in Dt. Faridpur.	
Mohanganj	N. River Buriganga	Srinagar	
	S. River Rathkhola or Kirtinassa	Munsiganj	
		Paschimdi	
	E. Serajabad	portion of	
	W. E. of Nulla Churain	Keraniganj	

At the time of the creation of the above thanas, the 5 thanas of Dacca city were increased to 31 in number. In 1807 a new thana was created out of the southern portion of Petalganj with headquarters at Narayanganj corresponding approximately with the present Narayanganj Thana, and in the following year a new thana was created out of Haziganj and located at Jaffierganj on the River Jamuna. By the year 1813-1814 considerable changes had taken place in the thana jurisdiction, as may be seen from the following statement :—

Original Thana	*Thanas in 1813-14*	*Modern Thanas.*
Pitalganj	Ekdalla	Kapasia and Rupganj W. of Lakhiya
	Narayanganj	Narayanganj
	Jessore	Raipura and Rupganj E. of River Lakhaya
Dhamrai	Sabhar	Sabhar, Keraniganj (excluding Paschimdi), and a small portion of Manikganj
Haziganj	Haziganj	Harirampur and part of Faridpur, Manikganj (excluding a small portion)
	Manikganj	
	Jaffierganj	Sealo
	Nawabganj	Nawabganj

Original Thana	*Thana in* 1813-14	*Modern Thanas.*
	Solaghar	Sreenagar and Paschimdi
Mohanganj		area of Keraniganj
	Rajabari	Munsiganj

The thanas in Bakarganj, Thana Burrir Hat in Dacca City and Thana Sibchar in Dacca Jalalpur, as then existing, are excluded from the above statement as not falling in the present Dacca District. In Daaca City itself the changes had been greater; the 31 thanas of 1793 were reduced to 15, of which one at Tejgaon, immediately north of the city proper, is subsequently classed as a mafassal thana, covering the whole of the modern Keraniganj thana, with the exception of Paschimdi. The remaining 14 city thanas were Alamganj Bhiti Ajebpur, Nawabpur, Naraindia, Fulbaria, Sujatpur, Khara Nikas, Dhakeswari, Sultanganj, Maneswar, Amligola, Gerd Kella Purub Darwaza, and Islampur. In 1819 the headquarters of Ekdalla Thana were moved to Jamalpur, on account of the decaying state of Ekdalla, due to the change in the course of the River Lakhya, and about the year 1820, the thana at Tezgaon was moved to Pubail owing to the sale of the Company's property at Tezgaon. By the year 1836, thana jurisdiction had resolved itself as follows:

Thana jurisdiction 1819-1844.

Thanas of 1813-14	*Thanas of* 1836	*Modern Thanas*
Ekdalla	Kapassia Rupganj (part of)	Kapassia Rupganj (part of)
Narayanganj	Narayanganj	Narayanganj
Jessore	Raipura Rupganj (part of)	Raipura Rupganj (part of)
Sabhar	Sabhar	Sabhar (part of Mainkganj)
Hajiganj	Hajiganj	Harirampur
Manikganj	Manikganj	Manikganj (excluding a small portion)
Jaffierganj	Jaffierganj	Sealo
Nawabganj	Nawabganj	Nawabganj
Solagar	Sreenagar Paschimdi	Sreenagar Keraniganj (part)
Rajabari	Rajabari	Munsiganj
Tejgaw	Tejgaw (Pubail)	Keraniganj (part)

It is interesting to note that by 1838, no fewer than 10 outposts had been established in addition to the above thanas. By 1836 the thanas of Dacca City had been reduced from 14 to 10 (excluding Tejgaw), Sarafatganj being substituted for Alamganj and Bhiti Ajebpur, Maneswar, Khara Nikas and Fulbaria being abolished. In 1838 proposals were made for revising the jurisdiction of the city thanas; by the orders of Government of January 8th 1839 the city was redistributed into 3 thanas only, Lalbag on the West, Sadar or Kotwali in the centre, and Faridabad in the east. The Sadar station included a large part of Tejgaw thana, the city being bounded by the River Buriganga, River Torag, Tangi Khal, Balu River and Dholai Khal.

Thana Jurisdiction 1845-1869.

In 1845 the district was divided for administrative purposes into sub-divisions, those of Sadar, Manikganj and Munsiganj comprising the present district; the whole of the present Narayanganj sub-division was included in Sadar. In 1860 the thanas were identical with those of 1836 for the mafassal, with those of 1839 for the city. The headquarters of the Tezgaon thana were now at Tangi, and of the Haziganj thana at Harirampur. Between the years 1865, and 1867, however, several changes occurred. The 3 city thanas and Tangi thana were amalgamated into Thana Sadar. Narayanganj, and Paschimdi were amalgamated into a single thana with headquarters at Narayanganj and transferred from the Sadar to the Munshiganj subdivision.

Thana Jurisdiction 1870-1887.

In 1870, the Narayanganj thana was abolished and a new thana of Keraniganj created, comprising the former Sadar thana, and the whole of Narayanganj thana lying west of the Lakshya and south of the Buriganga; the large island known as Bol Char was transferred to Rajabari Thana, the headquarters being transferred to Munsiganj; the remainder of the old Narayanganj thana was transferred to Thana Rupganj with headquarters at Murapara. In 1871, however, the above changes were considerably modified; a new thana was created at Narayanganj consisting of its former area with the exception of Bol Char and Paschimdi. The Rupganj thana was transferred back to Rupganj, and in place of the Keraniganj thana, a new thana Lalbag was created corresponding to the present Sadar, and Keraniganj thanas. The boundaries of all the thanas of the district were definitely notified by the Boundary Commissioner in 1874.

In 1888 the Lalbag Thana was split up into three, Lalbag, Kotwali comprising the City of Dacca, and Keraniganj the remainder of the former thana of Lalbag. In 1896 the Lalbag thana was abolished and amalgamated with Thana Kotwali or Sadar.

The utility of the thana as a revenue unit in this district can rightly be

The thana as a revenue unit.

criticised. In 1793 the number of mofassal thanas was 4, and city thanas 31. There are now 12 mafassal thanas, and 1 city thana, and the identification of thanas in old documents is a matter of extreme difficulty. The thanas have not only been amalgamated and sub-divided, but have been subject to a process of reshuffling. A large area of the original city thanas now forms part of Thana Keraniganj, while the Paschimdi area of the latter thana has from time to time been included in thanas Narayanganj and Shologhar. The revenue thana has been largely affected by changes in police jurisdiction, and for the sake of continuity and intelligibility of records it is to be hoped that the boundaries now fixed may remain permanently as far as they are not affected by changes in the course of the big rivers—changes which are inevitable so long as the rivers are maintained as the criteria of revenue jurisdiction. Considering that the extreme confusion and interlacing of the parganas and tappas of the district makes such divisions totally unworkable for revenue purposes, the revenue thana is the only unit which is now available for revenue administration. At the same time much confusion does and must occur owing to discrepancies between revenue and police thanas, but where the revenue thana is too extensive for practical police administration, the boundary of the revenue thana should invariably be maintained as the external boundary of the constituent police thanas.

F. D. ASCOLI.

THE ARCTIC HOME IN THE RIG-VEDA: AN UNTENABLE POSITION.

III

Now, though it is quite clear, from what has already been stated that the Punjab and its neighbourhood formed the primitive home of the early Aryan settlers in India, and that it was here that the Rig-Veda took its shape, there is one great difficulty against this theory. The Punjab dawns are no doubt, gorgeous and beautiful. But the natural features and the climatic conditions of the Punjab of the present day do hardly correspond to those mentioned in the Rig-Veda. The periodic monsoons, with their heavy showers and terrific storms, and the grand displays of elemental strifes so frequently referred to in the Rig-Veda are conspicuous by their absence in the Punjab as we know it. But this difficulty is not, after all, a very formidable one, though apparently it appears to be so. It is quite evident that the Punjab of to-day is not what it was thousands of years ago. Many of its old large rivers have, as is

evident from the presence of the traces of very ancient river-beds among the sands in the neighbourhood of the Punjab, long ceased to exist and been swallowed up in the deserts; and with these changes in topography, the climatic conditions of the country must have also undergone a great change. When these rivers were in existence the climatic conditions of the country must have been quite different from what they are now, and that they were then, in all probability exactly the same as those found in the Rig-Veda.

In view of the existing climatic difficulties, Prof. Hopkins is, however, of opinion that the hymns offered to Varuna and Ushas, believed to be the oldest of the Vedic hymns, were alone composed in the Punjab, and that the rest of the hymns must have been composed in the neighbourhood of the sacred river Saraswati south of Ambala, where alone the climatic conditions closely resemble, even now, those mentioned in the Rig-Veda. Dr. Macdonell has also accepted this view. But if the climatic conditions and the natural features of the tract of land to the south of Ambala do, even now, correspond to those of the Rig-Vedic times, it is quite probable that when the rivers of eastern Afganistan as well as the Saraswati, the Drisadvati, and the Apaya were in the zenith of their glory, similar conditions prevailed throughout the Punjab and its entire neighbourhood. Thus the climatic difficulties referred to above, are more apparent than real; and there is absolutely no reason to think that only the hymns offered to Varuna and the Dawns were composed in the Punjab, and that the rest of the hymns were composed elsewhere. Besides, the view that the hymns offered to Varuna and the Dawn are among the oldest of the Vedic hymns is open to serious psychological difficulties. In the Rig-Veda, Varuna, the all embracing sky above, has been conceived and represented as the Lord and creator of the universe "the great upholder of the Physical and moral order." He is the king of all exsistences (VII, 8, 7, 6), and supports the entire universe (VIII, 41, 3), and pervades all directions (VIII, 41, 7). He has given strength to the horses, milk to the cows) and resolution in the hearts of men (V. 85, 2). He absolves men from their sins, and is the preserver of all sacred resolutions. New conceptions like these are extremely complex and abstract in their character. And hence it is difficult to treat the hymns offered to Varuna as amongst the earliest of the Vedic hymns. We must, accordingly conclude that when the various systems of rivers mentioned in the Rig-Veda were in existence, the climatic conditions of the Panjab were quite different from what they are now, and that they then exactly resembled the conditions mentioned in the Rig-Veda, and found even now, as Mr. Hopkins himself admits, in the neighbourhood of modern

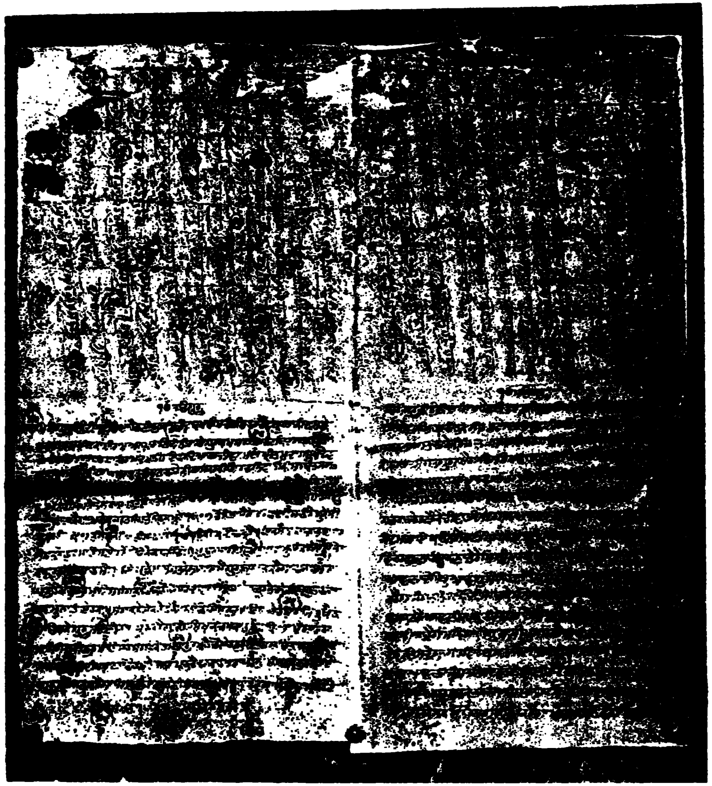

V. III.

Two letters of Guru Gobind Singh.

written in 1701 A. D. written about 1693 A. D.

II.

A letter of Guru Gobind Singh

written in 1691 A. D.

IV.

A letter of Guru Gobind Singh

written about 1694 A. D.

To illustrate Sirdar Gur Baksh's article on 'Sikh relics in Eastern Bengal.'

Ambala. Thus the so-called climatic difficulties are more apparent than real; and we are irresistibly led to the conclusion that Eastern Afganistan, the Punjab and the tract of land south of modern Ambala formed the earliest Home of the Aryans in India.

But it is admitted on all hands that the early Aryans came and settled in the Punjab and its neighbourhood from without. In the Rig-veda itself, we come across what appear to be traces of early migrations of the Aryans, in hordes, into the country, in search of fertile lands for habitation. The Rig-Veda contains some hymns addressed to Pusha. Pusha is, according to Yaska, the Sun, conceived as the Protector of things সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপা-য়িতা আদিত্যঃ (sarvesan bhutanam gopa-yita adityah).

"Roth also regards Pusa to be a solar deity" in character. According to Professor Maxmuller, Pusa is "the Sun as viewed by the shepherd" In some of the hymns Pusa has been represented as the Guide and Protector of the travellers. In some of the Vedic hymns again, he has been conceived as the Protector and Guide of the shepherd, as well as of the cattle, and has, accordingly, been represented as 'seated on a goat," "অজাশ্ব." (Ajashvah) or "ছাগ বাহনঃ" (Chhaga Vahanah). Thus stripped of all figures, Pusa, in the Rig-Veda, sems to mean the Rising Sun. The Rising Sun is both the Guide and Protector of the travellers as well as of the shepherd. In some of the hymns, Pusa has been invoked as 'the Son of the Cloud.' Why the Rising Sun was represented as the 'Son of the cloud,' it is not very difficult to see. The effect of the night on the sun resembles greatly that of the cloud upon it. The sun, moreover, appears, on its rising, actually to come out of the womb of the mother Night, as it were. And hence evidently is the origin of the conception. We quote below some extracts from one of the hymns (1,48) offered to Pusa which appear to be of great historical significance. In this hymn we find Rishi Kanva Ghoura invoking Pusa, the Rising Sun, for safe guidance and protection on a journey for pleasant and fertile tracts of land, through unknown dangers, across unknown regions. The extracts are as follows and will speak for themselves:—

1. "সং পূষন্ অধ্বনঃ তির বি অংহঃ বিমুচঃ
নপাৎ ।
সক্ষ্বা দেব প্র নঃ পুরঃ ॥

[Sam Pushan adhvanah and tira vi
Vimuchah napat ।
Sakshva Deva pra nah purah ॥] 1,42,1.

'O Pushan, help us to reach our destination, and remove all dangers from the way. O son of the Cloud, do thou march before us.'

2. "অভি সুজবসং নয় ন নবজ্বারঃ অধ্বনে ।
পূষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ ॥"

[Abhi sujavasam naya no navajvarah
adhvane ।
Pushan iha kratum viduh ॥] 1,42,8.

'O Pushan, lead us to a fertile tract

of land, covered with green grass and trees. Let there be no new dangers (or tróubles) in the way. Thou knowest the means of our protection on this journey.'

3. "যঃ নঃ পূষন্ অঘঃ বৃকঃ দুঃশেবঃ
আদিদেশতি ।
অপ স্ম তৎ পথঃ জহি ॥"

[Yah nah Pushan aghah vrikah duh-
shevah adideshati ।
Apa sma tat pathah jahi ॥] 1,42,2.

'O Pushan, remove the wrong-doer from our path, who strikes and plunders and seeks to force us to take the wrong path (the path pointed out by him).'

4. "অতি নঃ সশ্চতঃ নয় সুগা নঃ সুপথা কৃনু ।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥"

[Ati nah sashchetah naya suga nah
supatha krinu ।
Pushan iha kratum vidah ॥ 1,42,7.

"Remove from us those coming to intercept us on the way. Lead us by easy and pleasant paths. O Pushan, thou knowest the means of our protection on this journey.

These evidently seem to refer to an early Aryan migration in search of fertile lands. Here is another significant extract from another hymn, wherein Indra and Brihaspati have been invoked for guidance and protection, on a journey, in search of cows, through unknown lands :—

"অগব্যূতিঃ ক্ষেত্রম্ আগন্ম দেবাঃ উর্বী সতী
ভূমিঃ অংহুরণা অভূৎ ।
বৃহস্পতে প্রচিকিৎস গবিষ্টৌ জরিত্রে ইন্দ্রপন্থাম্ ॥

[Agavyutih kshetram aganma devah
urvi sati bhumih amhurana abhut ।
Vrihaspate pra chikitsa govistou
jaritre Indra-pantham ॥ VI. 47,20.

'O gods, we have come to a tract of land where cows do not graze. The extensive region gives shelter to Dasyus alone. O Brihaspati, give us instructions in our search for cows. O Indra, show the way to thy worshippers.'

It appears from the above Rik, that a band of the Aryans, having been out in search of wild cows for purposes of domestication (or lost cows), accidentally came on a tract of land where cows did not graze and which gave shelter to Dasyus alone. They accordingly prayed to Brihaspati and Indra for protection and safe guidance. The expression, "অগব্যূতিঃ ক্ষেত্রম্" (Agavyutih kshmetram) 'a tract of land where cows do not graze,' probably stands for a desert or a marshy land; and it is not unlikely that it refers to a tract of land through which the Aryans had to pass on their way to their new settlement in the Punjab and its neighbourhood.

But though it is universally agreed that the Aryans came and settled in India from without, yet very little is definitely known about their original home. The language of the Rig-Vedas closely resembles the Avastan, the Greek, and the Slavonic languages. There is also some affinity between the Vedic language and the Indo-Germanic tongues spoken by many of the modern nations of Europe. The social and religious traditions of the Hindus also seem to have much in common

with those of Persia and ancient Europe. There is, besides, a close affinity in physical features and the size of the skull between some sects of the Hindus and the Persians as well as many of the modern nations of Europe. And from these affinities, it has naturally been inferred that the ancestors of these various peoples must have, in some very remote past, lived together as members of one united and undivided family of men, inspired by the same hopes and aspirations, and knit together by the ties of one common language, one common blood, and one common culture. But as to the Original home of the united Aryans, the thinkers are widely divided in their opinions. The old "Central Asia" theory has, of late, been greatly discounted; and various considerations have led some scholars to shift the site of the primitive home of the Aryans from the plains of Central Asia to Northern Germany or still further to Scandinavia. Recent Geological reserches have, however, proved that, during the Inter-Glacial period, the distribution of land and water about the North Pole was quite different from what it is now and that, in those early times, there existed a circumpolar continent, with Nova Zembla, Spitzbergen and the other existing islands of the Arctic Sea as its parts, and that, until the advent of the last Glacial epoch, these regions enjoyed a temperate climate, and were inhabited by men. These and various other considerations have led Professor Rhys to maintain that the undivided Aryans originally lived, in all probability, in some tract of land within the Arctic Circle "somewhere to the North of Finland and the neighbourhood of the White Sea." Mr. Bal Gangadhar Tilak has, in his "Arctic Home in the Rig-Veda", likewise, sought to establish that the undivided Aryans lived somewhere "within a few degrees of the North Pole", where alone "a day or a night of six months and a long continuous dawn of several days' duration with its revolving splendours," known, in his opinion, to the Vedic Rishis through traditions, could have been possible. Mr. Tilak is, however, of opinion that the traditions of the original Polar Home have been "better preserved in the sacred books of the Brahmins and the Parsis" than in those of the west; and he has, accordingly, concluded that it is not unlikely that the primitive home of the Aryans was "located to the North of Siberia rather than to the north of Russia or Scandinavia". The theory of the Arctic Home of the Aryans is however, widely regarded now as scientifically untenable. But be it what it may, Mr. Tilak's position that there are clear and unmistakeable references to Arctic phenomena in the Rig-Veda is not at all tenable. In what follows we shall carefully discuss and examine Mr. Tilak's views, and shall endeavour to prove conclusively that there are no traces of "a long day or a night of six

months and a continuous dawn of several days' duration" or of any other Arctic phenomena in the Rig-Veda, and that therefore there is absolutely nothing in the Rig-Veda to show that the prehistoric ancestors of the Vedic Rishis ever lived in or about the Arctic Pole.

THE SUPPOSED TRACES OF THE LONG ARCTIC NIGHT.

In the first place, we shall consider if the Rig-Veda really contains any traces of a long Polar night. Under this head Mr. Tilak has mainly relied on the following expressions in support of his position.

1. "তমসঃ অন্তাঃ". (Tamasah antah) VII, 67, 2.

"The ends of darkness"

2. উরু অশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতিঃ মা নঃ দীর্ঘাঃ অভিনশন্ তমিস্রাঃ। (Uru ashyam jyotih ma nah dirghah abhinashan tamisrah). 11-27-14.

May I reach the broad fearless light; may not long darkness overtake us.'

3. "ঊর্ম্যে নঃ সুতরা ভব ॥" . X,-127-6, (Urmye nah sutara bhava).

'O Night, be auspicious unto us."

"The expression, 'ends of darkness' ("Tamasah antah"), says Mr. Tilak, "is very peculiar, and it would be a violation of idiom to take this and other expressions indicating long darkness to mean nothing more than long winter nights, as we have them in the temperate or the tropical zone. ......The anxiety manifested", in the above-mentioned passages, "for the disappearance of the long darkness is unmeaning, if the darkness never lasted for more than twenty-four hours". the maximum duration of the longest winter nights in those regions (Vide. The Arctic Home in the Rig-Veda, p. 126). "If the night was not" adds Mr. Tilak,......"unusally long where was the necessity for entertaining any misgivings about the coming dawn?......It was not the long winter nights that the Vedic bards were afraid of. ......It was something else, something very long, so long that though you knew it would not last permanently, yet, by its very length it tired your patience, and made you long for, eagerly long for, the coming dawn. In short, it was the long night of the Arctic region......which the Vedic bards knew by tradition. (Vide. The Arctic Home in the Rig-Veda, p. 129-131).

Now, let us see if the passages cited by Mr. Tilak do really support his position. Of the above-mentioned three expressions, two, as we shall see presently, have nothing to do with any fears whatever arising from the darkness of the night. And although the third shows that the Vedic Rishis were really afraid of the darkness of the night, yet Mr. Tilak's inference about the cause of the same is entirely fictitious and unhistorical. The first of the said Riks, when fully stated runs

অশোচি অগ্নিঃ সমিধানঃ অস্মে উপোদৃশন্
তমসঃ চিৎঅন্তাঃ।
অচেতি কেতুঃ উষসঃ পুরস্তাৎ ॥

[Ashochi agnih samidhanah asme upodrishan tamasah chid antah.

Achati ketuh ushasah purastat.]

VII, 67, 2.

" Sacrificial fire has been kindled by us. Verily the ends of darkness are seen, and the banner of the Dawn is visible in the east."

Now, Rishi Vasistha is the author of the Rik under noticed ; and the Rik contains invocation to the twin gods, Aswins, to come and accept the offerings prepared for them. The twin brothers are the symbolical representations of the twilight aud of the early dawn ; and they have to be worshipped in the very early hours of the day, before the expiry of the darkness of the night, and the......appearance of the day. In the Rik in question, we accordingly, find Vasishta, one morning, shortly before the day-break to have thus invoked the twin gods, with sacrificial fire kindled before him :—

"The ends of darkness are seen, and the banner of the Dawn is visible in the east. And we are......awaiting you two, O Aswins, with the sacrificial fire kindled before us."

Evidently, therefore, there is absolutely no reference here to any fears whatever arising from the darkness of the night, or anything of the sort. Moreover, the expression, " তমসঃ অন্তঃ," (Tamasah antah) 'the ends of darkness,' here clearly refers to the darkness of the night which was then about to dawn, at the end of which Vasishta was actually engaged in offering sacrifices to the Aswins, with sacrificial fire kindled before him. Evedently therefore the..... phenomenon described here is purely Indian in character. But yet Mr. Tilak has, most solemnly told us that " the expression, 'ends of darkness,' ("Tamasha antah") is very peculiar," and that " it would be a violation of idiom " to take it to mean nothing more then the darkness of the night " in the temperate or the tropical zone."

N. K. DUTT.

PITFALLS IN JUVENILE EDUCATION.

Herbert Spencer, that epoch-making philosopher of the nineteenth century, in his famous book on Education, translated into sixteen languages, rightly deplores that " while for the purposes of gaining a livelihood an elaborate preparation is needed, not an hour is spent for the gravest of all responsibilities—the management of a family." While speaking thus of the state of things in England two score of years ago, the prophetic seer perhaps knew that his remarks would apply very literally to the present state of things in India. In by-gone times discipline in the family, whether Hindu or Mussalman,

was proverbial. The parent or teacher was almost worshipped. But in the cyclic order of events India seems to have receded to a backward state, so far as the discipline of young men,—turned out by Universities is concerned The extent to which this discipline prevailed almost excited the ridicule of foreigners, and implicit obedience to order was almost regarded as base subservience. In the Hindu joint family the *Karta* played the role of a practical demigod The *guru* at the *tol* or *patshala* was treated as if he was an incarnation of God. The Ustadji at the *maktab* was looked upon as an equally extraordinary being. Any transgression of the order oi the *guru* or *karta* was considered sinful. The old system of training, both within the family under the sway of the master of the house, and outside it under the ferule of the pedagogue, though somewhat calculated to curb the growth of independent thought and action, is, however, eminently suited to the conditions of India.

The Western system of education, with all its blessings, has brought on a state of things, which is responsible for much of the disorder that has grown rampant in the country in the shape of dacoity and crimes by youngmen belonging to classes that have drunk more deeply than others at the fountain of modern education. The master of the house as much as the teacher at school deplores that no longer he is obeyed by his wards. The disinterested man in the street also shakes his head in regret to find that the boys of to-day have lost all respect for age and authority. Even fifteen years ago, the manners of boys were not half so uncouth as as they appear to-day, much to the alarm of all peace-loving population. Things must glide from bad to worse unless precaution is taken betimes.

An analysis of the present condition of things would show that the critical stage in the life of a boy begins before he is sixteen, that is, before he enters upon the higher stage of College education. The authorities have so far shown extreme solicitude for the welfare of a boy, by providing for the proper supervision of his character and conduct after he has finished his secondary education and entered upon the College course. Suitable boarding houses under the management of able and highly paid professors or Superintendents are provided in plenty. But it has hardly occurred to any body's mind that the mischief begins long before a boy enters the precincts of a College. No doubt, the School authorities are always anxious that undesirable teachers do not get into their institutions, and the teachers appointed impart the right sort of education. But how long does a boy remain in charge of a teacher in twentyfour hours? And in a class consisting of a number of boys how much of the teachers' attention can each individual boy expect to get?

Ordinarily, a boy is required to stay in school five hours in the day, except during Sundays and holidays, which amount to good five months in the year, when of course, he is practically master of himself. Taking, the average size of a class to be thirty, each individual boy cannot expect to get more than ten minutes' of the teacher's attention towards him. It is well-known that the same teacher does not stay in the same class all the five hours. Ordinarily, the class hours would be divided among five different teachers. From this point of view, each individual boy cannot expect to secure more than two minutes' attention from each individual teacher. A good teacher, can of course, secure the whole of the boys' attention towards himself, and thereby keep him out of harm's way, but such teachers are not plentiful. While a school boy's character and conduct cannot properly be looked after during the limited school hours, it is necessary that some body should watch and guide him during other hours. In the existing state of things, arrangements for such supervision cannot be made in all cases. Owing to economic causes there has been a rise in the private tutor's demand for pay, as much as in everything else. While a middle class gentleman conld get a private tutor for his boy on Rs. 5/- a month fifteen years ago, he cannot get one on less than Rs 15/-, now-a-days. But although there has been a rise in the price of every thing there has not been a corresponding increase in the income of the middle class gentleman. Formerly, it was a custom in all respectable middle class families to keep a number of senior boys in their house and provide them with food, in consideration of their keeping good company with the boys of those families. But economic grounds have rendered such arrangements impossible. The only alternative left is for the guardian himself to look after his ward. But work in all departments of Indian life has so much increased, and people are now-a-days kept so busy in the sordid struggle for existence, that a man can hardly devote any attention to this ward. As long as female education does not make good progress, and the ladies do not get educated, they cannot be expected to look after the children properly. The result is that the boy grows according to his own sweet will and pleasure and derives inspiration from such ideals as appeal to his juvenile fancy. He reads any book he likes and listens to the idle talk of idealistic dreamers.

While I would not curtail arrangements for the provision of suitable residential institutions for young men entering upon University education, I would at the same time insist on the establishment, on a much larger scale, of similar institutions for boys attending secondary schools, so that they may live with their teachers day and night, and derive inspiration for all that is good on this fair earth below. Here,

a boy would live with his teacher in the same way as one of his class used to do in the *tol* or *maktab* in the days of yore. A large number of residential institutions built on the modern European plan will no doubt, entail a very heavy expenditure. But as long as the economic condition of the middle class does not improve, it is useless to set up such a high standard of architecture before them, while it is known that after spending a number of years under the roof of a magnificient building equipped with electric light and fan, a young man of his class will go out into the world to earn in many cases, much less than what his guardians had spent for his education at college. Discontent naturally dogs his footsteps and he curses the fate which ordained his education under these circumstances. He belies the expectations of his parents who demand ample compensation for the money invested in his education. Growing desperate he recklessly goes to please his relations as well as himself, and takes to undesirable forms of activity. The best policy to adopt in education is that of "plain living and high thinking." Modest buildings constructed on strictly sanitary principles devoid of luxuries and the glare of modern civilization which a middle class boy cannot ordinarily be expected to provide for in practical life, would be most suitable. A boy, whose people have spent their whole life in a *kutcha* house, need not be habituated to live in a *pucca* building.

The want of religious education is also responsible for much of the evil which prevails among young men. It, is I believe, compulsory in every public school in England to attend the Bible class. In some of the mission schools in India also the attendance at the Bible class is enforced. But, alas ! no arrangement is made in any other schools for religious and moral training. It is a truism that education without a strong ground-work of religious training cannot have much moral force. It is necessary, therefore, that there should be some one at the very outset to instil such ideas. The introduction of religious and moral training in all institutions is a desideratum of the highest moment. Arrangements may similarly be made in all residential institutions for religious training based on the respective faiths of the boarders, and the selection of books to be read may be carefully made by Pandits and Maulanas.

Since the introduction of the kindergarten system in our Indian schools in 1901, during the regime of Sir Alexander Pedler, text,-books have contributed not a little towards the growth of a materialistic tendency among the juvenile community. As opposed to a previous system, though, of course, in keeping with the predilections of a scientific age, the senses are more appealed to now-a-days than the heart or the mind. Formerly, text-books opened with descriptions of the goodness of God or the King,

but now-a-days, one will find the first lesson of a school book treating on the virtues of a fruit or an animal. The modern system is more scientific, no doubt. But in the absence of a programme of religious education, which is conspicuously absent in India, it cannot but generate those sentiments which every right-thinking man condemns and has caused so much alarm to the community.

A proper system of secondary education, supplemented by a number of residential institutions to carry out that system, in which necessary arrangement for suitable religious education may be made, appears to me to be just the remedy for much of the evil which permeates the juvenile middle class community at the present time. Remedy should be applied as soon as the disease begins, but better still, if the disease can be prevented. The elaborate arrangement made now-a-days to supervise a student's career after he has entered the University College and not before, appears to me, to quote a Bengali proverb, "like watering the top of a tree after its root has been cut out."

Syed Abdul Latif.

LANGUAGE AND LITERATURE.

APPENDICES.

Appendix I:

(a) English Books prescribed for classes III to VIII of High Schools.

(b) Works "recommended to indicate the standard of knowledge to be demanded of candidates at the Matriculation Examination of 1915."

(c) Extract from paper of a First Year student, written six months after matriculating in the 1st division.

Appendix II:

(a) Books prescribed for Intermediate Examination 1915.

(b) Extracts from paper of a Third Year student written six months after passing the Intermediate Examination (2nd division).

Appendix III:

(a) Books prescribed for B. A. Examination, 1915.

(b) Extract from a paper submitted in this Exmination by a candidate who passed.

(c) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who failed.

Appendix IV:

(a) Course prescribed for the M. A. Examination 1915.

(b) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who passed (3rd division)

(c) Extract from a paper submitted in this examintion by a candidate who failed.

APPENDIX I :

(a) English Books prescribed for Classes III to VIII of High Schools :—

English. Class III. Longman's English Course for Indian schools, First Reading Book.

English. Class IV. Longmans' English Course for Indian Schools, Second Reading Book.

English. Class V. 'Longmans' English Course for Indian Schools. Third Reading Book.

English. Class VI. Longman's English Course for Indian Schools, Fourth Reading Book.

English. Class VII. Longmans' English Course for Indian Schools, Fifth Reading Book.

English. Class VIII. (i) Palgrave's "Children's Teasury," Part II.

(ii) "Robinson Crusoe," or the Heroes" or Andersen's "Fairy Tales."

Grammar. Class VI. "A Introductory English Grammar," by Rowe and Webb.

Grammar. Class VII and VIII. "An Elementary English Grammar," by Rowe and Webb.

(b) Works "recommended to indicate the standard of knowledge to be demanded of candidates at the Matriculation Examination of 1915.

MATRICULATION EXAMINATION.

1915.

ENGLISH.

The following works are recommended to indicate the standard of knowledge to be demanded of candidates at the Matriculation Examination in 1915 :—

Prose.

Lal Bihari De Folk Tales of Bengal

H. L. Havell ... Stories from the Odyssey (C. Harrap.)

Scott ... Readings from the Waverly Novels Vols. I and II (published Messrs. Sarkar & Co.)

Kingsley ... Heroes.

Defoe ... Robinson Crusoe.

G. Kupfer ... Legends of Greece and Rome (G. Harrap.)

Arabian Nights, edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co.)

Animal Story Book, edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co.)

Washington Irving ... Rip Van Winkle ; Legend of the Sleepy Hollow.

Grimm ... Popular Stories.

Lamb's Tales from Shakespeare.

Hunter ... Readings from Indian History, Part III.

Gould ... Youth's Noble Path.

Poetry.

Lahiri's Select Poems, Revised edition, Published by the Calcutta University.

Macaulay ... Lays of Ancient Rome.

Jennings ... English Poems, Part I (Macmillian).

Palgrave ... Children's Treasury, Part I (Macmillan).

(c) Extract from paper of a First Year Student, written six months after matriculating in the 1st division.

Milton at first wrote a book named the "Doctrine and discipline of divorce restored" and that was followed by three other books; Tetrachordon was one of them. In this pamplet he expounded four passages from the scripture which dealt with the matrimonial matters.

He tries to give them highest thought of liberty in the matter of divorce and induced the them to give up the restrictions that were imposed upon divorce by the acclisiastical church and to follow the bible in the matter of divorce. This book was written in a very learned manner, its subject matter was intricate and obstruse. It was circulated for a while in English and afterwards little care was taken of that book Some of the stall readers sneered at the very name or the book on account of their inability in spelling out the title of the pamplet. They did not like to follow the views of Milton in the matter of divorce. So they protested against his views most vigorously.

Milton then said in his anger and remorse that he had given highest and sublime thought before some fools who might be compared to the most awkward of the beasts as Pigs, dogs, asses, etc.

Again he said—"These fools when cry for liberty they mean that liberty is examption from all moral obligation. They can not claim to liberty is, are wise and learned but they are not so. After so much bloodshed and so much west of money in the Civil war they have not yet understood what real liberty is?

APPENDIX II.

(a) Books prescribed for Intermediate Examination 1915.

ENGLISH

Poetry.

Tennyson ... Selections from, edited by Rowe and Webb.

Gray ... Elegy.

Milton ... L'Allegro; Il Penseroso.

Cowper ... Task, Book I.

Prose.

Macaulay ... Essay on Addison.

Grant ... Xenophon.

Swift ... Gulliver's Travels (Blackie and Son)

Addison ... Coverley Papers (Frowde).

A paper will be set on Essay, Prosody and Rhetoric and some questions will be set on unseen passages from works of the same standard of difficulty as those prescribed for the Matriculation Examination.

(b) Extracts from paper of a Third Year Student written six months after passing the Intermediate Examination (2nd division).

(i) Dagon was represented as half fish and half man. He was worshipped by the Egyptians. A war broke out between Egyptians and Israelities.

The Egyptians won the battle. They captured the ark which was given by God to the Israelities, and brought it to their home. They set it by the side of Dragon. Next day they found that Dragon was fallen at the feat of the ark. They set it up again but at the next day they again found that the hands and feets of Dagon were cut off and he was fallen at the feet of the ark.

(ii) The Hell was situated in the depth of chaos. The distance of the Hell from the heaven was nine times with that of the earth from the Pole of the universe. It was like a huge furnase. It flamed always but there was not any light. It was place of darkness. It was not absolutely dark. It had enough light to show the horrible sights of the hell. There was no peace of mind or rest of body. It always tormented the dwellers. There was lake of fire in it. The bank of the lake of was a country of solid fire.

APPENDIX III.

(a) Books prescribed for the B. A. examination 1915.

B. A. Examination, 1915.

ENGLISH.

Pass course.

Shakespeare...A Midsummer Night's Dream. Julius Caesar.

Milton...Paradise lost, books X, XI and XII.

Byron...Childe Harold, Cantos I and II.

Cowper...Letters (Golden Treasury Edition).

Plutarch...Alexander and Caesar (translated by Stewart and Long).

George Eliot...Sillas Marner.

Honours Course.

(In addition to the books prescribed for the pass Course).

Shakespeare...Cymbeline.

Marlowe...Edward II.

Shelley...Adonais.

Wordsworth ... Selections from, by Mathew Arnold (Golden Treasury Series).

Mathew Arnold...Essays in Criticism, Second Series.

Burke...Speeches on American Taxation and Conciliation with the Colonies (Burke's selected works, edited by Payne, Vol. I).

The following books are recommended for the study of the philology of the English Language and the History of English Literature :—

Lounsbury...History of the English Language.

Latham...Handbook of the English Language.

Thomson...Students' English Literature, founded upon the Manual of Thomas B. Shaw.

Saintsbury...Short History of English Literature.

The following books are prescribed for candidates who take up the alternative paper in English :—

Carlyle...Past and present.

Pater...Appreciations.

(b) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who passed.

It is customery with the Englishmen of the present time to regard that time of England as the golden age of the past which in comparison with the modern time is regarded as an age of poverty and want of civilization. At that time both the low class and the high class of people were, as compared with the present time, poorly fed and clothed. Plagues and pestilence were more common then than these are at present. People died in greater number both in and outside the town than at present. The present death rate among the emigrants is comparatively lower than that in ancient town.

Future generation of men will think that they have progressed than ourselves and will envy our position considering that we are hapier than they would be.

(c) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who failed.

Fearing immediate death from his master who became injured for some reason, a man named Andocles fled to desert in order to save his life. The man was in hurry to flee from his master. Therefore he became tired on account of the haste, and the heat of the sun. Scarcely had he enterred a cool retreat when a huge lion came there roaring terribly. The man was very much terrified on hearing the lion roar so he tried to conceal himself from the clutch of the lion. The lion came to him with his lifted paw. And by his posture it was clear that the lion was imploring help from him. At first he trembled with fear but at length he took courage. He coming to the lion found that the lion was asking his aid in getting out the thorn from his paw. The man lifted the thorn and wiped the blood which came out from the sore. Then the lion felt relieved from the pain. The man thought that such a solitary life is more dreadful than to be revenged by his injured lord; so he determined to return to his native land prefering the punishment from his lord to his solitary life. Death was preferable to him; he goes to his native land to suffer derth where no one will feel sympathy for him. At length the lion who was cured by him came out from his cage to devour him. But the lion paused and fell at his feet when he came to know that this was very man who save his life is getting out the pointed thorn from his paw.

APPENDIX IV.

(a) Course prescribed for the M. A. Examination 1915.

M. A. EXAMINATION.

ENGLISH, 1915.

Common Papers For Group A. and B.

Paper I.—General History of English Literature.

No text-books.

Paper II.—Shakespeare and post-Elizabethan Drama.

Shakespeare ... Hamlet ; Antony and Cleopatra.

Dryden ... All for Love.

Goldsmith ... She stoops to Conquer.

Swinburne ... Atalanta in Calydon

Paper III.—Poetry.

Spenser ... Faerie Queene, Books I and II.

Palgrave ... Golden Treasury of Songs and Lyrics, Book II.

Milton ... Paradise Regained.

Wordsworth...Sonnets (as in Matthew Arnold's Selections from Wordsworth.)

Tennyson...Idylls of the King (except Gareth and Lynette and Merlin and Vivien).

Paper IV.—Prose.

Bacon ... Essays.

Burke ... Reflections on the French Revolution.

Morley ... Studies in Literature.

Carlyle ... Past and Present.

Group A.

Paper V.—(a) Text-book.

Chaucer and outlines of Historical English Grammar.

Chaucer ... The Prologue ; the Nonnes Prestes Tales ; the Tale of the Man of Lawe ; Legend of Good women (Prologue only) House of Fame.

(b) Books recommended for study.

Morris ... Historical English Accidence.

Kellner ... Historical English Syntax

Paper VI.

Shakespeare and the Elizabethan Drama.

Paper VII.—Selected period of Prose

Chief Prose writings from 1850.

Paper VIII.—Essay or Essays on subjects connected with the course.

No text-books.

Group B.

Paper V.—English Language and Literature prior to 1100 A.D.

Sweet ... Anglo-Saxon Reader, Part I.

Paper VI.—English Language and Literature from 1100 A. D. including Chaucer.

Morris and Skeat ... Specimens of Early English, Parts I. and II.

Skeat ... Specimens of English, Literature.

Paper VII.—Historical English Grammar, including the Elements of Teutonic Philology.

Books Recommended for Stndy.

Morris ... Historical English Accidence.

Kellner ... Historical English Syntax

Skeat ... Principles of English Etymology, 1st and 2nd Series.

Helfenstein ... Comparative Grammar of the Teutonic Languages.

(b) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who passed (3rd division).

These lines (Shakespeare's 44th Sonnet) give vent to the bitter pangs of a man who yearns for being united with his beloved one, from whom is separated. Alexander Selkrik he in his life at the island of Juan Fernandez, wished that had he the wings of a dove, he would have flown away to where his near and dear ones were. But this

man rises a step farther in his meditation, and wishes that his whole body were converted into a thought. In that case he could have easily passed over the distance which separates him from his longed one. For the progress of thought is unobstructed everywhere; and nothing in the world is so rapid in its movement as thought. It can reach the farthest limit of the world in no loss of time.

(c) Extract from a paper submitted in this examination by a candidate who failed.

Spenser has a puritanic tendency and so he has attacked the vices and abuses of church and state under his allegorical personages. In the first canto he has made the Holiness to unite with truth under the name of Redcross Knight and . Then the Knight meets the Error and Archimego. Then he left and for a time is united with Duessa. These very names of the characters show the qualities which they possess.

Unless we know what represents or whom Red Cross knight represents we cannot understand the story.

But as I said above it is not like Tennyson's allegory so mystical as we cannot understand the deeper meaning of the story unless we try to go deep into them. Suppose when we read Tennyson's Idylls of the king, we do not care so much for allegory as for the story. We see Arthur before us commanding the round-table and fighting war with enemies, but unless we dig deep we do not find Arthur represent soul or Gunivere the flesh and his knights the different virtues. We see only a king conquering his enemies, ruling his country peacefully, marrying but the wife deserting her. If we find any allegory in the Idylls of the King we find that in the coming and the passing of Arthur and the Holy Crail.

But spenser's poem is not so......

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড। ঢাকা—বৈশাখ, ১৩২৩ ১ম সংখ্যা।

বর্ষ-বোধন।

সে আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে। চৈত্রের শেষ-দিন—গভীর গরজনে সেদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল—মুহুর্মুহু প্রলয় জীমূত-মন্দ্রে, ঘন ঘন বরিষণে বিদায়ের প্রবল অশ্রুধারা ঢালিয়া সে চলিয়া গেল! নিশাবসানে যখন প্রভাত হইল, তখন সেই পুরাতন বন্ধুকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। আর তাহার সন্ধান মিলিল না! কোথায় সে গেল কেহ বলিতে পারিল না।

সে যখন ছিল তখন সে কখনও নিদাঘের প্রখর রবিকিরণে হৃদয়ে তপ্তজ্বালা ঢালিয়া দিয়াছে, কখনও শীতল সলিল ধারায় দেহ মন শীতল করিয়াছে। কখনও বিহগকলকাকলিতকুঞ্জভবনে বাঁশরীর মধুর রাগিণী জীবনে শতসুখ-স্বপ্ন রচনা করিয়াছে। তখন কেবলি ডাকিয়াছি হে চিরসুন্দর! বঁধু! তুমি চিরদিন হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান থাক—তুমি যে আমার অতি প্রাণের নিধি, তুমি যে আমার সব—

'তপ জপ তুঁহু সকলি আমার করের
মোহন বেণু।'

কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে যাহাকে পাইয়াছিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে! সে আর নাই! সে বিস্মৃতির অতল নীরে কোথায় যে তলাইয়া গেল আর ত তাহাকে পাইলাম না! যখন তাহাকে পাইয়াছিলাম, যত দিন সে আমাদের ছিল তত দিন তাহাকে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তখন তাহাকে ত ভালবাসিবার মত করিয়া ভালবাসি নাই। শ্রদ্ধা করিবার মত শ্রদ্ধা করি নাই, শুধু হেলায় খেলায় তাহাকে হারাইয়াছি—আজ তাই অনুতাপদগ্ধ প্রাণ কেবলি কাঁদিয়া বলিতেছে—

'যা কর চরণ নখর-রুচি হেরইতে মুরছয়ে
কত কোটি কাম।
সো মধু পদতলে ধরণী লোটায়ল পালটি না
হেরিণু হাম।

সে বড় ব্যথা পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোটি কোটি নর নারীর শোণিতাশ্রু, কোটি কোটি পতিবিয়োগ-বিধুরা রমণীর তপ্ত শ্বাস তাহার প্রাণে বড় বেদনা দিয়াছিল। সে এমনি দুর্ভাগা যে সে চাহিয়াছিল পৃথিবীর নর-নারীর ব্যথা-যন্ত্রণা হাহাকার যেন লুপ্ত

হয়, কিন্তু সে ত তাহা পারে নাই! পতিপুত্রহারা জননী মনের দারুণ খেদে বলিয়াছে "কেন সে আসিয়াছিল? তাহাকে ত তাহারা চাহে নাই! কত নর-নারী গৃহহীন—পথহারা, আশ্রয়হারা হইয়াছে—রণভেরীর প্রবল নিনাদে জগৎব্যাপী অশান্তির দারুণ প্রলয়-বহ্নিতে দগ্ধ নর-নারী তর্জ্জনি হেলাইয়া তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছে। বিশ্বমানবের পুঞ্জীভূত বর্দ্ধিত অভিশাপ একদিন গগন স্পর্শ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—প্রদীপ্ত বহ্নিতে চিরদিনের জন্য সে লুপ্ত হইল। সে গেল—কিন্তু স্মৃতি রাখিয়া গেল। সে স্মৃতি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। তাহার শ্মশান-বহ্নিতে জগতের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়া রহিল।

* * * *

তাহার সেই চিতাভস্ম হইতে এক নবীন শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব হইল। রজনী তাহার কালো বসনখানি সহসা ফেলিয়া দিয়া লজ্জায় পলাইয়া গেল—সেই দেবতার নব যৌবনশ্রী দেখিয়া ঊষাসুন্দরীর বদন-কমল লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল! বিহগ নবীন গানে নবীন ঝঙ্কারে তাহার অভিনন্দন আগমনী-সঙ্গীত গাহিল। নিখিলের নর-নারী তাহাকে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল। স্তম্ভিত বিশ্ব নবীন উৎসাহে নব উদ্যমে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবপুরুষকে দেখিয়া মিলিতকণ্ঠে গাহিল—

"তোমার বদন অতি সুশোভন মদন মোহিত মানি।
দেখিয়া জুড়ায় সকল পরাণ সফল করিয়া মানি॥"

জগতে চিরদিনই প্রাচীনে ও নবীনে এই বিরোধ। প্রাচীনকে জঞ্জাল মনে করিয়া আমরা দূর করিয়া দিতে চাহি—আর নবীনকে ভালবাসিয়া আদর করিয়া বরণ করিয়া লই। বুঝিতে পারি না নবীন ছলনাময় কপট শঠ—সে শুধু কুহেলি স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে। আমরা নবীন আশায় বুক বাঁধি—পরে দেখিতে পাই সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! যখন পুরাতনের সহিত নূতনের সামঞ্জস্য করিতে যাই—দেনা পাওনা হিসাব করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হিসাবে বড় ভুল হইয়াছে। প্রাচীন যখন যায়—তখন সে আমাদিগকে একবার পশ্চাতে তাকাইবার জন্য করুণকণ্ঠে মিনতির সুরে আহ্বান করে—সে আহ্বানে কর্ণপাত করিতে পারিলেই আমাদের সাফল্য নতুবা সবই বৃথা। সে কি? সে কালসমুদ্রের একটা তরঙ্গ বই ত নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচিত্র লীলারসে যে নৃত্য করিয়াছি তাহা থামিয়া গিয়াছে—সে তরঙ্গে যে শক্তি ছিল কাল তাহা অপহরণ করিয়াছে! মহাপ্রস্থানের পথে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব যেন অগ্নিদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তেমনি প্রতিবর্ষ বিদায় মুহূর্ত্তে আমাদের শক্তিরূপ গাণ্ডীব কাড়িয়া লইয়া বলিতেছে—আর নয়—তোমার প্রয়োজন নাই, এখন তুমি আমাকে দাও। এ শক্তি-ত্যাগ বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই করিতে হয় ও হইবে। রক্ষা নাই—মহাদেবের ভীষণ ত্রিশূল উত্থিত রহিয়াছে—প্রলয় নির্ঘোষে ডমরুর ডিমি ডিমি রব—সংসার চক্রের শতলেলিহান ফণি গর্জ্জিয়া উঠিতেছে তারপর কখন সঞ্জীবনী শক্তি অপহৃত হইয়া চিরদিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিবে কে তাহা বলিতে পারে?

মানুষ কি চায়? এই যে বিশ্বজগতের নরনারী-বিরাম নাই বিশ্রাম নাই—স্রোতোধারার ন্যায় বেগে পৃথিবীর বক্ষে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহারা কি চায়? দেখিবে শুধু একই বাণী ধ্বনিত হইবে—সুখ-শান্তি চাই! অথচ সুখ-শান্তি কি তাহাই আমরা বুঝি না। সুখ ও শান্তির মীমাংসা কে করিবে? পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনে কেহ সুখী—আবার পরের পীড়ন করিয়া কেহ সুখী। কেহ বিলাসিতা পরপীড়ন—পরের নির্য্যাতন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন আবার কেহ বা পৃথিবীর বেদনা—দুঃখ বলিতে যাহা বুঝি তাহা দূর করিবার জন্য আকুল হইয়া পড়েন—আপন পর বলিয়া ভেদ থাকে না। সুখ ও শান্তির তারতম্য নানা দেশে নানা রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রীর সামাজিক অবস্থাও এই সুখ-শান্তির পর্য্যায় ভুক্ত। ভারতবর্ষ চিরকাল অনন্তকে উপলব্ধি করিবার জন্য তপোবনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল আর ইউরোপ

ও আমেরিকার দিকে চাহিয়া দেখ তাহারা মৃত্যুর পর কি আছে কোথায় পরলোক কোথায় ব্রহ্ম সে জন্য কোন চিন্তা না করিয়া জড়জগতের কথা ভাবিতেছেন—বর্ত্তমানকে তাহারা ভাবেন, ভবিষ্যতের চিন্তা তাহারা করেন—কিন্তু পরকাল ধর্ম্ম এসব কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমরাও সহসা জাগিয়া উঠিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হা অন্ন! হা অন্ন রবে কাঁদিতেছি—হাঁটিতে চাই—পড়িয়া যাই—কেবলি অন্ধকার! আশ্রয়-তরুর শীতল ছায়ায় থাকিয়া আমরা নিরাশ্রয় বিশ্বাসহারা হইয়াছি। আমরা কি তাহাই আমরা বুঝি না। বুঝিতে পারি না—হিংসা কেমন করিয়া দূর করিতে হয়, বুঝিতে পারি না—অনুকরণ বিপজ্জনক বুঝিতে পারি না—আমার আপনাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে বিশ্বব্যাপী মিলনের কর্ম্মের যে সঙ্গীত রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে—সে সুরের সহিত আমারও সংযোগ আছে। নীরব সাধক—গভীরভাবে যখন ধ্যান-মগ্ন থাকেন তখন তাঁহার অন্তরমধ্যে ব্রহ্মের বাণী জাগ্রত হয়, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়। ঈশা বল, মুসা বল, খ্রীষ্ট বল, বুদ্ধ বল, মহম্মদ বল, শ্রীচৈতন্য বল সকলেই ধ্যানে সেই বাণী শুনিয়াছিলেন তাই তাঁহারা বিশ্বজগতে আপনাদিগকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

মানুষ যখন যে কার্য্য করে তখনি তাহার তাহাতে ডুবিয়া থাকা উচিত। ধ্যানী হইতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ কেন? ব্যবসা-বাণিজ্যে এত বিফল কেন? সাহিত্য-চর্চ্চায় এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছি কেন? কোন দেশ বা জাতি দু'চারিজন লোক বড় থাকিলে বড় হয় না—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও প্রীতির প্রচার আবশ্যক। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা সে দিকে লক্ষ্য রাখিব ততদিন পর্য্যন্ত আমরা শুধু স্বপ্নই দেখিব।

দুঃখ যেখানে, সেখানেই সুখ। সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ ইহা জগতের চিরন্তন রীতি। রৌদ্র আছে বলিয়াই সুশীতল ছায়ায় আদর। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত গৌরব।

আমাদের কি চাই? কর্ম্ম চাই? আর কি চাই মন চাই প্রাণ চাই। অতিরিক্ত আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস অতিরিক্ত দাম্ভিকতা আমাদের অধঃপতনের কারণ। আমরা একজন শতকাজে নিযুক্ত হই ফলে কোন কার্য্যই সাফল্য লাভ করে না। এ গ্লানি এ নিন্দা—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আমাদিগকে দূর করিতে হইবে। মন হইতে ক্রোধ ও দ্বেষের মলিনত্ব আমাদিগকে দূর করিতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন—

"বিশ্বজগৎ আমারে ডাকিলে
কে মোর আত্মপর?"

হে মানব! তোমরা কি শুনিতেছ না প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বিশ্বজগৎ আহ্বান করিতেছে। সেই আহ্বান আমাদিগকে শুনিতে হইবে—আমাদের নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে—কেন্দ্রীভূত হইয়া আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

আজ এই নূতন বৎসরে হে প্রভু! হে নিখিলনাথ তোমার চরণ-সমীপে আমরা মিলিত হইয়াছি।* আমরা মানব—কামনায় আমাদের প্রাণ-পূর্ণ—আমরা তোমাকে চাহি না—যদি বলি তোমাকে চাহি তাহা হইলে মিথ্যা কথা হয়, আমরা চাহি—আমাদিগকে চারিত্র-বল শিক্ষা দাও। নিন্দা ও গ্লানির হাত হইতে রক্ষা কর। আর আমাদিগকে এই শক্তি দাও—যেন আমাদের পাপকে ঘৃণা করিবার এবং পুণ্যকে আশ্রয় করিবার শক্তি জন্মে। আমরা যাহাতে আমাদের শক্তি ও মর্য্যাদা বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক।

(পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বনিবনাও না হইলে, প্রতীচীর আইন উভয়ের পৃথক্‌বাসের ব্যবস্থা দিয়া থাকে। আইনের ভাষায় এর একটা বিশিষ্ট নামও রহিয়াছে। কিছুদিন হইল, সংস্কৃত ব্যাকরণের জুলুম সহ্য করিতে না পারিয়া বাংলা ভাষা, কিংবা বাংলা ভাষার ব্যভিচার সহ্য করিতে না পারিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পরস্পরের ছাড়া-ছাড়ির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। বাংলার সাহিত্য-বিচারকদের চূড়ান্ত বিচারে অতঃপর পৃথক্‌বাসেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং পাণিনির মতে 'সাহিত্যিক' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় কি না এরূপ একটা কটমট্ বৈয়াকরণিক গবেষণার গোলক ধাঁধাঁয় কাহারও বুদ্ধিকে আমরা জর্জ্জরিত করিয়া তুলিব, এ বিভীষিকার কোন কারণ নাই। যে ভাবেই হউক সাহিত্যিক কথাটা বাংলায় ঢুকিয়াছে; সে সংস্কৃত না অসংস্কৃত ইত্যাদি প্রশ্ন তুলিয়া এখন আর তার জাতিবিচারে কোন লাভ নাই। কিন্তু সে যে একটা বস্তুর বাচক সেই বস্তুর গুণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার সময় এখনও যায় নাই। এখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে 'সাহিত্যিক' অর্থে কাহাকে বুঝিব।

কোনও সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়-সিদ্ধ সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করার মত দুষ্কর্ম্ম আর নাই। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি যে আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তার অর্থের মধ্যে কতকটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে—গালান মমের মত সে যেন অনায়াসে একটু এদিক ওদিক নড়িতে পারে, অথচ তাহাতে যেন তার নিজত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়। এ অবস্থায় কেহ যদি জোর করিয়া কোনও একটা শব্দকে কোনও একটা অর্থের সহিত পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত সম্পৃক্ত করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে আমরা সহজেই একটু অসন্তুষ্ট হই। সাহিত্যিক শব্দটীও ঠিক এই প্রকারের। গুণের সঙ্গে দ্রব্যের কিংবা ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তার যেরূপ সম্বন্ধ সাহিত্যের সহিতও সাহিত্যিকের সেইরূপ একটা সম্বন্ধ, এ মোটা কথাটা আমরা সকলেই বুঝি। সাহিত্যের যিনি চর্চ্চা করেন তিনিই সাহিত্যিক। কিন্তু এর উপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় চর্চ্চা মানে কি, তাহা হইলে আমরা যথাসম্ভব বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিতেই ইচ্ছা করি। সাহিত্যের অধ্যয়নও চর্চ্চা, তার অধ্যাপনও চর্চ্চা; আর সাহিত্য-পাঠকদের সহায়তার নিমিত্ত তার ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়নও কতকটা চর্চ্চা বই কি! এবং সাহিত্যের সৃজন যে তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় রকমের চর্চ্চা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহার যে কোন রকমের চর্চ্চা যিনি করেন তাঁহাকেই যে আমরা সাহিত্যিক বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধরিতে পারা যায় এমন যে কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়া যিনি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতি বিস্তৃত অর্থে আমরা তাঁহাকেই সাহিত্যিক মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এই উদারতার মধ্যে একেবারেই কোনরূপ সংকীর্ণতা নাই এমন নহে। পণ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ ঔষধের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় নানা অলঙ্কারে, বিশেষতঃ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত পদবহুল, সরস, বাক্যবিন্যাস পাওয়া যায়। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহারা এরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদিগকে সাহিত্যিক বলিয়া গ্রহণ না করা যে অনুদারতার পরিচায়ক তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদিও আমরা সাহিত্য বলিতে যথাসম্ভব বিস্তৃত অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি, যদিও 'নটরাজ শিবের' বাসস্থান নির্ণয় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পর-পার সম্বন্ধে কবিতা পর্য্যন্ত, সায়েস্তা খাঁর সময়ে চাউলের দর হইতে আরম্ভ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা পর্য্যন্ত, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম না প্রকৃতি এই প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুশিক্ষার পক্ষে মদনমোহনের বই ভাল না ম্যাকমিলনের বই ভাল এই তর্ক পর্য্যন্ত, গোলাপের গুণ বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া মন্টেসরি অপেক্ষা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রাধান্য স্থাপন পর্য্যন্ত—যে কোনও বিচারে, যে কোনও বিষয়ে ভাষা রচনা করা যায় তাহাকেই আমরা সাহিত্য বলিতে

প্রস্তুত, তথাপি সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান কি এই প্রশ্ন তুলিলে সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ হইবে। কবি বলিবেন, বিক্রমাদিত্যের ক'টা হাতী ছিল এই বিচারে যে ভাষা খরচ করা হয় তার নাম সাহিত্য নয়; কবির দাবী অগ্রাহ্য না করিয়াও হয় ত দার্শনিক বলিবেন, আকাশে রামধনু উঠে কিংবা মেঘ দেখিলে ময়ূর নাচে, কেবল এই সব কথা ভাবিয়া যে ভাষার স্ফুরণ হয়, তাহাই সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নহে।

যেখানে কলহ হয়, কলহের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে না যাওয়াই অনেক সময় বুদ্ধিমানের কাজ। বিবদমান সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের কলহের মীমাংসা করিতে থাকুন, আমরা আপাততঃ কোন পক্ষভুক্ত হইতে চাই না। তবে, আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের উদার অর্থ গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ পন্থা। পদ্য ও গদ্য কাব্য যে সাহিত্যের প্রায় পোনর আনা অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্যের এই সংকীর্ণ অর্থের পক্ষে সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসের সাক্ষ্যই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তথাপি একটু বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ না করিলে সাহিত্য সামগ্রীটা নিতান্তই হাল্কা হইয়া যায়। মানুষের মনের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যে সব ক্রিয়া ভাষায় প্রকাশ পায় তাহাই সাহিত্যের উপাদান। সুতরাং সাহিত্য ভাষায় মানুষের স্বপ্রকাশ; এবং যিনি কোনও বিষয়ে সুচিন্তিত, সুসম্বদ্ধ ভাব ভাষায় প্রকাশ করেন তিনিই সাহিত্যিক। পোষ্টাফিসের কুইনাইনের বিজ্ঞাপন যিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহাকে সাহিত্যিক বলিব না, কারণ, 'যে পরিবার কুইনাইন ব্যবহার করে না' ও "যে পরিবার কুইনাইন ব্যবহার করে" এ দুইয়ের ছবি ছাড়া, 'এক মোড়ক কুইনাইনে বিশ দিন জ্বর নিবারণ করে'—ইহার বেশী তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এই কুইনাইন সম্বন্ধেই যদি কেহ একটা প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করেন তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

সাহিত্যই যে মানুষের আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়, তা নয়। চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—সমস্ত কলাবিদ্যাই মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহে অবয়বের সহিত অবয়বের যে সম্বন্ধ, কোনও এক জাতির আত্মপ্রকাশ হিসাবে এই কলা সমষ্টির প্রত্যেকটীর সহিত প্রত্যেকটীর সেই সম্বন্ধ। যে জাতির মন যে পরিমাণে পুষ্ট, তাহার বেলায় এই সমবায়-সম্বন্ধ তত স্ফুট; এবং যে জাতির ইহাদের কোনও একটীর অভাব কিংবা অপূর্ণতা রহিয়াছে, তাহার মন সেই পরিমাণে নূতন। ব্যক্তির জীবনে আমরা সব সময় সব কাজের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাই না; জাতির জীবনেও তেমনই অনেক সময় তাহার বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিতে পারে; এই উভয় প্রকার জীবনই সেই পরিমাণে অপূর্ণ, অসংযত, সুতরাং হীন। কিন্তু মানুষের মনের এই বিবিধ প্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ অনেক সময় সহজেই ধরা যায়, তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরের কোণে রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যে দিন হইতে হেঁয়ালিতে ভরা কবিতার আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাধারণ বুদ্ধিতে অনধিগম্য, কারুকরের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুছাড়া অন্যের নিকট অর্থহীন, ছবির আবির্ভাবও হইয়াছে।

সাহিত্য বিবিধপ্রকার কলাবিদ্যার—মানুষের আত্মপ্রকাশের বিবিধ প্রণালীর, একটী; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আবশ্যকীয় আর একটী সত্য এই যে, মানুষ—ব্যক্তি কিম্বা জাতি—যত প্রকার কাজ করে সাহিত্যও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত; এবং ঐ সমস্ত কাজের যদি কোন বিধি থাকে, তাদের মধ্যে যদি সদসদ্ বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকে তবে সাহিত্যের বেলাও তাহা রহিয়াছে। এই কথাটী আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম সংস্কৃত কবিরা যখন কিছুতেই মানিতে লাগিলেন না, বৈয়াকরণ তখন 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে নিজে খালাস হইলেন। কবিরা যৎকিঞ্চিৎ অমান্য করিলেন বটে, ব্যাকরণ তথাপি মরিল না। কিন্তু আজ দেখিতেছি শুধু কবি নন সাহিত্যিক মাত্রেই, শুধু ব্যাকরণের নয়, নিয়মমাত্রেরই অধীন হওয়া অসম্মান্ জনক এবং

ভাব-স্ফুরণের একান্ত ব্যাঘাত-জনক মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলায় তেমন কঠোর, দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকরণ নাই; সুতরাং গুরুতররূপে ব্যাকরণের শাসন অমান্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু মানুষের অন্যান্য কাজ যে নৈতিক নিয়মের অধীন, সাহিত্য যে কেন সে নিয়মের অধীন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্যের মধ্যেও শিষ্ট—অশিষ্ট, ভদ্র-অভদ্র হইতে পারে একথা কেন যে স্বীকৃত হইবে না, তা জানি না। অশ্লীলতা যে কাব্যের দোষ, অনেক কাল আগে আলঙ্কারিক এ কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে এ নিয়মের বহু ব্যভিচার থাকিতে পারে, তথাপি স্পষ্টতঃ কেহ নিয়মটী অস্বীকার করেন নাই। ব্যভিচারের মাত্রা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখনই বোধ হয় বলা হইয়াছিল 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।' মল্লিনাথ তাঁহার প্রিয় কবি কালিদাসের সমর্থন করিতে গিয়া এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ইহা অন্য কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।' কালিদাস অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকের নিয়ম ভাঙ্গেন নাই একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তথাপি নিয়মটী কোথাও অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ত জানি না।

কিন্তু আজ কলাসৃষ্টির—(আর্টের)—দোহাই দিয়া কবিরা স্পষ্টতঃ এ নিয়ম উপেক্ষা করিতে সাহসী হইতেছেন। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, বিদ্যালয়ে কিংবা তাহার বাহিরে নীতিশিক্ষা দেওয়া কবির কর্ম্ম নয়,—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তাঁহার পেশা; তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে যদি কাহারও চক্ষু ঝলসিয়া যায়, যদি কাহারও মনে কুভাব জাগে, যদি কেহ কুপথে যায়, কবি সে জন্য দোষী হইতে পারেন না। আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। বাইবেলের ইহুদী কবিদের পর কবির নিকট পৃথিবী কদাচিৎ নীতিশিক্ষা আশা করিয়াছে; প্ল্যাটো বলিয়াছিলেন কবিরা অসত্য বস্তুর বর্ণনা করেন—তাহারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং আদর্শ-রাষ্ট্রে তাঁহাদের স্থান হওয়া উচিত নহে। কিন্তু কবিরা যাহা বলেন তাহা ত ভদ্র-সমাজের উপযোগী করিয়া বলা উচিত।

আমরা যে ব্যভিচারের কথা বলিতেছি তাহার দৃষ্টান্ত যদি বিরল হইত তাহা হইলে একথা তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের রুচিতে আঘাত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। বেশী পুরাণ হয় নাই, এই সেদিন মাত্র এক কবি লিখিয়াছেন,

'এস প্রিয়া এস হৃদয় বিলাস-মন্দিরে,
হে ভীরু ঘুচাও নিষ্ঠুর নীবি-বন্ধনে,
ব্যর্থ করো না আজি এ জীবন-সঙ্গীরে,
সার্থক কর চির কামনার ক্রন্দনে!'

যদি বটতলার কোন পুস্তকে ইহা থাকিত তাহা হইলে আপত্তি করিতাম না; কিন্তু শিষ্ট সমাজে চলিতে পারে এই ভাবেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কালিদাসের নামের সঙ্গে জড়িত একটী কবিতা আছে তাহাতে বলা হইয়াছে, 'দার্শনিকেরা 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া অস্থির, কিন্তু নীবি-বন্ধ-মোক্ষই আদিম ও চরম মোক্ষ।' এর পরে, 'রঘুবংশের' শেষ নরপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস বর্ণনার পরে, জয়দেবের গীতগোবিন্দের অংশ বিশেষের পরে, এবং বাংলার 'বিদ্যা-সুন্দরের' বিহার বর্ণনার পরে, ভাবিয়াছিলাম নীবি-বন্ধ-মোচনের কথা শিষ্ট সাহিত্যে আর উঠিবে না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, ইহাদের সহিত 'বোকাসিও বায়রনকে সামিল করিয়া, 'টীষ্ট্রাম-খ্যাণ্ডী'-প্রণেতার মসলায় ঝাঁঝ দিয়া, নূতন করিয়া ঢল ঢল ভাবে এ ভাবের তরঙ্গে আধুনিক কবিরা বাঙ্গালীর পান-পাত্র ভরিয়া দিতেছেন। নীতির কঠোর কথা এখানে তুলিতে চাই না। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়'; সমস্ত বাংলাদেশ এ কথায় সায় দিয়াছে। এর পরে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা বাংলাদেশে তুলিবে তার ভাগ্যে বিলাসীর ঈর্ষাকষায়িত সম্মার্জ্জনী ভিন্ন আর কিছুই জুটিবে না। আমরা কিছুই ত্যাগ করিতে বলি না; মানুষের যত রকম ভোগ্য আছে, তাহা সমস্তই বাঙ্গালীর ভোগে আসুক; ইহা ও 'নাল্পস্য তপসঃ ফলং'। আধুনিক চারিত্র নীতিও মানুষকে কিছুই ত্যাগ করিতে বলে না। 'বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণস্তাবৎ

তরুণীরক্তঃ, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ' এই করিয়াই আমাদের জীবন কাটিয়া যাউক, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু নেশাখোরকে আমরা এখনও ঘৃণা করি, এবং কাব্যেরও নেশা আছে। ভাষায় ও ভাবে অসংযমের পক্ষপাতী আমরা নই। অবশ্যই কালিদাস ভারতচন্দ্র এখনও শিষ্টসমাজে আটক পড়েন নাই, কখনও পড়িবেনও না। কিন্তু 'দশকুমার চরিত' যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছে, সে সমাজের অবস্থা আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি; ভারতচন্দ্রের পদাবলী যখন প্রকাশ্য বৈঠকে গীত হইত, সে অবস্থাও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। এখন আর সুরুচির কথা বলিলে কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারিবেন না। এখনকার ভাষা ও ভাব মার্জ্জিত না হইলে সাহিত্যিক সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিবে এমন ত মনে হয় না। পূর্ব্বতন কবিদের মধ্যে যাহা আমরা নিন্দিত মনে করি তাহারই অনুকরণ কেন অবাধে চলিবে? বাংলা দেশে ত কবিতার দুর্ভিক্ষ এখনও উপস্থিত হয় নাই; আসল, সরস, ওজঃসম্পন্ন কবিতা যদি দিবার না থাকে, তবে অনর্থের হেতু এ হস্ত-কণ্ডূয়ন কেন?

শুধু সাহিত্য নয়, ইউরোপের সমগ্র কলা বিদ্যার বিষয় ইউরোপেরই একজন প্রধান মনীষী পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসরের চিন্তার ফলে, কাউণ্ট্ টল্‌ষ্টয়, ইউরোপের কলার প্রতি যে তীব্র সমালোচনার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, দেখিতেছি বাংলায়ও তাহা বলিবার সময় আসিয়াছে—কিন্তু বাংলায় বলিবার লোক কই? টলষ্টয় বলেন, 'আমাদের সময়ের ও আমাদের সমাজের কলা বিদ্যা সব রকমেই বার-বিলাসিনীর মত। বেশ্যারই মত ইহা পণ্য, রঙ্গীন বেশে চিত্রিত, উন্মাদক এবং উচ্ছন্ন যাওয়ার উপায়'। তিনি আরও বলেন, 'দুনিয়ার আদি হইতে, ট্রয়ের যুদ্ধ যে দিন হইয়াছিল সে দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যে সব হত্যা ও আত্মহত্যার কাহিনী আধুনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভ ভরিয়া রাখে সে পর্য্যন্ত মানুষের দুঃখযন্ত্রণার বেশীর ভাগই নারীপ্রেমের অত্যধিক অপব্যবহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে'। টলষ্টয়ের এই উক্তি হইতে নারীর প্রতি শঙ্করাচার্য্যের তীব্র ঘৃণার কথা মনে পড়ে—'দ্বারং কিমেকং নরকস্য? নারী!' উপন্যাসে, নাটকে, চিত্রে, সঙ্গীতে—সর্ব্বত্রই টলষ্টয় এক দুর্দ্দম রিরংসা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; এবং ইহাকে তিনি বাস্তবিক কলা বিদ্যা বলিতে মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন ইউরোপের কলা 'শিল্পে পরকীয়া নায়িকার সংস্রব না থাকিলে সেটা উপন্যাসই হয় না; নগ্ন কিম্বা অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তি কোনও একটা উপলক্ষে দেখা না দিলে, তাহা নাটকের মধ্যে গণ্যই নয়; চিত্রের, বিশেষতঃ ফরাসী চিত্রের অধিকাংশই নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি।'

টলষ্টয় সমস্ত ইউরোপের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সমুদয় মতই জগতে কখনও গৃহীত হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন। সোফোক্লিজ, ইউরিপিডিজ্ হইতে আরম্ভ করিয়া, দাঁতে, ট্যাসো, সেক্সপিয়র-মিল্‌টন, গেটে-শিলর, ইবসেন্-ম্যাটারলিঙ্ক প্রভৃতি কবি, জোলা কিপলিং প্রভৃতি গল্পলেখক, মোজার্ট, বিটুভেন, ওয়াগ্নার প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ, রাফেল, এঞ্জেলো প্রভৃতি চিত্রকর———কাহাকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। সার্ভেণ্টিস্, মলিয়ার ডিকেন্স, হিউগো, পুশকিন, প্রভৃতি কয়েকজন লেখক জুলেস্ ব্রিটন প্রভৃতি কয়েকজন চিত্রকর, ও বিভিন্ন জাতির সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত,—মাত্র ইহাদের মধ্যে তিনি কতকটা সার্ব্বজনীন কলা দেখিতে পান; তাছাড়া অন্য সকলের মধ্যেই শুধু অনুকরণ কিংবা অনুকরণের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এরূপ কঠোর, সংসারবিরাগীর উপযুক্ত, মানুষের ন্যায্য সুখ ও আনন্দের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তথাপি টলষ্টয় যে ইউরোপের একটা বর্দ্ধমান উদ্দাম রিরংসা ও লালসার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় ঠিক। কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে দেখিয়াছিলাম, বিলাতে

কোনও এক কিনেমেটোগ্রাফের ছবিতে সত্যকে নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি রূপে দেখান হইয়াছিল; প্রথমে উহা প্রকাশ্যে সর্ব্ব সাধারণকে দেখাইতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই; তাই নিয়া অত্যন্ত আন্দোলন হয়। পরে লণ্ডনের কাউন্টি কৌন্সিলের সভ্য, কয়েক জন পাদ্রী ও বাহিরের কয়েক জন লোককে ইহা দেখান হয় এবং সকলের মত জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাতে ছবিটীর পক্ষে মত দেন ২১৮জন এবং বিরুদ্ধে মাত্র ১১জন। (ষ্ট্যাট্সম্যান্, ২১। ৮। ১৫)।

এই প্রচণ্ড রিরংসার ফলে ইউরোপ উচ্ছন্ন গেলে আমাদের শোক করিবার অবকাশ হইবে কি না সন্দেহ;—আমরা নিজের নিয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে ও কলাশিল্পে যদি এই ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের চিন্তিত হইবার কারণ আছে।

টলষ্টয় যে আরও বলিয়াছেন সাহিত্য ও কলাশিল্পকে সার্ব্বজনীন—সকলের বোধগম্য করিয়া দিতে হইবে, তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। সকলই সব বুঝিতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু তথাপি টলষ্টয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে। বাস্তবিক, খাঁটি সঙ্গীতে ও চিত্রের মাধুর্য্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলই মোহিত হইয়া থাকে। নিতান্ত গ্রাম্য লোকও সহরে আসিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া থাকে। এ অনুভূতির জন্য তার কোন শিক্ষা, কোন পুস্তক পাঠ আবশ্যক করে না। কিন্তু সঙ্গীতের নামে যখন আওয়াজের কসরৎ হয় কিংবা চিত্রের নামে যখন কল্পনা আঁকা হয়, তখনই মানুষের বুদ্ধি আকুল হইয়া যায়। অবশ্যই, রামায়ণের কাহিনী যে না জানে 'অশোক বনে সীতা'র ছবির সম্পূর্ণ অর্থ সে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না; তথাপি, তার কোন অর্থই সে গ্রহণ করিতে পারিবে না এরূপ মনে করা ভুল। সকলেই এক বিষয় হইতে সুখ কিংবা দুঃখ না পাইতে পারে; কিন্তু সুখ দুঃখ মানুষের সাধারণ; সুতরাং যে হেতু হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, দুঃখ কিংবা সুখের চিত্র দেখিলে মানুষমাত্রেই তাহা না বুঝিবে কেন? সুতরাং আজ কাল মাসিক সাহিত্যের সম্পাদকেরা ছবি ছাপিয়াই যে বলিয়া দেন 'ছবিটীর অর্থ এই,—তাহাতে বাস্তবিক ছবিটীর ঐ অর্থ হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অধিকার আমাদের আছে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। সুতরাং কলা-শিল্পকে যে সার্ব্বজনীন করা যায় না, তা নয়। শিল্পী যে বলিবেন 'আমি সৃষ্টি করি, আমিই বুঝি'—ইহা টলষ্টয় সহ্য করেন না বলিয়া তাঁহাকে অনুদার বলা যায় না।

সাহিত্য, তাহার ভাষা ও ভাবকেও তেমনই সার্ব্বজনীন করিয়া তোলা যায়। কলিকাতার ভাষাকে যে আজকাল অনেকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি আছে। আমাদের অপত্তি কেহ শুনিবে কি না জানি না; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলা গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতার মনীষীরাও আপত্তি করিয়াছিলেন; আজ যদি তাঁহারাই প্রাদেশিক ভাষার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের সহায়তা ছাড়াই ভাষা-বিভাগ সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করার অর্থ টলষ্টয়ের মতে যদি এই হয় যে, সাহিত্যে যাহা কিছু কথিত থাকিবে তাহা সকলেই সমান ভাবে বুঝিবে, তাহা হইলে সে অর্থে সাহিত্য কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে কি না সন্দেহ। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের তফাৎ আরও অনেক কাল পৃথিবীতে থাকিবে; সকলের বুঝিবার ক্ষমতা সমান হওয়ার আরও দেরী আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বুঝিবে না বলিয়া যদি গরীয়সী চিন্তাকে সাহিত্যে প্রকাশিত হইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকসান ছাড়া লাভ নাই।

কিন্তু আর একটী অর্থে সাহিত্যের ভাবকে সার্ব্বজনীন করা চলে। আগে যে আলঙ্কারিকের অনুশাসন অনুসারে সদ্বংশপ্রভব নায়কের বিষয়ই সাহিত্যের একমাত্র কথনীয় ছিল, তাহা এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। তথাপি

ইউরোপের সাহিত্যে এখনও টলষ্টয়ের মতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের জীবন কাহিনীর প্রাধান্যই বেশী। বিলাতের সাময়িক সাহিত্যে যত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই লর্ড-লেডীর প্রণয়-বৃত্তান্ত। পুরাকালে সাহিত্য রাজদরবারের দরবারী ছিল; রাজার প্রাসাদে তাহার জন্ম, রাজার যত্নে তাহার পোষণ হইত; কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং তখন রাজাদের বৃত্তান্তই শিষ্ট সাহিত্যের উপাদান ছিল। কিন্তু এখন আর সাহিত্য প্রাকৃত জনের কুটীরে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না; সুতরাং এখন সাহিত্যে সাধারণের অনুভব ও অভিজ্ঞতার স্থান হইতে পারে। এবং এই অর্থেই সাহিত্যকে সর্ব্বজনীন করা সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, করা উচিত। যে সাহিত্যে সমস্ত জাতির অনুভব ও জ্ঞান, অবশ্যই শিষ্ট ও মার্জ্জিত ভাবে, প্রকাশিত থাকে তাহাই আদর্শ সাহিত্য। সাহিত্যে সকলের আগে জাতির সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; ইহাতে শ্রেণীবিশেষের একান্ত আধিপত্য থাকা ঠিক নহে। কিন্তু এই সমস্ত প্রকাশের মধ্যে যে সংযম ও শিষ্টাচার থাকা উচিত সাহিত্যিকগণ কি তাহা মনে রাখিবেন না?

আমরা সাহিত্যকে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থিত মুনিঠাকুরের কঠোর তপশ্চরণের মত নির্ম্মম ও নিরানন্দ করিয়া তুলিতে বলি না। মানুষের সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত তৃপ্তি ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকুক; একটা সবল, সতেজ, দীপ্তি তাহার প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দেউক: এ পৃথিবী যে ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং বাসের উপযুক্ত, এ জীবন যে সুখের, এবং ভোগের উপযুক্ত,—এই ভাব সাহিত্যকে উল্লাসিত করিয়া দেউক; যে প্রাণ, যে জিজীবিষা, যে আনন্দ ও যে উল্লাস বৈদিক সাহিত্যকে, বাইবেলের সাহিত্যকে, আবেস্তার সাহিত্যকে সংপ্রাণিত করিয়া দিয়াছে, তাহাই আবার জগতের সাহিত্যকে প্রদীপ্ত করিয়া দেউক। অলস, নিরানন্দ, স্নায়ুহীন, মুমূর্ষুভাব যেন সাহিত্যকে প্রাণহীন করিয়া তোলে না। মানুষের সমগ্র চিন্তা, সমগ্র অনুভূতি, সমগ্র জ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে সম্যক্ ফুটিয়া উঠুক। কিন্তু তার মধ্যে যেন শিক্ষা ও সংযমের অভাব না হয়; উচ্ছৃঙ্খল ভোগলালসা, অসংযত উত্তেজনা, অমার্জ্জিত রুচি যেন তাহাকে কলুষিত করিয়া না দেয়। বাংলা সাহিত্যের এমারত আজ দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে; বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ কি এ কথা মনে রাখিবেন না যে সাহিত্য কর্ম্মে মানুষের অভিব্যক্তির অন্যতম, সুতরাং ইহাও একই নৈতিক নিয়মের অধীন? সত্য এবং শিব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুধু সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা যে সাহিত্য করে, তাহা হইতে জাতির অমঙ্গল হইতে পারে। 'সত্যং শিবং সুন্দরং'—এ তিনের একত্বে যে জাতির কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাষা গড়িয়া উঠে, সে জাতিই জগতে ধন্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রাঙা ফাঁসি।

দূরে থেকে চাই তাঁরে
　　কাছে এলে ভুলে যাই।
আঁখিটি তুলিয়া কভু
　　মুখ পানে নাহি চাই।
তবে—কি ছি!—মিছে কথা!—
　　আমি তাঁরে ভালবাসি?
মরমে কে টেনে দিল
　　সরমের রাঙা ফাঁসি!

শ্রীকূলচন্দ্র দে।

সেকালের বাঙ্গালা

সাময়িক পত্রিকা ও বঙ্গ সমাজ।

সে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। তখন বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রভাব। মিশনারিরা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বর্ণমালার পুঁথি ছাপাইয়া, সাহিত্য ও ব্যাকরণ লিখিয়া অভিধান বাহির করিয়া, বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা দিতেছিলেন। বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালা লিখিতে পারিত না, ছাপার পুঁথিও ভাল করিয়া পড়িতে পারিত না। বাঙ্গালা উন্নত গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা মুন্সী রামমোহন সবে কালেক্টরের মুন্সীখানার দেওয়ানি ছাড়িয়া বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদের অনুবাদ করিতে করিতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের মক্স করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; "প্রভাকরের গুপ্তকবি "রাতে মশা দিনে মাছি" তাড়াইয়া কলিকাতায় বর্ণমালা শিক্ষা করিতেছিলেন; "আলালী ভাষার" জন্মদাতা টেকচাঁদ তখন সবে হাটি হাটি পা পা করিয়া চলিতে শিখিতেছিলেন; বাঙ্গালা শিশুশিক্ষার রচয়িতা মদনমোহন জননীর ক্রোড়ে স্তন্যপানে রত; তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জননীর জঠরে অবস্থিত; বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও সম্পদদাতা অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই—বাঙ্গালা সাহিত্যের তেমন দুর্দ্দিনে—মুশলমানী বাঙ্গালায় লিখা কবিওয়ালা রাম বসুর "প্রতাপাদিত্য" ও গোলক বসুর "হিতোপদেশ"ই ছিল যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; চণ্ডীচরণের "তোতার ইতিহাস"ই যখন ছিল বাঙ্গালা ভাষার আদরের জিনিস; বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্যের মুখ রক্ষার জন্য যখন উৎকলী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তেমনি উৎকলী দন্তভাঙ্গা "অতি-উৎকট মহাশঙ্কটী", ভাষায় বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখাইয়া নবাগত সিভিলিয়ান বিচারপতিদিগকে ভীত করিতেছিলেন—বঙ্গ সাহিত্যের তেমন শোচনীয় দিনে বাঙ্গলার একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম "বেঙ্গল গেজেট।" বেঙ্গল গেজেটের সেই ভট্টাচার্য্য সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা ১২২৩ সালে, ইংরেজী ১৮১৬ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গলগেজেট" প্রকাশ করেন। পত্রিকার মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। মিশনারিরা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সুদূর পরাহত ছিল। মিশনারিগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, আইন, অভিধান, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া যে আমাদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি যে বাঙ্গালার সাময়িক পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বাঙ্গালী!

লং সাহেব মাসিক, সাপ্তাহিক সকল রকমের পত্রিকা কেই "সংবাদপত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে 'বেঙ্গলগেজেট' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল, কি মাসিক সাহিত্য পত্র ছিল তাহা অবগত হইবার আর এখন কোন উপায় নাই। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—ইহা পুস্তাকাকারে বাহির হইত এবং তাহাতে সম্পাদকের লিখিত বিদ্যাসুন্দর ও বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্প চিত্র সহ বাহির হইত। (১)

বেঙ্গলগেজেট একবৎসর মাত্র জীবিত ছিল। ইহার নামটী হিকির ইংরেজী "বেঙ্গলগেজেটের" নামের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল গেজেট উঠিয়া গেলে ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে মার্সম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ শ্রীরাম-পুর হইতে "দিগ্‌দর্শন" নামে এক খানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ও গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের কার্য্য রীতিমত চলিতেছিল। ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধর সেই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে

* ঢাকা সাহিত্য সমাজে পঠিত।

(১) সংবাদ প্রভাকর ১২৬০। ১ বৈশাখ

অসমর্থ হইয়াই পত্রিকা পরিচালনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি, অবগত হইবারও কোন উপায় নাই। কিন্তু মার্সম্যান সাহেবের দিগ্‌দর্শন বাহির করিয়া যে বিপদ গণিতেছিলেন তাহা উক্ত মার্সম্যানের স্বলিখিত বৃত্তান্ত হইতেই অবগত হওয়া যায়।

এই সময়ের অবস্থা উল্লেখ করিয়া মার্সম্যান লিখিয়াছেন :—It appeared (in 1818) that the time was ripe for a native newspapdr and I offered the missionaries to undertake the publication of it. The jealousy which the government had always manifested of the periodical press appeared, however, to present a serious obstacle. The English journals in Calcutta were under the strictest surveillance, and many a column appeared resplendent with the stars which were substituted at the last moment for the Editorial remarks and through which the censor had drawn his fatal pen. In this state of things it was difficult to suppose that a a native paper would be tolerated for a moment. Life and times of Carey and Murshman.

এইরূপ অবস্থাতেও মার্সম্যান "দিগ্‌দর্শন" বাহির করিয়া ফেলিলেন। দিগ্‌দর্শন বাহির হইলে মিশনারিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেরি সাহেব গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিকা বাহির করিবার বিরোধী ছিলেন। "দিগ্‌দর্শন" বাহির হইবার পর যখন গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন প্রতিবাদ বা 'কৈফিয়ত তলপ' হইল না, তখন মার্সম্যান একখানা বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও বাহির করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও কেরীসাহেব বিরোধী হইলেন। শেষ আপোষ মীমাংসায় পত্রিকা বাহির করাই স্থির হইলে মার্সম্যান ঐ সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" বাহির করেন।

"সমাচার দর্পণ" বাহির হইলে মার্সম্যান তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ১ খানা দর্পণ সহ ঐ অনুবাদ গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংসের নিকট পাঠাইলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া মার্সম্যানকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং ১৮১৮ অব্দের ১৯শে আগষ্ট পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিয়া সাহিত্যচর্চ্চা ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনের পথ সুগম করিয়া দেন।

"দিগ্‌দর্শন" মাসিক পত্রে রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এই সময় মিশনারিদিগের সহিত তাঁহার বেশ সৌহৃদ্যছিল। ১৮১৯ অব্দে কলিকাতার মিশনারিরা গস্পেল ম্যাগাজিন নামে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বপূর্ণ একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন; এই পত্রে ও "সমাচার দর্পণে" হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা প্রকাশিত হইতে থাকিলে রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মণ সেবধী" নামে আর একখানা মাসিক পত্র বাহির করিয়া তাহাতে মিসনারিদিগের পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন।

এই সময় রামমোহন রায় বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ হিন্দু সমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হন। সংবাদ কৌমুদীতে এই মত প্রচারিত হইতে থাকিলে, হিন্দু সমাজে মহা বিপ্লবের সূচনা হয়। অপর দিকে উইলিয়ম এডাম নামে তাঁহার জনৈক খ্রীষ্টান বন্ধুকে তিনি একেশ্বরবাদে দিক্ষীত করেন। এই কার্য্যে মিসনারিগণের সহিত ও তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার সতী দাহ নিবারণ বিষয়ক প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট আলোচিত হইতেছিল; এই তিন দিক রক্ষা করিবার জন্য তিনি "সংবাদ কৌমুদিতে" প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "সতীদাহ নিবারণের" সপক্ষে ও প্রচলিত হিন্দুমতের বিপক্ষে যখন "কৌমুদীতে" প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল তখন তাঁহার সহকারী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ কৌমুদীর" কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে যাইয়া হিন্দু সমাজের দল ও বল বৃদ্ধি করিলেন। সহমরণ প্রথার সমর্থন জন্য

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দুধর্ম্মসভা হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা বাহির করেন।

এই দলাদলি উপলক্ষে আরও দুই খানা সংবাদ পত্রিকা ও কয়েক খানা পুস্তক পুস্তিকার উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকা দ্বয়ের এক খানা কৃষ্ণমোহন দাসের "সংবাদ তিমির নাসক," অপর খানা নীলরতন হালদারের "বঙ্গদূত"। ১৮২৩ সনে চন্দ্রিকার সমর্থনে "সংবাদ তিমির নাসক" ও ১৮২৫ সনে নীলরতন হালদার, মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের উদ্যোগে কৌমুদীর সমর্থন জন্য বাঙ্গালা ও পার্সী—দ্বিভাষী "বঙ্গদূত" বাহির হয়।

প্রতিবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে উমানন্দ ওরফে নন্দলাল ঠাকুরের "পাষণ্ড পীড়ন" উল্লেখ যোগ্য। পাষণ্ড পীড়নের প্রত্যুত্তরে রামমোহন রায় "কৌমুদীতে" পথ্য দান" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় অনেক শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত লোক উভয় পক্ষে নিযুক্ত থাকিয়া বাদ প্রতিবাদ লিখায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষ দশ বৎসরের অধিককাল এইরূপ মতবিরোধের তুমুল তর্কে আত্ম নিয়োগ রাখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবন সঞ্চারে যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া ছিলেন।

এই দলাদলি চলিত থাকা কালেই ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ প্রভাকর" সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয় এবং বঙ্গ সাহিত্যকে রসসিঞ্চনে সজীব করিয়া তুলিতে থাকে।

প্রাগুক্ত দলাদলির সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হইলেও ঐ সকল দুরূহ ধর্ম্ম কথার বাদ প্রতিবাদে তিনি যোগ দান করিলেন না; পরন্তু তিনি সকল সমাজের উপরই ব্যঙ্গ করিয়া কাব্য গড়িতে লাগিলেন।

বলিতেগেলে ঈশ্বর গুপ্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন। "প্রভাকরের" হাস্য ও ব্যঙ্গরসের লেখাই ছিল সেই আকর্ষণের বিষয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে সুধু বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন তাহা নহে; বাঙ্গালা সাহিত্যের এক যুগ প্রবর্ত্তন এবং সেকালে সাহিত্য সমাজ গঠন—এ দুটিও তিনি প্রভাকরের সাহায্যে করিয়াছিলেন।

সেই সাহিত্য যুগের ও সেই যুগের সাহিত্য সমাজের আলোচনা না করিলে সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের ইতিহাস অপূর্ণ থাকিবে। আমরা তাই এখানে সংবাদ প্রভাকরে ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (১৮৩১ সন) কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর বাহির করেন। সংবাদ প্রভাকর স্বীয় ললাটে সংবাদ এই রাজ টীকাটী লইয়া সাপ্তাহিকরূপে আবির্ভূত হইলেও ইহাতে সংবাদ অপেক্ষা গদ্য ও পদ্য রচনাই থাকিত অধিক।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পাথরিয়া ঘাটার মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কবির আসরে লড়াই করিয়া ও গান বাঁধিয়া দিন কাটাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু উক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহাকে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে ভদ্রভাবে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। এই সময় "কৌমুদী" ও "চন্দ্রিকায়" তুমুল বাদপ্রতিবাদ চলিতেছিল—বন্ধুর পরামর্শে ঈশ্বরচন্দ্র সময় বুঝিয়া *লেখনী কণ্ডূয়ণ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রভাকর* বাহির করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রভাকরে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন:—"বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্য ক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে—পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।" (১)

---

(১) সংবাদ প্রভাকর ১২৬০। ১ বৈশাখ।

দুইটী সংস্কৃত শ্লোক প্রভাকরের কণ্ঠে শোভা পাইত। শ্লোক দুটী সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের রচনা। তিনি প্রভাকরের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন।

প্রভাকরের তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকগণের নাম আমরা প্রভাকর হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করিলাম।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (শব্দকল্পদ্রুম রচয়িতা)।
পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ)।
„ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ)।
বাবু নন্দলাল ঠাকুর ("পাষণ্ড পীড়ন" প্রণেতা)।
„ নন্দকুমার ঠাকুর।
„ চন্দ্রকুমার ঠাকুর।
„ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ("অনুবাদক" সম্পাদক)।
" রামকমল সেন (ইনি একখান বিরাট অভিধান লিখিয়া বাঙ্গালার জনসন বলিয়া পরিচিত ছিলেন)।
" নীলরতন হালদার ("বঙ্গদূত" সম্পাদক)।
" কৃষ্ণচন্দ্র বসু।
" ব্রজমোহন সিংহ ("সংবাদ রত্নাকর" সম্পাদক)
" শ্যামাচরণ সেন।
" গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (ভাস্কর সম্পাদক)।
" রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
" ধর্ম্মদাস পালিত।
" নীলমণি মতিলাল প্রভৃতি।

ইহারা সকলেই সেকালের সমাজে গণ্যমান্য-ব্যক্তি ও বাঙ্গা ভাষার লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রভাকর ও কিছুদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্মও উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দণ্ডে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তর গমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগর নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগ শূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকরের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই "প্রভাকর" কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" (সঃ প্রঃ ১২৫৩ | ১ বৈশাখ)।

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ প্রভাকর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। কিরূপে প্রভাকর পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল সম্পাদকের নিজ ভাষায় আমরা তাহা উল্লেখ করিতেছি। সম্পাদক লিখিয়াছেন:—

"১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটা নিবাসী সাধারণ মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর, মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্তবহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটী করেন না। একারণে আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতাগুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের নাম ও যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন পরিচালকগণের উপদেশে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরকে প্রাত্যহিকে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে "সংবাদ প্রভাকর" প্রাত্যহিকরূপে দর্শন দিতে লাগিল। প্রভাকরের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালা দৈনিক পত্র ছিল না।

এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের পরবর্ত্তীযুগের প্রবীন ও যশস্বী লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষানবিশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সময় আরো যাহারা শিক্ষা-

'প্রভাকরে' লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম।

পণ্ডিত রাধানাথ শিরোমনি।
„ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ।
বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র।
„ বিশ্বম্ভর পাইন।
„ গোবিন্দচন্দ্র সেন।
„ কানাইলাল ঠাকুর।
„ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ উমেশচন্দ্র দত্ত।
„ শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ।
রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর।
বাবু হরিমোহন সেন।
„ জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।
„ সীতানাথ ঘোষ।
„ গনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
„ হরনাথ মিত্র।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ গোপালচন্দ্র দত্ত।
„ শ্যামাচরণ বসু।
„ উমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ শ্রীনাথ শীল।
„ শম্ভুনাথ পণ্ডিত।
„ হরনাথ ন্যায়রত্ন।
„ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ প্রভাকরের" সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন।

এই সময় এমন আরো কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চা সাক্ষাৎ ভাবে না করিলেও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সেকালের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনায় তাহাদের উল্লেখ প্রয়োজন বোধ আমরা গুপ্ত কবির সালতামামি খতিয়ান করিয়া তাহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহারা সকলেই স্ব স্ব সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং বোধহয় সকলেই এখন স্বর্গধামে বিশ্রাম করিতেছেন।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর,
" রমানাথ ঠাকুর,
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
" গিরিশচন্দ্র দেব,
" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
" রমাপ্রসাদ রায়,
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ,
" মাধবচন্দ্র সেন,
" রাজেন্দ্র দত্ত,
" হরচন্দ্র লাহিড়ী,
" অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী,
" হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি।

এই যে আমরা আজ সাহিত্য সম্মিলন করিতেছি এইরূপ সাহিত্য সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন বা পূর্ণিমা সম্মিলনের ন্যায় অনুষ্ঠান ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত "প্রভাকর" কার্য্যালয়ে এইরূপ একটী সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সহরের এবং মফস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন। সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বিদায়ের ব্যবস্থাও ছিল।*

১২৬০ সালে প্রভাকরের একটা মাসিক সংস্করণও হইয়াছিল; তাহার বিবরণ আমরা "প্রভাকরের" ইতিহাসে যথাসাধ্য প্রদান করিলাম।

এইবার বঙ্গসাহিত্যে "প্রভাকর" ও গুপ্তকবির প্রভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

প্রভাকরের পূর্ব্বে যে কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় অধিকাংশ ভাগ

* এই বার্ষিক সম্মিলন পরে চৈত্রমাসে হইত।

গুরুতর ধর্ম্মকথার কাটাকাটি ও বাদ প্রতিবাদে পূর্ণ থাকিত, সুতরাং লোকে বড় মনোযোগ দিয়া তাহা পড়িত না, পড়িলেও সহজে তাহা হইতে কোন সরল ভাব গ্রহণ করিতে পারিত না। "সতীদাহনিবারণ" প্রথার আন্দোলন উপস্থিত হইলে, রাজারামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত "সংবাদকৌমুদীর" সহিত যখন হিন্দু-সভা নব-সৃষ্ট মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকার' মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করিয়া একটু কিছু উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঐ সকল বাদপ্রতিবাদে শাস্ত্র কথা অধিক থাকায় তাহা স্বল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রীতিপ্রদ হইত না। ঠিক এই সময়—যখন পাঠকের আগ্রহ হইতেছিল পরন্তু তাহা পূরণের উপকরণ পাওয়াযাইতেছিল না—বাঙ্গালার স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ কাব্যরসে ভরপুর করিয়া "সংবাদ প্রভাকর" উপস্থিত করিলেন। ঈশ্বর-চন্দ্রের "প্রভাকর" শ্লেষ ও রসকথায় পূর্ণ থাকিত। সেই শ্লেষ ও রসকথা সহজেই তখন বাঙ্গালী পাঠকের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে প্রভাকর অল্পে অল্পে বাঙ্গালার পাঠক শ্রেণী গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। 'প্রভাকর' কেবল যে পাঠক সমাজই গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন—তাহা নহে ; বাঙ্গালা-লেখক সমাজও গঠন করিয়াছিলেন, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমান উন্নত বাঙ্গালা সাহিত্য 'প্রভাকর' ও তদীয় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট কতদূর ঋণী, 'প্রভাকর' ও ঈশ্বরচন্দ্র সেই মৃত বঙ্গভাষাকে সঞ্জীবিত করিতে কতদূর সাহায্য করিয়া ছিলেন, পাঠক তাহা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই স্থানে আমরা তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

এই সময় যেমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আলো-চনার জন্য ২।৪ খানা পত্র পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিতেছিল, সেইরূপ বক্তৃতা শিক্ষা এবং রচনা শিক্ষার জন্য ও স্থানে স্থানে সভা সমিতি গঠিত হইতেছিল। দর্জ্জি-টোলার নরনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এই সময় (১২৪৫) "বাঙ্গালাভাষা অনুশীলনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তখন উদীয়-মান প্রতিভা। সভাসমিতি মাত্রেই তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ থাকিত। বাঙ্গালা সাধুভাষার যিনি শক্তিদাতা—সেই অক্ষয়কুমার দত্ত, তখন উনিশ বৎসরের যুবক—পড়া শুনা শেষ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় এদিক ওদিক ঘুরিতে ছিলেন এবং অবসর সময়ে অল্প অল্প কবিতা রচনা করিয়া বীণাপাণির চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। উক্ত বঙ্গভাষা অনুশীলনী সভায় অক্ষয়-কুমার যোগদান করিতেন। একদা এই সভায় তিনি "প্রভাকর" সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরি-চিত হন এবং তৎপর হইতে প্রভাকর কার্য্যালয়ে যাইয়া পত্রিকাদি পাঠ করিতেন।

একদা প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক অসুস্থ হইয়া অনুপস্থিত থাকায় ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার একটা স্থান দেখাইয়া তাহা "প্রভাকরের" জন্য অনুবাদ করিয়াদিতে বলেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে আমি কখনও গদ্য লিখি নাই এবং লিখিতেও পারি না। অক্ষয়কুমার এড়াইতে চেষ্টা করিলেও ঈশ্বরচন্দ্র তাহা শুনিলেন না বলিলেন "তুমি লেখাপড়া জান, যেরূপই হউক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া লিখ, আমি দেখিয়া ছাপিব।" অনন্যোপায় হইয়া অক্ষয়কুমার নির্দ্দেশিত অংশের অনুবাদ করিলেন। অনুবাদ পড়িয়া গুপ্ত কবি তাঁহাকে এতদূর প্রশংসা করিলেন এবং উৎসাহ প্রদান করিলেন যে অক্ষয়কুমার সেই দিন হইতে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহা "প্রভাকরে" প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময় "প্রভাকরের" সহিত গৌরীশঙ্কর ভট্টা-চার্য্যের "ভাস্কর" ও "রসরাজ" পত্রদ্বয়ের বিষম বাদানু-বাদ বাঁধিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র পদ্যে ও অক্ষয়কুমার গদ্যে ভাস্করের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকেন। অক্ষয়কুমারের এই গদ্য প্রবন্ধগুলি এমনই সুন্দর হইতে-ছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া একদিন রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "অক্ষয়বাবু দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন।"

বলা বাহুল্য সংবাদ প্রভাকরের এই নবীন লেখক, ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য অক্ষয়কুমার কালে গুরুকেও ছাড়াইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গুরুর স্থায় যুগ প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন কাঙ্গাল হরিনাথ; সোমপ্রকাশের দ্বারিকানাথ, হতভাগ্য কবি দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি ও প্রভাকরের দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। আমরা যথা স্থানে তাহার আলোচনা করিব।

সাহিত্য জগতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব প্রকৃতই মৃত বঙ্গসাহিত্যের প্রাণে এক নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের পদানুসরণে অল্পকাল মধ্যেই প্রায় বিশ পঁচিশ খানা সাময়িক পত্র বাহির হইয়া পড়িল। এবং কোন কোন পত্র বাহির হইয়া বঙ্গসাহিত্যে অভিনব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিল।

বঙ্গ সাহিত্যে এই সমবেত উদ্যম বঙ্গভাষার পক্ষে প্রচুর কল্যাণকর হইয়াছিল—মৃত বঙ্গ ভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাজ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিল।

১৮৩০ অব্দে "প্রভাকর" প্রকাশিত হইবার পরই প্রেমচাঁদ রায় "সংবাদ সুধাকর" ও ব্রজমোহন সিংহ "সংবাদ রত্নাকর" বাহির করেন। ১৮৩১ সনে বেণীমাধব দেব "সারসংগ্রহ" প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "অনুবাদিকা" মৌলবী আলীমোল্লার "সমাচার সভারাজেন্দ্র" দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির "জ্ঞানান্বেষণ" পি, রায়ের "সংবাদসুধাকর" প্রভৃতি ৫।৬ খানা পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৩২ সনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'শাস্ত্রপ্রকাশ' গঙ্গাচরণ সেনের "বিজ্ঞান সেবধীশ," জ্ঞানচন্দ্র মিত্রের "জ্ঞানোদয়", মহেশচন্দ্র পালের "সংবাদ রত্নাবলী" এবং "পাশাবলী" প্রভৃতি আরও ৬।৭ খানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই সময় রাজধানী কলিকাতায় পত্রিকা প্রচারের এইরূপ ধূম থাকিলেও সুদুর মফস্বলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েককটী স্থান এবং হুগলী, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানেই এই সকল পত্রিকা যাওয়া দূরে থাকুক, ছাপার পুঁথিও প্রবেশ করিতে পারে নাই। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। দেশের এই অবস্থা উল্লেখ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সেই একেশ্বর বাদে দীক্ষিত বন্ধু উইলিয়ম এডাম গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিককে দেশে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তন জন্য অনুরোধ করেন। উইলিয়ম এডামের এই প্রস্তাব সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল আলোচনা করিয়া উক্ত এডামকেই এই বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

১৮৩৫ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী এডাম তাঁহার ১ম রিপোর্ট প্রদান করেন। এই রিপোর্টে বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামসমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঐ সনেই সার চার্লস মেটকাফ্ গবর্ণর জেনারেল হন এডামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান তখনও চলিতেছিল। মেটকাফ্ পূর্ব্ব হইতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল। সেই বৎসরই বেণীমাধব দেব "সংবাদ সার সংগ্রহ," হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, "কালীশঙ্কর দত্তের "সংবাদ সুধাসিন্ধু" প্রভৃতি কতকগুলি' পত্রিকা বাহির হইল। ইহার পর "সংবাদ দিবাকর," "সংবাদ গুণাকর," "সংবাদ সৌদামিনী," "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়," "ভৃঙ্গদূত" "সংবাদ অরুণোদয়," "সুজন রঞ্জন" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাহির হইলে পর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের "সংবাদ ভাস্কর" ও "সংবাদ রসরাজের" আবির্ভাব হয়।

১৮৩৮ সনের ২৮ এপ্রিল এডাম সাহেবের শেষ রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্টে আপাততঃ তখন কোন ফল না ফলিলেও বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি

সে সময় অবিশ্রান্ত পত্রিকা প্রসব করিতে থাকায় রাজপুরুষদিগের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যুগপৎ কৃপা ও সম্ভ্রম দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। ফলে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষাকে পার্শিভাষার পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিলেন; পার্শিভাষা বাঙ্গালার রাজকীয় দপ্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

গবর্ণমেণ্ট মৃত বাঙ্গালা ভাষাকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ঐ সনের জানুয়ারী হইতেই মার্সম্যান সাহেবের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট"ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুগ্রহ-লক্ষণ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রদর্শনকরিলেন, এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশ যুড়িয়া ১০১টি হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এডামের সম্মান রক্ষা করিলেন।

"সংবাদ ভাস্কর" এবং "সংবাদ রসরাজ" আবির্ভূত হইয়াই সংবাদ প্রভাকরের সহিত তুমুল সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের সূচনা করেন। এ দুখানা পত্রিকাও "সংবাদ পত্র" বলিয়া পরিচিত হইলেও সাহিত্যচর্চ্চায় এক দলের মুখপত্র ছিল।

প্রভাকর বাহির হইয়াছিল পাথুরিয়া ঘাটার রাজ পরিবারের সহানুভূতি ও সাহায্য বলে। ভাস্কর বাহির হইল শোভাবাজার রাজপরিবারের কাহারও আনুকূল্যে। ভাস্কর এবং রসরাজ উভয়ই সাহিত্যালোচনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাই প্রভাকরের ন্যায় এ দুখানা পত্রেরও সামান্য আলোচনার চেষ্টা এখানে করিব।

১৮৩৮ সনে "রসরাজ" এবং "ভাস্কর" উভয় পত্রিকাই বাহির হয়। রসরাজের সম্পাদক ছিলেন প্রভাকরের লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যসুহৃদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ভাস্করেরও ৩য় বর্ষে তিনিই সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু ভাস্করের ১ম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়।

১৮৩৯ সনের শেষ সপ্তাহে ভাস্কর পত্রে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে রাজা রাজনারায়ণ সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে ধৃত করিবার জন্য বিশ পঁচিশ জন হিন্দুস্থানী লোক নিযুক্ত করেন। ১৮৪০ সনের ১৩ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীনাথ রায় পটলডাঙ্গার রাস্তার মধ্যে গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন এমন সময় রাজার ঐ হিন্দুস্থানী লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, অপমান করে, এবং শেষে মুখবন্ধ করিয়া আন্দুলে লইয়া গিয়া তাহার শরীরে জল-বিছুটী লাগাইয়া ও নানা-রূপে অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে। এদিকে সম্পাদকের পক্ষে রাজার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করাইয়া তাহাকে ধৃত করাইতে চেষ্টা করিলে তিনি হাজির হইয়া জামিনে মুক্ত হইতে চাহিলেন। তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল না। সম্পাদকেরও কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

২০শে মার্চ্চ সম্পাদককে আদালতে হাজির করা হইল। রাজাও হাজার টাকা জরিমানা দিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের ইহার পর আর ভাস্করের সম্পাদকীয় আসনে উপবেশন করিবার সখ রহিল না। (Englishman 17th & 21st march 1840)

শ্রীনাথ করকে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া নিয়া আটক করিয়া রাখিলে "ভাস্করের" পরিচালকগণ "রসরাজ" সম্পাদক ভট্টাচার্য্যকেই "ভাস্করের" সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত (১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ) ভাস্করের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত ঝগরাটে লোক ছিলেন। তিনি "ভাস্করের" সম্পাদকীয় ভার লইতে না লইতেই এক বিপদে পড়িলেন। কাশিম বাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথ রায় ও তাঁহার পত্নী রাণী স্বর্ণময়ীর পক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত হইল। সারজন পিটার গ্রাণ্ট এই অভিযোগের বিচার করিয়াছিলেন। বিচারে আসামী গৌরীশঙ্কর দোষী প্রতিপন্ন হইয়া ৬মাসের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে ও পাঁচশত টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত মহারাজের বিরুদ্ধে কিছু লিখিবেন না বলিয়া তাঁহাকে এক হাজার টাকার জামিন দিতেও হইয়াছিল। এই মোকদ্দমা চলিত থাকা কালেই রাজা নরসিংহ রায়ও গৌরীশঙ্করের নামে ঐ আদালতেই আর একটি অভিযোগ আনয়ন করেন।

প্রথমোক্ত দণ্ডের কাল শেষ হইলে এই অভিযোগ গৃহীত হইবে বলিয়া অবধারিত হয়। (Bengal Herald 1843, 14 January) এই দ্বিতীয় অভিযোগের ফল কি হইয়াছিল, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই।

গৌরীশঙ্করেরও এক দল চেলা ছিল। তাঁহার কারাবাসের সময় তাঁহার সাহিত্য-শিষ্যেরাই "রসরাজ" পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

সংবাদ প্রভাকরের সহিত লড়াই করিবার জন্যই গৌরী শঙ্কর রসরাজ বাহির করিয়াছিলেন। রসরাজের রস ভদ্রলোকের উপভোগ্য ছিল না। লোকের অযথা নিন্দা ও অশ্লীল খেউর প্রচারই ছিল রসরাজেরকর্ম্ম।

ভাস্করে প্রথমে বেশ সুরুচিসঙ্গত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। "রসরাজের" সহিত "প্রভাকরের" সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেলে "প্রভাকর"-"ভাস্কর" উভয়ই পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকেন। তখনকার এই সকল রচনা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা নাসিকাকুঞ্চিত করত বাঙ্গালা রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন।

এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে "প্রভাকর" পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে বুঝিয়া, গুপ্তকবি রসরাজের সহিত দ্বন্দ্ব পাকাইয়া তুলিবার জন্য "পাষণ্ড পীড়ন" নামে আর একখানা অভিনব পত্রিকা বাহির করেন। তখন 'রসরাজ' ও 'পাষণ্ড-পীড়নে' যে উত্তর-প্রত্যুত্তর লিখিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া সেকালের একজন সুধী পাঠক লিখিয়াছেন—"সে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়াজনক উক্তি-প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য জগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না।"

"রসরাজ" ও "পাষণ্ডপীড়ন" সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে "প্রভাকর"ও "ভাস্কর"কে অশ্লীলতায় অধিক নিমজ্জিত হইতে দেখা যায় নাই!

গৌরীশঙ্কর অশ্লীলতা ও পরনিন্দা প্রচার করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একজন যথার্থ পণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্য করিতেন, এবং "সংবাদ কৌমুদী"তে লিখিতেন। ঐ সময় তিনি "সতীদাহ নিবারণ" পক্ষে রাজার মতানুবর্ত্তী ছিলেন! গবর্ণমেণ্ট হাউসে সতীদাহ সম্পর্কে যে পণ্ডিত-সভা হইয়াছিল, তাহাতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ জয়ী হন। সমাগত ইংরেজ মহিলারা তাঁহার হ্রস্ব আকৃতি দেখিয়া উপহাস করিলে, গবর্ণর জেনারেল বলিয়াছিলেন "যিনি স্ত্রীজাতির এত উপকারী ও সমর্থক তাঁহাকে উপহাস করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অন্যায়।" সেই জয় লাভ ও উপহাসের পর হইতেই তিনি দেহের হ্রস্বতা হেতু গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১২৬৪ সালের ২৪শে মাঘ গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়; তাহার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

১৮৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজকীয় কার্য্যালয় সমূহে দ্বিতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পে অল্পে দেশীয় জনগণের মনে হইতে লাগিল।

সে সময়ে বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম সমূহে দেশী ভাষা শিক্ষার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা উইলিয়ম এডামের রিপোর্ট পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন।

সুদূর মফঃস্বলে সে সময় বঙ্গভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবেশ না করিলেও রাজধানীতে ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং মিসনরিদিগের অবস্থিতিস্থান সমূহে তাঁহাদিগের চেষ্টায় লোকে বাঙ্গালা শিখিতে ও বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশ পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে কলিকাতার এই রাশি রাশি বাঙ্গালা পত্রিকারও দুই এক খানা সেই সেই স্থানে গৃহীত ও পঠিত হইত।

এই সমস্ত পাঠক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিল না। তাহার কারণ উচ্চশিক্ষিত ইংরেজী নবীশেরা তখন বাঙ্গালা ভাষা পড়িত না; সে ভাষায় যে পাঠ করিবার ও জানিবার কিছু আছে, তাহা বিশ্বাস করিত না।

এই সময় বঙ্গীয় সমাজের রুচি কবির টপ্পা ও খেয়ালের উপরই আবদ্ধ ছিল। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী, খেউর—সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সমাজের এইরূপ অবস্থায় কিরূপ ভাবে পত্রিকা চালাইলে অধিকাংশ লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া পত্রিকা পড়িবে এবং তাহাতে পত্রিকারও পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে ইহা যিনি না বুঝিয়া পত্রিকা চালাইতে অগ্রসর হইয়াছেন—পৈত্রিক অর্থের জোর না থাকিলে তিনি পত্রিকা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই জন্য "প্রভাকর" ও "ভাস্করের" পূর্ব্বে যতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল তাহার মধ্যে মিসনারিদিগের "সমাচার দর্পণ" রাজা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" ও রাজা রাধাকান্ত দেবের "সমাচার চন্দ্রিকা" ব্যতীত কোন পত্রই দীর্ঘজীবী হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত ও তদীয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই "প্রভাকর" ও "ভাস্কর," "রসরাজ" ও "পাষণ্ডপীড়নকে" সেই সাময়িক রুচির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহারা আমরণ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিকে জীবিত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন; সঙ্গতিও কিছু কিছু করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকা যে কেবল অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ থাকিত তাহা নহে। এই উভয় পত্রে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক লেখক ছিলেন—ইঁহাদের সকলের লেখাই যে কুরুচিপূর্ণ ছিল তাহাও নহে। এই পত্রিকাগুলিতে এবং সেকালের অন্যান্য পত্রিকায় উচ্চ নীতিকথাও যথেষ্ট থাকিত—তথাপি সেকালের শিক্ষিত লোক ও ইয়ংবেঙ্গলের দল বাঙ্গালা পত্রিকা অপাঠ্য বলিয়া ত্যাগ করিতেন। বাঙ্গালা "বুলি" মুখে আনা অসভ্যতা মনে করিতেন। তাহার কারণ সেকালের আদর্শ।

১৮১৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারী হিন্দু কালেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কালেজ স্থাপিত হইলেই সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাদিগের ছেলেদিগকে ইংরাজি শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার ফল সেকালে এই হইয়া ছিল যে, যুবকেরা যাহা কিছু ইংরেজের আচরণীয় তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইংরেজী কায়দায় চলা, ইংরেজী কায়দায় বলা, ইংরেজী ধরণে স্নান, ইংরেজী সুরে গান, ইংরেজের মত চাওয়া এবং টেবিলে বসিয়া খানা খাওয়া—এমন কি স্কুল কামাই করিয়া মদ্য পান করাও যুবকেরা সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অভ্যাস করিল।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই যুগের এক জন "এজু"। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"তখন হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্য পান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। * * আমি, ঈশ্বর ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কালেজের গোল দিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোল দিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবার কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমিও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শ শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কার্য্য মনে করিতাম।"

এই সময় বসু মহাশয়ের বয়স ছিল পনর, ষোল বৎসর মাত্র। এই বয়সে তিনি পাছে অপরিমিত মদ্যপায়ী হইয়া উঠেন, সেই জন্য রাজনারায়ণ বাবুর পিতা তাঁহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া বসিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মদ্য পান করিতেন।

স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ও সেকালের লোক ছিলেন। তিনিও তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরা পান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস ও দেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কি রূপে হইবে, আর কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে?"

ইংরেজের আচরণ অনুকরণ করাই তখনকার

সভ্যতার লক্ষণ ছিল। তাই সে কালের যুবকগণ দেশীয় প্রথা, দেশীয় ভাব, দেশীয় ধর্ম্ম, দেশীয় ভাষা—এমন কি পিতা মাতা আত্মীয় স্বগণকে দেশীয় ডাকা পর্য্যন্ত অসভ্যতা মনে করিতেন না।

এই রকম যখন দেশীয় যুবকগণের মনে সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে ব্যবস্থা সচিব মেকলে সাহেব তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে প্রচার করিলেন—

That a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.

মেকলের এই উক্তির আলোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বলা বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দু-কালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন বলিতে লাগিলেন যে, এক সেলফ্ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরব দেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন,. সেকস্পিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সমক্ষে বেদ-বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"

কেবল যে সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু কালেজের যুবকেরাই এইরূপ চাল অবলম্বন করিলেন, তাহা নহে, সংস্কৃত কালেজের পড়ুয়ারাও সময়ের গুণে দেশীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি। তিনি তখন সংস্কৃত কালেজে পড়িতেন, কিন্তু কোটপেন্ট্লন না পড়িয়া কোথাও যাইতেন না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার এই সময়ের মালদহ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"এক হস্তীর উপর রামগোপাল বাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটী হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেন্ট্লন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর ফর করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! দৃশ্যটী দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ৩৭ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গালার নবীন উদীয়মান যুবক দলের যখন মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তখন অপুষ্ট, অব্যক্ত ভাষায় লিখিত সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা—বিশেষতঃ প্রভাকর, ভাস্কর, রসরাজ ও পাষণ্ডদলনের খেউর কাব্যি যে তাহাদিগের ঘৃণার সামগ্রী হইবে তাহার কি আর কথা আছে?

ইহাদের সকলেই যে দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে। কাহারও কাহারও প্রাণে স্বদেশ হিতৈষণার ভাবও বিলক্ষণ ছিল। বাবু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাহার মধ্যে একজন। ইনি ও বাবু রসিক কৃষ্ণমল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে মিলিত হইয়া দেশী ভাষায় জ্ঞান সংগ্রহ ও দেশী সাহিত্যকে উন্নত করিতে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে এক খানা পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা কেহই বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন না সুতরাং "জ্ঞানান্বেষণ" ইংরেজী বাঙ্গালার দ্বিভাষিক রূপেই চলিতে লাগিল। "জ্ঞানান্বেষণের" নাম আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। ১৮৩১ সনে বাহির হইয়া "জ্ঞানেন্বেষণ" ১২। ১৩ বৎসর চলিয়াছিল।

"জ্ঞানান্বেষণ" উঠিয়া গেলে ইহারাই Bengal Spectator বাহির করেন; এখানাও ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিভাষিক ছিল। এই ইঙ্গ-বঙ্গ দল বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটীতে সাহিত্য সম্মিলনী সভা করিয়া মাতৃ ভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলে হিন্দু কালেজের অপর ছাত্র রসিক কৃষ্ণ "জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ" হিন্দুকালেজের আর কতিপয় যুবক "সর্ব্বরস রঞ্জিনী," ও হিন্দুকালেজের

পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র 'জ্ঞানোদয় পত্রিকা' বাহির করিয়া বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে অপরাপর ছাত্রদিগকে আহ্বান করেন। ইহার কিছু কাল পরে হিন্দু কালেজের ছাত্র সীতানাথ ঘোষ ও "জগদ্বন্ধু" পত্রিকা বাহির করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা যথা স্থানে উল্লেখ করিব।

মোট কথা, বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেরই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা পত্রিকার প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল। ঐ ভাব "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার প্রচারের পরে অনেকটা মন্দীভূত হইতে থাকে।

"সংবাদ ভাস্কর" ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" প্রচার-কালের মধ্যে উপর্য্যুক্ত Bengal Spectator, জ্ঞান-সিন্ধুতরঙ্গ, "সর্ব্বরস রঙ্গিনী" ও "জ্ঞানোদয়" ব্যতীত ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের "জ্ঞানদীপিকা" শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতবন্ধু", নীলকমল দাসের "ভৃঙ্গদূত", অক্ষয়কুমার দত্তের 'বিদ্যাদর্শন', শ্রীনারায়ণ রায়ের "অয়নবাদ দর্শন" প্রভৃতি আরও কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া লয় পাইয়া যায়। অতঃপর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" আবির্ভাবে বঙ্গ সাহিত্যে নূতনযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশীভাষাকে ঘৃণা না করিলেও দেশীয় পত্রিকার অপরিপুষ্ট ভাষা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন এই সকল লোক তাহার ভাষা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন রামতনু লাহিড়ীকে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ।" *

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। ২০০ পৃঃ।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাহির হইলে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তাহারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাহার চর্চ্চায় অধিক অগ্রসর হইলেন না; বরং ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাহার কারণ, বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইংরেজেরা পড়িতেন না, ইংরেজী প্রবন্ধ তাঁহারা পড়িতেন এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হইলে—লেখককে প্রচুর সম্মানিতও করিতেন। এইরূপ প্রলোভনের কএকটা কারণও তখন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্তি।

হিন্দুকালেজের 'এজু'দিগের মধ্যে কিশোরীচাঁদ ছিলেন একজন। তিনি ১৮৪২ অব্দের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় "রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হেলিডে সাহেব (পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) কিশোরীচাঁদকে ডাকাইয়া নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। এইরূপ ভাবী প্রলোভনে সেকালের "এজু"র দল প্রায় সকলেই ইংরেজী রচনার দিকে অধিকতর নিবিষ্টভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই উচ্চপদ লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা কোন চাকুরীর প্রত্যাশী ছিলেন না তাহারও সম্মান লাভের জন্য ইংরেজী লিখিয়া ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন; রাজনারায়ণ বসু তাঁহার অনুসরণ করিলেন, মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কবিতা লিখিতেছিলেন, এইবার "Captive Lady" লিখিতে আরম্ভ করিলেন; এই পরিবারের গোবিন্দ দত্ত "Cherry Blossom" ও শশী দত্ত "Vision of Sumeru" লিখিয়াছিলেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটীক সোসাইটীর জার্ণেলে ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ভোলানাথ চন্দ, রাজেন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বানার্জ্জি—সকলেই ইংরেজী লিখিতে লাগিলেন।

"তত্ত্ববোধিনীর" প্রচারের পর যখন ইহাদের ও কেহ কেহ অল্পে অল্পে আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা

করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গলাসাহিত্যের সে দুর্দ্দিন ক্রমেই অপসৃত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী বাহির হইলে হিন্দু সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের সভা সমিতিগুলি হইতে "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" "ধর্ম্মরাজ" "হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়" "হিন্দুবন্ধু" প্রভৃতি পত্র বাহির হইতে থাকে। এই সকল পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টসমাজ উভয় সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে, তখন খ্রীষ্টান মিশনারিদের পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড ডব্লিউস্মিথ "সত্যার্ণব," এম টাউনসেণ্ডের সত্যপ্রদীপ; রেভারেণ্ড জে ওয়েঙ্গারের "উপদেশক" "ইবেঞ্জিলিষ্ট" প্রভৃতি পত্রিকা বাহির করিয়া খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে থাকেন। মুশলমান সাহিত্যিকগণও বসিয়া রহিলেন না, তাহারা মৌলবী রজবালীকে সম্পাদক করিয়া "জগদ্দীপক ভাস্কর" বাহির করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, সমস্ত সমাজই যখন স্ব স্ব চিন্তা ও ভাব বঙ্গভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পে অল্পে ভাবপ্রকাশক হইয়া শক্তিশালী হইতে লাগিল।

এই দলাদলির সময়ই "পাষণ্ডপীড়ন, দুর্জ্জনদমন, মহানবমী, কাব্যরত্নাকর, ভৈরবদণ্ড, আক্কেল গুড়ুম, রসমুদ্গর, রসসাগর প্রভৃতি আরও কতকগুলি অভিনব পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রবন্ধনে কাষ্ঠ বিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় বঙ্গভাষার সাহায্য করিয়াছিল।

আধুনিক সুধীলেখকগণ আমাদের শেষোল্লিখিত পত্রিকাগুলিকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দর্শন করিয়াথাকেন। বাস্তবিক "প্রভাকর" "ভাস্কর" "রসরাজের" ন্যায় এগুলিরও অসংযত ও অশ্রাব্য ভাষা বাঙ্গালার নৈতিক বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে দূষীত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকাগুলিকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল অশ্লীল ও অশ্রাব্য লেখাদ্বারাও ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পক্ষে কোন সাহায্য হয় নাই।

অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথাকেও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সম্ভারের প্রয়োজন। শব্দ সমূহের মনোরম যোজনা সাহিত্যিক কলা কৌশল সাপেক্ষ। ঐ রূপ লেখা সমাজের অহিতকর হইলেও কোন নবীন সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট সাহায্যকারী। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও মদনমোহনের "বাসবদত্তাকে" নিতান্ত আবর্জ্জনার জিনিষ বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সকল বিষয়ই দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া বিচার করিতে হইবে। আর মনে রাখিতে হইবে "সুদৃশ্য রোম নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।" বাঙ্গালার "বঙ্গদর্শন" ও বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় সনন্দ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হয় নাই।

দলাদলি এবং খেউর চুটকীতেও সাহিত্য ভাব-প্রকাশক ও শক্তিশালী হয়; যে কোন জাতীর প্রাথমিক ভাষাও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্যপ্রচারের স্বাধীনতার ইতিহাস "অধ্যায়ে আমরা তৎসম্বন্ধীয় অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মিশনারীদিগের আক্রমণ হইতেই বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি, ব্রাহ্মসমাজের ও হিন্দুসমাজের দলাদলিতে তাহার পুষ্টি এবং ব্রাহ্মসমাজের আত্মকলহের পর সামাজিক দলাদলির শান্তি হইলে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই সময়ে আরও নানা বিষয়ে অনেক রকম দলাদলি চলিয়াছিল; তাহাতেও কতকগুলি সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। আন্দুল হইতে বাবু রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ কিরণ" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় কায়স্থ সমাজের সংস্কার ও উন্নতির সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব থাকিত; কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট এই সকল প্রবন্ধ

মনোমত না হওয়ায়, তিনি ১৮৪৮ সনে "মুক্তাবলী" নামে আর একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া "কায়স্থ কিরণে" প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদে ও শ্লেষকারীদিগের বিদ্রূপ রচনায় সাময়িক সাহিত্য কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাকরে গুপ্তকবি বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"যত ছুড়ীগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে।
আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে.
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

এই কঠোর বিদ্রূপের প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ সনে "সর্ব্বশুভকরী" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার ভাষা তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষাও উচ্চদরের হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় "সর্ব্বশুভকরি" সংবৎসর কালও জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে পারে নাই। ইহার পর ১৮৫৬ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করিলেও কয়েকখানা পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার ফলে সেকালে বিস্তর পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ও অপরাপর সমাজের দলাদলি চলিত থাকা কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া যে কয়খানা সাময়িক পত্র পরিচালিত হইয়াছিল, ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা বঙ্গসমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে "বিবিধার্থ সন্দর্ভ" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৫১ অব্দে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মাসিক পত্রিকাখানা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই বিবিধার্থ সংগ্রহের চিতাভস্ম হইতেই ১৮৬২ অব্দে "রহস্য সন্দর্ভ" উদ্ভূত হয়।

ইতোমধ্যে ১৮৫৩ অব্দ হইতে গুপ্তকবি প্রভাকরের একটা মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকরের প্রভায় ভবিষ্যৎ নবীন যুগের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ব্বাভাষ উষার অরুণ কিরণের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সময় বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষানবীশরূপে অবতীর্ণ হন। এই দলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন কবি দ্বারকানাথ অধিকারী।

প্রভাকরে বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল, দ্বারকানাথ তাহাতে সর্ব্বপ্রথম পুরস্কার লাভ করে। কুণ্ডীর তৎকালীন সাহিত্যপ্রিয় ভূম্যধিকারী ৺ কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী এই পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

হায়, দুর্ভাগ্য দ্বারকানাথ, তোমার নিকট পরাজিত বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর "দুর্গেশনন্দিনী" ও "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া তুমি অমর ধামে চলিয়া গেলে!

১৮৫৪ সনে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সুলেখক "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলিত হইয়া মাসিক পত্রিকা নামে একখানা কাগজ বাহির করেন। ইহাই ছিল প্রথম স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। ইহার অন্যূন দশ বৎসর পরে ১৮৬৩ সনে বর্ত্তমান সময়ের জীবিত মহিলা পাঠ্য "বামাপত্রিকা বোধিনী" বাহির হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে ১৮৫৫ সনে অদ্বৈতচরণ আঢ্য "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। এই পত্রিকায় মুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ লিখিতেন। কিছুদিন পরে ইঁহাদের আত্মকলহে পত্রিকাখানা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬০ সনে জগমোহন তর্কালঙ্কার "বিজ্ঞানকৌমুদী" নামে আর একখানা পৃথক পত্রিকা বাহির করেন।

১৮৬৩ সনে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের "বামাবোধিনী পত্রিকা" বাহির হইয়াছিল। ঐ সনেই কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী হইতে "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" ও ১৮৬৪ সনে বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চুচুড়া হইতে "শিক্ষাদর্পণ" মাসিক পত্র বাহির করেন। ভূদেবের "শিক্ষাদর্পণ" অধিক

দিন জীবিত থাকিতে পারে নাই, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এই সময় (১৮৬৪ অব্দে) ব্রাহ্মসমাজে প্রাথমিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উদার মতাবলম্বী দল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল সমাজ হইতে পৃথক হইয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন এবং সেই সমাজ হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মতত্ত্ব আজও জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে।

অতঃপর ১৮৬৭ সনে "নবপ্রবন্ধ" ও "অবোধবন্ধু," ১৮৬৮ সনে "অবকাশবন্ধু", "হিতসাধক" ও জ্ঞানরত্ন এবং ১৮৬৯ সনে খ্রীষ্টান মিসনারিদিগের "জ্যোতিরিঙ্গণ" প্রভৃতি বাহির হয়। এ গুলির মধ্যে "সারদামঙ্গল" প্রণেতাকে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'অবোধ-বন্ধু' ও প্যারীচরণ সরকারের "হিতসাধক" উল্লেখযোগ্য।

আমাদের উল্লেখিত মাসিক পত্রিকাগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমরা পশ্চাতে প্রদান করিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচিত সে কালের মাসিক পত্রিকা-গুলির মধ্যে মাত্র ৩ খানা পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে তিনখানার নাম (১) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" (২) "বামাবোধিনী পত্রিকা" ও (৩) "ধর্ম্মতত্ত্ব"। ১ম খানা ৭৯ বর্ষে, ২য় খানা ৫৩ বর্ষে ও তৃতীয়খানা ৫১ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

ইহার পর এক মধুর বসন্ত প্রভাতে নবীনযুগের আগমনের সাড়া পড়িয়া গেল। বঙ্গবাসী পুলকবিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন—

আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে "বঙ্গদর্শণ নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। সে পত্রের সম্পাদক হইবেন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লেখক হইবেন শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি।"

১২৭৮ সালের চৈত্রমাসে ভবানীপুরের মুদ্রাযন্ত্রে ব্রজমাধব বসু এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন "দুর্গেশ নন্দিনী" ও "নীলদর্পণ" বাঙ্গালা দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে—বাঙ্গালী বঙ্গদর্শণের সাদর সম্ভাষণের জন্য উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে নব-যুগের বার্ত্তা প্রদান করিতে যাইয়া আর আপনাদিগকে অধিকতর অধৈর্য্য করিয়া তুলিব না।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

প্রত্নতত্ত্ব-মাহাত্ম্য।

১। প্রত্নতত্ত্ব নব্য বাঙ্গলার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী, নবযুগের এক অমূল্য দান। বাঙ্গলার প্রত্নতত্ত্ব দ্বিজিহ্বতার লীলানির্ঝর, সুতরাং এক জিহ্বায় তাহার মহিমমণ্ডিত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক সম্প্রদায়ের পঞ্চমুখে যাহার অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টি, একমুখে তাহার গুণ ব্যাখ্যা কি কেহ করিতে পারে?

কতভাবে কতকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিয়া কখনও বা পুরাতন দীর্ঘি পুকুরের পঙ্কশয্যায় শায়িত থাকিয়া যে নিজের লিপিময় সত্তা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদের সেবার জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে সেটি কি যে সে পরার্থপর সে যে শক্তিধর, সে যে আদরের বস্তু! বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব বস্তুতঃই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু! বিবিধ ধাতুপ্রস্তর-খোদিত, অপরূপ বর্ণমালা শোভিত দেবতা কোন উপাসককেই একে বারে নিরাশ করেন না। অনুমানাতীত অতীতের বিলোপ কুক্ষিগত কঙ্কালে অতি অতি অতিতস্য অতিবৃদ্ধ পিতামহের শ্মশান ভস্মের স্বপ্নস্তূপে যে ভক্ত যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, এই মহাশক্তি-সম্পন্ন দেবতা তাহার কাছে সেই কল্পিত কঙ্কাল ও ভস্মে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা. জীবন যৌবন প্রভৃতি যোজনা করিয়া জীবন্ত ভাবে সেই মূর্ত্তিকে উপস্থাপিত করিতেছে। আজকাল বঙ্গ সাহিত্যের মন্দিরে এই দেবতার পূর্ণ আরাধনা, অখণ্ড আধিপত্য! সকাল সন্ধ্যায় সকলে ইহার পূজারতি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। আর সেই আরতির তুমুল শঙ্খ ঘণ্টা-রবে বাঙ্গলার দশদিক ধ্বনিত ও কম্পিত। যাহারা ইহার সেবায়েৎ বা পুরোহিত তাঁহারা এখন ধন্য, সফল-জন্মা!!

শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে সত্যনারায়ণ ঠাকুরকে অবজ্ঞা করাতে তাঁহার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে একজন মাত্র সওদাগরের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সপ্তডিঙ্গা সাগরে ডুবিয়াছিল। আবার তাঁহার কৃপাবলে ধনৈশ্বর্য্যসহ সেই, বাণিজ্য-তরীগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা এই প্রত্ন দেবতাকে আদর শ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই, যোড়শো-পচারে অর্চ্চনা করিতে অনভ্যস্ত, সমাজে তাহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা দুর্গতি উপস্থিত হইতেছে, ইহা বোধহয় কাহাকেও অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। এই দেবতার প্রকোপে পড়িয়া কত ব্যক্তি ও কত জাতির, পূর্ব্ব গৌরবের সপ্তডিঙ্গা যে চিরবিনাশ সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা ও সংবাদ কোনও পাঁচালী প্রবন্ধকার বা ঐতিহাসিক জন মণ্ডলীর নিকটে ধরিয়া দেখাইতেছে না। পক্ষান্তরে, ইহার অসামান্য কৃপায় বর্ত্তমান যুগের কত অজ্ঞাত-কুলশীল নূতন সওদাগর অযথা-রোপিত অপ্রকৃত অতুল পূর্ব্ব গৌরবের বিভব-পূর্ণ সহস্র ডিঙ্গা লইয়া সমাজ-বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে না কি?

দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াইত বাঙ্গলা সাহিত্যের বেওয়ারিশ ভবনে এই সত্য নারায়ণ ঠাকুরের এত প্রভাব, এত প্রতিপত্তি এত সেবা, এত উপাসনা। শনিঠাকুরের বড় পীড়ির ব্যবস্থা কি সাধে হইয়াছে? এই প্রভুর মাহাত্ম্য পড়াইত এক বল্লালকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া পাঁচের প্যাচে ফেলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কত এক কালিদাসকে খণ্ডশঃ বিভক্ত শত কালিদাসের খর্ব্বমূর্ত্তি করিবার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে। ইহার শক্তির কথা আর কি বলিব? সেদিনকার সাধক রামপ্রসাদের মাথার করাও পড়িতে বাকী রাখে নাই। তিন টুকরা করিবার জন্য সম্পূর্ণ অনুচিত উন্মাদপ্রসূত উদ্যোগ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে নাকি? অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই সুধু মানুষই যে ইহার দৌরাত্ম্যে দুর্দ্দশাগ্রস্থ, বা ইহার দয়ায় অভিনব সৌভাগ্যের অধিকারী হইতেছে তাহা নহে। নদী, নালা, খাল বিল, জেলা, মহকুমা এমনকি গোটা, পরগণা পর্য্যন্ত ইহার শুভাশুভ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই দয়াময়ী দেবতার দারুণ অভিসম্পাতে সেদিন যে ঢাকার চিরবিশ্রুত শ্রীবিক্রমপুর স্থাবর জঙ্গম প্রাণী অপ্রাণী বন, উপবন জল স্থল সহ গৌড়ের নিকটস্থ হইতে বাধ্য হইল, ইহা বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হন নাই।

কথায় বলে "দেবতা নষ্ট বাহনের দোষে"। প্রত্ন দেবতার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতেছে। অধিকাংশ বাহন বা সেবায়েৎই নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির কামনায় মিথ্যা কপটতার পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া "বোধ হয়" "মনে করি," "অনুমিত হয়," "বুঝি" "সম্ভবতঃ" প্রভৃতি কতগুলা অর্থ গন্ধহীন অশুচি-শব্দ-প্রসূনে পূজা করিয়া ইহার দেবত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃত পক্ষেই প্রত্ন এখন পেত্নীর রূপধারণ করিয়া পুরাতন পরিবারের ছাড়া জমি গুলিতে এক বিষম ভৌতিক বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আঙ্গিনায় এখন এমন কয়টি মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন ওঝা আছেন, যিনি বা যাহারা সত্য সত্যনিষ্ঠার উপরে দৃঢ়রূপে দাঁড়াইয়া পূর্ণ নির্ভীকতার সহিত প্রকৃত প্রমাণরূপ, রাম নাম উচ্চারণ করিয়া ইহার পেত্নীত্ব দূর করিতে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন? যে জাতি বা পরিবারে ইহার সেবায়েৎ যত কম সেই জাতি বা পরিবারে ইহার উপদ্রব উৎপাত তত অধিক।

সত্য কথা বলিতে কি যাঁহারা ঘৃণাভয়ে ইহার সেবা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, আজ হউক কাল হউক, নিশ্চয়ই তাহাদের কীর্তিময় অতীত গৌরবময় পুরাতন বাস্তুভিটায় বাস করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

অতীতবিভবসম্পন্ন বহু পুরাতন পরিবার নিজেদের পরিবার অতীত স্মৃতি রক্ষায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, যাহারা এক ভ্রান্ত ধারণার কোমল শয্যা শয়নে থাকিয়া এক অনুপম পূর্ব্ব গৌরব আবদ্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুখতৃপ্তির আরাধনা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না, অগৌণে প্রতিকার পন্থা অবলম্বন না করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে চিরাধিকৃত রাজ সৌধ পরিত্যাগ করিয়া উপহাসাস্পদ "অতীত হীন তরুতল আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইবে। ভবিষ্যতের দিকেইবা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কেন? প্রত্ন তত্ত্বের কৃপায় কত উদাসীন কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল পরিবার বা বংশ নিজস্ব হইতে বঞ্চিত এবং কত ভূঁইফোড় ব্যক্তি বা পরিবার সেই সম্পদের অধিকারী হইতেছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা কি ইহা দেখিতে পারিতেছেন না? যখন পারিবেন, তাঁহাদের ভবনে অসীম মান মর্য্যাদার রাশি লইয়া জাতীয় ইতিবৃত্তের সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিবে।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি যাঁহারা বংশ বা পরিবারগত গৌরবময় বৃক্ষের শাখা প্রশাখার বিস্তৃতি পরিপুষ্টি ও কিসলয় কুসুমের সৌন্দর্য্য সম্ভার দেখিয়া আত্ম-তৃপ্তিতে ডুবিয়া থাকিতেছেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যদি প্রত্ন-কুঠারাঘাতে মূল কর্ত্তিত হয়, তবে বৃক্ষের এই বৃদ্ধিপরিপুষ্টি কেহ শেষে সহস্র চেষ্টাতেও পূর্ব্বস্থানে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন? কে না জানেন মূলের শক্তিতেই সর্ব্বত্র সকলের বিকাশ।

উপসংহারে আবারও বলি প্রত্নের—বর্ত্তমান প্রত্নের প্রভাব সকলেই স্মরণ রাখিবেন, প্রত্নতত্ত্বের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমশঃই কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রত্নের কৃপায় যেমন এক ভাঙ্গিয়া অনেক, অনেক মিলিয়া এক হইতেছে তেমন আবার ইহারই ইঙ্গিতে ইহারই আদেশে রামের সম্পত্তি শ্যামের অধিকার-ভুক্ত হইতেছে, সুতরাং এই প্রকার অসামান্য শক্তিধর দেবতাকে অনাদর অবজ্ঞা করিতে নাই।

আজ প্রত্ন-মাহাত্ম্যের মুখবন্ধ মাত্র করিলাম। বারান্তরে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ইহার অপরূপত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রায়শ্চিত্ত

(গল্প)

চঞ্চল বিশালাক্ষির অচঞ্চল তীরে কণকপুর;—সেই কণকপুরে কমলাকান্ত একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। কমলের ষোল বিঘা জমি, একখানা হাল, একজোড়া বলদ এবং একটী দুগ্ধবতী গাভী ছাড়া ঘাটে একটী ছোট নৌকাও বাঁধা ছিল। প্রতিদিন প্রত্যুষে কিছু পান্তা ভাত খাইয়া কাঁধে লাঙ্গল ফেলিয়া গোশালা হইতে একজোড়া বলদ লইয়া "টক্ টক্, দুর অ" করিতে করিতে উহাদিগকে হাঁকাইয়া সে মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং সূর্য্যদেব ঠিক মাথার উপর না উঠিলে বাড়ী ফিরিত না।

দ্বিপ্রহরে মুখখানা জবাফুল করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী বলদগুলিকে গোঁয়ালে বাঁধিয়া স্বামীকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিত। তামাক খাওয়া শেষ করিয়া মাথায় একটু সরিষার তৈল ঘষিতে ঘষিতে কমল গামছা কাঁধে করিয়া নদীর ঘাটে আসিত এবং একবুক জলে নামিয়া 'মা গঙ্গা' বলিয়া একটা ডুব দিয়াই স্নান কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিত।

গৃহে ফিরিয়া আহারে বসিলে, পত্নী লঙ্কার প্রসাদে লাল টুক্‌টুকে রঙ মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে করিতে কত পুরাতন সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ করিত;—আজ যদি তার সেই ছেলে বাঁচিয়া থকিত—আজ যদি তার গোপাল;– একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসেই এখানে কথাটা শেষ করিয়া ফেলিত—তাহা হইলে কি কমলের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সহিতে হইত! পোড়া বিধি এত অবিচার তোমার এ গরীবের ঘরে!! কথায় কথায় অলঙ্কারের,—গহনাপত্রের কথা উঠিত। চিক্‌টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অবধি গলাটা একেবারে খালি। কি কুলক্ষণ! হাতের বাজুটা দুই দিকেই কি জানি কেন ফেকাশে হইয়া যাইতেছে! সেক্‌রা বেটা ভারি ঠগ্—সে নিশ্চয়ই ঠকাইয়া দিয়াছে। কমলের সাংসারিক জ্ঞান মোটেই নাই— সে পারে শুধু দিন ভরিয়া হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে ইত্যাদি।

খাওয়া শেষ করিয়া গোটা দুই শুপারি দিয়া একটা পান চিবাইতে চিবাইতে কমল ঘরের আঙ্গিনায় ছেঁড়া মাদুরের উপর কাঁথা বিছাইয়া শুইয়া পড়িত, এবং খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া এক ছিলিম তামাক টানিতে টানিতে গরু চড়াইবার জন্য পুনরায় বাহির হইয়া পড়িত। সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, "আমার জন্য কি এনেছ বাবা?" বলিয়া কন্যা ফুলমণি পিতাকে জড়াইয়া ধরিত। সে মধুর আহ্বানে কমলের সমস্ত দিবসের ক্লান্তি যেন ঘুচিয়া যাইত এবং কোন দিন পেয়ারা কোন দিন বা পেপেটা মেয়ের হাতে দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত।

হাত মুখ ধুইয়া শ্রীকৃষ্ণের শত নাম পড়িতে পড়িতে কমলের প্রায় প্রহর দুই রাত্র অতীত হইয়া যাইত, তারপর রেড়ীর তৈলের মিট্ মিটে আলোর সাম্‌নে বসিয়া বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুর করিয়া পড়িত। মেয়ে পিতার নিকট বসিয়া তাহাই শুনিত এবং পত্নীও এক কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া শুপারি কাটিতে বসিত। প্রতি হাট বারে সেই কাটা শুপারিগুলি বিক্রয় করিয়া কমল যে দুই পয়সা লাভ করিত তৈল লবণ প্রভৃতি খুচরা খরচটুকু তাহাতেই বেশ চলিয়া যাইত।

ফুলমণি যখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে পিতার কোলে ঢলিয়া পড়িত কমল তখন পড়া বন্ধ ফুলমণিকে লইয়া করিয়া আহারে বসিত এবং মোটা আউস ধান্যের এক থালা ভাত নিঃশেষ না করিয়া কখনই উঠিত না। তারপর মেয়ের নিকট সেই রাক্ষসের গল্প—রাজপুত্রের গল্প—পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প করিতে করিতে দরিদ্র কমল যে গভীর নিদ্রা লাভ করিত—সে নিদ্রা, সে গভীর সুষুপ্তি কুসুমকোমল শয়নে থাকিয়া লক্ষপতি ধনী কখন কল্পনাও করিতে পারে না।

এ সংসারে কমলের কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার সকলই ছিল—ছিল না শুধু একটী হৃদয়ের ধন,—পুত্র। পুত্রের অভাবে অন্তরের সমস্ত স্নেহরাশি কন্যার শিরে ঢালিয়া কৃষকদম্পতী বেশ সুখেই ছিল।

আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলিয়া কণকপুরের শ্যামল প্রান্তর ধৌত করিয়া অস্থির বিশালাক্ষি

ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই তীরে প্রকৃতি রাণীর মোহন-শয়নে রাশি রাশি কাশকুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। স্বর্ণাভ সানাল, রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়া, শ্যামল অশ্বথ প্রভৃতি কত শত তরু যথেচ্ছা দাঁড়াইয়া নৌকারোহীদের আসা যাওয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে। কত জন হাসিতে হাসিতে কত জন কাঁদিতে কাঁদিতে লতা-পাতাঘেরা, কণকপুর গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এক ফোঁটা ফুলমণি সময়ে অসময়ে তটিনী-তীরে বসিয়া থাকিত। বিশালাক্ষির বক্ষের উপর হাজার নৌকার ছুটাছুটি দেখিতে সে বুঝি বড়ই ভালবাসিত! কত তরণী "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে" গাহিতে গাহিতে পাল উড়াইয়া শিশুর বক্ষে প্রতিধ্বনি উঠাইয়া, আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া চলিয়া যাইত!

* * * *

এক দিনের কথা বলিতেছি। তখন অপরাহ্ন। পশ্চিম গগনে রবি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অশ্বথ তলের ছায়া বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিশালাক্ষির স্বচ্ছ সলিলে রবির কিরণ অজস্র মুক্তা ঢালিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে দক্ষিণের ওই কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের উপর একটা বৈশাখী মেঘ দেখা দিল—ধীরে ধীরে সে মেঘ সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ধরণী রবির কিরণে হাসিতেছিল সে ধরণী নিমিষ মধ্যে মলিন, বিবর্ণ হইয়া গেল। ঝড় উঠিল। বিশালাক্ষির চঞ্চল বক্ষ চঞ্চলতর হইয়া উঠিল। হাটে মাঠে, বাটে যে যেখানে ছিল আপন আপন গৃহে সকলেই ফিরিয়া আসিল।

গাভী ও বলদ দুইটীকে একটা ঘাস-বহুল জলাভূমে ছাড়িয়া দিয়া কমল "পাচনির" উপর বসিয়া তামাক টানিতেছিল, আর পার্শ্বের সবুজক্ষেত্রে মূক প্রাণীদের অন্যায় লোভ দেখিলে দুই একটা প্রিয় সম্বোধন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। সহসা প্রকৃতির এ রুদ্র মূর্ত্তি দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া সে বাড়ী ফিরিল। রান্নাঘরখানা বড়ই জীর্ণ—কমল ভাবিল পূর্ব্বহইতে একটু সাবধান না হইলে এবার আর তাকে খাড়া রাখা যাইবে না।

বাড়ী আসিয়াই শুনিল গৃহিণী বলিতেছে—"লক্ষীছাড়া মেয়েটা গ্যাল কোথায়! সারাদিন টু টু করে ঘুরে বেড়ায়, না মানে ঝড় না মানে বৃষ্টি! ইস্ কি ঝড়! এর ভেতরে মানুষ বের হয়!"

সত্য সত্যই ফুলমণি ঘরে ছিল না। পিতা ঊর্দ্ধশ্বাসে উৎকণ্ঠিত মনে কন্যার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার আশঙ্কাও বাস্তবে পরিণত হইয়া গেল। জীর্ণ গৃহখানা ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া কমল, অবশেষে বিশালাক্ষির তীরে উপস্থিত হইল। নিতান্ত বালিকা এই দুর্যোগেও এক তুচ্ছ তরণীর সঙ্গে বিশালাক্ষির পাগল জল রাশির লড়াই দেখিতেছিল। ত্রস্ত পদশব্দে চমকিত হইয়া ফুলমণি ফিরিয়া চাহিল। দেখিল পিতা আসিতেছে। 'বাবা! বাবা!' বলিয়া কন্যা পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। ক্ষুদ্র বাহুবিস্তার করিয়া বিপন্ন নৌকাটী দেখাইয়া দিল—বাক্যস্ফুরণ হইল না। হৃদয় বুঝিবা বলিতেছিল—"দেখ দেখ বাবা! ঐ বুঝি একটা নৌকা ডুবে যায়! ইস্ কি ভয়ানক!!"

মেয়েকে পাইয়া কমল আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু নদীতে যাহা দেখিল তাহাতে তা'র সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সে দেখিল ক্ষুদ্র একটী নৌকাকে গ্রাস করিবার জন্য বিশালাক্ষির বুভুক্ষু সলিল উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তরণীর আত্মরক্ষার্থ লক্ষ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতেছে। মাঝি কত চেষ্টা করিল—এদিক ওদিক কত দিকে হাল ঘুরাইল কিন্তু হায় সমস্তই নিষ্ফল চেষ্টা। নৌকায় নারীকণ্ঠের ক্রন্দন উঠিল—কেহই শুনিল না,—কেহই সাড়া দিল না। নিষ্ঠুর জল-প্রবাহ আপন উৎকট সাধ মিটাইয়া লইল।

নদী-তীর হইতে কমলের গৃহ অধিক দূর ছিল না। মেয়েটি নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। কমল একবার নৌকার প্রতি, একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিল। মুহূর্ত্ত দুই কি ভাবিয়া অমনি বিশালাক্ষির উচ্ছৃঙ্খল জলে লাফাইয়া পড়িল। নিতান্ত সহজভাবে স্ত্রীকন্যার একমাত্র রক্ষক কমল এমনই করিয়া মৃত্যুর হাতে জীবন অর্পিয়া

দিল। কন্যা শুনিল পিতা বলিতেছে—"ওই বাড়ী দেখা যায়—মা! তুই শীগ্‌গীর দৌড়ে চলে যা।"

উৎকণ্ঠিত মাতা গৃহে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। পলকে পলকে তা'র অন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছিল! এ ভীষণ ঝড়ে মেয়ে কোথায়! স্বামীই বা কোথায় রহিল—এখনও কেন ফিরিয়া আসিতেছে না। এ সকল প্রশ্ন তাহার হৃদয়ে তুফান তুলিয়া দিল। বাহিরে ঝড়—ভিতরেও ঝড়! অসহায়া রমণী অস্থির হইয়া পড়িল।

* * *

আকাশে ঘনঘটা—বিশালাক্ষির ভৈরবগর্জ্জন—চারিদিকে গভীর অন্ধকার,—এসমস্তই উপেক্ষা করিয়া কমল সাঁতার কাটিয়া ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দেখিয়া লইল একটী প্রৌঢ়া রমণী ক্ষুদ্র এক বালককে দুই হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া অমনি সলিল তলে নিমগ্ন হইয়া গেল। নিরাশার একটা হা হা রব উন্মত্ত বায়ুস্রোতে নাচিতে লাগিল।

বালকটী কমলের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রৌঢ়া সে মুহূর্ত্তেই ডুবিয়া গেল। নির্ম্মম জল-স্রোত কে জানে কোন্ অজ্ঞাত দেশে সে দেহ উপস্থিত করিল। ক্লান্ত কমল যখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তীরে পৌঁছিল বালক তখন অচৈতন্য।

মেয়ে ডাকিল "মা! ওমা!" অমনি জননী ছুটিয়া আসিল—দেখিল স্বামীও কন্যা উভয়েই দাঁড়াইয়া। ক্রোড়ে বালক দেখিয়া ভাবিল—এ আবার কি উৎপাত! জিজ্ঞাসা করিল 'এ কে গা?'

কমল এ প্রশ্ন কানে তুলিল না। কিংবা তুলিলেও উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। পত্নীকে কতটুকু লবণ্ আনিতে বলিয়া সে বালকের পা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে বালক সমস্ত জল উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। ঠোঁট নড়িয়া উঠিল—বক্ষ স্পন্দিত হইল—কি একটা কথাও কহিল। ধীরে ধীরে কমল তাহাকে ঘরে আনিয়া কাঁথা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল।

* * *

স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রভাত রবির কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহার এ শিশুর মত নিতান্ত শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে পূর্ব্ব রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়াছিল—কে বলিবে সে ঝড় তটিনীর বুক প্রাণী হত্যাপাপে কলুষিত করিয়াছিল। যাক,—কমল সে প্রভাতে আর মাঠে গেল না। কি করিয়া যাইবে?

দুর্ভাগ্য বালক তখন উঠিয়া বসিয়াছে। বিস্ময়-নয়নে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং পাংশু চক্ষু আরক্ত ও চঞ্চল। কমল জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তোমার নাম কি?" বালক কহিল "আমার নাম মাণিক।" তা'র পর কমল বালকের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল "তার নাম মানুকের বাপ্।" অবোধ বালকের এই উত্তর কমলের হৃদয়ে বড়ই বাজিল।

অপরিচিত স্থানে অপরিচিত বিপন্ন বালক, মা-বাবা-ঠান্‌দিদি একে একে সকলের নাম করিয়াই কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন, সে বিলাপ সকলেরই চিত্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল,—ক্ষুদ্র বালিকা ফুলমণির বুকে বুঝি অত্যন্তই আঘাত করিল। মাণিক ও ফুলমণির অবিরল অশ্রু বন্যার জলের মত উচ্ছ্বসিত বেগে ছুটিয়া চলিল।

এটা সেটা খাইতে দিয়া—এটা ওটা দেখাইয়া তাহার পিতা অবিলম্বেই তা'কে নিতে আসিবে এই আশ্বাস দিয়া আকুল বালককে শান্ত করিতে কমল যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু হায়! মাণিকের চিত্ত এ অলীক আশ্বাসে প্রবোধ মানিল না। বর্ষার দিনের মত মুখখানা তা'র কেবলি মলিন—কেবলি বিষন্ন। মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা রৌদ্রের মত আশার আশায় নিমিষের জন্য প্রফুল্ল মাত্র।

লক্ষ চেষ্টা করিয়াও কমল বালকের উল্লেখযোগ্য, তেমন কোন পরিচয় পাইল না। অসংলগ্ন কথা হইতে সে ইহাই শুধু বুঝিতে পারিল যে, বালক দিন দুই হয় তা'র ঠাকুর মা ও এক মাতুলের সঙ্গে বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিল। কমলের শত অনুসন্ধান বুঝি ব্যর্থই হইল!!

কথায় কথায় একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা

মানিক্! বল্ ত তোর বাবা আমার চাইতে বড় না ছোট?" "তোমার চাইতে বাবাকে বড় দেখায়।" বলিতে বলিতে বালকের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। একটা উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুহিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া ঘরটাকে বিষাদময় করিয়া তুলিল। কমল নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া অন্য কথা পাড়িল, বলিল "বেশ মাণিক! তাহ'লে আমি যে তোর কাকা—ফুলমণি তোর বোন।" হাঁ বলিয়া বালক ছুটিয়া গেল।

ঘরের আঙ্গিনায় ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে মাণিক ও ফুলমণির সঙ্গে কমল, গল্প করিতেছিল। কি একটা কথায়, মাণিক বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা কাকা! তুমি আমায় বাড়ী ফিরে দিয়ে এলে না?" বালকের পিঠ চাপড়াইয়া কমল কহিল—"কেন কাকা! এখানে তোমার মন মিশে না?" মাণিক কতক্ষণ কোন কথাই বলিল না। তা'র পর—"মার জন্যে বড় কষ্ট হয় কাকা! মা এখন আমায় কত মনে করছেন!!"—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হায় মাণিক আজও মার কথা ভুলিতে পার নাই।

কমল মাণিককে কোলে টানিয়া আনিল। "এবার তো'কে ঠিক মার কোলে পৌঁছে দেব। আচ্ছা! তোর বাড়ীর পরিচয়টাত একবারও ভাল করে দিলে না কাকা!"—বলিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

মাণিক বলিল—"কেন! তোমায় ত বলেইচি কাকা আমাদের বাড়ী পশ্চিম পাড়া—মিনিদের বাড়ীর ঠিক সামনে। বাড়ীতে দু'খানা বড় দু'চালা ঘর—একটায় বাবা, মা ও আমি থাকি—আর একটায় ঠান্‌দিদি থাকেন। তা'র কাছে সন্ধ্যে বেলা আমি কত রাক্ষসের—ভূত ভূতের গল্প কত দেশের কথা শুনি। তা'ছাড়া যে গোলা-ঘরটা, তার ঠিক্ পেছন দিকে মস্ত একটা সাজনা গাছ আছে। সন্ধ্যের পর আমি কখনও সে গাছ তলে যাই না। ইস্! মা বলেচেন সে গাছে একটা ভূত থাকে।" ভূতের নাম শুনিয়া বালিকার গা শিহরিয়া উঠিল। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! সে ভূতটাকে তুমি কখনও দেখেছ দাদা?" মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মিনি এক দিন রাত করে সে গাছতলা দিয়ে আসছিল—আর অমনি সে ভূতটাকে দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ল—সে অবধি সন্ধ্যায় সেদিকে যাইতে মা আমায় মানা করে দিয়েচেন।"

* * *

দিনের পর দিন করিয়া কত দিন চলিয়া গেল। জগতের চির-প্রচলিত নিয়মে মাণিকের শোক-বেগ একটু বুঝি প্রশমিত হইল। স্নেহাতুর কমলের অসীম বাৎসল্য ও বালিকা ফুলমণির অকপট সারল্যে বালকের নয়ন-জল অনেকটা বুঝি মুছিয়া গেল। যে গৃহের উজ্জ্বল স্মৃতি তাহার হৃদয়ে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল আজ এতদিনে তাহা ম্লান হইতে চলিল।

বালকের হৃদয় হইতে গৃহের নমনীয় স্মৃতিটুকু অনেকাংশে যে মলিন হইয়া গেল বালিকা ফুলমণিই সে জন্য অনেকটা দায়ী। মানিক ও ফুলমণি,—সে যেন সত্য সত্যই একমার পেটেরই ভাই বোন। একই বৃন্তে যেন দুইটী ফুল। দু'জনে একই সঙ্গে একই খেলা খেলিত—একই সময়ে একই স্থানে গরু চরাইত—বিশালাক্ষির তীরে বসিয়া বসিয়া একই সময়ে নৌকা-গুণিত। ঝগড়া যে হইত না এমন বলিতেছি না। দাদা হয়ত বলিল, "দ্যাখ ফুলি ঐ কত বড় একটা নৌকা পাল তুলে যাচ্ছে! আজকের দিনে এত বড় নৌকা আর কক্ষনো যায় নি।" "ইস্!" বলিয়া বোন দাদার [illegible] মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। [illegible]ন ছোট খাট কারণে ছোট ছোট কলহ প্রায়ই হইত কিন্তু সে কলহে, তাহাদের হৃদয়ের বন্ধন এতটুকু শিথিল না হইয়া বরং উল্টাই হইত।

* * *

দুর্ভাগ্য মাণিককে সকলেই ভালবাসিত,—বাসিত না শুধু একটী প্রাণী—সে কমলের পত্নী ফুলমণির মা। কমল তাকে ঠিক নিজের ছেলের মত করিয়া দেখিত,—বুঝি সত্য সত্যই অত্যন্ত স্নেহ করিত;—আর তার গৃহিণী সে মানিককে বিষতুল্য জ্ঞান করিত,—মাণিক ছিল তার দু'চোখের বালি। পরের ছেলে সংসারে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া অন্ন ধ্বংস করিবে, আর তা'র পুত্রাকাঙ্ক্ষিত

হৃদয়কে তাহারই,—সেই কুড়ান ছেলেরই—সহস্র আব-দার অকাতরে সহ্য করিতে হইবে। ইহা হইতেই পারে না—অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে দিন দুরন্ত বিসূচিকা কণকপুরে বিজয়নিশান উড়াইয়া ক্ষুদ্র মাণিককে আক্রমণ করিল মা মেয়েকে সে দিন সাবধান করিয়া দিলেন,—"ও ঘরে যাস্ ত আমার মাথার দিব্বি রইল।" কিন্তু হায়! মেয়ে কি মার সে কথা শুনিল? সে কত বার মাতার আদেশ অমান্য করিয়া কমলের সঙ্গে সে ঘরে গেল! জননী ভাবিল—নিজের পেটের মেয়ে সেও আজ অবাধ্য!! যে কারণেই হউক কমল-গৃহিণী, কাঙ্গাল মাণিককে কখনও তাহার স্নেহের অঞ্চলে স্থান দিতে পারিত না।

*   *   *

বালক কণ্ঠে —"প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া
'ননী দে' বলিয়া কাঁদে
নাহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী,
ঠেকিলা বিষম ফাঁদে।"

গাহিতে গাহিতে মাণিক গরু চরাইতেছিল। "ওই পেয়ারাটা আমায় পেড়ে দাও দাদা!" বলিতে বলিতে ফুলমণি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। বালক দেখিল সত্য সত্যই গাছে একটা পেয়ারা ঝুলিতেছে। গাছে উঠিয়া মাণিক পেয়ারা পাড়িল, কিন্তু যেমন অদৃষ্ট; সঙ্গে সঙ্গে 'মা—গো—মা! বলিয়া নিজেও পড়িয়া গেল। পা কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বোন্ কাপড়ের অঞ্চল ছিঁড়িয়া দাদার পা বাঁধিয়া দিল। "নূতন শাড়ীটা ছিঁড়ে ফেল্লি?" বলিয়া মাণিক চেঁচাইয়া উঠিল।

ভাই বোন্ দু'জনেই গৃহে ফিরিল। কি একটা কাজে মা ডাকিলেন—"ফুলি।" "কি মা?" বলিয়া ফুলমণি মাতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বনাশ! মা দেখিলেন মেয়ের নূতন 'শাড়ী'টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"একি! এটা না সেদিন হাট থেকে এনে দিয়েচে?"

"হাঁ মা। এই দেখ না দাদার পা টা, ইস্! কি ভয়ানক কেটে গেছল—ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিল। আমি কচু পাতায় করে জল এনে, নেক্‌ড়া ছিল না কি না তাই—" কন্যার কথা শেষ হইল না; মাতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তাই,—তাই আপনি ছিঁড়ে তার পা বেঁধে দিলেন! ইস্! কি আমার ভক্তি রে! দস্যি! পোড়ার মুখী মেয়ে!" ভীমবেগে ঝড় বহিয়া গেল। সে ঝড় হইতে দুর্ভাগা মাণিক ও রক্ষা পাইল না। গৃহিণীর অবিরল তীক্ষ্ণধার বাক্যবাণ ক্ষুদ্র বালকের অন্তস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিল।

আজ অনেক দিনের পর মাণিকের সেই কলাগাছ-ঘেরা বাড়ীটার কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই মা—সেই খেলার ঘর—সেই পেয়ারা গাছ—সে সমস্তই মানিকের স্মৃতিপটে রঙ্গিন,—উজ্জলতর হইয়া উঠিল। মাণিক "মা! মা" করিয়া কত কাঁদিল। হতভাগ্য বালক! যদি চক্ষু থাকিত তবে দেখিতে পাইতে, আজ তুমি যাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল,—অস্থির হইতেছ তোমারই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও বক্ষ নিশি-দিন অশ্রু-সলিলে ভাসিয়া যাইতেছে। যে জ্বালা—যে তীব্র বেদনা তাঁহার হৃদয়ে; বালক,—তুমি তার কি বুঝিবে? মাণিক! সেই যে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, মা'র কোল ছাড়িয়া ঠাকুর মার সঙ্গে চলিয়া আসিলে,—কই! আরত সে স্নেহ-সিঞ্চিত বুকে ফিরিয়া গেলে না!!

দ্বিপ্রহরে কমল বাড়ী আসিয়া বলদ দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল মেয়ে ও মাণিক উভয়েই কাঁদিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গৃহিণীর গলা বাজিয়া উঠিল,—"কে জানে কেন ওরা কাঁদ্‌ছে। কোত্থেকে এক হতভাগা ছোঁড়া কুড়িয়ে এনেচ—তার উপর আবার আহ্লাদ দিতে দিতে এমন করেছ যে টু শব্দটী করবার যো নেই।" "কি হয়েছে বল না?"

"কি আর হবে! এই যে সেদিন হাট থেকে মেয়েকে নূতন 'শাড়ী'খানা এনে দিয়েচ তা ইচ্ছে করে শুধুশুধি ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি বল্লুম কি যে গরীবের ঘর একটু হুসিয়ার হয়ে চলতে হয়—এতেই ওদের, বাপ্‌রে বাপ্! কি কান্না—" "না বাবা! মা দাদাকে খুব বকেছে।" ফুলমণি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং

তাহারা যে নির্দ্দোষ সেই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টার কোনই ত্রুটী করিল না।

সেইদিন স্বামী-স্ত্রীতে একটু বেশ মানোমালিন্ত হইয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পর প্রতিবেশী কৃষ্ণকান্তের যোড়শ বর্ষীয় পুত্র রামধন কমলের বাড়ী আসিয়া রামপুরের বৃহৎ মেলার কথা ঘোষণা করিয়া গেল।

রামপুর কণকপুর হইতে প্রায় একদিনের পথ। এ বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে সেখানে বেশ জমকাল রকমের এক মেলা বসিবে গ্রামের জমিদার মহাশয় ইহাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

রামধন ফুলমণির মাকে কাকী মা বলিয়া ডাকিত। কাকী মা তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি আলাপ করিল। "আচ্ছা এবারেই দেখা যাবে তুই কেমন সেয়ানা। লোকে বলে রামধন খুব চালাক চতুর ছেলে।" বলিতে বলিতে কথাটা অবশেষে শেষ করিয়া ফেলিল। উত্তেজিত অপরিণতবয়স্ক বালক "এ আর একটা কি শক্ত কাজ কাকী মা।" বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

* * *

সন্ধ্যার অন্ধকারে রামধন রামপুরের মেলা হইতে একা একা ফিরিয়া আসিল। কমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি-রে রামা! এখন একা এলি যে? আমাদের মাণকে না তোর সঙ্গে গিয়েছিল?"

"হাঁ গিয়েছিল ত' কিন্তু যা ভেবেছিনুম তাই হয়েছে—আমি তা'কে নিতে চাইনুম না—বল্লুম—না রে না মাণিক! ছেলে মানুষ তুই, অত বড় মেলা যদি হারিয়ে যাস্! তবু সে জেদই করলে বল্লে কি না তা'কে নিতেই হবে।"

"ইস্!" বলিয়া ফুলমণি গর্জ্জিয়া উঠিল, "দাদা বুঝি যেতে চেয়েছিল?—তুমি ত জোর করে নিলে—বল্লে কত বড় মেলা! কত খেলনা আসবে। কত তামাসা হবে।"

নির্ব্বুদ্ধি রামধন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চক্ষু—কর্ণ—সমস্ত দেহই তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে কথা কহিল না সত্য, কিন্তু তাহার বিশ্বাসঘাতক আরক্ত কর্ণ ও চঞ্চল ভীতি-বিহ্বল নয়ন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিল।

"কি করলি!" বলিয়া ত্রস্ত কমলাকান্ত সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া চলিল। স্বপ্নাতীত বিপদে অসহায়া ফুলমণি অস্থির হইয়া পড়িল। আজ কি করিয়া সে তাহার চঞ্চল চিত্তকে সান্ত্বনা দিবে। আশৈশব যে মাণিকের সহিত সে একত্র খেলিয়াছে—একত্র খাইয়াছে একত্র গল্প করিয়াছে—একই বৃন্তে দুইটী কুসুমের মত সর্ব্ব সময়েই একত্র রহিয়াছে আজ তাহাকে ভুলিয়া সেই ফুলমণি কি করিয়া একা একা নিঃসঙ্গ নূতন খেলার ঘর নির্ম্মাণ করিতে বসিবে!!

শরতের মেঘের মত গম্ভীর কমলাকান্ত—ক্ষুব্ধ চিত্তে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল কেহ তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না—করিতে সাহসও পাইল না। একবার শুধু ফুলমণি "দাদা কেন এল না—তাকে কোথায় রেখে এলে?" বলিয়া পিতার কাছে ঘেসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু অপ্রত্যাশিত উত্তরে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। পিতা ও দুহিতা উভয়েই ভাবিল এ দুঃখ,—এ আঘাত কখনও ভুলিবার নহে।

দিন কিন্তু কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। "ছেলে-টাকে বাঁচাইয়াও বাঁচাইতে পারিলাম না" বলিয়া যদিও কমলাকান্ত কখন মাঝে মাঝে দুঃখ করিত, দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে যদিও ফুলমণির নয়ন-কুসুম অশ্রু শিশিরে ভরিয়া যাইত তথাপি তাহাদের দিন বসিয়া রহিল না—সুখে দুঃখে একরকম করিয়া কাটিয়া গেলই গেল। যে যাতনা তাহারা অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিল—যে ঘটনা চিরদিন তাহাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল দেদীপ্যমান হইয়া রহিবে ভাবিয়াছিল, কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই যাতনাই আজ সহনীয় হইল—সেই ঘটনাই আজ স্মৃতির রঙ্গিন পত্রে মলিন হইয়া গেল।

একটী প্রাণী আজিও শুধু মাণিককে এতটুকু ভুলিতে পারিল না। আজিও মাণিক তাহার স্মৃতির মন্দিরে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিল। যেদিন অপরিণত বয়স্ক যোড়ষবর্ষীয় বালক মেলা হইতে একা

একা ফিরিয়া আসিল—সেই দিন কমল-গৃহিনীর সুখ-দুঃখময় জীবনের এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতেই অভাগিনী, হৃদয়ে শান্তি—বিশ্রামে সুখ—কার্য্যে উৎসাহ সমস্তই হারাইল। হায় সে যে ঘোর পাতকিনী!! শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বক্ষণে পাপাগ্নি, হৃদয়ে তাহার কেবলি ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। উঃ! সে কি ভীষণ জ্বালা! নিরাশ্রয় বালক কি এমন অপরাধ করিয়াছিল? কি এমন অনিষ্ট করিয়াছিল? যে এমনই করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে? মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় গৃহিণী যে হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছিল তাহারই পানে আজ জীবন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া ছাই হইতে লাগিল।

* * *

বিজয় নগরের গোবিন্দচরণ একটা লাঙ্গলের ফাল 'মূল' করিতেছিল। জিনিষটা তাহার পছন্দ হইয়াছিল সত্য কিন্তু ফালওয়ালা বড় 'বেয়াড়া'। উচিত মূল্য হইতে অনেক অধিক চাহিল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল—

"না গো ম'শায় না, দু'টাকার কমে এটা কখ্‌খনো দিতে পারব না।" "পৌণে দু'টাকায় হয়ত দাও। দেখতে পাচ্ছনা এটা কত হাল্‌কা। 'টুপ্‌ টুপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে বেচলেইত তোমার লাভ—দাও, দাও; এই নাও টাকা নগদ দিচ্ছি।"

"না না রেখে দিন ম'শায় টাকা। পৌণে দু'টাকা!!! বাবা! সারাদিন বসে থাকলেও ওদামে দিচ্ছি নে; চিনি ত নই যে জলে গলে যাব।"

অনেক তর্কের পর গোবিন্দচরণ পৌণে দুটাকার উপর আর এক আনা বাড়াইয়া 'মূল,' করিতেছিল ততক্ষণ একটি পরিত্যক্ত পথহারা বালক তাহার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছিল। গোবিন্দ ভিড় ঠেলিয়া রাস্তায় আসিল। আর অমনি সে বালক সকল তাহার কোলে লাফাইয়া পড়িল। গোবিন্দ চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। কি দেখিল? নয়ন! তোমায় সকল সময় বিশ্বাস করা যায় কি? যায়। তাহা না হইলে গোবিন্দচরণ 'মাণিক্‌! মাণিক!' বলিতে বলিতে তাহার বক্ষের মাণিককে বাড়ী লইয়া গেল কেন?

মাতা দুই হাতে চাঁদ ধরিলেন। জননী ও পুত্রের নয়ন-সলিল-গঙ্গা যমুনার পবিত্র ধারার মত দুই কূল উচ্ছ্বসিত করিয়া ছুটিয়া চলিল।

মাণিক বুঝিতেই পারিল না রামধন তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিল কেন—আগেই বা চলিয়া গেল কেন। পিতা বলিলেন 'সাপে বর'। মাণিক কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিল না। অর্থ যাহাই হউক না কেন সে কমল ও তাহার ছোট বোনটিকে অতি সহজে ভুলিতে পারিল না। কমল যে তাহাকে বড়ই ভালবাসিত—ফুলমণির দাদা ডাক যে তাহার বড়ই ভাল লাগিত। আর তার কাকী মা? সে কি মাণিককে এতটুকুও স্নেহ করিত না! একদিন মাণিক মার কোলে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল,—সে যেন পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িতেছে—হঠাৎ পা ফস্‌কাইয়া কাটাক্ষেতে পড়িয়া গেল—যেমনি পড়িল অমনি পা কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—ফুলমণি শাড়ী ছিঁড়িয়া কচুপাতা করিয়া জল আনিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল—রক্ত থামিয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া আসিলে শাড়ী ছেঁড়া দেখিয়া, কাকীমা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিল। চমকিত হইয়া মাণিক চক্ষু মেলিল—দেখিল সে জননীর স্নেহের অঙ্কেই শুইয়া আছে—কোথায় বা সেই ফুলমণি! কোথায়ই বা তার মা'! স্বপ্ন যে যথার্থই স্বপ্ন।

মাণিকের মা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার হৃদয়ের মাণিককে আবার ফিরিয়া পাইবে;—আবার তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে;—আবার মাণিক মা! মা! ডাকিয়া তাহার হৃদয়কে-স্নেহ বিহ্বল করিয়া দিবে। যে তরু শীতের প্রকোপে স্খলিতপত্র হইয়াছিল শীতের সেই তরুই আবার মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। অদৃষ্টে থাকিলে কি না হয়? অথবা শীত আসিলে বসন্ত আসিবে না কেন?

* * *

বৎসর দুই অতীত হইয়া গিয়াছে। মাণিক তাহার আপনার সংসার বুঝিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধ গোবিন্দচরণ

জগদীশপুর গ্রামে একটী 'লক্ষ্মীযুক্ত' কন্যার সঙ্গে আপনার হারানিধির পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই শুভ কার্য্যে মাণিক তা'র কমল কাকাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনা করিল। পিতা পুত্রের অভিপ্রায় জানিয়া কমলের উদ্দেশ্যে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে মাণিক একবার তা'র কাকার সন্ধান লইয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এবার সে বড় আশা করিয়া রহিল,—কাকা কি এ সংবাদ শুনিয়াও আসিবে না?

তিন দিন পরে লোক ফিরিয়া আসিল। মাণিক ব্যগ্র হইয়া কাকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু হায় যেমন অদৃষ্ট—মাণিক শুনিল তাহার স্নেহের কাকা আর এ জগতে নাই—বিসূচিকায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। আরও শুনিল কণকপুর বিশালাক্ষির উচ্ছৃঙ্খল গর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাণিকের পিতা এসংবাদে নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। হায়! তাহার জন্যইত মাণিকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। গোবিন্দ ভক্তিনম্র শিরে তাহার প্রাণপ্রিয় পুত্রের জীবনরক্ষক মৃত মহাত্মার উদ্দেশে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

মাণিকের হৃদয়ে এই নিদারুণ সংবাদ নিতান্তই বাজিল। হায়! মাণিক একটু সেবাও করিতে পারিল না। যে বিসূচিকায় কমল এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেল—মনে পড়ে সেই দিন সেও এই রোগেই শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছিল, আর তাহার কাকাই ত অবিশ্রান্ত অক্লান্ত সেবা করিয়া মাণিককে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল। আজ যদি কমল বাঁচিয়া থাকিত, মাণিক শুধু এই কথাই ভাবিয়া মনকে ব্যথিত করিতেছিল। জীবনের স্বপ্নময় এই শুভ মুহূর্ত্তেও হৃদয়ে তাহার শুধুই অন্ধকারের আধিপত্য হইল।

জগদীশপুর গ্রামে আনন্দের বাঁশী বাজিয়া উৎসবময় গৃহ মাতাইয়া তুলিল। এ বাড়ীর সে বাড়ীর বহুলোক বর দেখিতে ব্যস্ত হৃদয়ে ছুটিয়া আসিল। মাণিক ব্যতিরেকে সেখানে আজ বুঝি সকলেই সুখী!!

* * *

চারি চক্ষের মিলন হইলে মাণিক চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! এ যে ফুলমণি!!!" অন্তঃপুর হইতে কে ছুটিয়া আসিয়া মাণিককে কোলে তুলিয়া নিল—আবেগভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—"তুই মাণিক!!! বিধাতা! এতদিনে বুঝি মেয়ের প্রায়শ্চিত্তের শেষ!" সমস্ত লোক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীচারুভূষণ দেব।

VOL. 6. No. 2.

MAY, 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT HIS OWN

npartial verdict comes from the … lic and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Raad, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, M.A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" J. G. Cumming, C. S. I.
" F. C. French Esq., I.C.S.
" W. A. Seaton Esq., I. C. S.
" R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
" Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Eirminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C,S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
" Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M.A.
" W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
" T. T. Williams M.A., B.Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M.A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Babadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan,
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
" Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
, Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Jaladhar Sen.
, Jagadananda Roy
" Benoy Kumar Sircar.
, Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

An Eighteenth Century Bengali Manuscript ...	Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon)	39
Milton's Message	Rev. Harold Bridges, B.D.	55
Dacca Forty Years Ago ...	... ...	66
Heaven and Hell	Baharuddin Ahmed	75

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	প্রাচীন চতুষ্পাঠীর শিক্ষা	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ বিদ্যানিধি ...	৩৫
২।	কবিতার প্রাণ (২)	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৮
৩।	বর্ষ আবাহন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৪৫
৪।	মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান ...	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর	৪৫
৫।	উত্তরাপথ ভ্রমণ	শ্রীযুক্ত ভবঘুরে	৪৯
৬।	বঙ্গের কুলবধূ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	৫৬
৭।	ফুল-শয্যা (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশ গুপ্ত	৫৭
৮।	গায়ক পাখী	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬২
৯।	বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বিএ বিটি ...	৬৪
১০।	উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার ঘোষ এম্, এ ...	৭০

THE DACCA REVIEW.

VOL VI. MAY, 1916. No. 2.

AN EIGHTEENTH CENTURY BENGALI MANUSCRIPT.

At this crisis in the history of the human race, when the powers of darkness and of evil are drawn up in proud array against the forces of right and justice; when civilisation itself is on its trial, and all that we hold dear is at stake; at this terrible crisis when one of the great European Continental powers has forgotten that she still professes to believe in the teachings of a Book which is mightier than swords and bloated armaments and which preaches the lesson that it is righteousness which exalteth a nation, in one of my waking dreams I was led to think of an old mutilated Bengali manuscript which came to our notice from a remote district in Eastern Bengal. Curiously enough, the manuscript was one of the literary exhibits at a public exhibition held in the District of Mymensingh in 1904. It was exhibited by the author of a history of Mymensingh—Babu Kedarnath Majumdar. It has since been published in the journal of the Bangiya Sahitya Parishad, the Bengal Academy of Letters, the importance of whose contributions to the promotion of research and scholarship in these provinces can hardly be exaggerated. The activities of this Academy in the direction of the preservation and publication of old and hitherto forgotten vernacular manuscripts under the supervision of competent scholars equipped with the necessary philological and historical knowledge have recently attracted the sympathetic notice of the statesman who now presides over the destinies of Bengal. If my feeble words can in any way help to awaken a general interest among our graduates and undergraduates in the work of the zealous band of enthusiastic scholars gathered round this Academy, I shall not have spoken in vain.

The manuscript contains the first canto of an Epic poem entitled 'the "Maharastra Purana," or the defeat and death of Bhaskar Pandit, and thus deals

with the irruption of the Mahrattas into Bengal, the incidents connected with which led to the adoption of a number of precautionary measures by the English for the safety and defence of their settlement in Calcutta. One of these as we all know, is the digging of the historic Maharatta Ditch* which ran along the lines now occupied by the Circular road. The work was not abandoned till three miles of it had been actually finished. No less than 600 peons and 300 Europeans, we are told, were engaged in this work for about six months, a road on the townside being prepared with the excavated earth.

If, as we are told by our literary critics, "the subject of the Epic poem must be some one, great, complex action and the principal personages concerned must belong to the high places of the world, and must be grand and elevated in their ideas and in their bearing," the coming of the Mahrattas into Bengal does not seem to be unworthy of Epic treatment. This we realise when we think of the panic which the irruption excited throughout the province, the havoc which it wrought, the brilliant acts of personal bravery which it brought forth, and the ultimate csnsequences which it led to. Indeed, episodes like these in the history of nations have supplied matter to many a popular Epic, if not to the literary Epics. I need hardly recall to mind in this connection that familiar lullaby with which mothers in Bengal still hush to sleep their complaining or restless infants, and children.

"Chhele ghumalo, pada judalo borgi elo deshe
Bulbulite dhan kheyechhe, khajna debo kishe;

which may be rendered—

The baby is sleeping, the village is still. The bargis are riding around.

The bulbuls have eaten the grain in the ear—Oh! how is the rent to be found?

The Bargi.

I may add just a word in passing as

* The inhabitants of Calcutta dreading a repetition of the calamity obtained permission to dig a ditch round the city to the extent of seven miles which was called the Mahratta ditch. —Auber, British Power in India.

The following is a historic reference to the Mahratta ditch, which, it will be recognised, has a very special interest of its own: The President received a Purwanah from the Nabab to the following purport. That he had been informed we were building a wall, and digging a wall, and digging a large ditch round the town of Calcutta; that he did not approve of our carrying on these works without his permission. The reply the President returned to the Nabab's Purwanah was to the best of my remembrance, as follows.

That the Nabab had been misinformed in respect to our building a wall round our town; and we had dug no ditch since the invasion of the Mahrattas, at which time we executed such a work at the particular request of our inhabitants and with the knowledge and approbation of Aliverdy Khan.—Holwell to the Honourable Court of Director etc. Fulta, 30th November, 1756.

to what the "bargir" is—which is said to be the more correct form though it appears as "Borgi" in our Nursery rhyme. We are told by a high authority that "Bargir" is not a caste. Any cavalry soldier who could not supply his own horse and who was therefore left in charge of an animal belonging to a higher soldier was a "Bargir." He may have belonged to any caste. He was the dread of Bengal, where he was known as 'Bargi." Sir Herbert Risley gives a lucid description of this "Bargi" —this Maratha cavalry officer. He says :—

The following notice of it in the new edition of "Hobson-Jobson" makes the matter clear :—"A trooper of irregular cavalry who is not the owner of his troop horse and arms (as is the normal practice) but is either put in by another person, perhaps a native officer in the regiment, who supplies horses and arms and receives the man's full pay, allowing him a reduced rate, or has his horse from the State in whose service he is. According to a man's reputation or connections, or the number of his followers, would be the rank (mansab) assigned to him. As a rule, his followers brought their own horses and other equipment; but sometimes a man with a little money would buy extra horses and mount relations or dependents upon them. When this was the case, the man riding his own horse was called, in later parlance, a "Siledar" literally, "equipment-holder" and one riding somebody else's horse was a "bargir" "burdentaker"—W. Irvine, The Army of the Indian Moghuls, (J. R. A. S. July, 1826, p. 539).

It was the practice of the Maratha "sardars" to allow their mercenaries to realise arrears of pay by looting the country, and the word bargir thus passed into popular speech as the designation of a Maratha trooper."

Internal Evidence of Authorship.

In the manuscript we have only the first canto of this Epic poem. Whether this is but a fragment of a longer poem the rest of which in all human probability is irretrievably lost to us, or whether this is all that the poet produced for the edification of his contemporaries and of coming generations we do not know. Further we are told that the poem is the work of poet "Gangaram." But who was Gangaram, where did he live, who were his friends and associates? The information regarding these points is rather meagre, though definite and well-ascertained and has been put together by the author of the history of Mymensingh. The evidence supplied by the poem itself, the many provincialisms in it, its many departures from correct orthography, the almost perfect phonetic renderings of words and expressions which frequently occur in it, remind us of the dialectical peculiarities of Eastern Bengal. But this in itself would not justify the two-fold conclusion that the author hails from a district like Mymensingh in Eastern Bengal and that the

poem was composed in Eastern Bengal. For the poem may well be the work of an Eastern Bengal man resident in or near Murshidabad. The familiar knowledge which the poet displays of the geography of the neighbourhood of Murshidabad would lend support to this view and indeed there is nothing improbable in it, as the connection between Dacca and Murshidabad must have been close and intimate in those days, perhaps even more so from all accounts than in our times. There is little to support the other alternative view that the poem is the work of one who did not belong to Eastern Bengal and that the provincialisms were interpolated by the amanuensis who copied the poem and that he brought his manuscript with him to Mymensingh.

We have a date entered at the close of the manuscript which I take to be the date of the copying of the manuscript rather than of the composition of the poem. The date corresponds to the year 1751 of the Christian Era which is just half-a-dozen years prior to Clive's fateful victory at Plassey. The events which the poem relates have reference to the years 1741-42 A. D., and 1744 which is the year of the death of Bhasker Pundit, and thus the poem, if the manuscript and the date entry in the manuscript be genuine—and we have no reason to question their genuineness—must have been composed within ten years of the occurrence of those events, when their memory was still fresh in the minds of the poet and of the readers to whom the poem appealed. Hence we have in the poem a vivid, realistic, contemporaneous account of a stirring chapter in the history of Bengal almost on the eve of the transference of sovereign power into the hands of the English. And if the date entry in the manuscript be reliable, we have here one of the earliest authentic accounts of the Mahratta irruption. Seir Mutakherin has been hitherto accepted as one of our early original sources of information regarding this period. Grant Duff, author of the monumental History of the Mahrattas, tells as frankly in a footnote to his work :—

"The best account of Ballajee Rao's campaign in Bengal, to which I have had the benefit of access is the Syer Mutuakhereen which is my authority for the greater part of the Bengal transactions at this period assisted however in several parts by Mahratta Manuscripts and Letters."

And indeed our debt to Gholam Hossian Khan, the author of Seir Mutakherin, is great for the detailed, forcible presentation of the epic events of these years, which reminds us on many an occasion, as I hope to show later on, of Xenophon and of Xenophon's description of the famous Retreat of the Ten Thousand.* But Seir Mutakherin

* Stuart has the following, but his chief authority is Seir Mutakherin :—

Aliverdy Khan was encamped near Midnapore when intelligence arrived that Bhascar Pundit

which was written in Persian did not come into the hands of the public till 1780, or 1783, more than a quarter of a century after our Hindu poem' and its English Translation by the French Creole, Raymond, did not appear till some time after. Hence I need not dilate on the historical interest which attaches to the manuscript to which I have ventured to invite attention. If the accounts and references in our Hindu poem tally, as they undoubtedly do in all essential particulars, with the descriptions to be found in the pages of the Mahomedan historian, we shall have presented before us another remarkable instance of historical coincidence.† We shall have one more proof of the value of the materials which our Vernacular literature may be made to supply for reconstruction of the history of our land.

Chief Feature of the Poem.

I began by stating that the agonising incidents of the "dark and distracting" war which now convulses Europe led me to think of this old Eighteenth Century Bengali poem. For the noticeable point in the framework of the poem is its mythological setting, and the idea which dominates its opening lines is that of a strong moral force controlling and shaping human destiny on earth. There is an unfaltering faith in an all-wise Providence which never allows iniquity to triumph over righteousnees.‡ Then again,

had been detached by Raghuji Bhonsla the Mahratta Chief of Berar, at the head of forty thousand horse to demand the "chauth" of Bengal and was rapidly advancing towards him ; but the Nawab expecting that they would enter by Orissa was a little alarmed at the report ; "as he had received advice of their intention to pass through Bihar" and had intended on his return to the capital to take measures to resist them, for which he fancied he should have ample time, before they could reach that province.

† He speaks to us as one who had himself lived through these troublous times, and states that it was his father who first communicated the appalling news of the stealthy advance of the Mahratta soldiery to Aliverdi Khan, through Aliverdi's nephew, the Governor of Bihar, as the Nabob was returning leisurely to Murshidabad after his victorious campaign in Orissa. We are definitely told "My father was taking some rest from fatigues of that expedition (the capture of Ramgar) when on a sudden, intelligence was brought by some trusty persons that Raghoji Bhonsla pandit had sent his own Pardhan at the head of forty thousand horse to conquer Bengal, and that in a few days they would pass close to him through the hills on their way to that country. This intelligence, such as it seemed to be was with a scrupulous exactitude transmitted to the Governor-General of Bihar, who forwarded it with letters of his own to Aliverdi Khan. This prince not trusting the intelligencer, paid little attention to the letter, and he answered his nephew, by desiring him to be easy in his mind and to apply himself to his business ; adding that whenever the Mahrattas should make their appearance, care would be taken to give them a good reception.

‡ "Whenever there is a decay of religion, Bharatas, and an ascendency of irreligion then I manifest myself."

"For the protection of the good, for the destruction of evil-doers, for the firm establishment of religion, I am born in every age. The "Gita."

as we approach the final catastrophe in the poem, when the indomitable Mahratta general is done to death by means which cannot be characterised as other than treacherous, we are prepared for it by the poet's references to the misdeeds of the Mahratta general and of his soldiery and his open violation of moral laws. He has oppressed the weak and suffered unspeakable outrages to be committed on defenceless women. He has thus lost the support and the sympathy of the gods above. He has incurred the displeasure of the higher powers who are the protectors of the weak and the defenders of the defenceless on earth. He has been judged and found wanting. And he must suffer. The truth of that old saying which finds expression in the classical line "quemdeus vult perdere prius dementat," is once again brought home to our mind. The Mahratta general falls a victim to all appearance to human contrivance, but really to divine displeasure. This is how a Hindu poet in a Bengeli poem justifies the ways of God to man.

I have already alluded to the historical interest which necessarily attaches to Gangaram's poem. The Mahrattas came to Bengal on the plea of demanding "Chauth" from Nabob Aliverdy Khan on behalf of the Mogul Emperor, the titular sovereign power, says the poet.§ Chauth has a fairly extensive literature of its own, and some highly interesting details about it are to be found in Holwell's Historical Events, Part I. For our present purposes, it is enough to refer to the following statement in Bolt's Consideratlons on Indian affairs. Bolt was for many years in the service of the East India Company in Bengal, serving as an Alderman or Judge of the Mayor's Court of Calcutta which was one of the courts established agreeably to the Charter granted to the Company. We need have no hesitation in accepting as substantially correct his presentation of the historical facts regarding Chauth :—

"There are several nations in India, now living under distinct governments of their own, who never were subdued by the Moguls, though indeed most of them, at times, have been their tributaries. They, however were never able to make the Mahrattas either their subjects or tributaries.

These people are governed by an artistocracy of Rajas of the Hindu religion, who for many ages have done more tnan defend themselves, for they

§ It does not appear what was the object of the Berar Mahrattas; whether conquering Bengal, to plunder it, or to establish the "Chauth" or claim for the fourth part of the revenues as owing to the weakness of the Mogul Government they had done in several other provinces. Aliverdy Khan suspected they had been instigated by the Nizam, who a short time previously had established his independent authority at Hyderabad and was supposed to be jealous of the rising power of the Governor of Bengal—Stewart's History of Bengal.

imposed tributes on most of their neighbours; and at last they even obliged the famous Mogul Aurengzebe to submit to the mortifying and dishonourable terms of paying them a "Chauth," or annual tribute of the fourth part of the revenues of the Deckhan; so that it might be said, the Emperor thereby not only acknowledged their independence of himself but likewise their joint right of sovereignty with him over those provinces that produced the revenues out of which the "Chauth" was paid.

This "Chauth" or tribute was continued to be received by the Mahrattas from the Mogul even long after the revenues of the Deckhan provinces had ceased to be paid into the royal treasury at Delhi: for in the year 1740, when the deputies of the Sahoo Rajah (King of Sittarah) arrived as usual at Delhi to receive the Chauth, they were told by the Mogul's ministry, "that Nadar Shah had lately so exhausted the treasury, that the Emperor was rendered utterly incapable of satisfying their demands, the more especially as the revenues of the Bengal provinces had been withheld from the year 1738 by the rebellion of Alliverdy Khan, who, in conjunction with his brother Hajee Ahmed, had usurped the Government of that Subahdary, they requesting at the same time, that the deputies would entreat their master, in the Emperor's name, to send an army of sufficient force to exact the amount of the Chauth that was due to them, and also to take the heads of Aliverdy and his brother, and restore the family of Sujah Khan to the Subahship; as the distracted state of the Empire put it out of his power to send a force strong enough to reduce the two rebels."

Thus power was given to the Marahttas by a real Mogul, upon the loss of Deckhan, to levy their tribute on the Bengal provinces, in lieu of what they had received as their Chout from the Deckhan revenues. But the truth was, the revenues of both Subahs were alike lost to tho Mogul; so that his ministers may be supposed to have given such an answer merely to get rid of a troublesome demand, though even made without justice. However the Marahtahs accepted of the transferred pledge, with the service annexed to it, which had the appearance of giving them likewise a new title of their Chout; and they accordingly proceeded to act from those powers for both purposes. An army of eighty thousand horse was expeditiously sent by them into the Bengal provinces, under the command of Boskhar Pundit, who, after explaining the nature of his powers, demanded of the usurper, Alliverdy Khan, 'Three years arrears of the Chout, the treasures of the two late Subahdars, and that in future an officer of their own should have a seat in every cutchery throughout the provinces to collect the fourth part of the revenues on their behalf."

These demands being refused with

extreme indignation, preparations were of course made for a decision by arms. The first consequence of which was, that Alliverdy found himself in so dangerous a situation, as, with twenty-five thousand Patan and Bengal soldiers, to be necessitated to force his way desperately through the whole Marahtah army, and make a fighting retreat from Burdwan to the opposite side of the river at Cutwah; which he effected in three days, with the loss of all his men, except five-and-twenty hundred Patans and fifteen hundred of his Bengal force."

Origin of Mahratta Irruption.

I hasten to point out how what the Bengali poem relates about the Chauth is identical with Bolts' statement, so much so that the one reads almost like a recapitulation or prose version of the other. I give here a more or less literal rendering of this section of the poem.

Sahu, addressing Raghuraja, said, "For a long time the Chauth for Bengal has not been paid to us. Despatch an ambassador at once to the Mogul Emperor. Ascertain why the Chauth for Bengal is in arrears. Address a letter with him." Raghuraja penned a short and curt note which the Mahratta representative took with him starting on his errand early the next day, and came to where the Emperor of Delhi resided. Then the Emperor told his vizir. "Acquaint us quickly with the contents of the letter." Upon which the letter demanding the Chauth for Bengal which was in arrears was read out to the Emperor by the Vizir. The Emperor ordered the Vizir to address Shahu and say that Aliverdy, the servant, had murdered his master, the Soubah of Bengal, and he had grown so strong that he had ceased to pay the imperial revenues. The Emperor was pleased to add what by the way was a strange confession of his own impotence, a significant commentary on the decadence of the Mogul power. "I have not got an army ready. I have none with me at present who can go and realise the the revenues. The consequence is that Aliverdy is in tranquil possession of Bengal and is growing more and more powerful everyday. The imperial revenues have not been paid for these two years. Let Shahu demand the Chauth for Bengal on my behalf." The Mahratta messenger took the letter from the Vizir and bowed his head in respectful homage to the Emperor and came to Satara without loss of time. Shahu was seated in his Dewankhana when the messenger arrived and delivered the Emperor's reply, after which he remained standing with folded hands at one end of the Durbar Hall. The Dewan acquainted Shahu with the contents of the Emperor's letter explainhow the Mogul desired the Mahrattas to send an armed force into Bengal for the recovery of the Chauth due from that province. Then Shahu said. "Whom shall we send to Bengal?" to which Raghuraja replied, smiling, "Let me have that commission." The request

was granted and Bhaskar Pandit was chosen by Raghuraja as the leader of the expedition and was placed at the head of a force of forty thousand men. This is the origin, as narrated in the poem, and as partly confirmed by historians, of the Mahratta irruption of 1741-42.

We read in Seir Mutakherin—

"The particulars of this invasion are as follows—Ragoji-Bhosla was a Prince nearly related to the Rudja Sahu, and one of the most renowned Commanders in the Mahratta Empire, where he possessed the country of Barar of which the great Nagpur is the capital. This Prince either instigated by Nizam-el-mulk, or prompted by what he knew of the weakness of the Empire, undertook to make an irruption into the kingdom of Bengal. His views were either to to make a conquest of it, or at least to establish in it contributions to the full amount of the Chout, *i. e.*, one-quarter of the reveuues, an odious yoke that had become established in many countries of Hindustan and Deccan, but from which Bengal had yet remained entirely free. For this purpose he made choice of his own Prime Minister Bhasukur Pandit, and gave him the command of an army of twenty-five thousand horse, which had swelled to forty thousand; and that army had passed with ease through the mountainous country and difficult passes, which like so many gates, shut up the entrance of Bengal, but where, nobody had thought of opposing their passage."*

It is interesting to note that according to the poet's statement Bhaskar Pandit came at the head of 40,000 men, Gholam Hossain Khan says that Bhaskar's original following numbered 25,000 which soon swelled to 40,000 while Grant-Duff tells us that "the Mahratta army consisted of ten or twelve thousand horse and report had swelled theirnumbers to nearly four times that amount."

Aliverdi and the Bengal Subadarship.

About the accession of Aliverdy Khan, to the Subadarship of Bengal, Behar and Orissa, the facts are thus summarised by Grant-Duff:—

About this period usurper, Aliverdi Khan, established his authority over the provinces of Bengal, Behar and Orissa. From a humble situation in the service

* About the reliability of popular estimates in these matters, we may compare the following which has reference to one of the subsequent Maharatta inroads into Bengal:—

On the Nabob's departure from the city Sabat began his march from Ballasore and after a short conflict with Koosal Singh, possessed himself of Midnapore, and sent small detatched parties to seize on the country round him: one of which advanced as far as Chundercona and another as far as Bowannypore, where they still remain without advancing a foot further to the northward: his whole force consists of 1,000 vagaband horse and half as many foot. The force by the timidity of some and roguery of others at the city has been magnified to ten times the number: and fear has taken such total possession of the people there that they imagine him and his troops within an hour's march of them—"Holwell to Major Caillaud," Fort William, 24th Feb. 1760.

of Shujaud-deen Khan, nabob of Bengal Aliverdy had been appointed the nobob's deputy in Behar. Surfuraz Khan, the heir-apparent to the nabobship, was stationed at Dacca, and Moorshed Koolee Khan, the son-in-law of Shujah-ud-deen, was the deputy governor of Orissa, having for his dewan a native of Arabia, named Meer Hubeeb. On the death of Shujah-ud-deen, Surfuraz Khan was appointed nabob, Aliverdy Khan rebelled, and slew him in battle. He also attacked and drove Moorshed Koolee from Orissa. Meer Hubeeb, the dewan, a person afterwards so instrumental in Mahratta progress also fled, but subsequently submitted. and entered the service of the successful insurgent. Aliverdy Khan was acknowledged by the Emperor as nabob of Bengal, in consequence of sending a part of the property and jewels of Surfuraz Khan to court.

Other Sources of Interest,

What are some of the other sources of interest of our Bengali poem besides the purely historical one? On this point I propose to invite. attention only to two short passages in the poem. When Burdwan lay besieged by the Mahrattas, all supplies were cut off and no provisions could be brought into the city. We have in this connection a a graphic description, all too short, of the state of utter destitution to which the townsfolk and the Nabob together with his soldiery were reduced even at Burdwan "which for plenty of provisions" Seir Mutakkherin says, surpassed most parts of Bengal. We are told that no trader could venture out of the city. The "Borgis" plundered and murdered all whom they could lay hold of, with the result that no provision could be had; rice, pulse, "dal" of all sorts, oil, ghee, flour, sugar, salt began to be sold at a rupee a seer. The misery of the poor was indescribable. Numbers died of starvation. Ganja and tobacco were not to be had. So also vegetables of all kinds. They all, from the lowest to the highest including the Nabob him-self, had to subsist on boiled roots of plantain trees. I think we may safely assume that in the enumeration before us we have a fairly exhaustive list of the articles which in the poet's day constituted the ordinary dietary of the Hindu section of a flourishing town like Burdwan. There can be no question of the populousness and prosperity of Burdwan in those days, and I need hardly explain that Burdwan and the Raja of Burdwan played an important part in the social and political history of Bengal in the Eighteenth Century Hence it would seem that the Hindus in those days lived largely on vegetarian dishes. Again, the use of narcotics like tobacco and ganja must have been widely prevalent. It should however be noted that while tobacco and ganja are expressly mentioned by the poet, there is no reference to wine or any other intoxicating liquor, though we know from other sources of the fondness of

the Bengal peasantry for the "todi"—the unfermented palm joice.

A picture of Devastation.

One other short passage I venture to refer to as throwing a curious sidelight on the economic aspect of the history of Bengal in the Eighteenth Century. The passage I am thinking of is the one in which the poet describes the flight of the panic-stricken inhabitants from their burning villages and homesteads which were being ravaged by the Marhatta soldiery.

The passage under reference tells us —"when the Bargis began to plunder the village the inhabitants sought shelter in flight. The Brahmin Pandits fled carrying with them their loads of manuscripts, the goldsmiths fled carrying with them scales and tools: the "gandabaniks" fled with their merchandise, the "kansaris" (Braziers) fled with their brass and copper, the blacksmiths and potters fled with their implements of production—the wheels and sticks; the "sankabaniks" fled with their instruments and the fishermen fled with their fishing nets."‡ It may be noted in passing that flashes of grim humour are not entirely absent from the dark picture of devastation painted by the poet. A group of panicstricken men flying from the deserted villages ask one another if any of them had seen the freebooters— to which the reply came that none had yet actually seen the Bargis, but that they were running away because everybody else was doing so. But alas, soon afterwards, the poor shuddering villagers were surrounded by the freebooters and tortured and robbed of their all in the usual style.

Here again it is permissible to the student of history to assume that the poet has given his readers a fairly complete list of the trading pursuits and occupations of the Hindus of his day. The "Unchanging East" is thus the reflection which forces itself on our mind, for what was true of the Bengal of the poet's day is also more or less true of the Bengal of the present day, and is, certainly true of the Bengal of the Sixteenth century. In that remarkable poem, Chaitanya Bhagbat, the author gives us an account of the peregrinations of the apostle through his native city on a certain memorable occasion. We are told that Chaitanya first went to the weavers. He then visited in succession those who deal in dairy products: the "Gandhabaniks" the "Malakars" and the "Sankhabaniks" and the "Tambulis".

‡ As regards these trade classifications we may remember what Dalton says in his Descriptive Ethnology of Bengal. Amongst the Hindus, all trades are hereditary and each forms a caste, the persons belonging to which must not marry out of it. These guilds are not included amongst the four classes by the ancient exponents of the Hindu system. They are declared to be the issue of marriage between a male of one or other of the recognised castes with a female of another, and are thence called the mixed classes, of whom from thirty to forty are enumerated including the tribes to whom the vilest officers are assigned.

Thus the Maharashtra Purana of the Eighteenth Century speaks of the same familiar trades, the same familiar implements of production, the same familiar articles of merchandise as the Chaitanya Bhagabat of the Sixteenth Century. One other thought would suggest itself to us, namely, the importance of the part which cottage industries with their rude tools and implements have hitherto played in the economic life of Bengal, giving us those exquisitely finished silk handkerchiefs which still find their patrons in high places and those delicate varieties of Muslin which are still the wonder of the world.

Progress of the Mahrattas.

Of the body of the poet's narrative, I propose to speak in my next paper. Hear I shall only state that the poet tells us practically nothing of the doings of the Mahrattas before their entry into Bengal proper. Leaving Satara, Bhasker, we are told, came to Bijapore where he halted for one night. Thence the expedition proceeded to Katak. From Katak the Marhatta force came by rapid forced marches to Nagpore, and they entered Bengal through the hilly region of Panchakot. From the point that Panchakot is reached, the poem is not wanting in details. Neither is that local colouring absent which we do not naturally expect to find in the pages of our professed historians, but which a native contemporary poet cannot help spreading over the familiar scenes he paints.

I conclude my introductrry remarks by inviting attention to one more enumeration in the pages of our poet which seems to have a special interest of its own from the sociological and ethnological points of view. Besides the traders and craftsmen already mentioned, the poet tells us that all the Kayesthas, Vaidyas of the threatened villages ran away. The Kshetris and Rajputs followed suit throwing away their swords and sabres.

The Mahratta Inroads.

The agriculturists and Kaibartas did the same. Among the flying crowds, were to be found the Gossains and Mohunts. But there were Mahomedans also—Sheikhs and Syads, Moguls and Pathans. The way Mahomedans are mentioned by the poet, however, implies that they were in the minority. There were the Putwaris and the Shikdars of the villages. The "Chanhi Dhanuks," the Santals, the hill-tribes, were also to be found, who apparently trade in sheep and goats, for they are represented as taking their goats with them when they ran away. In certain districts in Lower Bengal, these Santals are known as Banuas even in modern times and constitute the floating labouring population of the locality. Perhaps in the poet's day according to immemorial custom these people dwelt on the outskirts of the villages beyond the limits of the village community proper, as they do to some extent even now.

The districts which were most affect-

ed by the Mahratta inroads of 1741-42 are Midnapore, Birbhum, Burdwan, Bankura and Moorshidabad. It is thus natural for us in this connection to think of a volume of local history like Major Walsh's sumptuously finished History of Murshidabad. Referring to the Census retuns of 1901, Major Walsh notes "that the balance between Hindus and Mahomedans is no longer in favour of the Hindus, though the difference is not very great." Thus there can be little doubt that in the Eighteenth Century the Hindus outnumbered the Mahomedans even at the Provincial Mahomedan Capital. As regards the Santals, I referred to in connection with our poet's mention of the "Dhanuks," Major Walsh says that they live for the most part in the West and North-West of the City and adds that "They are by nature hunters and nomadic, but there is no scope for their energies and they must settle down to agriculture and daily labour." In his "Tribes and Castes of Bengal," Sir Herbert Risley speaks of the Dhanuks as a separate caste and judged from the Census figures for Murshidabad and its neighbouring districts in recent years where they are classed as Hindus, they constitute numerically by no means a negligible section of he local population. The student of history would be excused if the thinks in this connection of the remote past of India, for there is a famous description of a seven-fold division of the Indian body politic in the pages of Megasthenes, in course of which the Greek traveller and Ambassador speaks of the Philosophers, the Brahmins and the Germanes; the husbandmen, who were never disturbed in their peaceful occupations even by contending armies in times of war—the artisans who were free from taxation and were maintained at the expense of the State, and neatherds and shepherds who lived in huts and who were nomads, hunting down wild beasts and noxious birds which destroy corn, and who thus served a highly useful purpose. But these hunters did not apparently constitute a caste of Hindus but were a separate non-Aryan tribe. If our Dhanuks of the Eighteenth and Nineteenth Centuries be the descendants and representatives of the neatherds and shepherds described in the pages of Megasthenes—which there is little doubt they are—we have proof positive, of the antiquity of the process which is in operation under our very eyes, the process by which Hinduism is ever expanding and extending the limits of its fold, adding to the lower strata of the social organism and that by which it comes to be one of the most comprehensive of our socio-religious systems.

It will have been noticed that the poet speaks of Brahmin scholars and their manuscripts. He also mentions the Gossains and Mohunts, while we miss all reference to the priests, who in the pages of the Sixteenth Century Mukundaram, as in our present-day

villages, go their daily rounds offering pujahs and levying toll, and thus constitute an important factor in the economy of the life of the village community. I do not, however, think we should be justified in drawing any conclusion from this omission regarding the position of the orthodox Hindu cult in the neighbouring regions of Burdwan and Murshidabad.

The poet concludes by saying that men of thirty-six * different "Varna" or castes were to be found among the fugitives. The last word "Varna" takes our mind back to the question of the origin of castes in India and reminds us that after all the true Sanskrit name for Caste, "Varna" literally means colour.

Shall we therefore say with Max Muller that "the first trace of caste which we find in India is purely ethnological" and recall to our mind that glorious Vedic hymn—"Indra gave horse, Indra gave the Sun, he gave the earth with food for many, he gave gold, and gave wealth, destroying the Dasyus, Indra protected the Aryan 'Varna'." (Rig Veda, III, 34' 9.)

Permit me lastly to suggest a reference to any of our modern Census returns of a Bengal district, and to note how the main elements which constituted the population of a Bengal village of the Eighteenth Century as described in Gangaram's poem, correspond to the state of things which we find around us to-day.

My present topic is but a slender thread on which to hang a discussion of the almost insoluble problem of the origin of caste in India, and I have no intention of entering into an examination of the question on the present occasion. But my younger friends would pardon me if I invite their attention in this connection to Senart's important work on the Castes in India —an English translation of portions of which is to be found in the Indian Antiquary for May and June 1912. Senart's theory of the origin of caste in India will always have an interest for us and his main proposition is quoted here for convenience of reference—Says Senart—

"Caste, in my opinion, is the normal prolongation of the ancient Aryan institutions as remodelled by the vicissitudes into which they are involved by the new conditions and surroundings they met in India. It would be inexplicable without this traditional basis, as it would be unintelligible without the alloys that have been mixed with it, without the circumstances that have kneaded it".

In 1911 came to our hands from the

* Dalton says: In his *Descriptive Ethnology of Bengal* referred to once before. According to different authorities, the number of inferior castes so originated from mixed alliances between the four recognised castes ranges from thirty to upwards of forty, and includes some of the most useful of the people, as carpenters, smiths, weavers, potters, and braziers.

Faculty of Political Science in the Columbia University, a publication of no inconsiderable interest. It is written by Dr. Chen Huan Chang and entitled, "The Economic Principles of Confucius and His School." A work on the economic teachings of Confucius by a Chinese writer of Dr. Chen's position and experienee who had himself been a Mandarin and who in Professor Hirth's words "has had the advantage of sifting his ideas through the methods of western Science" must be a notable addition to the historical literature of economic thought. Dr. Chen's work tends to show that Confucianism is a great economic as well as a great moral and religious system. As the Doctor himself puts it "Confucius combines the economic and ethical elements into one system and this is a characteristic peculiar to his religion." My object in alluding to it here is to explain that though there is no caste in China, there is a clearly defined division of the population into four classes. Says Dr. Chen;

Using the principle of the division of labour as a basis, the Chinese have classified their people into four groups from a very early period. Such a classification is not a caste system, but a division of occupations and it includes all the people. Kuling's commentary says. "In the ancient time there were four groups of people; there was a group of people called merchants; there was a group of people called farmers; and there was a group of people called artisans." The definition of these four groups is given by Ho Hsiu. He says:—

First, those whose virtue enabled them to occupy the public positions were called students. Second, those who cultivated land and produced grain were called farmers. Third, those who finished the goods by the skilful mind and toilsome hand were called artisans. Fourth, those who exchanged wealth and sold goods were called merchants. The four groups worked separately, and the labour of one group was not taken by the other three. Therefore, the wealth was sufficient. This was the system of the ancients and the same classification is still used now.

Under the influence of Confucius, China had no social class or caste. But by the division of labour, she had and has, four groups of people.

To every student of Indian Institutions, the division of the population in China into 4 classes will suggest an analogy which is full of interest as also a contrast* which is full of instruction.

"The East bowed low before the blast
In patient, deep disdain.
She let the legions thunder past
And plunged in thought again."

So sang the poet, the advocate of

* Up to the present, India alone has shown a universal system of castes. At least, one may find elsewhere accidental traces, germs of analogous institutions: they are nowhere generalised, arranged in a system.

Steuart (Indian Antiquary, June, 1912).

sweetness and of light, the apostle of culture in England, how different from the present-day abominable German kultur. Similiarly the historian in a remarkable passage of his Annals of Rural Bengal, commenting on the interest which attaches to our hitherto neglected local District records, says, " Dynasties struggled and fell, but the bulk of the people evinced neither sympathy nor surprise, nor did the pulse of village life in Bengal move a single beat faster for all the calamities and panic of the outside world." The Mahratta irruption of the mid-Eighteenth Century must have been a calamity of an exceptional order, for it did succeed, at least for a little while, in disturbing the even tenor of life of the bulk of the people in these provinces and it did make the pulse of Bengal village life beat a little faster than usual. This we realise when we think of the attitude of the people towards that other overwhelming calamity which overtook Bengal and filled the cup of her misery within twenty years of the coming of the Mahrattas—that famine which visited Bengal in 1769-70 accompanied by the grim laughter of its inseparable associates--starvation and pestilence which carried off at least one-third of the population within that short period. When in God's grace favourable seasons returned, it was found that there were not enough able-bodied men left to carry on the regular occupations of husbandry. During this famine, the manhood and the womanhood of Bengal proved to the wondering outside world how they can suffer in silence and even face death with undisturbed equanimity. But that womanhood, usually hidden in seclusion, so reticent, so patient in suffering, so uncomplaining in the midst of surrounding desolation, was forced to fly from the burning homesteads and to appear before the public as Gangaram tells us during the inroads of the Borgis. "Respectable women who had never trodden public thorough-fares," says the poet with his usual terseness, "were forced to fly through the ravages of the Mahrattas with bag and baggage." Pangs of child-birth came upon some of these delicate women in the midst of their painful horrors, and the still more painful publicity.

Let us place ourselves for a minute in the position of a contemporary poet speaking of an appalling calamity which had overtaken his native land during his lifetime. Or let us imagine a Daniel Defoe living in London, not during the Plague of 1665 whose history he wrote, but in the England of the Ninth Century during the Danish invasions and writing about these incursions in the fashion of the Anglo-Saxon Chronicle. What are the probable salient points to which our poet or historian would especially invite attention ? These would probably be the names and characteristics of the conspicuous leaders, generals and chieftains, the names of the towns and villages which had suffered most in the all-pervading

calamity, and the stirring episodes which appeal to our imagination almost with a compelling force even at this distance of time, and which crown with glory or cover with infamy, the memory of the actors concerned. It is therefore quite in keeping with the fitness of things that our Bengali poet should speak to us of the characters who are the protagonists in the struggle he narrates; of the districts and villages which were ravaged and plundered; and of that heroic retreat of Aliverdy Khan from Burdwan to Cutwa, suffering the extreme of misery and displaying the extreme of heroism, a retreat therefore which has been aptly compared to the famous retreat of the Ten Thousand.

Before attempting to give a summarized version of the purely historical portions of the poem, or before asking you to consider the accuracy of the historical information to be gleaned from the poet's pages, it would be useful to invite attention to some of the actual personages who are mentioned by name by Gangaram in course of his narration.

This I propose to do in my next paper.

J. N. DAS GUPTA.

MILTON'S MESSAGE.

Some years ago I had the pleasure of listening to an organ recital by a very famous English musician. Among the selections he played was one of his own improvisation and of all I think that charmed me most. Beginning with a very simple and striking air he gradually developed it into more and more complex variations until at last he finished in a perfect torrent of most exquisite harmony leaving his hearers spellbound. Yet notwithstanding the complexity and grandeur of the final movement the first simple air was to the very end distinguishable; in fact one felt that it had been the inspiring spirit of the whole improvisation.

So is it with Milton's writing. To the careful and truly appreciative listener throughout his work one dominant note is observable. Sometimes it is clear enough to be absolutely unmistakable even to the casual hearer and at other times it is hidden away under a grand chorus of harmony of which, upon analysis, we shall find it to be the inspiring theme.

Were my object merely to ascertain the nature of and give a name to that simple theme the task might soon be accomplished; for the central message of John Milton may be summed up in the one word liberty. I wish however to understand the significance of the

theme and to appreciate its value. To this end we must first glance at the historical surroundings amidst which Milton wrote, and then at the course of development through which his thought concerning Liberty passed.

For a key to unlock the significance of the stirring events of the seventeenth century in which Milton lived and worked we must hark back more than one hundred and fifty years. In 1453 A. D. Constantinople was captured by the Turks; a simple enough event in itself but fraught with the most striking and far-reaching consequences for Europe and for the whole world.

. During the dark ages which succeeded the downfall of Rome intellectual culture seemed to have died out in Europe. In Constantinople alone was a tiny spark preserved. There a number of scholars, chiefly Greeks, lived and studied and preserved the old masterpieces of literature which had come down to them from the Augustan age of ancient Greece and Rome. Even their enthusiasm for learning was not sufficiently great to induce them to leave their comfortable homes and face the difficulties of spreading knowledge among the less enlightened peoples of the West. When the city fell into the hands of the Turks however these savants were obliged to flee and fortunately they took with them many of their ancient books. Doubtless they looked upon the capture of their beloved city and their own subsequent exile as the greatest of possible hardships. But history has taught us that their hardships constituted just the breeze needed to fan their spark of learning into a flame which soon kindled the whole continent and coutinues to this day as a mighty conflagration. That revival of learning, known as the Renaissance produced a spirit of unrest in almost all departments of European life. Increasing knowledge engendered an ardent spirit of enquiry. Religion, politics and social conditions became subjects for close investigation. Investigation revealed disabilities and abuses and thus the spirit of enquiry developed naturally into a call, at first gentle but gradually increasing in volume, for reform.

Hence it was that the Reformation arose. Religious men on the Continent began to question the tyrannical authority of Rome and to call for a greater freedom of thought and conduct. Their agitation reached England but gradually. True it is that Henry the Eighth had eagerly availed himself of the movement and to suit his own private ends had divorced the Church from Rome but the mass of the English people did not really begin to appreciate the inner significance of the Reformation until fifty years later. Whereas the revival of learning made itself felt in a perfectly phenomenal advance in literature and science during the reign of Elizabeth, it was not until Charles the First came to the throne in 1625, that it reached its culminating point.

In the compass of an article such as this it would be impossible to deal with all the real and fancied wrongs which the people of that time suffered. The most that can be attempted is a brief summary of the more conspicuous of them. They may be broadly indicated under the two heads of Political and Religious disabilities. Under Charles, the Parliament which should, according to the ideals of government in England, have been the organ of popular representation had become a mere tool for the advancement of the King's designs. He summoned it in order to get large grants of money sanctioned for carrying on an unpopular and extravagant foreign policy and as soon as the money was granted dissolved or suspended it in order to avoid the criticism of his schemes which would have inevitably been advanced by its members. Whenever it refused or hesitated to comply with his wishes he immediately dispensed with even its financial assistance and betook himself to various cruel and arbitrary measures for the extortion of the needed cash from private individuals. When criticism of his schemes was attempted by members of parliament he had them arrested and committed to prison. Such an encroachment on civil liberty might have been endured fifty years before but by a people breathing the atmosphere of enlightenment consequent upon the Renaissance it was naturally resented. So there arose an insistent demand for Parliamentary liberty which when opposed issued in a civil war.

It seemed as if no act of Charles could widen the breach thus made by his political tyranny. But there was one thing dearer to England than even Free speech in Parliament and that was Religious Freedom. The battle against the oppression of the Pope of Rome was still being fought by the successors of Luther and Calvin on the Continent and although it had outwardly been won in England by Henry the Eighth Charles was insidiously but firmly trying to undo the results of the Victory. He appointed men with distinctly Roman sympathies to the highest ecclesiastical offices in England and gave them unlimited powers to enforce their doctrines. Persecutions of a most bitter type were carried on against those who refused to have their worship determined for them by such men. Those who were uuwilling to practise religion in precisely the form which Charles prescribed were branded as heretics and traitors and were punished by the severest penalties. So stringent did the restrictions on liberty of conscience and worship become and such an intense persecution arose against those who insisted on enjoying these privileges that many of the best people of the country followed the lead of their kindred spirits in Holland and emigrated to America. There they were more than willing to face the direct hardships and counted them but a small price to pay

for the retention of the inestimable blessings of Freedom.

Broadly speaking then there were two great parties in England in the early days of Charles' reign, opposed to the King, the Parliamentarians who deman- the right of free speech and political liberty and the Puritans who protested in no uncertain tones against the fettering of conscience and the curtailing of their religions freedom. Of course the two classes were not mutually exclusive. Most of those who belonged to one were also sympathetic with the other. but they represent the two great streams of thought converging to compose the mighty river of National Freedom. Later on the issue became complicated by the entrance of the Scottish Presbyterians and by the differences between the Parliament and the Army. These however need not vitally concern us here. The principles for which Milton stood remained the same and even though the issue became confused in the minds of many of his contemporaries by the conflicting currents of thought which followed the establishment of the Commonwealth, yet they remained perfectly clear in his mind. At a time when the need of liberty was being acutely felt and vociferously expressed he threw the weight of his genius into the battle and did more to ensure ultimate victory than either he or his contemporaries imagined.

Lest Milton's sincerity as a Disciple of Freedom should for a moment be called in question let us bear in mind the following facts. Although he always seems to have been of a religious turn of mind, in youth he gave up the idea of entering the Church as a profession simply because, as then constituted, it was the abode of a tyrannical formality. In his tract on "Reason of Church Government" written many years later he says "Perceiving what tyranny had invaded the Church, that he who would take orders must subscribe slave, I thought it better to preserve a blameless silence before the sacred office of speaking, bought and begun with servitude and forswearing." Further the very vehemence which betrays itself in his prose writings, sometimes verging on the vulgar, seems to have been due to the intensity of his feeling in the cause of Liberty which he was espousing. If such language jars upon our feelings how repulsive it must have been to his own truly poetic soul. Necessity alone in a good cause could have called it forth. But chief evidence of all that the Love of Liberty was the strongest passion of his life is afforded by the fact that Milton, for the best years of his life, forsook poetry and spent his energies in writing pamphlets and carrying on controversy. That a life of such stirring conflict and strife was not at all to his taste is clear from such considerations as these." His youth was not spent in controversy but in long years of quiet study and travel. Indeed he himself confesses that such a life

was most to his liking. When writing of Italy he says in his "Defensio Secunda" "The sad news of civil war coming from England called me back for I thoght it disgraceful while my fellow countrymen were fighting for liberty, that I should be travelling abroad for pleasure." Further, from his youth Milton had cherished the high ambition of writing a really great poem, a work by which his name would go down to posterity. Listen to him as he writes of "That inward prompting which grew daily upon me that by labour and intent study, which I take to be my portion in this life, joined with a strong propensity of nature, I might perhaps leave something so written to after times, as they should not willingly leave to die," and again, and more beautifully, in his second sonnet where he apologises for his apparently protracted inactivity by saying that he is preparing for "That same lot however mean or high, toward which time leads me and the will of Heaven. All is, if I have grace to use it so, as ever in my great Task-master's eye." Now it seems to me that here is the greatest evidence of the sincerity and intensity of Milton's belief in the cause of liberty. He laid aside the great ambition of his life at just that time when he had most strength to accomplish it in order that he might take his place in the forefront of the battle for Freedom. He forsook the solitude of the country where his thoughts might easily turn to poetry for the stern prose of a life of political controversy carried on within the walls of a great noisy city. "Because" he says, "I could not be ignorant what is of Divine and what of human right, I resolved, though I was then meditating certain other matters, to transfer into this struggle all my genius and all the strength of my industry" (Defensio Secunda) Yes, two voices clamoured for attention in Milton's consciousness; the voice of desire, of ambition, of pleasure bade him write a mighty poem and the voice of duty, stern and impelling, summoning him to fight in the interests of liberty. That he responded to the latter has as history shows, brought him the greatest of fame and to us, his posterity, inestimable blessing.

Now let us turn to a consideration of the campaign which Milton waged. How did he strive for the prize of liberty and what particular forms of that much coveted trophy did he endeavour to secure for his fellow countrymen?

Quite early in his career as a writer he seems to have turned his thoughts to the goal of civil and political liberty. In Comus written in 1634, whilst he was staying in the quiet village of Horton, he hints at the impending downfall of the Court party. For some time afterwards though he remained silent on the subject and the reason of his silence is not far to seek. Milton by no means underestimated the value of political liberty but with a deeper insight than some of his contemporaries he realised

that to be of any permanent use it must be preceded by Social and Religious freedom. Hence it was that on his hasty return from the pleasures of foreign travel to take part in his Nation's struggle for liberty he did not immediately address himself to political controversy but began to write on Church Reform, the spread of Education and the Freedom of the press. He went to the root of the whole subject by striving first to prepare the people for the reception of that glorious prize of liberty; that blessing without such preparation Milton knew full well would rapidly degenerate into the Curse of License. To quote his own words from the "Defensio Secunda" "I saw that a way was opening for the establishment of real liberty; that the foundation was laying for the deliverance of man from the yoke of slavery and superstition; that the principles of religion which were the first objects of our care, would exert a salutary influence on the manners and constitution of the public......I therefore determined to relinquish the other pursuits in which I was engaged, and to transfer the whole force of my talents and my industry to this one important object."

The initial object of attack in Milton's polemic was then Religious Intolerance. As early as 1637 before embarking on his foreign travel he had made his voice heard on the subject in no uncertain tones. For in his classic elegy "Lycidas" he refers to the clergy of the established Church in terms like these:—

"Blind mouths! that scarce themselves know how to hold
A sheep-hook"........
And when they list their lean and flashy song
Grate on their scrannel pipes of wretched straw;
The hungry sheep look up, and are not fed,
But swol'n with wind and the rank mist they draw,
Rot inwardly, and foul contagion spread."

And the same sentiment again finds tongue in verse when in the immortal sonnet he prays Cromwell:—

"Help us to save free conscience from the paw
Of hireling wolves whose gospel is their maw"

And again he urges Fairfax to the task of reform in the words

"Till truth and right from violence be freed
And public faith cleared from the brand of public fraud."

So important did the task of securing freedom of religious thought from the oppressive dogmatism of a corrupt clergy appear to Milton as an absolutely necessary preliminary to the attainment of all other forms of Liberty that his earliest prose works are all devoted to the subject. Beginning in 1641 we have in quick succession his pamphlets on "Reformation touching Church Discipline in England and the causes that have hitherto hindered it, "Prelatical Episcopacy"

"The Reason of Church Government urged against Prelaty" and two or three others. In all these tracts Milton pleads for the right of the individual to choose and practise whatever form of worship his own conscience approved repudiating compulsion of any kind. That this was his sincere conviction and not due to prejudice against any one particular creed or church is evidenced clearly enough by his subsequent conduct. After severing his connexion with the established Church on leaving Cambridge he became closely identified in his religions belief and practice with the Presbyterians. But when, during the latter days of the Long Parliament, the leaders of that Church grew intolerant he does not hesitate to leave them and denounce their infidelity to the cause of Liberty in the strongest terms. No indictment could be stronger than that which he levels against his erstwhile friends in the sonnet on "The New Forcers of Conscience".

"Dare ye for this adjure the civil sword
To force our consciences that Christ set free,
And ride us with a classic hierarchy".

Let us make no mistake however as to the sincerity of Milton's love for religion. Far from urging the abolition of religion he strove for its reformation along the only lines by which religion can be reformed; not by changing its form of outward organisation merely, much less by giving it the sanction and support of state recognition but by giving each man the opportunity of investigating its truth and significance for himself unhindered by convention, priestly interference or state compulsion. Religion was supremely important both for its own sake and as a guide to moral conduct. In the latter sense especially it was of infinite value to the Nation for by it a national characrer which alone could constitute a worthy and secure foundation for the edifice of national liberty.

From his campaign against religious bondage Milton passed to the advocacy of Social Freedom. Here he again began with fundamentals by writing a masterly tract on Education. In it he advocates a system of teaching that "shall fit a man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices both public and private, of peace and of war" for liberty to act without wisdom is the most doubtful of blessings. Intellectual freedom apart from sound education would be productive of nought but error. Then followed the most famous of all his prose works the Areopagitica. Taking its name from the oration of the great Greek apostle of Liberty Isocrates it advocated Liberty of expression of opinion. Its immediate occasion was the strict censorship to which all publications were subjected during the reign of Charles the first, and its chief plea is for the freedom of the press. But the whole force of the book is on the side of liberty and it

concludes with a fine series of passages in which Milton claims liberty of conscience and of the expression of opinion for all. In the same department of social freedom must be reckoned the tracts urging a relaxation of the divorce laws. However much we may disagree with their arguments and perhaps justly resent their conclusions they serve to show how thoroughly imbued with the spirit of liberty Milton was. Nor can his bitterest enemy sustain a contention that they were the product of a man with lax moral standards. For his biographers show him to have been a man of singular purity and his own insistence on morality as the sheet anchor of all forms of liberty is everywhere apparent in his writings. In one passage he says "If ever God instilled an intense love of moral beauty into the mind of any man He has instilled it into mine." In one of his sonnets he writes of men

"That bawl for freedom in their senseless mood,
And still revolt when truth would set them free.
Licence they mean when they cry Liberty;
For who loves that must first be wise and good."

and he closes Comus with the memorable lines

"Love Virtue, she alone is free
She can teach ye how to climb
Higher than the sphery chime:
Or if Virtue feeble were,
Heaven itself would stoop to her."

With the establishment of the Commonwealth Milton was appointed Latin Secretary. The post was not gained by his own seeking, nor when he obtained the appointment did he use it for his own personal advantage. He esteemed it highly however because it gave him an additional opportunity for advancing the interests of his cherished ideal of Liberty. The post included amongst its duties that of writing pamphlets in defence of the Government's action and policy. It was into this side of the office that Milton entered with the enthusiasm bred of deep conviction and in the discharge of its duties he gave lavishly of his learning and genius. Indeed he gave something that most men would have regarded as of more value than these—the gift of his own sight. For it was whilst working on the political pamphlets, reading and writing far into the night, that his already weakened eyes failed him altogether. It was a great sacrifice and this is what he says of it in his sonnet of Cyriack Skinner,

"What supports me, dost thou ask?
The conscience, friend, to have lost them overplied
In Liberty's defence,—"

The task set to Milton by the Government which employed him was that of defending and justifying their execution of king Charles. His first publication on the subject entitled "The Tenure of Kings and Magistrates" was issued just a fortnight after the king's death.

In it he contends that it is lawful for any people to depose, and if necessary, execute a monarch who proves himself tyrannical and wicked. His argument is based on the contention that all men are free born. They bind themselves together in communities and freely elect kings to rule them. If this king fails in his responsibilities the people have again the right to exercise their freedom and depose him and in the event of his using his office merely for the exploitation of his subjects and the advancement of his own selfish ends they may punish him. The publication of this pamphlet not unnaturally called forth a storm of criticism from the camp of the Royalists, and so Milton embarked nupo a period of controversy which lasted for several years. Much that was written during this period is of little permanent interest. It was the fashion of the time to resort often and forcibly to the *argumentum ad hominem* and the abuse poured upon each other by Milton and his antagonists is far from profitable reading. However in all his writings he kept the flag of liberty flying and the two most notable of his treatises which have come down to us are the Eikonoclastes in English and in Latin " The Defensio pro Populo Anglicano." The latter is a masterpiece of learning and genius and it evoked a chorus of praise from scholars in Holland, France, Denmark, Sweden and Germany.

By the year 1656 with the Commonwealth in full swing Milton had indeed cause to rejoice for he must have felt that his ideals were almost realised. But alas for him ! In the very hour of his apparent triumph doubts began to beset him and as we shall shortly see, soon after his temple of hope itself was rudely shattered.

He had, years before, hinted at possible dangers lying in wait for the new administration. In his sonnet he admonishes Cromwell " that peace hath her victories no less renowned than war" and he had always protested against the state control of religion. Now seeing his warnings disregarded he writes a tract in 1659 showing "that it is not lawful for any power on Earth to compel in matters of Religion." " Then after writing two or three more pamphlets in a similar spirit he brings his series of prose writings to a close with "A letter to a friend Concerning the Ruptures of the Commonwealth". In this letter he roundly criticises the Government for their compromise and failure to act up to their former ideals and then proceeds to suggest that government should be carried on by a Grand Council of Parliament of the ablest men to sit in perpetuity and do their business by means of a Council of State". Such criticism of those in authority lost him his post as Latin Secretary but it affords another evidence of the absolute sincerity and unbounded courage of the man. To the very last he retained his ideals of liberty untarnished

never relinquishing them even when shortly after they seemed to be for ever consigned to the realm of the impossible by the accession of King Charles II to the throne.

The feelings of the old and blind Prophet of Liberty, when he heard of the restoration of the monarchy and the re-establishment of the High Church party, may better be imagined than described. For the time being the must have been weighed down by the feeling that his life had been an utter failure. Why had he given up the cherished ambition of his youth to write a great poem in order to fight such a lost battle? Would it not have been infinitely better for him to have continued his foreign travel and then retired to some quiet country retreat far from the noise of strife and the harassment of controversy and there spent the best years of his life in the composition of some monumental work of literature for posterity? If such questions did arise in the mind of the blind poet history had given a clear and unmistakable answer to them. The failure was apparent only, not real. For after all the great ideals for which Milton fought have been realised the more fully by us because of his fighting and the ambition of his youth was, far more effectually carried into practice after his apparent failure than it could have been before. The years between 1660 and his death in 1674 he spent in comparative retirement and during that period his very best work was done. His blindness, the bitter disappointment, the apparent failure of his hopes must have involved but did not crush him into a despondent silence. On the contrary the experiences through which he had passed brought out the very best in his character; so that the work of those last years is trebly precious. It embodies his vast stores of learning, it furnishes us with the rich fruits of his wonderful life and experience and best of all it reflects a a soul clear, clean and beautiful as gold which has been refined by fire.

It is manifestly impossible to attempt anything like an appreciation, much less criticism, of those last three immortal works here, but one would fail in doing justice to Milton's message of liberty if one omitted to consider the way in which he sets it forth in Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistes. The subjects of these are taken from the Christian Scriptures and may be very briefly outlined as follows. In "Paradise Lost" Milton elaborates the story of the first sin committed by man, traces its origin and describes its terrible and farreaching results. Man was created by God, Milton says, with the power of free choice. He knew what God's will for him was and had liberty either to do it or disobey. One day he was tempted by an evil being called Satan and using his power of Free Will for ill, chose to disobey God. His act of disobedience was man's first sin and is soon leads on to others,

as a result of which, all manner of pains, losses and ills came into the world to vex him and his posterity. The opening words of the poem itself sum up its contents:—

"Of man's first disobedience and the fruit
"Of that forbidden tree, whose mortal taste
"Brought death into the World and all
......Sing heavenly Muse"

Paradise Regained, although not so long or so fine a piece of work, is a sequel to the former epic. In it the story of the Temptation and Victory of Jesus Christ are set forth and Milton teaches that whereas by Adam's disobedience, sin with all its awful horrors, entered the world now by the implicit obedience of Jesus ; victory over sin is secured and a means found whereby man may become free again from its tyranny.

The third great poem, Samson Agonistes, was published shortly before Milton's death. It is written in dramatic form and tells the story of the old Hebrew hero Samson. Samson was a man of prodigious strength who by his prowess delivered the nation from their enemies. At length however, in disobedience to God's command, he confided the secret of his strength to a dissolute woman with whom he consorted. She proved to be in the pay of Samson's enemies and betraying his secret delivered him into their hands. They then blinded him and compelled him to do the most servile work whilst they mocked at his weakness. Ultimately Samson after meditating much repented of his sin and disobedience to God and unknown to his captors gradually regained his former strength. Finally when he is one day requisitioned to make sport for a great multitude of his foes who are assembled at a feast he takes his stand between the two chief pillars of the banqueting hall and by exercising his strength pulls them down, killing thousands of his captors and dying himself in the wreck of the building. It is a piece of wonderful dramatic writing and the most pathetic parts of it are those in which we can read the experiences and thoughts of the blind poet in the words of the sightless hero Samson.

The point which chiefly concerns us here is the way in which Milton in each of these three great poems keeps prominent and develops his favourite theme of Liberty. After the apparent failure of his former campaign, the negation of all his hopes for national and religious freedom, we might well have expected him to drop the subject. But no, he has by no means lost faith in the ideal of his youth. The terrible experiences through which he has passed have merely altered his perspective. Maturer consideration, after much suffering has led him to turn his gaze from without to the inner chambers of life and now his last word to the world before he dies is "This one thing man needs, needs more than civil

and social liberty, more even than outward religious freedom ; he needs preeminently freedom of soul ; he must at all cost free himself from the bondage of evil." The failure of his fellow countrymen to rally round the banner of religous, social and civil freedom which he had unfurled before them for so many years, the collapse of the Commonwealth and the restoration of the Monarchy, all had impressed this great lesson upon him. Man must first of all foster that precious seed of LIberty with which God endowed him at birth, the Freedom of Will. If by his own folly and disobedience he has sold himself to sin and forfeited his power to choose rightly,, well, then his greatest and fundamental need is to seek God's forgiveness and the restoration of the gift by responding to the overtures which the Almighty Himself has made towards him by appealing to him through the life and death of his Son Jesus Christ. The highest, most supremely valuable and attainable liberty is freedom from sin and all forms of unrighteousness. It is the fruit of perfect obedience to the will of our Creator, is the Liberty of the sons of God. In the words of a worthy successor of the "Mighty-mouthed inventor of harmonies" as he addressed God

"Our wills are ours, we know not how ;
Our wills are ours to make them thine."

And did Milton attain that Liberty for himself ? Surely he did if the quiet resignation of the best of all his sonnets may be taken to represent his heart :—

"God doth not need
Either man's work or his own gifts ; who best
Bear his mild yoke, they serve Him best : His state
Is kingly ; thousands at His bidding speed,
And post o'er land and ocean without rest ;
They also serve who only stand and wait.

HAROLD BRIDGES.

DACCA FORTY YEARS AGO

(Cuttings from the "East").

DR. ROBSON.—Dr. Robson our present Inspector of schools arrived here last Monday and assumed the charge of his duties from Mr. Croft who left this place last Saturday morning.

AN ADDRESS.—The students of Mr. Croft resolved to present him with an address and with this view they wrote and asked him to fix a time and place to receive the address, on which Mr. Croft thanking his students for their good wishes informed them that he could not receive the address as it was strictly forbidden by the Govt. Mr. Croft was indeed held in high esteem by all classes of the community.

MR. WILSON.—We are in a position to refute emphatically the assertion of

the Daccaprokash that it has never been contemplated by the authorities to appoint a native gentleman, professor of mathematics to our local College. The fact is that Mr. Wilson the present professor having had congestion of liver, was advised to go off to the seas and he has gone on leave for two months. As no European professor could be had for such a short time, Babu Mathur Nath Chatterjea M. A. is now teaching the higher College Classes and Babu Rasamay Basak M. A. the 1st year class we believe, to the entire satisfaction of the students. Mr. Wilson we learn, has much recovered and is likely to rejoin his post within a week or so.

Cricket match last Saturday. The College sixteen played their annual match with the station eleven. The total number of runs on the side of the College was 160, and that on the side of the station fortysix. The station was poor in strength, as some of their good players were not present on the occasion; Mr. Lyall the best bat was unfortunately bowled out only after four runs. Mr. Peacock had the highest score on the station side making 18. Mr. Gouldsbury wor the best successful bowler. The station had only one Bye and three Leg Byes. On the College side Basanto alone scored forty one. He also proved a good bowler and field. Bhagavaty had the next good score, 24. Aswini was a good field and a successful bowler. The College had 22 Byes 6 wides and 1 LegBye. We would suggest that the native station cricket club play the station next Saturday.

Mr. Buckland—Mr. C. T. Buckland, as Commissioner of the Dacca Division, has done for our town in its advanced condition what Henry Walters did for it in its earlier stage of development. The Railway steamer that that now plies between Dacca and Goalunda and has wrought a remarkable change in the state of commerce was the result of his official influence with the Government of Bengal. The Eastern Railway itself owed its existence in a great measure to his exertions. It was his favourite plan to intersect the Eastern Provinces from Dacca to Sylhet and from Sylhet to Chittagong with a beautiful net work of Railways connecting our central emporium of trade with Calcutta.

To our extreme regret he did not continue here to bring about the realization of his magnificent project.

The fine 'bund' or embankment which now forms the most convenient promenade ground along the river during all seasons of the year is due to Mr. Buckland's extraordinary tact and capacity as a ruler and administrator. The foul and noisome state of the Ghats along the Strand during the rains and the want of a pure airing locality in the heart of the town were subjects of bitter complaint with the European and native residents of the station. The authorities hitherto knew not how to remove the nuisance. Many a Civil Surgeon of our town, Dr. Simpson not

excepted, attributed the frequent outbursts of the malaria after the rains to the noxious state of putrid metter and vegetable deposited on the banks. Major White and Dr. Mann were lamentable victims to the state of things that was really an eyesore to an anxious observer. The eagle eye of Mr. Buckland marked this and lost no time to inaugurate a measure, the fruit of which is that we daily take our morning and evening walks, breathe the ever refreshing air and bless with all our hearts the benevolent and public-spirited author of the "Buckland Bund."

All potent was his call for a public contribution. The Zemindars and merchants who were asked to subscribe to the measure, gave most bountifully and unhesitatingly, excepting one whose tale will form an interesting anecdote to the annals of our city in connection with the works of utility due to Mr. Buckland's energy. The letter which was addressed to this person age calling upon him to contribute a round sum of money in furtherance of the scheme was not responded to as warmly as did the others of his class. The result was a refusal of the next interview sought by the Zemindar, who lost no time to recover the smile of the *chotalat* of Dacca.

The beautiful strand was not meant for pleasure trips alone. A far nobler object of utility was at the bottom of the scheme. The river which had already begun to be shoaly shared the attention of the Commissioner who thought of turnning the main current below the Bukhtoboly chur from the Dhulesory to the Boory Gunga. With the view of defending the city bank of our river from the increased force of the water, he provided it with the masonry work which now richly contributes to the splendid scenery that presents itself to an observer on the other side of the river.

It was in the contemplation of Mr. Buckland to extend the bund to the western extremity of the town and there locate the steamer Ghat that a contagious disease imported by the watery vehicle might exhaust its fury in a remote corner of our station. Time however has belied our expectations.

Economic Museum—The CALCUTTA GAZETTE announces the formation of committees for the Economic Museums at Dacca, Faridpur, Bhowal, Madaripur, etc. We shall watch their proceedings with interest. Babu Preo Nath Bose L. M. S. which the Calcutta Gazette renders into London Missionary society, is appointed for the Dacca committee.

Ice-Machine—We are to glad to observe that an Ice-Machine has been set in a working order at Patuatuli. Ice is being sold for four annas a seer. Ice-cream is also prepared on order. Mr. Shircore is putting up another Machine at Bungla Bazar and we hear it is capable of turning out 600 maunds of Ice every day. Dacca will certainly not die for want of Ice now.

The Hindu Hostel—We have been favoured with a copy of the rules for the

guidance of the inmates of the Hindu Hostel established here on the 9th September last. There are four classes of boarders ranked according to the rooms they respectively occupy. The rates are Rs. 8, 7, 6 and 5. This covers the expense for food, house-rent, servant's wages etc. In September there were 27 boarders, in October 30, In November 32, in December 28, in January 25, in February the number increased to 36. We congratulate Babus Obhoy Chandra Das, Personal Assistant to the Commissioner and Anath Bandhu Moullik the Manager and superintendent of the Hostel on this steady success. We learn that there is a nominal committee for its management, but that the members never met and the management is wholly left, to Obhoy Babu. Perhaps it is better that at the beginning only one or two should have the management, and we think the Principal of the College should be appointed a manager in addition to Obhoy Babu. The rules can be had on application to the Hostels. The house which the Hostel now occupies is a very good one, situated as it is on the river bank. All the arrangements we learn are excellent.

The Dacca Law Class—In our last we stated that the law professor was to get only the fees paid by the students every month. His Honour has on the strong representation of the People's Association and the Principal of the College sanctioned the retaining of the Law Classes quite on their original footing; and considering the fact that the Law Classes have hitherto been a source of gain to the Government he has sanctioned Rs. 200 a month for the law lecturer for three years more. The rate of fees payable has nevertheless been raised to seven rupees. As the Behar people have not yet asked the Government to retain their Law Classes the Government has not ordered their re-establishment. The Hoogly College loses the Law Class attached to it. The Lieutenant-Governor (vide his resolution) candidly acknowledges that he did not foresee the evlls which would eventually result from the abolition of the 2nd and 3rd year Law Classes as reported by the Principal of the College.

To The Director of Public Instruction.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letters noted in the margin (No. 253 of 28th Jan. 1875; „ 436 of 6th Feb. do.), forwarding proposals for re-establishment of the second and third year law classes at Dacca.

2. The orders of the 21st. November 1874, were issued on a representation from the officiating Director of Public Instruction that the classes at Hoogly, Dacca, and Patna had ceased to be self-supporting, and that there was no likelihood of any of these colleges being again in a condition to collect fees sufficient to pay the salaries of the lecturers. Mr. Sutcliffe recommended that the lecturers should be remunerated by the

fees alone; but as an alternative measure, he suggested the maintenance of a first year class, and the discontinuance of the others.

3. On consideration of the matter, the Lieutenant-Governor was of opinion that it might be possible to obtain the services of a qualified lecturer for a first year class, but it appeared undesirable to continue classes for the second and third years under the instruction of lecturers who should be remunerated only by fees. It was thought that if this were attempted, the lecturers who would receive very inadequate pay, would probably be men of an inferior stamp, and that neither the University nor the High Court would be willing to accept such instruction as satisfying the conditions of the regulations for the Degree of B. L. and for the Pleadership examination.

4 But when the orders of the 21st November 1874 were passed, it was not contemplated that they would result in the discontinuance of the classes altogether. On the contrary the orders were passed with the express object of ensuring the maintenance of the classes, it being anticipated that students would attend the first year lectures at a Moffusil college and the lectures of the other two years at the Presidency.

5. It now appears that this will not be the result of the orders. The former lecturers are unwilling to continue their duties on the terms offered to them, and the students and residents of Dacca have strongly represented the injury which will be inflicted on the college and the hardships to students of Law in the eastern districts generally, by an adherence to the orders of November last. The principal of the college has also stated that the students are willing that the fees should be raised from Rs. 5 to Rs. 7 per month. Under these circumstances the Lieutenant-Governor will not object to reconsider his former orders. With regard to Hoogly, he does not think that any case is made out. A Hoogly student can without difficulty attend law lectures at the Presidency College, and his doing so does not involve the necessity for his residing in Calcutta. With Patna and Dacca the case is different: but the Patna students have made no representation on the subject, and it does not appear that they are anxious to have the classes maintained on the old footing. The precise orders, therefore, will apply to Dacca only, but the Lieutenant-Governor will consider the question of extending them to Patna also, if it be shewn that the students and residents desire that this should be done.

6. The Lieutenant-Governor can give no pledge thst these classes shall be permanently kept up at the cost of the state. The orders of the Government of India in June 1865, distinctly contemplated that the classes were to be self-supporting, and if this result is not attained the classes will eventuatly have to be closed. But under the

circumstances of the case and with regard to the fact that in former years there has been a surplus of receipts over expenditure, the Lieutenant-Governor consents that the lecturer at Dacca shall be paid his salary as before on condition that the fee for lectures is raised to Rs. 7 per month. This arrangement will continue til all students now in the class shall have completed the course. At the end of that time if the classes should still be unable to pay their own expenses, they will have to be given up.

7. Your letter no. 253, of the 28th January 1875 reported that the law lecturer at Dacca had tendered his resignation. It appears however that the Principal of the College wishes to retain his services, and I am therefore directed to authorize you to allow the lecturer to withdraw his resignatlon, and this will render his formal reappointment unnecessary.

8. A further representation must be made in the event of its being desired that concession conveyed in the present letter, should be extended to the Patna College.

I have etc.
H. J. REYNOLDS.
Sec. Govt. of Bengal.

Mr. Archibald B. A.—By an oversight the arrival of this gentleman at Dacca as Professor of Mathematics and Physical science was not announced in our last issue. He comes from Oxford, and we hope in Mr. Garrett's absence, he will take lively interest in the Physical education of the boys.

Mr. Archibald.—Mr. Archibald of our local College has introduced a novelty into Dacca. We mean a bicycle. He is a master in his art and is veritably the "cynosure" of curious eyes, along the roads, admiring his tact and skill. We recommend this vehicle to young Bengal and hope they will profit by his example. It combines speed with economy and its special peculiarity is noiselessness. But we fear the strength of the legs necessary to work the two-wheeled *garry* will be found wanting in the slim legs of our youths and the recreation may be looked upon as a hazardous physical exercise.

The necessity of keeping even balance on the seat will be another difficulty and considering that hackney carriages driven by boys of 8 or 9 are not safe companions on the narrow thoroughfares of Dacca, our young men from such prudential considerations may not be inclined to take to this new mode of locomotion.

Mr. Lyall.—Our popular Magistrate while returning from a tour through Manickgunge, went out a hunting after a buffalo on last Wednesday morning; on his way he met a wild boar and while firing at it the boar attacked him and wounded his left hand. The boar however fell dead on the spot.

Owing to Mr. Lyall's ill health there was no regular cricket match on last Saturday.

Barooni Mela.—The Kartick Barooni fair at Munshigunge held at the end of the last year must have been a great success. The value of goods brought for sale was one lakh and a half above that of last year, reaching the large sum of Rs. 45,54,455. The fair lasted for one and a half month, during that time there were only 3 thefts. The number of visitors averaged 7,500 a day. The health of the people was wonderful, only two deaths occurred one from cholera and the other from fever. The services of Sub-Inspector Prag Dutt Tawari are said to have been invaluable.

The Pogose School.—The worthy Head Master of the Pogose School Babu Kailas Chandra Datta M. A., B. L. is going away to join the bar at Comillah, and he has resigned his present post. We hope Mr. Pogose will ere long make a permanent arrange ment, and that, with a deserving man, to keep up the reputation of his long standing school.

Liberality.—We are requested to mention that Babu Pratab Chandra Das has offered one gold and one silver medal to the first and second students of the Pogose School respectively at the next Entrance Examination. We are glad to find the Babu coming forward to give such encouragement to one of the oldest institutions of the city.

PROCEEDINGS THE OF ANNIVERSARY OF THE EAST BENGAL WEAL WORKING ASSOCIATION.

As announced in our last two issues the Anniversary of the E. B. *Subha Sadhini* Association was celebrated with great eclat in the premises of Baboo Radhica Mohan Rai last Monday at 5 P. M. A good number of European gentlemen and ladies as well as a great part of the native gentry were present on the occasion. The Commissioner Mr. R. B. Peacock presided and Mrs. Lyall distributed prizes to the pupils of the Adult Female School and Girls' School.

The President opened the meeting with a few appropriate words and asked one after another those who had previously signified their wish, to speak on the occasion. First of all stood our new Inspector of schools Dr. W. Robson who delivered a long speech. It was very convincing and instructive, full of happy illustrative analogies. As regards the importance of the Association he said that if we place our faith not in what is seen that is what has already been done by the Association but in what is unseen that is what it is the Pioneer of, we must attach very great importance to the Association. The absolute necessity and very great importance of female education which is to a great extent the one successful work of the Association, he very clearly pointed out. In conclusion in order to corroborate his remark "that the native females are capable of great things" he made very favorable mention of the acquirements, manners &c. of the well-known kulin girl Debi Bidhu Mukhi.

Then stood Mr. Kemp the Editor

of the *Bengal Times*. He spoke much in favor of Native Female Education. The change of his opinion on the subject is, in very gratifying. He had blamed Miss Carpenter when she came out to India to further the still more neglected cause of Native Female Education and had advised her not to waste her energies here in India, which might have been been better employed at home.

The third and the most enthusiastic speaker on the occasion was the noble-minded Mr. W. Livingstone. He very successfully appealed to the sense of right and justice of the Europeans in general as well as of she educated natives in regard to the education of the Native Females. He also proved by facts and figures the parsimony of Government in paying for the education of Native Females in contrast with that of the males.

The fourth speaker was Dr. Ram Prosad He did not previously signify his wish to speak on the occasion. Neverthless, he could not resist the temptation of speaking. He spoke as usual very frequently and attempted to point out some of the evils that, in his opinion, attend native female education at the present day, such as want of reverence in the so-called educated native ladies for their husbands and their negligence in perfoming domestic duties.

Then came the turn of our well-known speaker Babu Kali Prasanna Ghosh but as he was absent on account of his illness, Pundit Prasanna Kumar Chakravarti, the Second Bengali speaker in Dacca was asked to speak. He stood and delivered not a short speech on the subject of national life and improvement He as usual first glorified the ancient Aryans and then lamented the degraded state of their unworthy posterity. Then he turned round and said although some pogress was being made by the male portion of the native community, we could not forget that the other half of the community was in great darkness, and that the educated natives were very much to blame for the negligence of their most onerous duties to the Fair Sex. He concluded his lecture with words of encouragement to the small band of workers of the Association and with thanks to the European gentlemen and ladies.

The next person who spoke was Babu Banga Chandra Ray. He as a leading member of Association made requests to the native gentlemen present to lend sympathy to those that were engaged in the work of doing good to their country. He also politely requested the European ladies present to now and then visit the Adult Female School and smile upon it so that the pupils might be thereby encouraged to prosecute their studies with zeal and ardour. The last speaker was Babu Ruhiny Kumar Basak, who tried to point out the healthy influence the females if properly educated are able to exercise upon society

He illustrated his statement with a few historical examples.

Then after the Prize distribution took place, the president Mr. F. B. Peacock addressed the meeting. He at first made some statistical remarks as regards the progress of Female Education in East Bengal. Then he said that the Association had fairly carried on its work for the last four years, as could be well gleaned from the report just then read before the meeting by the secretary It was, indeed, a very sad thing that the Association had not been hither to able to realize such a scanty sum as Rs. 25 as local subscription being half the amount Govt. paid, for the support of the Adult Female school under the supervision of the Association. He then very pertinently remarked that if what the association was doing was good and proper, it should be supported and encouraged by all means and if it was doing what was bad and improper it should be suppressed. Not to support and encourage it even when it was thought to be doing what was good and proper was to prove illiberal. He concluded his interesting though short speech with words of enconragement and good wishes to the members of the Association. Then Mr. Robson proposed a vote of thanks to the chair and to Mrs. Lyall which was seconded by Mr. W. B. Livingstone and the meeting dissolved.

The Vikrampur Hitasadhini Sobha.—According to a local contemporary the Vikrampur Hitasadhini Shobha's worthy Secretary Babu Prasanna Chundra Chakravarty's Report read at the fourth anniversary, of the Sabha, celebrated with great eclat, the other day, as announced in our last—contained fiction as well as facts. It is also asserted that in regard to a disputed point (the alleged fiction is said to refer to this point) the President and the Secretary gave quite opposite versions and contradicted each other. We were present at the anniversary and we are therefore in a position to state that there was no disagreement between the President and the Secretary in regard to the disputed point or any other point whatever and that the Secretary's Report is an absolutely true version of the doings of the Sobha he represents. And having made searching enquiry into the matter, we are enabled to say, without any fear of contradiction that at a monthly meeting of the Sobha, it was formally proposed, the proposal being unanimously carried—to indirectly promote the anti-polygamy movement set on foot and earnestly prosecuted by a Brahmin-reformer of Vikrampur Want of space compels us to content ourselves with this meagre notice of a very useful institution in East Bengal. The claims on our gratitude of the President and the Secretary above referred to, can hardly be exaggerated.

HEAVEN AND HELL.

'Tis absolutely true
That they that conscience led,
The path of virtue tread,
This life will never rue.
They will sink in the tomb,
And friends in vain will mourn,
Not knowing they are borne
Elsewhere to live and bloom.
For, through a golden gate,
Drest in ethereal guise,
Their blessed souls will rise
To that celestial state
Wherein, both night and day,
The holy angels raise
A chorus in the praise
Of God, and melt away.
And penitence is *hell*,
Miscall'd a 'Burning Pit,'
Wherein will sinners sit,
And Mercy's beads will tell.
Then will the angels fair
On them their influence shed,
O'er them their pinions spread,
And them for *Heaven* prepare.
And then and then alone
Will God remit their sin
And kindly take them in
As children of His own.

BAHAR-UDDIN AHMED.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড　　ঢাকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩　　২য় সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্র... কলিকাতা

প্রাচীন চতুষ্পাঠীর শিক্ষা।

বর্ত্তমান টোলের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা নিতান্তই অপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোথায়ও কেবল ব্যাকরণেরই চর্চ্চা হইতেছে, কোথায়ও শুধু স্মৃতিরই চর্চ্চা হইতেছে, কোথায়ও বা আবার দর্শনেরই মাত্র অধ্যাপনা হইতেছে। এই প্রকারে কেবল এক বিষয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়াই ছাত্রগণ টোল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বিশেষরূপেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। টোলের এই এক বিষয়িনী শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান স্কুল কলেজের বহুবিষয়িনী শিক্ষার তুলনা করিলে টোলের শিক্ষাকে যে অঙ্গহীন শিক্ষা বলিয়া মনে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। টোলের এই অঙ্গহীন শিক্ষা দেখিয়া আমাদের দেশের শিক্ষা চিরদিনই অঙ্গহীন ছিল এরূপ ধারণা উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের পুরাকালের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহাকে বর্ত্তমান স্কুল কলেজের পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়িনী শিক্ষার অপেক্ষা যে তেমন অধিক অপূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হইবে তাহা নহে।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রথম গুরুগৃহে হইত। এই শিক্ষা "গুরুকুলে বাস" বলিয়া কথিত হইত এবং এই গুরুকুলে বাস হইতে ছাত্র "অন্তেবাসী" নামে অভিহিত হইত। প্রথম গুরুর নিকট বেদই বিশেষভাবে অধীত হইত। বেদ কেবল অধীত হইত তাহা নহে পরন্তু আচরিতও হইত। তাহাতেই এই প্রথম শিক্ষাবস্থার নাম বেদের "ব্রহ্ম" * নামানুসারে 'ব্রহ্মচর্য্য' বা 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' হইয়াছিল। বেদপাঠের দ্বারাই যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা সমাপ্ত হইত মনুসংহিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখই আছে:—

"বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ ২য় অধ্যায়

অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ছাত্র বেদসকল-দুইবেদ বা একবেদ যথাক্রমে পাঠ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।"

*"বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম"। অমরকোষ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাঙ্গবেদ অধ্যয়নেরই নিয়মছিল। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ছয়টী বেদাঙ্গ। 'কল্প'—যজ্ঞোপদেশক শাস্ত্র-নিরুক্ত বেদের অভিধান বিশেষ জ্যোতিষ-যজ্ঞাদির সময় নির্ণায়ক শাস্ত্র। যজ্ঞকুণ্ড বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণের নিয়মাদি হইতেই জ্যামিতি বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। কল্পরূপ বেদাঙ্গের সহিত উক্ত নিয়মাদির ও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধহয়। এই প্রকারে এক বেদাধ্যয়নের মধ্যেই যে ব্যাকরণ, অভিধান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

গুরুকুলে পূর্ব্বোক্তরূপ শুদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা যেমন প্রদত্ত হইত তৎসঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ বিবিধ জ্ঞান মূলক অন্য শিক্ষাও প্রদত্ত হইত। রঘুবংশে বরতন্তু শিষ্য কৌৎসের শিক্ষার চিত্র যেখানে অঙ্কিত হইয়াছে সেখানে আমরা সেই সমস্ত শিক্ষার স্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হই। কৌৎস যখন মহারাজ রঘুকে গুরুদক্ষিণার পরিমাণ জ্ঞাপন করিতেছেন তখন বলিতেছেন :—

"নির্ব্বন্ধ সঞ্জাত রুষার্থ কার্শ্যম্।
অচিন্তয়িত্বা গুরুণাহ মুক্তঃ
বিত্তস্য বিদ্যা পরিসংখ্যয়ামে
কোটীশ্চতস্রোদশ চাহরেতি॥" ২১ ৫ম সর্গ।

"আমি গুরুকে দক্ষিণার্থ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে রাগান্বিত হইয়া আমার অর্থাভাব বিবেচনা না করিয়াই আমাকে বলিলেন বিদ্যার সংখ্যানুসারে চতুর্দ্দশ কোটি অর্থ আমার জন্য আনয়ন কর।"

অধিগত বিদ্যার সংখ্যানুসারে কোটির চতুর্দ্দশ পরিমাণ মুদ্রা দক্ষিণাদানের জন্য শিষ্য আদিষ্ট হওয়ায় বিদ্যার সংখ্যা যে চতুর্দ্দশ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। মল্লিনাথ টীকায় এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার পরিগণনা মনুসংহিতা হইতে এইরূপে প্রদান করিয়াছেন—"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসান্যায় বিস্তরঃ। পুরাণংধর্ম্ম শাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ।"

"ছয়টী বেদাঙ্গ, চারিটী বেদ, মীমাংসা, ন্যায় (তর্কশাস্ত্র) পুরাণ (ইতিহাস) ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশটীই বিদ্যা।"

এখানে দেখা যাইতেছে বেদ ও বেদাঙ্গের অতিরিক্ত মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্ভূত ছিল। এই পাঠ্যতালিকাতে পূর্ব্বের ব্যাকরণ, অভিধান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষার সহিত আমরা মীমাংসাতে দর্শনের, ন্যায়ে তর্কশাস্ত্রের; পুরাণে ইতিহাসের; ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মৃতির যোগ পাইতেছি। শেষোক্ত শাস্ত্রে ধর্ম্মনীতি, লোকনীতি রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই অন্তর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত পাঠ্যবিষয় সকলের সহিত বর্ত্তমান স্কুল কলেজের পাঠ্যবিষয়ের তুলনা করিলে বর্ত্তমানকালে যে অধিক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। প্রত্যুত বর্ত্তমানকালে যেস্থলে ধর্ম্মশিক্ষার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয় তৎস্থলে প্রাচীনকালে ধর্ম্মশিক্ষারই নিতান্ত আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষায় কোনও বিদ্যালয়েতো পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচীন বিষয়সম্মিলন দৃষ্ট হয়না তবে ইউরোপের ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার (Theological and Secular education) বিদ্যালয় সকল একত্রমিলিত হইলে যাহা হয় আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাতে প্রায় তাহাই পাওয়া যায়।

আমরা উপরে চতুর্দ্দশ বিদ্যার নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহাতেও সমস্ত পঠিতব্য বিদ্যার শেষ হয় নাই। এতদতিরিক্ত আমরা আরও চারিটী বিদ্যার নাম প্রাপ্ত হই। সেই চারি বিদ্যার নাম "আয়ুর্ব্বেদ," "ধনুর্ব্বেদ" "গান্ধর্ব্ববেদ" ও "অর্থশাস্ত্র"। প্রাগুক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহিত এই চারিটী অতিরিক্ত বিদ্যার যোগ করিয়া বিদ্যার সংখ্যা অষ্টাদশ হয় যথা :—

"আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈবতাঃ॥

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

'আয়ুর্ব্বেদ' চিকিৎসা বিদ্যা 'ধনুর্ব্বেদ' যুদ্ধবিদ্যা 'গান্ধর্ব্ববেদ' সঙ্গীত বিদ্যা ও 'অর্থশাস্ত্র' ধনবিজ্ঞান বিদ্যা। এই চারিটীই বিশেষ বিদ্যা। কিন্তু বিদ্যার পারদর্শী হইবার জন্য চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহিত এই চারিটী বিদ্যা আয়ত্ত করারও প্রয়োজন হইত। এই অষ্টাদশ বিদ্যা

পারদর্শী মহাপণ্ডিতকে বুঝাইতেই 'চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্রে পণ্ডিত' এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরি উল্লিখিত চারিটী বিশেষ বিদ্যার ইংরেজীতে নাম এইরূপ হইবে—Medical Science, Archery or Military Science, Musical Science, Science of wealth or Political Economy ইহা হইতে অষ্টাদশ বিদ্যার কিরূপ বিপুল পরিসর ছিল তাহা আমরা কতকটা ধারণা করিতে সমর্থ হই

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ধর্ম্মমূলক ও জ্ঞানমূলক শিক্ষা ব্যতীত আমরা ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও দেখিতে পাই। কালিদাস রঘুর শিক্ষার বর্ণনায় এই ব্যবহারিক শিক্ষার একটী সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধীঃ
ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পনবাতি পাতিভিঃ
দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ॥ ৩০" রঘুবংশম্
তৃতীয় সর্গঃ।

"দিগধিপতি সূর্য্যদেব যেরূপ পবনাধিক বেগশালী অশ্বসকল যোগে চতুর্দ্দিক অতিক্রম করেন উৎকৃষ্ট বুদ্ধি রঘু ও তদ্রূপ সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তি সহায়ে চতুঃসমুদ্রতুল্য চতুর্ব্বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন।"

চতুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে মল্লিনাথ এইরূপ টীকা করিয়াছেন :—

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চশাশ্বতী।
এতাবিদ্যাশ্চতস্রস্তু লোক সংস্থিতি হেতবঃ॥"

ইহার অর্থ এই 'তর্কশাস্ত্র, বেদ, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি এই চারিটী বিদ্যাই সমাজস্থিতির মূল।' 'লোক সংস্থিতি হেতবঃ' বলিয়া চারিবিদ্যা নির্দ্দেশিত হওয়ায় ইহাদিগকে আমরা পরিষ্কারই ব্যবহারিক বিদ্যা (Practical Studies) বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। উল্লিখিত বিষয় গুলির ইংরেজী নামের দ্বারা পরিচয় এইরূপ হইবে Logic, Theology, Political Economy, Law। ইংরেজী নাম হইতে, এই সমস্ত বিদ্যা সাংসারিক জীবনের পক্ষে যে সবিশেষ উপযোগী তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

পুরোহিতের সহিত ধর্ম্মকার্য্যের সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার পক্ষে ও দণ্ডনীতির ব্যবহারিক শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া বিহিত দেখা যায়। কামন্দকনীতি শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ॥" 'পুরোহিত বেদ ও দণ্ডনীতিতে নিপুণ হইবেন।' এইরূপে প্রাগুক্ত ব্যবহারিক শিক্ষা ব্রাহ্মণেরও সাধারণ শিক্ষারূপে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রকারে প্রাচীনতম কালের চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও অষ্টাদশ বিদ্যাই যে কালক্রমে চতুর্ব্বিদ্যার সঙ্ক্ষিপ্ত আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

চতুর্ব্বিদ্যার পাঠ না যখন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তখন হইতেই বিদ্যাশিক্ষার স্থান "চতুষ্পাঠী" নাম ধারণ করিয়াছে। "চতুর্ব্বিদ্যার পাঠ হয় ইহাতে" ইহাই চতুর্ব্বিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কিন্তু "চতুর্ণাং বেদানাং পাঠোঽত্র" অভিধানে "চতুষ্পাঠীর"এরূপ ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। এই ব্যুৎপত্তি আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এক, দুই বা বহু বেদের পাঠ সম্বন্ধে মনুতে আমরা বৈকল্পিক বিধিই দেখিতে পাই। বেদ চতুষ্টয় পাঠের নিশ্চিত বিধি আমরা দেখিতে পাই না। বেদ সকলই যদি চতুষ্পাঠীর একমাত্র পাঠনীয় বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীতে বেদ পাঠ একেবারেই রহিত দেখা যাইত না।

"চতুষ্পাঠী" নামের উৎপত্তি কখন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পর ইহার উৎপত্তির প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় সময়ে মঠে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ইহা হইতে শিক্ষাস্থানের নাম "মঠ" হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানে "মঠশ্ছাত্রাদিনিলয়ঃ" এইরূপ উল্লেখ করিয়া মঠকে যেমন বিদ্যা শিক্ষার স্থানরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তেমনই বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের বাসস্থানরূপেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতেই টীকাকার ভরত লিখিয়াছেন "আদিনা পরিব্রাজকক্ষপণকাদীনাং গ্রহঃ। *" পূর্ব্বে আমরা চতুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে যে শ্লোক

* শব্দকল্পদ্রুম।

উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা বৌদ্ধনীতিবেত্তা কামন্দকীয় নীতি হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বৌদ্ধদিগের সময় চারিবিদ্যার অধ্যাপনা ব্যবহারিক শিক্ষারূপে প্রচলিত ছিল বুঝিতে পারা যায়। এই চারিবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষারূপে বহুল প্রচলন হইতেই ইহাদের দ্বারা শিক্ষা স্থান "চতুষ্পাঠী" নামে পরিচিত হয়।

"চতুষ্পাঠী" নামের মূলানুসন্ধান দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে প্রাচীন চতুষ্পাঠীর শিক্ষা বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীর ন্যায় অঙ্গহীন ছিল না; বরঞ্চ তৎকালের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ কার্য্যকরী শিক্ষাই ছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য কার্য্যকরী শিক্ষার সহিত ইহা সর্ব্বাংশে সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা একেবারে হীনও ছিল না। প্রত্যুত বেদশিক্ষার সহিত ইহার যোগ থাকায় ইহা বিশেষরূপে ধর্ম্মপ্রধান শিক্ষাই ছিল; বর্ত্তমান পাশ্চাত্যানুযায়িনী শিক্ষার ন্যায় ধর্ম্মহীন শিক্ষা ছিল না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবিতার প্রাণ (২)

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এই দর্পণের মধ্য দিয়া আমরা অতীতকে বর্ত্তমানের মধ্যেও উপলব্ধি করিতে পারি। জাতি বা সমাজ উত্থান ও পতন রীতি নীতি ও পদ্ধতি—ভাববৈচিত্র্য এবং কর্ম্মবৈচিত্র্য এ সমুদয়ই সাহিত্যরূপ দর্পণের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারি। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য জগতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। কবিছন্দের চঞ্চল নৃত্যের দ্বারা ভাবা পুষ্পের যে সুরভি সুন্দর মাল্য রচনা করেন তাহা অতীত ও বর্ত্তমানকে এক অচ্ছেদ্য-মিলন-সূত্রে সংযোজিত করে। কবি যুগ প্রবর্ত্তক। শুষ্ক নীরস ইতিবৃত্ত মানুষ ভুলিতে পারে—কিন্তু কাব্য কেহ ভুলিতে পারে না। কালিদাসের জন্ম সন তারিখ লইয়া প্রত্নতত্ত্বের লড়াই অবিশ্রান্ত ভাবে চলিবে এবং তাহার স্থির মীমাংসা পণ্ডিতেরা কেহই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবেন না—কেহ বলিবেন তোমার হিসাব দশ বৎসরের ভুল, আমার হিসাবই ঠিক্ আবার অপর তর্জ্জন করিবেন—তোমার ভুল আমার ঠিক, কালিদাসের জন্ম পত্রিকা বিচারের এই কল-রোল নদীর স্রোতের মত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিবে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কালিদাস কাব্যের প্রমত্ত সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার যুগের যে পেলব মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কি কেহ ভুলিতে পারিবেন? যুগে যুগে নানাদেশে নবীন কবির উদ্ভব হয়। কবি তাহার জন্মযুগের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কাব্যরসে সিঞ্চিত করিয়া ভবিষ্যত যুগের নর নারীর সমক্ষে উপস্থিত করেন। এজন্যই আমরা প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যরস পান করিবার জন্য বিভোর হইয়া পড়ি। এজন্যই কবির আসন এত উর্দ্ধে অবস্থিত। কাব্য যেমন সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হয় কোন দেশে কোন কালেই সাহিত্যের অপর কোন অংশ তাদৃশ প্রিয় হয় না। কাজেই কবির এ কথাগুলি সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোচনা করা যাউক। কবি ঈশ্বরচন্দ্র শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বের চিত্র আমরা তাঁহার কাব্য হইতে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দান কবিতার প্রাণ একথা কয়টী অতি যথার্থ হইলেও দেশকাল ও পাত্রভেদে উহা নানা বিভিন্ন আকারের ধারণ করে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ইহার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনায় সে যুগের সামাজিক চিত্র সুস্পষ্ট চিত্রিত। তাঁহার রচনা একদিকে যেমন সরল ও প্রাঞ্জল ছিল, হাস্যরস বর্ণনায়ও তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কবি আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেখানে যে পরিহাসের উপযুক্ত প্রমোদকর বিষয় পাইয়াছেন তাহাই অতি সরল ও সরস ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল ঈশ্বরচন্দ্র সে সকলের প্রতি কখনও কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। তাহার কবিতা হইতে আমাদের দেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফল সমাজ-দেহে

কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা নিম্নলিখিতরূপ জানিতে পারি,—

খেয়ে খানা পড়ে খানা কত খানা কারখানা।
বাড়ীতে খানার খোলা দিবানিশি জলেছে॥
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী।
আহারের সময়েতে ভগবতী (মদ্য) চলেছে॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট দাঁতে কাটে বিস্কুট।
গোটুহেল ড্যামহুট্‌ মা বাপেরে বলেছে॥
এর চেয়ে সুখোদয় কবে আর কার হয়।
দেখ আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে॥

* * * *

'আমার সেবক যত তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর সরাসর ডেকেছে॥
স্মৃতি মনু বেদ আদি দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে বড় দায় ঠেকেছে॥'

আবার স্ত্রী শিক্ষার অত্যধিক আন্দোলনের সময় তিনি লিখিয়াছিলেন যে—

'এরা এ, বি, পড়ে বিবি সেজে বিলাতী বোল
কবেই কবে,
আর কিছুদিন থাক্‌লে বেঁচে
সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের
মাঠে হাওয়া খাবে।'

রস সম্বলিত তিনি অসংখ্য কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এখানে আমরা একটী উদ্ধৃত করিলাম।

দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্যা তের পহর অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী॥
আর ভাদর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজার দিন এবার॥

* * * *

কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হলো ছায়েখার।
এই সূর্য্যি মামা পূর্ব্বদিকে অস্ত চলে যায়॥
উত্তর দখিণ কোণ থেকে আজ বাতাস লাগছে গায়
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া সিং উঠেছে
দু'টো তার॥
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন।
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে দু'জন॥
কালু কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে
হাহাকার।

এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সঙ্গীত, হাফ্‌ আকড়াই, ও পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র 'হিতপ্রভাকর' নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীর নিকট অত্যধিক যশ ও গৌরব লাভ করেন সেই গ্রন্থ রচনার একটু ইতিহাস আছে, এস্থলে ঐ বিষয়টীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। বেথুন্ সাহেব খৃঃ ১৮৫১ অব্দের ৭ই জুলাই তারিখে কবি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নলিখিত রূপ পত্র লেখেন—

"আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আপনি বাঙ্গালা ভাষায় একজন সজীব কবি; আপনি যদি পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সুকুমারমতি বালক বালিকাবর্গের পাঠোপযোগী একখানি কাব্য রচনা করেন তাহা হইলে আপনার দেশীয় লোকেরা অবশ্য আপনার নিকট বাধিত হইবেন এবং আমিও সেই সূত্রে বাধিত হইব * * * আমি আপনাকে আরও অনুরোধ করিতেছি, যে পুস্তক লিখিবেন, তাহাতে অপবিত্র অথবা অশ্লীল ভাব যেন স্থান না পায়। এ অনুরোধ করিবার বিশেষ কারণ এই আমি শুনিয়াছি, আপনাদিগের দেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রশংসনীয় গ্রন্থকারগণ ঐ দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।" 'হিতপ্রভাকর' গ্রন্থের সেই

জয় ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান
জয় জয় ভবপতি,
করি প্রণিপাত এই কর নাথ!
তোমাতেই থাকে মতি!

এ কবিতাটি জানেন না বা পাঠ করেন নাই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বঙ্গদেশে এইরূপ কেহ আছেন কিনা জানি না। তাঁহার কবিতার ন্যায় ভাব প্রণোদিত

শক্তিপূর্ণ নানা জাতির কবিতা অতি অল্প সংখ্যক কবিই আমাদের দেশে দান করিয়াছেন। এক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় সৌভাগ্যশালী লোক অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনে নিজ কবিত্ব সমৃদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন শিষ্য গৌরবেও তিনি ততোধিক যশঃ গৌরব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যত যুগে যে দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রদীপ্ত কিরণ জালে বঙ্গ-সাহিত্য-গগন ঝলসিত হইয়াছিল সেই দুই মহা-পুরুষের প্রথম প্রেরণা প্রথম হাস্য রচনার হাতে খড়ি প্রথম রচনা প্রকাশ শুরু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভাবলেই সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সে শিষ্য দুই জনকে তাঁহাদের নাম আপনাদিগকে বলিবার কৌতুহল অনাবশ্যক-তাঁহারা আর কেহই নহেন আমি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর কথা বলিতেছিলাম। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম ও নাট্য-সম্রাট দীনবন্ধু এই ঈশ্বরচন্দ্রের স্নেহ তরুর অন্তরালে রহিয়াই একদিন আপনাদের আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই দুই তরুণ শিষ্যের শুভ্র ললাটে বীণাপানি তাহার অতি শৈশবেই যশের যে উজ্জ্বল গৌরব রশ্মি রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা সাধক কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

ঈশ্বরচন্দ্ররূপী প্রদীপ্ত তপনের লোহিত রশ্মি যখন কাব্যগগণের পশ্চিম সীমান্তে কালের অজ্ঞাত কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে লুকাইয়া গেল তখন নিদ্রিত—দুঃখমগ্ন শোকাকুল বঙ্গবাসী দেখিতে পাইল এ দুইটী তরুণ বিহঙ্গ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বিশীর্ণ তরুশীর্ষে বসিয়া আছে। একটীর কণ্ঠে সঙ্গীতের মধুর নিক্কণ অপরের কণ্ঠে রুদ্রলীলার তরঙ্গ গর্জ্জন। তখন গভীর রজনীতে সকলে অলস অবশ ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গে তাহারা শুনিতে পাইল একটী বিহঙ্গ তান ধরিয়াছে—

রাত পোহাল ফরসা হল
ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা
জুটলো অলিকুল।
পূর্ব্ব ভাগে নবীন রাগে
উঠলো দিবাকর
সোণার বরণ, তরুণ তপন
দেখ্‌তে মনোহর।

এখানে দীনবন্ধুর আলোচনা আমরা করিবনা, তাঁহাকে নাট্যকার রূপে দুরে রাখিলে আমাদের অন্যায় হইবে না। নাট্য সাহিত্যের দিক্ দিয়াই তিনি আমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা ক্ষুদ্র হইলেও স্বর্ণ-মুষ্টি। সে স্বর্ণমুষ্টি সুরধুনী কাব্য। ঐ কাব্যে আমাদের দেশের তৎকালীন নাগরিক ও পল্লী জীবনের যে সুমধুর চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা একহিসাবে আমাদের বাঙ্গলার ইতিহাসের অভিভূত করিয়া লইলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। সেত শুধু প্রাণময়, নির্জীব কঙ্কালের সুন্দর সুঠাম লাবণ্য ময় দেহে রূপান্তরিত হইতে প্রাণধারণ যেমন এক আশ্চর্য্য ভীতি ও বিস্ময়ের ভাবোদ্রেক হয় তেমনি দীনবন্ধুর সুরধুনীর কল কল ধ্বনির তালে তালে অতীতের যে সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বাস্থ্যময়ী পল্লীজননীর চিত্র দেখিতে পাই তাহা আমাদের বর্ত্তমানের গর্ব্বোদ্ধত শ্মশানের বিভীষিকাপূর্ণ হাহাকার ধ্বনি পরিপূরিত বৃথা অট্টহাসির পরিম্লান ছবিকে আরও অধিকতর ম্লান করিয়া দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের প্রদীপ্ত সূর্য্য। তাঁহাকে ঘিরিয়াই বঙ্গ গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রহ উপগ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে কাব্য রচনায় মননিবেশ করিয়াছিলেন 'ললিতাও মানস' নামে একটী ক্ষুদ্রকাব্য এবং কয়েকটী খণ্ড কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু সে সকলের যে কোন স্থায়ী মূল্য নাই সে সম্বন্ধে কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু বঙ্কিম সূর্য্য যখন শৈশব গগনের ঘন ঘোর কুহেলি তিমির ভেদ করিয়া মধ্য গগনে উদিত হইলেন তখন সকলে বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কি প্রভা! কি তেজ! দিকে দিকে প্রদীপ্ত আলোক রশ্মি অন্ধকার দুর করিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধকার নাই—অন্ধকার নাই! মাতৃভাষা আমাদের দীনা নহে ইংরেজী শিক্ষিতের সে ঘৃণার পাত্র নহে সে যে অপূর্ব্ব বৈভবশালিনী বিশ্বজনমনোমোহিনী দেবী জগদ্ধাত্রী

সে শুভ দিনে কোটি কোটি কণ্ঠে কোটি কোটি মানব সন্তান গগন বিদারি ভৈরব মন্ত্রে গাহিয়া উঠিল 'হে ভাষা জননি! কে বলে মা তুমি অবলে

এত কথা বলিতে বলিতে এক জনের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। সে "সুধীরঞ্জন" প্রণেতা ৺ দ্বারকানাথ অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর ন্যায় ইনিও গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য শিষ্য ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজী ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভ্রমণার্থ কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। সেই সময়ে দ্বারকানাথ "মনেরপ্রতি উপদেশ" নামক একটী কবিতা লিখিয়া গুপ্ত মহাশয়কে উপহার দেন। গুপ্ত মহাশয় এই কবিতাটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং উহা 'প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ করিয়া লেখককে উৎসাহ প্রদান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের সহিত যে কবিত্বের প্রতিযোগীতা চলিত তাহাতে কখনও দীনবন্ধু কখনও বঙ্কিমচন্দ্র এবং কখনও দ্বারকানাথ জয়ী হইতেন। দ্বারকানাথ বঙ্গ সাহিত্যে বেশী কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই তথাপি যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন—কবিতা প্রিয় রসজ্ঞ ভাবুকের নিকট উহা চির সমাদৃত রহিবে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়া ছিলেন—"যদিও আমাদিগের কবিবর অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই তথাচ তিনি যে তাঁহার "সুধীরঞ্জনে" চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদিগের বঙ্গভাষা যে একটী অমূল্য অলঙ্কার হারাইয়াছেন তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। অদ্য আমরা যে বঙ্কিম বাবুর লেখনী নিস্যন্দিত অজস্র অমৃত রাশি পান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি, এবং যে দীনবন্ধু বাবু এতদিন কাব্য রসে বঙ্গবাসীদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন আমাদিগের কবিবর ইঁহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন"। এই উক্তি আমাদের নিকট বর্ত্তমান সময়ে অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও সেকালে যে উহা অত্যুক্তি বিবেচিত হইত না আহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎসাময়িক কয়েক জন কবিভ্রাতা কর্ত্তৃক "প্রভাকর" পত্রিকায় যে সকল আক্ষেপ সূচক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার দুইটী পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

শশধর সম তুমি, যশধর ছিলে।
কি কারণে যশ সেতু, ভঙ্গ করি দিলে?

দ্বারকানাথের

দয়ার সাগর, সর্ব্ব-গুণাকর,
যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদয়
জন্ম মৃত্যু অনুগামী।

আর তাঁহার

আহা! কি আশ্চর্য্য মায়া
মায়ের অন্তরে,
জীবের মঙ্গল হেতু সদাবাস করে

বোধ হয় সকলেরই কণ্ঠস্থ আছে। "বঙ্গভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার কথোপকথন" শীর্ষক কবিতাটিতে উভয়ের কলহ বড়ই আনন্দ দায়ক রস সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। ইংরেজী ভাষা বঙ্গভাষাকে বলিতেছে—

কিছুই বলিতে নারি, তুমি কি ভাবের নারী,
কে বুঝিবে তব আচরণ।
পরি হরি সুধাকর, যুড়াইতে কলেবর,
খদ্যোতের নিয়াছ শরণ।

ইংরেজী ভাষার এইরূপ উক্তি শুনিয়া বঙ্গভাষা গর্জ্জিয়া বলিল,—

'কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার।
চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার॥
সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ।
শশি কি কখন পারে শোভিতে আকাশ॥
কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবেনা কভু গোস্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥'

এইরূপ নানা বাদানুবাদের পর ইংরেজী ভাষা বিজয়িনী হইলে দীনা বঙ্গভাষা মিনতির সুরে কহিলেন,—

এ জগতে সতি, তুমি গুণবতী,
তোমারে শিখাব কিবা।
তবেগো সুন্দরী! যদি কৃপাকরি
আমারে প্রসাদ দিবা।
তোমার সহিতে, সাক্ষাৎ করিতে
আইলে যুবক সবে।
মোর দিব্য লাগে, সকলের আগে
এই কবি কথা কবে॥
স্বদেশীয় ভাব, শিখিতে উল্লাস,
না হয় অন্তরে যার।
বিধাতার ভুলে, মানবের কুলে
জনম হয়েছে তার।

মদনমোহন তর্কলঙ্কারও এ যুগের কবি। তাঁহার রচিত 'বাসব দত্তা' অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছিল।

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'

এই কবিতাটী শিশু পাঠ্য হইলেও এমন মনোরম সরল ও সুন্দর কবিতা এপর্য্যন্তও রচিত হয় নাই।

ইহাদের কিছু পূর্ব্বে মধুসূদন মধুচক্র রচনা করিয়া গৌড়জনের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন—হেমচন্দ্র শিঙার রবে নব উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন—

নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ রচনা করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আমাদের নির্জ্জিব বঙ্গভাষায় এই তিনটি কবির কবিত্ব প্রভাব কত দূর শক্তি বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত ইংরেজী প্রভাবের প্রভাবিত হইয়া ইঁহারাই কাব্য-সাহিত্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদ, নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" এবং হেম বাবুর "বৃত্র সংহার" বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি। তিনজন কবির কবিতার বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমরা আমাদের সমাজের বক্তব্যের গতি এখন অন্য ভাবে প্রবাহিত করিব।

এই যুগে একদল প্রাচীন কবিগণের ভাব প্রণোদিত কবির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর কেহ কেহ বা কবির দল, পাঁচালীর দলের গায়কছিলেন। আবার কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষিত না হইলেও বঙ্গভাষায় অসাধারণরূপ শিক্ষিত এবং মহামহিমান্বিত সাধক ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল ফিকির চাঁদের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। কাঙাল ফিকির চাঁদের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত সুধায় এক সময় বঙ্গের হাট মাঠ ঘাট সর্ব্বত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীতই পরমার্থ জ্ঞাপক। এখানে দুই একটীর উল্লেখ করা গেল,—

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ওরে ফল খেয়ে যোরে যে গাছ দেখে না॥
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়ছে আবার খসিয়ে
ওরে আগুণেতে পুড়ছে ঘাস গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে!
মরছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবুলোকে করছে মনে আমার মরণ হবেনা হবেনা!
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় সবাকার
তখন ইচ্ছাপরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার!
লোক এমন অবোধ ভাই, হাতের সম বলনাই।
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না॥
কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙালে,
ঈশ্বর কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে!
আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক্ কর তাই,
পর দেখ্‌ব আছেন তিনি
ভাব্‌তে কিছু হবেনা হবেনা!

আবার

ওরে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি,
মনে একবার ভেবে দেখ্‌লে!
মানুষ করে যখন ধন উপার্জ্জন,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে,
সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে ॥
যদিরে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন,
নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো,
নাহি ডাকে বাবাবলে ॥
দিয়েরে ছাই উদরে, সিন্ধুক পুরে,
ধন দৌলত রেখেও মলে ॥
শ্মশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন,
একখানা ছেঁড়া চাটাই ফেলে।
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে
সেথার শরীর মাটী করলে,
শ্মশানেতে লবে যখন, হয়ত তখন,
তিনি দেবেন গোবরগুলে।
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে,
খেটে খেটে জন্ম এখন এই শেষ কালে।
বুড়োবলদের মত, কষ্ট কত,
স্থান না পায় আর কোন স্থলে ॥

এই সকল সঙ্গীত সংসারের ভিতর নিয়ত বৈরাগ্যের বিভীষিকা আনয়ন করে। ঠিক এইরূপ পরমার্থ জ্ঞাপক কবিতা রচয়িতাগণের মধ্যে পালন সা ফকির, পাগলা কানাই, সুধারাম বাউল, কৃষ্ণচান্দ্র পাঠক প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতাগণের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃত কবি হৃদয়ের ও গূঢ় আধ্যাত্মতত্ত্ব সমূহের সরল ও সহজ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল কবিগণের ও সঙ্গীত রচয়িতা গণের বিবিধ রচনা যত্নের সহিত সংগৃহীত হইতেছে।

যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যাহ্ন গগনে উজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন—যখন তিনি 'বঙ্গ দর্শন' প্রচার করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য সমাজে প্রতিভাবান কৃতী সাহিত্যিক মণ্ডলী গঠিত করিয়া নবভাবে নবছন্দে বঙ্গবাসীর তৃষিত হৃদয় মরুতে রসাল নন্দনের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহার অল্প কিছুদিন পরেই পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মা তীরের বিক্রমপুরের এক সাধক পুরুষ ঢাকা নগরীর পুণ্যপীঠে 'বান্ধবের' পুণ্য-প্রদীপ জ্বালিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দীনামলিনা সাহিত্য জননীর সাধনার জন্য ঋত্বিকবেশে আরতির শুভ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার সেই আহ্বানে বড় কেহ একটা শ্রবণ করে নাই। কেবল কবি দীনেশচরণ আর কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় সঙ্গীতের সুমধুর স্বর-লহরীতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ বাবুর—

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনেও! সঙ্গীতটী যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে—ততদিন ঐ স্বর লহরী কোন বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। দীনেশচরণ বসুর "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরণের বেদনা" সঙ্গীতটীও এ সময়েই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন পশ্চিমবঙ্গে একটী সাহিত্য-কেন্দ্র গড়িয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলির শুভ অভ্যুদয় হইয়াছিল—দুর্ভাগ্যের বিষয় কালীপ্রসন্ন তেমন কিছু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় কি দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা সর্ব্বসাধারণই বিবেচনা করিবেন।

যখন পূর্ব্ব পশ্চিমে বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন রূপী দুই ভীষণ গিরিবর্ষ্ম উচ্চশীর্ষে গগন চুম্বন করিতেছিল—সে সময়ে দুই গিরিবর্ষ্মের মধ্যদিয়া এক নির্ঝরিণী বাহির হইয়া আসিল। সে ঘুমাইয়াছিল--উপল বুকে নীরবে আপনার সুখসুপ্ত শয্যায় সুখশায়িত ছিল—সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিল সে মৃদুস্বরে গাহিয়া উঠিল—সে স্বর বড় মধুর বড় কোমল কিন্তু দৃঢ় আবেগ পরিপূর্ণ। সে গাহিল—

আমি—ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটি",
হেসে খল, খল গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান!
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।

এসময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস, অক্ষয়কুমার, রজনীকান্ত প্রমুখ কবিগণের শুভ অভ্যুদয় হইল। মহিলা কবিগণ কবিতার প্রাণে ভাব বিভোর চিত্তে পৌরষ কণ্ঠের সহিত কমনীয় রমণীর কণ্ঠ মিলাইলেন। স্বর্ণকুমারী, গিরিন্দ্র মোহিনী, মানকুমারী কামিনী রায় প্রভৃতির কথা বলিতেছি। তারপর নির্ঝরিণী যখন ক্রমশঃ স্রোত পথে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন চারিদিক অপূর্ব্ব ফলে পুষ্পে সুশোভিত করিয়া সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডী ভেদ করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এক অপূর্ব্ব বাণী শুনিতে পাইলাম—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়,
যে প্রাণ-তরঙ্গ মালা রাত্রি দিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোম কূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী—জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন,
আমার নাড়ীতে আজ করিছে নর্ত্তন।

এই বিশ্বপ্লাবিনী শক্তি লইয়াই রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। রবীন্দ্রনাথের কণামাত্র প্রভাব লইয়া বর্ত্তমানের নবীন কবির দল কাব্যসাহিত্যে আনাগোনা করিতেছেন। তাহাদের বিষয় আমি বর্ত্তমান কাব্য সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের বিষয়ও উক্ত প্রবন্ধেই আলোচনা করিব। প্রবন্ধের বিষয়টী অতীব গুরুতর। উপযুক্ত গ্রন্থাভাবে আমি তেমন করিয়া আলোচনা করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান কাব্য সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বর্ত্তমান যুগের কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তারিতরূপে আমার মন্তব্য জ্ঞাপন করিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বর্ষা-আবাহন।

এসো ঝিল্লীর মঞ্জীর ঝনঝননে—
এসো মন্থর মারুত-সঞ্চলনে!
এসো কঙ্কনবাদনে সুন্দরী হে!
নব গৌরব-উন্নত শুভ্র দেহে!
এসো মন্দার মাল্যে ললাট ঘেরি,
এসো কুন্দের গুচ্ছে শ্রীহস্তে ধরি!
এসো চঞ্চল অলিকুল-গুঞ্জরণে
এসো লুণ্ঠিত অঞ্চল সঞ্চলনে!
এসো পূর্ব্বাকাশে তুমি শুভ্রবেশে
এসো নিবিড় তিমিরে তুমি মুক্ত কেশে!
এসো পারিজাত-নিন্দিত মাল্যপরি,
নব বিশ্ববীণা তব হস্তে ধরি।
এসো শঙ্কিতচিত্তে আনন্দময়ি!
এসো মর্ত্যে মানবমনে দেবী অয়ি!
এসো নবঘন-অঞ্চলে সজলধারে
এসো কুসুমফোটান তব বাঁশির স্বরে—
এসো পুলক-শিহর সাথে শ্যামলবাসে;
এসো বরণে বরণে রাঙা নূতন বাসে!
এসো কবি-চিত-বন্দিতা!
মূরতি অনিন্দিতা!
মল্লার-রাগিণী-নন্দিতা হে—।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'জামাদল্ আখির্ মাসে যখন সম্রাট আকবর সেরগড়ে (কানোজে) শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি সিংহাসন বত্রিশ নামক একখানা পুস্তক আমাকে প্রদান করেন; ইহা মালবপতি রাজা বিক্রমজিৎ সম্বন্ধীয় বত্রিশটী আখ্যায়িকা সম্বলিত, এবং তুতি-নামার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সম্রাট আমাকে গদ্যে এবং পদ্যে ইহার অনুবাদ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া অনুবাদের এক পৃষ্ঠা সেই দিনই দেখাইতে আদিষ্ট হই। একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমার নিকট এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দিন আমি প্রথম আখ্যায়িকাটির প্রারম্ভ ভাগ হইতে এক পৃষ্ঠা অনুবাদ করিয়া সম্রাটের নিকট স্থাপন করিলে উহা তাঁহার মনোনীত হইল। অনুবাদ সমাপ্ত হইলে আমি উহা "নামা এ—খিরাদ্—আফ্জা" (৫৩) নামে অভিহিত করিলাম; এই নামের মধ্যেই গ্রন্থ রচনার তারিখ কৌশলে নিহিত আছে। সম্রাট কর্ত্তৃক এই অনুবাদ গ্রন্থ অতি সন্তোষের সহিত গৃহীত হইয়া রাজকীয় পাঠাগারে স্থাপিত হইল।' (৫৪)

সম্রাট আকবরের আদেশে কাশ্মীরী ভাষায় লিখিত একখানা কাশ্মীরের ইতিহাসের শেষার্দ্ধ পারসীক ভাষায় অনুদিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকাতে "মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রবন্ধে বদাউনীর জীবন বৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"(বদাউনী) হিন্দীতে লিখিত একখানি কাশ্মীরের ইতিহাসও সংক্ষিপ্তাকারে ভাষান্তরিত করেন। এখানি যে রাজতরঙ্গিণী নহে, তাহার প্রমাণ আছে।" (৫৫) দুর্ভাগ্য বশতঃ, অধ্যাপক মিত্র মহাশয় কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই, এবং আমরাও কোন পারসীক ইতিহাসে তাঁহার উক্তির পোষকতায় কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। পক্ষান্তরে, বদাউনী প্রণীত মুন্তাখাবু—ত্ তারিখ্ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক অধ্যাপক W. H. Lowe আলোচ্য কাশ্মীরের ইতিহাসখানাকে রাজতরঙ্গিণী বলিয়াই

(৫৩) গ্রন্থের নামের অর্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী'। এই নামের মধ্যে গ্রন্থ রচনার তারিখও নিহিত আছে। যথা,—৫০+১+৪০+৫+৬০০+২০০+৪+১+৮০+৭+১—৯৯৯।

(৫৪) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t Tawarikh*, Vol. ii., p. 186.

(৫৫) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ১৮৪ পৃঃ।

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৫৬) প্রকৃত প্রস্তাবে, বদাউনী প্রদত্ত উক্ত গ্রন্থের বিবরণের সহিত ও রাজতরঙ্গিণীর যথেষ্ট ঐক্য বর্ত্তমান। এরূপাবস্থায় Lowe সাহেবের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

আইন্-ই আকবরীতে (৫৭) এবং বদাউনীর গ্রন্থে বর্ণিত কাশ্মীরের ইতিহাসের পারসীক অনুবাদের বিষয় উল্লিখিত আছে। মুন্তাখাবু-ত্ তারিখ হইতে এই অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

'কাশ্মীর-পতি সুলতান জিন্-উল্-আবিদিনের আদেশে সুবিখ্যাত পণ্ডিত সাহাবাদ নিবাসী মোল্লা শাহ্ মহম্মদ হিন্দুগণের মিথ্যোক্তি পূর্ণ কাশ্মীরের ইতিহাসের কতকাংশের অনুবাদ করিয়া উহা "বাহ্‌র্-উল্-আস্‌মার" (৫৮) নামে অভিহিত করেন; উহার অধিকাংশই তৎকালে অনূদিত হয় নাই। এই বৎসর (৯৯৯ হিঃ অব্দ, অথবা ১৫৯০—৯১ খৃষ্টাব্দ) সম্রাট (আকবর) আমাকে (বদাউনী) ঐ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাসখানা সম্পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। উহার ৬০ "জাজ্" (juz) ব্যাপী শেষ্ খণ্ড খানা পাঁচমাস মধ্যে অনুবাদ করিয়া দিতে আমি আদিষ্ট হই। এই সময়ে সম্রাট একদিন রাত্রে আমাকে তাঁহার শয়নাগারে আহ্বান করিয়া তদীয় শয্যার পাদদেশে আসন প্রদান করিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায় হইতে আখ্যায়িকাবলী শ্রবণানন্তর বলিলেন,—"সুলতান জিন্-উল্-আবিদিনের আদেশে অনূদিত 'বাহ্‌র্-উল্—আস্‌মার্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড আয়াসবোধ্য প্রাচীন পারসীক ভাষায় লিখিত, সুতরাং আপনি সহজ ভাষায় পুনরায় উহার অনুবাদ করুন; এবং আপনার লিখিত মূল লিপি সযত্নে রক্ষা করিবেন।" আমি সানন্দে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। আমি অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিতেই সম্রাট আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ১০,০০০ টঙ্কা এবং একটি অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন। মহান্ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর দুই তিন মাস মধ্যে আমি এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে আশা করি। ৫৯

'এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য আমি দুই মাসে শেষ করি, এবং উহা পর্য্যায় অনুসারে সম্রাটের নিকট পঠিত হইবার জন্য রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত হইল।' ৬০

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোল্লা সিরি নামক জনৈক কবি ছিলেন; তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানও পর্য্যাপ্ত ছিল। তৎকর্ত্তৃক হরিবংশ এবং কালীয়দমন অনুবাদের বিষয় 'আইন্-ইআকবরী'তে উল্লিখিত আছে। 'মৌলানা সিরি শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত হরিবংশ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করেন। সম্রাটের আদেশে এই গ্রন্থকারই কালীয়দমন গ্রন্থের একখানা নূতন অনুবাদ করিয়া "আয়ার দানিশ" নামে উহা প্রকাশিত করেন। মূল গ্রন্থখানা কার্য্য মূলক জ্ঞান সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ, এবং কঠিন ভাষায় লিখিত। নস্‌রুল্লাই মুস্তোফী এবং মৌলানা হোসেন্—ই ওয়াইজ উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিলেও, তাঁহাদের ভাষা কঠিন এবং অভিনব শব্দাবলী সমন্বিত।' ৬১

সূর্য্যপূজায় সম্রাট আকবরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহা মুসলমান যুগের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত

(৫৬) বর্ত্তমান প্রবন্ধের ৫৮নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫৭) "The History of Kashmir, which extends over the last four thousand years, has been translated from Kashmirian into Persian by Maulana Shah Muhammad of Shahabad."—BLOCHMANN, *Ain-i-Akbari*, Vol. i., p. 106.

(৫৮) "*Bahr-ul-asmar* means 'the Sea of Tales.' It is probably the *Rajatarangini*, "The Ocean of Kings," the only piece of History in Sanskrit. The *Katha Sarit Sagara* could hardly be meant."—W. H. LOWE, *Muntakhabu-t Tawarikh*, 1884, Vol. ii p. 415, foot note.

(৫৯) W. H. LOWE, *Muntakhab-t ut-Tawarikh*, Vol. ii. pp. 415, 416.

(৬০) *Badaoni*, II. p. 374, as translated by H. BLOCHMANN in his *Ain-i Akbari*, Vol. i., p. 106, foot note.

(৬১) H. BLOCHMANN, *Ain-i Akbari*, Vol. i., p, 106.

আছেন। সম্রাট নিজেও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সূর্য্যের ১০০১টি সংস্কৃত নাম সংগ্রহ করাইয়া একত্র গ্রথিত করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে ঐ নাম-সাহস্রিকা আবৃত্তি করিতেন।৬২

সম্রাট আকবর কেবল যে সংস্কৃত গ্রন্থই পারসীকে অনুবাদ করাইতেন, তাহা নহে। যাহাতে মুসলমানগণের ন্যায় তাঁহার হিন্দু প্রজাগণের সাহিত্য ভাণ্ডারও পুষ্টিলাভ করে, তজ্জন্য তিনি পারসীক ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী সংস্কৃতে অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উলুগ্ বেগ্ প্রণীত "জিচ্-ই-জাদিদ্-ই-মির্জাই" নামক পারসীক ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্রন্থ সম্রাট আকবরের নির্দেশক্রমে গ্রন্থকারের সহায়তায় আমির ফতেউল্লা সিরাজি নামক জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত এবং কিষণ্ যোষী, গঙ্গাধর মহেশ ও মহানন্দ নামক হিন্দু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত হয়। (৬৩)

অতঃপর আমরা আকবরের সভাকবি সুপ্রসিদ্ধ ফৈজী কর্ত্তৃক অনুদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত পঞ্চতন্ত্রের সার-সঙ্কলন হিতোপদেশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হয়, এবং সেই পহ্লবী অনুবাদ অবলম্বনে "বিদ্‌পাইর আখ্যায়িকাবলী" (Fables of Bidpai) নামে উহার পারসীক অনুবাদ হয় বলিয়া আমরা জানিতে পারি। (৬৪) এই পারসীক অনুবাদক কে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়। বদাউনী তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'১০০৩ হিঃ অব্দে সম্রাট আকবর কবিশ্রেষ্ঠ ফৈজীকে "পঞ্জ্ গঞ্জ্" (punj ganj) রচনা করিতে আদেশ করেন।' (৬৫) এই "পঞ্জ্ গঞ্জ্" এবং পঞ্চতন্ত্র অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। এই অনুমান যথার্থ হইলে ফৈজীই পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

ফৈজী যে সংস্কৃত গ্রন্থাবলী পারসীকে অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে নলদময়ন্তীর অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবুল্‌ফজল্, বদাউনী, প্রভৃতি আকবর রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ সকলেই এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন্-ই আকবরীতে আবুল্‌ফজল্ লিখিয়াছেন,—'নল ও দময়ন্তীর প্রেমকাহিনী হৃদয়বান্ পাঠকের অন্তঃকরণ করুণ-রসে আপ্লুত করে; এই হিন্দী (অর্থাৎ হিন্দুগণের ভাষায় লিখিত) আখ্যায়িকা আমার ভ্রাতা ফৈজী-ই-ফৈজী "লায়লি মজ্‌নুর" অনুরূপ "মস্‌নবি" (masnavi) ছন্দে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন; এই গ্রন্থ এখন সর্ব্বত্র "নল-দমন" নামে সুপরিচিত।" ৬৬

এই অনুবাদ সম্বন্ধে "মুন্তাখাবু-ত্-তারিখ্" গ্রন্থে বদাউনী লিখিয়াছেন,—'১০০৩ হিঃ অব্দে মাত্র পাঁচ মাস সময় মধ্যে ফৈজী নল-দমন গ্রন্থ (নল ও দময়ন্তী পরস্পর প্রেমাবদ্ধ রাজদম্পতি; ইঁহাদের আখ্যায়িকা ভারতে সুপরিচিত) অনুবাদ করেন; ইহা ৪,২০০ শ্লোক সম্বলিত। ফৈজী নজর স্বরূপ কতিপয় আসরফি সহ এই অনুবাদ সম্রাট সকাশে উপস্থাপিত করেন। এই গ্রন্থ সম্রাটের মনঃপূত হয়, এবং তিনি ইহার চিত্র-সম্বলিত সুদৃশ্য অনুলিপি করিতে আদেশ প্রদান করেন। সভাস্থলে পঠিতব্য পুস্তকাবলীর মধ্যে ইহা রক্ষিত হয়, এবং নকিব খাঁ ইহা সম্রাট সকাশে পাঠ করিবার জন্য নিযুক্ত হন। রচনা মাধুর্য্যে এই গ্রন্থ প্রকৃতই একটি "মস্‌নবি;" এবং দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি আমির খস্রুর পরে এরূপ সুললিত কাব্য গত তিন শত বৎসর মধ্যে রচিত হয় নাই।' ৬৭

(৬২) W. H. LOWE *Muntakhabu-t-Tawarikh*, Vol. ii., p. 332.

(৬৩) FRANCIS GLADWIN, *Ayeen Akbery*, (Ed. by Jagadis Mukhopadhaya, Calcutta), p. 85; H. BLOCHMANN, *Ain-i Akbari*, Vol. i., p. 104.

(৬৪) *Memoire* prefixed to S. DE. SACY'S edition of *Calilah wa Dimnah*, Paris, 1816; *Biographic India, Universelle*, tom. xxi., p. 471; ELLIOT, *History of* Vol. v., pp. 571, 572.

(৬৫) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t-Tawarikh*, Vol. ii., p. 510.

(৬৬) H. BLOCHMANN, *Ain-i Akbari*, Vol. i., p. 106.

(৬৭) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t-Tawarikh*. p. 410.

বদাউনী হিন্দুভাবাপন্ন ফৈজী ও আবুল্ ফজলের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। শত্রুর লেখনীপ্রসূত এই প্রশংসাবাদ ফৈজীর অসামান্য প্রতিভা ও কবিত্বের পরিচায়ক। ফৈজী নিজেও নল-দময়ন্তী গ্রন্থখানার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে গ্রন্থশালা রাখিয়া যান, তাহাতে নানাবিষয়ক ৪৬০০ শত পুস্তক সুরক্ষিত ছিল। তন্মধ্যে ১০১ খানা তৎ-রচিত "নল-দমন" গ্রন্থ পাওয়া যায়, বদাউনী এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। ৬৮

গণিত শাস্ত্রেও ফৈজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত (৬৯)এবং লীলাবতীর পাটিগণিত সংস্কৃত হইতে পারসীকে অনুবাদ করেন। আইন্-ই আকবরীতে আবুল্ ফজল্ লিখিয়াছেন,—'ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত পাটিগণিত সমূহের মধ্যে লীলাবতীর গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট। হিন্দুর অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া উহা আমার ভ্রাতা সেখ আবদুল ফৈজী-ই ফৈজী কর্তৃক পারসীক বেশে সজ্জিত হইয়াছে! (৭০) Dr. Taylor এই লীলাবতী গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি, লিখিয়াছেন—'ফৈজীকৃত লীলাবতীর অনুবাদে মূল গ্রন্থের অনেকাংশ বাদ পড়িয়াছে, এবং মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও পারসীক অনুবাদে এত অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, ফৈজী সহকারীগণ প্রদত্ত মর্ম্মার্থ অবলম্বনেই তদীয় পারসীক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মনে স্বভাবতঃই এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়।' ৭১

ফৈজী যে কেবল এই সংস্কৃত পুস্তক কয়েক খানারই অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে। মহাভারত, অথর্ব্ববেদ, প্রভৃতি অনুবাদ কালেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আকবরের রাজত্বকালে যে সকল পারসীক অনুবাদ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ফৈজীর নেতৃত্বাধীনে সম্পাদিত। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন মুসলমান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদ্বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ খ্যাতি আছে যে, ফৈজীই মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ হন, এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এমনকি বিশেষজ্ঞগণ পর্য্যন্ত এই ভ্রম হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাহা প্রবন্ধারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। ফৈজীর সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। Dow প্রণীত ভারতের ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ আছে।

সেখ মোবারক অতি উদার ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ফৈজী ও আবুল্ ফজল্‌কে তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম এবং গূঢ় বার্ত্তাসমূহ অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া সম্রাট আকবর মোবারকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফৈজীকে সংস্কৃত শিক্ষার্থ হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র বারাণসীতে প্রেরণ করেন। বারাণসীর তাৎকালীন কোনও বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষার্থী রূপে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলে অধ্যাপক প্রিয়দর্শন, মেধাবী ফৈজীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। গুরুগৃহে দশবৎসর কাল অবস্থান করিয়া ফৈজী সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং এমন কি বেদ শিক্ষা করেন। তথায় অবস্থান কালে ফৈজী অধ্যাপকের একটি সুন্দরী কন্যার প্রতি আসক্ত হন, এবং অধ্যাপকও তাঁহাকে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হন। অপত্য নির্ব্বিশেষে যিনি এই সুদীর্ঘকাল শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করা অবিধেয় জ্ঞানে ফৈজী গুরুর নিকট সরলভাবে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করেন। যবনকে বেদ শিক্ষা দান করাতে এবং যবন সংস্পর্শে জাতিপাত হইয়াছে বিবেচনায় শোকে মুহ্যমান হইয়া অভিমানদৃপ্ত ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। ফৈজী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কৃত পাপের জন্য যে কোন

---

(৬৮) *Tarikh-i Badauni*, in ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 549.

(৬৯) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র।—"ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন," ২য় বর্ষ, ১০৫ পৃঃ। ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিতের বিষয় কোন পারসীক ইতিহাসে উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

(৭০) H. BLOCHMANN, *Ain-i-Akbari*, Vol. i., p. 105.

(৭১) Dr. TAYLOR, *Lilavati*, p. 2.

প্রকার শাস্তি অথবা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণে প্রস্তুত হওয়ায় অধ্যাপক আত্মহত্যা হইতে সংবৃত হইলেন। গুরুর ইচ্ছানুযায়ী ফৈজী তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, কখনও বেদের অনুবাদ করিবেন না, এবং হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম কখনও অভিব্যক্ত করিবেন না। (৭২) সম্ভবতঃ এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়াই ফৈজী পরবর্ত্তী কালে সম্রাটের নিদেশ সত্ত্বেও অথর্ব্ববেদের অনুবাদ কার্য্য হইতে নিজে বিরত থাকেন। (৭৩)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বদরি নারায়ণের পথ ছাড়িয়া আজ আমরা কেদারের পথে চলিতেছিলাম। এখানে পথ বড়ই কদর্য্য. অনেক স্থলেই বর্ষার ভীষণ জলপ্রপাতে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অতিকষ্টে সে সকল স্থান অতিক্রম করিতে হইতেছিল। পর্ব্বতের উন্নত গাত্র ভেদ করিয়া বন্ধুর রাস্তা চলিয়াছে কোন কোন স্থানে রাস্তা দুই হস্তের অধিক প্রশস্ত নহে, রাস্তার সোজা নীচে মন্দাকিনী, কোন প্রকারে পদস্খলিত হইলেই ধ্রুব মৃত্যু। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিলুবাড়া নামক একটী সুন্দর চটীতে স্থান লইলাম, চটীর ঠিক সম্মুখেই মন্দাকিনীর শীতল স্বচ্ছ জলধারা যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। পরপারে, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ীদিগের সুন্দর ঘরগুলি দেখা যাইতেছিল। তাহাদিগের গমনাগমনের জন্য মন্দাকিনীর উপরে একটী দড়ির ঝোলা বর্ত্তমান। বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছিলেন যে লোহার পুল নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই প্রকার ঝোলার সাহায্যেই দুস্তর পার্ব্বত্য প্রস্রবণ সমূহ অতিক্রম করিতে হইত। আজও বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সাধুগণ বদরিকাশ্রমের কথা বলিতে বলিতে এই সমুদয় ঝোলার ভীষণতার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয়ে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সঞ্চার করিয়া থাকেন। কাজেই রাস্তার অন্তর্গত না হইলেও ঝোলাটী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। বেশ একটু adventure হইবে। জামা জুতা চটীতে রাখিয়া ঝোলা পার হইতে চলিলাম।

ঝোলার নির্ম্মাণ কৌশলও অতিশয় সুন্দর। দুই ধারে পাহাড়ের সঙ্গে মজবুত খোঁটা আঁটকাইয়া, পাশাপাশি করিয়া দুইগাছি শক্ত, গাছের বাকলের কাছি তাহাতে বাঁধা হইয়াছে, সেই কাছির উপর খণ্ড খণ্ড গাছের ডাল পাতিয়া চিকণ দড়িদ্বারা সেগুলিকে কাছিটীর সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেটী হইল পুল, তার আবার রেলিংও আছে। নীচের কাছি দুইটীর প্রায় ৩ হাত উপরে দুইপাশে আরও দুইটী কাছি টানাইয়া নীচের কাছি ও উপরের কাছির সঙ্গে দড়ি জড়াইয়া সে রেলিং তৈয়ারী হইয়াছে।

ঝোলা পার হইতে বাস্তবিকই আশঙ্কায় হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এক একটী গাছের ডালের মাঝে প্রায় ১ হাত করিয়া ফাঁক। প্রায় ২০ গজ নীচে মন্দাকিনীর উন্মাদ প্রবাহ পর্ব্বত ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন প্রকারে পতিত হইলে আর রক্ষা নাই। অতিসন্তর্পণে রেলিংএরদড়ি বগলে চাপিয়া ধরিয়া গুটি গুটি করিয়া পা ফেলিতেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে, দোলের গোপালের মত দোল খাইতেছিলাম। পরপারে পৌঁছিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে পুনরায় ঝোলা পার হইয়া চটীর নিকটে আসিয়া মন্দাকিনীর তীরে একটী সুন্দর প্রস্তরের উপর উপবিষ্ট হইলাম। নীরদ বাবু ঝোলা পার হইয়া অপর পারে যাইয়া বসিলেন,

---

(৭২) DOW, *Indostan*, Vol. i., pp. xxiii, xxiv.

(৭৩) বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুসলমান ধর্ম্মের আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল। অতঃপর মুসলমানগণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আমরা পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আরবে ও পারস্যদেশে সংস্কৃত চর্চ্চা সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে তৎসম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমে তাহার স্বরলহরী জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন ভেদ করিয়া আমার কর্ণে আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার সে সঙ্গীত স্পষ্টই শুনা যাইতেছিল, আবার কখনও বা গঙ্গার গর্জ্জনে তাহা মিলাইয়া যাইতেছিল। নীরদবাবু গাহিতেছিলেন:—

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, গাঢ় ধূমের ন্যায় এক প্রকার নিবিড় কুজ্ঝটীকার অন্তরালে, পর্ব্বত শীর্ষগুলি লুকাইতে ছিল। নীরদ বাবু এবার ঝোলা পার হইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন, উভয়েই চটীতে ফিরিয়া আসিলাম। স্বভাবের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে আজ হৃদয় বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে মন্দিরা ছিল, চটীতে বসিয়া মন্দিরা বাজাইয়া সকলে সমস্বরে, বাউলের সুরে গাহিতে লাগিলাম—

"আর কেন মন এ সংসারে যাই চল সেই নগরে
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে॥"

চটীতে একদল বাঙ্গালী সাধু ব্যতীত অন্য কেহই ছিলনা। কাজেই আমাদের গানের 'সমঝ্‌দার' ও জুটিয়া গিয়াছিল তার উপর, তাঁহারা আবার বেশ 'গুণীলোক', সকলেই বেশ গাহিতে পারেন, আমাদের অনুরোধে দুই একটী ভজন তাঁহারাও গাহিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে মাতৃভাষায় মুখ ভরিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পরদিন খুব প্রত্যুষে বাহির হইয়া পড়িলাম, বাঙ্গালী সাধুগণ আমাদের অনেক পূর্ব্বেই চটী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কাজেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার পার্শ্বে জীর্ণ প্রস্তরের মন্দিরে 'বাল কেদার' দর্শন করিলাম।

তিল বাড়া হইতে ৫॥০ মাইল দূরে অগস্ত্যমুনি নামক একটী বড় চটী, সেখানে মহামুনি অগস্ত্যের প্রস্তরবিগ্রহ সমন্বিত একটী মন্দির আছে। তথা হইতে সামান্য দূর অগ্রসর হইলেই, দূরে শুভ্র তুহিন মণ্ডিত হিমাদ্রির সমুন্নত শৃঙ্গাবলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। নানাকৃতির শৃঙ্গসকলের উপর প্রভাত সূর্য্যের রজত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া একটা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল, সহসা যেন যবনিকার অন্তরাল হইতে স্বর্গরাজ্যের দৃশ্যপট আমাদিগকে মূকের ন্যায় স্তব্ধ করিয়া, নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল, এ যেন শূন্যমার্গে, উপকথা কথিত অমরাবতীর হিরন্ময় প্রাসাদচূড়ার শ্রেণী, একটা অব্যক্ত মধুর ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষনেকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাড়াইয়া সেই কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পূর্ব্বে কল্পনায় তুলিকায়, হৃদয়পটে হিমালয়ের যে নিখুঁত ছবিখানা আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম আজ বাস্তব হিমালয়ের দর্শন লাভ করায়, তাহা নিষ্প্রভ হইয়াগেল। কবিবাক্য আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম "Fact is stronger than fiction"। নিকটেই একজন পাহাড়ী ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এগুলি ৺কেদারনাথ পর্ব্বতের শৃঙ্গ। সে স্থান হইতে কেদার নাথ যদিও প্রায় ৪০ মাইল দূরে তথাপি আমাদের মনে হইতেছিল, যেন আর কতকটা অগ্রসর হইলেই পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিব। একটা নূতন আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতে লাগিলাম। কবির একটী লাইন মনে পড়িয়া গেল, তাহাই গাহিতে গাহিতে চলিলাম।

"অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার কিরিটিনী
অয়ি ভুবন মনমোহিনি।"

মধ্যাহ্নে সৌড়ী নামক চটীতে অবস্থান করিয়া, বৈকালে পুনরায় চলিতে লাগিলাম। চটী পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, আকাশে কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিল, চতুর্দ্দিকের অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী, ঘন কৃষ্ণ মেঘ মণ্ডিত হইয়া প্রলয়ের ভীষণতা ধারণ করিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। নিবিড় মেঘমালার কোলে চকিত বিদ্যুল্লেখা সেই ভীষণতাকেও অনেকটা সরস করিয়া তুলিতেছিল। পরক্ষণেই আবার কর্ণভেদী ঘোর গর্জ্জনে সে ভীষণতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে ত্রাসে কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। আমরা তিনটী বাঙ্গালী যুবক ব্যতীত পথে আর অন্য যাত্রী নাই। 'কাণ্ডিওয়ালাও' অনেক পশ্চাতে রহি-

য়াছে। আশ্রয়ের আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপণ করিতে লাগিলাম কিন্তু চঞ্চল বিদ্যুৎস্ফুরণে, উদাস অচঞ্চল বৃক্ষরাজী ও কঠোর পর্ব্বতশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল না, ঘোর মেঘগর্জ্জন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে যেন উপহাস করিতেছিল। এমন দুর্দ্দিনে, এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে, একান্ত সহায়হীন হইয়া আমরা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলাম। পরবর্ত্তী চটীতে আশ্রয় লাভের আশায় আমরা ভয়ে ভয়ে দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি পরিতে আরম্ভ হইয়া বন্ধুর পথ পিচ্ছিল করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল। সঙ্গে ছাতা ছিল, কিন্তু তাহা খুলিবার জো নাই, কারণ তাহা হইলে প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যাইয়া প্রাণ হারাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছিল, এমতাবস্থায় বসিয়া বসিয়া ভিজিলেই বা প্রাণ রক্ষা হইবে কিরূপে? কাজেই একান্ত নিরুপায় হইয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভিরী নামক চটীতে আশ্রয় পাইয়া ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে দৌলতও আসিয়া পড়িল। সে বেচারা আজ একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। কাপড় চোপর বদলাইয়া ধুনী জ্বালাইয়া শিথিল হস্ত পদ সেঁকিয়া লইলাম রাত্রে ২।১ খান রুটী করিয়া খাইয়া পথের দুর্দ্দশার বিষয় আলাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেদিনকার সেই বিড়ম্বনার কথা আজও মনে স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে, বোধ হয় অনেক দিন থাকিবে। তবে কালের আবর্ত্তনে, বিস্মৃতির জলে সেই ভীষণতা মুছিয়া যাইয়া এখন যেন সে চিত্রটী অনেকটা কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাহা হৃদয়কে তেমন করিয়া কম্পিত করিয়া তুলে না; বরং যেন একটু আত্মপ্রসাদজনিত হর্ষে হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে। তাই বুঝি শ্রীরামচন্দ্রের, বন বাসের কষ্ট, চিত্রদর্শনকালে তাহাকে আনন্দই দিয়াছিল।

প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু—
সংচিন্ত্যমানানি সুখান্যভবন্।

পরদিন প্রত্যূষে কিছুটা শক্ত চড়াই অতিক্রম করিয়া একটী পর্ব্বতশিখরে উপনীত হইলাম। সে স্থানটী অনেকটা উপত্যকার মত দুইদিকে আরও উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী, মাঝখানে ক্ষুদ্রায়তন সমতল পথ। পথের দুই ধারে অসংখ্য পার্ব্বত্য গোলাপের ঝাড়, তাহাতে অগনন গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশ আমোদিত করিতেছিল। আমাদের দেশে কত যত্ন করিয়া, কত সার ছড়াইয়া, তবে দুই একটী গোলাপ গাছ উৎপন্ন করিতে হয় সঙ্কুল কঠোর পর্ব্বতের কোলে কোন্ দক্ষ মালীর যত্নে, কাঁহার উপভোগের নিমিত্ত, তাহারা এমনি করিয়া, সুবাস বিলাইতেছে, কাঁহারই বা চরণনিম্নে তাহারা একটী একটী করিয়া ঝরিয়া পাড়িতেছে?

কিছুটা পথ চলিয়া গুপ্তকাশী পৌঁছিলাম। উত্তরাখণ্ডে গুপ্তকাশী ও উত্তরকাশী নামক দুইটী কাশী বিদ্যমান, এই সকল স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, একজন পাহাড়ী তপ্তকাশী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী আমাদিগকে বলিয়াছিল।

মহাপ্রস্থানের সময়, পঞ্চপাণ্ডব জ্ঞাতিহত্যাজনিত পাপ ক্ষালন করিবার মানসে কাশীবিশ্বেশ্বরের দর্শনাভিলাষী হইয়া বারানসীধামে উপস্থিত হন। বিশ্বেশ্বর তাহাদিগকে দর্শন দিতে অনিচ্ছুক হইয়া, বারানসী হইতে প্রস্থান করিয়া উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করেন। বারানসীতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠীরাদি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন তখন সহদেব গননা করিয়া স্থির করিলেন যে বিশ্বনাথ উত্তরাখণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন, অগত্যা তাঁহারা ও তাঁহার উদ্দেশ্যে সেই দিকে গমন করেন। এইরূপে 'হরদ্বার' দেবপ্রয়াগ, ও রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বিশ্বনাথ ক্রমান্বয়ে প্রস্থান করেন। পাণ্ডবগণও গননাদ্বারা তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। এবার নিতান্ত বিব্রত হইয়া বিশ্বনাথ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন, গুপ্তকাশীতে এবার তিনি ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে

থাকেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ এবারও তাঁহার সন্ধান পাইয়া তথায় উপস্থিত হ৹ ও তাঁহার গুপ্তনিবাস খুঁজিয়া বাহির করেন অগত্যা শিব সেখান হইতেও পলাইতে বাধ্য হন।

যাহা হউক, শিব এখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন বলিয়াই, স্থানটির নাম গুপ্তকাশী হইয়াছে। গুপ্তকাশী স্থানটী অপেক্ষাকৃত জম্‌কাল, এখানে দোকান পসার অনেক আছে। বাজারের ঠিক মাঝখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির। মন্দিরে রৌপ্য নির্ম্মিত যোনীচিহ্ন মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গবিগ্রহ স্থাপিত। মন্দিরের এক পার্শ্বে রৌপ্য নির্ম্মিত নারায়ণের বিগ্রহও আছে। মন্দিরের সম্মুখেই একটী সুন্দর ঝরণা রৌপ্য নির্ম্মিত গোমুখ ও হস্তিমুখ হইতে ঝরণার জল দুইদিক হইতে কুণ্ডে পতিত হইতেছে। মন্দিরের প্রায় দুই মাইল নীচে মন্দাকিনী। তাহার অপর পারে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত 'উমীমঠ' দেখা যাইতেছিল।• গুপ্তকাশী হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে উমীমঠ পড়ে না। কেদার হইতে বদরি যাইবার সময় 'উমীমঠ' হইয়া যাইতে হয়।

• গুপ্তকাশীতে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া, বৈকালে ৫ মাইল চলিয়া বুংমল্লা নামক চটীতে রাত্রিবাস করিলাম। এখান হইতেই হিমালয়ের দারুণ শীতের আভাস পাইতে লাগিলাম। গুপ্তকাশীর পর হইতে প্রায় সকল চটীগুলিতেই লোকের বেশ ভিড় ছিল। কারণ কেদার হইতে বদরি যাইতে, এই রাস্তায়ই ফিরিয়া নালা চটী হইতে ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া, মন্দাকিনী পার হইয়া যাইতে হয়।

প্রত্যূষে বুংমল্লা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সকল পথে অনেক মালসরবরাহকারী ভেড়ারপাল দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী দলে ৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত ভেড়া থাকে। ভেড়া গুলি বড়ই সুন্দর। তাহাদের গায়ের লোম্ খুব লম্বা, মাথায় প্যাঁকা বাঁকা বড় সিং। উহাদের গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে। ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতে করিতে যখন তাহারা সঙ্কীর্ণ পথ গ্রাম অবরোধ করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখায়। কয়েকটী প্রকাণ্ড কুকুর রক্ষকরূপে তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করে। সকলের পশ্চাতে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিহিতা পাহাড়ী রমণীগণ পৃষ্ঠে ছেলে মেয়ে বাঁধিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত সাঙ্কেতিক ধ্বনি দ্বারা মেষগুলিকে চালিত করিয়া থাকে।

মধ্যাহ্নে বদলপুর নামক চটীতে আহারাদি করিলাম। চটীতে বসিয়া 'পথ প্রদর্শিকা' দেখিয়া, চলিবার programme করা হইল। স্থির হইল সেইদিন রামপুর চটীতে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন ভোরে ভিন্ন রাস্তায় 'ত্রিযুগীনারায়ণ' দর্শন করিয়া গৌরীকুণ্ড পৌঁছিব। কিন্তু কথায় কথায় রামপুর পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া আসিলাম, পুনরায় এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কাজেই আসিবার সময় ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া চলিতে লাগিলাম। ত্রিযুগীর পথ ছাড়িয়া. নীচের রাস্তায় সোমদ্বারা আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে মন্দাকিনী ও বাসুকীগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। বাসুকী গঙ্গার উপর লোহারপুল পার হইয়া কয়েকমাইল অতিশয় কঠোর চড়াই করিতে হইল। পথে মুণ্ডকাটা গণেশ দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় গৌরীকুণ্ড পৌঁছিলাম।

গৌরীকুণ্ড স্থানটী বেশ বড়, চারিদিকে বরফ-ঢাকা সাদা পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝখানে চটী, দেবালয়, বাড়ী ঘর ইত্যাদি অবস্থিত, চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশিখর হইতে অনবরত গাঢ় বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া, স্থানটীকে সর্ব্বদাই কুজ্ঝটিকাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের মুখ, এখান হইতে বড় একটা দেখা যায় না, কাজেই শীতের প্রকোপ এখানে অত্যন্ত বেশী। চটীর কিনারা দিয়া বেগবতী মন্দাকিনী ছুটিয়া চলিয়াছে। চটীর অদূরেই মা ভগবতীর মন্দির। মন্দিরের সন্নিকটে একটী কুণ্ডে তুহিন শীতল জলধারা পতিত হইতেছে। অল্প দূরে আর একটী কুণ্ড। তন্মধ্যে পিত্তলের বাঁধান গোমুখ হইতে অপূর্ব্ব তপ্ত জলধারা কুণ্ডে পতিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত শুভ্রতুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী সামান্য উত্তাপও সেখানে, অতিশয় লোভনীয় বস্তু। সেখানে এমন একটী তপ্ত, জলধারা যে কি প্রকার অপূর্ব্ব সামগ্রী তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই তপ্ত প্রস্রবণের

উৎপত্তি সম্বন্ধে দৈবীলীলা সম্বলিত অনেক গল্প এখানে প্রচলিত আছে। সমগ্র যাত্রীগণই পরমপুলকিত চিত্তে, ভক্তিভরে তাহার জলে স্নান তর্পণাদি করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত সৌভাগ্যবান মনে করেন। অবশ্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকের চক্ষে ইহাতে, আশ্চর্য্যান্বিত হইবার, ব. হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার করিবার মত যে কিছুই নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভগবৎ প্রেমিক ভাবুকের চিত্তে যে তাহা পরমেশ্বরের অদ্ভুত দয়ার কথা স্মরণ করাইয়া, একটা ভাবের স্রোত বহাইয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ ভাবের তাড়নায়ই ভক্তহৃদয় আবেগ পূরিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

"দয়ার যাঁর নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে॥"

চটীতে বেজায় ভিড়। কোন প্রকারে একটু স্থান মিলিল। দারুণ শীতে "কুকুর কুণ্ডলী" হইয়া অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করা গেল। উপরে আরও শীত, কাজেই স্থির হইল, এখানেই আস্তানা করিয়া কেদার দর্শন করা যাইবে। দৌলত আমাদের জিনিষপত্র লইয়া এখানেই অপেক্ষা করিবে, আমরা দর্শনান্তে পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিবাস করিব। কেদারনাথ এখান হইতে ১০ মাইল উপরে। যাতায়াতে ২০ মাইল চলিবার কষ্ট স্বীকার করিলে বরফের মধ্যে রাত্রিবাস করিবার ভীষণ কষ্ট হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে।

যথেষ্ট গরম কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া কেদার দর্শনে বাহির হইলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে বাহির হইয়াই দশ মাইলব্যাপী ভীষণ চড়াই তার উপর রাস্তা এমন সঙ্কীর্ণ যে একজনের অধিক লোক তাহাতে পাশাপাশি চলিতে পারে না। রাস্তার বামে কঠোর পর্ব্বত প্রাচীর, দক্ষিণে প্রায় সোজা ১ মাইল নীচে মন্দাকিনী। তার উপর পর্ব্বতের উপরের বরফ গলিয়া জল পড়িয়া, প্রায় সমগ্র রাস্তাটীই অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক কঠিন রাস্তাই বটে! তাই কেদারনাথ 'কেদার কঠিন' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন জয়ধ্বনিতে পার্ব্বত্য প্রদেশ মুখরিত করিয়া যাত্রীর সাড়ি চলিয়াছে। অনেকদিনের কষ্টের পর দেবদর্শনের আশায় সকলেরই হৃদয় উৎফুল্ল। ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। মন্দাকিনীর দুই দিকেই গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সংযোগ সাধন করিয়া দণ্ডায়মান। শৃঙ্গে শৃঙ্গে সাদা বরফরাশি ধব্ ধব্ করিতেছিল, সাদা সাদা মেঘের টুকরাগুলি পর্ব্বতের উপর গা এলাইয়া দিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সুন্দর ঝরণা সকল নামিয়া আসিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া মন্দাকিনীতে পতিত হইতেছে। আহা কি সে অনুপম শোভা! কি সে অদ্ভুত গরিমা! প্রত্যক্ষ না করিলে সে বিরাট দৃশ্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না।

তিন মাইলের চড়াইর পর স্বর্গনিশানী নামক একটী ক্ষুদ্র চটী দেখিতে পাইলাম। তাহা অতিক্রম করিয়া, সাবধানে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। আরও দুই মাইল অগ্রসর হইলেই রামবাড়া চটী। সেখান হইতে কিছুদূর চলিলে একটী গন্ধক মিশ্রিত জলের ঝরণা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সে জলে স্নান করিলে গায়ের খোঁস পাঁচড়া আরোগ্য হয়। এ সকল স্থানে চলিতে সকলেরই গায়ে ও জামায় এক প্রকার কীট জন্মে, তাহাদের দংশনে শরীরে খোঁস হয়, এই জলে গা কাপড় ধুইলে কীটগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতির এই নিভৃত কোণে সামান্য অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে, তৎপ্রতিকারের এমন স্বাভাবিক সুন্দর উপায় কোন্ প্রেমিক হৃদয়ের সৃষ্টি? কে সেই দেবতা যাঁহার প্রাণ আর্ত্তের দুঃখ নিবারণের জন্য এমন করিয়া সচেষ্ট হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে অবিশ্বাসের বালুকামন্দির, নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়, কোন্ এক বিরাট শক্তির পদতলে মস্তক আপনা হইতেই লুণ্ঠিত হইতে চাহে। তাই বুঝি ভাবুক হৃদয় চাক্‌চিক্যময় নগর জনপদ পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতির স্নেহময় ক্রোড়ে আপনাকে চির নির্ব্বাসিত করিতে এত প্রয়াসী। প্রকৃতির ভক্ত সেবক ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

Sweet is the lore which nature brings;
Our meddling intellect

His shapes the beauteous forms of things;-
We murder to dissect.

এখন হইতে রাস্তার দুই পার্শ্বেই পুঞ্জীভূত বরফ রাশি আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে রাস্তার উপরেও বরফ পড়িয়া রহিয়াছে এ সকল বরফ আমাদের কলে তৈয়ারী বরফের মত নহে, এ যেন স্তূপীকৃত শুভ্র কর্পূর রাশি। মাঝে মাঝে জুতা সমেত পদদ্বয় তাহাতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছিল। লাঠির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বরফের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া আমরা সানন্দে পথ চলিতে ছিলাম। কোন কোন স্থানে মন্দাকিনীর জলের উপরে পর্ব্বত প্রমাণ বরফ জমা হইয়া রহিয়াছে, মন্দাকিনীর খরস্রোত, সে বরফ রাশি ভেদ করিয়া সুন্দর খিলানের মত তৈয়ার করিয়া ছুটিয়াছে। এখানে শীত আরও প্রখর, তার উপর ক্রমাগত চড়াই করার পরিশ্রমে আমরা অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। 'এবার আরও কঠিন চড়াই আরম্ভ হইল। যাত্রীদিগের মুখে সেই হর্ষোৎফুল্ল ভাব আর নাই। এখন যেন অনেকেই দারুণ পরিশ্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। ঘন ঘন দেবতাদিগের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে চলিয়াছে। একস্থানে দেখিলাম একটী প্রৌঢ়া পথকষ্টে মূৰ্চ্ছিত প্রায় হইয়া প্রস্তরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, সঙ্গীগণ ভীতচিত্তে তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। অন্যস্থানে একটী বৃদ্ধা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, এক স্থানে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর কণ্ঠে কেদারনাথকে বলিতেছিল:— "এ কেদারনাথ স্বামী, এ বুড়্‌ঢিকা খবরলে" বৃদ্ধার ব্যাকুল ক্রন্দনে মনে বড়ই কষ্ট হইল। আমরাও অতি কষ্টে চলিতেছিলাম, কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই, ক্লান্ত হয়া বসিয়া বসিয়া পড়িতেছিলাম। যজ্ঞেশ্বর বেচারা একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল, নিজেদের অবস্থা গোপন রাখিয়া আমরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম দেব দর্শন করিতে হইলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। আমার মনে হইল এইরূপে পথ চলাই এক প্রকার তপস্যা। অদূরে তুষার স্তূপের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী প্রস্তরের মন্দির দেখা যাইতে লাগিল, মন্দিরের দ্বারে ঘণ্টা নাড়িয়া পূজক চীৎকার করিয়াছিল "এ গরুড়জীকা দর্শন হ্যায়, সোয়ালাখ্ পর্ব্বতকা মালিক হ্যায়, উনকো ভজন করো দর্শন মিল্ যায়গা।" পাহাড়ীগণ বলে যে কেদারনাথ ও বদরির যাত্রীদিগকে সোয়ালক্ষ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, গরুড়জীই এই সকল পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা, তাহাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ দর্শন হয়।

গরুড়জীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী প্রসস্ত উপত্যকায় পৌঁছিলাম। এবার সেই প্রাণান্তকারী ভীষণ চড়াই শেষ হইল, এখান হইতে সমতল পথে প্রায় এক মাইল চলিলেই কেদারনাথের মন্দির। দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধ বরফ ঢাকা পর্ব্বতের সারি, মাঝখানে সম্পূর্ণ তুষারাবৃত সেই উপত্যকা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সিতশুভ্র বরফরাশি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। স্থানে স্থানে গাঢ় কুজ্ঝটিকার ন্যায় সাদা মেঘের টুক্‌রা সকল ভূমি সংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে গুলি ভেদ করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইতেছিল। তাহাতে পরিধেয় ভিজিয়া যাইতেছিল, আর অসহ্য শীতে হস্তপদ আড়ষ্ট হইয়া হাতের লাঠিগাছি ও ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছিলাম না। মাঝে মাঝে হাল্কা বরফ রাশির উপর পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাইতেছিল কোথাও বা এমন এক এক খণ্ড ঘন সন্নিবিষ্ট মেঘের মধ্যদিয়া যাইতে হইতেছিল, যে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবে আমাদের কণ্ঠ নিঃসৃত সঘন জয়ধ্বনী আমাদিগের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিতেছিল। সহসা সুদূর বাঙ্গালার নিভৃত কোন অবস্থিত আমাদের সেই পল্লীকুটীরের কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। যেখানে, শরতের আকাশে ধীর মন্থরগামী শুভ্র মেঘের টুক্‌রাগুলি দেখিতে দেখিতে শৈশবে কত কথাই না ভাবিয়াছি। কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, ভাবিতাম মেঘগুলি কত উচ্চে অবস্থিত? অত উচ্চে কি মানুষ উঠিতে পারে না? আজ সত্য সত্যই সেই মেঘের সমান উচ্চে উঠিয়াছি এমনকি

মেঘ আমাদের গায়ে লাগিয়া বসন সিক্ত করিয়া দিয়া যাইতেছে, শৈশবের সেই উন্মাদ কল্পনা আজ সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইল ভাবিয়া হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। এইরূপে মেঘমালার মধ্যদিয়া ও বরফ রাশি পায় দলিয়া প্রায় ১ মাইল অগ্রসর হইলে সহসা আমাদের অতি নিকটে কেদার নাথের মন্দিরের চূড়া প্রকাশিত হইয়া উঠিল; অমনি যাত্রীগণ আনন্দে উচ্চ জয়ধ্বনী করিয়া উঠিল। একটা অপূর্ব্ব উল্লাসে সকলেরই মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তুষারসমাবৃত মন্দাকিনীর উপর ছোট পুল পার হইয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। চতুর্দ্দিকে শুভ্র বরফ রাশি ধব্ ধব্ করিতেছে, মধ্যে সুন্দর উপত্যকা ভুমির উপর প্রস্তরের মন্দির অবস্থিত মন্দিরের নিকটে পূজক ও পাণ্ডাদিগের কয়েক খানা বাড়ীঘর ও ২। ১টী দোকান পসার। ঘরগুলি সকলই পাথরের। কোন কোন ঘরের চতুর্দ্দিকে এমন করিয়া বরফ জমিয়া রহিয়াছে যে তাহা এক প্রকার আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। বরফ কাটিয়া দরজা গুলি বাহির করা হইয়াছে। এইরূপ একখানা ঘরে স্থান লইলাম। শুনিলাম শীঘ্রই মন্দির বন্দ হইয়া যাইবে। তাই তাড়াতাড়ি মুজা জুতা খুলিয়া। খালিপায়ে বরফ দলিয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম। শীতে যেন সর্ব্বাঙ্গের রক্ত জমিয়া হিম্ হইয়া গিয়াছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই রাশীকৃত বরফ জমিয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র মন্দিরটাই বরফ চাঁপা পড়িয়াছিল, সম্প্রতি বরফ গলিয়া কিছুটা বাহির হইয়াছে। মন্দিরের দরজা বরফ কাটিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে।

মন্দিরের দ্বারে, খাজাঞ্চীর নিকট মন্দিরে প্রবেশের ভেট্ ছয় পয়পা দিয়া একখানি টিকেট পাইলাম। ভিড় ঠেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করাগেল। ভিতরে আলো প্রবেশের পথ মাত্র নাই। একটী প্রকাণ্ড ঘৃতের প্রদীপ, মন্দিরের সেই নিবিড় অন্ধকার কথঞ্চিত দুর করিতে সক্ষম হইতেছিল। প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মিতে বিগ্রহ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল না। আরও নিকটে যাইয়া বিগ্রহ দর্শন ও আলিঙ্গন করিলাম। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে গম্ভীরা, তাহার মধ্যে কেদার নাথের বিরাট বিগ্রহ স্থাপিত। সচরাচর লিঙ্গ বিগ্রহ যে গঠনের হয়, কেদারনাথের বিগ্রহ সে প্রকার নহে, বিগ্রহের অঙ্গ অমসৃণ ও তাহা যথার্থ লিঙ্গাকৃতি বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডাগণ বলে যে ইহা, একটী মহিষের ছিন্ন পশ্চাৎভাগ, দেবীলীলায় প্রস্তররূপে পরিণত হইয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণিত নরনারীর সাগ্রহ পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে একটী কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। গুপ্তকাশীর বিবরণে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইয়াছে, বাকীটুকু এই :—

পলায়নতৎপর বিশ্বনাথ যখন দেখিলেন যে গুপ্তকাশীতেও পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন তখন তিনি, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া, বিপুল হিমানী সমাবৃত, নগরের অগম্য এই কেদারনাথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণও পাত্র সোজা নহেন। ভীমসেনের গদাঘাতে পর্ব্বত চূর্ণিত হইয়া রাস্তা নির্ম্মিত হইল, তখন পঞ্চপাণ্ডব কেদারনাথে উপনীত হইলেন। শিব দেখিলেন গতিক ভাল নহে আর কোথায়ই বা পালাইবেন, আরও উত্তরে যাইবার পথমাত্র নাই, অগত্যা তিনি মহিষের আকৃতি ধারণ করিলেন, এবং মায়া মহিষযূথ সৃজন করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া রহিলেন। কিন্তু সহদেবের অদ্ভুত গণনাশক্তি সে রহস্য জালও ভেদ করিতে সক্ষম হইল। তখন পাঁচ ভাইয়ে মিলিয়া যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে ভীমসেন দুইদিকের পর্ব্বত গাত্রে দুই পদ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইবে এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ, সকল মহিষগুলিকে তাহার পায়ের নীচ দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবেন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার মহিষটাই ছদ্মবেশী মহাদেব, ভীমসেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিবেন, সেইরূপ করিলে সকল মহিষগুলি লাঙ্গুল তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল, সকলের বড় মহিষটীর লাঙ্গুলে ভীমসেন ধরিয়া ফেলিলেন, তখন ভীষণ টানাটানি লাগিয়াগেল, কিন্তু মহিষদেহে আর কত সয়। টানাটানিতে মহিষরাজের সম্মুখার্দ্ধ ছিন্ন হইয়া সবেগে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া নেপালে

যাইয়া পড়িল, সেখানে তাহা "পশুপতিনাথ" নামে পূজিত হইতে লাগিলেন, পশ্চাতার্দ্ধ সেখানেই রহিয়া গেল। এত করিয়াও যখন বিশ্বনাথের মুখকমল দর্শনে বঞ্চিত হইলেন তখন পাণ্ডবগণের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। ভীমসেনত চটিয়া আগুণ, গদাঘাতে হিমালয়কে সমভূমিতে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দৈববাণী হইল যে মহিষরূপী বিশ্বনাথের ছিন্নার্দ্ধের পূজা অর্চ্চনা করিলেই তাঁহারা পাপমুক্ত হইবেন। অগত্যা পাণ্ডবগণ, সেই ছিন্নার্দ্ধের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিয়া, মহাপ্রস্থানে ব্রতী হইলেন। তখন হইতেই কেদারনাথ নরনারীর পাপতাপহারীরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। পুরাণেতিহাসে এইপ্রকার কোনও ঘটনার উল্লেখ আছে কিনা তাহার অনুসন্ধানের ভার প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাঠকের উপর। আমরা গল্পটী যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিবার স্থান, তাহাতে বরফগলা জল জমিয়া রহিয়াছে, শুধু পায়ে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মনে হইল বুঝি দাঁত লাগিয়া পড়িয়া যাইব। যাহা হউক দর্শন করিয়া কুঠুরিতে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীওয়ালা ঘরের দ্বারে উনন জ্বালিয়া পুরী ভাজিতেছিল, প্রথমে হাত পাও সেঁকিয়া, ও পরিধেয় বসনগুলি একটু গরম করিয়া লইয়া কিছু পুরী লাড্ডু উদরস্থ করাগেল। এমন দারুণ শীতে এ স্থানে আর অধিককাল বাস করা এক প্রকার অসম্ভব হইবে ভাবিয়া তখনই গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

যাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এতদিন ধরিয়া কত কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, কত নদ, নদী; পাহাড় পর্ব্বত হেলায় উল্লঙ্ঘন করিয়া, কখনও বা রৌদ্রে পুড়িয়া কখনও বা বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শত শত মাইলব্যাপী কঠিন পথ অতিক্রম করিয়াছি, আজ তাঁহার দর্শন পাইয়া হৃদয়ে সত্য সত্যই যে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিব তাহার আর আশ্চর্য্য কি! একবার শেষবারের জন্য কেদারনাথের মন্দিরাভিমুখে প্রণিপাত করিয়া, মুখে উচ্চ জয়ধ্বনী উচ্চারণ করিয়া, সেখান হইতে বাহির হইলাম। যতদূর পর্য্যন্ত দেখাগেল ফিরিয়া ফিরিয়া কেদারনাথের মন্দিরের ধ্বজাটী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ক্রমে মন্দিরের শেষ চিহ্নটুকু ধবল তুষার রাশির পশ্চাতে অন্তর্হিত হইল, তখন কেদার নাথের উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রণিপাত করিয়া নামিতে লাগিলাম। বোধ হয় এ জীবনে কেদার দর্শন এই প্রথম ও শেষ। আর কখনও সে সুযোগ এ জীবনে উপস্থিত হইবে কি না জানি না। কিন্তু তাহার স্মৃতি আজও হৃদয়ে স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে, এই দীর্ঘকাল অবসানের পর আজও তাহার একটী রেখাও মলিন হইয়া যায় নাই।

(ক্রমশঃ)

ভবঘুরে

বঙ্গের কুলবধূ।

(১)

মুখটি ফুটে কভু কথাটি কহে না;
নীরবে গঞ্জনা সয়,
নীরবে বেদনা বয়,
সজল আঁখি দু'টি ফিরে চাহে না;
তবুত মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

(২)

মুখটি ফুটে কভু কথাটি কহে না—
চাপান বেদনাগুলি,
হৃদয়ে উঠিছে ফুলি,
নিশ্বাসে প্রকাশে তার মনোবেদনা;
তবু সে মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

(৩)

মুখটি ফুটে কভু কথাটি কহে না—
মিথ্যা অভিযোগ রাশি—
বরিয়া লয় গো হাসি;
আহা কি অবিচার, নিঠুর তাড়না;
তবুত মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

(৪)

মুখটি ফুটে কভু কথাটি কহে না—
ভালবাসা করে দান,
পায় ঘৃণা প্রতিদান,
কেহত আদর করি কাছে আসেনা;
তবু সে মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ফুল-শয্যা

(গল্প)

(১)

গ্রীষ্মের ছুটিতে রমেশ বাড়ী আসিয়াই শুনিল আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের কথা শুনিবা মাত্র রমেশ আরও উন্মনা হইল। একবার ভাবিল পালাই। কিন্তু তাহার পিতা রমেশের বাল্য বন্ধু অমরনাথের নিকট হইতে তাহার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়াছেন। তাই সর্ব্বদা তিনি রমেশকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন। রমেশ পালাইবার সুযোগ পাইল না।

ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সমস্ত আয়োজন ও নিমন্ত্রণাদি ঠিক হইয়া গেল। এমন সময় রমেশের পিতা অন্নদা বাবু কন্যার পিতার নিকট হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন—"শ্রীমতী অমলার আজ কয়েকদিন যাবত ভয়ানক অসুখ। এখন সে এত দুর্ব্বল যে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ১৫ই বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। আপনি যদি আর কিছুদিন অপেক্ষা করেন তবে এই কন্যা-দায়গ্রস্ত গরীবের প্রাণ বাঁচিয়া যায়।" আসল কথাটা আর উল্লেখ না করিয়া শুধু এইটুকুই লিখিলেন। কারণ তাহাতে বিবাহের বিপত্তি ঘটাইতে পারে।

অন্নদা বাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে টেলি-গ্রামের উত্তর স্বরূপ লিখিলেন—"আর ১০ দিনের বেশী দেরী করিবার সাধ্য নাই। আগামী ২৫শে দিন স্থির হইল।"

কন্যার পিতা হরকিশোর বাবু অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

(২)

দেখিতে দেখিতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ আসিয়া পড়িল। হরকিশোর বাবুর বাড়ীতে বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বহির্ব্বাটিতে পুরুষদের হাঁকাহাঁকি। অন্তঃপুরে মেয়েদের কোলাহল। আজ বৈকালে বর ও বরযাত্রগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সকলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত।

গোধুলী লগ্নে বিবাহ। বর-পোষাক পরিয়া রমেশচন্দ্র বিবাহের আসরে আসিল। অন্তঃপুরে অবিরাম উলুধ্বনি উঠিতে লাগিল।—বর কন্যার শুভদৃষ্টি হইবে।

একজন প্রৌঢ়া বলিলেন "অমী, ভালো ক'রে চোখ তুলে বরকে দেখে নে'।" এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে মেয়ের ঘোমটা তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা ব্যর্থ হইল। অমলা কিছুতেই চোখ তুলিল না।…হঠাৎ রমেশ চিৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। "আর নয়, আর নয়;—নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।" অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। সকলে "কি হইল", "কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিল। কেহ ছুটিয়া জল আনিতে গেল; কেহ বা বাতাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল "সমস্তদিন উপোষ, তাতে আবার ছেলের শরীর দুর্ব্বল, তাই এমন হ'লো।"

রমেশ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাহাকে আবার বিবা-হের আসনে আনিয়া বসান হইল।—লগ্ন যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

কন্যার পিতা হরকিশোর বাবু নীরবে অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন—"না জানি অদৃষ্টে আরও কত আছে।"

বিবাহ হইয়া গেলে মেয়েরা বর কন্যাকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া গেল।

বিবাহের পরদিন বরযাত্রদের বিদায়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। রমেশের জলযোগের সময় হইলে শ্যালিকাগণ পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল "আজ বোধ হয় রমেশ বাবু বেশ সুস্থ আছেন; কাল তো ভয়েই তাঁর সাথে কথা বল্‌তে পারি নি। আজ তাঁর বুদ্ধির পরীক্ষা হবে।" এইরূপভাবে কি করিয়া রমে-শকে জব্দ করিতে পারিলে আপনাদের জয় হইবে তাহারি কল্পনা করিতে লাগিল। এমন সময় শুনিতে পাইল সকলে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া "রমেশ" "রমেশ" বলিয়া ডাকাডাকি করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া

বেড়াইতেছে। কোথায় রমেশ! কেহই রমেশকে খুঁজিয়া পাইল না।

হরকিশোর বাবু নীরবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অন্নদা বাবু হরকিশোর বাবুকে বলিলেন "রমেশ হয় তো আপনাদের কোনও একটা ক্রটিতে রাগ ক'রে বাড়ী চলে গেছে। তবে আমরা আর দেরী করি কেন? আমাদের বিদায়ের আয়োজন করুন।"

অন্নদা বাবু বিরক্ত হইয়া মনে মনে রমেশকে গালি দিয়া কহিলেন, "হতভাগা, আমার জাতমান রাখ্‌বি না দেখ্‌ছি।" কিন্তু তাঁহার মনে একটা দারুণ চিন্তা উপস্থিত হইল।

বরযাত্রগণসহ কন্যাকে লইয়া অন্নদা বাবু বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু রমেশ কোথায়?—রমেশ তো বাড়ী ফিরে নাই!

(৩)

রমেশের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। বহু স্থানে সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

দিনের পর দিন গেল। মাসের পর মাস গেল। ক্রমে ছয় বৎসর অতীত হইল। দীর্ঘ ছয় বৎসর! রমেশের কোনও সন্ধান নাই। অন্নদা বাবু ও তাঁহার স্ত্রী জীবন্মৃত হইয়া দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন। কখনও কখনও রমেশের মাতা "রমেশ" "রমেশ" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বলিয়া উঠিতেন "রমেশ বাপ্ আমার তুই এলি?" অন্নদা বাবু অমলার পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। বাটীর অন্যান্য সকলে ঘুমে অচেতন। রমেশের মাতার এতক্ষণে একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে। এমন সময় তিনি যেন শুনিলেন কে যেন দ্বারে ঈষৎ করাঘাত করিল; কে যেন মৃদুস্বরে ডাকিল "মা!"

রমেশের মাতা ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। সে শব্দে অন্নদা বাবুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অমলাও জাগিল। অন্নদা বাবু মনে করিলেন "বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ঐরূপ করিতেছেন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন "ওগো, কি হয়েছে? একটু ঘুমাও না; রাত যে অনেক হ'লো।"

আবার দ্বারে ঈষৎ করাঘাত হইল। আবার যেন কে ডাকিল "মা!"

রমেশের মাতা তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। "মা আমি রমেশ" বলিয়া রমেশ মাতার চরণে প্রণাম করিল। মাতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপন স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন শিরশ্চুম্বন করিলেন। সাশ্রুনয়নে রমেশকে কহিলেন "বাবা, এতদিন আমাদের ভুলে কেমন ক'রে ছিলি?" রমেশ কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ পিতৃচরণে প্রণাম করিল। সে পিতার মুখের পানে চাহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অধোমুখে মাতার সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

অমলার হৃদয় এতক্ষণ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অন্য কক্ষে চলিয়াগেল। মাতা পুত্রে অনেক কথা হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পরদিবসও আনন্দ কোলাহলে সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল।

(৪)

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রমেশ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বিছানায় শুইয়া আছে ক্ষণেক পরে মাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "এখন ঘুমাও। আমি বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অমলা ধীরে ধীরে মৃদু পাদবিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। একটা অজানিত লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এখনও সে মুখ তুলিয়া রমেশের পানে চহিয়া দেখে নাই।

অমলা শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "অমলা, আমায় চিন্‌তে পেরেছ? আমি সেই দস্যু!

রমেশের মুখের পানে চাহিতেই অমলার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ের শ্বাসযন্ত্র যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কম্পিত হৃদয়ে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলনা।

রমেশ ধীর স্বরে কহিল "অমলা, ভয় নাই। আমি আজ আর সে দস্যু নই। ভয় নাই অমলা।" এই বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া অমলাকে নিকটে আনিল। অমলার হৃদয় তথাপি ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল।

রমেশ আবার কহিল "অমলা, আমার সমস্ত কথা এখনও বলা হয় নাই। আমি আজ আর সে দস্যু নই। আজ আমি সেই দস্যুরই বিচার-কর্ত্তা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

অমলা তথাপি নীরব। রমেশ তাহাকে আরও নিকটে আনিয়া বসাইল। রমেশের স্পর্শে তাহার শরীরে যেন একটা তাড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। রমেশ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল "অমলা, আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী আজ তোমায় বলিতেছি, শোন—"

"সে আজ অনেকদিনের কথা। সতের বৎসর বয়সে আমি গ্রাম্য স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতায় এফ, এ পড়িতে যাই। সেখানে আমার এক বন্ধু জুটিল হরিমোহন। হরিমোহন পটলডাঙ্গায় থাকিত। তাহাকে আমি পূর্ব্বে চিনিতাম না। একদিন হঠাৎ তার সাথে গোল দীঘিতে আলাপ হয়। তদবধি সে আমার বন্ধু।

বন্ধু তো বন্ধুই বটে! তাহার বন্ধুত্বের এম্নি একটা নেশা ছিল যে তাহাকে দেখিলে আর আমি স্থির থাকিতে পারিতাম না। যেখানেই থাকি, যে কাজেই থাকি তাহাকে দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার সহিত বাহির হইয়া পড়িতাম। ক্রমে বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হইল। হরিমোহন সাথে না থাকিলে আমার গড়ের মাঠে যাওয়া হইত না, ইডেন্‌গার্ডেনে বেড়ানো হইত না। হরিমোহন না থাকিলে আমার থিয়েটারে যাওয়া হইত না, বায়স্কোপ দেখা হইত না।'

ক্রমে তাহার সহিত মিশিয়া আমি দিন দিন অধঃপাতে যাইতে লাগিলাম। অমরনাথ আমার বাল্য বন্ধু। সে আমাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত। কিন্তু আমি তাহাতে কর্ণপাতও করিতাম না। নূতন পাইলে পুরাতনকে কে চায়? কিন্তু হায়, কয়জনে পুরাতনের কদর বুঝে!

বাবা আমাকে খরচ বাবদ যথেষ্ট টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু আমি এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই সমস্ত টাকা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতাম।

তারপর হরিমোহনের গুণে আমি একজন পাকা গাঁটচোর হইয়া উঠিলাম। নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে পথ ভুলাইয়া গলির ভিতর আনিয়া জোর করিয়া টাকা লুট করিয়া লইতাম। বন্ধুবর হরিমোহন আমাকে খুব উৎসাহ দিত।

আমি যে এত অধঃপাতে গিয়াছি অমরনাথের তাহা জানিতে বাকী ছিল না। সে আমার অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই আমার খোঁজ রাখিত। সে যখন ইহার প্রতিকারের কোন পন্থাই খুঁজিয়া পাইল না, তখন বাবাকে আমার বিষয় সমস্ত লিখিয়া আমাকে এই সময়ে বিবাহ করাইতে উপদেশ দিল। বাবাও মনে করিলেন, বিবাহ দিলে বোধহয় মতিগতি ফিরিবে। তিনি আমার অগোচরে বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গেলে বিবাহ দিবেন, এই রূপ মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন।

বাড়ী যাইবার সময় দেখাগেল এসেন্স পোষাক প্রভৃতির দোকানে সবশুদ্ধ আমাদের দুই জনার প্রায় ১৫০০৲ টাকা বাকী পড়িয়াছে। তাহারা সকলেই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। আমি হরিমোহনকে বলিলাম, 'কিহে, এখন কি করা যায়? চল এই বেলা আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে পালাই।' হরিমোহন বলিল, 'পালাবো! কোথায়? তুমি বল কি?' আমি বলিলাম 'কি করা যায়?—টাকা?—' হরিমোহন আমার কথায় বাধাদিয়া বলিল, 'কুচ পরওয়া নেই; সব ঠিক্ হবে।'

পরদিন আমরা যুক্তি করিয়া ঠিক করিলাম ট্রেনে ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করা যাইবে।

প্রথমে আমার বড় ভয় হইতে লাগিল। আমি হরিমোহনকে বলিলাম 'ভাই' আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। থাক্ কাজনেই; ওরকমে পারা যাবে না।'

হরিমোহন হাসিয়া বলিল, 'তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমায় এতই কাঁচা ঠাওরাচ্ছিস্! আমি আরও দুই তিনবার এম্‌নি করে টাকা সংগ্রহ করেছি।'

তাহার কথার ভাব ভঙ্গীতে আমি শেষে স্বীকৃত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

কলিকাতা হইতে মেয়ে গাড়ীতে উঠা সন্দেহজনক মনে করিয়া পূর্ব্বের ট্রেনে আমরা দুই ষ্টেসন অগ্রসর হইয়া রহিলাম। হরিমোহন কলিকাতা হইতে পরচুলো ও হিন্দুস্থানী মেয়েদের পোষাক কিনিয়া আনিয়াছিল। আমাদের তখনও ভালমত গোঁফ উঠে নাই। রাত্রে সেই অপরূপ বেশে সজ্জিত হইয়া দুইজনে দ্রুতপদে মেয়েদের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম।

হিন্দুস্থানী মেয়েলোক মনে করিয়া কেহই আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে আসিল না। আমরা চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। তোমার মার হাতে একটী ছোট বাক্স দেখিতে পাইলাম। হরিমোহন বলিল, 'ঐ বাক্সটা নিশ্চয়ই গহনার; ওটাই নিতে হবে।'

ট্রেনের কামরায় প্রায় নয় দশ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। একটী প্রৌঢ়া তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' তোমার মা বলিলেন 'দেশে যাচ্ছি মেয়েকে বিয়ে দিতে।'

প্রৌঢ়া আবার বলিলেন 'এই মেয়েটী বুঝি? বেশ বড়ই তো হয়েছে।'

তোমার মা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, বড়ই তো হয়েছে। তা, কি ক'রবো দিদি, আজকাল বর কি এত সহজেই মিল্‌তে চায়? অনেক কষ্টে একটী জুটিয়েছি। এখন বে'টা ভালোমত শুভে কুশলে হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই।'

ইতিমধ্যে তোমার সমবয়স্কা একটী মেয়ের সাথে তোমার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল্। সে তোমার মার কথা শুনিয়া তোমায় বলিল 'তোমার বে' বুঝি? তা' এতক্ষণ আমায় বলনি কেন? আচ্ছা, তোমার বর কি করেন?'

তুমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলে 'যাও, তুমি ভারি দুষ্টুমি ক'রতে জান।' কিন্তু তুমি সহজে তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিলে না। সে যখন একান্তই নাছোড় তখন তুমি বলিলে 'শুনেছি তিনি এফ, এ পড়েন।' তোমার সঙ্গিনী বলিল 'মোটে এফ, এ পড়েন!' তুমি তোমার গর্ব্বিতা সঙ্গিনীর কথায় একটু দুঃখিতা হইলে। তুমি জানিতে তাহার স্বামী এম, এ পাশ করিয়া ল' পড়িতেছেন। তখন তুমি বলিলে 'আচ্ছা এফ, এ পড়েন তাতে আর কি হয়েছে? আমি তাঁকে এম, এ পাশ করিয়ে ছাড়বো।' 'ওমা, তুমিতো কম মেয়ে নও হে!' এই বলিয়া তোমার সঙ্গিনী হাসিয়া উঠিল।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ষ্টেশনে ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। হরিপুর ষ্টেশনে সকলেই নামিয়া গেল। শুধু তোমরা দুই মায়ে ঝিয়ে বাকী রহিলে। তোমাদের সহিত যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন তিনি একবার আসিয়া তোমাদের খবর লইয়া গেলেন। ট্রেন হরিপুর ছাড়িয়া চলিল। ধীরে ধীরে প্লাট ফর্ম্ম ছাড়িয়া হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

তোমরা সঙ্গিহীন হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলে। তাহার পর তোমার মা তোমাকে বলিলেন 'এখন তো আর লোক নাই, এইবার একটু শুয়ে ঘুমাও। আমিও একটু ঘুমুই।' দুই জনেই শুইয়া পড়িলে। তোমার মা শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তুমি তখনও ঘুমাও নাই।

হরিমোহন আমাকে চুপি চুপি বলিল 'রমেশ, এইবার।' আমিও বলিলাম 'হাঁ এইবার।' বলিয়াই মাথার পরচুলো জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলাম। আমাদের হিন্দুস্থানী পোষাকের নীচে মাল কোচা দেওয়া ধুতী পরা ছিল। হিন্দুস্থানী কাপড়ও খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম।

মুহূর্ত্তেই হরিমোহন তোমার মার মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি চেঁচাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হরিমোহন জোর করিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া রাখিল।

তুমি উঠিয়াই চেঁচাইতে লাগিলে। আমি তোমাকে ছুরি দেখাইয়া বলিলাম 'সাবধান! গোল ক'রলে এখনি,— তুমি তাহা শুনিয়াও তোমার মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিলে। তখন আমি তোমার কপালে সজোরে এক মুষ্টাঘাত করিলাম। তোমার কপাল ফাটিয়া দর দর করিয়া রক্ত ছুটিল।

তখন ট্রেন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। হরিমোহন আমাকে বলিল 'গাড়ী—আস্তে আস্তে চ'লছে; এইবার তুমি বাক্সটা নিয়ে নেবে পড়; আর দেরী ক'রো না। ষ্টেশন নিকটে। যাও, আমি তোমার পেছনেই নাব্‌ছি।' তখন তোমরা সংজ্ঞাহীন।

আমি আর দেরী করিলাম না। প্লাটফর্ম্মের অপর দিকে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়াই বিদ্যুৎ বেগে দূরে চলিয়া গেলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম হরিমোহন নামিতেছে; কিন্তু হঠাৎ সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত ছুটিল। পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ী হইতে একজন ভদ্রলোক দেখিলেন যে একটী লোক চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিকলী টানিয়া গার্ডকে বিপদবার্ত্তা জানাইলেন। গাড়ী থামিলে পর সকলেই সমস্ত দেখিয়া ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিল। শুনিয়াছি হরিমোহনের আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। সে আজও জেলে।"

অমলা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিল। এতক্ষণে সে ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

রমেশ আবার কহিতে লাগিল, "তাহার পর পায়ে হাঁটিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া সোজা বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে সাহস হইল না। বাড়ী আসিয়াই শুনিতে পাইলাম আমার বিবাহ। কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়? সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা হইতেছিল এই বুঝি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসে। আমি ভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইতাম না। ইতিমধ্যে বাবা এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে তোমার ভয়ানক অসুখ; ১৫ই কিছুতেই বিবাহ হইতে পারিবে না। হায়, তখন তো আমি বুঝি নাই যে আমিই সেই অসুখের কারণ!

বাবা দশদিন পরে অর্থাৎ ২৫শে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তাহার পর বিবাহের দিন শুভ দৃষ্টির সময় দেখিলাম সেই মুখ! সেই সদ্যঃ ক্ষত! আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় চিৎকার করিয়া ভূপতিত হইলাম। তাহার পর কি হইয়াছিল জানি না। বিবাহ আমার সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় হয় নাই। পরদিন প্রাতে উঠিয়া লোকজনের হাবভাব দেখিয়া বুঝিলাম গতরাত্রে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পালাইলাম। তোমার সেই গহনার বাক্স আমার সাথেই ছিল। কারণ অন্য কোথাও সেটা ফেলিয়া রাখিতে আমার সাহস হয় নাই। সেই বাক্সটা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেটা খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে তোমার গহনা ব্যতীত আরও একশত টাকার পাঁচখানা নোট রহিয়াছে। আমি কোনও দিন তোমার গহনায় হস্তক্ষেপ করি নাই। ষ্টেশনে আসিয়া সেই টাকা হইতে কলিকাতার একখানা টিকিট করিলাম। কলিকাতা আসিয়া সেই দিনই একদম কাশী চলিয়া গেলাম।

কাশীতে প্রায় একমাস অতীত হইল। একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিলাম, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে যেন পরিচিতস্বরে আমাকে ডাকিল 'রমেশ!' আমি ফিরিয়া দেখিলাম অমর নাম! অমরের মাতা কাশী থাকিতেন। তাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া অমর আজ কয়েকদিন হইল কাশী আসিয়াছে।

সে আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু এতকাল তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আজ তাহাকে এইখানে দেখিয়া আমার জীবনের একমাত্র পরম বন্ধু বলিয়া মনে হইল। তাহাকে পাইয়া যেন আমি হারাধন ফিরিয়া পাইলাম।

একে একে তাহাকে আজ সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ের গুরুভার যেন অনেকটা লঘু হইল।

সমস্ত শুনিয়া অমর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'রমেশ, এখন তুমি কি করিতে চাও?' আমি কহিলাম 'তুমি আমাকে কি করিতে বল?' অমর আবার একটু চুপ থাকিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে বিশেষ কিছুই করিতে বলি না; তুমি যে রমেশ ছিলে সেই রমেশই হও। আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হও। হা হুতাশের প্রয়োজন নাই। পড়িয়া শুনিয়া মানুষ হও। জীবনটাকে নষ্ট হইতে দিও না।'

তখন তোমার সেই কথাটা আমার মনে পড়িল।—তুমি তোমার ট্রেনের সেই সঙ্গিনীটীকে বলিয়াছিলে যে আমাকে এম, এ পাশ করাইয়া ছাড়িবে। তৎক্ষণাৎ আমি অমরের কথায় স্বীকৃত হইলাম। পরদিনই মেলে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে 'জেনারেল এসেম্ব্লি' কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়িলাম। একটী 'প্রাইভেট টিউসনের' যোগাড় করিয়া লইলাম। তাহাতেই বেশ কুলাইয়া যাইত। মাঝে মাঝে অভাব হইলে তোমার বাক্স হইতে দু'একটা টাকা খরচ করিতাম। আবার টাকা হাতে আসিলে তাহা পুরাইয়া রাখিতাম।

এফ, এ, বি, এ ও এম, এ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া 'ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-সিপ' পরীক্ষায় পাশ হইলাম। তোমাদের কাহাকেও আমি কোনও সংবাদ দেই নাই। মনে করিয়াছিলাম যদি কোনওদিন মানুষ হইতে পারি, তবে তোমাদিগকে মুখ দেখাইব; নচেৎ এই পর্য্যন্তই। অমরকেও আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম যে সে যেন আমার সংবাদ কাহাকেও না বলে। যদি কেহ কখনও আমার সন্ধান পায় তবে আমি আবার পালাইব। সুতরাং সেও কাহাকেও আমার সন্ধান বলে নাই।"

রমেশের কথা শেষ হইলে উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল। পরে রমেশ তাহার স্ত্রীকে ডাকিল "অমলা!"

অমলা কোনও কথা না বলিয়া কেবল একটু অগ্রসর হইল। রমেশ বাক্স হইতে সেই গহনা বাহির করিয়া তাহার গায়ে একে একে পরাইয়া দিল। তাহাকে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার সেই ক্ষত চিহ্নিত স্থানে বারংবার চুম্বন করিয়া কহিল "অমলা, আমাদের ফুল-শয্যা এখনও হয় নাই; আজ আমাদের ফুল-শয্যা।

শ্রীসুশীলকুমার দাশ গুপ্ত।

গায়ক পাখী।

(আঁধার মাণিক বা সুঁচ-চোরা)

আঁধার মাণিক বা সুঁচ-চোরা দয়েলের মত বড় পাখী। দৈহিক গঠনে দয়েলের সঙ্গে ইহাদের কোনও সামঞ্জস্য নাই। ইহাদের গলা খাটো, কপাল ঈষৎ চেপ্টা, শরীরের উপরিভাগ গোল ধরণের, নিম্নভাগ চাপা। পুচ্ছ প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বিস্তৃতাগ্র। পুচ্ছের ঠিক মধ্যস্থলে একটী অল্প পরিসর (½ ধান পরিমিত) পালক প্রায় ২ ইঞ্চি বর্দ্ধিত। এই পালক খানিই বেচারীর ঘাড়ে এক দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছে। সুঁচের সহিত এই পালকের বিশেষ সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও ইহার "সুঁচ-চোরা" নামটা সর্ব্বত্রই পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে বলেন "পলাচোরা" (পলা—রাখালদের পাচন বাড়ির এক নাম)। যে নামই হৌক ইহাদের চৌর্য্যের দুর্ণামটা সর্ব্বত্রই জাগরূক। কে জানে কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে এই কলঙ্ক কালিমা লইয়া স্বজাতি ও বিজাতি সমাজে ইহাদিগকে চলিতে হইতেছে। এসম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে, সংক্ষেপে তাহা বলিব।

সে ছিল রাজার বাড়ীর দর্জ্জির ছেলে। দর্জ্জি রোজ ছেলেটাকে লইয়া রাজবাড়ীতে কাজ করিতে যাইত, আর ছেলের নেংটীতে এক একটী সুঁচ বিধাঁইয়া গোপনে বাড়ী লইয়া আসিত। দরোয়ান যাতায়াতকালে দর্জ্জিকে পরীক্ষা করিয়া দিত। ছেলে শিশু, প্রায় দিগম্বর, তাহাকে পরীক্ষা করিতনা। দর্জ্জির সুঁচ যোগাইতে মন্ত্রী গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। দর্জ্জি

বলিত কাঁকে (কাক নহে) সুঁচ নিয়া যায়। (কাঁক কোন প্রাণী ছিল কিনা জানি না; তবে পাড়াগেয়ে ছোট ছেলে মেয়েরা কাঁকের ভয় রাখে। হঠাৎ কোনো দ্রব্য হারান গেলে তাহার অপরাধটা কাঁকের ঘাড়েই চাপে)। মন্ত্রী একদিন কথাটা নাপিতের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নরসুন্দর পরদিনই প্রকৃত চোর ধরিয়া দিল। মন্ত্রী মহাশয় বাপের পাপের সহায়তার জন্য ছেলেকে অল্প শাস্তিই দিলেন—তাহার গুহ্যদেশে সুঁচ বিধাঁইয়া ছাড়িয়া দিলেন। বেচারী লজ্জায় পাখী হইয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার দুর্ণাম গেল না—ছায়ার মতই রহিল। অপর পক্ষ বলেন—এক রাখাল অপর রাখালের শলা চুরি করিয়া এই দণ্ড লাভ করে।

আঁধার মাণিকের দেহ কান্তি বড়ই সুন্দর। ইহাদের পালকের উপরিভাগ নব দুর্ব্বাদলশ্যাম। এমন সুন্দর সবুজবর্ণের পাখী বিরল *। পালকের লোমগুলির পার্শ্ব গাঢ় ভায়োলেট বর্ণের। দেহের আগাগোড়াই এক রং। ইহাদিগকে এক দিক হইতে সবুজ ও অপর দিক হইতে চক্‌চকে ভায়োলেট বর্ণের দেখা যায়। ঠোঁট কালো, সূক্ষ্মাগ্র ও পার্শ্ব ধারাল। ঠোঁটের উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটী সরু কৃষ্ণ রেখা চক্ষুর উপর দিয়াও একটু অগ্রসর হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষুদুটী যেন লুকায়িত আছে। এই রেখা দুটী ও গলার একটী কাল কৃষ্ণাভ রেখা গলবন্ধের মত শুধু নিম্নদিকের কতকাংশে প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

আঁধার মাণিকের ডানা দুটী খাটো। আকৃতি কতকটা বকুলপাতার মত; কিন্তু ইহাদের ডানা দুইটীতে যথেষ্ট শক্তি আছে। ডানার পালকগুলি সুবিন্যস্ত এবং দৃঢ়। ইহারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়। নানা বিচিত্র গতিতে এদিক্ সে দিক্ উড়িয়া খেলা করিতে আঁধার মাণিক যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে। কখন বা ঘুঘু পাখীর মত * ক্ষুদ্র ডানা দুটীতে চট্‌পট্ ধ্বনি করিতে করিতে ইহারা সোজা উপরের দিকে উঠিয়া যায়—এবং কিয়দ্দূর উঠিয়া পক্ষপুট প্রসারণ করতঃ বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারাও অধিকাংশ সময়ই দুষ্টামী করিতে ভালবাসে। তবে ইহারা আত্মকলহ কিম্বা অন্যের প্রতি আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ভূমির নিকটবর্ত্তী আকাশমার্গে ক্রীড়া করাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা কদাচিৎ একাকী বিচরণ করে; প্রায়শঃই ইহাদিগকে এক জোড়ায় বা দুই চারি জোড়ায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। উহারা বিশ্রামার্থ খোলা জায়গায় ক্ষুদ্র কঞ্চি ডাল বা খুঁটীর উপর বসিয়া গান করে। ইহাদের আওয়াজ মিহি এবং মিষ্ট। কিন্তু ফিঙ্গার † মত অস্থির প্রকৃতি বলিয়া ইহাদের গান করিবার তত সময় নাই। রীতিমত গান করিবার সময় ইহারা খুব কমই প্রাপ্ত হয়। যখন অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণতলে আপনার ক্লান্ত দেহ (?) শান্ত করিতে বসিয়া আঁধার মাণিক গান করে—তখন অদূরবর্ত্তী পথিকের চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়াই পারিবে না।

আঁধার মাণিক উচ্চ ভূমিতে জমির আইলের পার্শ্বে মাটীতে ক্ষুদ্রগর্ত্তে বাসা করে। ইহারা প্রায়ই কার্ত্তিক মাসে গর্ভধারণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে বা পৌষ মাসের প্রথম—যখন কৃষকেরা মাঠের 'স্বর্ণচূড়শস্য' সকল গৃহে লইয়া গেলে কিয়দ্দিন জমিগুলি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখনই সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া আঁধার মাণিক আইলের পার্শ্বে ক্ষুদ্রগর্ত্তে ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে কখন কখন আঁধার মাণিক শুষ্কতৃণগুচ্ছ টানিয়া আনিয়া গর্ত্ত মুখে স্থাপন করে। অধিকাংশ সময়ই জননী গর্ত্তে পড়িয়া ডিমে তা দেয়—পুংপক্ষী তাহার আহার যোগায়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও লোকজন বা অনিষ্টকারী কাহাকেও দেখিলে আঁধার মাণিক গর্ত্তের ত্রিসীমার ধারেও যায়না। তখন স্ত্রী পাখীকেই উদর পরিপোষণার্থ

* আঁধার মাণিকের মত আর সবুজ পাখীও আছে—সময়ান্তরে বলিব। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ টিয়া পাখীও সবুজ। লেখক।

* প্রতিভায়—"ঘুঘুপাখী"। † প্রতিভা—"ফিঙা"।

বাহিরে আসিতে হয়। মাটীর ভিতরেও ইহাদের বাসা এত গরম যে দীর্ঘ সময় তা' না দিলেও ডিম্বের বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইহাদের ডিম্বগুলি মোট সাদা। এক কালে ইহারা দুই হইতে চারিটী ডিম্ব প্রসব করে। পাট, পাতা, প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বাসায় ডিম্বগুলি স্থাপন করিয়া তাহাতে তা' দেয়। ১২'—১৫ দিন তা দেওয়ার পরই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ছানা মাঘ মাসের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম ভাগে তাহাদের মাতা পিতার সঙ্গে উড়িতে আরম্ভ করে।

কীট পতঙ্গই ইহাদের প্রধান খাদ্য। এই পাখী প্রায় বারমাসই আমাদের দেশে অল্পাধিক পরিমাণ দৃষ্ট হয়। তবে আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্তই অধিক দেখা যায়

আঁধার মাণিক আপন জাতির ডিম্বেও তা দেয় বলিয়া শোনা যায়, এসম্বন্ধে সত্য সিদ্ধান্ত করিতে পারিনাই ইহারা কখনও লোকালয়ে আগমন করে না। *

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* গায়ক পাখী—

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৃত্তি—উপযুক্ত ছাত্রগণ যাহাতে উচ্চ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিভাগ হইতে মধ্য বিভাগে অধ্যয়ন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা। অনুন্নত সম্প্রদায় ও স্থানের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বঙ্গদেশে পরীক্ষার্থীর অবস্থা ও সচ্চরিত্রতার উপর বৃত্তি নির্ভর করে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ ও মধ্যপ্রদেশ স্কুলে স্কুলে পরীক্ষা হইতে থাকে। অন্যান্য প্রদেশে স্কুলে স্কুলে পরীক্ষা হওয়ার পর নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার পরে ছাত্রমাত্রেই বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু পঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে স্কুলে স্কুলে পরীক্ষার পর বৃত্তি পরীক্ষার জন্য কতিপয় ছাত্র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে স্থানের জন্য বৃত্তির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যতটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার তিনগুণ ছাত্র পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে পারে এবং এক এক স্কুল হইতে এক একটি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কেবল নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তির জন্য ৯২, ১৯২৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল—কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১, ৩১ ৯৭৪৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যয়িত হইয়াছে।

শিক্ষকের সংখ্যা ও গুণাবলী—১৯০২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ১০৬,০০০ জন ছিল। অর্থাৎ প্রতি ২৬ জন ছাত্রের জন্য একজন ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৭১, ৩৫৯ জন শিক্ষক ছিলেন, অর্থাৎ প্রতি ২৯ জন ছাত্র একজন শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করিত। এই সকল শিক্ষকের মধ্যে ৪২,৫৫৪ জন শিক্ষার প্রণালীতে শিক্ষিত। বোর্ড স্কুলের শিক্ষকগণের কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধাংশ শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত। সাহায্যকৃত স্কুলের কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বাদশাংশ শিক্ষক শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত।

বেতন—সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের হারের গড় বাহির করা আয়াসসাধ্য! তবে মোটামুটি বোর্ড স্কুলের শিক্ষকের বেতন মান্দ্রাজ ১০৲ বোম্বাইদেশে ২০৲ টাকা হইতে ১৫ টাকা। শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষিত বোর্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৮৲ টাকা এবং মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৬৲ টাকা। বঙ্গদেশে অসাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকের বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা কিন্তু ছয়টি বিভাগে ৬৲ টাকারও কম। যুক্তপ্রদেশে ও মান্দ্রাজে শিক্ষকের বেতন ৮৲ টাকার কম নয়। পঞ্জাবে প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫৲ এবং অন্যান্য শিক্ষকের বেতন ১২৲। ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন ২০৲ টাকা হইতে ৮০ টাকা। নিম্নব্রহ্মে সাহায্যকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনূন ২০৲

টাকা ও অনূর্দ্ধ ৩০৲ ছাত্র বেতন আদায় হইয়া থাকে। কোন কোন স্কুলে ছাত্র বেতন ৭৫৲ ও দেখা যায়। উচ্চ ব্রহ্মে কিন্তু ছাত্রবেতন ১৫৲ টাকার বেশী আদায় হয় না।

পোষ্টআফিসের কার্য্য—কোন কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারি কার্য্য করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া লন। মান্দ্রাজে ৫২১ জন শিক্ষক ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারি করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য ২৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত অধিক বেতন প্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশে ৫৩২ জন শিক্ষক ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টারি করিয়া থাকেন। পঞ্জাবে, শিক্ষকগণ পোষ্ট আফিসের কার্য্য করিয়া ২৲ হইতে ৮৲ বেশী বেতন লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে ৩৩২ টি ব্রাঞ্চ পোষ্টআফিস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। আসামে কিন্তু এই প্রথা নাই।

শিক্ষক পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা—বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকের বেতন ৫০৲ কিংবা ইহার কম হইলে তাহার একটি পুত্র বিনা বেতন এবং আর একটি পুত্র অৰ্দ্ধ বেতন প্রদান করিয়া তাহাদের পিতা যে স্কুলের শিক্ষক সেই স্কুলে পড়িতে পারে। যিনি শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিয়া অনূর্দ্ধ ২৫৲ টাকা পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্রেরাও পূর্ব্বোক্ত সুবিধা ভোগ করিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি শিক্ষা বিভাগের কার্য্যে থাকিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন, তাহাদের সন্তানেরাও এইরূপ সুবিধা ভোগ করিতে পারে। এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও গবর্ণমেণ্টের স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাদের পুত্রদের শিক্ষার জন্য অল্পাধিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধকালের সাহায্য—বোম্বাই প্রদেশে বোর্ডস্কুলের শিক্ষকগণ পেন্সন ভোগ করেন। মধ্যপ্রদেশ যে সকল শিক্ষক ১০৲ টাকার বেশী বেতন পান তাহাদের পেন্সনের কথা হইতেছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে বোর্ডস্কুলের শিক্ষক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চৎ প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা ভোগ করার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে বা আসামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেন্সন বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কোনই বন্দোবস্ত নাই।

পাঠ্য বিষয়—সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাতৃভাষা পঠন, লিখন, সাধারণগণিত, মানসাঙ্ক, হাতের লেখা পাঠ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়াথাকে। ব্রহ্মদেশে ব্যায়ামে বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বস্তুপাঠ প্রায় সকল বিদ্যালয়েই পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইয়াছে। ড্রইং ও প্রায় সর্ব্বত্রই করা হয়। মাত্র প্রকৃতিপাঠ সকল বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না। গ্রামের নক্সা, জমাবন্ধী সহজ পরিমিত, জমাখরচ প্রভৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যতের জীবিকা উপার্জ্জনের সাহায্যকল্পে পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করা হয়। ভুগোল বিষয়ক সাধারণ পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়া থাকে। ইতিহাসের গল্প কোন কোন প্রদেশে অবশ্য পঠনীয় এবং কোন কোন প্রদেশে না পড়িলেও চলে। মান্দ্রাজ পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা অবশ্য শিক্ষা করিতে হয়। মান্দ্রাজে ইংরেজী, পঞ্জাবে পারশ্য ভাষা এবং ব্রহ্মদেশে পালি দ্বিতীয় ভাষা।

মক্তব ও ফুঙ্গি কিয়াংয়ের পাঠ্য বিষয় সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য বিষয় হইতে একটু স্বতন্ত্র। লিখন, পঠন ও সাধারণ গণিত এবং ব্যায়াম ছাড়া ভুগোল, ইতিহাস প্রভৃতি এই সকল স্কুলের পাঠ্য তালিকায় স্থান লাভ করে না।

গ্রামের স্কুল ও সহরেরর স্কুলের মধ্যে সময় সময় পাঠ্য তালিকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বোম্বাই প্রদেশে গ্রাম্যস্কুলের এক বিশেষ শ্রেণী আছে কিন্তু সকল গ্রাম্যস্কুলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। মধ্যপ্রদেশে দুই শ্রেণীর বালকের জন্য দুই প্রকার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহারা দুই বেলা স্কুলে আসে তাহারা ভূগোল ও অঙ্ক শিক্ষা করে। মধ্যপ্রদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে গ্রামের স্কুল ও সহরের স্কুলের পাঠ্য তালিকায় কথঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। গ্রামের স্কুলে কৃষকগণের উপযোগী কতিপয় বিষয়ের পরিবর্ত্তে সহরের স্কুলে কতিপয় উচ্চতর বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত রহিয়াছে।

হাতের কাজ—ড্রইং, কাগজকাটা ও মাটির-

জিনিস তৈয়ার করাই হাতের কাজের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্জাব প্রদেশে প্রাথমিক শিল্প বিদ্যালয় ও প্রাথমিক সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। মাত্র শিল্পবিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত বিষয় ব্যতীত শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে কাঠের বা ধাতুর কাজ কিংবা এই উভয়বিধ কাজই শিক্ষা দেওয়া হয়। কাঠের উপর কাজকরা হইতে সামান্য সামান্য জিনিস তৈয়ার করাই এই সকল শিল্প বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ধাতুদ্বারা সাধারণ হাতুড়ি, বাটাল, দা প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য জিনিস শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রস্তুত করিতে শিখে। শিল্পবিদ্যালয়ে কাঠের ও ধাতুর কাজে দক্ষ একজন বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। তিনি স্কুলের শিক্ষকগণকে শিক্ষা দিবেন। ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্ট কতিপয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৌলমিনে একটি স্লয়েড (sloyd) বিদ্যালয় আছে। ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল এবং এবং এংগ্লো-ভার্ণিকুলার স্কুলে 'স্লয়েড' ক্লাস রহিয়াছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও ইহার জন্য বাধ্যতা—বরোদারাজ্যে ১৯০৭ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এক নিয়ম হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক বালককে বাধ্য হইয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাক সভায় মাননীয় গোখলে মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সুবিধার জন্য এক 'বিল' (প্রস্তাব) উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বালকদিগকে বাধ্য করিবার কথা ছিল। এই প্রস্তাবানুসারে যে পরিবারের মাসিক আয় দশ টাকার অনূর্দ্ধ সেই পরিবারের বালকদিগের বিনাবেতনে পাঠ করার কথা হয়। ইচ্ছা করিয়া যদি কোনও পরিবারের কর্ত্তা বালকদিগকে স্কুলে না পাঠায় তাহা হইলে প্রথমবারে ২৲ ও পরে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে বলিয়া মাননীয় গোখলে মহোদয় প্রস্তাব করেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটি ব্যয় বহন করিবার জন্য ইহাদের অধীন স্থানসমূহে শিক্ষার জন্য টেক্স বসাইতে পারিবে এরূপ বিধি প্রবর্ত্তনের কথা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক রাজস্ব হইতেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করিবার জন্য অর্থসাহায্য লাভ করা যাইবে এইরূপ ব্যবস্থাও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মাননীয় গোখলে মহোদয় দেখাইয়াছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বালকদিগকে বাধ্য করিলে এবং বেতন উঠাইয়া দিলে ৪½ কোটি টাকা খরচ লাগিবে।

মাননীয় গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাব নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেকেই অনুমোদন করিতে পারিলেন না—

(১) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বালকদিগকে বাধ্য করার অভিপ্রায় এখনও জনসাধারণ প্রকাশ করে নাই।

(২) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই বিধির অনুকূল নহেন।

(৩) বে-সরকারি সদস্যবর্গের অভিমতও মোটের উপর এই বিধির অনুকূল নহে।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য স্থানীয় টেক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব অনেকেরই অনভিপ্রেত।

(৫) জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলের অনুকরণে ভারতে নানাকারণে এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

(৬) বরোদা রাজ্যের রিপোর্টে এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক এই বিধি এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(৭) বরোদা রাজ্যে ইচ্ছা করিয়া বালকদিগকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিলে যে জরিমানা দিতে হয় তাহার হার গড়ে ব্রিটিস রাজ্যে লোক সংখ্যা ধরিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য গড়ে যাহা দিতে হয় তাহার দ্বিগুণ। অথচ ব্রিটিস রাজ্যে যতলোক লিখিতে পড়িতে পারে তাহাদের সংখ্যা বরোদা রাজ্য যতলোক লিখিতে পড়িতে পারে তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী।

(৮) মাননীয় গোখলে মহোদয় এই বিধি প্রবর্ত্তিত

করিতে যে ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন তাহা ঠিক হয় নাই। ৯ কোটি টাকার কম বালকদিগকে শিক্ষার জন্য বাধ্য করিলে কখনই অবৈতনিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে না। এবং এই ৯ কোটি টাকা খরচ করিলেও অতি অল্প দিনের জন্য মাত্র সামান্য শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ প্রাথমিক ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

(৯) এখনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে স্বেচ্ছায় যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইতেছিল তাহাতে বাধা পড়িবে।

এই সকল কারণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ রহিয়াছে, যাহাতে এখনও এই বিধিপ্রবর্ত্তন সমর্থিত হইতে পারে না। *

বেতনের হার—শ্রেণী অনুসারে বেতনের হারের তারতম্য হইয়া থাকে। পঞ্জাবে নিম্নতম শ্রেণীতে বেতনের হার এক আনা ও উচ্চতম শ্রেণীতে পাঁচ আনা।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাথমিক কিংবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিম্নবিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বালকদিগকে বেতন দিতে হয় না। আসামে নিম্নপ্রাথমিক স্কুলে বেতন দেওয়া বালকদিগের ইচ্ছাধীন। পঞ্জাব প্রদেশে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা একপ্রকার অবৈতনিক বলিলেই চলে। যুক্তপ্রদেশে বেতনের হার অতি কম, কিন্তু কৃষিজীবিগণকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হয় না। মধ্যপ্রদেশে বেতনের হার নিম্নতম (বাৎসরিক বেতনের হার এক আনা কি অর্দ্ধ আনা)। সেখানেও কৃষিজীবিদিগের জন্য যুক্তপ্রদেশের প্রচলিত ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই যাহারা বেতন দিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব স্বতঃ অবৈতনিক। ব্রহ্মদেশে বিহার স্কুল আছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না সেই প্রদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। মাত্র এংগ্লো-ভার্ণেকুলার বিদ্যালয়ে বেতনের হার অত্যন্ত অধিক।

বেতনের হার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষায়ও প্রযোজ্য। অনেক প্রদেশে স্থানীয় পুরস্কার ও সাহায্য প্রদানের প্রথা আছে, সুতরাং দরিদ্র ছাত্রেরা শ্লেট ও পুস্তকের মূল্য অনেক সময় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর পুস্তকের মূল্যও অতি সামান্য।

শ্রমজীবীদিগের সন্তানগণের শিক্ষা—(১) কৃষক সম্প্রদায়—কৃষক বালকেরা বীজ বপনের সময়, ক্ষেত নিড়ি দিবার সময়, শস্য কাটার সময় কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে। তা ছাড়া প্রায় সর্ব্বদাই গরু চরায় ও অন্যান্য অনেক গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে। সুতরাং যাহাতে তাহারা এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেপারে ইহা মনে রাখিয়া দিবসের উপযুক্ত সময়ে স্কুল বসিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু অনেক পরিবার প্রাথমিক শিক্ষা আদবেই ভালবাসে না, কারণ তাহাদের বিশ্বাস লেখাপড়া শিখিয়া বালকেরা পৈতৃক ব্যবসায়ে উদাসীন হয়।

(২) ইতর জাতি—এতদিন কেবল উচ্চ জাতির মধ্যেই বিদ্যানুশীলন সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু অল্পদিন হইল ইতরজাতির বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে এবং ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকারে ইতরজাতির মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। এই বিষয়ে খৃষ্টান মিশনরীগণের উদ্যম প্রশংসনীয়। বোম্বাই প্রদেশে স্যার নারায়ণ রাও চন্দভারকারের অধীনে 'ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাস মিশন' বিশেষ কাজ করিতেছে। আন্দুল ও উড়িষ্যার করপ্রদমহলের 'কেপন'দিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহা উল্লেখ যোগ্য। দীল্লিতে চামাদিগের জন্য ২৭টি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের ২৩টিই মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। বঙ্গদেশের অন্তর্গত বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের নমশূদ্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডমিশন বিশেষ সাহায্য কারতেছে।

কারখানায় প্রাথমিক শিক্ষা—ভারতের অনেক প্রদেশে তুলা ও পাটের কল রহিয়াছে। সেই সকল কাজে প্রায় ৩৭,০০০ বালক কাজ করিয়া

* Progress of Education in India, 1907-12.

থাকে। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আহাম্মদাবাদ, হুগলী, কানপুর, আগ্রা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কলের অধিকারীবৃন্দের অধীনে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল স্কুলে অনূ্যন দুই ঘণ্টাকাল লেখা পড়ার চর্চ্চা হইয়া থাকে।

চা-বাগানে প্রাথমিক শিক্ষা—আসামে বহুসংখ্যক চা-বাগান আছে। এসকল চা-বাগানে কুলিদিগের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য অনেক চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সন্তোষজনক নহে। গবর্ণমেণ্ট ও এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

নৈশ বিদ্যালয়—নৈশ বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবিগণ অধ্যয়ন করে। ইহারা দিবসে খাটে এবং রাত্রিকালে যে স্থলে পাঠশালা আছে সেই সকল পাঠশালার শিক্ষকেরা ইহাদিগকে পড়াইয়া কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অর্থসাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন। শ্রমজীবিগণ বিনা বেতনে স্কুলে পড়িয়া থাকে। অনেক স্থানে পুলিশ, চাপরাশি এবং চাকরেরা এই সকল পাঠশালায় পড়িয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ ও গোরক্ষপুরে শিল্পবিদ্যালয়ের সহিত দুইটি নৈশ বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

কণ্টিনিউএসন স্কুল—বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বালকের মাত্র বর্ণ পরিচয় হইয়াছে ও যাহারা শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্যই এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০০০ এবং গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উন্নতির জন্য ১৩০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

মধ্য বিদ্যালয়—এই জাতীয় বিদ্যালয়ে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার পর আরও দুইবৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই সকল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরে আরও দুইবৎসরের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া অনেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজে ও বঙ্গদেশে মধ্যবিদ্যালয় সমূহে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে মধ্যইংরেজী ও মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিভিন্ন; এবং মধ্যবঙ্গ বৃত্তি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই প্রাপ্ত হইয়াথাকে সুতরাং মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা আর ইংরেজী পড়িতে পারে না। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মধ্যবঙ্গ ও মধ্য ইংরেজীস্কুলের পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্নতা ছিল না। মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ইচ্ছা করিলেই ছাত্রেরা ইংরেজী পড়িতে পাড়িত।

মধ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা—ইংরেজীর প্রসারের সঙ্গে মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের সংখ্যার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৯০৭-১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতীয় ৯৫২টি বিদ্যালয় নূতন স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহাদের ছাত্রসংখ্যাও ৭০৯১ বাড়িয়াছে।

পূর্ব্বে এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য ১২½ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৫½ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১ লক্ষ টাকাই গবর্ণমেণ্ট দান করিয়াছেন। এক একটি স্কুলের বার্ষিক মোট খরচ পড়ে ৭০৫৲ টাকা, এবং এক একটি ছাত্র পড়াইতে পড়ে বৎসরে ৭৷৷ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

ছাত্রসংখ্যা—ভারতে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে এরূপ বয়স্কের বালক ও বালিকাগণের মধ্যে শতকরা ১৫·৭ জন প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ৬০ লক্ষ বালকবালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে। তন্মধ্যে বালকের সংখ্যা ৫১,৩২,০০০ জন, অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে এই বয়সের বালকের মধ্যে শতকরা ২৬ জন বালক বিদ্যালয়ে প্রকৃত পক্ষে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল—যে প্রদেশে বোর্ড স্কুল রহিয়াছে সেই প্রদেশে বালকেরা বেশী দিন বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। বঙ্গদেশে শিক্ষার কাল অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম। মান্দ্রাজে তত কম নহে।

আবার খুব বেশীও নহে। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে শিক্ষার কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। পঞ্জাবে ও ব্রহ্মদেশে সাধারণতঃ শিক্ষার যে কাল দেখা যায় বস্তুত তাহা ঠিক নহে। যাহা দেখা যায় শিক্ষারকাল তাহা অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘতর।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ভারতের অধিবাসীবর্গের মধ্যে কতলোক লিখিতে পড়িতে পারে তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বয়স	প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে					
	যতলোক লিখিতে পড়িতে পারে (১৯০১ খৃঃ)			যতলোক লিখিতে পড়িতে পারে (১৯১১ খৃঃ)		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সকল বয়সের	৫৩	৯৮	৭	৫৯	১০৬	১০
০—১০	৮	১৩	২	৭	১২	৩
১০—১৫	৫১	৮৫	১০	৫০	৯৫	১৭
১৫—২০	৭৫	১৩২	১৪	৮৫	১৪৪	২১
২০ তদূর্দ্ধ	৭৪	১৩৯	৮	৮২	৫০	১২

দ্রষ্টব্য—উল্লিখিত তালিকায় দেশীয় রাজ্য ভুক্ত করা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ৬২ জন ও দেশীয় রাজ্যে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ৪৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

উদ্বোধন

(পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের গৃহপ্রবেশ উৎসবে পঠিত)

আলোক যাঁহার চন্দ্রসবিতা
গ্রহতারকায় নিত্য রাজে,
স্পন্দিত যাঁর প্রাণ সঞ্চার
জড় অজড়ের মর্ম্ম মাঝে,
স্বসে সঙ্গীতে গন্ধে বরণে
মধুময় চির প্রকাশ যাঁর,—
নিখিল জ্ঞানের আদি ও অন্ত
নিখিল মর্ম্মবীণার তার;
বাতাস বহিছে মধুতরঙ্গ
মধুকরে যাঁর সিন্ধুজল,
করুণা যাঁহার কিরণগঙ্গা
ছাপাইয়া বহে গগণতল,
অণুতে অণুতে নবীনতা আনি
প্রেমে যাঁর জাগে সপ্তলোক,
আজি এ সভার নবীন প্রয়াস
তাঁরি করুণায় পূর্ণ হোক্।

এই নগরীর ধূলিকণিকায়
হারাণো স্বর্ণরেণুকারাজি,
এই তটিনীর স্বচ্ছধারায়
লুপ্ত কাহিনী উঠিছে বাজি';
এরি অঞ্চলে মাণিক হিরণ
এরি অঞ্চলে ভিক্ষাদান,—
শত উত্থান পতনের মাঝে
আজিও বঙ্গে কীর্ত্তিমান।
নবীন জাতির নব সাহিত্য
জননীর মত বক্ষে ধরি'
কে পিয়াল তারে পরাণের রস?
কে জিয়াল তারে এমন করি'?

সে কথা কহিতে চোখে আসে জল
মর্ম্মে বেদনা ওঠেগো বাজি'—
বঙ্গবাণীর হৃদয় রতন
কালীপ্রসন্ন কোথায় আজি?
কোথা আজি সেই দীপ্ত তপন
প্রাচীর ললাটে দীপ্যমান,
যাঁহার আলোক-পরশে জাগিল
নবীন বঙ্গ কম্পমান!—
আকাশে বাতাসে জাগিল বোধন,
দিগ্‌বালা ঢালে কুম্ভজল,
নবীন ভাষার উদাত্ত খকে
ধ্বনিয়া উঠিল গগণতল!
—নাহি আজ সেই সৌম্যশান্ত
তাপসকল্প সাধক ধীর,
তাঁরি স্মৃতি আজি আলোড়ে মর্ম্ম,
তাঁরি লাগি' চোক্ষে অশ্রুনীর।

তাঁরি হাতগড়া প্রবীণ 'সমাজ'
নবীন প্রভাতে মেলিল আঁখি,
ধন্য আজিকে বিবুধবৃন্দ
গৌরববিভা ললাটে আঁকি'
সুন্দর হোক্ জ্ঞানমন্দির
সার্থক হোক্ সাধনা যত,
জননীর পায়ে উঠুক বিকশি'
ভক্তমর্ম্ম কমল শত।
আলোক যাঁহার চন্দ্রসবিতা
গ্রহতারকায় নিত্য ভায়
কবির কামনা তাঁরি পাশে আজি
কবির প্রণাম তাঁহারি পায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

VOL. 6. No. 3.

JUNE, 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

'But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, *Nayabazar Raad, Dacca.*

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
J. G. Cumming, C. S. I.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C,S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.SC.
Dr. P. K. Roy, D.SC.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.SC. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.SC. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.SC.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra.
Jaladhar Sen.
Jagadananda Roy
Benoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

H. E. Lord Carmichael ...	... ...	i
Matter and Consciousness ...	Sir John Woodroffe	1
Greek and Gothic Elements in the Hindu Population	Prof. Hem Chandra Roy Choudhury, M. A.	78
Indian Student Sketches ...	Prof. Thos F. O'Donnell (Agra College)	81
The Study of Geography ...	P. Leo Faulkner, F. R. G. S., F. R. S. A.	86
The Arctic Home in the Rig-Veda : An untenable Position (iii) ...	Prof. N. K. Datta	90
Dacca Forty Years Ago ...	... ...	95

সূচী।

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
১। যশোধর্ম্মদেব	শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ এম্, এ, বি, এল, ...	৭১
২। বৃষ্টিবিন্দুর অভিভাষণ (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	৭৭
৩। ব্যাকরণের দরখাস্ত	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী	৭৮
৪। তুমি (গান)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	৮৭
৫। পুষ্কর	শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্ এ	৮৭
৬। আকাশের নীলরঙ্	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বিদ্যানিধি ...	৯১
৭। ৺রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা এল, টি ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, টি, ও	৯৪
৮। শ্যামের বাঁশী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্ এ	১০২
৯। স্বপনে ঐ	শ্রীযুক্তা বিভাবতী সেন	১০২

H. E. LORD CARMICHAEL.

Once more we have the privilege, and we all feel it to be a very pleasant privilege, of welcoming His Excellency the Governor of Bengal to the Second Capital. He has always shown a very warm appreciation of our City and of the many interests and hopes which centre here. Just now hope is the predominant note; we in Dacca have a happy knack of hoping. We hear rumours that the Dacca University which seemed so near in 1912 is now going to take form and to become one of our Institutions. The Member of His Excellency the Viceroy's Council whose special function it is to look to such matters is coming to Dacca in August and we feel sure that he will find much to encourage and possibly much to surprise him. He will be also heartily welcome and we feel sure that guided by the good sense and experience of those on the spot and bringing with him the spirit of a large constructiveness associated with Delhi and Simla he will do much to bring the good ship safely into port.

There are many other schemes which Dacca wishes to see carried into effect. But we know that His Excellency's Government sympathises with us and that it is only the wretched lack of pence that prevents us from getting what we want.

Perhaps in the near future we may through Lord Carmichael's kind intervention be favoured with a visit from our new Viceroy. He has announced his intention of travelling far and wide, and we feel certain that he will find much to occupy his thoughts in Eastern Bengal. We have not forgotten the last visit of a Viceroy to our city and the profound impression it produced.

We cannot conclude this note without saying how very sorry we all feel that Her Excellency Lady Carmichael has not been able to leave Darjeeling on this occasion. Her Excellency will, we are sure, realize the respectful esteem in which she is held by all here and we are only sorry that we shall have no opportunity this year of showing her the place that her constant kindness has won for her in the hearts of the Dacca public.

MATTER AND CONSCIOUSNESS.

The subject of my lecture to-day is Consciousness or Chit and matter or unconsciousness, that is Achit ; the unchanging formlessness and the changing forms. We are Consciousness-Unconsciousness or Chid-Achit ; being Chit Shakti as regards our Antaratma and the particularised Maya Shakti as to our material vehicles of mind and body. The reason that I have selected this subject amongst the many others on which I might have addressed you is that these two ideas are the key concepts of Indian Philosophy and religion. If they are fully understood both as to their definition and relations then all is understood so far as intellect can make such matters intelligible to us. If they are not understood then nothing is properly understood. Nor are they always understood even by those who profess to know and write on Indian Philosophy. Thus the work on Vedanta of an English Orientalist now in its second edition describes Chit as the condition of a stone or other inert substance. A more absurd error it is hard to imagine. Those who talk in this way have not learnt the elements of their subject. It is true that you will find in the Shastra the state of the Yogi described as being like a log (Kashtavat). But this does not mean that his Consciousness is that of a piece of Wood. But that he no more perceives the external world than a log of wood does. He does not do so because he has the Samadhi consciousness that is illumination and true Being itself.

I can to-night only scratch at the surface of a profound subject. To properly expound it would require a series of lectures and to understand it in its depths years of thinking thereon. I will look at the matter first from the scientific point of view ; secondly declare what those

* We are greatly indebted to Sir John Woodroffe for so kindly preparing for us this summary of the very interesting and stimulating address he recently delivered at the Dacca Sahitya Parishat before a distinguished audience. Ed.

concepts mean in themselves; and thirdly show how they are related to one another in the Sankhya and the Mayavada and Shaktivada presentments of Vedanta doctrine. The Shaktivada of which I deal to-night may be found in the Tantra. It has been supposed that the Agamas arose at the close of the age of the Upanishads. They are Shastras of the Upasana Kanda dealing with the worship of Saguna Ishvara. It has been conjectured that they arose partly because of the declining strength of the Vaidik Achara and dissensions therefrom and partly because of the increasing numbers of persons within the Hindu fold who were not competent for the Vaidika Achara and for whom some spiritual discipline was necessary. One common feature distinguishes them; namely their teaching is for all castes and all women. They express the liberal principle that whilst socially differences may exist, the path of religion is open to all and that spiritual competency and not the external signs of caste determine the position of persons on that path. Ishvara in these Agamas is worshipped in threefold form as Vishnu, Shiva, Devi. Therefore the Agamas or Tantras are threefold, Vaishnava, Shaiva and Shakta, such as the Pancharatra Agamas of the first group, the Shaiva Siddhanta (with its 28 Tantras), the Nakulisha Pashupatam, and the Kashmirian Trika of the second group; and the alleged division into Kaula, Mishra, Samaya of the third group. I express no opinion on this last division. I merely refer to this matter in order to explain what I mean by the word Agama. The Shaktivada however which I contrast with Máyáváda to-day is taken from the Shakta Agama. By Máyáváda I mean Shangkara's exposition of Vedánta.

Now with reference to the scientific aspect of the subject I show you in three main particulars that modern Western physics and psychology support Indian philosophy. Indeed Mr. Lewes Dickinson in an acute recent analysis of the state of ideas in India, China and Japan observes that the Indian form of religion and philosophy is that which most easily accommodates itself to modern Western science. That does not prove it is true until it is established that the conclusions of Western science to which it does conform are true. But the fact is of great importance in countering those who have thought that Eastern

ideas were without rational foundation. It is of equal importance to those two classes who either believe in the ideas of India or in the particular conclusions of science to which I refer. The three points on this head are firstly that physicists by increasing their knowledge of so-called "matter" have been led to doubt its reality and have dematerialised the atom and with it the entire universe which the various atoms compose. The trinity of matter, ether and electricity out of which science has hitherto attempted to construct the world has been reduced to a single element—the ether (which is not scientific "matter") in a state of motion. According to Sangkhya the objective world is composed of the Bhutas which derive ultimately from Akasha. I do not say that scientific "ether" is Akasha which is a concept belonging to a different train of thought. Moreover the sensible is derived from the supersensible Akasha Tanmatra and is not therefore an ultimate. But it is important to note the agreement in this that both in East and West the various forms of gross matter derive from some single substance which is not "matter." Matter is dematerialised and the way is made for the Indian concept of Maya. There is a point at which the mind cannot any longer usefully work outward. Therefore after the Tanmatra the mind is turned within to discover their cause in that Egoism which reaching forth to the world of enjoyment produces sensorium, senses, and objects of sensation. That the mind and senses are also material has the support of some forms of Western philosophy such as that of Herbert Spencer for he holds that the Universe whether physical or psychical is a play of force which in the case of matter we experience as object. Mind as such is, he says, as much a "material" organ as the brain and outer sense-organs though they are differing forms of force. His affirmation that scientific "matter" is an appearance produced by the play of cosmic force and that mind itself is a product of the same play is what Sangkhya and Vedanta hold. The way again is opened for the concept Maya. Whilst however Spencer and the Agnostic School hold that the reality behind these phenomena is unknowable the Vedanta affirms that it is knowable and is Consciousness itself. This is the Self than which nothing can be more intimately

known. Force is blind. We discover consciousness in the Universe. It is reasonable to suppose that if the first cause is of the nature of either Consciousness or matter and not of both it must be of the nature of the former and not of the latter. Unconsciousness or object may be conceived to modify Consciousness but not to produce Consciousness out of its unconscious self. According to Indian ideas Spirit which is the cause of the Universe is pure Consciousness. This is Nishkala Shiva : and as the creator the great Mother or Devi. The existence of pure consciousness in the Indian sense has been decried by some thinkers in the West where generally to its pragmatic eye Consciousness is always particular having a particular direction and form. It assumes this particularity however through Maya. We must distinguish between Consciousness as such and modes in consciousness. Consciousness is the unity behind all forms of Consciousness whether sensation, emotion, instinct, will or reason. The claim that Consciousness as such exists can only be verified by spiritual experience. All high mystic experiences whether in East or West have been experiences of unity in differing forms and degrees. Even however in normal life as well as in abnormal pathological states we have occasional stretches of experience in which it becomes almost structureless. Secondly the discovery of the subliminal Consciousness aids Shastric doctrine in so far as it shows that behind the surface Consciousness of which we are ordinarily aware there is yet another mysterious field in which all its operations grow. It is the Buddhi which here manifests. Well established occult powers and phenomena now generally accepted snch as telepathy, thought reading, hypnotism and the like are only explainable on hypotheses which approach more nearly Eastern doctrine than any other theory which has in modern times prevailed in the West. Thirdly as bearing on this subject we have now the scientific recognition that from its materia prima all forms have evolved ; that there is life in all things ; and that there are no breaks in nature. There is the same matter and Consciousness throughout. There is unity of life. There is no such thing as "dead" matter. The well-known experiences of Dr. Jagadish Bose establish response to stimuli in inorganic matter. What is this

response but the indication of the existence of that Sattva Guna which Vedanta and Sangkhya affirm to exist in all things organic or inorganic. It is the play of Chit in this Sattva so muffled in Tamas as not to be recognisable except by delicate scientific experiment which appears as the so-called "mechanical" response. Consciousness is here veiled and imprisoned by Tamas. Inorganic matter displays it in the form of that seed or rudiment of sentiency which enlarging into the simple pulses of feeling of the lowest degrees of organised life at length emerges in the developed self-conscious sensations of human life. Consciousnes is throughout the same. What varies is its wrappings. There is thus a progressive *release* of Consciousness from gross matter through plants and animals to man. This evolution Indian doctrine has taught in its six lakhs of previous births. According to the Hindu books plants have a dormant consciousness. The Mahabharata says that plants can see and thus they reach the light. Such power of vision would have been ridiculed not long ago but Professor Haberlandt, the well-known botanist, has established that plants possess an organ of vision in the shape of a convex lens on the upper surface of the leaf. The animal consciousness is greater but seems to display itself almost entirely in the satisfaction of animals wants. In man we reach the world of ideas but these are a superstructure on consciousness and not its foundation or basis. It is in this modeless basis that the various modes of consciousness with which we are familiar in our waking and dreaming states arise.

The question then arises as to the relation of this principle of Form with Formlessness; the unconscious finite with infinite consciousness. It is noteworthy that in the Thomistic philosophy Matter like Prakriti is the particularising or finitising principle. By their definition however they are opposed. How then can the two be one?

Sangkhya denies that they are one and says they are two separate independent principles. This Vedanta denies for it says that there is in fact only one true Reality, though from the empirical dualistic standpoint there seem to be two. If the question then is asked, Is dualism, pluralism, or monism to be accepted? for the Hindu the answer of

Shruti is that it is the last. But apart from this the question is, Does Shruti record a true experience and is it the fact that spiritual experience is monistic? or dualistic? The answer is as we can see from history that all high mystic experiences are experiences of unity in differing forms and degrees.

The question cannot be decided solely by discussion but by our conclusion as to the conformity of the particular theory held with spiritual experience. But how can we reconcile the unity of pure consciousness with the plurality of unconscious forms which the world of experience gives us? Vedanta gives various intellectual interpretations though experience can solve this question. Shangkara says there is only one Sadvastu, the Brahman. From a transcendental standpoint It *is* and nothing happens. There is in the state of highest experience (Paramatma) no Ishvara, no creation, no world, no Jiva, no bondage, no liberation. But empirically he must and does admit the world or Maya which in its seed is the cosmic Sangskara which is the cause of all these notions which from the highest state are rejected. But in it real or unreal? Shangkara says it is neither. It cannot be real for then there would be two Reals. It is not unreal for the world is an empirical fact—an experience of its kind and it proceeds from the Power of Ishvara. In truth it is unexplainable and as Sayana says more wonderful than Chit itself.

But if it is neither Sat nor Asat then as Maya it is not the Brahman who is Sat. Does it then exist in Pralaya and if so how and where? How can unconsciousness exist in pure consciousness? Shangkara calls it eternal and says that in Pralaya Mayasatta is Brahmasatta. At that time Maya as the power of the ideating consciousness and the world its thought do not exist: and only the Brahman exists. But if so how does the next universe arise on the assumption that there is Pralaya and that there is not with Him as Maya the seed of the future universe? A Vija of Maya as Sangskara even though Avyakta (not present to Conciousness) is yet by its terms different from consciousness. To all such questionings Shangkara would say they are themselves the product of the Maya of the state in which they are put. This is true but it is

possible to put the matter in a simpler way against which there are not so many objections as may be laid against Mayavada.

It seems to me that Shangkara who combats Sangkhya is still much influenced by its notions and as a result of his doctrine of Maya he has laid himself open to the charge that his doctrine is not Shuddha Advaita. His notion of Maya retains a trace of the Sangkhyan notion of separateness though separateness is in fact denied. In Sangkhya Maya is the real creatrix under the illumination of Purusha. We find similar notions in Shangkara who compares Chit to the Ayaskantamani and denies all liberty of self-determination in the Brahman which though itself unchanging is the cause of change. Jnana Kriya is allowed only to Ishvara, a concept which is itself the product of Maya. To some extent the distinctions made are perhaps a matter of words. To some extent particular notions of the Agamas are more profound than those of Shangkara who was an intellectualist.

I refer to such a view as that which giving the the richest content to the Divine Consciousness does not deny to it knowledge but any dual knowledge ; spiritual experience being likened by the Brihadaranyaka Upanishad to the union of man and wife in which duality exists as one and there is neither within nor without. It is this union which is the Divine Lila of Shakti who is yet all the time one with Her Lord.

The Shakta exposition appears to be both simple and clear. I can only sketch it roughly—having no time for its detail. It is first the purest Advaitavada. What then does it say ? It starts with the Shruti "Sarvam Khalvidam Brahma." Sarvam = world ; Brahman = consciousness or Sachchhidananda ; therefore this world is in itself Consciousness.

But we know we are not perfect consciousness. There is an apparent unconsciousness. How then is this explained ? The unmanifested Brahman before all the worlds is Nirguna Shiva—the Blissful undual consciousness. This is the static aspect of Shiva. This manifests Shakti which is the kinetic aspect of Brahman. Shakti and Shaktiman are one ; therefore Shiva manifests as Shiva-Shakti who are one and the same. Therefore Shakti is consciousness.

But Shakti has two aspects (Murtti) viz : Vidya Shakti or Chit-Shakti

and Avidya Shakti or Maya Shakti. Both as Shakti which is the same as Shaktiman are in themselves conscious. But the difference is that whilst Chit Shakti is illuminating consciousness, Maya is a Shakti which veils consciousness to itself and by its wondrous power appears as unconscious. This Maya Shakti is Consciousness which by its power appears as unconsciousness. This Maya Shakti is Triguna Shakti that is Shakti composed of the 3 Gunas. This is Kamakala which is the Trigunatmakavibhuti. These Gunas are therefore at base nothing but Chit-Shakti. There is no necessity for the Mayavadin's Chidabhāsa that is the reflection of conscious reality on unconscious unreality as Mayavada says. All is real except in the sense that some things endure and are therefore truly real : others pass and in that sense only are not real. All is Brahman. The antarātma in man is the enduring Chit-Shakti. His apparently unconscious vehicles of mind and body are Brahman as Māyā Shakti that is consciousness appearing as unconsciousness by virtue of Its inscrutable power. Ishvara is thus the name for Brahman as Shakti which is conjoined Chit-Shakti and Maya-Shakti.

The Mother Devi is Ishvara considered in His feminine aspect (Ishvari) as the Mother and Nourisher of the world. The Jiva is an angsha of that great Shakti : the difference being that whilst Ishvara is Mayavin, Jiva is subject to Maya. The world-thinker retains His Supreme undual Consciousness even in creation but His thought, that is the forms created by His thinking are bound by His Maya, that is the forms with which they identify themselves until by the power of the Vidya Shakti in them they are liberated. All is truly Sat—or Brahman. In Creation Shiva extends his power and at Pralaya withdraws it into Himself. In creation Maya is in itself Consciousness which appears as unconsciousness. Before creation it exists as consciousness.

Important practical results follow from the adoption of this view of looking at the world. The latter is the creation of Ishvara who is not a mere Mayik counterfeit of the Brahman. The world is real ; being unreal only in the sense that it is a shifting passing thing whereas Atma as the true Reality endures. Bondage is real for Bondage is Avidya-

shakti binding consciousness. Liberation is real for this is the grace of Vidyashakti. We are each centres of power and if we would achieve success must realise ourselves as such knowing that it is Devata which thinks and acts in us and that we are the Devata. Our world enjoyment is His and liberation is His peaceful nature. The Agamas deal with the development of this Power which is not to be thought of as something without but as within our grasp through various froms of Shakti Sadhana. Being in the world and working through the world, the world itself in the words of the Kularnava becomes the seat of liberation (Mokshayate Sangsara). The Vira does not shun the world from fear of it. But he holds it in his grasp and wrests from it its secret. Realizing it at length as Consciousness the world of matter ceases to be an object of desire. Escaping from the unconscious driftings of a humanity which has not yet realised itself He is the illumined master of himself, whether developing all its powers or seeking liberation at his will.

JOHN G. WOODROFFE.

THE DACCA REVIEW.

VoL VI. JUNE, 1916. No.

GREEK AND GOTHIC ELEMENTS IN THE HINDU POPULATION.

To the Greeks in the days of Homer India was a fabulous land whence the people of the Hellenic world got their Kassisteros (Sans, Kasting=tin) and El-ephas (Sans, Ibha i.e. ivory)[1]—a land inhabited by a race of men who were considered to be next of kin to .the Ethiopeans[2]. India continued to be a land of mystery till the epoch of the Persian wars when for the first time, the Greeks saw arrayed against them these formidable warriors clad in cotton garments and armed with huge bows and iron-tipped arrows coming from beyond the Indus. Henceforward Greek writers notably Hekataios of Miletos, Herodotus, and Ketasias came to possess some real knowledge of this country and Herodotus even heard of Indian ascetics who did not kill any life, nor sowed anything but lived upon herbs[3]. Still the old ignorance with regard to this country was not wholly removed and to many a Greek India remained a land of gold-digging ants, teeming with four-footed birds as big as wolves and inhabited by pigmies only three spans in height against whom war, as Homer had sung, was waged by the Cranes and also by partridges which were as long as geese.

The Veil of mystery which hung over this country was finally lifted by Philip's warlike son who made the Hindus feel the irresistible might of a race more adventurous and not less gifted than their own. Alexander had with him, not only the picked troops of Macedon but also scientific men and men of literary culture who could wield the pen as well as the sword. The impression produced by the new comers upon the Hindu world is probably reflected in the

1. Mc Crindle's Fragments of the Indika of Megasthenes." P. 3.

2. Homer, Od, 1.2524.

3. Mc Crindle's 'Herodotus." P. 2.

following passage from the Karnaparva of the Mahabharata :

Sarvajna Yavana Rajan Suraschoiva Viseshatah "The Greeks are omniscient, oh king, and are particularly warlike." (That the word Yavana or Yone meant a Greek is proved by Asoka's Rock edict XIII where Antiochus of Syria is called a Yonaraja and also by the Besnogar inscription [4] where Heliodorus, the ambassador of Antalkidas is called a Yavanduta).

The Greeks were no less impressed by what they saw around them. Now, for the first time, they came into contact with an Asiatic people whose valour they admired[5] and whose religion they were soon to embrace in large numbers. It is interesting to notice the first contact of the Vanguard of the Hellenic Civilisation in the East with some of the exponents of the Indian religion. When messengers from Alexander invited Mandavis,[6] the Hindu philosopher to go to the son of Zeus with the promise of gifts if he complied and threats of punishment if he refused, he did not go. Alexander, he said, 'was not the son of Zeus, for he was not so much as master of the larger half of the world." As for himself he wanted none of the gifts of a man whose desires nothing could satiate ; and as for his threats he feared them not ; for if he lived India would supply him with food enough, and if he died he would be delivered from the body of flesh now afflicted with age and would be translated to a better and purer life. Alexander expressed admiration of the man and let him have his own way. Mandavis was indeed a man with whom Diogenes would have liked to shake hands.

Alexander could not effect a permanent political union between the Hellenic West and the Brahminic East. Even in his lifetime Philippos, satrap of the Indian provinces was murdered, and shortly afterwards all vestiges of Macedonian rule in the land of the Five Rivers were swept away by Chandra Gupta Maurya who, for the first time, brought the whole of India from sea to sea under one umbrella. Chandra Gupta, his son Bindusar and Bindusar's son the famous Asoka kept this country united and free from foreign inroads. But the withdrawal of the strong arm of third sovereign was the signal for the disruption of the Maurya empire. His sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn by any weaker hand. While India was experiencing the convulsions of the expiring dynasty, the Greeks who had founded a powerful kingdom in Bactria, again poured through the N. W. gates of this country and succeeded in re-establishing their sway over the Punjab and occasionally extending it as far as the

4. Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, P. P. 1053-93

5. Bury's smaller History of Greece. P. P. 428-29.

6, Mc Crindle's Strabo, P. 74.

Jumna and Surastra. References to these Yavana invaders are found in Sanskrit works. One is referred to by the grammarian Patanjali,[7] the author of the Mahabhasya, in the well-known passages of his work 'Arunad yavanch saketam' and 'Arunad yavanah madhyamikam'—the Greek besieged Oudh, the Greek besieged Madhyamika. "When the viciously valiant Greeks—'Dushata vikrantah yavanah'—(says the Gargi Sanhita) after reducing Saketa. Panchala and Mathura will reach Kusumadhaaya, then all provinces will be in disorder.[8]'

The conquerors were, however, soon conquered. Greece captured her Roman captors, the children of the Greek were captured by captive India.

The Greeks were already acquainted with a sect of Indian philsophers who, says Clemens, followed the precept of Boutta whom they honoured as a God on account of his extra-ordinary Sanctity.[9] In the Milindapanha or the questions of Milinda which is one of the most notable books in the Pali literature, Milinda is spoken of as a yavana i. e. Greek king converted to the religion of Buddha—the Boutta of Clemens—by the sage Nagsena. Milinda is the same as Menander who according to Strabo, penetrated to the Jumna and subjugated Pataline and and Surashtra. The statement of the Milindapanha is confirmed by a coin of the king which bears the Dharmachakra, the symbol of Buddhism.[10] According to a legend mentioned by Plutarch seven cities fought after his death for his ashes.

In the inscriptions of the caves at Karli, Junnar and Nasik in Western India, says Prof. Bhandarkar, we find Yavanas or Greeks making gifts in connection with Buddhist stupas and monasteries. One inscription mentions the gift of a pillar by a Greek named Simhadhayya (Yavanasa Singha dhayana thaubho danam). Another mentions the gift of a Greek named Dharmma (dharmma Yavanasa). A third refers to the religious benefaction of a Greek Chanda (Yavanasa Chandaram deya dharma); while a fourth inscription mentions a dwelling which was granted by Indraganidatta, son of Dharmadeva, a Greek resident of Duttamitra (Datamitiyakasa Yonakasa dharmadeva putasa Indragnidatasa).

Dharma, Chandra, Dharmadeva and Indragnidatta were all persons of Greek extraction who embraced Buddhism and accepted Hindu names. Indragnidatta was a resident of Duttamitra, a town in Sanvira contiguous to modern Scinde

7. Indian Antiquary, 1911, Foreign elements in the Hindu population by Dr. Bhandarkar.

8. See—the Chapter of the G. Sanhita entitled the Yaga Puran. See also Smith Early History of India, third Edition, P. 214.

9. Clemens' Alexandrinus (strom 1. p. 305).

10. Indian Antiquary—1911, "Foreign Elements in the Hindu population."

supposed to have been founded by the Greek king Demetrios.

The religion of Gautama Buddha was not the only Indian faith which appealed to the heart of the Greeks. As early as the 4th century B. C. they had become acquainted with the religion of Krishna-Vasudeva who is also known as an incarnation of the God Vishnu. They at first identified Krishna who is also known as Hari with their own Herakles. This Herakles, said Megasthenes and Arrian, was held in special honour by the Sourasevoi, an Indian tribe who possessed two large cities Methora and Cleisobora.[11] Methora is the same as Mothura, the birth place of Krishna. A pillar inscription of about the 2nd century B. C. found at Besnagar in the Gawalior territory records the erection of a Garudadvaja in honour of Vasudeva, God of Gods, by Heliodora, son of Diya who came from king Antalikita i. e. Antalkidas to the court of king Bhagabhadra. Heliodora is called a Yavanaduta i. e. Greek ambassador and his and his father's name, says Prof. Bhandarkar, correspond to Greek Heliodoras and Dion. The fact that he erected a Garuda column in honour of Vasudeva together with the epithet "Bhagavata" shows that though a Greek he had become a Hindu.

11. Mr. Crindle's "Megasthenes and Arrian." p. 201.

From the above statements, it would appear that a considerable body of Greeks accepted the faith of this country and became a part and parcel of the Hindu population, as is proved by their acceptance of Hindu names and intermarriage with Hindus; that intermarriage was allowed between Hindus and Greeks is proved by Chandragupta's marriage with the daughter of Selukas Nikator. In the Sanskrit literature, there are references to towns named after or inhabited by the Hinduised Greeks.

The city of Dattaimitra is referred to by Patanjali.[12] In the Mahabharata mention is made of a Yavanapura in the southern part of India.[13] The allusions to Greeks and Greek cities in the Mahabharata need not cause surprise because the Great epic was last recast after the Christian Era as is proved by the mention of the Tusharas or Tochari i. e. Kushanas and the Hunas in several of its passages.[14]

The Greeks were not the only European people who came to this country in the days of yore and yielded to the wonderful assimilative power of Hinduism. Dr. Sten Konow draws our attention to two remarkable epigraphic records in Junnar in the Kathiewor

12. Indian Antiquary 1911. Foreign Elements in Hindu population.

13. C. V. Vaidya's "Epic India" P. 485.

14. Mahabharata—Santi Parva LXV. 13-15 see also Jand Prs of A. S. B. Vol. 9, No. 7. (The plays of Bhasa, and thing Darsaka of Magadha by K. P. Jayaswal.

Peninsula which must be assigned to the 2nd Century A. D. [15] These are—"Yavanasa Irilasa Gatana deya dhama be podhiyo"—the gift of two cisterns by the Yavana Irila of the Gatas. "Yavanasa Chitasa Gatana Vhojana matapo deyadhama saghe"—the gift of a refectory to the Sangha by the Yavana Chita of the Gatas.

Here we find mention of two Yavana converts who are further characterised as Gatas. The name Irila leads Dr. Konow to think that the Gata Yavanas were in reality Goths. Irila is the regular Gothic form of a well known Germanic name. The word is essentially identical with Aisils, Eorl or Jarl. Chita is the Prakrit form of the sanskrit Chita and this thorough Indian name is a proof of the rapidity with which the newcomers from the west succumbed to the influence of their environment.

If Dr. Konow's theory be correct it can not be denied that the Goths who destroyed the Roman Empire and founded some of the most powerful states of modern Europe should also be regarded as furnishing one element of the present Hindu population and confirming the statement which indeed requires no confirmation that India is an epitome of the whole world.

HEM CHANDRA ROY CHAUDHURI.

15. J. R. A. S.—1912, P. 379 "Goths in Ancient India" by Sten Konow.

INDIAN STUDENT SKETCHES

THE WARDEN'S SKETCHES.

I.

You know what a Warden is don't you? Well to prevent any mistakes, a Warden is a man who wards or watches somebody or something. "Watches" is the word that brings home the idea. The Warden in this particular case was a professor and his wards were students.

To start off with, the Warden was Irish, and that by itself is sufficient to explain a lot: otherwise he was fat, fair, forty and short. He was just a wee bit conceited, but kindhearted, and more or less in sympathy with the students under his charge. He had read a good deal about India, and had conceived the idea, subconsciously or otherwise—more probably otherwise that disaffection and the Indian student were synonymous terms. He determined however to find it all out for himself and an opportunity was not long in presenting itself. There was one student who struck him as undoubtedly light-headed and he began to watch him carefully.

Benode Behari Lal—that was the student's name—ought certainly to have gone astray judging from his appearance. His head was old enough for a man of thirty or more, and the rest of him young enough for a stunted stripling of sixteen. Quite a decent forehead surmounted large deep-set eyes, and his

small pointed chin slightly protruding looked smaller still under his large open mouth, through which gleamed teeth that might have been beautifully white, only they were stained slightly red. His dress consisted of white boggy trousers, a black alpaca coat, and a small pork-pie cap. He had of course a moustache, glasses and a pronounced stoop. He never played any kind of game and was always seen with a book or two under his arm.

What first aroused the Warden's suspicions was the fact that Binode Behari was always surrounded by a crowd of students. His influence was great and the Warden was at a loss to understand the reason. He did not play games, and he was by no means a brilliant student. Moreover he did not seem to have much strength of character or to have very pronounced opinions about anything, yet the influence was unmistakable. Even Daulat Singh—a stalwart six-foot sikh, captain of the Hockey and soccer teams—was sometimes seen in his company, giving him his respectful attention. The obvious solution was disloyalty. This would easily account for the little groups frequently seen in animated conversation, of which Binode Behari was almost always the centre. The objection to so obvious a solution was the behaviour of Benode Behari himself. He was always most polite and respectful to the European Professors, sometimes even going out of his way to perform unnecessary little courtesies, and apparently frank and open in conversation. But after due consideration the Warden thought that this was the specious smiling, studied veneer which was extended to hide deep-laid schemes and turn aside all enquiry.

Every day seemed to convince the Warden more and more that his suspicions were well-founded; curious little incidents were constantly occurring to prove to him that he was right. On one occasion the students were getting up some amateur theatricals and the play selected was "Julius Caesar". Benode Behari was the most prominent member of the committee. As a matter of fact he was treasurer, secretary, and vice-president; after a half dozen rehearsals there was some hitch in the proceedings, and another play was selected. The Warden was anxious to find out the reason for this sudden change and naturally asked Benode Behari for an explanation.

"We found Julius Caesar too difficult; said he "and we have taken up Hamlet instead". "But Hamlet" is much more difficult than "Julius Caesar" said the Warden.

"Yes, Sir" said he, but we do not like the killing scene in 'Julius Caesar'."

"Caesar's murder" said the Warden, "is not so very hard to represent, and besides that particular scene is very effective."

"Yes Sir" said he.

"Then, why did you change?" asked the Warden.

Benode Behari hesitated for a time, and the excuse he at last put forward was sufficiently startling !

"We did not like the murder scene, because of the wrong ideas it might suggest to the students."

"What wrong ideas could possibly be suggested ? said the Warden.

Again there was a certain amount of hesitation, but at last came the answer.

"They might compare Julius Caesar to the British Government."

The Warden was completely taken aback. This reply in his opinion showed the greatest cunning in Binode Behari, who was evidently afraid that the students might behave somewhat imprudently during the representation of the play, and thus lead to the discovery of his designs. But the greatest artfulness of all was displayed in the fact that Benode Behari posed as the guardian of the loyalty of his fellow-students. It never for a moment struck the Warden that the reply might have been true.

On another occasion a member of the Indian staff was leaving. There was the usual farewell address and Benode Behari was again prominent. The Warden's suspicions were aroused this time by the wording of the address. He thought too much stress had been laid on the great obligations the students owed to the British government, and the eternal gratitude it was their duty to feel towards such a benign and far-seeing providence.

At last a lucky chance gave information to the Warden which still further convinced him in his idea about disloyalty. He learned that Binode Behari with several other college students met constantly in the city between five and seven in the evening, and held meetings which were largely attended. It was an easy matter to find out the house where they met, and the Warden determined to pay a surprise visit. The surprise was most successful and he discovered every thing.

Situated in the midst of a winding bazar, in the second storey of what was apparently an uninhabited house, was the room in which the students used to assemble. The Warden climbed up the dark and narrow stair-case. He had no difficulty in seeing what was happening inside, for the simple reason that there was no door to the room. A most unexpected sight confronted him. The room seemed to be crowded with people, some sitting, some standing, and all talking at once. The most peculiar feature was the great diversity in the ages of those who had assembled there. In one comer was quite a number of bearded men with books in their hands, some reading and some asking questions. In another corner was a crowd of noisy youngsters evidently enjoying themselves with slates and chalk. In the centre was a large group consisting mainly of boys and young men who were diligently taking down notes and the notes were being

dictated by Binode Behari. It was almost impossible at first to understand anything of what was being said, owing to the confused sounds, which at one time took definite shape in English, and at another in Hindustani. Gradually however by concentrating his attention on Benode Behari the Warden was able to follow. The words somehow seemed strangely familiar until at last he recognised the notes that he himself had dictated to his students on the previous day.

It was a night-school. The Head-master was Binode Behari, and several college students were his assistants. The fee of the pupils was gratitude, and the reward of the masters was love.

Benode Behari is still in the college, and his influence has now extended to the Warden.

II.

A FOOT-BALL MATCH.

The Warden had an idea that by playing games, he, could much more quickly get to understand the students, and at the same time win their confidence. It was not exactly a pleasure at the age of forty or thereabouts to turn out for soccer at a temperature well over 80°, but there was nothing like making the best of a bad job, and the best way to keep young and feel young was to do as young people did. His first appearance on the football field was greeted with a smile of amusement. He was old enough to be the father of most of the other players, with just a trifling tendency to stoutness. He had however in by-gone days represented his College in the Rugger field, and the effect of the training he then received had not yet completely worn off. His kicking was still quite sound and the decided advantage of his weight—thirteen stone told very much in his favour in all collisions accidental or otherwise. Accordingly after one or two practice matches the smile of patronising amusement with which he was at first greeted changed to a smile of genuine welcome.

He took a great interest in the team, got them to turn out and train regularly. Moreover he taught them the value of keeping their places and particularly the value of self-control and combination. He was fortunate in having to deal with an exceptionally good lot of fellows. Daulat Singh the football captain was a fine stalwart Sikh, well over six feet and a gentleman by birth and instinct; he had wonderful control over his team, and always exerted his influence in accordance with the wishes of the Warden. Then there were Shiam Singh, a hardy Rajput of very good family, Nand Kishore a Paharee, thin, wiry, and hardy, and as nimble of foot as his native mountain goat. The whole team in fact seemed to contain the pick of the college. They were all true sportsmen and all had the instincts of true gentlemen.

The result of this constant practice and training made itself plainly evident in the League Tournament. There were many hard fought tussles and some keen replays, but the College team came out successful in the end with the handsome margin of eight or ten points, Incidentally they secured a handsome silver cup and a set of medals. They were very pleased with themselves and deservedly so after such a successful season, and when a challenge came along from the Royal somethings, they were only too pleased to accept.

The Royal Somethings were a famous regiment and had covered themselves with glory on many a battlefield. Their officers were all fine fellows and the rank and file, hot-headed reckless Irishmen for the most part, delighted in nothing more than a bit of a scrap either in peace or war. The dull routine of barrack life was much too slow for them and at times they were rowdy and inclined to get a bit out of hand. They had not been long out in India and they had a fine contempt for Indians. It was in something of this spirit that the challenge was issued—namely 'to knock the bloomen' conceit out of the native team.

The match was played on the College ground and it was unfortunate that no Officer was playing in their team or on the ground watching the match. Otherwise perhaps the series of incidents that took place would never have occurred. Play had scarcely commenced when the trouble started. The students scored a goal within the first ten minutes. They were too quick and the Tommies waxed furious ; a bulky lumbering Tommy would throw himself with all his force against a student who in most cases proved too quick for him, with the result that the Tommy went head over heels to the great delight of three or four hundred spectators. Nothing delights an Indian so much as a big kick high up in the air or a good toss, and as a general rule he is quite impartial in vociferously applauding these two things on whichever side they occur. This delighted shouting was mistaken for jeering and the Tommies' waxed more furious than ever. They not only now used their weight but abominable language in addition, and curses, were, on their lips every second minute. The game still went on and the students led by two goals at half time. They had behaved splendidly. They took what they got in the way of hard knocks like true sportsmen, and absolutely ignored the foul language used by their opponents. They had been taught that language of any kind was not only useless on the football field, but a waste of breath and energy which might be more profitably expended on the game itself.

Naturally the Warden was furious but at the same time helpless. There was no one to whom he could appeal, for even the referee was one of their own men sportingly agreed to by the students, All he could do was to urge the

team to keep cool, play a steady game, and turn a deaf ear to the abuse which was being freely hurled at them. He felt sore and ashamed and he feared that a few more incidents like this might easily move them to the conclusion that all sahibs were not gentlemen.

The second half started and it was more or less a repetition of the first, only worse. The Tommies made frantic efforts to reduce the lead, aided appreciably by the referee, but all to no purpose and yet another goal was scored against them. Then an unfortunate incident occurred. The Warden charged the goal keeper who fell back rather awkwardly into a drain behind the goal post, getting a nasty fall. The studsjue sent up a wild shriek of delight. Two Tommies swore revenge, and a few minutes after fiercely charged the Warden from opposite sides. The latter discreetly held back, and the two dashed into each other with great force. There was another wild shriek of delight from the students. This last proved too much for one of the Tommies, who jumped up from the ground and deliberably aimed a nasty kick at the Warden. But this proved too much for the Warden who had been inwardly raging the whole time, and he struck the Tommy. That settled the business. The students rushed on to the field in a howling surging mass and surrounded the Tommy who had attacked their Warden. Many hands roughly picked him up and flopped him on the ground, and flopped him on his sides. The Warden by using all his powers of persuasion as well as all the threats he could think of did all he could do to save the victim. Order was restored after some little time, but the match was over.

When the facts of the case were known the Warden became more or less unpopular with the officers of the Royal somethings, but he felt he was compensated to a certain extent by the bond that had been established between himself and the students.

THOS. F. O'DONNELL.

THE STUDY OF GEOGRAPHY.

BY

P. LEO FAULKNER F.R.G.S., F.R.S.A.

(Indian Police).

During the past few years it has been my good fortune to be actively associated with the management of one of the leading educational institutions in West Bengal. It has in consequence been my lot to see much of the method which prevails for the instruction of scholars in various subjects and what has impressed me most is the comparative absence of interest shewn in the teaching and study of geography. In fact it

has not yet been realised that geography is a science as important for instance as philosophy or physics and in this paper it will be my object to indicate the vast field of research that is for ever open to the student of this interesting and important subject.

Geography is that branch of science which deals with the phenomena (1) of the earth's surface and (2) of those who inhabit the earth. The fact that one has learnt by heart a long list of rivers or bays, the population of several towns or the average rainfall of some others, the height of certain mountains or the names of a few volcanoes does not mean that one has studied geography. Far from it! When one has spent some years in dealing with the figure and dimensions of the earth and its movements as a planet: the physical conditions of the earth's surface and the cognate phenomena of the sea and the air: the study of man and his forms of government and commerce; then, and then alone, can a student declare without fear of contradiction that he has studied geography. It will be observed hat I have included anthropo-geography as a branch of this science, a view that has been accepted by the leading English and German geographers. If this were not the case, the study of travel and exploration would not, for instance, be comprehended in that branch of learning where it falls with such obvious propriety. It is thus apparent that an intelligent and comprehensive course in geographical science entails a progressive acquaintance with the development of human history.

The Phœnicians were the first nation to shew geographical enterprise. They wended their way through the Mediterranean and passing beyond the Straits of Gibraltar emerged into the Atlantic to visit the shores of Ancient Britain. They founded settlements and towns in Asia Minor and in Africa and earned immortal fame in the 9th century B. C. for discovering Carthage which later was destined to challenge the right of Rome to the title of "World's champion." Referring to the Phoenicians Heeren writes:—"They extended their enterprises and undertakings much further than even the Venetians and Genoese of the Middle ages. Their ships were to be found both "on the Indian and the Atlantic Ocean while their flag "was flying on the shores of Britain and the coasts of "Ceylon".

Herodotus, the Greek historian, who lived nearly 500 years B. C., has dealt with many geographical subjects in his works. In 465 B. C. he left his home in Asia Minor to travel in Greece and other countries. We find him at Athens and Corinth and he also visited Babylon, Thrace and Sicily. While on his travels he was careful to study the ethnology and geography of the countries through which he passed and he has perpetuated the knowledge thus gained in his great History which will last as long as man is man.

About this epoch there was constant discussion as to the shape of the earth. It was the philosopher Aristotle, impressed by the fact that during an eclipse the earth's shadow upon the moon was circular, who first contended seriously that the earth was a sphere. True Thales, the father of Greek philosophy had. as early as 600 B. C., declared his belief in such a theory but his only reason for so doing was the argument that of all figures the sphere is the most perfect. Eratosthenes, a mathematician who lived in Alexandria about 200 B. C., persisted with the arguments urged by Aristotle and it is now generally admitted that he was the first to use longitude and latitude for demarcating position.

Maps appear to have existed from about 1500 B. C. but the few traces of Egyptian cartology now available shew that such maps were crude in the extreme. We know, however, that Ptolemy projected a map about 150 A. D., but the first satisfactory map of the world was not produced until 1544 A. D. when Sebastian Cabot published the chart with which his name will ever be honourably associated. Ptolemy spent much time in verifying the latitude and longitude of the principal towns of the Roman Empire and even went the length of estimating the actual distances between such places.

India herself was early concerned with geographical enterprise. About 500 B. C. Darius, King of Persia, despatched an expedition with orders to explore the rivers of the Punjab. Then, as so often is the case, the explored country became the property of those whose curiosity had led them so far afield, and the valley of the Indus had to acknowledge the Persian king as its lord and master. Alexander the Great, King of Macedon, about one hundred and fifty years later, resolved to conquer India, and Greek writers have left us a stirring account of his march through the Punjab. It is interesting to note that in 300 B C. one Megasthenes came to the court of Chandragupta. He remained there for many years and has placed on record a detailed account of the geography of India and the customs of its people.

Chinese travellers and pilgrims were wont to visit India in the early part of the Christian era. Their writings are the source of much of our knowledge of that epoch and we learn for instance that Tamluk was then a flourishing seaport. Now it is many miles up the river Rup Narain and a flat bottomed paddle steamer approaches it with difficulty.

As the centuries came and went geographical discovery as distinct from geographical research made rapid progress. I do not, however, intend to refer to the discoveries of the Middle ages though there is a well-nigh irresistible inclination to quote from that fascinating volume "The Travels of Marco Polo, the Venetian." I can but

commend an early study of its romantic pages to any student who intends to make an intelligent study of geographical science. My reference to the travels and works of the earliest geographers has been made to demonstrate how from time immemorial some of the greatest of the world's philosophers have readily recognised the importance of geography as a science. It was, however, not until 1560 A. D. that a comprehensive work on this subject was written and published. Then, Varenius with a proper conception of the scope of geography did not content himself with a mere description of countries and peoples but narrated the earth's phenomena and attempted to investigate their causes and explain their objects. To my mind, and I am of course open to correction, Varenius was the first European Scientist to realise fully the possibilities of geography as a science.

Kant, the great metaphysician and philosopher, whose works are highly esteemed both in the Eastern and Western hemispheres, lectured on Physical Geography at Konigsberg in 1768. He even included theological geopraphy in his lectures and held that religion was not only a question of sentiment but that it depended largely on the climatic and geographic aspects of a country. Humboldt, however, was the greatest geographer of all time. His book Cosmos published about 1850 is the gem of all geographical classics and this work was undoubtedly the means of bringing home both to English and German educationalists the necessity for specialising in a science which had long been sadly and irrationally neglected. It was Humboldt's lectures and researches which impressed upon scientists the urgent necessity for the centralisation of the many subsections into which the study of geography had been allowed to drift. Geography is now recognised as one of the most important branches of Science and many Universities in England and in Europe regarding it as one of the highest branches of knowledge have special chairs of Geography. Why, then, should it be disregarded in India for geography is "the foundation of all historical knowledge?"

This paper has been written with the sole object of drawing attention to the almost total absence of geographical study in Indian schools, colleges and Universities. It is not intended to be anything more than the key to a palace replete with valuable knowledge and I can but hope that some at least will make use of the key aud enter for themselves the realms of study which await the attention of the students and scholars of this country.

THE ARCTIC HOME IN THE RIG-VEDA: AN UNTENABLE POSITION.

III

The same remark also applies to the second of the aforesaid riks, which runs as follows :—

"অদিতে মিত্র বরুণ উৎ মৃল যৎ বঃ বয়ম্ চক্রম
কৎ চিৎ আগঃ।
উরু অশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতিঃ ইন্দ্র মা নঃ দীর্ঘাঃ
অভিনশন্ তমিস্রাঃ ॥

[Adite mitra Varuna uta mrila yat vah vayam chakrima kat chit agoh ।

Uru ashyam abhayam jyotih Indra ma nah dirgha abhinashan tamisrah ॥

'O, Adity, Mitra, and Varuna, graciously pardon us, if we have committed any sins unto you. O Indra, may I reach the broad fearless light, and may not long darkness overtake us.'

Now, Rishi Sishu is the author of the Rik under notice. In it the Rishi has been represented as engaged in soliciting the *gods to forgive him and his* kinsmen all their transgression if any and to bestow on them the blessings of happy life in the world to come. Here the expression "উরু অভয়ং জ্যোতিঃ" (Uru abhoyam jyotih) 'the broad fearless light,' simply means the heaven, the domain of perpetual light, "যত্র জ্যোতিঃ অজস্রম্" (Yatra jyotih ajasram) as it is characterised in IX, 112, 7, and where death and therefore fear cannot enter "অমৃতে লোকে" (Amrite loke) (IX,112,7); and "দীর্ঘাঃ তমিস্রাঃ,, (Dirgha tamisrah), 'long darkness' simply means the darkness of the region intended for the wicked after death "গম্ভীরং পদম্" (Gambhiram padam) (IV, 5, 5.). In fact, to understand the real significance of the aforesaid expressions, one must take them in the light of the Rig-Vedic conception of heaven and hell. The Rig-Veda describes the domain intended for the good after death as one of eternal and unending sunshine and joy, "লোকাঃ যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ যত্র তৃপ্তি। (Lokah yatra jyotishmantah yatra triptih (IX, 112, 9 and 10) and the region, meant for the residence of the wicked after death as covered with unending darkness, "গম্ভীরং পদম" (Gambhiram padam) (IV, 5, 5) and this explains why the Rishi solicited the gods to lead him and his men, after their death, to the region of broad and *fearless light*, "উরু অভয়ং জ্যোতিঃ" *(Uru* abhayam jyotih) and to save them from long darkness দীর্ঘাঃ তমিস্রাঃ (Dirgha tamisrah)—the torments of a life in hell, "গম্ভীরং পদম্" (Gambhiram padam). *Evidently, therefore, this* Rik *also* does nol help Mr. Tilak in the least.

But be it what it may, there are, no doubt, passages in the Rig-Veda—and the third of the Riks mentioned above is one of this kind—which show clearly that the Rishis were really afraid of the darkness of the night, and that they, at times, even prayed to their gods and goddesses for deliverance from the same, and for the appearance of the dawn. To understand, however, what made them mortally afraid of the darkness of the

night, one must enter into the history of the times and try to understand the circumstances under which the Rishis then lived and worked. The history of the times is writ large on the pages of the Rig-veda itself. The Rig-Veda most clearly tells us that the non-Aryans, vanquished in open war, often took refuge in forests and móuntain fastnesses; and that, at times, taking advantage of the darkness of the night, they came out of their hiding-places, and attacked the invaders, and, whenever possible, harassed them, and plundered their food and cattle. The Rishis, being strangers in a strange land, were unable to meet these nightly attacks, or to punish their enemies, as long as the darkness lasted. On the approach of the dawn, however, they took up arms, rushed upon the enemies, and either killed or drove then away. And this clearly explains why the Rishis were so afraid of the darkness of the night, and why they often prayed to to their deities for deliverance from the same, and for protection during its continuance. But to our great misfortune, none of the Vedic Scholars, eastern or western, have, in their efforts to discover the causes of such apprehensions, ever fully entered into the history of the times. The real causes of these nightly apprehensions have not, therefore, been yet satisfactorily explained by any one; Sayana suggested that they were due to misgivings caused by long winter nights and the western scholars have simply accepted Sayanas suggestions. It has further been suggested that "to the old Vedic bards night was as death, since they had no means, which a civilised person in the twentieth century possesses, of dispelling the darkness of the night by artificial illumination," and that it was the absence of artificial illumination that made the Rishis eagerly long for the appearance of the light and of the dawn. But both these explanations are extremely absurd and preposterous. The modern savages, who are much more backward than the Vedic Rishis, are not at all known to suffer from any such apprehensions at night. Had these apprehensions, as Mr. Tilak aptly observes, anything to do with the absence of artificial illumination, or the mere length of the ordinary winter nights, as we have them here in the temperate or the tropical zone, similar apprehensions would have certainly been visible among the modern savages as well. But in accounting for the causes of the nightly apprehensions of the Vedic Rishis, Mr. Tilak has gone from one extreme to another, and has concluded that they must be due to the recollection of the horrors of the darkness of the long Polar nights which had oppressed their remote ancestors in their Polar homes in some prehistoric and bygone age. Mr. Tilak has not evidently cared to enter into the history of the times. Had it not been for this, he would have clearly seen that the nightly misgivings of the Rishis had

absolutely nothing to do with the supposed recollection of the Polar darkness, the imaginary cause to which Mr. Tilak attributed them, and that they, on the contrary, proceeded from such causes as would have frightened any of us, even now, under similar circumstances. But unfortunately Mr. Tilak, astute scholar though he is, has, in the treatment of his subject, adopted an extremely questionable method. He had had the Arctic Home theory already into his mind. He has then, it appears, gone about picking out such passages from the Rig-Veda as, he thought, would fit in with the said theory, and lend a support to it, but in so doing, Mr. Tilak has not deemed it necessary either to look into the context of the passages cited by him in support of his position, or to enter into the history of the times. It is therefore no wonder, if Mr. Tilak, thus misled by his geological bias, has fallen into grievous blunders, and been led into conclusions extremely far-fetched and unhistorical.

The nightly apprehensions of the Vedic Rishis were real, and were due to causes equally real. But to discover these causes, one must, as we have said, turn to the history of the times, writ large, as has already been stated, on the pages of the Rig-Veda itself. In the very Rik, for instance, where the Rishi prays the goddess Night to be auspicious unto him and his men—and this is the only recent Rik, mentioned by Mr. Tilak under this head, in support of his position—the Rig-Veda most clearly tells us why the Rishis were afraid of the darkness of the night. The said Rik,—and Mr. Tilak has only quoted half of it, and he alone can say why, runs as follows :—

"যবয়় বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনম্ ঊর্ম্যে। অথ নঃ সুতরা ভব॥" (Yavaya vrikyam vrikam yavaya Urmye atha nah sutora bhava.)

X, 127, 6.

'Remove O Night, the Rakshasees, the Rakshasas and the thieves ; and then be auspicious unto us.'

Here the use of the word "অথ", atha then, is very significant. It clearly shows that the Rishis were, at night, greatly afraid of the non-Aryans, whom they called by such names as Rakshasas. Dasyus and the like, and that they had often to pray for protection against their nightly depredations. Here is another equally significant Rik, wherein the goddess dawn was invoked under similar circumstances, for protection.

দূরে অমিত্রম্ উচ্ছ ঊর্বীং গব্যূতিম্ অভয়ং কৃধিনঃ।

VII, 77, 4.

Dure amitram uchha urvim gavyutim abhoyam kridhinah I

Shine forth, O Dawn, scattering the enemies, and render our pasture lands free from fear. In the following Rik we are still more clearly told why the Rishis so eagerly longed for the appearance of the Dawn :—

বিশ্বম্ অস্যাঃ ননাম চক্ষসে জগৎ জ্যোতিঃ কৃণোতি সূনরী।

অপ দ্বেষঃ মঘোনী দুহিতা দিবঃ উষা উচ্ছৎ
অপ স্রিধঃ। 1, 48, 8,

Vishvam asyah nanama chakshasa
jagat jyotih krinoti sunari।
Apa dveshah maghoni duhita divoh
ushaw uchhat apa sridhah॥

The whole world is doing homage to the wealthy goddess Dawn, the Daughter of the Sky, for her appearance; for she, the excellent Guide, dispels the darkness, and scatters the enemies and the oppressor! Again, in 1, 50, 2, we are told :—

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রাঃ যন্তি উক্তিভিঃ।

Apa tya tayavoh yatha nakshatrah
yanti uktibhih।

'On the approach of the Sun, the Revealer of the world, those well-known thieves disperse, with the night, like the stars.'

Here the word, "ত্যে", tya 'those well-known', is very significant. It clearly shows that thieves referred to here were well-known to the Rishis, and that their nightly depredations were matters of very common occurrence. Again, in the Rig-Veda, the Dawn is often characterised as "যাবয়দ্দ্বেষাঃ" (yavayatdveshah), the Scatterer of the *enemies and also as* "জীরা রথানাম্" (Jira rathanam). "One who sends forth chariots of war", and as "সুনরী" "the excellent Guide?"

Now, the fore-going passages and expressions, combined together, give us a clear and faithful history of the times. The Rig-Veda, therefore, clearly tells us that the non-Aryans, by their nocturnal visits, often made the nights extremely unsafe, and compelled the Rishis eagerly to long for deliverance from the darkness of the night and for the appearance of the dawn. It is, therefore, quite clear that the nightly apprehensions of the Rishis had absolutely nothing to do with the recollection of the supposed darkness of the Polar nights, the hypothetical cause to which Mr. Tilak attributes them. Evidently, therefore, Mr. Tilak's contention stands absolutely nowhere.

Mr. Tilak's contention is not only unhistorical, but it is extremely unpsycological at the same time. The prospect of a present or coming danger alone can create consternation. The mere recollection of dangers supposed to have been experienced by one's prehistoric ancestors in same remote and prehistoric age, but not having even the remotest chance of repeating themselves in the future, can, by no means, give rise to any apprehensions whatever. "A painted devil," says Shakespeare, "frightens none but a child or a lunatic." The Vedic Rishis were neither boys of immature understanding *nor lunatics. They, on the contrary* were men of very strong common sense, and were so much advanced in civilization as to have solved, as Mr. Tilak himself admits, even "the question of the equation between the solar and lunar year with sufficient accuracy." The Rishis knew fully well that the nights of the country they lived in, were

short, and that there was absolutely no chance of their ever being oppressed with the long darkness of the Polar nights in their Indian homes. So even if it be admitted that the prehistoric ancestors of the Vedic Rishis had really lived in the Arctic Pole and that the Vedic Rishis were, by tradition, aware of the great length of the Polar nights, still it is extremely absurd to maintain that, on the approach of the night, the recollection of the long Polar darkness frightened the Vedic Rishis in their Indian homes. So Mr. Tilak's position is, on the very face of it, entirely unpsychological.

The supposed Traces of the long Arctic Dawns :—

We shall now consider if the Rig-Veda really contains any traces of long and continuous dawns of several days' duration with their revolving splendours visible only in Polar regions. Here is one of the most important Riks mentioned by Mr. Tilak, under this head, in support of his position :—

"কিয়তি আ যৎ সমনা ভবতি যাঃ ব্যূষুঃ
যাঃ চ নূনং ব্যুচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা
জোষম্ অন্যাভিঃ॥" I. 113, 10.

(Kiyati a yat samana bhavati yah vyushuh yah cha nunam vyuchhan. anu purvah kripate vavashana pradidhyana josham anyavih.)

'How long have the Dawns been with us—those that have arisen, and those that shall arise ? The present Dawn desiring us light, is imitating those that have gone before. The exceedingly bright Dawn of the present shall. likewise, be imitated by others to come'.

Now, this Rik, taken by itself, disjoined from the context, may, no doubt, lead one to think that the Dawn referred to here was probably really a long Dawn, which, though seen rising continuously for severai days, was not yet fully flashed forth. And this is exactly how Mr. Tilak has taken it. But read in the light of the context, it lends absolutely no support to Mr. Tilak's contention. In the very next Rik, for instance, we are clearly told that the Dawn referred to in the Rik under notice was an Indian Dawn, which is seen every morning rising in the east. The Rik runs thus :-

ঈয়ুঃ তে যে পূর্বতরাম্ অপশ্যন্ উষসম্ মর্ত্যাসঃ।
অস্মাভিঃ উ নু প্রতিচক্ষ্যা অভূৎ আ উ তে যন্তি
যে অপরীষু পশ্যান্॥=I. 113, 11,

(Iyuh te ye purvataram apashyan ushasam martasah. Asmabhih unu pratichakshya abhut a u te yanti ye aparishu pashyan.)

Those who saw the Dawn in the past, are dead. She is *now visible to us.* Those who will see her hereafter are yet to come (are not yet born).

Now, Rishi Kutsa is the author of this as well as of the preceding Rik. And we are clearly told here that the Dawn in question was one which was then actually seen by the Rishi shining before him. Evidently, therefore, the very expression, "অস্মাভিঃ উ নু প্রতিচক্ষ্যা অভূৎ" (asmabhih u nu pratichakshya abhut) "she is now visible to us," conclusively

proves that the phenomenon described here was one that was actually present before the Rishi, and therefore purely Indian in character. The thirteenth Rik of the same Sukta is still more significant. It runs as follows :—

"শশ্বৎ পুরা উষাঃ ব্যুবাস দেবী অথঃ অদ্য ইদং
ব্যাবঃ মঘোনী।
অথঃ ব্যুচ্ছাৎ উত্তরান্ অনু দ্যূন্ অজরা অমরা
চরতি স্বধাভিঃ ॥" I. 113, 13.

[Shashvat pura Ushah vyuvasa Devi athah adya idam vyavah maghoni । athah vyuchhat uttaran anu dyun ajara amara charati Svadhabhih ॥]

"Formerly the goddess Dawn flashed forth every day. The wealthy Dawn 'now shines here'. She will blaze forth hereafter during the coming days. She has (thus) been shining, by her own lustre, 'ever the same', *from all eternity.*"

Rishi Kutsa is the author of this Rik as well. And here we are most clearly told that formerly "পুরা" (Pura) the Dawn rose 'every day', "শশ্বৎ ব্যুবাস" (Shashvat vyuvasa), and that she has been 'ever the same' from all eternity, "অজরা অমরা" (Ajara amara). Now, as applied to the Polar Dawn which shines only for thirty days continuously, and then becomes invisible for the rest of the year, the expression "শশ্বৎ ব্যুবাস" (Shashvat vyuvasa), 'rose daily', is entirely meaningless. Again it is quite evident from the expression "অজরা অমরা" (Ajara amara), 'ever the same from all eternity', that Rishi Kutsa was aware of only one kind of Dawn, namely, the Dawn that rose daily, "শশ্বৎ ব্যুবাস" (Shashvat vyuvasa). It is therefore evident that the Rishi was not even aware of the very existence of the Polar Dawn which rose for thirty days continuously then became invisible for the rest of the year. Had it not been so, he would certainly been the last person to say that formerly the Dawn rose every day and that she has ever been the same from eternity. The supposed discovery of a reference to the Polar Dawn in one of the Riks must, therefore, be a fiction pure and simple. So the Dawn referred to in the Rik under notice must needs be an Indian Dawn, which, as Kutsa himself says, "অদ্য ইদং ব্যাবঃ" (Adya idam vyavah) was then shining before him, and which rose daily, "শশ্বৎ ব্যুবাস" (Shashvat vyuvasa).

(To be continued)

NALINI KANTA DATTA.

DACCA FORTY YEARS AGO.

Steamer communication.— We are happy to inform the public that there will soon be opened a steamer communication between Nalchhity, Barisal, Madaripur, Faridpur and Goalundo. Great credit is due to the exertions of Mr. Sutherland, Judge of Backergunge, who is trying to raise a fund to be used in purchasing a small steamer and in

defraying all the necessary expenses of having such a communication. This no one can deny is a move in the right direction, for it will contribute to the great increase of trade in Nalchhity, Jalokati and Madaripur which are the three trading marts in Backergunge and Faridpur. Gentlemen of the district of Dacca willing to subscribe to the said fund may send their names to us and communicate to us the sum they would each like to pay.

Dacca College.— Proceedings of a meeting of the students and ex-students of the Dacca College held on the 15th May, 1875, to consider the best means of expressing their great respect and regard for Mr. Garrett, Principal of the Dacca College. Babu Pran Kumar Das, ex-student of the College was voted to the Chair. The Chairman having enumerated the obligations that the students owe to Mr. Garrett called upon Babu Purna Chandra Banerjee to read the letter that was proposed to be sent to Mr. Garrett.

The following resolutions were then carried.—

1. Proposed by Babu Purna Chandra Banerjee seconded by Babu Ram Kumar Basak.

That as no address can be presented to a Government Officer according to the existing rules, a letter expressive of our feelings be sent to Mr. Garrett.

2. Proposed by Babu Amar Chand Laha secended by Babu Mohini Mohan Bose.

That a subscription be raised with the object of having an oil painting of Mr. Garrett to be hung up in the College Library.

3. Proposed by Babu Har Chandra Bhattacharjya seconded by Babu Basanta Kumar Guha.

That a Committee consisting of the following gentlemen be formed with power to add to their number to raise subscription for the neeessary expenses.

Babus Pran Kumar Das, Sarat Chandra Bose, Amar Chand Laha, Kali Nath Chatterjee, Sarat Chandra Dhar, Probhat Chandra Chatterjee, Nava Kumar Chakravarty. Aswini Kumar Bose, Lalit Kumar Das, Purna Chandra Mohuntya, Durga Prasanna Sen and Purna Chandra Banerjee.

4. Proposed by Babu Kali Nath Chatterjee seconded by Babu Nava Kuma Chakravarty,

That Babu Pran Krisna Das be elected Chairman of the above Committee and Babus Sarat Chandra Bose and Purna Chandra Banerjee Secretaries.

The subscription list was then circulated and above Rs. 130 were subscribed at the spot. Babu Purna Chandra Banerjee heading the list. With a vote of thanks to the Chair the meeting separated.

DACCA ATHLETIC SPORTS.

[Held on the 12th and 13th May, 1875]

Among the causes of the degradation and helplessness of the Bengalees as a nation, we might say the Hindu's

inoffensiveness takes the precedence. Inoffensiveness is inculcated by all religions, but the Hindus (especially the Bengalees) alone have carried it into their daily life. Now offence being involved in, and inseparable from, defence, we are not surprised to find that the inoffensive Bengalees are wholly helpless and incapable of defence. Impertinence and presumption which the young Bengal are accused of, are only the first symptoms of a spirit of offensiveness which, thanks to English Education and modern civilization is surely though slowly growing among us. Another cause of our degradation is the use of intoxicating 'drugs' instead of drinks. We are proverbially a non-drinking nation but the masses of Bengal are fearfully addicted to intoxicating drugs notably ganja. Had the Bengalees been a drinking, and not a smoking nation, we would certainly have been better fitted for defence and qualified for self-government. The Mohamedans are also a non-drinking nation and the consequence has been that they have gradually been ousted from Europe and are now not safe from the attacks of Feringhees in Asia, in their own countries from which they issued, in days gone by, in not very large numbers to carry fire and sword to the extremities of the earth. Our readers will, we hope, not misunderstand us ; we do not advocate drinking habits or wish to be a nation of drinkers, much less of drunkards : but we have no hesitation to say that as long as there are drinking nations in this world, a non-drinking nation must go to the wall and that as the masses of our countrymen are addicted to drugs, we really wish that they had taken to drinks instead, and thereby placed at our disposal masses of ruffianlike men not caring two pence for their dear homes, relatives etc. and dearer lives.

Inferior physical strength is not the least of the causes of our national degradation. And it is with intense satisfaction that we welcome the first fruits of Sir George Campbell's good educationsl policy of which gymnastic exercises were the most prominent and unexceptionable feature.

On the 12th of May athletic sports were held in the College Gymnasium and the programme of exercises is given below. Many respectable European and native gentlemen were present on the occasion. All the competitors did the exercises tolerably well. Beni Madhab Pal, Arunoday Sen and Kula Chandra Dutt's feats were admired by all spectators and called forth repeated cheers. Beni Madhab stood first in the Belvedere Tournament and he quite with ease kept his position at Dacca. The teacher did some wonderful feats on the Trapezium and Babus Brajendra Kumar Roy and Raghu Nath Das offered to him two Gold Mohars. Among the boys under 14 Rai Mohan Mukherjee, Akshay Kumar Das and Mohamed Mohsin went through their parts capitally well.

On the 13th May the sports were held on the Cricket Ground at the Old lines. The remaining subjects in the programme were gone through ; almost all respectable European and native gentlemen were present. A few ladies graced the meeting with their presence and as the BENGAL TIMES announced, were served with "cool drinks". There was a good concourse of people and order was kept with the greatest possible difficulty. With the kind permission of Khajeh Ahsun Ullah his band played at every interval between two exercises. Beni as usual did wonders on the Horizontal bar, Kula coming up quite close by him. Dina Bandhu cleared the hurdles very fairly and won easily the 300 yards race. This boy obtained Babu Sri Nath Roy's Gold Mohar for standing first among Bikramporee boys. The ground exercises of boys under 14 were very interesting : Akshay Kumar Das did several things very neatly and cleverly, and was repeatedly cheered by the whole audience. It was the opinion of the Judges and all bystanders that great credit was due to him. He is a young boy of 12 and his going through the exercises so capitally well struck all who saw his exercises. Babu Pratab Chandra Das offered him a gold mohar in addition to the fund prize. Beni Madhab Pal has won the 1st. Champion Prize and Annada Sen the 2nd Champion prize. The whole thing was a decided success and great credit is due to Mr. Garrett and his assistants notably to Babu Pran Kumar Das for the setting up of the thing and first class arrangements throughout the whole on both days. We cannot on the part of the public too strongly thank them for their noble and successful exertions. We hope these sports will be continued every year.

Mr. Webb.—This gentleman has come here by the last steamer and joined his appointment as Professor of Literature on Monday last. We wish him every success.

DACCA COLLEGE PRIZE DISTRIBUTION.

On Monday the 17th Instant at 5-30 P. M., in the College compound Prizes were distributed to the College and Collegiate School students by the Commissioner of the division before a respectable and numerously attended meeting. Representatives of all sections of the Dacca Community were present on the occasion. Mr. Garrett the Principal of the College opened the meeting with an apology for renewing the old custom of Prize distribntion. He said fifteen years before Prizes were *publicly distributed every year* either by the Lieutenant-Governor, President of the Council of Education, or the Commissioner of the division with great eclat. Why the custom was discontinued Mr. Garrett knew not but he thought it would do good to renew it and with this honest conviction he

revived the custom and having given a short history of the College for last year requested the President to distribute the prizes, but he took the oppurtunity to announce to the public thas the Bengal Government has sanctioned Rs. 29,000 on the condition of an equal amount of local subscription for addition to the College building. The present building was meant for 350 boys at the highest, but at present the College consisted of of more than 600 boys consequently every room was over filled and it was to be wondered that the boys did not fall sick. An addition to the College building is essentially necessary and the P. W. D. has estimated the cost at Rs.58,000 together with the cost for a large examination Hall. Mr. Peacock after distributing the prizes said that he quite agreed with Mr. Garrett that public Prize distributions always tended to encourage the students. He said already the Bar and public service were overcrowded and it ought to be the aim of the students to take to independent professions. He thinks there is yet ample room for natives taking to several trade and independent professions and to that wards ought their attention be directed. He regretted Mr. Garrett's transfer and cited the late Gymnastic tournament and the day's prize distribution as proofs of his great interest for the welfare of his students. The meeting then separated with repeated cheers for the President, Mr. Garrett and the donors of prizes. Just as the President left his chair and the gentlemen present were vacating their seats Babu Pran Kumar Das, an ex-student of the local College stepped forward and with Mr. Garrett's permission read a *letter* to him from the ex-students and students of the College expressive of ther feelings at his approaching departure from this place. Mr. Garrett then made a short but feeling reply. He said he never knew that the students were going to read a letter and he felt himself at the moment unable to give a reply but promised to reply to the letter in writing. He said that the students' sorrow on his leaving Dacca was not half so keen as his own. In fact tears were almost rushing out of his eyes when he gave the short reply. He mentioned that during his stay of 6½ years at Dacca he had no cause of complaining of the conduct of any student towards him. He had every reason to to be satisfied with their conduct. He took the opportunity of thanking the teachers for their good manners and able management of their respective classes.

DACCA.

(Communicated).

It was one day in June in the memorable year 1857 remarkable in the annals of British India for the mutiny of Government troops, a Civilian Judge got up from the Bench and rung the bell of alarm. It was something in the

daily *Hurkura* that startled his perturbed imagination. A false cry of "they come, they come" was heard. A crowd of people rushed out of the kutchery and spread the cantagion of affright far and near through the town.

The phenomena of a panic day were then markedly visible. The Offices and Institutions presented a most dismal appearance; their inmates flying in precipitate haste to their houses. Mr. Harris of the College jumped over the northern wall to meet his darling son in the house occupied by the Moonsiff's kuchery. Many had retained boats wherewith they fled to their homes in the villages. The European Residents with the exception of a few took to fast-moving native vessels, consigning their property and valuables to the faithful custody of their servants. The manly Editor of the DACCA NEWS sat with a revolver in hand upon the top of his three-storied office which overlooks the square in front of the Baptist Mission Church. Old Mr. Shircore, the Armenian Merchant, plucked all the courage and fortitude that one could collect in the extreme hour of peril, and bore a similar attitude in anticipated defence of his Depot then occupying the rooms of the BENGAL TIMES' office. The Judge, Magistrate and Commissioner were taking their round from the Sudder Ghat to the Company's gardens now forming the premises of the Dacca Bengal Bank.

Well-to-do-men in the town shut themselves up in their houses. The mass of people were running in the utmost confusion imaginable. Groups of them were seen coming out of one street and going into another. The opulent of the townfolks buried their treasures in pits underueath their lowest floors or in cavities in sidewalls and carefully closing them with lime and mortar. They sent their females and children to the securer retreats in the country and themselves continued in the town. No small credit however is due to the benign chastening influence of a vigorous executive administration. The miscreants and vagrants of which our city abounds durst not take advantage of the hour; they observed the moment of anarchy but consciously kept their hands aloof from any mischief. The Police had no scope for exertion and the disturbance that had so uncalled-for raged in the political horizon of Dacca abated in course of four hours.

In their most anxious and dreadful expectation of an imminent fight between the black and white soldiers in the Company's service albeit there was no European band of troops in the station, the affrighted native inhabitants ransacked the grain shops and purchased the articles of consumption to the last quantity available. The prices rose to the most exorbitant rates ever known in the memory of the oldest man then living and though they fell subsequently the market never recovered its original condition, that was remarkably most easy and commodious for the poor of the town,

The panic thus described was the the signal for precautions taken by the local authorities. European soldiers were called for. A brigade of sailors numbering not more than three hundred was the contingent that the rulers in the Metropolis could provide for the town of Dacea. They arrived here in no delay and took up quarters in the house opposite the Telegraph Office. To the natives, the oldest of whom only saw the European soldiers passing en route to Burmah, it was a new sight, and they flocked in numbers to witness the spectacle of a European Soldiery being placed as a counterpoise to the trained bands of upcountry Sepoys in whom all faith was lost.

The sailors were a completely raw recruit. They were subjected to drill and parade every morning. With Guns and muskets and bayonets, preceded by the artillery and followed by the Magazine Chest, they proceeded at dawn of day to the deserted cantonment on the north of the town and there went through all the manœuvres and tactics of a mock battle in the field. During intervals they were made to march round Dewan Bazar and Chowk to the Lalbagh premises where the Sepoys were located. They went round the store houses and quarters of their native rivals and were back to their own in the European portion of the town.

Thus preparations were being made somewhat on a par with the exigency of the time. The juncture was critical in the extreme. Captain Leurs Commander of the Brigade was an exceedingly bold and masterly spirit of the time. He was most energetically backed by his comrades, two young Lieutenants in charge of the wings. The civil officers were no less equal to the occasion. Dr. Green, Messrs. Carnac Davidson, and Abercrombe, most sharply watched the course and turn of affairs with reference to the disaffected Sepoys at Jalpaiguri and Chittagong. They lost no time to organize the flower of the European and Christian residents of the station into a volunteer corps with Captain Harris as their head. The College compound and the old kutchery grounds between the College and the Pogose School were the scenes of their training operations. Among the volunteers figured Mr. Brennand, Mr. N. P. Pogose and the late lamented Mr. Robinson of our College.

DACCA MEDICAL SCHOOL.

We are glad to announce to our readers that the proposed Medical School at Dacca is atlast to become an accomplished fact. This new school will be opened on the 15th June next. There was a rumour that such stndents only would be admitted to the new Medical School who had passed the University Entrance Examination. Many young minds were put to despair by this news. But now we are glad to be able to say that those who have passed either the University Entrance,

the Vernacular Scholarship, or the Minor Scholarship Examination will be allowed to take their admission in to the Dacca Medical School. The new school will be exactly on the same footing as "The Campbell School of Medicine" at Sealdah. The course of study will extend over three years; and it will embrace the various subjects of Anatomy and Surgery, Chemistry and Medical Jurisprudence, Materia Medica and Medicine and Midwifery. After the third year of study, there will be a final examination which will be conducted by a Committee consisting of the Deputy Surgeon General of the Circle, the Superintendent of the School, and another Medical Officer, assisted if necessary, by the Teachers, who will themselves conduct the class examinations of First and Second Year's students."

The rate of fees will be the same as has lately been laid down for the Campbell School of Medicine, *viz* two rupees on entrance, three rupees monthly, and ten rupees for the license. There will be a certain number of stipends or scholarships to be awarded by competitive examination, and also the usual number of class prizes. The Bengal Government has declared that until further orders the Civil Surgeon of Dacca will act as the Superintendent of the school. Those who are candidates for admission to the Dacca Medical School must be between the ages of 16 and 20 years, and they should apply to Dr. D. B. Smith the Officiating Civil Surgeon of Dacca.

SANITATION.

Old Dacca, in the accumulated filth of ages, promises soon to be one of the clearest, and perhaps, on that account, the healthiest of Municipal towns in Bengal. Soon, in course of time, does she bid fair to rival the cities best provided with Sanitary appliances.

The long contemplated scheme of securing for the town the means for the daily removal of the night soil is about to come to speedy consummation. Nearly two hundred sweepers will be imported from the North-Western Provinces and permanently located in the northern quarter of the town. The funds for the purpose have, after some delay in correspondence with reference to the subject, been sanctioned and men have been sent to fetch the sweepers.

On the other hand, the water-works, the celebrated gift of our worthy fellow townsman Khajeh Abdool Gunny C.S.I. are steadily advancing to completion. What the daily cleaning apparatus will will do for the lungs, the water purifying machinery will effect for the bowels. The two working together will secure for our Mofussil station all the advantages that the costly drainage system and the water machines do for the Metropolis of Bengal.

The privy nuisance is of all nuisances the worst. The stench in some places is the most nauseous and is wafted by

the breeze into men's houses. Poor people who under pressure of Municipal Porowanas are obliged to spend much more than the privy rate of two annas a month, nevertheless live in the ever annoying atmosphere: they will most gladly accept the daily method of cleansing the privies.

The timely recurrence of the most dreadful of diseases, the cholera, in the form of a malaria is due to the filthy state of the town, incident to the continued deposit of the human ordure that from time past has been the course of practice in this town. Should the project be carried out, the city which is now a hot bed of periodical pestilence will on comparison look like a Sanitarium and her inhabitants bless the memory of the originator of the scheme, Mr. D. R. Lyall just as they do now morning and evening the ordainer of thr Buckland Bund.

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড | ঢাকা—আষাঢ়, ১৩২৩ | ৩য় সংখ্যা।

যশোধর্ম্মদেব

পণ্ডিতবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং গৌড় রাজমালা লেখক রমা প্রসাদ বাবু উভয়েই স্ব স্ব গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যশোধর্ম্মদেব লৌহিত্যতীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। বৈজ্ঞানিক প্রমাণে এই নির্দ্দেশ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? আমরা এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের ইতিহাস উদ্ধার করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রমাপ্রসাদ বাবু বরেন্দ্র প্রদেশের ইতিহাস সঙ্কলনে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। গৌড়রাজমালা প্রকাশিত হইবার পরে বাঙ্গালার ইতিহাসের যে যে উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা রাখাল বাবুর গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইলে যে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে তাহাতে বোধ হয়, কেহই সন্দেহ করেন না।

আমরা এই প্রবন্ধে যশোধর্ম্মদেবের ইতিহাসের আলোচনা করিব। প্রাচীন কালে মালব প্রদেশে দশপুর নামে এক নগর ছিল। এই নগরের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণ দসর বা মন্দসর বলিয়া কথিত হয়। মন্দসর এক্ষণ মহারাষ্ট্র নরপতি সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত; ইহা শিবনা নামক এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উত্তরতটে অবস্থিত। বোধ হয় এই দশপুরনগর যশোধর্ম্মের রাজধানী ছিল। এই নগরের অনতি দূরে দুইটি শিলাস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। উভয় শিলাস্তম্ভে এক একটি উৎকীর্ণ লিপি আছে। ইহা ব্যতীত মন্দসরে এক শিলাফলক লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই তিন লিপি গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। স্তম্ভলিপিদ্বয়ে কোন কোন অব্দ লিখিত নাই; ফলক লিপিতে লেখা আছেঃ—

পঞ্চসু শতেশযু শরদাং
যাতেষ্বে কোননবতি সহিতেষু।
মালবগণ-স্থিতি-বশাৎকাল
জ্ঞানায় লিখিতেষু॥

এই লিপির অব্দ মালবগণ স্থিত্যব্দ ৫৮৯। মালবগণ স্থিত্যব্দ পশ্চাৎ বিক্রমসংবৎ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং বিক্রমাব্দ ৫৮৯ দ্বারা খৃষ্টাব্দ ৫৩২ বুঝা যাইতেছে। অতএব যশোধর্ম্ম খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

যশোধর্ম্ম গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য এবং তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের সমসাময়িক।

ফ্লিট সাহেবের গুপ্তলিপি নামক গ্রন্থে যশোধর্ম্মের তিনটি লিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌড়রাজমালা লেখক (১) যশোধর্ম্মের নাম যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন লিখিয়াছেন। রাখাল বাবু যশোধর্ম্ম লিখিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু বর্দ্ধন বা যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন লিখেন নাই।

কথিত তিনটি লিপিমধ্যে ফলক লিপিতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামের উল্লেখ আছে কিন্তু স্তম্ভ লিপিদ্বয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম দৃষ্ট হয় না।

দক্ষ নামক এক ব্যক্তি তাহার পিতৃব্য অভয় দত্তের স্মরণার্থ এ৹টি কূপ খনন করেন, এই কূপ মধ্যে এই ফলক খানা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লিখিত আছেঃ—

অথ জয়তি জনেন্দ্রঃ শ্রীযশোধর্ম্ম নামা
প্রমদবনমিবান্তঃ শত্রু সৈন্যং বিগাহ্য।
ব্রণ কিসলয় ভঙ্গৈ র্যোঽ ঙ্গভূষাং বিধত্তে
তরুণ তরুলতাবদ্বীর কীর্ত্তি র্বিনাম্য॥
আজৌ জিতৌবিজয়তেজগতীং পুনশ্চ
শ্রীবিষ্ণুবর্দ্ধননরাধিপতিঃ স এব।
প্রখ্যাতঔলিকরলাঞ্ছন আত্মবংশো
যেনোদিতোদিতপদং গমিতো গরীয়ঃ॥
প্রাচোনৃপান্‌সুবৃহতশ্চ বহূনুদীচঃ
সাম্নাযুধাচ বশগান্‌ প্রবিধায় যেন।
নামাপরং জগতি কান্তমদো দুরাপং
রাজাধিরাজ পরমেশ্বর ইত্যুদূঢ়ম্‌॥

ইত্যাদি ইত্যাদি—

ফ্লিট সাহেব বিষ্ণুবর্দ্ধন সম্বন্ধে তিন স্থানে তিন প্রকার লিখিয়াছেন।

No. 35 is another record of this same Yasodharma, coupled in this case with a king named Vishnuvardhana. (২)

ইহাদ্বারা যশোধর্ম্ম এবং বিষ্ণুবর্দ্ধন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বোধ হয়।

অন্যত্র—

It then mentions a king named Vishnuvardhana who though he had the titles of Rajadhiraja and Paramesvara, would appear to have acknowledged a certain amount of supremacy on the part of Yasodharma. (৩)

পুনঃ অন্যত্র (৪) লিখিয়াছেন—

The expression (স এব) looks at first sight as if Yasodharma and Vishnuvardhana were one and the same person. But the general structure of this verse, as well as the use of the two distinct titles জনেন্দ্র and নরাধিপতি and of the expression "আত্মবংশ" shews that this is not the case.

শিলাফলকলিপির যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে পাঠ উদ্ধারে কোন ভ্রম হয় নাই। যদি উৎকারকের কোন প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে, তবে 'স এব' পদ না হইতে পারে। শিলাফলকলিপি সম্পূর্ণ পাঠ করিলে বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং যশোধর্ম্ম অভিন্নব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অথচ 'স এব' পদদ্বারা অভিন্নব্যক্তি বুঝা যায়।

শিলাস্তম্ভলিপিদ্বয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন উপাধি দৃষ্ট হয় না। শিলাফলকলিপিতে যশোধর্ম্মকে 'জনেন্দ্র' বলা হইল কেন? ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন।

যশোধর্ম্মদেবের সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের নরপতিগণের অবস্থার পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(১) গৌড় রাজমালা ৫ পৃষ্ঠা

(২) উপক্রমণিকা ১০ পৃষ্ঠা।

(৩) ১৫১ পৃষ্ঠা। (৪) ১৫৫ পৃষ্ঠা।

'সর্ব্বরাজ্যোচ্ছেত্তা লিচ্ছবিদৌহিত্র' সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অভাবের পরে তদীয় পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির হ্রাস হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। তদনন্তর প্রথম-কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালে হূণগণ তাহাদের পূর্ব্ব আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছিল। আরবগণ যেমন খৃষ্টাব্দের অষ্টমশতাব্দীর প্রথমপাদে একদিকে সিন্ধু তীরবর্ত্তী সিন্ধুপ্রদেশাধিপ দাহিরের দেশপতির রাজ্য এবং সেই সময়েই অপরদিকে ইয়োরোপের অন্তর্গত ইব্রনদের তীরবর্ত্তী আন্দালসিয়ার অধীশ্বর রডারিকের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; হূণগণও খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে তদ্রূপ একদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং অপরদিকে রোমক সাম্রাজ্য, উভয় সাম্রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। কুমার গুপ্তের (১ম) সময়েই হূণগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শাকলনগর অধিকার করেন। হূণ নরপতিগণের মধ্যে তোরমাণ এবং তাহার পুত্র মিহির কুল সমধিক প্রসিদ্ধ। তোরমাণ এবং মিহিরকুলের সাময়িক দুইখানা উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। (৫)। হূণদিগের উৎপাতই গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রধান কারণ।

হূণগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে তাহরা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'মিহিরকুল' নামদৃষ্টে, বোধ হয়, যে হূণগণ তাহাদের ভাষাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইয়োরোপে Hungrary প্রদেশের নামদ্বারা হূণদিগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে হূণদিগের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। ভারতবর্ষে যে সকল হূণগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর্য্য সমাজে মিলিত হইয়া গিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর নামক জিলায় ইরাণ (প্রাচীন ঐরিকিন) নামক স্থানে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের এক বরাহ মূর্ত্তিতে তোরমাণের সাময়িক উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে কোন অব্দ লেখা নাই, কিন্তু লেখা আছে যে—'বর্ষে প্রথমে পৃথিবীং * * মহারাজাধিরাজ শ্রীতোরমাণে প্রশাসতি' অর্থাৎ তোরমাণের রাজত্বের প্রথমবর্ষে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই শিলালিপিতে মাতৃবিষ্ণু নামক একজন সামন্তরাজের নাম আছে এবং তাহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ইরাণে প্রাপ্ত বুধগুপ্তের সাময়িক অপর এক শিলাস্তম্ভ লিপিদৃষ্টে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই স্তম্ভলিপির সময়ে মাতৃ বিষ্ণু জীবিত ছিলেন। এই লিপির অব্দ ১০০ ৬০ ৫ অর্থাৎ ১৬৫ গুপ্তাব্দ = ৪৮৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তোরমাণ জীবিত ছিলেন বলা যাইতে পারে। তোরমাণের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অব্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গোয়ালিয়র নগরে (প্রাচীন গোপগিরি) মিহিরকুলের সাময়িক (তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষের) এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই দুইখানা লিপি দ্বারা দেখাইতেছে যে মধ্যপ্রদেশেও হূণদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

সম্রাট্ কুমার গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দ গুপ্ত হূণদিগের আক্রমণ নিবারণ করার জন্য মহাব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার ভিতরি শিলাস্তম্ভ লিপিতে লেখা আছে:—

"বিচলিত কুললক্ষ্মীস্তম্ভনায়োদ্যতেম
ক্ষিতিতল শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা"।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ত্রিযামা' শব্দ 'রাত্রিত্রয়' করিয়াছেন। (৬)। বাস্তবিক ত্রিযামা শব্দদ্বারা রাত্রি বুঝায়, রাত্রিত্রয় বুঝা যায় না।

যশোধর্ম্মদেবের এক শিলাস্তম্ভ লিপিতে লেখা আছে:—

যেভুক্তাগুপ্তনাথৈর্ন্ন সকল বসুধা
ক্রান্তি দৃষ্ট প্রতাপৈ
র্নাজ্ঞা হূণাধিপানাং ক্ষিতিপতি মুকুটা-
ধ্যাসিনী যাম্ প্রবিষ্টা।

অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটগণ যে স্থান অধিকার করেন

(৫) Fleet Nos. 36 and 37.

(৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ৬০ পৃষ্ঠা

নাই যশোধর্ম্ম সেই সকল প্রদেশ ও অধিকার করেন, এবং হুণাধিপ যে স্থানে প্রবেশ করিতে পারেন নাই যশোধর্ম্ম সে প্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছেন। রাজ কবির এই উক্তি প্রকৃত নহে। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য যত দুর বিস্তৃত ছিল, খৃষ্টাব্দের পরে অন্য কোন নরপতির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

হুণাধিপের সম্বন্ধে দ্বিতীয় স্তম্ভ লিপিতে লেখা আছেঃ—

আবর্জন ক্লিষ্ট মূর্দ্ধ্না চূড়াপুষ্পোপহারৈ
মিহির কুল নৃপেণার্চ্চিতং পাদযুগ্মং

অর্থাৎ মিহির কুল নৃপতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহার পাদ অর্চনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীতে হইয়া থাকিবে; কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মিহির কুলের পিতা তোরমাণ জীবিত ছিলেন।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে সুবিখ্যাত চীনশ্রমণ ইয়াংচোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে শ্রমণবর শাকল নগরে উপনীত হইলে মিহির কুলের বৃত্তান্ত অবগত হন্। তিনি লিখিয়াছেন, শাকল নগর তোরমাণ এবং তাঁহার পুত্র মিহির কুলের রাজধানী ছিল।

মিহির কুলের সময়ে মগধদেশে বালাদিত্য নামে এক নরপতি ছিলেন। মিহিরকুল বালাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করিলে উভয় মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া ছিলেন। পরিশেষে বালাদিত্য তাঁহার মাতার অনুরোধে মিহির কুলকে মুক্তি প্রদান করেন। মিহিরকুল বন্দী থাকা সময়ে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন; মিহির কুল শাকল পুনরধিকার করিতে না পারিয়া কাশ্মীর প্রদেশে গমন করেন এবং তত্রত্য নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে মিহির কুল কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আশ্রয়দাতা কে নিহত করেন এবং কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। (৯)

মিহিরকুল যে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, তাহা রাজতরঙ্গিণী পাঠেও অবগত হওয়া যায়। ইয়াং চোয়াং যে বালাদিত্যের নাম লিখিয়াছেন ইনি গুপ্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য। ইনি প্রথম কুমার গুপ্তের পৌত্র এবং দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পিতা। আমরা এ স্থলে গুপ্ত বংশীয় সম্রাট গণের বংশাবলী প্রদান করিলাম।

১। শ্রীচন্দ্রগুপ্ত
পত্নী লিচ্ছবিতনয়া কুমার দেবী
|
২। সমুদ্র গুপ্ত পত্নী দত্ত দেবী
|
৩। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পত্নী ধ্রুবদেবী

৪। কুমার গুপ্ত
ইহার বোধহয় দুইপত্নী ছিলেন প্রথমার নাম অজ্ঞাত দ্বিতীয়া অনন্তদেবী
|
৫। স্কন্দ গুপ্ত বোধহয় প্রথমার গর্ভজাত
তদনন্তর
পুর গুপ্ত (অনন্তদেবীর গর্ভজাত)
পত্নীবৎসদেবী
|
৭। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য
পত্নী শ্রীমতী দেবী

৮। কুমার গুপ্ত

কুমার গুপ্তের (২য়) পরে অন্য কোন গুপ্ত সম্রাটের নাম পাওয়া যায় নাই।

শ্রমণবরের লিখিত বৃত্তান্ত যখন রাজতরঙ্গিণী দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন এবিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। বোধ হয়, যশোধর্ম্মদেব সম্রাট বালাদিত্যসহ হুণ দমনে যোগদান করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেবের শিলাস্তম্ভ লিপিতে লেখা আছেঃ—

আলৌহিত্যোপকণ্ঠাৎ তালবন গহনো
পত্যকাদামহেন্দ্রাদা
গঙ্গাশ্লিষ্ট সানোস্তুহিন শিখরিণঃ
পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।

হিমালয় হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং

(9) Watlers Vol I pp 288-9.

ব্রহ্মপুত্রনদ হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল।

অপর শিলাফলক লিপিতে লেখা আছে প্রাচ্য এবং উদীচ্য বহু নৃপতিগণ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। (৮)

এক্ষণ দেখিতে হইবে যে এই দুই শ্লোকোক্ত বাক্য প্রকৃত না স্তাবকোক্তিঃ?

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনীতে লেখা আছে * (৯) যে তিনি কোশল দেশীয় মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কেঁরলদেশীয় মণ্টরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্র, গিরিকোট্টুরের স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লকের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর হস্তিবর্ম্মা, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়, এবং দক্ষিণাপথের অন্যান্য নরপতিগণ এবং আর্য্যাবর্ত্তের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা এবং অন্যান্য নরপতিগণকে পরাজিত করেন। যশোধর্ম্ম যদি প্রাচ্য এবং উদীচ্য বহু নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া থাকেন তবে তাহাদের নাম নাই কেন? একমাত্র মিহিরকুলের নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে বৃত্তান্ত সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। সুতরাং আমরা যশোধর্ম্মের মগধ এবং বঙ্গজয়ের বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। রাজকবিগণ যে এরূপ স্তাবকোক্তি লিখিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

দেবপালদেবের তাম্রশাসনে (১০) লেখা আছে:—

আগঙ্গাগম মহিতাৎ সপত্নশূন্যা
মাসেতোঃ প্রথিত দশাস্যকেতুকীর্ত্তেঃ।
উর্ব্বীমা বরুণ নিকেতনাচ্চ সিন্ধো
রালক্ষ্মী কুলভবনাচ্চ যো বুভোজ॥

হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতু, বরুণ নিকেতন হইতে ক্ষীরোদ সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান দেবপাল উপভোগ করিয়াছেন। এই বাক্য যে স্তাবকোক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমার্ক নরপতির সময়ে কল্যাণ নগরে বাস করিতেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরানাম্নী টীকা রচনা করেন।

তিনি লিখিয়াছেন:—

আসেতোঃকীর্ত্তিরাশে রঘুকুলতিলকস্যাচ
শৈলাধিরাজা দাচ প্রত্যক্‌পয়োধে
শ্চটুল তিমিকুলোত্তুঙ্গরিঙ্গত্তরঙ্গাৎ।
আচ প্রাচঃ সমুদ্রান্নতনৃপতি শিরোরত্ন
ভাভাস্বরাঙ্ঘ্রিঃ পায়াদাচন্দ্রতারং
জগদিদমখিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ॥

পরমহংস মহাশয়ও স্তাবকোক্তি পরিত্যাগ করেন নাই।

কান্যকুব্জের সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন পরলোক গমন করার পরে 'অর্ব্বাচীন গুপ্তবংশীয়' নরপতি আদিত্যসেন মগধে রাজত্ব করেন। তাঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে:—

'শাস্তাসমুদ্রান্ত বসুন্ধরায়াঃ' (১১)

নয়পালদেবের সম্বন্ধে:—

'সমস্তভূমণ্ডল মাবিভ্রতি শ্রীনয়পালদেবে' ১২

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

মহাকবি লিখিয়াছেন:—

আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং আনাকরথবর্ত্মনাং

ইহাতে যেরূপ ঐতিহাসিক সত্য, পূর্ব্বোক্ত বচন গুলিও তদনুরূপ।

ফরিদপুর জিলাতে ধর্ম্মাদিত্যদেবের ২খানা, গোপচন্দ্রদেবের ১খানা এবং সমাচারদেবের ১খানা এই চারিখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ হর্নলি এবং বিচারপতি পার্জিটার বলেন যে এই ধর্ম্মাদিত্য এবং যশোধর্ম্ম অভিন্নব্যক্তি। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় রাজণ্যকাণ্ডে এই চারিখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন। ধর্ম্মাদিত্য এবং যশোধর্ম্ম অভিন্নব্যক্তি হইলে বঙ্গদেশে যশোধর্ম্মের

(৮) আমরা পূর্ব্বেই এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি।
(৯) Fleet no. I.
(১০) গৌড়লেখমালা ৩৮ পৃষ্ঠা।
(১১) Fleet p 213
(১২) গৌড়লেখমালা।

অধিকার বিস্তৃত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যশোধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাদিত্য অভিন্নব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে পণ্ডিতবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই চারিখানা শাসন কূটশাসন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কিনা তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তিদ্বারা এই চারিখানা শাসন কূটশাসন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। (১৩)

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী লৌহস্তম্ভে লিখিত আছে:—

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা
শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোভিলিখিতা
খড়্গেনকীর্ত্তির্ভুজে। (১৪)

এই প্রশস্তি চন্দ্রনামক একজন নরপতির; ইহাদ্বারা দেখাযায় যে তিনি বঙ্গদেশের অধিবাসিগণকে সমরে পরাজিত করেন। শুশুনিয়া পর্ব্বতের গাত্রে যে লিপি দৃষ্ট হয় তাহাদ্বারা চন্দ্রবর্ম্মার বঙ্গদেশে আগমন বৃত্তান্ত সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মার বঙ্গাগমন এবং বঙ্গবিজয় বৃত্তান্ত সত্যবলিয়া গ্রহণ করা যায়। (১৫) শুশুনিয়া লিপিতে লেখাআছে:—

'পুষ্করণাধিপতে র্মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতি।' এই চন্দ্রবর্ম্মা পরে সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হন। (১৬) শুশুনিয়া পর্ব্বতে চন্দ্রবর্ম্মার উৎকীর্ণলিপি প্রকাশিত না হইলে কেবল লৌহস্তম্ভের প্রশস্তিদ্বারা তাঁহার বঙ্গবিজয় কাহিনী প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যাইত না।

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যশোবর্ম্মানামে একজন নরপতি পাঞ্চাল প্রদেশে রাজত্ব করেন। অমর কবি ভবভূতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। যশোবর্ম্মা ৭৩১ খৃঃঅব্দে চীনদেশে এক দূত প্রেরণ করেন। যশোবর্ম্মার রাজকবি বাক্‌পতি তাঁহার প্রভু যশোবর্ম্মার জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া 'গউরবহো' নামক এক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত আছে। ইহাতে যশোবর্ম্মার মগধ এবং বঙ্গ বিজয়কাহিনী লিখিত আছে। কবি যে প্রকারে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে যশোবর্ম্মার মগধ এবং বঙ্গবিজয় কাহিনী অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে মগধে জীবিতগুপ্ত (২য়) নরপতি ছিলেন। বঙ্গেশ্বর কে ছিলেন নির্ণয় করা যায় না। (১৭)

যশোধর্ম্মের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে উত্তরা পথের অন্যান্য প্রদেশে কে কে নরপতি ছিলেন? মালব প্রদেশে বুধগুপ্ত এবং ভানুগুপ্ত নামক দুইজন নরপতির লিপি পাওয়া গিয়াছে। বুধগুপ্তের শিলাস্তম্ভলিপিতে লেখা আছে:—

'শতে পঞ্চষষ্ট্যধিকে বর্ষণাং ভূপতৌ চ বুধগুপ্তে' (১৭ক) অর্থাৎ এইলিপি ১৬৫ অব্দের, এই অব্দ গুপ্তাব্দ। ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বুধগুপ্ত এই সময়ে মালবে রাজত্ব করিয়াছেন।

বুধগুপ্তের পর ভানুগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার শিলালিপির অব্দ:—"সম্বৎসর শতে একনবত্যুত্তরে"। (১৮) অর্থাৎ ১৯১ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫১০ খৃষ্টাব্দ।

বুধগুপ্ত এবং ভানুগুপ্ত মালবের গুপ্তবংশ; ইহাদের সহিত গুপ্তসম্রাটগণের অথবা অর্ব্বাচীন গুপ্তরাজগণের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকার বিষয় জানা যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'মালবের গুপ্তরাজগণ খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মালবে স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' (১৯)

যশোধর্ম্মের সময় যখনে মালব প্রদেশেই অন্যনর-

(১৩) J. A. S. B. New series vol VII p p 289—308.
বাঙ্গালার ইতিহাস ১০১ পৃষ্ঠা।
(১৪) Fleet no 32.
(১৫) প্রবাসী ১৩২০। ফাল্গুন ৪৯৮ পৃঃ।
(১৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ৪০—৪১ পৃঃ।
V. Smith 3rd Edition p 290.

(১৭) বাঙ্গালার ইতিহাস ১০৫ গৌড়রাজমালা ১৫।
(১৭ক) Fleet no 19.
(১৮) Fleet no 20.
(১৯) বাঙ্গালার ইতিহাস ৮৪ পৃষ্ঠা।

পতির অস্তিত্ব দেখা যায়, তখন তাঁহার বঙ্গবিজয় কাহিনী রাজকবির কল্পিত বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত।

মগধের অর্ব্বাচীন গুপ্তরাজগণ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। ইহাদের আদিপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত। কৃষ্ণগুপ্তের বংশধর মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সহচর ছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন ৬৭২ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা দৃষ্ট হয়। (২০)

যশোধর্ম্ম মগধের গুপ্তরাজকে জয় না করিয়া লৌহিত্যতীর পর্য্যন্ত কিরূপে রাজ্য বিস্তার করিলেন?

পরিব্রাজক মহারাজ সংক্ষোভের তাম্রশাসনেও তিনি ৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করার বিবরণ দেখাযায়। (২১) এবং ইহাদ্বারা তৎকালে গুপ্ত সম্রাটের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়।

মৌখরি রাজগণও বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের কতকাংশে যশোধর্ম্মের সময়ে রাজত্ব করেন, এরূপ অবগত হওয়া যায় এই সমস্ত কারণে যশোধর্ম্মের বঙ্গবিজয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়না।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

বৃষ্টিবিন্দুর অভিভাষণ।

চাতক চড়ুইর কাতর কণ্ঠ, ঘুঘুর করুণ ডাক
কোন ঋত্বিকে যজ্ঞ করে?—ক্ষিতি পুড়ে খাক!
চেঁচায় পেচা কাদাখোঁচা টুনটুনি আর টিয়া
বারির তরে শ্যাম ধরণীর ভারি আকুল হিয়া।
বেঁচে থাকা দায়!
বিশ্ব বুঝি ভস্ম হলো—ফুল্‌কি উড়ে যায়!
আয়রে আশু বৃষ্টিশিশু—কোথায় আছিস্ তোরা?
আয়রে সবে নেমে ভবে ছুটিয়ে জলদ-ঘোড়া।
ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্!
ভরিয়া দেয়ে খাল-দরিয়া-বাপী-পুকুর-কুপ।

বনমালতী বেলাযুঁথী—একরত্তি মেয়ে
ক্ষিণ্ণমনে দীন নয়নে উর্দ্ধপানে চেয়ে।
পানি বিনে পঙ্কজিনী পঙ্কে পড়ে ঢলে
কোন্ অভাগী আগুন দিল দীঘির কাল জলে?
আর কি থাকা যায়?
আয় রে ধেয়ে গগন ছেয়ে আয়রে ধরার গায়।

কাজল দেশের কাছাকাছি সজল মেঘের ঘর
নাইক মোদের বাছাবাছি, নাইক আপন পর।
কভু মোরা, বাপের পিসি কভু মায়ের মাসী
অম্বু দিয়ে বিশ্ব বাঁচাই, শম্ভু হয়ে নাশি।
সলিল ঢেলে ছলিম চাচার সফল করি বোনা
ফুল ফসলে ছেয়ে ফেলি—ফলাই ক্ষেতে সোণা।
ডাঙার উপর ডিঙা চালাই শিঙা ফুঁকে ফুঁকে
ভবনদী পার করে দি—মুক্ত বেণীর মুখে।
আমরা সবাই ক্ষুদ্র কবি, রুদ্র মোদের লীলা
নগনগরী সাগর করি জলে ডুবাই জিলা।
ইন্দ্রধনুর মাথায় চড়ি সান্দ্র বিকাল বেলা
রৌদ্র মেঘের মাঝে করি "অরুণ বরুণ" খেলা।
সিন্ধুতনয় সামান্য নয়—বিন্দু কিসে কম?
নিয়ে আসি সর্দ্দিকাশি—জলজ্যান্ত যম!
দামোদরের ছাওয়াল মোরা কোটি সোদর ভাই
দেশে দেশে বেঁড়াই ভেসে—কলস্বরে গাই।
বর্দ্ধমানে বসাই মোরা "মহার্ণবের" মেলা
সীতাভোগ আর মিহিদানায় পূর্ণ করি ভেলা।

আমরা ধোয়াই পথের ধূলি— তোমরা বল কাদা
জান কেবল উল্টা বুলি; বলিহারি দাদা!
হবচন্দ্রের দেওয়ান বটে!—বুদ্ধির ঝুলি পেটে
ডেকে এনে দূর করি দাও নয়ানজুলি কেটে!
বৃষ্টিজলে কাপড় কেঁচে রৌদ্রে শুকায় ধোপা
কালে ভদ্রে আস্‌লে কাছে—শুনায় মধুর চোপা।
বঁধুর লীলা বুঝা ভার
বুকের দুখে মানুষ করি ব'কে শোধে ধার।

(২০) Fleet no 43.
(২১) Fleet no 25.

কত রঙ্গ জানি।
বাতায়নে বঁধুর সনে করি কানা কানি।
মল বাজিয়ে ঝলকে চলে কমলমণি থাকি
আকা-বাঁকা পথটি আগে পিছল করে রাখি।
আলতা পরি কনকলতা আঙিনাতে যায়
পঙ্ক হয়ে অন্নলক্ষ্মীর ধরি রাঙা পায়।
বটতলাতে সাক্ষী শিখায় টর্নি বদন শীল
পাতার ফাঁকে মাথার টাকে মারি শিলার ঢিল্।
ফিরি দলে দলে।
যক্ষ রাজের বক্ষ ভাসাই—জ্বালাই তারে জলে।

নীল মাদুরে মেলিয়ে দেছি মেদুর মেঘের মায়া
বসুধারে বিলাই সুধা, শ্রান্ত জনে ছায়া।
বিনোদ বেশে দাওয়ায় বসে ভাবেন বিনোদিনী
চাবুটা বাজে—এলোনা যে—শ্যামলা-সাজে তিনি!
মুখখানি তার মলিন হেরে, ঝরে করুণ-আঁখি
সেজে তখন "ইল্‌সে-গুড়ুন্"—গুড়ুম্ গুড়ুম্ ডাকি!
সিক্তবেশে পান্‌সে হেসে মিন্‌সে আসেন ঘরে
এক পেয়ালা গরম গরম রিক্ত ঠোঁটের পরে!
দেলো তোরা হুলুধ্বনি—কুঞ্জে এলেন বঁধু
টাপুর-টুপুর বাজছে নুপুর—ওঁ—মধু! মধু! মধু!

ঐ—অনুরাগী ভেক-বৈরাগীর একতারাটি বাজে
মন্ত্র শুনে চন্দ্রতারা লুকিয়ে গেল লাজে।
জোবা পেয়ে পানি-কাউড় দিচ্ছে ডোবায় ডুব
কোন্ বাবাজী গোপীযন্ত্রে বাজায়—"কুব্-কুব্"
মরালছানা মেল্‌ছে ডানা সরাল নাচে সরে
পায়রা করে বক্-বকম্, ময়ুর পেখম ধরে।
ডাহুক্ ডাকে—শালিখশাখে—বিলে বেলেহাঁস
মাছের মালিক মাউছারাঙা—ঝিলটি তাহার খাস্।
জলে স্থলে রস উথলে—হাজার ফুলের সভা
কেয়াকদম-শাপ্‌লাশালুক্-লাল টুক্‌টুক্ জবা!
নিশিগন্ধ-কমলকুন্দ—মর্ম্মভরা মউ
শান্ত সাঁঝে হলুদে সাজে হাস্‌ছে ঝিঙে বউ।

আল্‌তা মেখে ডালিম দিদি কুটীর কোণে রাজে
রূপার ফুলটি খোঁপায় গুঁজে চাল্‌তা তোফা সাজে।
ডহর ডাঙা ডুবুডুবু—পূর্ণনদীনালা
আঙ্গিনাতে ভাঙ্গ্‌লো কেরে লক্ষ জলের জালা!
বাজাও ত্বরা মাদল-কাড়া—এলো বাদল-রাজা
বানাও খানা—"ঘুগ্‌নিদানা-চিনে বাদাম ভাজা।"

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

ব্যাকরণের দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী শ্রীব্যাকরণচন্দ্র দুর্ভাগ্যশিরোমণি, সাং প্রাচীন সংস্কৃতনগর, হাল সাং নব্য বাঙ্গলা, পিতা শ্রীশ্রীমৎ মহেশ, জীবিত কি মৃত হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

সাহিত্য-সমাজের সভাপতি মহাশয়, আমি আপনার পরিচিত কিনা জানি না। পরিচিত হইলেও আপনার আদর-স্নেহ দাবি করিতে পারি কিনা, বলিতে পারি না। তবে এই কথা প্রকাশে আমার সাহস আছে যে, এখন আপনাদের অনেকেই আমাকে চিনেন না বা চিনিতে চাহেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি সারাটা বাঙ্গালা মুল্লুক খুঁজিয়া এমন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় খুব কমই বাহির করিতে পারিলাম, যিনি বা যাঁহারা আমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা-দুর্গতি দেখিয়া দু'ফোটা চোখের জল ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এক কথায় বলিতে পারি, বাঙ্গলায় আজকাল আমার আপনার জন বলিতে বড় বেশী কেহ নাই। আজ আমি যেমন সহায়হীন সম্বলশূন্য, কিছুদিন পূর্ব্বে কিন্তু আমার এমন অবস্থা ছিল না। আত্মীয় কুটুম্ব, শিষ্য সেবায়তের অভাবে এখনকার মত তখন আমাকে "যথারণ্যং তথা গৃহং" মনে করিতে হয় নাই। সংস্কৃতওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন, রামগতি, তারাশঙ্কর; ইংরাজিনবিশ অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, ভূদেব, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙ্গলার অলঙ্কারের দল আমাকে ভালবাসিয়া, আদর

শ্রদ্ধা করিয়া অন্তরে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ, কত আত্মপ্রসাদ, কত গৌরব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন আমার প্রকৃত বান্ধব,—যথার্থ ভক্ত, অকপট অনুগত শিষ্য, সরল সহচর। আমার অনুশাসন বা বিধিনিষেধ তাঁহারা বাস্তবিকই আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি যত্ন-আগ্রহের সহিত পালন করিয়াগিয়াছেন। বাঙ্গালার গৌরব বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র, প্রফুল্ল, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাছেও কি আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি আদর-সম্মান কম ছিল? হায়, কালের কুটিলাবর্ত্ত তোমার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সেই উদার ভক্তসম্প্রদায় আজ কোথায়? তাঁহাদের তিরোধানে আজ আমি বাঙ্গলায় নিঃসঙ্গ জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিতেছি।

মহাশয়, আজ যে দরখাস্তকারী সাহিত্য-সমাজের দ্বারে দীনহীন বেশে, বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিতে উপস্থিত, মনে রাখিবেন একদিন সে দিব্য বপু অতুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, অসীম শক্তি সম্পদের মালিক ছিল। সংস্কৃত যুগে এই অধম কোন্ স্থান দখল করিয়াছিল জানিতে চান কি? অপৌরুষেয় বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের রচিত গণ্য নগণ্য কাব্য নাটকে পর্য্যন্ত আমার প্রবল প্রভুত্ব আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বিশ্বাস না হয়, অবসর মুহূর্ত্তে ভারতের কীটদষ্ট জীর্ণশীর্ণ পুরাতন পুথির উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

যা'ক সে কথা, বাঙ্গালীদের উন্নতি দেখিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বাঙ্গালায় বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তাহারই পরিণতি তাহারই ভবিষ্যৎ ফল, আমার এই দৈন্য দুর্দ্দশা, আমার এই বিকলাঙ্গতা।

সভাপতি মহাশয়, একটা মোটা রকমের ভুল করিয়া আমি দু'কুল হারাইয়াছি। যাঁহাদের আদর স্নেহে আমি বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হই তাঁহাদের সাহিত্য বিলাসী পুত্র পৌত্র, শিষ্য প্রশিষ্যদের স্বেচ্ছাচারিতায় মাঝে মাঝে বাধা দেই ও বিরক্তি প্রকাশ করি। ইহারই ফলে সেই সাহিত্য সৌখিন নব্য বাবুরদল আমার পদে লগুড় আঘাত করিয়া আমাকে একেবারে পঙ্গু বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। যাঁহারা আমাকে জোর করিয়া বাঙ্গালা হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাঁহারা আমাকে চিনিবেন কেন? চিনিলেই বা আমার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন কেন? আমি তাদের কাছে কিছুমাত্র আশা রাখি না। আপনি সাহিত্য সমাজের অধিনায়কের আসনে আজ উপবিষ্ট; ভরসা করিতে পারি; আপনার কাছে ন্যায় বিচার লাভে বঞ্চিত হইব না। তাই সাহিত্য-সমাজের পুরা মজ্‌লিসে বিচারপ্রার্থীরূপে দরখাস্ত লইয়া হাজির হইলাম।

সভাপতি মহাশয়, আমার দরখাস্ত শুনিবার আগে আমার সম্বন্ধে এইটুকু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি, আপনাদের জন্য সমাজ সৃষ্টির আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কি কি করিয়াছি, এবং আজ তাহার প্রতিদান কি পাইতেছি। আপনি যদি পরের চিন্তার বোঝা চাপাইয়া মস্তিষ্ককে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, তবে না হয় নিজের কথা নিজেই বলি, নিজের পরিচয় নিজে দিতে গিয়া যদি কোনস্থলে আত্মশ্লাঘা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়া ফেলি তবে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। মনে রাখিবেন বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের সংসর্গে আসিয়াই ঐ জিনিষটি উপার্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালার জল বাতাসে আমারও আকৃতি প্রকৃতিতে বেজায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীদের মত বর্ত্তমানে যত বেশী শক্তি সম্মান হারাইতেছি অতীতের গৌরবগানে ততই অভ্যস্ত ও ওস্তাদ হইয়া উঠিতেছি। আর্য্যত্ব ঋষিত্ব দর্শন বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতিতে কৃতিত্ব যেমন ঐ অতীতের গায়ে অঙ্কিত জড়িত, আমার ও প্রভাব প্রতিপত্তি মাহাত্ম্য ও আধিপত্য তেমনই ঐ পুরাকালের সিন্ধু তলস্থিত সংস্কৃত সিন্দুক পেটিকায় চির আবদ্ধ। বাস্তবিক আজ আমার সেই "পদ" গৌরব নাই, ঠিক তেমন "ক্রিয়ার" আদর নাই, "কারক"ত্বের সেই অসাধারণ সম্মান নাই, এক কথায় বলিতে গেলে সংস্কৃত আমলে ভাষা ও সাহিত্যের উপরে আমার যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, আজ তাহার কিছুই নাই। তাই বলিতেছিলাম আপনাদের মত আমার ও বর্ত্তমান নাই, কাজেই আছে অতীতের বড়াই, অতীতের দোহাই। এখন

জিজ্ঞাস্য, কেন এমন হইল ? সে অনেক কারণ, অনেক কথা ; তবে এটা ঠিক আপনারা হুজুগের গোঁসাই হুজুগে চলেন, নিজের স্বার্থ ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমষ্টির ইষ্টানিষ্ট দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া, কাজ করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি আপনাদের যখন হইতে কমিয়া আসিতেছে, সমাজে ও তখন হইতে একটা উলট্‌ পলট অদল বদলের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। কুসংস্কার বলিয়া পুরাতনে পদাঘাত ও উন্নতির ধুয়া ধরিয়া নূতনে প্রীতি প্রকাশ সেই হুজুগেরই ফল। জন্তু বিশেষের গতির মুখে পড়িলে যেমন নিস্তার নাই আপনাদের "গোঁর" মুখে পড়িয়া দেশের পুরাতন রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, সাহিত্য ও সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে এবং নূতন রীতি নীতি মৌলিকতার নকল ও ঝুটা পোষাক পরিয়া সসম্মানে শ্রেষ্ঠস্থান দখল করিয়া লইতেছে। এইরূপে সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধাক্কা বর্ত্তমান সাহিত্যে লাগিয়াছে এবং তাহারই ফল আমাকে ষোল আনা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি আপনাদের হুজুগের চোটে এখন মরণের পথে দাঁড়াইয়া আছি। স্মরণ করিয়া দেখুন পুরাতনে অশ্রদ্ধা ও নূতনে কেমন প্রেম দেখাইতেছেন। সার্ব্বভৌম ভাষার আশা ও আদর্শ স্থল "বঙ্গদর্শন" "বান্ধব" "আর্য্যদর্শন" প্রভৃতি জীর্ণ গলিত পত্র গুলাকে এখন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাঙ্গনের আবর্জ্জনা জ্ঞানে অনাদর, অবজ্ঞার আঁস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া নবোদ্গত "সবুজপত্রের" মধ্যদিয়া প্রাদেশিকতার অস্থ্যবস্থ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছেন ইহা ও হুজুগেরই মায়া হুজুগেরই কাজ। বড় দুঃখে, বড় বেদনায়, আপনাদের নিন্দা করিতেছি অপরাধ ক্ষমা করিবেন, বিরক্ত হইয়া বা রাগ করিয়া হতভাগ্যের দরখাস্ত দূরে ছুড়িয়া ফেলিবেন না। যা বলিতে ছিলাম আপনারা যদি গড্ডলিকা প্রবাহে না ভাসিয়া সমাজ ও সাহিত্যের কথা ধীর, স্থির ভাবে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিতে শিখিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় চিনিতে পারিতেন এই অধম আর্য্যজাতির সমাজ গঠনের শুভ সূচনা হইতে এই পর্য্যন্ত সমাজ ও সাহিত্যের জন্য কত কি করিয়াছে। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা না জন্মিলে, একের উৎকর্ষ উন্নতি অপরে প্রতিফলিত না হইলে, মানবমণ্ডলী কখনও প্রকৃত কল্যাণও যথার্থ অভ্যুদয়ের অধিকারী হইতে পারিত না। এজন্যই উন্নতিপ্রিয় তত্ত্বদর্শীরা উন্নত সমাজের আদর্শে নিজেদের সাহিত্যকে, এবং উৎকর্ষ মণ্ডিত সাহিত্যের অনুকরণে স্ব স্ব সমাজকে গঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাসা করি এই মঙ্গল বার্ত্তা ভারতীয় জন সঙ্ঘের সম্মুখে প্রথম প্রকাশ করে কে ? আপনাদের কোন্ শুভানুধ্যায়ী প্রচার করিয়াছিল। এবং কোন্ হিতৈষী প্রাণপাত করিয়া একাত্মতা বা হরিহর মিলনের শক্তি-সৌন্দর্য্যে ভারতের আদিম সমাজ ও সাহিত্যকে চির সুন্দর চংমোন্নত ও গৌরবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল ? সে আর কেহই নহে আপনাদের সম্মুখস্থিত এই অধম ব্যাকরণ শর্ম্মা। আমি সাহিত্যের ভিতরে যে সকল রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সাহিত্যকে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন ও অবশ্য পালনীয় কতকগুলি বিধি নিষেধের অনুবর্ত্তী করিয়া উৎকর্ষের উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করি তৎকালীন সমাজিকগণ আমার প্রবর্ত্তিত সেই সমস্ত রীতি নীতি অনুসরণ করিয়া সমাজকে গঠিত করেন। এই স্থলে হয়ত কেহ কেহ ইতিহাস আলোচনার ছলে বলিবেন, প্রথম সামাজিক আর্য্যগণ যে সকল আচার ব্যবহার রীতি নীতির আইন পাশ করিয়া সমাজকে শাসিত নিয়মানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সাহিত্যে সেই সকল সামাজিক রীতি নীতি প্রথা পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। যাক্ সে বিষয়ে আমার তর্ক নাই, মৌলিকতা যাহারই হউক একের অনুকরণে যে অপরটি গঠিত হইয়াছিল এই বিষয়ে বোধ হয় কাহারও কোন সন্দেহ নাই। আমি আপনাদের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলাম, আর্য্যগণই প্রথম সমাজকে নিয়মিত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কাছেই ঋণ গ্রহণ করিয়া সাহিত্যকে উৎকর্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি।

আমার যত্নে সমাজ ও সাহিত্য কিরূপে এক অচ্ছেদ্য

মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই কৃপা করিয়া এক মিনিট সময় নষ্ট করিয়া তাহা শুনিলে কৃতার্থ হইব। প্রাচীনসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা ব্যবসার অনুসারে পৃথক জাতি বা বর্ণ গঠিত হইয়াছিল। ঋষি যুগের এই বর্ণ বিভাগই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। সেকালেও একালের মত গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতিবেশীরূপে এই সকল বর্ণ বাস করিত। এই বর্ণ বিভাগ বা জাতিভেদে সেই পুরাতন সমাজের শরীরে কোন প্রকার বিরোধ বিপত্তি, অনৈক্য অপ্রেমের আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই, বরং পাড়াপর্শী বা নিকটস্থ বর্ণ সকল সবর্ণ অসবর্ণতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া নিয়ত এক মধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া ঐক্য ও সখ্যের শক্তি মাধুর্য্যে তৎকালীন সমাজকে অতুল প্রভাব বিভবে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজের ব্যক্তিরা স্ত্রীপুরুষভেদে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি বহুভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা বর্ণ রূপে পরিচিত হয়। সমাজের এই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার মধুময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ও সাহিত্যে বর্ণ বিভাগ প্রবর্ত্তিত করি। আমার শাসনে অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষর সকল দন্ত্য, তালব্য অন্তঃস্থ, ও উষ্ম প্রভৃতি বহু ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হয়। এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমি মাছিমারা কেরাণীর মত সমাজের এই বর্ণ বিভাগ রীতি অবিকল নকল করিলাম না। আমার অধীন অক্ষরগুলিকে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তে বর্ণত্বের অধিকার প্রদান করিলাম। সমাজের ব্যক্তিদের মত আমার অক্ষর বা বর্ণগুলিও স্ত্রীপুরুষভেদে স্বর ও ব্যঞ্জন নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইল ; স্বর স্ত্রী জাতীয় ব্যঞ্জন পুরুষ শ্রেণীর বর্ণ। সমাজের পুরুষগণ যেমন "অর্দ্ধাঙ্গিনী" স্ত্রীর শক্তি সাহায্য ব্যতীত কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, আজিও করিতে পারিতেছে না ; অর্থাৎ আদিকাল হইতে দেখা যাইতেছে সমাজের পুরুষদিগকে স্ত্রী শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কর্ম্মভবনে তাহাদের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। আমার অধীন পুরুষগণ অর্থাৎ ক্ খ্, প্রভৃতি ব্যঞ্জনেরা ঠিক তেমনই স্বররূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রীর সহায়তালাভ করিতে না পারিলে অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; স্ত্রীর শক্তিতেই তাহারা উচ্চারণ কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়া থাকে। এস্থলে সমাজ ও সাহিত্যের নারীগণের সম্বন্ধে দুটা ঐতিহাসিক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতে এমন একদিন ছিল যে দিন আর্য্যনারীর দল স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিয়া জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রতিভার প্রাখর্য্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে পুরুষদিগকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেদিনও রাজপুত মহিলারা যে স্বাতন্ত্র, যে ব্যক্তিত্ব দেখাইয়া যেমন জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন সাহিত্যেও একদিন অ, আ প্রভৃতি চতুর্দ্দশটি রমণী নিজেদের ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য পরের সাহায্য প্রার্থিনী হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার জলবাতাস সহ্য করিতে না পারিয়া দীর্ঘ ৯কার রূপিণী মহিলাটী অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যে ১৩টী রমণী এখন বিরাজ করিতেছে। ইহারা জগতে সর্ব্বতোভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা "অক্ষর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাক্ বা না থাক্ দ্বিপদজন্তু মাত্রেই সেইরূপ মনুষ্য বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, সাহিত্য সংসারে স্বতন্ত্রই হউক আর পরতন্ত্রই হউক এখন শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্রই অক্ষর পদবাচ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আন্তর্জাতিক বিভাগ পুরাতন বিশ্ববর্ণের মিলনে সময়ে সময়ে যেমন বাধা উপস্থিত করিয়াছে অন্তঃস্থ প্রভৃতি জাতি বিভাগও আমার বর্ণ সমাজে ঠিক তেমনই কোন কোন সময়ে মিলন বা সন্ধির মহান্ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। অন্যত্র এ বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সমাজে যেমন ধনজন বলের গর্ব্ব কাহারও পক্ষে মিলনের পরিপন্থী হইয়া থাকে আমার অধিকারের কয়েকটি বর্ণ ঠিক সেইরূপ দ্বিত্ব, বহুত্বের অভিমানে অন্ধ হইয়া অন্যের সহিত মিলনে বা সন্ধি স্থাপনে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে। আমি এই সন্ধি বিদ্রোহী বা মিলনের বিরোধী বর্ণগুলিকে বিশেষ মার্কা বা চিহ্ন-যুক্ত করিয়া

ভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিয়াছি। সমাজ ও সাহিত্যের কতকগুলি বর্ণ চিরকালই অমিলন বা বিসন্ধির পক্ষপাতী আর কতগুলি সময়বিশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে সময়ে সময়ে প্রতিবেশী বর্ণের সহিত বেশ একাত্ম ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বস বাস করে। সন্ধি বা পরস্পরের মিলনে প্রাচীন লোকসমাজের শক্তি বৰ্দ্ধিত ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে পক্ষান্তরে বিগ্রহ বা বিরোধে ইহার বিপরীত ফল প্রসূত হইয়াছে দেখিয়া আমি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন উদ্দেশ্যে মিলন বা সন্ধিরকঠোর আইন প্রচার করিয়াছিলাম এবং আদর করিয়া সন্ধিকেই আমার ক্রোড়ে প্রথম স্থান দান করিয়াছিলাম। সময় চক্রের আবর্ত্তনে সর্ব্বত্রই মহা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কি কারণে জানিনা এখনকার সমাজ বিপরীতগামিত্বের প্রবল বন্যায় প্লাবিত। সামাজিক পুরুষগণের পুরাতন প্রবৃত্তি এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত। সেকালের স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন বর্ত্তমানযুগে মহা মূর্খতার নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বদিকে গমন করিতে হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে পশ্চিম যাত্রার কথা বলিতে হইবে, অন্যথা তাহার বুদ্ধিমত্তায় সকলের সন্দেহ উপস্থিত হইবে। নব্য সমাজে বাক্যে ও কার্য্যে যিনি যত অসামঞ্জস্য দেখাইতে পারিবেন তিনি তত অধিক সমাজ পতিত্ব বা জননায়কত্বের অধিকার দাবী করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং এই "উল্টো বুঝিলে রামের" দিনে যত সভা সম্মিলনের উদ্ভব ও প্রভাব বিস্তৃতিলাভ করিতেছে বর্ণে বর্ণে অসম্মিলন ও বিরোধ যে ততবেশী জন্মলাভ করিতেছে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। এই বিপরীত পন্থী সমাজের আদর্শে আধুনিক সাহিত্যিকগণ পরিচালিত হইয়া বর্ণে বর্ণে মিলন বা সন্ধির আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছেন

ইঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য জনৈক ভাগ্যবান্ বিদ্যাভূষণের শরনাপন্ন হইয়া তাহার নিকট হইতে "পাঁতি" সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বাঙ্গালায় সন্ধিহত্যায় কোন পাপ নাই" বলিয়া পাতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি কেবল "মনান্তরেই" বাঙ্গালা সন্ধির সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইয়াছেন, তাই তাঁহার মতে সন্ধির অস্তিত্ব যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের মন্দিরে ততশীঘ্র মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে।

অহং ব্যাকরণ শর্ম্মা সেকেলে ভুষণ্ডী, সমাজ ও সাহিত্যের কত উন্নতি অবনতি দেখিয়াছি, কত উদয় প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমি এই ছেলে ছোক্রাদের মতে চলিব কেন? নিজের কথা নিজে বলিতে নাই, সমাজের হালচাল বিশেষ ভাবে ওয়াকিব আছি বলিয়াই আমি বিদ্বেষিগণের আক্রমণে সন্ধির পুরাণ অস্তিত্বটুকু আমার অঙ্গ হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিতে দেই নাই। অবস্থা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ একটা ব্যবস্থা করিয়াছি। সকলের অপ্রিয়, অবাঞ্ছনীয় সন্ধিকে পূর্ব্বের মত প্রথম স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি নাই। উহাকে ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া ষত্ব, ণত্ব, কারক, সমাস প্রভৃতির পশ্চাতে গুপ্ত অংশে ইহাকে আশ্রয় দিয়াছি। তারপর এখন যে শুধু বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যে বর্ণে বর্ণে মিলন বা সন্ধি লইয়া গোল চলিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বে সাহিত্যে ও সমাজে ক্রিয়ার সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিত না তাহারা কখনই জগতে কারক বলিয়া আত্মপরিচয় দানে সাহস পাইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে কত চতুর চালাক যেমন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া কেবল গলাবাজির জোরে বড় রকমের কার্য্যকারক বলিয়া দশের কাছে পরিচিত হয়, নব্য সাহিত্যেও ঠিক সেইরূপ চতুর "সম্বন্ধ পদটি "ক্রিয়ার" বাড়ীর ধারে না গিয়াও শুধু বিদেশী মুরুব্বির জোরে কারকের সম্মান দাবী করিতেছে। পক্ষান্তরে একটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রকৃত সম্মানী "কারক" বিনা অপরাধে ফাঁসীর হুকুম পাইয়াছে। প্রাচীন দয়াদাক্ষিণ্যের সমাজে অন্ধ আতুর দীনদুঃখী বর্ষার জলধারার মত চারিদিক হইতে নানাবিধ দান লাভ করিয়া ধন্য হইত। তখনকার সাহিত্যেও সম্প্রদানের সম্মান খুব বেশী ছিল। কালের ইঙ্গিতে সেই দয়ার দেশে দানের আকাশে নিষ্ঠুরতার প্রখর কিরণমালায় শোভিত হইয়া "অর্দ্ধচন্দ্র" প্রকাশিত হইল। সভাপতি মহাশয় আপনি মনে কিছু করিবেন

না, সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি এখনকার বাঙ্গালী মহলে দান প্রকৃতি ক্রমশঃই যেন পঞ্চত্বের পদতলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। নজীর চাইকি? বেলা দ্বিপ্রহর গৃহস্থের বাড়ীতে অন্ধ, পঙ্গু, বৈরাগী, বৈষ্ণব, মুষ্টিভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে দানের বদলে শত অপমানরাশি ভিক্ষার ঝুলিতে পুরিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে ফিরিয়া যায় না কি? ইহা কি অলীক বা অপ্রকৃত কথা? এই সমবেদনাশূন্য সমাজের অনুকরণে নব্য বাঙ্গালী বৈয়াকরণিক প্রভুরা সম্প্রদানবিমুখতা প্রদর্শন করিবে না কেন? ইহা অন্যায় ও অসঙ্গত নহে, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সময়োপযোগী। বিদ্যাভূষণের সম্প্রদায় কারকের দল হইতে সম্প্রদানকে বাঙ্গালার বাহির করিয়া দিয়াছেন।

তারপর নব্য সাহিত্যিকগণ বর্ত্তমান সমাজপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহিত্যে এক নূতন আইন জারি করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণের দল বর্ত্তমান সাহিত্যের সমাসকক্ষে সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিদিগকে প্রবেশ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া গ্রাম্য ছোটলোকগুলাকে আদর করিয়া ডাকিয়া সেই কক্ষের সত্বস্বামিত্ব দান করিতেছেন, কথাটা আর একটুকু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইতেছে।

একান্নবর্ত্তী প্রথার অমৃতধারায় প্রাচীন সমাজের পারিবারিক জীবন যখন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমার প্রাণান্ত যত্নে সাহিত্যেও ইহার অনুরূপ কল্যাণকরী—সমাসপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। একান্নবর্ত্তিতার যুগে একজন অভিভাবকের অধীন হইয়া এক একতাসূত্রে গ্রথিত থাকিয়া পরিবারের দশজন যেমন নিজ নিজ সাংসারিক জীবন সুখশান্তির মধ্যদিয়া অতিবাহিত করিত, প্রাচীন সাহিত্যের ঠিক তেমনই এক অভিভাবিকার অধীনে এক একতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পদসকল ভাষার গৌরববর্দ্ধনে উদ্যোগী হইয়াছিল। এই উদ্যোগ, এই রীতিপ্রবর্ত্তনা আমারই শাসনের ফল। আমি এক বিভক্তি অভিভাবিকার অধীন করিয়া দুই বা ততধিক পদকে যে মিলিত করিয়াছিলাম এই পদ মিলনেরই নাম সমাস। সমাজে যেমন মিলন ছিল তেমন বিরোধ বিগ্রহ যে ছিলনা তেমন নহে, সাহিত্যেও তেমন এক বিভক্তির অধীনতা অস্বীকার করিয়া পদ সকল স্বাতন্ত্র্যের গৌরব লাভে যখনই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে তখনই তাহাদের মধ্যে "বিগ্রহ" উপস্থিত হইয়াছে। আমার অধিকারের এই বিগ্রহ অনৈতিহাসিক ঘটনা নহে। যাক্, যা বলিতেছিলাম, নব্য সমাজে ভদ্রলোকের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়ে একান্নবর্ত্তী প্রথার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, নব্য সাহিত্যেও সমাসপ্রথা ভদ্রদিগকে ছাড়িয়া ইতরশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াছেন। এই "বিশাল" 'বসুধা'র দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রেই নাকি ভব্য, সভ্য, ভদ্র শব্দ; আধুনিক বৈয়াকরণিকেরা বলেন, ইঁহারা বাঙ্গালার প্রকৃত অধিবাসী নহেন। এই সকল সংস্কৃত শব্দেরা বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছেন মাত্র। ইহাদের সমাস-রীতি বাঙ্গালায় গ্রহণযোগ্য নহে। বৈয়াকরণিকদের মতে খাঁটি দেশীয় শব্দের ভিতরে সমাস-পদ্ধতি প্রচলিত করিতে হইবে এবং তাহাই নিজস্ব বলিয়া গৃহীত হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ইহারা বলেন, বাঙ্গালার জল বাতাসে "ঘৃতান্ন" দুষ্পাচ্য, "ঘি ভাত" সুখকর লঘু পথ্য। বিদেশী শব্দ যাহারা বঙ্গজ শব্দের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদিগকে লইয়া সমাস বা যৌথ পদ-পরিবার গঠন করিতে নাকি কোন দোষ নাই, যথা—ধন দৌলত, কাগজ কলম প্রভৃতি। সভাপতি মহাশয়, আর একটা বিসদৃশ ব্যাপারের দিকে আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

হেড্‌পণ্ডিত, ব্রাহ্মমিশনারী, ডিপুটী বাবু ও সংস্কৃত প্রফেসার প্রভৃতি এঙ্‌লোবেঙ্গলীদল বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্মিলিত পদ-সমাজে বিনা প্রায়শ্চিত্তে ও বিনা আপত্তিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার জন-সমাজ কিন্তু এবিষয়ে বহু পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর এক কথা, শুধু এই দিক দিয়াই যে হাল আমলের সাহিত্য আধুনিক সমাজকে পরাস্ত করিয়াছে তাহা নহে আধুনিক সাহিত্যিকমণ্ডলী এক বাঞ্ছনীয় উদারনীতি অবলম্বন করিয়া যে শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয় করিতেছেন বাঙ্গালার লোক সমাজ স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছেন

বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্য-সমাজের "ধনী", "দরিদ্র", "বিদ্বান", "মূর্খ" প্রভৃতি প্রকৃত আর্য্যগণ জাতিধর্ম্মের কথা ষোল আনা বিস্মৃত হইয়া উহার হস্ত প্রসারণে কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ নবাবী আমলে নবাব বাদসা (নওয়াব পাতসাহ) হইতে আরম্ভ করিয়া গরিব বাবুর্চ্চী খানসামা নফর চাকরকে পর্য্যন্ত সস্নেহে স্বসমাজে গ্রহণ করিয়া যেরূপ শক্তি-সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছিল আজ আবার "কমিশনার," "জজ," "ম্যাজিষ্ট্রেট' হইতে রেল আফিসের বুকিংক্লার্ক ও মটর ড্রাইভার প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত সমান ভাবে পঙ্‌ক্তি ভোজনে অধিকার প্রদান করিয়া জনবল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। বাঙ্গালী সমাজ যদি এই উদারনৈতিক সাহিত্যিকগণের কাছে শিক্ষা-লাভ করিতেন, আজ ইহারাও যদি চিরাভ্যস্ত বর্জ্জনপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণনীতি ব্রতে দীক্ষিত হইতেন, মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর সম্প্রদায়ের মত যদি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে স্ব স্ব সমাজভুক্ত করিয়া লইতে তিলমাত্র কুণ্ঠা বোধ না করিতেন তবে বাঙ্গালীর সমাজ-শক্তি আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইত, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি। কথায় কথায় অবান্তর প্রসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি, ক্ষমা করুন। এখন তদ্ধিত সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াই আপনাদিগকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিব। "একটী কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণের" প্রতি-শ্রুতি আরও অনেকবার প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু শপথ রক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা করিতেছি না দেখিয়া আপনারা নিশ্চয় আমার সত্যনিষ্ঠায় খুবই সন্দেহ করিতেছেন। কি করিব? বাঙ্গালী জনসমাজের সংসর্গে যেমন শিক্ষা পাইয়াছি আমিও তো তেমনই ব্যবহার করিব। আপনারা বক্তৃতার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত "আর একটী মাত্র শব্দ বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব" এই প্রতিজ্ঞা কতবার করিয়া থাকেন, কিন্তু অঙ্গীকার পালনে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন কি? ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমিও বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই প্রতিশ্রুতি প্রকৃত প্রতিশ্রুতি নহে, ইহা শিষ্টাচারের রূপান্তর মাত্র, বিদেশ হইতে সমাগত সভ্যতানুমোদিত এক নূতন প্রণালীর বিনয় প্রদর্শন।

যা'ক, এখন "প্রকৃত মনু'সরামঃ"। পুরাকালে তদ্ধিত প্রভৃতি প্রত্যয়গুলিকে আমি একটা উপদেশ দিয়াছিলাম;—সুশিক্ষিত নট বালক যেমন নিজের কাঁধে চড়িয়া নৃত্য করিতে পারে না তোমরাও তেমন নিজেদের শিরে অর্থাৎ সমজাতীয় বা সগোত্র প্রত্যয়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্যগীতে প্রয়াস পাইও না। আমার এই মঙ্গল আদেশ বিশাল সাহিত্য-ভবনে বহুদিন পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল। আজ যেখান-কার স্তন্যপায়ী শিশুরাও আমাকে দেখিয়া কত প্রকার ঠাট্টাবিদ্রূপের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে সেই বাঙ্গালার মাটীতে আমার আদেশের মূল্য যে কাণা কড়িও নহে তার আর বলিতে হইবে কেন? আমার এই অনাদর অবজ্ঞা দেখিয়াই তো আজ সুযোগ বুঝিয়া তদ্ধিত প্রত্যয়েরা নিজেদের স্কন্ধে নিজেরা আরোহণ করিয়া নূতন "সৌজন্যতা" ও "মাধুর্য্যতা" প্রভৃতিতে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যকে সুশোভিত করিতেছে।

আর একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে আমার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যে স্বার্থ সমস্যা বর্ত্তমান যুগে একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পুরাতন সমাজ ও সাহিত্যে সেই স্বার্থের উপাসনা যে একেবারেই ছিল না এমন নহে। সেকেলে সামাজিকদের মত সাহিত্যের „বালক-যুবকেরাও" শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্যই স্বার্থের সেবা করিত। ইহারা কভু সাহিত্যের পবিত্র ক্রিয়াকলাপ স্বার্থের "ক" চিহ্নে কলুষিত করে নাই। হাল আমলের সামাজিক লোকেরা যেমন স্বার্থ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব অবগত নয়, বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকদেরও তেমন ক্রিয়াগুলি স্বার্থের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিতে-ছিল। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুটিলতা ও মিথ্যা ব্যবহার মহাপাপ বলিয়া জানিতেন, তাই তিনি সরলপ্রাণে সহজভাবে সত্য প্রকাশ করিতে গিয়া 'খাইবেক' 'যাইবেক' 'করিবেক' 'দেখিবেক, প্রভৃতি স্থলে স্বার্থ চিহ্ন সংযোজনা করিতে বিন্দুমাত্রও ভীত ও সঙ্কুচিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী ইংরাজি নবিশ বৈষয়িক সাহিত্যসেবকেরা এই মুক্তকচ্ছ পণ্ডিতের কবুল জবাব গ্রন্থ পত্রে নজির বদ্ধ করিয়া রাখাটা নিতান্ত অবৈধ ও অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্বার্থের কুৎসিত "ক" চিহ্নটীকে বেমালুম মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

পুরাতন লোক সমাজে স্ত্রীপুরুষ ভেদে যেমন পোষাক পরিচ্ছদের বিভিন্নতা ছিল সাহিত্যেও তেমন সেই সংস্কৃত যুগ হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত আমার শাসনে স্ত্রীপুরুষ ও ক্লীবেরা বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজ নিজ অবস্থা সূচক ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। সামাজিক স্ত্রীলোকদের মত আমার অধিকার ভুক্ত মহিলারাও দীর্ঘ ঈকার ও আকার রূপ শাড়ী কাঁচুলী প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছিল। এস্থলে একটি কথা বলা বড়ই প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি, সাহিত্যে অঙ্গ অঙ্গীর মত বিশেষ্য ও বিশেষণ অভেদাত্মা, বিশেষ্যকে অঙ্গী ও বিশেষণকে অঙ্গ বলা যাইতে পারে। আমার কঠোর নিয়ম ছিল, এই অঙ্গ ও অঙ্গীর এক রকম পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করা। অঙ্গী অর্থাৎ বিশেষ্য নিজের জাতির অনুসারে যে পোষাক গ্রহণ করিবে অঙ্গ বিশেষণকে ও সেই পরিচ্ছদেরই অধীন হইতে হইবে যেমন—সুন্দরী বালিকা মহৎ বিশ্ব, ও সুন্দর বালক। বর্ত্তমান সমাজের বিচারালয়ে শুনিতেছি পুরুষদের সামলা স্ত্রীলোকে দাবী করিতেছেন এবং রমণীদের রমণীয় গাউন পরিধান করিয়া পুরুষেরা গৌরবান্বিত হইতেছেন। কাজেই নব্য সাহিত্যেও যে সমাজের দেখা দেখি পরিচ্ছদের ব্যভিচার আরম্ভ হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করুন "পরিশ্রম কার্য্যকরী হইলনা" এস্থলে পরিশ্রম রূপ পুরুষটীর কার্য্যকররূপ অঙ্গ বা বিশেষণ পদটি স্ত্রীত্ব বোধক (দীর্ঘ) ঈকারের শাড়ী পড়িয়া প্রকাশ্যে বাহির হইতে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে না পক্ষান্তরে "সম্পত্তি ও বিপত্তি চিরস্থায়ী নহে" এস্থলে সম্পত্তি বিপত্তি রূপ মহিলা বিশেষ্য দুটির অঙ্গ চির স্থায়ীন্ পদটি (দীর্ঘ) ঈকারের শাড়ীতে সজ্জিত হয় নাই। তারপর সমাজের ক্লীবদের যেমন পোষাকের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই অর্থাৎ কখন পুরুষের পোষাক কখন স্ত্রীপরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া থাকে. হাল সাহিত্যের ক্লীবদেরও সেই অবস্থা। অহেতুকী প্রেম এখানে স্ত্রী পরিচ্ছদ, এবং মহান্ বিশ্ব এখানে পুরুষের পোষাক গ্রহণ করা হইয়াছে। সাহিত্যের অন্দর বাহির খুঁজিলে এইরূপ পরিচ্ছদ বিভ্রাটের বহু দৃষ্টান্ত নয়ন-গোচর হইবে। মনের কষ্টে উন্মত্তের প্রলাপের মত কত কি বলিতেছি, দরখাস্ত অস্বাভাবিক দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, মাননীয় সমাজপতি ও সামাজিকগণ - সম্ভবতঃ আমার উপর বেজায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, আমি চাই আপনাদের দয়া। আপনাদের বিরক্তিতে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াই দখরাস্ত শেষ করিব। সংস্কৃতের আমল হইতেই সমাজে ও সাহিত্যে বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয় ও বর্ণনাশ চলিয়া আসিতেছে। সেঁকেলের সমাজে মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতিতে বর্ণাগম, বিশ্বামিত্রাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভে বর্ণ বিপর্যয় ও পরশুরামাদির ক্ষত্রিয় ধ্বংশে বর্ণনাশ, আর সে সময়ের সাহিত্যে গবেন্দ্র প্রভৃতিতে বর্ণাগম সিংহের বর্ণবিপর্য্যয় এবং পৃষোদর প্রভৃতিতে বর্ণনাশ সংঘটিত হইয়াছে। তবে প্রাচীন কালের বর্ণনাশ সমাজ ও সাহিত্যে সহিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি মৌলিকতাপ্রিয় সাহিত্যিক বিদ্যানিধির দল যে ভাবে নূতন করিয়া বর্ণসংহারের আইন বিধিবদ্ধ করিবার পাণ্ডুলিপি সাহিত্য সেবক সমাজ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা না বলিয়া বিদয় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। বিদ্যানিধির দল বলেন, বাঙ্গালা ভাষায় দুটি—"জ" (য, জ) দুটি "ণ" ন), দুটি "ব" তিনটি "শ" (স, শ, ষ) প্রভৃতির জীবন রক্ষার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। দরকার নাই বলিয়াই যদি বর্ণ বিলোপের জন্য আইন পাশ করিতে হয় তবে আমি নাচার। হিন্দু সমাজের বৃত্তি অনুসারে গঠিত বর্ণদের অনেকেই ত এখন স্ববৃত্তি বিচ্যুত, বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসাবে এখন তাহাদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক। এই প্রয়োজনহীন সামাজিক বর্ণদের সংহারে বিদ্যা-

নিধির সাহস আছে কি? সাহিত্যে ফাঁসি ও দ্বীপান্তরের ভয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তথাকার বর্ণনাশে তিনি এতটা সাহসিকতা এতটা আগ্রহ দেখাইতেছেন? তারপর তিনটা স, দুটা ন প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা যায় না বাঙ্গালীর উচ্চারণ দোষে। যাক্ সে কথা; অন্তঃস্থ শ্রেণীর বোকা "ব" টার জন্য আমি একটুকুও ওকালতী করিব না। এই "ব" কারটার বড়ই পরশ্রীকাতর; পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারে র "ম" কারের প্রযোশনে বেজায় বাধা উপস্থিত করে, এই অপরাধে উহাকে বাঙ্গালার বর্ণশ্রেণী হইতে বিতাড়িত করা আমি অসঙ্গত বোধ করি না। মূর্দ্ধন্য "ণ" টীর অপরাধ মাত্রাহীনতা। নিষেধ জিনিষটা বালক বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই বড় অপ্রীতিকর সুতরাং সেই নিষেধের মূর্ত্তিমান্ অবতার "ণ" কারের মাত্রা বা সীমা নাই সুতরাং ইহাকে এই ওজুহতে বর্ণ সমাজে, অপাংক্তেয় করা যাইতে পারে। কিন্তু বেচারা বিদ্যানিধির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমার কাছে আসিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই অনুরোধ জানাইতেছি দেখিবেন নব পরশুরামের উন্মুক্ত লেখনী—তরবারির আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন কি না। বাঙ্গালীরা অল্পেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এই জন্য শ, ষ, স তিন "স"য়ের অলন্ত উপদেশ আমি বক্ষে ধারণ করিতেছি, কিন্তু বিদ্যানিধির দল যদি জোর করিয়া দুটি মুছিয়া ফেলেন তবে তাহাদের কি মঙ্গল হইবে? বাঙ্গালার সংযুক্ত বর্ণগুলারও বড় বিপদ দেখিতেছি, অঙ্গ বিকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে সকল স্বার্থত্যাগী বর্ণেরা মিলনকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে আধুনিক সৌখীন সাহিত্যিক সম্প্রদায় উচ্চারণ অনুসারে শব্দ গঠন করিতে যাইয়া "আক্ত", "আন্ধ" প্রভৃতি সম্মিলিত বর্ণগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা কিস্তুত কিমাকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার জনসমাজের মত সংযুক্ত বর্ণমহলেও ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। "বাঙ্গালার" আকার নিরাকার হইয়া প্রথমে বাঙ্গলা, পরে "গ"য়ের গঙ্গাপ্রাপ্তিতে "বাঙ্‌লা" অনন্তর হসন্ত "ঙ্"টির রাহু রূপ ধারণে অর্থাৎ গোলাকার মস্তকটি বাদে সমস্ত অঙ্গ খসিয়া পড়াতে অদ্ভুত নূতন "বাংলা" মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমার বিভীষিকায় বাঙ্গালার বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী সকলেই না কি সন্ত্রস্ত, জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপক শপথ করিয়া এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালার কি সর্ব্বত্রই বিপরীত বিধান? কোথায় আমি যাহাদের বিভীষিকায় বাঙ্গলার গৃহত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের উদ্যোগী আজ তাহারাই কি না, বলেন ব্যাকরণ বিভীষিকা।

তবে এই কথা অস্বীকার করি না, বর্ত্তমান সাহিত্যের অবস্থাদর্শী সেই সুযোগ্য অধ্যাপক আমার পক্ষে যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছেন। এতদিন আমি শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছি কিন্তু এখন দিনের পর দিন দেখিতেছি অবমাননার মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে' এই অবস্থায়, এই বন্ধুবান্ধব হীন দেশে বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি না। যথার্থই বলিতেছি আমার জীর্ণ মলিন 'ব:' 'ণত্ব'দি ভৈজসপত্র ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পুঁটলি বাঁধিয়া অরণ্য যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম উত্তর বঙ্গের সাহিত্য বৈঠকে বাঙ্গালীর গৌরব নির্ভীক, সত্যপ্রিয়, ভবিষ্যদ্দর্শী ক্ষণজন্মা সুযোগ্য বিচার পতি স্যার আশুতোষ স্বজনবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন।"

"বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হইতেছেন।"

উপসংহারে আবার বলিয়াছেন,—

"আপনাদের ভাষা, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক; অন্তের অনুষেজক হউক।"

ইহাতে আশা হইতেছে, বাঙ্গালায় আবার আমার ডাক পড়িবে। আমাকে বাদ দিয়া ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ আকাশকুসুম কল্পনা নয় কি? আমার সাহায্য ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক, রচিত হইতে পারে কি? ভাষাকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলেও বোধ হয় শর্ম্মাকে

আবার আদর করিতে হইবে। আমি এই ভরসায় আরও কিছুদিন এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। এই অবসরে আপনার কাছেও বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি শুনিতেছি সামাজিক উকিলদের কেহ কেহ নাকি উভয়পক্ষেরই কথা বলেন, পক্ষান্তরে মক্কেলের কাজ করিতে না পারিলেও গৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না। সাহিত্য-সংসারের সাহিত্যিক উকিলেরা নাকি এই পথেরই পথিক। ইহাদের অনেকেই নাকি উভয় দলে বিচরণ করিয়া থাকেন। কাজেই আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ওকালতনামা দিতে পারিলাম না। এখন আপনাদের বিচার বুদ্ধি ও নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

উপসংহারে প্রার্থনা এই, সময় ও সমাজগতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি আমার অর্দ্ধ অধিকার স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি। স্মরণাতীত সংস্কৃত যুগের কথা আজ আর তুলিব না। বিদ্যাসাগরী আমলের দাবী রক্ষায়ও আজ তেমন ব্যাকুলতা নাই। নব্য বাঙ্গালা হইতে একেবারে উদ্বাস্তু না হই, ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী।

তুমি।

(গান)

তুমি সুন্দর, শোক-সন্তাপহর,
বাঞ্ছিত প্রিয়জন!
তুমি আঁধারে, হৃদি মাঝারে,
ধ্রুব-জ্যোতিঃ, অন্ধনয়ন।
তুমি কাননে কুসুম-প্রীতি,
তুমি কোকিলে আকুল গীতি,
মোহিনী উষায় হেসে ভেসে যায়,
তোমারি মধুর স্মৃতি!
তুমি প্রাণসখা, হৃদয় মাঝারে,
সুরভি-জড়িত নন্দন।
খেলে নয়নে তোমারি ভাষা,
তব স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা;
নধর অধরে সুধা ঝর ঝরে,
হাসিতে বাড়ায় আশা।
তুমি প্রাণসখা! বঁধু, মধুমাখা—
মম সাধনার ধন!
আমি না চাহিতে তুমি আসিও!
তুমি আঁধারে আলোকে হাসিও!
আমি না সাধিতে, হৃদয় বাঁধিতে,
মনোমত ভালবাসিও!
আমি দিব মালা প্রভাত-স্বপনে,
করিব চরণ বন্দন।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সন ১৩২০ বাং ১৮ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকা ৩৫ মিনিটের সময় আমরা আগ্রা হইতে আজমীঢ় যাত্রা করিলাম। রাত্রি ২ টার সময় বাণ্ডিকুই নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দীল্লি হইতে সে গাড়ী আসিল তাহাতে ২টা :৫ মিনিটের সময় উঠিয়া পরদিন বেলা ৮½ টার সময়ে আজমীঢ় উপস্থিত হইলাম।

দার্জ্জিলিং যেরূপ পর্ব্বতের স্তরে স্তরে সাজান, আজমীঢ় সহরটিও ঠিক সেইরূপ পর্ব্বত গাত্রে স্তরে স্তরে চিত্র পুত্তলীর ন্যায় অবস্থিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে তারাগড়, তন্নিম্নে পর্ব্বতের স্তরে স্তরে শ্যামল তরুলতাদির মধ্যে শুভ্র হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত। পর্ব্বতের মূলদেশে রেল লাইন হইতে আজমীঢ়ের দৃশ্য বাস্তবিকই অতীব মনোহর।

আজমীঢ়ে অবতরণ করার পরে একজন পুষ্করের পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা পুষ্কর যাইব

জানিয়া তিনি আমাদের পাণ্ডার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা পশুপতিনাথ পাণ্ডার নাম করাতে তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবেন স্বীকার করিয়া তিন টাকাতে দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলেন। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া পুষ্করাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আজমীঢ় হইতে পুষ্কর ৯ মাইল, একটী পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। আজমীঢ় এক প্রকার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত বেষ্টিত। অনসাগর নামক বিস্তৃত সরোবর গাড়ী হইতে দেখা যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে জল সঞ্চিত হইয়া হ্রদের ন্যায় বড় বড় সরোবরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরুলিয়া ও রাঁচি অঞ্চলে এইরূপ অনেক সরোবর দেখা যায়, সেই দেশে উহাদিগকে বাঁধ বলে।

আমরা ক্রমে সহরের ফটক অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে একটা পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের মধ্যে কোন ফাঁক্‌ দেখা যায় না, অথচ গাড়ী সেই দিকেই যাইতেছে দেখিয়া ইতস্ততঃ বোধ করিতেছিলাম। কিছুকাল পরে দেখিলাম পর্ব্বতের গায়ে উপরের দিকে বক্রভাবে বিস্তৃত একটি রাস্তা। গাড়ী সেই রাস্তা দিয়া ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন গাড়োয়ান ও সহিস গাড়ী হইতে নামিয়া, আস্তে আস্তে ঘোড়া ধরিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে আমাদেরও গাড়ী হইতে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া যাইতে হইল। কোন কোন স্থানে রাস্তা এত খাড়া যে ঘোড়ার পক্ষে গাড়ী টানিয়া রাখা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়। পূর্ব্ব হইতেই সহিস দুইখণ্ড প্রস্তর হাতে করিয়া গাড়ীর পিছে গমন করিয়া থাকে। ঘোড়া যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয় এবং আর গাড়ী টানিতে না পারে, তখন সহিস গাড়ীর পিছনের চাকার নীচে সেই দুইখান পাথর বসাইয়া গাড়ী আট্‌কাইয়া রাখে এবং ঘোড়া কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া নেয়। এইভাবে গাড়ী ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠে এবং তথায় যাইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করে। তখন যাত্রিগণ গাড়ীতে উঠিয়া বসে, গাড়োয়ান ও সহিস স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া কিছুকালের জন্য সমতল ভূমিতে গাড়ী চালাইয়া যায় এবং তৎপর পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে গাড়ী ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাকে। নীচের দিকে নামিবার সময় গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে থাকে এবং আরোহীদিগের মনে অনেক সময় পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা হওয়ার কথা শুনিলাম না। কোন প্রকারে সেই পার্ব্বত্য রাস্তায় ঘোড়া কি গাড়ী কোন রকম অকর্ম্মণ্য হইলেই বিপদ। আমরা ফিরিয়া আসার সময় দেখিলাম অপর একখানা গাড়ীতে উক্তরূপ দুর্ঘটনা হওয়াতে যাত্রিগণ অবশিষ্ট পথ হাটিয়া আজমীঢ় যাইতে বাধ্য হইলেন।

পুষ্কর সম্বন্ধে পুরাণকার বলিয়াছেন—

"দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুঞ্চৈব সুদুষ্করং॥"

এক পর্ব্বতগাত্রে এই রেল রাস্তা প্রস্তুত করার পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ কিরূপে পুষ্করে গমনাগমন করিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পর্ব্বতগাত্রে নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি এবং পথের দুই পার্শ্বে নানারকমের বানর দেখা যায়। যাত্রিগণ ছোলা ভাজা প্রভৃতি খাওয়ার জিনিষ দিলে উহারা আগ্রহের সহিত তাহা খাইয়া থাকে। স্থানে স্থানে লোকও বাস করিতেছে দেখা যায়।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া গাড়ী চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত সমতল পথে চলিল এবং অবশেষে দুই পার্শ্বে দোকান ও গৃহস্থের বাড়ীযুক্ত ক্ষুদ্র এক সহরে উপস্থিত হইল। উহাই পুষ্কর হ্রদের তীর, গাড়ী হইতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে হ্রদের স্বচ্ছ সলিল পরিদর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। পুষ্কর হ্রদ পূর্ব্বোক্ত রূপ একটি বাঁধ বা সরোবর বলিয়া অনুমিত হয়, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় মাইল এবং প্রস্থ প্রায় এক মাইল হইবে। উহার প্রায় চারি পাড়েই অসংখ্য পাথরের ঘাট এবং তীরে নানা দেবদেবীর মন্দির ও বহু প্রাচীন অট্টালিকা অবস্থিত। জলের মধ্যে পদ্মযোনি ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী। ঘাটের নিকট অসংখ্য মৎস্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ময়দা, মাকাই, ছোলা ভাজা প্রভৃতি যাহা দিতেছেন, মৎস্য-

গুলি অকুতোভয়ে তাহা টুপ-টাপ গিলিতেছে। হ্রদের মধ্যস্থলে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীর ভাসিতেছে দেখিলাম। তথায় জীব-হিংসা নাই বলিয়াই বোধ হয়—মৎস্য কি কুম্ভীর মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না। দিনের বেলা ঘাটের নিকটে কুম্ভীর ভাসিতে দেখা যায় না। শুনিলাম রাত্রিকালে কুম্ভীর ঘাটের নিকট আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া খায়। রাত্রে ঘাটের নিকট কুম্ভীর আসে বলিয়াই পাণ্ডারা আমাদিগকে রাত্রিকালে ঘাটে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পুষ্করে প্রথম স্নান করার সময় একজন পাণ্ডা একটি লাঠী হাতে করিয়া ঘাটে কোমর জলে নামিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে অভয় দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্নান করিতে বলিলেন।

পুষ্কর অতি প্রাচীন তীর্থ। হিন্দুশাস্ত্র মতে পুষ্কর সত্যযুগের তীর্থ, নৈমিষারণ্য ত্রেতাযুগের, কুরুক্ষেত্র দ্বাপর যুগের ও গঙ্গা কলিযুগের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণে আছে চন্দ্রভাগার উত্তরে, করতোয়ার দক্ষিণে, সরস্বতী তীরে, হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যোজন পরিমিত স্থানে পুষ্কর ত্রিতয় অবস্থিত। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, জগতে কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং লোক সকল পাপ কর্ম্মে রত হইতেছে। তিনি লোকের কষ্ট নিবারণাভিপ্রায়ে পুষ্করকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তলোকে আনা স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন কলির সংস্রবে পুষ্কর কলুষিত হইবে, সুতরাং যে স্থানে কলির প্রাদুর্ভাব নাই, সেই স্থানেই পুষ্কর স্থাপন করা বিধেয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার হস্তস্থিত পদ্মকে—"পদ্ম! যে স্থানে কলির প্রাদুর্ভাব নাই তুমি সেই স্থানে পতিত হও" এই কথা বলিয়া হস্ত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। পদ্ম অনেক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পতিত হইল; প্রথমে যে স্থানে পদ্ম পতিত হইয়াছিল তথা হইতে উঠিয়া তাহারই নিকট কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে অপর একস্থানে পতিত হইল, এবং তথা হইতে উঠিয়া উহার দক্ষিণ দিকে আর এক স্থানে তৃতীয় বার পতিত হইল। এই ভাবে ব্রহ্মার পদ্ম যে তিন স্থানে পড়িয়াছিল তাহাতে খাত হইয়া সুনির্ম্মল জল উঠিল। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তথায় আসিয়া উহার প্রথম স্থানকে জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় স্থানকে মধ্যম এবং তৃতীয় স্থানকে কনিষ্ঠ পুষ্কর নাম দিয়া পুষ্কর ত্রিতয় স্থাপন করিলেন। আজকাল মধ্যম পুষ্করের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। জ্যেষ্ঠ পুষ্করে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের বেদী এখনও পুষ্কর হ্রদে বিদ্যমান রহিয়াছে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যজ্ঞ হইয়াছিল। আজ কালও সেই সময়ে পুষ্কর তীরে মেলা মিলিয়া থাকে। কনিষ্ঠ পুষ্কর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সরোবর, উহা হইতে খালের আকারে হ্রদের জল বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে জলাভূমিতে পতিত হইতেছে, উহাই পুণ্য-তোয়া সরস্বতী।

পশুপতিনাথ পাণ্ডার বসত বাটীর সংলগ্ন পুষ্কর হ্রদের উত্তর তীরে অবস্থিত নূতন একখানা দোতালা বাড়ীতে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমাদের জিনিষ পত্র তথায় রাখিয়া আমরা পুষ্করে স্নান করিবার জন্য গুরুঘাটে উপস্থিত হইলাম। জলে কুম্ভীর দেখিয়া প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পাণ্ডাদিগের অভয় বাক্যে, একজন পাণ্ডা একলাঠী হাতে করিয়া জলে নামিয়া দাঁড়াইল এবং বহুলোক জলে নামিয়া স্নান করিতেছে দেখিয়া আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে জলে নামিয়া স্নান তর্পণাদি করিলাম। পার্শ্বস্থিত চত্বরে যাইয়া ভোজ্যোৎসর্গ ও পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া বাসায় গেলাম। আহারান্তে বৈকালবেলা পুষ্করতীরে কিছু ভ্রমণ করিয়া গুরুঘাটের নিকটের পুষ্কর-রাজের মন্দিরে গেলাম। পুষ্কররাজের মূর্ত্তি এবং সান্ধ্য আরতি দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীতিলাভ করিলাম। তৎপরে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া হ্রদের পশ্চিমে এক উচ্চ ভূমিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মার মন্দির দেখিলাম। পুষ্কর ভিন্ন অন্য কোন তীর্থেই ব্রহ্মার মন্দির দেখি নাই। এই মন্দির শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, উহার গর্ভগৃহে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রস্তরময় মূর্ত্তি, বামে প্রস্তর নির্ম্মিতা গায়ত্রী মূর্ত্তি, এবং মন্দির দ্বারের দুই পার্শ্বে ব্রহ্মার মানস পুত্র সনক, সনন্দ সনৎকুমার ও সনাতনের মূর্ত্তি চতুষ্টয়। মন্দিরের বাহিরে পঞ্চমুখ মহাদেব ও নারদের মূর্ত্তি। দুই পার্শ্বে দুইটী হস্তির উপরে

ইন্দ্র ও কুবের মূর্ত্তি, দ্বারদেশে কতিপয় হংস মূর্ত্তি অঙ্কিত।

ব্রহ্মার মন্দির হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া হ্রদ হইতে কিছু দূরে বরাহ মন্দির দেখিতে গেলাম। বরাহ মন্দির ও শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রশস্ত মন্দির। উহার গর্ভগৃহে শ্বেতপ্রস্তরের বরাহ মূর্ত্তি বিরাজিত, পার্শ্বদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরের বরাহ মূর্ত্তি, এতদ্ভিন্ন বেণুমাধব, অনন্তশায়ী এবং বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম।

সাবিত্রী পাহাড় পুষ্কর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। পাণ্ডাজিউর পরামর্শানুসারে পরদিন ভোর পাঁচটার সময় আমরা সাবিত্রী যাত্রা করিলাম। পুষ্কর হ্রদের পাড় দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। ব্রহ্মার মন্দিরের নীচ দিয়া কিছু দূর যাইয়া বামদিকে রূপার নির্ম্মিত এক গজানন মূর্ত্তি দেখিলাম। তৎপরে বালুকাময় এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। বালুকারাশির মধ্যে হাটিয়া চলিলাম। এই বালুকারাশি যখন রৌদ্রোত্তাপে গরম হয় তখন হাটিয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। শুনিলাম রৌদ্রের সময় কেহ কেহ হাটিয়া যাইতে দুইখণ্ড পাথর হাতে করিয়া যায়। যখন উত্তপ্ত বালুকারাশির তাপ আর পায়ে সহ্য হয় না, তখন উক্ত প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনঃ হাটিতে আরম্ভ করে। এইভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে পথ চলিতে থাকে। রাস্তার দুইপার্শ্বে কিছু কিছু দূর্ব্বা দেখা যায় কিন্তু উহা কাঁটার মত এরূপ তীক্ষ্ণাগ্র যে খালি পায়ে তাহার উপর হাটা অসম্ভব। রৌদ্রের সময়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া হাটিতে অসহ্য কষ্ট হইবে জানিয়াই পাণ্ডাজিউ উদ্‌যোগ করিয়া সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই আমাদিগকে নিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন।

আমরা পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইলাম। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি আছে, উহাতে প্রায় পাঁচশত ধাপ। পাণ্ডাজিউর দেখাদেখি আমিও জুতা পায় দিয়া গিয়াছিলাম। জুতা নিয়া মন্দিরে যাওয়া নিষেধ, কাজেই সিঁড়ির উপরে একটি চর্ম্মকার বালকের নিকট জুতা রাখিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসার সময়ে সেই চর্ম্মকার বালককে একটি পয়সা দিয়া জুতা আনিলাম, সে জুতার বালি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল।

রাস্তাতে ৩ | ৪ বার বিশ্রাম করিয়া আমরা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠিয়া দেখি প্রবলবেগে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃ-সমীরণ সেবন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই আমাদের শ্রান্তি দূর হইল। সেই পর্ব্বতশিখর হইতে উদিত সূর্য্যকিরণে পুষ্কর হ্রদ ও মন্দিরাদি দেখিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। পুষ্কর হ্রদ একটী সামান্য পুকুরের মত দেখিলাম।

মন্দিরের সম্মুখে আমার পূর্ব্বপরিচিত ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত প্যারীলাল দাসকে এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মালাকারকে সেই দূরদেশে দেখিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত।

সাবিত্রী ভেট (দর্শন) করার জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ১৷৹ পাঁচসিকা করিয়া দিতে হয়। সেই পাঁচসিকা দিয়া পূজোপকরণসহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিতা, আকর্ণবিস্তৃতনয়না, সহাস্যবদনা সাবিত্রী মূর্ত্তি অতীব মনোহারিণী। পুরাণে বর্ণিত আছে যে লোক পিতামহ ব্রহ্মা যখন পুষ্করে যজ্ঞ করিতে দীক্ষিত হইলেন, তখন নারদ প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংবাদ প্রেরণ সত্ত্বেও অন্যান্য দেবপত্নীদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতে সাবিত্রীর অসম্ভাবিত কাল-বিলম্ব হইয়াছিল। তাহাতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা আর অপেক্ষা করা সঙ্গত বোধ না করিয়া পত্নীরূপে গায়ত্রীকে নিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সাবিত্রী আর পুষ্করে গেলেন না এবং তদবধি এই পর্ব্বতোপরি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীকে সিন্দূর ও লোহা উৎসর্গ করিয়া সধবা স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাবিত্রীদেবীর পূজার জন্য বিধবা স্ত্রীলোক বেশী ব্যস্ত। সাবিত্রী মূর্ত্তির পূর্ব্বেই তৎকন্যা সরস্বতীর মূর্ত্তি। সাবিত্রী ও

সরস্বতী উভয় মূর্ত্তিই শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেখিতে সুন্দর। মন্দিরের বাহিরে ইন্দ্রাণীর অধিষ্ঠান। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী পবিত্র কুণ্ড। তথা হইতে অবতরণ করিয়া আমরা বেলা প্রায় ৮½ টার সময় পুষ্করস্থ বাসাতে ফিরিয়া আসিলাম।

পুষ্কর পরিক্রমা অর্থাৎ পুষ্কর হ্রদের চারিপাড় দিয়া হাটিয়া আসাও একটি তীর্থকৃত্য। আমরা পুষ্কর প্রদক্ষিণ করণাভিপ্রায়ে পুষ্করের পাড় দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। পুষ্করের পূর্ব্বতীরে অন্ধকারময় এক গুহাতে শিবলিঙ্গ স্পর্শন করিলাম। গুহার মধ্যে একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে কিন্তু তাহাতে কিছু দেখা যায় না। শিবলিঙ্গ স্পর্শ করার সময় আমি যখন হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলাম, তখন তথায় উপবিষ্ট ধ্যান মগ্ন কোন ব্যক্তির মাথায় হাত পড়াতে আমি কথঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলাম। সেই গুহার উপরিভাগে মন্দির মধ্যে পঞ্চমুখ মহাদেব শ্বেত প্রস্তরের বৃষভ প্রভৃতি দেখিলাম। পুষ্করের দক্ষিণদিকে কিছু নিম্নভূমি, তাহাতে ইক্ষু, মরিচ, প্রভৃতি শস্য ক্ষেত্র দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। তথায় বহু বন্য ময়ূর বিচরণ করিতেছে দেখিলাম। এক স্থানে অল্প অল্প জল আছে, তাহার নিকটে ছোট বড় অনেক কুম্ভীর সমবেত হইয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছে। পদ্মা নদীর চরে এবং জালছিড়ার তীরে এইরূপ দৃশ্য আমি অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু এত অধিক সংখ্যক কুম্ভীর আমি আর কখনও এক স্থানে দেখি নাই। কোন কোন কুম্ভীর মুখ উঠাইয়া আমাদিগের প্রতি তাকাইল কিন্তু পলাইয়া যাওয়ার কি আক্রমণ করার লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ইহার পরে অতি প্রশস্ত ও পুরাতন সপ্তর্ষিঘাটের উপর দিয়া পুরাতন এক রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। ভগ্নাবস্থায় বড় বড় দালান দেখিয়া আমাদের কষ্ট বোধ হইল। তৎপরে পশ্চিম তীরে বহু ঘাট অতিক্রম করিয়া বাসাতে আসিলাম।

শ্রীরাজকুমার সেন।

আকাশের নীলরঙ্‌।

সাধারণতঃ শূন্যদেশই আকাশ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। শূন্যের কোন রঙ্‌ থাকা সম্ভবপর নহে। শূন্যস্থান আমরা অন্ধকারময়ই দেখিতে পাই। এই অন্ধকার সর্ব্ববর্ণের অভাব বই আর কিছুই নহে শূন্যও সর্ব্ববস্তুর অভাবকেই বুঝায়। সুতরাং শূন্যের কোন রঙ্‌ থাকিলে সর্ব্ববর্ণের অভাব কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারই ইহার রঙ্‌ হইতে পারে। আকাশ শূন্যদেশ হইলেও ইহার রঙ্‌ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার না হইয়া যে উজ্জ্বল নীল হইয়াছে, তাহার অবশ্যই বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। এই কারণ সম্বন্ধেই উপস্থিত প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

আকাশ যে নীলবর্ণ তাহা যেমন আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, তেমনই আকাশের নাম হইতেও জানিতে পারি। আমাদের ভাষায় আকাশ "নীলাম্বর" বলিয়া অভিহিত হয়; পাশ্চাত্য ভাষায় আকাশ blue sky বলিয়া অভিহিত হয়। 'A bolt from the blue' এই ইংরেজীবাক্যে আকাশ যে সংক্ষেপে—'blue' অর্থাৎ নীল নামে অভিহিত হয় তাহার ও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আকাশের নীলবর্ণের কারণানুসন্ধানের দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে আকাশ যেমন অগণিত ধূলিকণা সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—তেমনই সূক্ষ্ম অসীম বাষ্পরাশিতেও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই বাষ্প ও ধূলিকণার উপর সূর্য্য কিরণ সম্পাতেই নীলবর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটী পাশ্চাত্য ভাষায় যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

"The earth is surrounded by the atmosphere which is charged with vapour and terrestrial particles; and the sun's light entering obliquely into it, the violet and blue rays or those which are conceived to have less momentum than the red rays, are particularly

arrested in their course, and are reflected in abundance to the earth. Thus when the atmosphere is nearly free from clouds, they give to the parts of the sky which are remote from the apparent place of the sun an azure tint."—National Encyclopedia.

উদ্ধৃত বক্তব্য হইতে বায়ুমণ্ডল ধূলি ও বাষ্পরাশি পরিব্যাপ্ত থাকাতে তাহাতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যে নীলবর্ণের উৎপাদক হয়, তাহাই আকাশের নীলবর্ণ রূপে প্রতিভাত হয়, ইহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপরি-উদ্ধৃত মত হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে বাষ্প ও ধূলি রাশি আকাশ নীলরঙ্ প্রকাশের নিমিত্ত কারণ। এই নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের যে পরিষ্কার ধারণা ছিল, শাস্ত্র হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইতে পারি। সেই আদি বৈদিক কালেই যে প্রাগুক্ত ধারণা উৎপন্ন ও সংগঠিত হইয়াছিল, বেদের আলোচনা হইতেই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমে আমরা ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম ঋক্‌টীই আলোচনা করিয়া দেখিব। সেই ঋক্‌টী এই :—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদং। সমূল্হ মস্যপাংশুলে ॥" ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ সূক্ত—১৭ ঋক্ "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল॥"—রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এস্থলে "বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের দ্বারা জগৎ আবৃত হওয়ার" অর্থ যে ধূলির দ্বারা বিষ্ণু বা সূর্য্যের বিচরণ মার্গ ব্যাপ্ত হওয়া তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি, করা যায়। অভিধানে আমরা 'বিষ্ণুর পদ' আকাশেরই নাম দেখিতে পাই যথা :—

"বিয়দ্ বিষ্ণুপদংবাতু পুংস্যাকাশ বিহায়সি।" (অমরকোষ) সুতরাং ধূলিযুক্ত বিষ্ণুপদের অর্থ আমরা ধূলিযুক্ত আকাশই পাইতেছি।

ধূলিযুক্ত বিষ্ণুপদ সম্বন্ধে আমরা যে ব্যখ্যা প্রদান করিয়াছি তাহাতে সকলের আস্থা স্থাপন নাও করিতে পারেন; প্রত্যুত রূপক ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, বিষ্ণুপদ বা আকাশ বুঝাইতে ধূলির বাচক শব্দেরই ব্যবহার শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তখন আমাদের একান্তই ভরসা আছে যে—আমাদের প্রাগুক্ত ব্যাখ্যা তাঁহাদের অননুমোদিত হইবে না। বস্তুতঃ অন্য শাস্ত্রে নহে, বেদেই আমরা ধূলির বাচক প্রসিদ্ধ 'রজঃ' শব্দ স্পষ্টাক্ষরেই আকাশের বাচক দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল্ড (Macdonald) তদীয় সুপরিচিত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে রজঃ শব্দের আকাশার্থে বৈদিক প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ বক্তব্য করিয়াছেন :—

"রজস্"—[dimness, region of clouds]

1 V. sky, air, atmosphere.

এস্থলে বলা বাহুল্য যে V. Vedic (বৈদিক) শব্দেরই সাঙ্কেতিক পূর্ব্বাক্ষর মাত্র।

শাস্ত্র হইতে আমরা আকাশকে যেমন ধূলিময় বলিয়া জানিতে পারি, তেমন বাষ্পময় বলিয়াও জানিতে পারি। বেদে এই জন্যই বাষ্পময় আকাশ সমুদ্র নামে বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

"সুদাসোদস্রা বসু বিভ্রতারথে পৃক্ষোবহত মশ্বিনা।
রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্য্যস্মেধত্তং পুরুস্পৃহম্ ॥

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪৭ সূক্ত।

"হে দস্রদ্বয়। তোমরা রথে ধন, লইয়া সুদাসকে অন্ন আনিয়া দিয়াছিলে সেইরূপ অন্তরীক্ষ হইতে অথবা দ্যুলোক হইতে অনেকের বাঞ্ছিত ধন আমাদিগকে দান কর।" "সমুদ্রাৎ" ইহার টীকায় সায়ণাচার্য্য 'অন্তরীক্ষাৎ' এইরূপ লিখিয়াছেন। রমেশ বাবু সমুদ্র শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"ঋগ্বেদ আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।" ঋগ্বেদানুবাদ ১৩৮৯ পৃঃ। বাষ্পময় আকাশের সমুদ্র নাম প্রকৃত সমুদ্রের নীলবর্ণ হইতে কল্পিত হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আকাশের নীলাম্বর ও সমুদ্রের নীলাম্বু নামের সাদৃশ্য হইতেই

নীলবর্ণের তুলনা দ্বারা যে আকাশের সমুদ্র নাম হইতে পারে তাহা অনুমান করা যায়। আকাশের 'অভ্র' নামের দ্বারাও সমুদ্র যেমন জলাধার আকাশও যে তদ্রূপ জলাধার তাহা বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে অনন্ত বিস্তার নীলজল রাশি আর উপরে অসীম নীলশূন্যদেশ সহজেই একটী অপরটীর প্রতিরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে। নীলবর্ণ সমুদ্রের নামে যে ঋষিগণ আকাশের 'সমুদ্র' নাম দিয়াছিলেন, তাহাতে সমুদ্রের নীলবর্ণের কারণই যে তাহারা আকাশের নীলবর্ণের কারণ ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই অনুমিত হয়।

আকাশের এক নাম 'পুষ্কর'ও পাওয়া যায়—যথা "ব্যোম পুষ্করমম্বরম্।" পুষ্কর শব্দ যেমন জল বুঝায় তেমনই পদ্মও বুঝায়। নীলাকাশের সহিত নীলপদ্মের সাদৃশ্য হইতেই সম্ভবতঃ আকাশ 'পুষ্কর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আকাশের এক নাম যে আমরা 'বিষ্ণুপদ' প্রাপ্ত হই—এই বিষ্ণু পদ 'পদ্ম' অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রকারে পদ্মরূপ আকাশই যে বিষ্ণুর স্থান তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বিষ্ণু সূর্য্যেরই বিকাশ মাত্র। সুতরাং আকাশরূপ পদ্মের সহিত আমরা বিষ্ণুরূপী সূর্য্যেরই যোগ প্রাপ্ত হইতেছি। বিষ্ণুর ধ্যানে আমরা তাঁহাকে যে "সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট" অথচ "সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী" রূপে উল্লিখিত দেখিতে পাই তাহাতেই বিষ্ণু যে সূর্য্যের সহিত অভিন্ন এবং আকাশ-রূপ তদীয় অধিষ্ঠান স্থানই যে, সরসিজ বা পদ্মরূপে কল্পিত তাহা পরিষ্কারই উপলব্ধি করা যায়। এই অধিষ্ঠানের নীলবর্ণ হইতেই বিষ্ণু "নীলোৎপল দলশ্যাম" হইয়াছেন। বিষ্ণুর পদ্মনাভ নামও আকাশরূপ পদ্মের সহিত তাঁহার যোগের প্রমাণ দিয়া থাকে। কেবল বিষ্ণুর সহিতই নীলোৎপলের সম্বন্ধ তাহা নহে, বিষ্ণুর লক্ষ্মী ইন্দিরার সহিতও নীলোৎপলের সম্বন্ধ ; তাহা-তেই, 'ইন্দিরাবর' নীলোৎপলের এক নাম হইয়াছে।

বিষ্ণুর 'নারায়ণ' নামে তিনি যে তেজোরূপে বাষ্পে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুর যে 'পদ্মেশয়' একটী নাম অভিধানে পাওয়া যায় তাহা-তেও বিষ্ণুকে নীলাকাশে ব্যাপ্ত বলিয়াই জানিতে পারা যায়। এই প্রকারে একদিকে নীলাকাশ নীল-পদ্মরূপে যেমন সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ও আধার হইতেছে, তেমনই অপরদিকে আকাশস্থ বাষ্পরাশি সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যতেজের আধারভূত হইতেছে। বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ যে ধূলিপটল সমাচ্ছন্ন আকাশের 'রজঃ' নামের দ্বারাই তাহার প্রমাণ হয়। সুতরাং বাষ্প যেরূপ সূর্য্য তেজের আধার হইতেছে ধূলিপটলও তদ্রূপই সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যতেজের আধার হয়। ইহা হইতে সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যতেজের সহিত যে আকাশের ধূলিপটল ও বাষ্পের সংযোগে নীলবর্ণের বিশেষ সম্পর্ক তাহা বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আকাশের নীলবর্ণের ব্যাখ্যাও যে এই সম্পর্কেরই উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং আকাশের নীলবর্ণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে আমাদের ঋষিদিগের জ্ঞান নেত্রে প্রতিস্ফুরিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ আভাসই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৺রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর।

রাজসেবার পুরস্কার।

আমরা ১৮৬৮-৭০ সনের লুসাই অভিযানের কথা বলিয়াছি। এই সময়ে এডগার ও হরিচরণকে যে ভাবে বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া, মৃত্যুর পাশ কাটিয়া কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল তাহা বস্তুতঃ বিস্ময়প্রদ। এই কর্ম্মী পুরুষগণ যে গভর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন তার আর বিচিত্র কি। নিম্নে যৎকিঞ্চিত উদ্ধৃত হইল—

এডগার সাহেবের পত্র (ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯) —স্বেচ্ছাসেবক হরিচরণ পুরস্কারের যোগ্য পাত্র—

Extract from letter no. 125 dated 18th February 1869 from J. W. Edgar Esqr. officiating Deputy Commissioner of Cachar to the Commissioner of Circuit, Dacca District.

"In connection with this subject I have much pleasure in bringing to your notice the services rendered by Hari Charan Sarma a small landholder in this district who has been frequently employed as Goomasta in tea gardens. When he heard of the intended expedition, he came to me and offered to do what he could. He has since had almost sole charge of the preparations on the Jhalnacherra side, collected provisions, coolies etc, opened out tracks in the direction of Guturmukh and in many other ways given most efficient aid.

As his services had been entirely voluntary for I did not even hint any reward for them, I hope that Government will recognize them in a substantial manner."

মেক উইলিয়াম সাহেবের পত্র (এপ্রিল ১৮৬৯) রসদ সংগ্রহে কার্য্য পটুতা অতীব প্রশংসনীয়—

Extract from a letter dated 7th April 1869 from O. G. R. Mc. William Esqr. Assistant Commissioner of Cachar to the officiating Deputy Commissioner of Cachar.

"The force was always well supplied with rusud. The arrangements made by Hari Charan Thakur who was in charge of the stores were excellent, and the energy with which he carried them out most praiseworthy. Had the expedition been successful, no small shares in its success wolud have been due to him."

এডগার সাহেবের পত্র (এপ্রিল ১৮৬৯)—লুসাই উপদ্রবে শান্তি স্থাপনে সাহায্য—লুসাইর পথ ঘাট নির্দ্ধারণে বন্দোবস্ত—লুসাই সর্দ্দারদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ—

Extract from letter no. 228 of 14th April 1869 from J. W. Edgar officiating Deputy Commissioner of Cachar to the Commissioner of Circuit Dacca District Dacca.

"4. I have no remarks to make upon Mr. Mc. William's report of the attempt made by the Western Column to get to Sukpilall's village except that I fully concur in what he says in the last paragraph about Hari Charan Surma. I have already called attention in my letter of the 18th February to this man's services and I hope that they may not be allowed to go unrewarded. He has devoted himself to assisting me in the settlement of Lushai difficulty and he is now working hard to get up parties to explore the country north of Sukpilall's

village during the rains and to induce the smaller chiefs to come in and make submission before the beginning of the cold weather.

সিমসন সাহেবের পত্র (এপ্রিল ১৮৬৯) —রাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ তালুক দানের প্রস্তাব—ধলেশ্বরী উপত্যকা পথে কৃতিত্ব—ইতিপূর্ব্বে বহুবার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত—

Extract from Letter No. 147 of the 21st April, 1869 from F. B. Simson Esqr. Officiating Commissioner of Dacca to the Honorable A. Eden, Secretary to the Government of Bengal.

I would also permit the Deputy Commissioner to give Apamea and Baboo Hari Thakur some Farms or Talooks on easy terms especially as marks of approbation for services on this occasion. Baboo Harry Thakur's services were really very valuable. He seems to have exercised on the Dulessary side somewhat the same active influence which Apamea employed on the Soonay. Harry Thakur has also on more occasions than one been prominently thanked and I believe rewarded by Government.

True extracts.

(Sd.) O. G. R. Mc. William,
Offg: Dy. Commissioner.

সিমসন সাহেবের পত্র (এপ্রিল ১৮৬৯) —গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ জ্ঞাপন—

No. 301.

Copy with copy of this office No. 147 dated 21st April, 1869 forwarded to the Offg. Deputy Commissioner of Cachar.

* * * *

The Deputy Commisioner should transmit to the gentlemen formally mentioned by Mr. Edgar and himself the thanks the Government has bestowed upon them.

(Sd.) F. B. Simson,
Commissioner, Dacca.

ইডেন সাহেবের পত্র (আগষ্ট ১৮৬৯)—তাহার কার্য্য তৎপরতায় গভর্ণমেণ্টের তুষ্টি—পুরস্কার দান প্রস্তাবে ছোট লাট বাহাদুরের আন্তরিক অনুমোদন—

Extract from Letter No. 227 T dated the 30th August 1869 from the Honorable A. Eden, Secretary to the Government of Bengal, to the Commissioner of Dacca.

"The special acknowledgements of Government are due to Apamia Choudhury and Babu Hari Charan Thakur and the Lieutenant Governor approves of the manner in which you propose to reward the services of these two persons."

এডগার সাহেবের পত্র (ডিসেম্বর ১৮৬৯) —এডগার সাহেবের সহিত লুসাই পরিভ্রমণ—৫০০ একর নিষ্কর ভূমি দানের প্রস্তাব -

Extract from Letter No. 866 of the 15th December 1869, from J. W. Edgar Esquire, Deputy Commissioner of Cachar, to the Commissioner of Dacca District.

"Para 4. Baboo Hari Charan Surma is to accompany me on my intended tour this year and I am very anxious that he should be rewarded for his services last season.

The total area of his holdings is about six hundred acres and with a jamma of Rs. 382. I should like to be empowered to offer him his choice of getting his present holdings on the same terms as Apamea may get his or a fee simple grant of about 500 acres of unassessed

waste land which he has been for sometime anxious to obtain."

মেকেঞ্জি সাহেবের পত্র (মে ১৮৭০)—**ছোট লাট বাহাদুরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন—**

Extract from Letter No. 2442 of the 18th May 1870 from A. Mackenzie Esqr. Offg. Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner of Dacca.

"With referrence to your communication No. 58 dated 7th instant I am directed to request that *you* will be good enough to convey the Lieutenant Governors' thanks to the persons named in the margin, for the good services rendered by them during the late tour of the Deputy Commissioner of Cachar through the Looshai country."

Hurry Thakur
* * *

মেক উইলিয়ম সাহেবের পত্র (নবেম্বর ১৮৭০)—৪১৩ একর পতিত জমি নিষ্কর দানের প্রস্তাব—

Extract from Letter No. 715 dated the 30th November 1870 from the Deputy Commissioner of Cachar to the Commissioner of Dacca.

2. I propose to give Hurry Thakur in fee simple a piece of unassessed waste land lying in Mouzah Brajapur and Paikan Ps. Hailakandi. The area of this land is 85 hals, 10 kears, 1 powa, 3 jaista, 2 raiks and 2 pons equivalent to 413 acres, 2 roods and 16 perches. More than two-fifths of this area is at present unculturable marsh. Of the remainder much more than half is partially filled up and is rapidly becoming fit for cultivation. There are besides about sixty acres of hill and grazing land and about forty of good arable land. If this area was granted to Hury Thakur he would drain the marsh and settle down ryots on the reclaimed lands which would thus in a few years and by the expenditure of a considerable sum of money become a property of some value.

True extracts.

(Sd.) O. G. R. Mc. William,
Offg. Dy. Commissioner.

এডগার সাহেবের পত্র (নবেম্বর ১৮৭০) —বিগত লুসাই পরিভ্রমণে বিশেষ সহায়তার পুরস্কারার্থ সর্ব্বোচ্চ সম্মানসূচক উপঢৌকন স্বরূপ হস্তিদানের প্রস্তাব—

Extract from Letter No. 716 of the 30th November 1870 from J. W. Edgar Esqr., Deputy Commissioner of Cachar to the Commissioner of Dacca.

Para 2. I should like to have an elephant given to Hurry Thakur as a reward for the great service he did in my last tour. I know that it is very difficult to get elephants now but I think if a sum of money were sanctioned we might be able to get one here. He would like very much to get one elephant from Government as this kind of present is thought to be peculiarly honorable on this frontier.

3. I also beg to propose to grant to him and Raj Kissen......a joint lease of the Ghagra fishery for years at Rs. 250/- per annum..........

মেকেঞ্জি সাহেবের পত্র (জানুয়ারী ১৮৭১)—সৈনিক কর্ম্মচারিগণের ভূয়সী প্রশংসা—নিষ্কর জমি ও জলকর মহাল ইজারা দানের অনুমোদনার্থ

ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ। হস্তিক্রয়ে বঙ্গেশ্বরের অনুমোদন—

Extract from letter No 352 D. Fort William the 30th January 1871 from A. Mackenzie Esqr. Officiating Junior Secretary to the Government of Bengal, to the Secretary to the Government of India in the Foreign Department.

3. Hnrry Thakur exercised on the Dallessury side the same active influence that Apameah displayed on the Sonai. The officers who went with the Dallessury Column bear testimony in the strongest possible terms to the valuable services rendered by him.

5. It will be seen from the Commissioner's present communication that it is proposed to give Hurry Thakur in fee simple 413 acres of unassessed waste land of which about 40 acres only is good arable land the rest being at present unculturable marsh, hill or grazing land and also to grant to him and to one Rajkissen who distinguished himself by his zeal and good service during Mr. Edgar's subsequent tour through the Lushai country a joint lease of the Gogra fishery for the years at Rs. 250 per annum which has been the average revenue derived from the fishery for the last three years.

7. In consideration of the valuable services rendered by Hurry Thakur and Apameah Choudhury as well as by Rajkissen tke Lieutenant Governor begs to recommend that the grants of the lands and fisheries on the proposed terms may be sanctioned by the Government of India.

8. As the men, specially Hurry Thakur, again gave valuable assistance to Mr. Edgar in his subsequent tour through the Looshay country, the Lieutenant Governor has on the recommendation of the local authorities sanctioned the payment to Hurry Thakur of a sum not exceeding Rs. 1200 for the purchase of elephant as an additional reward.

True extracts

Sd. O. G. R. Mc. William
Offg. Dy. Commer

এইচ্ এল্ উইলিয়াম সাহেবের পত্র (ফেব্রুয়ারী ১৮৭১)—১৮৬৯ সনের লুসাই অভিযানে সাহায্য ও ১৮৭০ সনের লুসাই পরিভ্রমণে সাহায্যের নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি, জলকর মহালের ইজারা এবং হস্তি দানে মহিমান্বিত রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদন—

From H. Lepore William Esq. under Secretary to the Government of India Foreign Department to the Hon'ble Ashley Eden Secretary to the Government of Bengal judicial Department. (No 371 P dated Fort William the 20th February 1871).

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your officiating junior Secretary's letter No 352 Dated 30th January 1871 and its enclosures and in reply to state that the Viceroy and Governor General in Council is pleased to sanction the rewards proposed for Appa Meah Choudhury, Hurry Thakur and Rajkissen on account of services rendered by them in the Lushai Expedition of 1869, and to Mr. Edgar, in his tour in the Lushai Country in 1870, as recommended

by His Honour the Lieutenant Governor in the 7th Paragraph of the letter under acknowledgment.

2. I am at the same time to intimate that his Excellency in his council confirms the sanction given by his honor to the payment of a sum not exceeding Rs. 1,200 to Hurry Thakur for the purchase of an elephant as an additional reward for the valuable assistance given by him to Mr. Edgar in 1870.

True Copy

Sd/- O. G. R. Mc. William

Offg. Dy Commissioner

বেইলী সাহেবের পত্র (অক্টোবর ১৮৭১)—লুসাই পরিভ্রমণে সবিশেষ সাহায্যের নিমিত্ত বঙ্গেশ্বরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন—

No. 5328.

From S. C. Bayley Esq.

Offg. Secretary to Govt. and Bengal in the Judicial Dept.

To Baboo Hurry Charan Sarma.

Fort William the 30th Ootober 1871

Judicial Department

Judicial.

Sir,

Mr. Edgar having brought to the notice of the Lieutenant Governor the assistance which he received from you during his march from the Dulleswar to the Sonai and on his return to Cachar, I am directed to convey to you the thanks of government for the valuable services rendered by you on that occasion.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. S. C. Bayley

Secy. to the Govt. of Bengal

লুসাই ভ্রমণ।

১৮৭০—৭১

ইতিপূর্ব্বে লুসাই দেশে বৃটিশ অফিসর রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু এডগার এর প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব করেন যে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনর বা তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মচারী বৎসরে একবার করিয়া লুসাই ভ্রমণ করিবেন, এবং ভ্রমণকালে প্রত্যেক লুসাই সর্দ্দারকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্ভাষণ করিবেন, তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিবেন, বিবাদ কিছু থাকিলে মীমাংসা করিয়া দিবেন, এবং যাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া এড্গারকেই পরবৎসর (১৮৭০—৭১) শীতকালে আবার লুসাই যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, এবং পরামর্শ দিলেন যেন কাছাড়ের মত চাটিগাঁর দিকেও লুসাই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হয়।

সেবারে শীতের আরম্ভে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি শান্তির প্রস্তাব * লইয়া এড্গার লুসাই যাত্রা করিলেন। তাহার মধ্যে আসল প্রস্তাবটির কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

---

*(1) The grant of Sunnuds to the chiefs, specifying, the conditions on which they would be left in the undisturbed possession of their lands.

(2) The levy of tolls by the chiefs on people going up to trade with the Lushais. Eventually it was hoped that the tribes would be induced to frequent periodical fairs within the British boundary.

(3) Settlement if possible of villages along the frontier between our outposts and the present sites of the Lushai villages.

জানুয়ারীর প্রথমভাগেই তিনি সোনাইর তীরে উপস্থিত হইলেন। ৯ই জানুয়ারী সুক্‌পিলালের দূত আসিয়া সংবদ দিল—লুসাই সর্দ্দার শেবুং হাউলংদিগকে সঙ্গে লইয়া হাইলাকান্দির দিকে লুণ্ঠন যাত্রা করিয়াছে। ১৬ই জানুয়ারী স্বয়ং সুক্‌পিলালের সঙ্গে এড্‌গার সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। সুক্‌পিলাল তখনো ইংরাজেরই বন্ধু। ১৭ই তারিখ পিবুকের দূত আসিয়া সংবাদ দিল বনলেনের পুত্র লেংকম সুনাই উপত্যকা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ ছাড়া নানান্ দিক হইতে নানারকমের গুজব এড্‌গারের কানে আসিতে লাগিল। ভয়ে ও সন্দেহে তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। সুক্‌পিলালের প্রীতি যদি ছলনাই হয়? লুণ্ঠন যাত্রার ভান করিয়া লুসাইর দল যদি তাঁর এই মুষ্টিমেয় অনুচরদিগকেই আক্রমণ করে? কে জানে এই বর্ব্বরজাতির কি অভিপ্রায়? এড্‌গারের এই উদ্বেগ ও শঙ্কটের সময় ভরসা ছিল কেবল পইবই ও বনপিলালের (পূর্ব্ব লুসাই) বন্ধুতা এবং তাঁর চিরসঙ্গী হরিচরণ, ইন্‌স্পেক্টার দোস্ত মহম্মদ ও বার্‌ল্যাণ্ড সাহেবের পরামর্শ। এড্‌গার তাঁহার লুসাই ভ্রমণের রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Extract from letter No. B, dated Cachar the 6th March 1871, from J. W. Edgar Esq, Deputy Commissioner of Cachar on special duty to the Commissioner of Circuit, Dacca Division.

22. We now felt our position getting more uncomfortable every day. The continued delay in the arrival of news from Cachar made us fear that our messengers might have been attacked and killed or taken captives on the way down. We know that this was in the highest degree impossible but we could not account for the delay on any other hypothesis. If this conjecture were correct we should have had in all probability to fight our way down if we went by river in which case the chances were that some of us would not have escaped alive. On the other hand I had not sufficient food for the land route. Besides this if we had gone down, then the Lushais would have thought that we did so either through fear, an idea I was very unwilling they should conceive, or with the intention of returning in a hostile manner in which case their best policy would have been to cut us off if possible on the way down. We had every reason to believe in the friendliness of the people of Dharmanssi and the other villages on the west—they were bringing in supplies daily and we felt that some how or other we must in the long run get intelligence from Cachar. All these things were in favour of our remaining where we were. On the other side was the knowledge that Vonolel's tribe were hostile and that we had thought it necessary to defy in a kind of way the other Eastern clans. Then was the cruel uncertainty about what had happened in the west of which we knew scarcely more than that it must have been something very bad. We could not tell what pressure the south western tribes might he able to bring on Sukpilal to betray us or whether they were not strong enough to attack and cut

(4) The appointment of a Political agent in Hill Tipperah * * *

(5) The opening out of two paths, one from Monier Khal to Bongkong and the of other from the Dwarbund road as far as the Rangto range.

* * * * *

The North East frontier of Bengal. Page 305

us up or (what I personally feared more) take us prisoners in spite of him. These seemed reasons for attempting to get back to Cachar at any risk. I confess that I felt at this time considerable anxiety about our position. Fortunately I had three as brave and prudent advisers as a man could wish for in a case of difficulty in Mr. Burland, Inspector Dost Mohamed and Babu Hurry Charan Sarma. I talked over our position with them separately and then resolved to wait for intelligence till the 22nd and if we get no news by that time to send for the headman of the villages round and inform them that we were going down to find out why intelligence and supplies had not come up and then get back to Cachar as quickly as possible.

এড্‌গার যখন এইরূপে আশায়ও আশঙ্কায় দুলিতেছিলেন লুসাইরা তখন হাউলঙ ও সাইলুদের সঙ্গে চট্টগ্রাম সীমান্তে রাক্ষসের মত রক্তপাত করিতেছিল।

২৩শে জানুয়ারী এই দস্যুর দল আরীয়নারখালের কাছাড়ীপুঞ্জী জ্বালাইয়া দিয়া ২৩ জনকে খুন করে এবং ৩৭ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

সেইদিন হাইলাকান্দির ২০ মাইল দক্ষিণে আলেক্‌জেন্দ্রাপুর বাগানে মিঃ সেলার প্রাতর্ভোজনে বসিয়াছিলেন। সাথী ছিলেন প্রতিবেশী মিষ্টার উইঞ্চেষ্টার ও তাঁর ছোট একটি কন্যা। এমন সময় দুর্দান্ত লুসাইরা বাগান আক্রমণ করে। সেলার সাহেব পালাইয়া গিয়া জঙ্গলে আশ্রয় নেন; পিতা উইঞ্চেষ্টার কন্যাকে রক্ষা করিতে গিয়া বর্ব্বরের ছোড়ার মুখে আত্মবলি দেন; সাত বছরের অসহায়া বালিকা বন্দী হয়।

এর ঘণ্টা কয়েকপর সংলগ্ন বাগান কাটলিচেরা আক্রান্ত হয়। কিন্তু দস্যুরা সেখানে জন কয়েককে হত ও আহত করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৪শে তারিখ আবার তারা কাটলিচেরা আক্রমণ করে কিন্তু এবারেও বিতাড়িত হয়।

২৭সে তারিখ মণিয়ারখাল গড় আক্রান্ত ও কুলি-লাইন উৎসাদিত হয়।

সেই দিনই দরমিখাল বাগান লুণ্ঠিত হয়।

এই ২৭শে তারিখই ইহারা নগ্‌দিগ্রাম বাগান আক্রমণ করিয়া জন কয়েক কুলি ও সিপাই হত্যা করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ঝালনাচেরার কুলিলাইন আক্রান্ত হয়। কিন্তু পুলিস আক্রমণ-কারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

এ ছাড়া শ্রীহট্ট, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং মণিপুরও এই লুণ্ঠন ব্যাপার হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

এদিকে এড্‌গার দেখিলেন এমন শত্রুদেশের মধ্যস্থলে বাস—এই চার ছয়জন মাত্র অনুচর লইয়া—কিছুতেই উচিত নয়। পথঘাট বন্ধ করিয়া দিয়া এই দুর্দান্তজাতি সহজেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিতে পারে। সুতরাং তিনি যথাসম্ভব সত্বর শিলচর ফিরিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ষ্টেসনে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। ২১শে তারিখ ক্যাপ্‌টেন লাইটফুট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৪শে তারিখ ভোরে রওয়ানা হইয়া বিকালে তাঁহারা লুসাই বাজার উপস্থিত হইলেন। সুকপিলালের পুত্র খালকোমের আদেশে এখান হইতে সুকপিলালের একজন মন্ত্রী এবং পূর্ব্ব লুসাইর দুইজন মন্ত্রী শিলচর পর্য্যন্ত এড্‌গারের সঙ্গী হইয়াছিল।

অসময়ে লুসাই পরিভ্রমণ শেষ হইল। হরিচরণ এডগার সাহেবের সহিত শিলচর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উদ্‌যোগী হরিচরণ এই অল্প কালের মধ্যেই লুসাই পথ ঘাট, বিভিন্ন জাতির অবস্থান এবং পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। এই সকল বিষয় পূর্ব্বে জানা ছিল না বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট বহুবার সৈন্য পাঠাইয়াও সফল কাম হইতে পারেন নাই। ১৮৬৯ সনের অভিযানও এই কারণে ব্যর্থ হইয়াছিল। ফলে লুসাইরা আপনাদিগকে অজেয় বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, এবং সুযোগ পাইলেই লুটপাট করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

হরিচরণের অক্লান্ত সাধনায় এতদিন পরে সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইল। লুসাইর পথ ঘাট আবিষ্কার এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহার্য্য করিবার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটী হস্তী প্রদান করেন। এই বৃত্তান্ত যথাস্থান আলোচিত হইয়াছে। রাজার নিকট হইতে প্রজা ভাবে সম্মান লাভ অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

লুসাই অভিযান।

১৮৭১—৭২ সন।

অতঃপর লুসাইকে ক্ষমা করিয়া চলা ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইল।

পরবর্ত্তী শীতকালের আরম্ভেই লুসাই আক্রমণ করা স্থির হইয়া উদ্‌যোগ চলিতে লাগিল। ২ ও ৪নং গুর্‌খা রেজিমেণ্ট্, ২২ ও ২৭ নং পাঞ্জাব পদাতি, এবং ৪২ ও ৪৪ নং নেটিব পদাদি, আর তার সঙ্গে সেপার্‌স্ ও মাইনার্‌স্ সমস্তে ৮০০০ আট হাজার সৈন্যে এক বিরাট দল গঠিত হইল। এই দল দুই শাখায় ভাগ হইয়া দক্ষিণ বা চট্টগ্রাম শাখা সেনাপতি ব্রাউন্‌ল (C. B.) এবং বাম বা কাছাড় শাখা ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল বোরসিয়ারের (C. B.) অধীনে স্থাপিত হইল। মিঃ এড্‌গার সিভিল অফিসাররূপে এবং হরিচরণ স্পেশ্যাল পলিটিকেল এজণ্টরূপে এই শাখার সঙ্গী হইলেন। রসদ যোগান, কুলি পরিচালনা করা, পথ-ঘাট কাটিয়া দেওয়া—এতদ্ব্যতীত দোভাষীর কাজও হরিচরণকেই করিতে হইত।

—কি কঠোর পরিশ্রমে তিনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতেন—মনে করিলে বিস্ময় হয়। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—সব সময়েই নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং দিনে দুবার আহার কচিৎ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত। এই স্বল্পাহারে দিনমানভরা হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি! ক্ষুধা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রসদের তত্বাবধান, কুলিদের পরিচালনা, সিপাইদিগকে উৎসাহ দান এবং আবশ্যক মত বন্দুক ধরিয়া গুলিছাড়া—হরিচরণ এ সকলই করিতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমেও পাহাড়ের ভিজা হাওয়ায় তিনি শীঘ্রই রক্তামাশয়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অসুখকে হরিচরণ অসুখ বলিয়া কখনই গ্রাহ্য করিতেন না। ভোরবেলা যেমন তাঁহাকে রাত না পোহাইতেই সৈন্যসামন্তাদির প্রাতরাশের আয়োজন করিয়া দিতে হইত, বিকালবেলা তেমনি রাত্রি না হইতেই রান্নার ব্যাপারটা শেষ করিতে হইত। রাত্রে শিবিরে আগুন জ্বালান নিষেধ ছিল। কারণ লুসাইরা সম্মুখ যুদ্ধ জানিত না। তাহারা লুকাইয়া আক্রমণ করিত, আগুন দেখিয়া গুলি ছাড়িত। মাথার উপর সেই গোলাগুলির বর্ষণ লইয়া হরিচরণ অটল-চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—কি নিঃশঙ্ক নির্ভীক বীরের মত! আশ্চর্য্য মানিয়া স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোরাসিয়ার বলিয়াছেন—

"He seems absolutely devoid of physical fear. I have had the opportunity of seeing him more than once under fire and each time he was calm and self-possessed as if he had been in his tehsil Cutchery."*

এ ছাড়া সকল রকমের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং সত্য মিথ্যা হাজার কথা হইতে সত্যটুকু বাছিয়া নেওয়াও হরিচরণেরই কাজ ছিল। উক্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর এক জায়গায় এড্‌গারের কাছে বলিয়াছেন—

"From what you have told me I feel sure in this department the assistance Hurry Thakur gave you was in "valuable."

হরিচরণের এরূপ বিচক্ষণতা যে লুসাই যুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের এক প্রধান সহায় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভবিষ্যতে আমরা ইহার সবিশেষ পরিচয় পাইব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা এল, টি।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, টি।

* N. W. Frontier of Bengal.

শ্যামের বাঁশী।

কি সুরে আজ বাজালে গো
    শ্যাম তোমার ও মোহন-বাঁশী!
পড়্ল খসে গোপকামিনীর
    চরণতলে শাসন-কাঁসী!
গোধন গুলি আঙ্গিনাতে
রইল পড়ে সন্ধ্যা-রাতে,
গোয়াল ঘরে ধূম নাহি গো,
    তুল্সীতলায় দীপের হাসি;
সব ফেলে আজ নেয় যে টেনে
    আকুল-করা মোহন-বাঁশী।

লক্ষীমায়ের আসনখানি
    কার হাতে আজ সাজ্‌বে ভালো?
ঘরে ঘরে কে দেখাবে
    আঁচল-ঢাকা সাঁঝের আলো?
খোকার খেলা সাঙ্গ হলে
ডাক্‌বে যখন 'মা মা' বলে,
গায়ের ধূলা মুছ্‌বে কে তা'র?
    চুমবে দুটি নয়ন কালো?
লক্ষীমায়ের আসন খানি
    কা'র হাতে আর সাজ্‌বে ভালো?

ঘাটের পথে আজ নাহি যে
    সিক্ত পায়ের চিহ্ন গুলি,
কে দিবে আজ ঠাকুর-ঘরে
    ধূপদানীটি যত্নে তুলি?
শিউলী গাছে পাতার ফাঁকে
জল্‌বে মাণিক লাখে লাখে,
খোকাকে আজ কে ভুলাবে
    দেখায়ে তাই জান্‌লা খুলি'?
ক'ার বুকে আজ ঘুমাবে সে
    ঘুমপাড়ানী ছন্দে ভুলি'?

গোপরমণী যায় ছুটে গো,
    যমুনায় যে বাজ্‌ল বাঁশী।
রইল পড়ে আঁধার ঘরে
    গোপসমাজের হাজার কাঁসী।
নদীর কূলে কুঞ্জবনে
খোকায় কি তা'র পড়বে মনে?
আবার ঘরে আস্‌বে ফিরে
    ফুট্‌বে যখন ভোরের হাসি?—
বুঝ্‌তে নারি কি সুরে শ্যাম,
    বাজাও তোমার মোহন-বাঁশী।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ।

দুজনে।

তুমি হয়ো নদী তাতে আমি হব ঢেউ,
ভেসে ডুবে ডুবে ভেসে,   বয়ে যাব নেচে হেসে
    তোমারি হৃদয় মাঝে জানিবে না কেউ।

তুমি হয়ো বাঁশী তা'তে আমি হ'ব স্বর,
তোমারি হৃদয় মাঝে   আকুল প্রভাত সাঁঝে
    তুলিব রাগিণীময় অবুত লহর।

তুমি হয়ো ফুল তা'তে গন্ধ হব আমি,
আকুল আবেশে ভোর   তারি মাঝে প্রাণ মোর
    নীরবে মিশিয়ে র'বে সারা-দিবা যামী।

তুমি হয়ো শশী আমি হইব কিরণ,
তোমারি সোহাগে ভেসে   ধরাতে পড়িব হেসে
    মধুর ললিত ছটা কণক বরণ।

তুমি হয়ো দিবাকর আমি হব উষা,
তোমারি ও পথ পানে   চেয়ে অনিমেষ ধ্যানে
    পড়িব কাঞ্চনী ফুলে মনিময় ভূষা।

তুমি হয়ো শ্যাম তরু আমি হব লতা,
তোমারি ও দেহ ঘিরি   তোমারি চরণ বেড়ি
    হৃদয়ে হৃদয়ে হবে পরাণের কথা।

তুমি হয়ো বায়ু আমি হ'ব উপবন,
মম কুঞ্জ দ্বারে এসে,   যখন দাঁড়াবে হেসে
    ছেয়ে যাবে ফুলে ফুলে আমার ভুবন।

তুমি হয়ো রবি আমি হব মৃণালিনী,
তোমার পরশ মেখে   প্রভাতে উঠিব জেগে
    তোমারি আশায় চেয়ে যাপিব যামিনী'।

তুমি হয়ো মধু আমি হব মধুকর,
তোমারি চরণ চুমি   তৃষিত এ চিত্ত ভুমি
    অমৃত করিয়ে পান হইবে অমর।

শ্রীবিভাবতী সেন।

Regtd. No. C. 746.

VOL. 6. No. 4.

JULY, 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0
Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, *Nayabazar Raad, Dacca.*

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
J. G. Cumming, C. S. I.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq , I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C,S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri. Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M. A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M. A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
; Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
, Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
, Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

The Vedas and the Puranas ...	S. C. Sarkar, M.A., M.R.A.S. Dy. Magistrate ...	105
The Days of the Hindu Calendar ...	Rai Bahadur, Prof. Jogesh Chandra Roy, M.A.	114
The Scope of Biogeography ...	P. Leo Faulkner, F.R.G.S., F.R.S.A: ...	127
The Arctic Home in the Rig-Veda : An untenable Position (iv) ...	Prof. N. K. Datta, M.A.	132

সূচী।

বিষয়।		লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা॥
১। চীনা "শিল্প-শাস্ত্র" ...		অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ ...	১০৩
২। ঢাকায় রথযাত্রা		শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ ...	১০৯
৩। রাজা ও প্রজা		... ...	১১৫
৪। বর্ষা-প্রভাতী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস, সি ...	১১৯
৫। ভূতের বাহন		অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, এম্, এ	১২০
৬। সাগরের প্রতি	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ ...	১২৪
৭। উত্তরাপথ ভ্রমণ		শ্রীযুক্ত ভবঘুরে	১২৪
৮। কাব্যের ভবিষ্যত		শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ ...	১২৯
৯। স্বপ্ন-মিলন	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৩৪
১০। সমালোচনা		...	১৩৪

THE DACCA REVIEW.

VOL. VI. JULY, 1916. No. 4.

THE VEDAS AND THE PURANAS

AS A SOURCE OF ANCIENT INDIAN HISTORY

In the work of reconstructing the history of ancient Aryan India, her ancient literature—sacred and secular particularly the *Vedas* and *Puranas* has not been laid under contribution, to any moderately appreciable extent, under the rules of modern historical criticism. Tradition embedded in contemporary literature has now been recognised as one of the sources of history; but the *Vedas* have been regarded—even by critical scholars—in the light of comparative religion or mythology, having nothing to do with sober history. *Puranas* too (though the name means chronicles, and one of the five indications of a *Purana* is an express account of dynasties, etc) have been so long relegated by historians to the region of fables. and by the faithful, regarded as only religious manuals. The time has come for subjecting Vedic and Pouranic literature (with all its manifold branches) to a methodical and critical study, with a view to obtain facts of ancient tradition, useful for a connected account of India of Aryan times.

For the last half a dozen years and more, I have devoted my leisure moments to such a study, and have been arriving, by degrees, at the conclusion that between the *Puranas* and the *Vedas*, a sufficiently intelligible traditional history of India from the earliest times, down to a few centuries before Christ, may be prepared in at least a tentative manner.

This sort of history, though not history proper in the strictest sense of the term, appears to my mind to be necessary spade work, to clear the ground for the foundation of a more substantial structure, with material collected in the course of research from different sources and in different quarters.

In this opinion, I am in some measure supported by the treatment given, by the historian of early India, (Mr. Vincent Smith), to some of the more

reliable *Puranas*, in carrying back the history of ancient times from the fourth to the seventh century B. C.; also by the dissertation, of Mr. F. E. Pargiter, I. C. S. Retd., on the dynastic lists collated and made out from the different Pauranic accounts. * In our own country, the researches in Vedic literature carried on by such erudite Vedic scholars as the late Mr. Umesh Chandra Batavyal, M. A., C. S.,[1] the late A. C. Sen, M. A., C. S.,[2] and Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna[3] which do not appear to have received as wide a recognition as they deserve,—lend further support to the proposition above advanced. In all these, however, the vast available extent of ancient Sanskrit literature has been only partially tapped. My own idea is to travel farther and farther afield, to cover the whole ground, and take a comprehensive survey, testing the information supplied by the *Vedas*, in the light of facts gleaned from the *Puranas* and *vice-versa*. In some sense, certain

* (*Vide* his "Dynasties of the Kali age") and "Ancient Indian Genealogies and Chronology F. R. A. S. 1910.

(1) *Vide* his "*Veda-Pravesika*" in Bengali Calcutta, 1311 B. E.

(2) See his articles on "*The Hero-gods in the Rg. Veda*" in "Research and Review" of the Journal of the Asiatic Society of Bengal.

(3) "*Pratna-Tatva-Varidhi*" in Bengali, Calcutta, 1319 B. E.

Puranas which have been admitted by some of our historians into the pale of recognised sources of history, contain mention of tradition which is more ancient than any to be found in the *Vedas*. The *Vedas* are collections of psalms, hymns, rituals and incantations of which the authorship is ascribed to certain religious Seers, poets, priests and medicine men. In the *Pauranic* lists, on the other hand, of ruling dynasties, priestly families and warriors and Rishis from the earliest times, we can trace Aryan History even to the Pre-Vedic age, for, the *Puranas* professedly begin with the beginning of things: at least things Aryan. Elsewhere, I have sketched out a preliminary outline of what such a tradition history might be like. *

What is essentially necessary to bring the subject within the practical arena of scholarly research, is to methodise, arrange, and interpret Vedic Texts *anew*, from a common-sense view-point, instead of following exclusively and mechanically the much-too-beaten track of explanation of orthodox commentators, etymologists, and lexicographers. In the next place, it is essential to collect and compare the dynastic lists, and other historical matter obtainable from some of the authentic *Puranas*, *e. g.* to the Matsya, the Vayu, the

* See my article on "*A peep into the earliest history of Aryan India*," published in the "Modern Review," 1910.

Vishnu, and the Bhagvata,—test them and fix their chronological sequence by means of synchronic anecdotes and references thereto found in the Vedic Texts.

It is not impossible, (as some Indianists are apt to imagine), to know the real import of certain abstruse Riks, without the aid of extant commentaries, particularly that of Sayana. They appear to be unintelligible often because the context is forgotten, or the interpreter proceeds to interpret with a preconceived notion of either a ritualistic dictum, an astronomical theory, or a favourite myth. More often than not, the true sense would flash upon the reader's mind, if he would read with the corresponding account of the occasion given in some *Purana* or other.

For a careful and accurate estimate of any literature, the one thing needful is to find out and fix in one's mind the *time* and the *place* wherein it was composed; as also the *nature* and *occasion* of the composition. As research now goes, however in matters Indian, one is surprised to see references in support of a given thesis, quoted indiscriminately from the widest range possible in Texts —from the archaic *Vedas* to the modern *Kavya* literature, equal value being attached to whatever may be found in Sanskrit garb. We, on the other hand, propose to essay a general survey on a chronological plan, if indeed the term 'chronology' may be applied to tradition scattered over vast and hazy distances of time. For this purpose, I have, in another paper,[1] briefly discussed the preliminary questions, so far as the *Rig Veda* is concerned, as to:

(a) Who composed the Riks?
(b) When were they composed?
(c) Where were they composed?
and (d) What is the subject-matter of the hymns?

(a) I quote from that article :—"The seven prominent *Rishis*, whose writings found a place in the *Sanhita* were,

(1) Gritsamada Bhargava,
(2) Viswamitra-Kansika,
(3) Vamdeva Vasishtha,
(4) Bharadwaja,
(5) Atri,
(6) Vasishtha,
(7) Kanva,

and these cover seven "*mandalas*" from the second to the eighth. The first *mandala* comprises hymn-collections of several *Rishis* who had each composed more than one hundred lines or *Riks*, and had become known as *Satarshis*; and the tenth *mandala* comprises all the hymns meant for *Soma* sacrifices, collected apart." The names of all the prominent *Rishis* mentioned above, occur in the *Puranas*; they being descendants of kingly families and connected with ruling houses."

(b) The period over which the composition of *Riks* extended may be roughly set down as six centuries from *Circa* 2000 B. C. to *Circa* 1400 B. C., the

(1) "The Religion of the Vedic Aryans",—(DACCA REVIEW, 1914).

latter date being approximately the date of the great internecine war, known as the *Kurukshetra* War,— after which, apparently, the ancient civilisation underwent a vital change.

(c) Again I quote from the same article :—"In *Vedic* times, Aryan settlements could be found scattered from *Pratissthana* in Afghanistan to the kingdom of *Valeya Kshattriyas* in Bengal ; from Kosala and Mithila on the north to the city of Mandhata, and Chedi and Matsya in the south. Even the *Dakshinapatha* beyond the Narmada, was not unknown. Agastya, brother of the great Vasishtha was the pioneer in colonising the south, and the *Riks* composed by him and his wife. are to be found in the collection. The Bhargavas had their strongholds in Bharoach in Western India, then known after their name as *Bhrigu Kachha*. A branch of the *Aikshakavas* under Mandhata and his descendants established itself on the Narmada ; and Mandhata, Purukutsa, Trasadasyu, and Trayaruna are famous names in the *Rik Veda*. The Kansikas were at Kanyakubja and Gathipura ; and Viswamitra and his Bhojas established themselves in a separate principality in *Bhojapur*.[2] The Vasishthas wielded their power in Kosala north, and were the ministers of Sudasa (Raghu) the great Vedic conqueror and emperor. The Gotamas flourished in Videha under the ægis of the Janakas ; and an offshoot of this family settled in Bengal (Dirghatamas and his son Kakshivan Onsija, and their descendants, being known as the Krishnanga-Gotamas).—— Another branch under Bharadwaja settled at Prayaga in the principality inherited from the Pauravas. Kanwa and the Kanwayanas had their centre on the bank of the Malini River in the *Doab*, and were under the protection of the royal Paurava House. It is evident from the above account that the *Riks* under review were composed not in "the land of the Five Rivers" alone. Vedic sacrifices were performed in all Aryan colonies and settlements then scattered over the vast riverine tracts of Northern India, from Afghanistan to Bengal, in Western and Central India, and even in the Deccan. We will accordingly expect to find and interpret local and personal references according to the country in which the hymns saw the light. In each settlement or principality, the Aryan community was one of the nature of a military outpost in an enemy's country ; settled and organised undertribal chiefs and conquerors, almost always at war with its neighbours, wanting more and more land to occupy, more and more soldiers to fight the battles, and more and more wealth from the rich enemy to be conquered, and reviling it when the tables were turned. Texts bearing on these points will be found in abundance in the collection.

(2) The Viswamitras (or Kausikas) also established themselves in Kausiki-Kachha, at the confluence of the Ganges and the Kosi.

(d) So far as the *Rg. Veda* is concerned, the hymns we have to consider and criticise, appear to have been composed for recitation at the *Yajnas* or sacrifices, performed by chiefs and royalties, or by wealthy citizens. These sacrifices included (i) domestic rites before the house-hold fire, (ii) sacrifices to Indra at full and new moons, and (iii) the grander ones, involving meat offerings and *Soma* oblations ; generally performed by princes and nobles.

This general out-line has to be filled in with details, and the theme elaborated with exactitude—which means the life-long collaboration of many scholars. I have so far been able to deal with only the merest fringe of the subject ; and *that* also, in respect of only one of the *Vedas, e. g.* the *Rg. Veda.* Here I have much pleasure to refer to the very reasonable re-arrangement of the Riks proposed by my son, Prof. S. C. Sarkar, M. A. of the Jagannath College, Dacca. His suggestion is to classify and collect together Riks according to the clans or families of *Rishis*, and then to place them in groups within the class, in genealogical and chronological sequence. In respect of the verses which do not admit of being so treated, he suggests allotting them to a separate section consisting of isolated *Rishis* and *Rajarshis.* Under the first section, he has given tables with short explanatory notes and enumeration of Riks *e. g.*

* "The Rg-veda re-stated" (Jagannath College Magazine 1913.

TABLE I.

The Bhargavas.

1. Sunakhepha-Devarata (see the Kausikee groups).
2. Gritsamada-saunaka.
   —R. Y. II 1-3, 23-26, 30-43.
3. Somahuti—II, 4-22.
4. Kurma son of Gritsamada. II 27-29
5. Usanas son of Kavi. VIII. 84 and IX 87-89.
6. Nema. VIII 100.
7. Jamdagni nephew of Viswamitra. VII 101, IX 62 and probably 65 ; X 110 and (X 167 jointly with Viswamitra, also parts of IX 67 and 107, and X 137).
8. Prince Playoga VIII, 102.
9. Kavi, son of Bhrigu IX 47-49, 75-79.
10. *Bhrigu, son of Varuna IX 65 (probably).*

8. In the other tables, he has similarly dealt with the Kausiskas, the Vasishthas, (including the Agastyas) the Gautamas, the Angirasas (including the Midha Panchalas, the Kanvas and the Atreyas.

Under the 2nd Section, he mentions the Kasyapeyas, the Ailas, and the race of the first Manu.

In explanation of table I ; as above described by way of example, the following genealogy is appended by him :—

D. of Hiranyakasyapa (Divya) = Bhrigu = D. of Puloma.

(12 *Deva* clans) | Kavi | Chyavana = Sukanya g. d. of Manu VII.

D. of an Indra (Yajani) = Nsanas Kaiya | Aknuvana = Ruchi, (d. of Nahusa) | Dadhichi ?

Devayjani = Yayati | Urva (migrated to the Gomati)

(The Yadavas) | Richika-Aurva = (L's. d. of Purukutsa and sister of Visvamitra)

Arjuna Sahasrabahu (Contemp of *Jamadagni)* | Jamadagni | (Sunahaepha afterwards Devarat)

Jayadhvaja | Parasurama.

Taljangha (Contemp of Parasurama)

Vitahabya (afterwads known as *Sunaka Bhargava)*

Gritsamada-Sanuaka

Kurma.

According to the Paurani lists embodying the names of princes common to the Agni, *Vishnu* and *Matsya Puranas*, Arjuna-Kartabiryya-Sahasravahu was twelfth in descent from Yajati. This establishes the age in which this great Haihaya prince and the Great Rishi Viswamitra flourished. Counting from Manu VII (Vaivaswata). whose daughter's descendants both were, they would be between the eighteenth generation on one hand, and the fifteenth on the other ; that is, at the average rate of 25 years per generation, the period would cover 450 or 375 years ; or, say, four centuries. The time would then be about the sixteenth century B. C. It would also appear that Bhrigu was either a younger contemporary of Manu or later in age than him by a generation or two. In the *Puranas*, Bhrigu's name occurs as one of the seven Patriarchal families of Rishis.

The above illustrates the way in which the authorship of given Riks classified according to gotras of Rishis, may be fixed in order of time, in the light of genealogical information gleaned from

the *Puranas.* The subject matter treated of in those Riks it will be possible then, to interpret and weigh in their intrinsic worth, and allusions and references occurring in the context, will then be more fully understood. Continuing the consideration about the Bhargava family of Rishis, it may be noted that from the time of Yayati and his son Yadu, they blended their fortunes with those of this branch of the *Ailas* (afterwards known as the *Yadanas.*

When the *Rg. Veda* has been arranged on some such plan as sketched and illustrated above, the original text of each group will have to be studied, and translated by different scholars in as many different ways as possible whether ritual etymological, astronomical mythical or historical. These meanings will have to be subjected to general criticism and thereafter, the meaning accepted by the majority of historical critics from the common sense point of view, might be taken as a basis for building whatever historical matter may be derived therefrom. Here it is necessary to emphasise, that when Vedic literature ceased to be composed, and centuries passed by, wherein it grew to be the cherished heritage of Aryan culture and annotators began to appear on the scene, there was a school of annotators who were known as the "*Aitihasikas*" or historians. Yaska in the fifth century B. C. in interpreting the Riks mentions them as also the Nairnktas (those who interpreted the Riks in their etymological sense). The historical treatment of the Vedas, will not therefore be altogether *an innovation* without a precedent.

In a way similar to that applied to the *Rg. Veda*, the other *Veda* and all their *Brahmanas* will have to be restated, reviewed and scrutinised. It would thus be possible to have information obtained from one source, tested and corrected by corresponding reference in another.

Side by side with a modern redaction of the *Vedas* and the *Brahmanas*, all the important *Puranas* will have to be critically edited, in so far as they would yield historical matter. Mr. Pargiter, as a pioneer in this field of research, has already given us a reasoned and corrected version of Puranic genealogies, in his article 'on "Ancient Indian genealogy and chronology", published in J. R. A. S. and in his subsequent work, "The Dynasties of the Kali Age". He has however, taken the account of the so-called Solar dynasty, as the *standard*, whereby he has tried to correct the other dynasties *e g.*, those of the Jadavas, the Haihayas, the Kanyakubjas etc. This, we are afraid, is not quite correct and can be easily challenged on many points For one thing, Mr. Pargiter has not taken the Vedic account of the princes occurring in many of these dynasties into consideration, and has thereby let go a valuable corrective. For another, it does not seem to have struck him that the dynasty of Manu VII. in the main and

male line established itself, *not in the Sacred Panchanada*, nor in the Madhyadesa, but farther east in Kosala north and south; and that branches of this race, established principalities in different centres of the eastern region where Vedic ritualistic civilisation did not thrive. The *Rig Veda* gives prominent reference to the Ailas, the descendants of Manu VII. through his daughter Ila, and the Aikshakavas and others of the so-called "Solar" race are hardly to be met with therein. Remembering that tradition preserved by Rishis and priests would be closer and more accurate in the case of rulers who supported them, than what would be the case in regard to princes who did not care for ritualistic sacrifices, it would be more reasonable to suppose that the genealogies of the *Ailas* and their offshoots preserved, are generally more reliable than the lists of "Solar" kings to be found in them, or in the *Kavyas.*

Instead of making one given dynasty the standard to go by, it will be fitter, in our opinion, to test every genealogy found in the *Puranas* by means of selective lists of names common to all, and by the application of synchronisms gathered from all sources—*Vedic* and *Pauranic.*

I have prepared dynastic lists on this plan from the *Agni*, the *Vishnu* and the *Vayu* Puranas in respect of (1) the Yadavas, (2) the Haihayas, (3) the Dvimidhas, (4) the Pauravas, (5) Kanyakubjas, (6) the North Panchalas, (7) the South Panchalas, (8) the Kasis, (9) the Anavas (10) the the Aikshakavas, (11) the Magadhas, (12) the Videhas. There would not be place in this article for these detailed lists; but by way of comment, it may be noted that against 69 generations of Yadava princes from Manu, 19 of the Haihayas, 55 of the Pauravas, 18 of the Dvimidhas, 15 in Kanyakubja line, 23 amongst the North Panchalas 22 of the South Panchalos 35 in the Kasi line, 44 in the Anava dynasty, 96 in the "Solar" line, 16 in the Magadha line and 56 in that of the Videhas, as shown in the genealogies collated by Mr. Pargiter in the J. R. A. S. We get in these common lists 39 generations in the Yadava dynasty from Ila Budha, 20 generations in the Haihaya dynasty, 12 in the Dvimidha line from Yavinara, 33 in the Paurava family, 13 in the Kanyakubja family, 25 in that of the North Panchalas, 12 of the Kasis from Suhotra, 32 in the line of Anu, 51 in the "Solar" line from Ikshaku, 32 of ths Magadhas, and 56 of the Videhas from Ikshaku. These latter show that certain famous names were somehow omitted from the genealogies in one or the other of the *Puranas e.g.*, Marutta, Kambalavarhis, and Tittiri from among the Yadavas; Tansu or Tritsu, Ilina, Hasti, Janmejaya II, Trasadasyu, Dilipa, Supotra and Yanmejaya III amongst the Pauravas; Sudasa, Saudasa Sahadeva, Prishata, Drupada, Dhrishtadyumna and Jantu amongst the North Panchalas;

Janmejaya in the South Panchala line; Kshattravridha and Gritsamada in the Kasi dynasty; Adhiratha in that of Anu; and Kakustha, Sudasa and Vrihadvala in the "Solar" line. If we get interconnecting anecdotes and accounts of these kings in the literature under review, we will be justified in inserting them in their appropriate places in the dynastic lists. Instead of the Solar line of the *Aikshakavas* being in the result regarded as acceptable as a correct measure of ancient dynastic succession, we find that the genealogies of the Yadavas in Western and Central India, of the Pauravas in the Punjab and the Doab, and of the Anavas and Magadha in the East, were probably more accurately maintained, because of their greater activities in conquest and colonisation, whereby the kingly names therein were more popularly and widely known and rememberd.

According to the Paurani tradition, Indo-Aryan dynastic age begins from Manu VII (Vaivaswata). It was his daughter Ila who settled and ruled in the Kabul Valley and was the progenitrix of the "Lunar" line of kings; and his son Ikshaku who established at Ayodhya (Kosala) the royal "Solar" line. The ruling Aryan dynasties of pre-Vaivaswata centuries probably flourished somewhere in High Asia, though references to an Aryan colonisation of India more ancient than the time of Manu VII, are not wanting in the Puranas. For instance Prithu-Vainya 14th in descent from Swayambhuba Manu, from whom India is believed to have been named *Prithivi* is described as the first king of India who performed the *Rajasuya* and became the ancestor of the *Kshattriyas*; and Bharat, sixth in descent from the same ancestor, to whom was allotted the kingdom south of the Himvan, gave his own name to the country be ruled over, (Bharatabarsha). Anga, grandson of Chakshusha Manu, (Manu IX) married Sunitha, daughter of Vaivaswata-Yama; and hence can be regarded as a contemporary of Vaivaswata Manu. That is to say, that, between Bharata I, and Manu VII, there is a difference of six generations, or a century and a half.

There is no mention of the antecedent Manus in the *Rg. Veda*, (except perhaps that of *Pita Mami* or father Mami, who may be identified with Swayambhuba-Mami); the hymns mainly dealing with the ritualistic worship introduced by Manu VII and his daughte Ila. It is admitted by scholars that the Riks collected in the *Rg. Veda* Sanhita were composed in Aryan India, including, of course, the Kabul Valley. This accepted tradition tallies with the dynastic tradition, to be found in the historical section of the ***Puranas***.

From what has been said above I believe it has been made clear that a connected dynastic account of Aryan princes from the earliest times can be gathered from literary sources which

have so long been neglected. Before proceeding to that task, it will be both convenient and necessary to place before the reader a geographical description of countries and climes where Aryan civilisation grew, and whence it extended. In some of the *Puranas*, some information, often conflicting and confused, can be had under the heads. "*Bhubana Kosha*" or "Geographical Description." This information can not of course be verified owing to the changes that have occurred with the lapse of ages, and to the old names of mountain, rivers, etc., having been long replaced by others. Still it is not altogether impossible to make an intelligent guess as to the position and situation of the tracts concerned, from the mass of matter yielded by the *Puranas*—This will be attempted in another paper.

I submit this hurried sketch for the consideration of Indian scholars engaged in research in the field of ancient Indian history, and not to show that I have yet been able to discover any historical fact in connection therewith, that can be placed side by side with those that are vouched for by coins, inscriptions or archaeological remains. The point is, that references in contemporary records of persons and events, should not be brushed aside, simply because these are literary, and not embossed on metal or engraved on stone. If this paper succeeds in directing attention to the hitherto neglected sources from which I have drawn, and in proving an incenitive to a systematically critical and scholarly study of India's *ancient literature* from the of view of *history*, I shall be happy to consider my humble labours amply rewarded.

S. C. SARKAR, M. A., M. R. A. S.

THE DAYS OF THE HINDU CALENDAR.

In selecting the subject of my lecture this evening I was guided by two considerations. One was that in the midst of modern western education it is sometimes desirable to look back upon the past however dim it may appear to us now. This is desirable not only because the present can not be understood without the past but also because the best corrective of the conceit of the present is a study of the past on which the present stands. The rapid strides of modern science make one's head giddy and a bewildering sense overpowering the historical repose of mind makes the past struggles of man to discover truth look like child's play. We forget that the world could give birth to a Newton only because there had been a Kepler born, and the birth of a Kepler became possible because of the previous birth of a Copernicus and Galileo. If the modern science of the last century

is so rich, it is because it has inherited the legacy of past generations which accumulated knowledge little by little in the course of many centuries. The other consideration which influenced me to choose my subject is the fact that foreign culture imbibed from boyhood tends to engender a bias of education which belittles what is indigenous because it is unknown and unlearnt. Theological and philosophical doctrines of the Hindus are at the same time so often dinned into our ears that we have almost begun to think that the people in ancient days lived a life of austere asceticism, seeking temples and groves to worship their deities and to meditate on the Great One. That they had other spheres of activity, that they developed a state of society in which were represented various departments of temporal knowledge, though repeatedly shown in history, are often lost sight of. Such a one-sided view of Hindu civilisation tends to distort the true perspective and to create a morbid sentimentality which the rough contact with the west does not always succeed in curing.

As an example, I have selected a topic with which we are all familiar. It will be unnecessary to deal with all the different kinds of days reckoned by Hindu astronomers. I shall confine my remarks to six different days, three of which are purely scientific while the other three though scientific in principle are presented to us in a garb of mythology. As a connecting link of the two sets of days I shall introduce the origin of week-days which though based entirely on astrology have been exercising an influence on the doings of a Hindu for at least two thousand years.

It is unnecessary to define the word day. We know that it primarily means the time between the rising and setting of the sun i. e. the time during which there continues to be light in contradistinction to night; secondarily, the word means the period of time between two consecutive sunrises. It includes a day proper followed by a night, or a night followed by a day.

The most natural day is what is caused by the sun's appearance above the horizon. Everyone knows that the sun rises in the east and makes the day (Diva). He moves in the sky from east to west, and then disappears below the horizon. We are then in darkness. It is night. Man begins his work with the rising of the sun and takes rest when the sun sets. The Vedic Rishis used to begin their sacrifice with sunrise and therefore connected the day with sacrifice. They named the day Savana divasa, the sacrificial day as distinguished from another day—the moon's day. It was the time for extracting the juice of the Soma plant and offering it to the gods after the morning ablution. The name savana divasa thus became current in Sanskrit language and meant a natural day.

But the Hindu astronomers were not satisfied with the name which bears no

connection with a natural event. They invented another word, and called the natural day, Bhu-divasa, the earth's day. The exact significance of this word will be seen later on.

But all the days are apparently alike. The sun rises and sets ; each day is followed by a night There is no mark by which one day can be distinguished from the next. Today is exactly like yesterday, and will be so tomorrow. It does not take long to notice that the moon is different from the sun in this respect. On some nights the moon is not seen, while on others she is seen, but in different shape. On some nights she appears full round, on others of other shapes. The nights are therefore better distinguishable than the days. The Vedic Rishis called those nights on which the moon is not seen Amavasya, literally the night on which the moon remains with or in conjunction with the sun. It is easy to count 30 nights between two consecutive Amavasyas or Newmoons or between two Purnimas, Fullmoons. These thirty nights, each followed by a day, were named *tithis.* The Rishis counted days, divasa, by nights.

The moon was adopted in every country as a measure of time. In Sanskrit she is Masma, in Anglosaxon mona, in German mond, Greek mene, all from the root Ma to measure. The word month is really moonth, Greek men, Latin mensis, Sanskrit masa. Hence the word month or masa is really a lunar period of 30 nights.

Thus the Jews began the day at sunset, and a Jewish day extends from sunset to sunset. The Mahommedans count the day also from sunset. It is the first moon visible which regulates their calendar. The English word Newmoon implies the same, though it now means conjunction, Amavasya. The reckoning of fortnights—a period of two weeks—shows that nights were counted as we count days. In the Hindu calendar all important festivals and ecclesiastical dates are determined by moon-days, the *tithis* excepting a few which were introduced later and are determined by the position of the sun.

While observing the moon the Vedic Rishis watched the stars and noticed that these were fixed as if on the concave surface of a sphere, and that the moon moved among them from west to east. The stars were grouped and the groups or constellations were given names. There was no necessity for naming all groups of stars in the heavens. The constellation which lie along the path of the moon were named, for they are the mile-stones in the path. The Rishis observed that the moon takes 28 days, rather 27 days, to move from one constellation (Nakshatra), and to return to it. Therefore they counted and named 27 Nakshatras. The moon was imagined to reside with each in succession. Hence the moon was called the lord of the nakshatras. It is well to remember that the moon in Sanskrit is a male person and the 27 nakshatras

female. The Sanskrit month-names are all derived from the names of the nakshatras, in which the moon appears full.

The Rishis, like early man, watched the periodical occurrence of the seasons, such as winter and rains. They noticed that the constellations which rise in the east or pass the meridian when the sun sets seem to approach the sun. Those that are seen in midheavens today at suuset will be seen on the west a few days hence. Either the stars move towards the sun or the sun towards the east among the stars. But the stars are fixed, and the moon is actually seen to move from west to east even during a night. Hence the sun also moves, though slowly, from west to east.

It was noticed that when the sun is close to certain constellations rains begin and when close to others winter comes on. It was further noticed that like the path of the moon the path of the sun also lies somewhat oblique. For some days the sun appears near to zenith at midday. The days are then long, and the nights short. When he is seen low down the days are short and the nights long. With the long days rains begin, with the short days winter. The seasons could not be mistaken ; and these gave the Rishis the division of time called the year. They named the year Vatsara the period of time in which the seasons (Ritavah) lie (Vasanti). They expressed also the period by the word Sarat (winter). We shall see further on that the home of the Rishis was in a very cold country. The people of England can appreciate the advent of summer after the rigours of winter. They express the year by summer. Their hearts glow at the sight of a dear friend, and they give him a *warm* reception. We who live in the Tropics know what the rainy season brings to us. The four months from the beginning to the cessation of rains were to students and pilgrims a period of inactivity. Even the Sun-god himself goes to sleep. The rivers swell sometimes overflowing the banks. Our hearts gladden at the seasonal rain which ushers in a rich harvest. Our hearts cool at the sight of a friend ; we offer him cool water to wash his hands and feet with and make him cool. It is natural for us to mark the year with Varsha, the rain.

The Vedic Rishis counted the days of the year and found the number to be 360. Many other ancient nations counted the same number. From this counting they divided the circumference of a circle into 360 parts or degrees. The year was divided into 12 sun-months, each of 30 days ; for, the moon month consists of 30 days.

Thus the foundation of the Hindu calendar was laid during the pre-Vedic times. It required improvements and precision. It was found that the moon does not actually take 30 days to come to be in conjunction with the sun, but half a day less. How to keep the number of *tithis* 30, yet to make the length

of the moon month accurate? It was done by giving an artificial meaning to the word, *tithi*. If the sun be assumed to be fixed, the moon describes 360° with reference to the sun in 30 tithis, on an average of 12° in each. The tithi was therefore declared to be that space of time which the moon takes to separate from the sun by 12°. This is the meaning of the term in the Hindu calendar.

Similarly, the path of the sun, the ecliptic, was mathematically divided into 27 equal parts, and each called a Nakshatra. The year was found to consist of 366 days, and a new meaning was given to the word day, 360 of which make up a year. The day was named *saura* of the sun.

It will be now clear why I have avoided employing the familiar terms lunar day and solar day. In English astronomy a lunar day begins when the moon departs from the meridian. In Hindu astronomy it may begin any time, as soon as the number of degrees of distance between the sun and moon becomes divisible by 12. For similar reasons I have been obliged to use the sanskrit term savana divasa, or natural day, instead of the familiar word civil day. The reason is, the savana divasa commences at sunrise and is continuously counted till next sunrise; whereas the civil day of the Europeans commences at the preceding midnight. Hence when a Hindu says, for instance, that he will start for Calcutta tonight, he means sometime within the night which does not end until next sunrise. Hindu astronomers, however, begin their day at the preceding midnight at the Meridian of Ujjayini, just as English astronomers begin their day at mid-day at the meridian of Greenwich.

Instruments were invented to measure the lengths of the days and it was found that the natural day is variable in length and therefore unsatisfactory as the unit of time. The early Hindu astronomers watched the passage of stars through the meridian and found that they take the same time to depart from the meridian and return to it. The time is invariable in length. It was called star's day—Nakshatra divasa, and adopted as the standard of time. The day is divided into 21,600 Pranas or respirations. As the equator, like every other circle, is also divided into the same number of minutes of arc, a minute of it takes 1 respiration to revolve. This unit of time was named Prana or respiration as the time of a respiration is usually the same, 4 secs of our watch.

The star day of Hindu astronomy is practically the same as sidereal day. In all modern observatories the standard clock keeps sidereal time. When the average of all the natural days of the year is taken, it is found to be 3 min. 56 secs. longer than the sidereal day. But once we get this measure, we can regulate our clocks by the sidereal time as the Hindus did their water timekeepers.

The three days, the civil, lunar, and sidereal are the important days of the Hindu Calendar. These came into use before Christ. The other days of which I am now going to speak are of different order. They represent certain astronomical facts.

Of these the division of time into the week is imaginary and entirely based on an astrological belief. The seven planets known to the ancients are the Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Satet. The sun and moon were called planets, because they move, and are not fixed like the stars. They were supposed to move round the earth as centre in circles called orbits. The most distant is the orbit of Saturn, which appears to move most slowly. Then are the orbits of Jupiter, Mars, the Sun, Venus, Mercury, and lastly the Moon, which is the nearest to the earth. The day was divided into 24 horas or hours, as it is done now, and the seven planets were believed to preside over them in succession. Now 3 times 7 give 21 hours; 3 hours remain over. Therefore the third planet of the series in descending order rules over the 24th hour, and the fourth one over the 1st hour of the next day and over the day itself. The division into week days appears to have been introduced into India from a foreign source, probably the ancient Chaldeans by the Greeks. The Chaldeans were experts in astrology and many an astrological belief of the Hindus can be traced to external sources, the Yavanas of Sanskrit literature. The source having been one, the system has been the same everywhere.

The ancient Hindus, however, had days consecrated to the Fathers, the souls of deceased persons corresponding to the *manes* of the departed of the Romans. These days--the days of the Pitris have astronomical significance, and represent indeed an astronomical fact. The Pitris are supposed to dwell in the moon. They see the sun from the moon as we do from the earth. There is, however, difference in the duration of their day. They see the sun for fifteen of our days and are in darkness for a similar period. For at the time of new moon, the side of the moon opposite to us faces the sun. It is then the mid-day of the fathers. At the time of full moon the side opposite to us is in darkness. It is then midnight with the Fathers. The 8th tithi of the dark half of the lunar month is thus their morning, and the 8th of the light half their evening. This explains why funeral oblation is made by the Hindus on Newmoon days when it is mid-day, the time of taking meals of the Fathers.

Now I pass on to the day of the Gods It is said that a year of mortal man is only a day and night of the Gods. How this reckoning arose requires some explanation. First, let us consider whether such long days and nights occur anywhere on the earth. To persons

living at or near the poles, the year consists of a day and night only. The sun takes six months to travel up from the south to the north, and another six months to move down from the north to the south point of his path. These are the two *Ayanas* courses of the sun and divide the year into two halves. There are reasons for believing that the Vedic Rishis made similar division and begăn the year from the vernal equinox —when the day and night are of equal length in spring, corresponding to the 21st March of our present times. They regarded the course from the vernal to the autumnal equinox on the north of the equator as the first half of the year and called this portion of the sun's path Deva-yana—the path of the gods. The southern half of the sun's path which the sun describes in another six months was called the Pitri-yana—the path of the departed souls, and sometimes Asura-yana— the path of the demons. Now, the gods of the Rishis lived with them near the North Pole. They mixed with the men on occasions and led a life similar to ours. To persons living near the north pole of the earth, the equator and horizon coincide, the Deva-yana lies above the horizon and Pitri-yana below it. To them the sun neither rises nor sets for six months. In other words, there is perpetual day for half of our year, and perpetual night for the other half. It is remarkable that in the very old Brahmana literature we meet with a passage which says, "That which is a year is but a single day of the gods." The statement is remarkable, because during the times of the Brahmanas the astronomical knowledge was not so advanced as to enable the Rishis to fabricate a fact by mathematical calculations as we do now. The statement is also found in Iranian literature. In the Rig Veda itself a Vedic bard says, "We have, O Asvins, reached the end of darkness ; now come to us by the Deva-yana road", clearly referring to the long nights due to the sun remaining below the horizon. The tradition of a day six months long is common in Sanskrit literature. It can only be explained on the hypothesis that it was originally the result of actual observation. In the Mahabharata, for instance, we are told that "At the north pole the sun and the moon go round from left to right every day, and so do all the stars". The very word 'Uttara' north, implies that it is the upper point of the heavens. The north can not be overhead or upper except to a person at or near the North Pole. These and many other passages have been quoted by Mr. Tilak which go to show that the earliest home of the Aryans was near the farthest north and that the day and night of the gods were matters of observation. Now I come to consider the longest day reckoned by Hindu astronomers. It is the day of Brahma, the creator. His day is such a long period that it is necessary to proceed from its smallest subdivisions. It is said

that 360 days of the gods make their year in the same way as 360 days of the mortals do theirs. Twelve hundred years of the gods make the smallest division of Brahma's day. It is equal to 432000 years of ours and called the Kali-yuga. Ten times this is the largest division—and called a Maha-yuga. A thousand Maha-yugas is a day of Brahma. His night is of equal length. At the end of each day of Brahma, all creatures are destroyed.

This division of time with slight variations is met with in almost every branch of Hindu literature. The question naturally arises : Is this a variation of unbridled fancy, or does it represent some theory of astronomy and serve any useful purpose ? We shall presently see that the Yuga division is an astronomical device and serves the same purpose as astronomical epochs. No event can be placed without a fixed starting point. Dates are referred to, some fixed point often arbitrarily chosen. Thus according to Europeans 1915 years have elapsed since Christ was born. An event which happened before Christ is dated B. C.— before Christ. So Christ is the starting point of historical events in Europe. The Hindus have many starting points the latest is the conquest of the Scythians—the Sakas. It corresponds to 78 years after Christ. Another is called the beginning of the Kali-yuga. It corresponds to 3102 B. C. These starting points are called epochs which form the beginning of respective eras.

Chronology is based on method of computing time. The creation has been the starting point of many chronologies. Thus the Jews reckoned time from the creation, which they dated at 3700 before Christ. Bishop Usher (17 cent.) and many others dated the creation from facts given in the Bible at 4004 B.C. The era of Constantinople adopted in Russia dates from the creation fixed at 5508 B. C. Now if we take the word creation in its real sense, these dates will appear ridiculous to modern science no less to the Hindus. They say that the age of the present creation is not to be counted by thousands but by millions of years. Indeed they claim an antiquity at least as old as the civilisation in Mesopotamia which is dated 7000 B. C.

The creation in Hindu chronology in the morning of Brahma's day means the creation of the solar system, the earth and the planets separating from the womb of the sun. The sun is therefore named the Savita,—the generator. According to the Hindus this took place some two thousand millions of years ago, and that the earth became fit for life twenty millions of years after the formation of the earth. Modern Physicists, geologists, and biologists have attempted at various times to assign an age to the earth. I need not repeat their estimates which are based on certain known laws of nature and arrived at with great care. I should, however, point out that if the Hindu

estimate is somewhat in excess, the error is on the safer side. The Hindus would regard the estimate of one hundred millions guessed by modern science rather too small.

But how did the ancient Hindus arrive at their estimate? It was not mere idle speculation delighting in æons, but certain astronomical facts which led to the theory of creation. The Hindu cosmogony or theory regarding the origin of the universe is as much astronomical as the modern Nebular hypothesis. The idea that the world has not been for ever in the form in which we see it, but that there was a time when it existed as a mass without form—a chaos—is not new to the Hindus. The chaos of the Greeks and the *ap* of the Hindus out of which all things were formed corresponds to the nebulous masses of modern astronomy. I have no time to describe in detail the process as found in astronomy, in Purans, in the codes of sacred laws of the Hindus, but would content myself by stating that the Hindu cosmogony takes account of the forces of contraction and repulsion as necessary for the evolution of the world. The account is substantially the same as that given by Kant in the 18th cent. He was the founder of the modern nebular hypothesis. He was struck by two facts of astronomy. One is that six planets and nine satellites (the number then known) move round the sun in circles not only in the same direction, but very nearly in the same plane. The Hindus of course did not know the existence of the satellites excepting the moon—the satellite of the earth. Neither did they know that the sun himself resolves on his axis. These have been discovered with the help of the telescope. But the absence of knowledge of these facts does not weaken the general conclusion. Kant argued that the common direction of motion of the planets in very nearly in one plane could not but be the result of some common cause. Yet there is no material connection between the planets which could make these take up a common direction of motion. It is natural to suppose that there was once some such connection. The space of the universe must surely have been filled at the beginning with original elements of the bodies of the solar system. Herschel (18th cent.) examined with a large telescope the nebulœ—the irregular masses of soft, cloudy light—found in the celestial space, and suggested that the stars were formed by a process of condensation of vapoury mass or nebula. Laplace, the celebrated French mathematician, early in the last century reasoned on lines similar to those of Kant and thought that the original material was nothing else then the atmosphare of the sun which once extended so far out as to fill all space now occupied by the planets.

This is an outline of the celebrated nebular hypothesis. It seems to me

that the early Hindus argued in a similar manner. The very word *yuga* implies junction, combination; and the periods though immensely long are not vague but expressed in human years. The date for framing a hypothesis regarding the origin of the universe were undoubtedly insufficient, but it must not be supposed that the result was erroneous, or the reasoning illogical. It was known to the Hindus that the planets all move in circles close to one another, and in the same direction; that they excluding the sun and including the earth are all dark bodies, shining only by the sun's light. Indeed they thought that the stars were also dark bodies and shine only by borrowed light. They also believed that the planets moved with the same velocity, and, that their unequal motion forward or backward, was not real but apparent. Given these, it may not be impossible for an intelligent man possessing speculative tendency to imagine a condition similar to what is implied by the nebular hyyothesis.

This was aided by a mathematical process, required in astronomy. In calculating the place of a planet for any date the first step is to obtain its place on some preceding date, the epoch. The latter place is known from old records. Given this place and the number of days or years elapsed since then, and the rate of motion of the planet we arrive at a place which the planet would occupy had it moved uniformly at that rate. The place thus found is called mean, and the imaginary planet, mean planet. The epoch may be any date, it may be Jan. 1. 1800, or Jan 1. 1850, or 3102 B. C. Given the present position and the rate of motion, it is easy to calculate backward and find the place on any previous date. Given the present positions and the rates of the motion of all the planets it is easy to calculate the time when they all met at one place. There is no speculation in it, but simple arithmetic. In this way the Hindu astronomers found that the mean planets *i. e.* the fictitious planets all moving with uniform motion, met together 3102 before Christ. This is called the beginning of the Kalijuga. The length of the yuga is 432000 years, at the end of which the mean planets will meet again. Kalijuga has been a very useful epoch in Hindu astronomy. It is the starting point in the calculation of the places of the planets, with the help of astronomical tables.

If we calculate the places backward it is found that the planets did not meet near one other and not at the same degree, minute and second. If we take a period longer than the period of the Kaliyuga, say ten times longer, we arrive at the great age—the mahayuga. At the beginning of the mahayuga all the planets met together, and will meet again at the end of the period if the laws of nature remain the same as they are now.

It seems that there was a school of Hindu astronomers who held similar views regarding the earth. The history of the origin of the theory is lost in obscurity. We find however, distinct mention of the theory first in the astronomical treatise of Aryabhatta. He worked in Pataliputra, Modern Patna, in the first half of the 6th Century A. D. In giving the periods of the planets he makes the remarkable statement that "in a Mahayuga the earth *revolves* to the east 1,582,237,500 times." In other words, the diurnal revolution of the starry sphere is due to the earth's rotation towards the east. In another place Aryabhata declares that as a man in a boat moving forward sees a stationary object on the shore as if moving backward so to the people in the equator the fixed stars seem to revolve to the west."

Now we understand why the natural day was given the name Bhu-divasa, the day due to the earth's motion, exactly as the lunar day was named Chandradivasa, the day to the moon's motion. That the theory of the rotation of the earth was at one time current in India is proved by the fact that later astronomers who tried to refute the theory did not however hesitate to use the word Bhu-divasa themselves in their own works. There must have been a reason for introducing a new word, the earth's day—a word which bears on its face the distinctive mark of a novel idea.

I have no time to describe the history of the Copernican theory which produced a revolution in the conception of the people in Europe. For fourteen centuries Europe was satisfied with the old conception of the earth's fixity in space. And none dared to go against the accepted doctrine. In India freedom of thought is unparallelled, and Aryabhata was not persecuted.

The ancient astronomers knew that the earth was round. They also knew the cause of eclipses. The moon like other planets was known to be a dark body. This explains the origin of the reckoning of the day of the Fathers. From the same we infer that the Hindu astronomers were aware that the same face of the moon is always presented to the earth. In other words, astronomically speaking, the moon rotates on her axis in the same period as she revolves round the earth.

But did the school of astronomers hold that the planets including the earth revolve round the sun? Pandit Bapudeva Sastri of Benares and Mr. Ramlingam Pillai of Madras have ably proved from facts of Hindu astronomy and the latter from a rare commentary of Aryabhata that the ancient astronomers of India held that the sun was the centre of motion of the earth and the planets. It is difficult to condemn the arguments. I shall however quote a statement of Varaha, a contemporary of Aryabhata from his work Brihat-samhita.

There he describes the qualifications of a person who wishes to be recognised as an astronomer. Among these he says that "an astronomer should be acquainted with the earth's revolution, rotation, and position in space." His exact words are "Bhu-bhagana-bhramana-samsthanadi." What can be a stronger and clearer evidence than this bare statement? Seeing that the later astronomers kept silent on the theory, the statement of Varaha is startling indeed. It is further to be noted that Varaha did not think it necessary to say anything in explanation of his statement, because, I fancy, it had been a current doctrine. Aryabhata wrote his work at the young age of 23. It is not possible for any young man to proclaim a new theory which was likely to go contrary to accepted doctrines and at the same time command respect of his contemporaries and successors, not only of India but of Greece and Arabia. We may therefore safely assert that he did not propound a new doctrine. In fact he himself disclaimed originality and concluded his treatise thus :—"The science of astronomy is a veritable ocean. It contains real and false gems of knowledge. I, riding in the ship of my intellect entered into the ocean, dived into it, and by the grace of the self-existence have brought to light the precious gems of true knowledge. For, in ages past the astronomy which lay hidden in the Vedas and made known to the world by Brahma was true". What this latter statement implies need not be at present emphasised.

I shall now conclude this brief sketch. We have seen how every Sanskrit word denoting a day contains within itself a long roll which can be unfolded only with patience. The central idea of the day is the appearance or visibility of the sun. When the sun is seen from any side of the earth, it is day there and night on the opposite side. Thus we get the earth's day. When any side of the moon is towards the sun, it is day there, as the day of the Fathers. When the sun is seen from the stars, as he is seen at Full-moon from the moon, it is star-day. The gods believed to dwell at the North-pole see the sun when he travels above the equator. It is then the day of the gods. Brahma looking down upon the sun from an immense distance sees the sun-shine. As long as the sun shines, so long is a day of Brahma. Every day is followed by a night. In the twilight of the evening of Brahma's day the sun goes out and with him the world becomes lifeless. During Brahma's night creation remains at a standstill, the sun with the planets form one formless inert mass. With the dawn evolution begins again and the existing order of things reappears in the morning. Another day passes with the same cycle of events. A year of Brahma consisting of 360 of his days rolls by, still the same cycle is repeated. But Brahma's life is not infinite, as infinite as time. He even is mortal, and with the expiry of the

hundredth year of his life, the universe dissolves into nothingness. There is chaos, "a dark illimitable ocean without bound, without dimension, where length breadth and height, and time and space are lost". Or as Manu, the ancient man, has said, "this universe was inert, without definition, beyond ken. as if the whole was in deep slumber. Then the Great Self-existent willed to evolve the universe. He put energy into the all pervading primeval matter emanating from Him. It assumed the shape of an egg, as brilliant as the golden coloured sun. In the egg He entered as Brahma, the creator of all the worlds".

In other words, there was cosmical evolution at the will of the One. Brahma is no other than His will working in the creation, and Brahma's day is nothing else than the existing order of things in the Universe the blue boundaries of which appear to us as the outline of an egg.

The period of a Mahayuga has also been of great use in expressing the periods of revolution of the planets. We say that the sun takes 365 days, 6 hours, 9 mins, 9.314 secs. starting from a star to complete a revolution or 365·256 35781 days. The Hindu astronomers would express the same fact by stating that there are so many days in Mahayuga. This method does away with the necessity of using fractions which are difficult to remember. The ancient Hindus have given to the world the decimal system of notation and it is no wonder that they devised this elegant method of avoiding fractions It is to be further remembered that the Hindu astronomical works like many other works are all metrical compositions in which fractions of numbers can hardly be introduced without violating the canons of versification.

The Yuga system of the Hindus has been misunderstood and much criticised. Adverse critics have adduced the system as an evidence of the Hindu's fondness for exaggeration. We are not concerned here with the use of the system in the Puranas as chronological data, nor with the accuracy of the origin. But when rightly understood, the conception of the great cycles by the ancient Hindus would do credit even to modern science. Indeed Laplace the celebrated French mathematician of the last century actually proposed a universal epoch somewhat similar to that of Hindu astronomy.

In the explanation of the theory of cycles and of Brahma's day we have assumed that the sun forms the centre round which the planets including the earth are revolving. For if the earth form the centre, the idea of the evolution of the planets from the sun becomes extravagant. The question therefore is : Did the Hindus, or at least the Hindu astronomers believe the sun to be the centre and the earth a planet of the sun ? Did they believe that the cause of the alternation of day and night is the whirling of the earth like a

spinning top? Modern science, declares that the earth is not fixed, but that it rotates on its axis and while rotating from west to east it is travelling round the sun at an enormous speed. These are accepted doctrines based on actual experiments and observation.

JOGES CHANDRA ROY.

THE SCOPE OF BIOGEOGRAPHY

BY

F. LEO FAULKNER, F. R. G. S., F. R. S. A.

(*Indian Police*)

Author of

"A Tour in the Far East," "The Sandars of the New Province", etc., etc.

Biogeography is to many the most interesting of the three main branches into which geographical science is divided. The following table will at a glance indicate the subjects comprised under this head, and it is obvious that to obtain a comprehensive knowledge of them much time and labour will be necessary.

It is not at once apparent how the study of animals, plants and mankind can have any concern with geography, but a little consideration will shew that such contingencies as the situation, climate and physical characteristics of a country must, of necessity, constitute a large factor in determining the distribution of the animals and plants to be found within its limits.

Geographical Science

Physical Geography — Mathematical Geography — Biogeography

Zoogeography — Anthropogeography — Phytogeography

Political Geography — Commercial Geography

Though it is an incontestable fact that human beings can live in any part of the world provided that they have a normal supply of water and food, the same cannot be said of the animals to be found in many parts of the two hemispheres. Thus the isthmus of Panama does not permit the migration of fish which would die were they to leave the warm seas. The Polar bear lives but a short time when taken from his home of ice in the north to the heat and glare of the tropics. In fact he rarely survives for long in the tem-

perate climate of Britain. Occasionally the presence of some natural enemy in a particular tract of country renders it impossible for a certain genus of animal to thrive there. Thus we find that in certain tracts of Africa it is impossible to introduce horses owing to the persistent hostility of the tsetse fly. Again though camels and giraffes prosper on an arid sandy plain, they are unable to make their way through forests which thus restrict their movements. On the other hand, monkeys cannot live in the open and so they will only be found in regions where trees are plentiful.

Such points as these early attracted the attention of modern scientists and the result of their researches was the inception of the theory of "geographical distribution." To Charles Robert Darwin and Alfred Russell Wallace must be given the credit for taking up this question with the care and searching inquiry it certainly merits and though many of their deductions yet require to be confirmed they have left a most valuable foundation on which scientists of the present generation can work. In his "Origin of Species" Darwin held that all species had not only a common origin but a common place of origin and, as I have already suggested, if this conception is to be satisfactorily and completely proved an explanation will have to be offered as to how certain animals are inhabiting different parts of the globe. All animals have the power of moving and hence more especially in the case of birds, natural locomotion must have been the primary factor in the distribution of species. The winds too form an excellent medium for the transportation of insects and ova while birds can carry such forms of life in their feet or on their wings.

Wallace's distribution of the animals of the earth was as follows :—

(1) Palæ arctic = Europe, temperate Asia, and the northern Fringe of Africa.

(2) Ethiopian = Rest of Africa.

(3) Oriental = India, South China, Malay Islands, Philippines, Borneo and Java.

(4) Australian = Australia and the neighbouring islands.

(5) Nearctic = North America excluding Mexico.

(6) Neotropical = Mexico, Central and South America. His scheme, however, has not been accepted in its entirety but to those who wish to dip deep into the ramifications of this fascinating subject I would recommend an early study of " A Geographical History of Mammals " written by Lyddeker, the well known naturalist.

Phytogeography, which in simple language means the geography of plants is a branch of science which, in the past, has, comparatively speaking, made but little headway. Although many have endeavoured to put forward a logical scheme of geographical distribution their conclusions have not been generally accepted. In 1807 Humboldt, the great German geographer and

naturalist, attempted to plan maps of botanical distribution but he appears to have been dissatisfied with his own arguments. Bentham, about 1870, originated a classifications of three regions and this with some modifications suggested by Drude is that followed for the most part by students of Phytogeography. The distribution of the land flora, which are, of course, quite separate from the sea flora, comprehends the following three groups:—

(1) Boreal, (2) Tropical and (3) Austral. These in turn are divided into many sub-groups.

It must not however be imagined that there is only one accepted geographical distribution of plants. Unfortunately scientific research in this direction is so diffused that a definite standard has not yet been obtained. Nevertheless, in these days of ubiquitous culture it may be said to be a pleasant relief to find a branch of science where so much sill remains to be done. Text books on the subject are comparatively few and far between and the only work of which I have any personal knowledge is Baker's Elementary Lesson in Botanical Geography. This too may now be out of print for I remember that when reading the subject some thirteen or fourteen years ago, my copy was then far from new. Plant Geography by Schimper is a learned exposition of the subject which will be appreciated by those who have already studied and understood the elements of Phytogeography.

As regards Anthropogeography, to demonstrate its importance as a branch of science I cannot do better than quote the following extract from "Peoples and Problems of India" written in 1911 by Sir T. W. Holderness:—"A country makes its inhabitants in more senses than one. This is true of India. In the first place a country must be able to sustain inhabitants, or they will not exist. There is a natural limit to its population. At one extreme is the Sahara Desert, at the other the Nile Valley. In India, both extremes are found..........."

"Again, a country may be said to make its inhabitants in that their faculties and dispositions are largely influenced by its physical and climatic conditions.........The many races that make up the population of India maintain their distinctive characters, though for centuries they have lived side by side. None the less India has stamped them with a common seal, and has wrought out a recognisable type amid a great profusion of species.

"Lastly, a country makes its inhabitants go far as it determines their political history. The fertility of a country may prove its ruin, if accompanied by a soft and languid climate which saps the energies and weakens the combative instincts of the inhabitants. Of this, Egypt is an instructive example. It has passed from one conqueror to another until it has lost the consciousness of national life. India

like Egypt, has been the coveted prize of the strong. But, unlike Egypt, it has in the long run absorbed its invaders and maintained its own civilisation. It has been able to do this because its natural frontiers have protected it from invasion except at one or two points. These points are so distant from the centre that invasions of India always lost something of their first impetus before they could be pressed home."

Could we hope to find a more apt illustration of the effect of the geographical characteristics of a country upon the people who form its inhabitants!

Again, let us turn to those European powers who are now engaged in terrible conflict in France and Russia. Germany has during the last forty or fifty years realised the immensity of its land boundary. It has during that period always had in view the possibility of a war in the course of which it might be attacked on its several frontiers. What was the result? We see it in that vast German army which entered the present war not only armed with all the legitimate means of destruction which civilised war-fare permits but fortified with nefarious death-dealing instruments evolved by the brains of those obsessed with the idea of German militarism. This, in no small degree, is the consequence of the geographical situation of Germany and furnishes another example of the truth of the statement, "A country makes its inhabitants in more senses than one".

A country with a long coast line and numerous safe ports would at once suggest itself as having the wherewithal of commercial prosperity. But unless there are navigable rivers on which to send down valuable commodities to the ports; unless there are convenient coal fields and deposits of iron ore; unless the inhabitants are adapted by upbringing and climate to constant labour in the extraction of minerals, the country is not likely to take a leading part in the world's commerce. On these and similar phenomena does commercial geography dilate. We learn why particular places and peoples are associated with particular phases of merchant enterprise and how they make their mark or lose their place in the incessant race for wealth.

It is constantly said that India's future depends on the development of its internal and indigenous industries. That this is true no one will deny, but is it not essential that the youth of the country should be instructed in the subject which will reveal to them the road which leads to success? Should they not be taught how other countries have prospered through a scientific and intelligent development of their industries!

I cannot claim to be an educationalist, so am unable, for instance, to understand why it should be necessary for the Indian Schoolboy to learn by heart page after page of Shakespeare. I can however declare without fear of contradiction that the average English school

boy spends far less time on the Bard of Avon than his Indian compeer does. Why should this be the case? There is, I have no doubt, some subtle solution for this apparently unintelligible conundrum but it is not obvious to the ordinary layman. There are, however, many who will agree with me that the time thus employed might be more usefully spent in the study of geography.

"Geography again: What a dull, tedious study that was wont to be!" remarks the Daily Telegraph in reviewing a book on Modern Geography. Dull and tedious it will be if the teachers do not comprehend the scope of the subject and we are thus forced to pause and inquire if a new class of instructors will not have to be trained before Geography can be satisfactorily taught in Indian schools! This paper, short and incomplete as it must necessarily be, wlll, I trust, demonstrate that Biogeography is neither dull nor tedious; on the contrary it deals with subjects that are not only of interest to the scholar but of vital importance to the patriot. It is now the duty of those in authority to insist that this branch of geographical science receives the attention it demands. "Picture book geography," as it has been scathingly styled, is still an optional subject in the Matriculation examination but very few competitors select it. The reason is obvious for Geography is of no subsequent value to the student from the point of view of "marks," and a young man anxious to take his degree cannot altogether be blamed for choosing the subjects which are most likely to assist him in the attainment of the end he has in view. The fault is with the system and until the system is brought into line with that which obtains in Europe, so long will one of the most important sciences be relegated to an oblivion from which it should be rescued without further delay.

The Royal Society of Arts and the London Chamber of Commerce hold annual examinations in which commercial geography forms an important part. This is perhaps the most useful phase of biogeography from the point of view of the average student who has not the opportunity or desire to specialise in geographical science. But in how many colleges or institutions on the Bengal side of India does commercial geography form a part of the curriculum of studies? They probably could be numbered on the fingers of one hand.

Here then, I say again, is an admirable opportunity for the University of Calcutta to initiate a course of lectures in this sadly neglected branch of learning. The Royal Geographical Society of England constantly reminds the various boards of examiners of the necessity for making geography an obligatory subject and of setting papers on modern scientific lines. Moreover, it does not remain content with giving advice, as a reference to the Society's Statement of income and expenditure

for 1915 shews that during the year it spent no less than £ 1188. 18. 6. on Education. Of this sum, £ 700 was devoted to the teaching of geography at Oxford and Cambridge Universities while £ 455. 2. 6 was expended on scientific instruction. It is also to be hoped that the new University of Dacca will, when it comes into being next year, not forget the claims of geographical science.

P. LEO FAULKNER.

THE ARCTIC HOME IN THE RIG-VEDA : AN UNTENABLE POSITION.

iv

The next important Rik, mentioned by Mr. Tilak, under this head, runs as follows :—

অব্যুষ্টাঃ" ইন্ নু ভূয়সীঃ উষসঃ

11-28-9.

(Avyustah it nu bhuyasih ushasah).

'Verily' many are the Dawns that have not flashed forth at all'.

This, expression also, if taken by itself, cut off from the context, appears to lend some support to Mr. Tilak's contention, as if the Dawn referred to here was really a Dawn, which, though seen rising continuously for several days, was not yet fully flashed forth. But a mere glance at the context will most conclusively prove that it mans something quite different. The first two parts of the Riks Mr. Tilak has only referred to the latter portion, and he alone knows why—combined together, run thus :—

"পরা ঋণা সাবীঃ অধ মৎকৃতানি মা অহম্ রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্। অব্যুষ্টাঃ ইৎ নু ভূয়সীঃ উষসঃ ॥"

(Pŏra rina savih adha matkritani ma aham rajan anyakritena bhojam avyustah it nu bhuyasih ushasah).

'O Varuna, absolve me from my paternal personal debts. O King, may I not live on others' earnings. Verily, *many of the Dawns (my Dawns)* have not at all flashed forth.'

Now, in this Rik we find Rishi Gritsamada or Kurma,—the authorship of of the Rik is uncertain—invoking Varuna to absolve him from his personal as well as paternal debts, and not to make him a burden upon others for his subsistence. And incidentally the Rishi has told us that so great were the miseries the debts had caused him that many of his Dawns (*i. e.* days), though dawned, seemed not to have dawned at all, "ব্যুষ্টাঃ অপি অব্যুষ্ট-কল্পাঃ", (vyustah api avyustakalpah) as Sayana puts it. Evidently therefore, the expression "ভূয়সীঃ উষসঃ", 'many Dawns', here simply means '*many of my Dawns*'; and as such, it refers to the events of the Rishi's own life and has absolutely nothing to do with any Polar Dawn or anything of the sort.

The most important Rik, mentioned by Mr. Tilak under this head, runs as follows :—

"তানি ইৎ অহানি বহুলানি আসন যা
প্রাচীনম্ উদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরি জারঃ ইব আচরন্তী উষঃ দদৃক্ষে
ন পুনঃ যতীঃ ইব ॥"
VII-76-3

(Tani it ahani vahulani asan ya
prachinam udita Surjasya
Yatah pari jarah iva acharanti Ushah
dadrikshe na punah yatih iva),

'Many were the splendours (of the Dawn), that lay spread before the Sun, and on account of which, O Dawn, thou lookest like a faithful and devoted wife, *always moving close in front of her husband*, and not like a faithless woman, *moving far away from her husband*.'

Here, the word "Ahani", has been used in its literal sense of "splendours", "তেজাংসি" (tajamsi); and it is exactly in this sense of the term that the Dawn has frequently been described, in the Rig-Veda, as "অহনা" (Ahana), 'the goddess having splendours'. But not satisfied with the above interpretation of the word by Sayana, Mr. Tilak has urged that here the word should be taken in its ordinary sense of 'days'. And thus understood, the expression, says Mr. Tilak, must mean as follows :—

"Many were the days that preceded the rising of the Sun, and through which the Dawn was seen moving about as after a lover, and not like a faithless woman who forsakes her husband.'

'It is therefore clear,' adds Mr. Tilak, 'that the verse in question expressly describes *a Dawn lasting for many days*, which is only possible in the Arctic regions.'

But here also Mr. Tilak has been misled by his scientific bias. In the Rik under notice, the Dawn has clearly been represented as *moving close in front of the Sun*, with her beauties fully laid bare before the gaze of her beloved, and therefore as looking like a faithful and devoted wife, "জারঃ ইব আচরন্তী" (jarah iva acharanti). Now, evidently such a description can only apply to the short-lived Dawn visible in Tropical and Temperate countries ; and it loses all its significance, when applied to the long Polar Dawns. In Polar regions, the Dawn rises long before the appearance of the sun, and there is a long interval between the first appearance of the Dawn aud the rising of the sun. The Polar Dawns, therefore, can, by no means, be characterised as "জারঃ ইব আচরন্তী" (jarah iva acharanti), 'moving close in front of the beloved like a faithful wife'. The Polar Dawn, which is visible long before the rising of the sun, and which spreads her splendours in regions far away from the sun, does, on the contrary, look like a faithless wife, "যতীঃ ইব" (jatih iva), who wanders far away from her beloved, with her beauties laid bare to the lustful gaze of others. Evidently, therefore, the Dawn referred to here must needs be a short-lived Indian Dawn, which is followed by the sun in quick succession, and which alone can, therefore, with propriety, be characterised as always moving close, like a devoted wife, "জারঃ ইব" (jarah iva), in front of her beloved husband, with

her beauties fully laid bare to his wistful gaze. Mr. Tilak's interpretation makes evidently the Rik extremely prosaic and entirely meaningless. The word, "অহানি" (Ahani), in the Rik under notice, must therefore be taken in Sayana's sense of "তেজাংসি" (tejamsi), 'splendours'. Profs. Roth, Grassman, and several other western scholars have fully admitted the soundness of this interpretation. Evidently, therefore, the Dawn referred to here must be a short-lived Indian Dawn, which alone can, with propriety, be described as, "জারঃ ইব আচরন্তী" (jarah iva acharanti) 'moving close in front of her beloved like a devoted wife.' Here is another RiK, with the same conception running through it, though somewhat differently expressed :—

"সূর্য্যঃ দেবীম্ উষসম্ রোচমানাং মর্য্যঃ ন যোষাম্ অভ্যেতি পশ্চাৎ। (I., 115, 2)

Surjah devim Ushasam rochamanam marjyah na yosham abhyeti paschat.

'The sun follows the beautiful Dawn, as a man (lover) follows a woman (his lady-love)."

Descriptions like these do, evidently, apply to a short-lived Dawn alone and are totally meaningless, when applied to the Polar Dawn.

Again, Rishi Vasishta is the author of the Rik, under notice. Here the Dawn has been represented *as then actually seen* by the Rishi moving close in front of her beloved like a devoted wife, "জারঃ ইব আচরন্তী দদৃক্ষে" (jarah iva acharanti dadrikshe). The expression, "জারঃ ইব আচরন্তী দদৃক্ষে" (jarah iva acharanti dadrikshe) 'thou *art seen* moving like a devoted wife', clearly shows that the Dawn described here was a Dawn which was then actually being seen by the Rishi. Such a dawn must needs be an Indian Dawn ; and it can have absolutely no reference to a Polar Dawn or anything of the sort. We have yet to consider one other characteristic of the Dawn. The Rig-Veda has, in several places, referred to the circular motion of the Dawn, and represented it as moving like a wheel. Referring to these descriptions Mr. Tilak tells us that "a dawn in the temperate or the tropical zone is visible only for a short time on the eastern horizon, and and is swallowed up, in the same place, by the rays of the rising sun" and that "it is only in the Polar regions that we see the morning lights revolving along the horizon for some day-long periods of time" ; and that, therefore, "if the wheel-like motion of the dawn mentioned in the Rig-Veda, has any meaning at all, we must take it to refer to the revolving splendours of the dawn in the Arctic regions. " Mr. Tilak has regarded this as one of his most invulnerable points. But we shall see, from what follows, that the supposed invulnerability of the point is a myth, pure and simple. The most important Riks, under this head, are as follows :—

1. "প্রতি স্তোমেভিঃ উষসম্ বসিষ্ঠাঃ অবুধ্রন্।
বিবর্ত্তয়ন্তীম্ রজসী সমন্তে আবিষ্কৃণ্বতীম্ ভুবনানি
বিশ্বা। VII, 80, 1.

[Prati stomebhih Ushasam Vasisthah abudhan |
Vivathayantim rajasi samante avishkrinvatin bhubanani vishva ||
"The Vasishtas, with their hymns, rouse the Dawn at the horizon (the end of heaven and earth)—the Dawn going round the earth along a circular path, revealing the same."

2. "উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বা উর্দ্ধা তিষ্ঠসি।
সমানম্ অর্থং চরণীয়মানা চক্রমিব নব্যসি আববৃৎস্ব॥" III, 61, 3.

[Ushah pratichi bhuvanani vishva urdhva tistasi,
Samanam artham charaniyamana chakramiva navyasi avavritsva.]

'O Dawn, thou art on high, and art coming towards the earth. O Newly-born (Dawn), desiring to go along the same path, thou movest like a wheel.'

Now, Vasishta is the author of the former of the two afore-said Riks. In it, the Vasishtas are represented as engaged in reciting their hymns and thereby rousing the goddess Dawn from her sleep, as it were, and making her appear on the eastern horizon. The conception of rousing the deities from their sleep with hymns is not at all uncommon in the Rig-Veda. In X, 40, 3, for instance, we come across the following :—

"প্রাতঃ জরেথে জরণাইব কাপয়া।"

(Pratah jarethe jaranaiva kapaya).

'O Aswins, you two are roused, in the morning, with hymns, like two old kings.'

In the Rik under notice the Dawn, has likewise, been represented as being roused from her sleep by the Vasishtas, with their hymns. And we are at the same time, told that the Dawn, which was thus being roused from her sleep, was the very Dawn that was there about to go round the earth, bathing it with her own light. Now, the Dawn that can possibly be represented as being roused by the Vasishtas must needs be an Indian Dawn. Evidently, therefore, the expression, "বিবর্ত্তয়ন্তীম্ ভুবনানি বিশ্বা" (vivarthayantim vhuvanani vishva) 'going round the earth', must be taken as having been applied to the very Dawn which was roused from her sleep by the Vasisthas with their hymns. Mr. Tilak's contention, therefore, stands absolutely nowhere. In fact, here the word, "বিবর্ত্তয়ন্তীম্" 'going round', must be regarded as applied to "উষসম্" the 'Dawn' roused by the Vasishtas. The Dawn in question must needs therefore be an Indian Dawn.

Again, in the Rik under notice, the epithets, "বিবর্ত্তয়ন্তীম্" (vivarttayantim) 'moving round,' and "আবিষ্কৃণ্বতীম্" (avishkrinvatim) 'revealing,' must both be taken as and connected with "ভুবনানি বিশ্বা" (vhuvanani vishva) 'the entire world.' The Dawn has, therefore, clearly been described here as "বিবর্ত্তয়ন্তীম্ ভুবনানি বিশ্বা" (vivarttayantim vhubanani vishva) 'moving round the entire earth, ' evidently over the head of the observer as it were, "*in a perpendicular plane like the wheel of a chariot*, bathing it with her own light, "আবিষ্কৃণ্বতীম্ ভুবনানি বিশ্বা" (avishkrinvatim bhubanani vishva). But

such a description does not at all apply to the Polar Dawn. The Polar Dawn always moves, as Mr. Tilak himself says, "*in a horizontal plane like a potter's wheel*, " and her movement is always confined to the horizon. And hence the dawn described here must needs be an Indian Dawn which the Vasishtas roused from the sleep, and was, on her way, *to go round the earth*, bathing it with her own light, over the head of the observer. It is true, as Mr. Tilak observes, that nowhere on earth, the dawn is actually seen moving over the head of the observer, from the east to the west, like the sun or the moon, in a perpendicular plane. But nevertheless, in a tropical or temperate country, the dawn is not actually "swallowed up by the rising Sun," as Mr. Tilak assumes, In the Rik in question, the Dawn is, on the contrary, conceived as continuing to move, unseen, fast followed by the Sun. And this is what makes it possible for the Dawn to reappear every morning, on the same eastern horizon similarly pursued by her lover. The conception of the Dawn ever fleeing from the embrace the Sun has been frequently alluded to in the Rig-Veda, and the story of Urvashee pursued by Pururava is an well-known allegorical representation of the same. Again, in I, 124, 3, we have heen most clearly told :—

"এষা দিবঃ দুহিতা পুরস্তাৎ ঋতস্য পন্থাম্
অনুএতি সাধু প্রজানতী ইব।"

(Esha Divah Duhita purastat ritasya pantham anueti Sadhu prajanati iva).

This Dawn, The Daughter of the Sky, always moves straight (well) in front of the Sun along his path, aware of his desire as it were. The conception of the Dawn, moving, *though unseen*, in a perpendicular plane over the head of the observer, from the east to the west, has, therefore, absolutely nothing unusual in it. Mr. Tilak's apprehensions are, therefore, entirely groundless and hypothetical. The Dawn referred to here must needs therefore be an Indian Dawn.

These remarks also apply, with equal force and cogency, to the second of the above-mentioned Riks. Rishi Viswamitra is the author of that Rik. And in it the Dawn has been represented as having been actually seen by Viswamitra on the Horizon, and at the same time, as going round the earth along the same path. The very expression "উৰ্দ্ধা তিষ্ঠসি" (urdha tishtasi)— 'thou art on high,' most conclusively proves that the Dawn described here must alone be regarded as an Indian Dawn, pure and simple.

THE SUPPOSED TRACES OF THE POLAR DAY IN THE RIG-VEDA.

We shall now consider if the Rig-Veda really contains any traces of the long Polar day. "The most explicit statement about the long day", says Mr. Tilak, is found in X., 138., 3. "In the said Rik, the sun is said to have unyoked his car, not at the sunset or on the horizon, but *in the midst of heaven*, there to rest for some time. A long

halt of the sun in the midst of the heaven is here clearly described, and we must take it to refer to the long day in the Arctic region."

Now, here also, we are extremely sorry to observe, Mr. Tilak has, in the interest of a theory, been led astray. The Rik in question runs as follows :—

"বি সূর্য্যঃ মধ্যে অমুচৎ রথং দিবঃ, বিদৎ দাসায়
প্রতিমানম্ আর্য্যঃ।
দৃঢ়ানি পিপ্রোঃ অসুরস্য মায়িনঃ ইন্দ্রঃ ব্যাস্যৎ
চক্রবান্ ঋজিশ্বনা॥" [Vi
Surjah madhye amuchat ratham divah
vidat Dasaya pratimanam Arjah.
Drirhani Piproh asurasya mayinah
Indrah vyasyat chakrivan Rijisvana.]

'The Sun unyoked his car in the mid-sky. The Aajya got an opportunity for retaliation against the Dasa. Indra, with the aid of King Rijiswan, overthrew the strong forts of Pipru, the conjuring Asura.'

Now, the expression, "বি সূর্য্যঃ মধ্যে অমুচৎ রথং দিবঃ।" (vi Surjah madhye amuchat ratham divah) 'the Sun unyoked his car in the mid-sky', does, no doubt, clearly indicate a 'long halt of the Sun' in the mid-sky. But what is "দিবঃ মধ্যে" (divh madhye) 'in the midst of the heaven'? It certainly means *the sky over the head of the observer.* The Rik, under notice, therefore clearly tells us that the Sun came to a standstill in the mid-sky, over the head of the observer. But in the Polar regions, such a position of the sun is physically impossible. During the long Polar day of six months duration, the sun must, on the contrary, always be seen lying in an inclined position, and never directly over the head of the observer. And hence 'the halt of the Sun in the mid-sky', mentioned in the Rik, under notice, can never be taken as referring to any Arctic phenomenon whatever. And hence Mr. Tilak's so-called "explicit statement" about a long Polar day is, after all, a myth, pure and simple.

Again, the said Rik distinctly tells us that the aforesaid halt of the Sun took place when Indra was engaged in demolishing the forts of Pipru, with the King Rijiswan ; and that, having taken advantage of the increased length of the day, caused by the aforesaid halt of the Sun, Indra and Rijiswan succeeded in overthrowing the forts of Pipru. Now, Rijiswan was, evidently, an Indian (Aryan) King. Evidently, therefore, the said halt of the Sun, no matter what it means, must needs be an Indian phenomenon, pure and simple.

But what does the Sun's supposed descent from the car really mean. Does it refer to any mysterious and extraordinary event? Or is it merely a figurative description of a very common and ordinary occurrence? A moment's reflection will show that the Sun's descent from his car and his halt in the mid-sky, mentioned in the Rik, is only a poetical representation of an every day optical phenomenon, seen in a country like India. Here in India, every morning the Sun is first seen on the horizon, seated on his golden car,

as it were. The Solar car is, however, soon seen fast moving upwards. But on reaching the mid-sky, the Solar car stops altogether, and the Sun descends from the car to rest for a while, as it were. Now, this apparent daily halt of the Sun in the mid-sky at noon has, evidently, been poetically described in the Rik, under notice, as the Sun's descent from his car. Evidently, therefore, this Rik also deals with an Indian phenomenon, and has absolutely no reference to the long Polar day.

ANOTHER SUPPOSED INVULNERABLE POINT :

We shall now consider another of Mr. Tilak's supposed invulnerable points ; and this shall be our last. This is what Mr. Tilak tells us on this point:–

"In the Rig-Veda, I, 24, 10, the constellation of Ursa Major (Rikshas) is described as being placed 'high' (uchcha) and as this can only refer to the altitude of the constellation, 'it follows that it must have been over the head of the observer" which is possible only in circumpolar regions, "The said Rik, therefore" says Mr. Tilak, "unmistakably refers to a Polar phenomenon'.

But here as well, as we shall see presently, Mr. Tilak's conclusion is hopelessly weak and untenable. The Rik in question runs thus :—

"অমী যে ঋক্ষাঃ নিহিতাসঃ উচ্চা নক্তম্ দদৃশে
কুহ চিৎ দিবা ইয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশৎ চন্দ্রমা নক্তম্
এতি॥"

[Ami ye rikshah nihitasah uchcha
naktam dadrishe kuha chit diva iyuh.
Adavdhani Varunasya vratani vicha-
kashat chandrama naktam eti.]

'Those stars (or constellation known as Saptarshi Mandal) that are placed on high, are visible at night. But where do they go during the day ? The ways of Varuna are inviolable. At his commands the moon shines at night.'

Now the word "ঋক্ষাঃ" (Riksha) means both stars in general, as well as the constellation Saptarshi Mandal; and Sayana has mentioned both these meanings. But of the two senses, here the first alone, evidently, fits in with the context. In the very Rik, there is also a reference to the rising of the moon. Again, in the 8th Rik of the same Sukta, we have been told :—

"উরু হি রাজা বরুণঃ চকার সূর্য্যায় পন্থাম্ অন্বু
এতবে।"

[Uru hi raja Varunah chakara Surjaya pantham anu etave.]—'Verily the King Varuna has made the wide path for the Sun to go repeatedly.'

The Sun, the Moon, and the Stars obey the great Varuna, and rise and set at his commands'—This is, evidently, the meaning of the Riks. The word "ঋক্ষাঃ" (Riksha), in the Rik mentioned above, must needs therefore be taken to mean stars in general, rather than any particular group of them; for in this sense alone the word properly fits in with the context; and if taken in this sense, Mr. Tilak's contention stands nowhere.

But even if we take the word in Mr. Tilak's sense, still his conclusion does not at all follow. The word "উচ্চা" (Uchcha), simply means 'on high' on the sky above; and Sayana has also taken the word in this sense. This word has, moreover, been frequently used, in the Rig-Veda, exactly in this sense. So the word 'Uchcha' simply means 'on high'; and it cannot be treated as identical with 'over head.' Mr. Tilak's conclusion, therefore, does not at all follow.

Again, in the Rik, in question, the words, "নক্তং" (Naktam), and "দিবা" (Diba), have been used side by side. And this clearly shows that the state of things referred to here applies to a country where days and nights follow one another in quick succession. In fact, the exclamation,

'অমী যে ঋক্ষাঃ নক্তং দদৃশে কুহ চিৎ দিবা ইয়ুঃ' those stars (or members of Saptarshi-Mandal) are seen at night; but where do they go during the day? becomes entirely meaningless in a country where day and night lasts each for six months at a stretch. Similarly the expression, 'অনু এতবে' (anu etave) 'to go repeatedly,' in the passage 'বরুণঃ চকার সূর্য্যায় পন্থাম্ অনু এতবে' (Varunah chakara Surjaya pantham anu etave) 'Varuna made the path for the Sun to go repeatedly' 'losses all its significance, when applied to a country where the Sun shines continuously for six months at a stretch. 'অনু এতবে', 'to go repeatedly', evidently implies a rapid succession of day and night. The phenomenon described here must needs therefore be purely Indian in character.

Again, Rishi Shunahshwena is the author of the Rik in question. And the word 'অমী' (ami) 'those', applies to objects, here starts in general or members of a particular group of them, as the case may be, directly seen at a distance. In the Rik in question, we accordingly find the Indian Rishi Shunahshwena, in some remote past, to have looked at the sky one night and thus exclaimed with wonderment:—

"অমী যে ঋক্ষাঃ নক্তং দদৃশে কুহচিৎ দিবা ইয়ুঃ" ?

'Those stars (or members of the constellation) that are visible at night, where do they go during the day?'

An Indian phenomenon must have clearly been referred to here. The very use of the word, 'অমী' (ami) 'those', unmistakably proves that the things signified by it were then actually seen by the Rishi. The Rik under notice therefore, cannot have any reference to any Polar phenomenon whatever. Thus Mr. Tilak's contention entirely falls to the ground.

Mr. Tilak is an erudite scholar. But of unfortunately, he has in the treatment his subject, shown an unscholarlike contempt for the context, and the history of the times, and in the interest of a theory, has, with the magic of his imagination, endeavoured, in vain, to build up a huge mountain out of a mere mole-hill; and the results have been very disappointing.

N. K. DATTA.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড ঢাকা—শ্রাবণ, ১৩২৩ ৪র্থ সংখ্যা।

চীনা "শিল্প-শাস্ত্র"।

("হিমালয়ের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়)

আমরা ভারতে ৬৪ কলার কথা জানি। বাৎসায়নের কামসূত্রে এই গুলির উল্লেখ আছে, শুক্রনীতিতেও আছে। ইংরেজিতে "আর্ট্‌স্‌" য়্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ বলিলে যাহা বুঝি আমাদের কলা শব্দে প্রায় তাহাই বুঝায়। ফাইন্‌ আর্ট্‌স্‌ বা সুকুমার শিল্প ছাড়াও অনেক বস্তু এই কলার অন্তর্গত।

৬৪ কলা সম্বন্ধে নানাগ্রন্থই ভারতীয় সাহিত্যে আছে। এই সমুদয় নানা নামে পরিচিত। সাধারণ নাম শিল্পশাস্ত্র। অন্যান্য নাম ময়শাস্ত্র, ময়মত, ময়বিদ্যা ইত্যাদি। ময় নামক মানুষ বা দেবতা বা অসুর এই সকল শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। এতদ্ব্যতীত শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ অনুসারেও বিশিষ্ট সাহিত্যের নাম আছে, যথা, বাস্তুবিদ্যা, "চিত্রলক্ষণ" ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থ আমরা অনেকেই চোখে দেখি নাই। কিন্তু প্রায় শতাধিক পুঁথির নাম অফ্রেক্ট সম্পাদিত 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ত্রিবেন্দ্রাম হইতে বাস্তুবিদ্যা নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে 'মানসার' নামক গ্রন্থের তথ্য মহীশূরের পণ্ডিত রামরাজ প্রণীত "হিন্দু আর্কিটেক্চার" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। রামরাজের গ্রন্থ বিলাতে মুদ্রিত হয়। সে অনেকদিনের কথা। আজকাল আমাদের দেশে সুকুমার শিল্পের নানা আলোচনা সুরু হইয়াছে। মনোমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত "উড়িষ্যাশিল্প" গ্রন্থে মানসার ব্যবহৃত দেখিতে পাই। মানসারের উল্লেখ সকলেই করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শুক্রনীতির ক্রোধ অধ্যায়ে শিল্পবিষয়ক নানা কথা আছে। কাজেই শুক্রনীতির উল্লেখ ও আজকালকার শিল্প-আলোচনায় দেখিতে পাই। এই মানসার ও শুক্রনীতি ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদের পণ্ডিত মহলে এখনও সুপ্রচারিত নয় বলিতে হইবে। যুক্তিকল্পতরু নামক পুঁথি, বৃহৎসংহিতা এবং রামায়ণ মহাভারতও আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় মাঝে মাঝে স্থান পায়। কিন্তু খাঁটি শিল্প

শাস্ত্রের পরিচয় আজও আমরা পাই নাই বলিতে বাধ্য। তবে সঙ্গীত-কলার তরফ হইতে কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আজকালকার সাহিত্যসংসারে দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

সকল প্রকার শিল্পেই চীনাদের নামডাক খুববেশী। এই নামডাক আজকালকার কথা নয়। অতি প্রাচীন কালেও চীনা জাতিকে পাকা শিল্পী বলিয়া জগতের লোকে জানিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দুইজন মুসলমান পর্যটক সমুদ্রপথে চীনে আসেন। তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আরবী হইতে ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। অনুবাদক ছিলেন রেণদো (Renaudot)। সেই ফরাসী অনুবাদের ইংরেজি অনুবাদ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু নবম শতাব্দীর এশিয়া সম্বন্ধে নানা কথা ইহাতে জানা যায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু আজগুবি গল্পও ইহার মধ্যে পাই। অধিকন্তু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতমহাসাগরের জাহাজকোম্পানী এবং চীনা, হিন্দু ও মুসলমান সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে।

দ্বিতীয় পর্য্যটকের নাম আবুজীদ্ আল্ হাসান। ইনি শিরাজের লোক। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারত হইয়া চীনে আসেন। এই পর্য্যটক বলিতেছেন—"চীনারা জগতের সকল জাতিকেই যে কোন শিল্পে পরাস্ত করিতে পারে। চিত্রবিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদর্শী। চীনাদের হস্তশিল্প নানাবিধ। এই বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। বস্তুতঃ অন্যান্য জাতি চীনাদের হাত সাফাই দেখিয়া বিস্মিত হইবে। এমন কি চীনাদিগের অনুকরণ করিয়া চীনা উৎকর্ষলাভ করাও অন্যের পক্ষে কঠিন

মুসলমান পর্য্যটক মহাশয় চীনা শিল্প-সংসারের একটা দপ্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে শিল্প-সমালোচনার রীতি বুঝা যায়। ইনি বলিতেছেন—"চিত্রকর তাঁহার হাতের কাজ লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। বক্‌শিষ বা ইনাম পাওয়াই উদ্দেশ্য। রাজা তৎক্ষণাৎ শিল্পীকে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার প্রদান করেন না। রাজপ্রাসাদের ফটকের সম্মুখে শিল্পী তাঁহার চিত্র রাখিতে আদিষ্ট হন। এক বৎসর কাল ইহা ঐখানেই থাকে। রাস্তার লোক, বাজারের লোক, মুটেমজুর, আরদালী পেয়াদা, ম্যাণ্ডারিণ পুরোহিত, পণ্ডিত, মন্ত্রী, আমীর, ওমরাহ, ঝি, চাকর সকলেই চিত্রটা যখন তখন দেখিতে পায়। সকলেই একটা করিয়া ভালমন্দ বলিতে অধিকারী। এইরূপে এক বৎসর ধরিয়া বাজারে যাচাই চলিতে থাকে এক বৎসরের মধ্যে এই খোলা মাঠের সমালোচনায় চিত্রের কোন দোষ বাহির না হইলে শিল্পী ইনাম পাইবেন। তখন শিল্পীকে শিল্পের ও ওস্তাদমহলে আসন দেওয়া হইবে। কিন্তু সামান্য মাত্র ত্রুটিও যদি রাস্তার কোন লোক দেখাইতে পারে তাহা হইলে শিল্পীকে সমাদর করা হইবে না। রাস্তার লোকেরাই এখানে সমজদার এবং পরীক্ষক। কিছুদিন হইল একব্যক্তি শস্যের শীষ আঁকিয়াছিল। এই শীষের উপর একটা পাখী বসান ছিল। রেশমের জমিনের উপর চিত্রটা আঁকা। রাজপ্রাসাদের ফটকের সম্মুখে এইটা যথারীতি রক্ষিত হইল। সকলেই ইহার যারপরনাই তারিফ করিতে থাকিল। যে দেখিত সেই বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিত। কেহই কোন দোষ বাহির করিতে পারিল না। এমন সময়ে একটা বে-আক্কেল লোক বলিল "এই ছবি পুরস্কার যোগ্য নয়। ইহাতে দোষ আছে। শিল্পীর হাত এখনও পাকে নাই।" রাজদরবারে লোকটার মত জানান হইল। সকলেই অবাক। এই ব্যক্তিকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল—দরবারে চিত্রকরও স্বয়ং উপস্থিত। লোকটা নির্ভয়ে রাজাকে বলিতে লাগিল—"শীষের উপরে পাখী বসিয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু চিত্রে দেখিতেছি শীষটা খাড়াই রহিয়াছে। ইহা নোয়াইয়া পড়া উচিত ছিল না কি? পাখীটা তুলার মত হাল্কা নয়। চিত্রকর এই সামান্য কথাটাই জানেন না। কাজেই এই শিল্প অতি নিম্নশ্রেণীর কার্য্য।" সভার লোকজন সকলেই সাধু সাধু করিয়া উঠিল। শিল্পী ইনাম পাইলেন না।"

প্রাচীন গ্রীসের শিল্প সমালোচনাও ঠিক এই ধরণের ছিল। কেবল শিল্প কেন—গ্রীকজাতির সাহিত্যও বাজারের যাচাইয়েই বাঁচিয়া থাকিত। বড় রাস্তার

ধারে গ্রীক স্থপতিগণের হাতের কাজ সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। "ফোরামের" মাঠে ও হর্ম্ম্যে তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য জনগণের পরীক্ষার বস্তু হইত। হাটে বাজারে বক্তৃতা করিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা যশস্বী হইতেন। প্রকাণ্ড সভায় সমগ্র নগরের অধিবাসীদিগের সম্মুখে নাচিয়া গাহিয়া অভিনয় করিয়া গ্রীক সাহিত্যবীরগণ প্রশংসা লাভ করিতেন। ইস্কীলাস, সফক্লীস, ফিডিয়াস, প্র্যাক্‌সিটেলিস্‌, ডিমস্থেনীস, আইসক্রেটিস,—ইহারা সকলেই বাজারের যাচাইয়েই মানুষ। নিন্দা প্রশংসা সুনাম কুনাম বিতরণের জন্য গ্রীক সমাজে কোন প্রকার দরজাবদ্ধকরা পরীক্ষা-গৃহ ছিল না। পাশ-ফেল ছোট-বড় বিচারের জন্য সময় নষ্ট করা হইত না। হাট বাজার মাঠ ঘাটই গ্রীকবীরগণের সব ঠিক করিবার আড্ডা। জনসাধারণের বাণীই শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে চরম মত ছিল। উহাই খাঁটি জুরীর বিচার—দেশের মত।

মধ্যযুগে ধর্ম্মমন্দিরে এবং মঠে শিল্পকার্য্য প্রধানতঃ সংগৃহীত হইত। তখনও শিল্পীদিগের পরীক্ষক থাকিত জনসাধারণ। প্রকাণ্ড স্থানে খোলাবাজারে ওস্তাদগণের কার্য্য পরীক্ষিত হইতে পারিত। লোকমত উল্টা হইলে কোন ব্যক্তিই মন্দির মঠের চিত্রশালায় স্থান পাইতেন না। বাজে মাল শীঘ্রই ঝড়িয়া পড়িত। এশিয়া ও ইয়োরোপ দুই ভূখণ্ডেই শিল্পসমালোচনার এই দস্তুর ছিল। এই জন্যই পুরাণ কারিগরগণের কাজ আজও এত প্রশংসিত হইতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদা কমিতেছে না। জনসাধারণের রুচি এবং অন্য প্রদেশের কঠোর সমালোচনার কষ্টিপাথরে সেই শিল্প দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাহার মার নাই। বর্ত্তমান যুগের আর্ট গ্যালারিগুলি সেইরূপ জনসাধারণের "ফোরাম" বা "প্রাসাদের ফটক" বা মন্দিরের মঠ বা "গোলদীঘি" নয়। এই জন্যই খোলা হাওয়ার নিরপেক্ষ সমালোচনা আজকালকার শিল্প সম্বন্ধে না হইবার কথা। এই কারণেই নব্যযুগের অনেক বস্তুই মরিয়া যাইবে। সাময়িক প্রশংসা লাভের পর শিল্পীরা শেষ পর্য্যন্ত অমর হইতে পারিবেন না। "লোকে যারে নাহি ভুলে" এইরূপ ভাগ্য একমাত্র জনসাধারণের বিচারেই সম্ভব। কোন দরজাবদ্ধকরা সমালোচনা-পরিষদের সুনজর কুনজরে নয়। সেনেট হাউস, একাডেমী বা পরিষদের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেই অমর হওয়া যায় না। গোলদীঘির পরীক্ষায় যিনি পাশ হইবেন তিনিই অমর। চীনারা শিল্প সৃষ্টি করিতে মজবুদ ছিল। আবার শিল্পকার্য্যের সংগ্রহকার্য্যেও চীনারা খুব পাকা। আজকাল ইয়োরামেরিকায় ধনবান্ বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতেরা নানাবস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এ কথা সকলেই জানি। কিন্তু চীনাদের বাতিক্ অতি প্রাচীন। মধ্যযুগে অনেক ব্যক্তি শিল্প-সংগ্রাহক বা প্রত্নব্যবসায়ী হইয়া চীনা সমাজে নাম করিয়াছেন। আরও প্রশংসাযোগ্য কথা এই যে, চীনারা চিরকালই শিল্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিল্প দ্রব্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শিল্পকর্ম্ম রাখিবার বা যাচাই করিবার প্রণালী সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্য শিল্প-সমালোচনার ঘর চীনা সাহিত্যে বেশ বড়। বস্তুতঃ সাহিত্য-সমালোচনা এবং শিল্প-সমালোচনা দুইই চীনা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে নানাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনারা সমজদার জাতি।

(১) চিত্রকলা ও হস্তলিপি।

চীনা অক্ষরগুলি এক একটা ছবির মত। অক্ষর লিখিতে পারা চীনে একটা বিশেষ বাহাদুরী। হাতের লেখা এই কারণে এক বড় শিল্প। ছবি-আঁকা আর হস্তলিপি দুইই এক কলা। হাতের লেখায় উৎকর্ষের জন্য অনেকেই নামজাদা হইয়া গিয়াছেন। ভাল হাতের লেখার জন্য পুরস্কার বিতরণ আজকালও হইয়া থাকে। দরবারী উচ্চতম কার্য্যের জন্য এখনও চীনারা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য লয় না—পাকা লেখকের সাহায্য গ্রহণ করে। কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বা কার্য্যবীরকে অভিনন্দন পত্র দিতে হইলে লম্বা রেশমের কাগজে হাতের লিখায় বক্তব্য প্রকাশিত করা হয়। এই ধরণের এক একখানা

অভিনন্দন পত্রের খরচ প্রায় দুইশত তিনশত টাকা পড়ে। বলাবাহুল্য আরও বেশী খরচও হইতে পারে।

আমরা ভারতবর্ষে হস্তলিপিকে এতবড় সম্মান প্রদান করি না। ইয়োরোপেও ইহার এরূপ সমাদর নাই। অবশ্য মধ্যযুগে এশিয়ায় এবং ইয়োরোপে উভয়েই হাতের লেখার মর্য্যাদা খুব বেশী ছিল। তখনকার দিনে হিন্দুশাস্ত্র, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে লিখিবার জন্য পণ্ডিত, মৌলবী, পুরোহিতেরা এবং এমন কি রাজরাজড়াগণও চিরজীবন উৎসর্গ করিতেন। ঐরূপ লিপিকার্য্যে সময় প্রদান করাই ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সে দিন আর আজকাল নাই। ছাপাখানার প্রভাবে হস্তলিপির আদর দুরীভূত হইয়াছে। কিন্তু চীনা সমাজে হস্তলিপির আদর ছাপাখানার প্রভাবেও কমে নাই। চীনারা অক্ষর ছাপিবার কৌশল অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কার করিয়াছিল। ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্র সেদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বহুপূর্ব্বে চীনারা অক্ষর ছাপিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন করে। বস্তুতঃ চীনাদের দৃষ্টান্তেই ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তথাপি চীনে হস্তলিপির আদর কমে নাই। তাহার একমাত্র কারণ চীনালিপির বিশেষত্ব। চীনা লিপিগুলি চিত্রবিশেষ। ছবি আঁকিতে যেরূপ নৈপুণ্য আবশ্যক, চীনা অক্ষর লিখিতেও সেইরূপ নৈপুণ্য আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে চীনারা চিত্র বিদ্যায় হাত দিবার পূর্ব্বে এই কারণে হস্তলিপিতে হাত মক্‌স করিয়া থাকে। হস্তলিপি চীনে চিত্রশিল্পেরই সামিল। নামজাদা চিত্রকরগণের অনেকে হাতের লেখায়ও প্রসিদ্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একখানা চিত্রশিল্পের পুস্তক আছে। তাঙ্‌ আমলেও একখানা দশখণ্ডে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ প্রণীত হয়। নাম "লীই-তায়-মিঙ্‌ হুয়া-কে"। গ্রন্থকারের নাম চাঙ্‌ য়েন-য়ুয়েন্‌। ইহাতে চিত্রশিল্পের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। লেখকের বংশে পুরাণাচিত্র বহুসংখ্যক সংগৃহীত ছিল। এই সংগ্রহের বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণো ওস্তাদগণের জীবনবৃত্তান্তও ইহাতে লিখিত আছে।

সুঙ্‌ আমলের চু-চাঙ্‌-ওয়ান হস্তলিপি সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মন্তব্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। নিজের মত অল্প বিস্তর আছে। হাতের লেখার উৎকর্ষ লাভের নানা উপায় ইহার আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থের নাম মিহ্‌-বে-পীন্‌। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে তুঙ্‌-শে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে সুঙ্‌ আমলের ওস্তাদ লেখকগণের বিবরণ আছে।

তাঙ্‌ আমলের উই-সুহ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ৫৬ বিভিন্ন লিপি প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। এইগুলি সবই নাকি চীনে নানাযুগে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার জন্য ব্যবহৃত দেবনাগরী লিপির উল্লেখও আছে।

একখানা গ্রন্থ বিশখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নানাযুগে প্রচলিত হস্তলিপির নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের নমুনা ইহাতে নাই। সম্রাট্‌ এবং রাজরাজড়াদিগের হাতের সহিও এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁশ চিত্রণে চীনারা সিদ্ধহস্ত। বাঁশগাছ আঁকিবার প্রণালী একখানা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ইহা ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। লেখকের নাম লে-কান্‌। পুস্তকের নাম "চুহ্‌-পু-চেয়াং-লুহ"। ইহাতে চারি অধ্যায় আছে—(১) বাঁশের সাধারণ আকৃতি বিষয়ক ছবি (২) "ইঙ্ক পেইন্টিং" (৩) নানা অবস্থায় বাঁশ কিরূপ দেখা যায় (৪) নানাজাতীয় বাঁশের আকৃতি। গ্রন্থের মধ্যে অতি-সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। বাঁশ গাছ সম্বন্ধে অতি গভীর গবেষণাও ইহাতে আছে। ওয়াইনির মতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি নিখুঁত। ঠিক যেন প্রকৃতির বাগানে ও ময়দানে বাঁশগাছগুলি দেখিতেছি। কাজেই পুস্তকখানা চীনা শিল্পশাস্ত্রের একখানা বেদ বিশেষ।

হুয়া-কীন্‌ গ্রন্থে চিত্রশিল্পের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে মোগল আমল পর্য্যন্ত চীনা চিত্রকলার ধারা ইহাতে বুঝা যায়। লেখকের নাম তাঙ্‌ হাও। বিদেশীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধে ও সামান্য বিবরণ আছে। বোধহয় ভারতীয় চিত্রকলার কোন

কোন তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার চিত্রকলার নানারীতি ("স্কুল") বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোন্ ছবি কোন্ রীতির অন্তর্গত তাহা বুঝিবার নানা সঙ্কেত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হীয়া ওয়ান্-য়েন চিত্রকরগণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নাম "তুহই-পাও-কীলন"। ইহাতে ১৫০০ ওস্তাদের নাম আছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে মোগল আমল পর্য্যন্ত ইঁহাদের আবির্ভাবকাল।

এই ধরণের অসংখ্য গ্রন্থই আছে। লেখকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভুল ধরিতে ছাড়েন নাই। সমালোচনার সমালোচনা এইরূপে চীনা সাহিত্যে অনেক জমিয়াছে। মাঞ্চুআমলেও হস্তলিপি এবং চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং সমালোচনা ও ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির হইয়াছে।

চীনে সীলমোহরের ব্যবহার অতি প্রাচীন। রাজরাজড়াগণ তো করিয়াছেনই—সাধারণ লোকেরাও সীলমোহর ব্যবহার করে। কাজেই সীলমোহর প্রস্তুত করা চীনে একটা ব্যবসায় বিশেষ। মোহরে নামলেখা বা ছবি আঁকাও একটা কলা বিশেষ। সুতরাং এই সকল বিষয়ে সাহিত্য পড়িয়া উঠাও অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ সীলমোহর সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পরিমাণ চীনা শিল্প-সাহিত্যে বিশাল। চীনা সাহিত্যের যে দিকেই তাকাই সেইদিকেই "বিশালং বিপুলং ভদ্রং স্ফারং সমং বরিষ্ঠঞ্চ" দেখিতেছি।

(৩) সঙ্গীত।

সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা নানা গ্রন্থেই আছে। অধিকন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ বিবরণ এবং যন্ত্র ব্যবহার করিবার কৌশল সম্বন্ধেও বিবরণে সাহিত্যের পরিচয় পাই।

নবম শতাব্দীতে নান্-চো ঢাক বাজাইবার প্রণালী সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিয়দংশ ঐতিহাসিক। গ্রন্থকার বলিতেছেন মধ্যএশিয়া হইতে ঢাক চীনে আমদানি হইয়াছে। তাঙ্ আমলে মধ্য-এশিয়া বলিলে ভারত-"মণ্ডল"ই বুঝিতে হইবে। নানা প্রকার ঢাকের জন্মকথা ও ইতিহাস এইগ্রন্থে আছে। ১২৯ প্রকার বাদ্যরীতি, সুর বা গৎ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ওয়াইলি বলিতেছেন "অনেকগুলির নামেই বুঝিতে পারি এই সমুদয় ভারতীয়।" ভারতের ঢাকও চীনে আসিয়াছে। গ্রন্থের নাম কী-কুও-লুহ্।

দশম শতাব্দীতে একখানা গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে নানা প্রকার সঙ্গীতের বিবরণ আছে। নৃত্যকলা সম্বন্ধে গবেষণা আছে। নাট্যের অভিনয় সম্বন্ধেও প্রবন্ধ আছে। বাদ্যযন্ত্র ও গীতও আলোচিত হইয়াছে। ২৮ প্রকার রাগ ও রাগিণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঙ্ আমলের নাচগান বাজনা বুঝিতে হইলে এইগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। চীনের তাঙ্ আমল ভারতীয় প্রভাবের আমল। কাজেই এই যুগের সকল চীনা গ্রন্থেই ভারতবর্ষকে পাইব—কোথাও মুখ্যভাবে কোথাও বা গৌণভাবে। ভারতবর্ষ চীনকে কেবল ধর্ম্ম প্রদান করে নাই—সমগ্র ভারতীয় সভ্যতারই নানা অঙ্গ প্রদান করিয়াছিল।

"কিন্" বা বীণা সম্বন্ধে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে একখানা বই লেখা হয়। উহা দশখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে।—(১) শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম। (২) সঙ্গীত কলার নানা রাগরাগিণী, সুর বা গতের নাম ও বিবরণ। (৩) এই সকল বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের তালিকা। (৪) বীণা প্রস্তুত করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এরূপ ওস্তাদ কারিগরগণের নাম। সংখ্যা বিপুল। (৫) স্বরলিপি।

৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জেড্ পাথরের বাদ্যযন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে চীনে আনা হয়। তে-চুঙ্ তখন চীনেশ্বর। ফরাসী পণ্ডিত বেজিন তাঁহার "চীনা থিয়েটার" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নাট্যকলা ভারতবর্ষ হইতেই চীনে আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে চীনে রঙ্গমঞ্চ ছিল না। নাচগান সমন্বিত অভিনয় চীনারা ভারতীয় বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট প্রথম শিক্ষা করে। বৌদ্ধ বলিলে যে-কোন ভারতবাসীকেই বুঝাইত। ভারতবর্ষের সকল বস্তুই চীনাদের বিবেচনায় "বুদ্ধমার্কা" ছিল।

(৩) শিল্প-সংগ্রহ ও বিবিধ "কলার" কথা।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাও-কীয়েন-লুহ্ নামক একখানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ছুরি ছোরা তলোয়ার খাঁড়া ও অন্যান্য শস্ত্র সম্বন্ধে ইহা ইতিহাসপুস্তক। লোহা, তামা ও সোণার তলোয়ারের উল্লেখ আছে। পাথরের নির্ম্মিত শস্ত্রের কথাও জানিতে পারি। সোণালি অক্ষরে নাম খোদাই করা হইত এই ধরণের তলোয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজরাজড়াদের অনেক ছিল। জাপানের কাইযোগণ ও এই সকল হাতিয়ার রাখিতেন। গ্রন্থে মান্ধাতার আমলের তলোয়ারের বিবরণ আছে। সমসাময়িক চীনের শস্ত্রের ও বিবরণ আছে।

চিঙ্-লুহ নামক একখানা গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হয়। তাহাতে ধাতু নির্ম্মিত পাত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। অধিকাংশই হান্-আমলের জিনিষ। ধাতু ঢালাই করিবার প্রণালী, পাত্রগুলির মাপজোক এবং নামখোদাই সবই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ওয়াং-কু নামক একব্যক্তি পুরাণা জিনিষের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা এক প্রকার বিশ্বকোষবিশেষ। নাম সুয়েন্-হো-পো-কু-তু। ত্রিশখণ্ডে বিভক্ত। নানাপ্রকার পাত্র, আয়না, পেয়ালা রেকাবি, ফুলদানের বিবরণ ইহাতে আছে। চাং আমল হইতে হান্ আমলের বস্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক প্রবন্ধ সচিত্র। পাত্রের গায়ে খোদাই করা অক্ষরগুলিও গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বস্তুগুলির বর্ণনায় ওয়াংকু নিজের কথা প্রায়ই বলেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সমুদয় সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াংকু সেই সমুদয় সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ছবিগুলি নিখুঁত। প্রাচীন চীনের শিল্প বুঝিবার পক্ষে এই সংগ্রহ-পুস্তকখানা বিশেষ মূল্যবান্। ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরণের একখানা পুস্তিকাও আছে কি? বোধ হয় না।

এই ধরণের শিল্প-সংগ্রহ বিষয়ক গ্রন্থ চীনারা নানা যুগেই লিখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও এই সাহিত্য চলিতেছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে শিল্পদ্রব্যের গাত্রে খোদাই করা রচনার বিবরণ দেখিতে পাই। এই গুলি চাও্ আমল হইতে তাঙ্ পর্য্যন্ত কালের বস্তু। পরবৎসর আর একখানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে কেবল আয়নার ছবি আছে। এই গুলিও চাও-চাতা আমলের দ্রব্য।

দোয়াত, কালী, কাগজ, তুলী ইত্যাদি এবং চিত্র-শিল্পের উপকরণ সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ আছে। মোগল আমলের লুহ-ইউ একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নাম নিহ্-শে। তাহাতে কালী প্রস্তুত করিবার শিল্প বিবৃত আছে। ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। ১৫০ জন পুরাণা মসী-শিল্পীর কথা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। অধিকন্তু চীনের বাহিরে লোকেরা কিরূপে কালী প্রস্তুত করে তাহার বিবরণও আছে। কোরিয়ার মসী-শিল্প, তাতারজাতির মসীশিল্প এবং মধ্যএশিয়াবাসীদিগের মসী-শিল্পের কথাও ইহাতে জানিতে পারি। মধ্য-এশিয়ার কথায় ভারতের কথাই আন্দাজ করা চলিতে পারে।

চীনে প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধেও নানাগ্রন্থ আছে। পুরাণা আমলের মুদ্রা সংগ্রহ করিবার বাতিক চীনাদের ছিল। সেই গুলির বিবরণ লিখিয়া রাখাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই ধরণের মুদ্রা-সাহিত্যের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের একখানা গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে সুপ্রাচীনকাল হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ সচিত্র। প্রত্যেক মুদ্রার সাকার পরিমাণ ও লিপি যথারীতি বর্ণিত আছে। বিদেশীয় রাষ্ট্রের মুদ্রার কথাও ইহাতে জানিতে পারি। লেখকের নাম হুং-চুন্। গ্রন্থের নাম চুয়েন-চে। ১৫ খণ্ডে বিভক্ত। ভারতীয় ৬৪ কলায় মুদ্রার উল্লেখ নাই।

পেকিঙের রাজ দরবারের পুরাণা মুদ্রার সংগ্রহ রক্ষিত হইয়া থাকে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহের বিবরণ রাজাদেশে প্রকাশ করা হয়। ইহাতে এশিয়ার নানাদেশের মুদ্রাও বিবৃত আছে। নানা পদক বা মেডেলের বিবরণ ও দেখিতে পাই। গ্রন্থ সচিত্র।

প্রস্তর-শিল্প চীনে অতি পুরাতন। কাজেই নানা

প্রকার পাথর সম্বন্ধে চীনা সাহিত্যও রচিত হইয়াছে। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশল ইত্যাদিও চীনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

চা চীনাদের খাঁটি স্বদেশী বস্তু। কাজেই চা গাছের কথা চীনাসাহিত্যে থাকিবারই কথা। চা-কিঙ্ নামক গ্রন্থ অষ্টমশতাব্দীর রচনা। ইহার আলোচ্য বিষয়—(১) চা-গাছের উৎপত্তি, (২) গাছ হইতে চয়ন করিবার প্রণালী, (৩) চার পাতা প্রস্তুত করিবার নিয়ম, (৪) এই সকল কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী পাত্রের বিবরণ, (৫) চা-পান, (৬) ঐতিহাসিক তথ্য, (৭) কোন্ কোন্ জেলায় চা উৎপন্ন হয়, (৮) বিবিধ, (৯) চিত্র-পরিচয়। চা-সম্বন্ধে নানা গ্রন্থই রচিত লইয়াছে। কোন্ জলে চার স্বাদ উৎকৃষ্ট হয় সেই বিষয়েও একাধিক গ্রন্থের পরিচয় পাই। এক লেখক সাত নদীর তুলনা করিয়া ইয়াংসির জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। চার জন্য জল গরম করিবার নিয়মও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তাঙ্ আমলের এক ব্যক্তি ষোলটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিন প্রবন্ধে জল ফুটিবার মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার সঙ্কেত আছে। তিন প্রবন্ধে জল ঢালিবার নিয়ম বিবৃত হইয়াছে। কেট্‌লি ও অন্যান্য পাত্র সম্বন্ধে পাঁচ প্রবন্ধ লিখিত। আর জ্বালানি কাষ্ঠের কথা পাঁচ প্রবন্ধে পাই।

মদ চোঁয়ান, বাগান তৈয়ারি করা, বাঁশের খোল প্রস্তুত করা, পাখীধরা, মাছধরা, ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ই চীনা সাহিত্যে আছে। ভারতীয় চৌষট্টি কলার মধ্যে এই ধরণের অনেক জিনিষ অন্তর্গত। সেই সকল কলা সম্বন্ধীয় সাহিত্য ভারতেও ছিল। সেই সমুদয়ের আলোচনা অল্পবিস্তর আজকাল দেখা যাইতেছে।

শ্রী ———

ঢাকায় রথযাত্রা। *

বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যার "ভারতী"তে "চল্‌তি ভাষা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক বলেন—

"সাহিত্য কার ইঙ্গিতে চলে? এক একজন প্রতিভাবান এসে সারথি হন তাঁরাই সাহিত্যকে গতি-দান করেন। এঁদের দ্বারাই সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি হয়;—বাকি লোক তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ করে।

"যিনি সাহিত্যের মহারথী তিনি রথ হাঁকিয়ে চলেন সেই রথের চাপে সাহিত্যের রাস্তা আপনি তৈরি হয়ে ওঠে। সে রথ কল্‌কাতার মধ্যেই চলুক, কি ঢাকায় চলুক তাতে কিছু আসে-যায় না। আজ্‌কের দিনে কল্‌কাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাংলাদেশ সেইদিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে। এমন যদি কোনো দিন আসে যখন ঢাকার পথে এমনিতর করে রথের চাকা ঘর্ঘর শব্দে চল্‌তে থাক্‌বে তখন সমস্ত বাংলাদেশ ঢাকার দিকেই অবাক্-দৃষ্টি ফেরাবে;—সেই রথের আগে আগে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধার নমস্কার আপনি অবনত হয়ে পড়বে। তুমি বাঁধাপথ তৈরি করতে চাচ্ছ—সেই বাঁধাপথে যে সাহিত্যের মহারথী রথ চালাবেন এমন সুবোধ চালক তিনি নন। তাঁর কাজই যে ওই যে তাঁকে নূতন পথ দেখাতে হবে।"

"বর্ত্তমান সাহিত্যরথী যে-পথ তৈরি করে দিচ্ছেন, সে পথে তোমার আমার মতো সামান্য কারবারিকে চলতেই হবে। পূর্ব্ব অঞ্চল পশ্চিমের প্রতি অভিমান করে বসে থাকলে চলবে না। এখন ঐ এক রাস্তা! কারণ আর সব পথ অন্ধকারে ঢেকে আস্‌ছে—অব্যবহারে মরে আস্‌ছে; সে পথ অচেনা অজানা হয়ে পড়েছে। তার গতি থেমে গেছে—তাকে ছাড়িয়া চলবার ডাক আমরা শুনতে পেয়েছি। কাজেই যে

* পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত।

পথ তৈরি-হতে-হতে চলেছে সে পথের যাত্রী আমাদের হতেই হবে। তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে গলা ভাঙ্‌তে পারি, আর কিছু পারব না। সারথির রথের চাপে চাপে সাহিত্যের পথ তৈরি হতে হতেই চলবে।"

পুরাকালে রোমান সম্রাট্‌গণ যখন দিগ্বিজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন রোমনগরীর রাজপথে তাঁহাদের রথের চাকার সহিত বিজিত রাজাদিগকে নাকি বাঁধিয়া দেওয়া হইত। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-সম্রাটের দ্বারাও বোধ হয় এইরূপ একটা অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার কোন কোন পার্শ্বচরের মনে সাধ হইয়াছে। কলিকাতার রাজপথে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রথারোহণ করিয়া আকাশে ধ্বজা উড়াইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বন্দি-মাগধগণ তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে করিতে চলিয়াছেন, তাঁহার রথনেমির ঘর্ঘর শব্দে দিগ্‌বলয় মুখরিত হইয়াছে—এরূপ দৃশ্য খুব মনোহর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রথের চাকার সহিত বাঁধিয়া দেওয়ার লোক কয় জন মিলিবে? সম্রাটের বিজয়-ভেরী তো অনেককাল যাবৎ বঙ্গদেশ কম্পিত করিয়া নিনাদিত হইতেছে, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের কথা দূরে থাকুক, এপর্য্যন্ত কয়জন কলিকাতাবাসী সাহিত্যিক তাহাতে সাড়া দিয়াছেন?

যখন লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজি হইতেছে না, তখন সম্রাট অবশ্যই তাঁহার বিদ্রোহী প্রজা দমনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে কোন দিকে পতিত হইবে? ভারতীর লেখক তাহার আভাষ দিয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় ঢাকা এক সময়ে বঙ্গের রাজধানী ছিল, ঢাকা কোন কোন বিষয়ে এখনও কলিকাতার সহিত প্রতিযোগীতা করিতে প্রস্তুত, আবার সম্প্রতি বিদ্রোহীদল ঢাকায় তাহাদের একটা কেল্লা স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং খুব সম্ভব অচিরে ঢাকার রাজপথে তাঁহার রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শুনা যাইবে। ঢাকার সাহিত্যিকগণ সাবধান হউন!

কিন্তু ঢাকার ভাগ্যে যদি সাহিত্য-সম্রাটের রথযাত্রা দর্শন ঘটে তবে ঢাকাবাসিগণের এক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি। সম্রাটের রথ তো নবাবপুর পাটুয়াটুলীর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের চল্‌তি রাস্তায় চলিবে না। শুনিতেছি সেই রথের চাপে নাকি নূতন রাস্তা "আপনি তৈরি হয়ে উঠে।" কলিকাতার Improvement Trust কলিকাতাসহরে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার এই "সুবর্ণসুযোগ" কেন পরিত্যাগ করিতেছেন বুঝি না। আশা করি ঢাকার মিউনিসিপালিটী এই সুযোগ ছাড়িবেন না। যাহাতে সেই রথটা সর্ব্বপ্রথমে শাঁখারিবাজারের দিকে চলে পূর্ব্ব হইতে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। তাহা হইলে বিনা অর্থব্যয়ে একটা খাসা নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়া ঐ সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবে।

আরনা—এবার রূপক ছাড়িয়া আসল কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যা'ক। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কলিকাতার চল্‌তি ভাষায় কাব্য উপন্যাস প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ঠাকুরবাটীর কোন কোন লেখক লেখিকা এবং রবীন্দ্রনাথের কোন কোন পার্ষদও সেই ভাষায় লেখেন। আবার "সবুজ পত্র" সম্পাদক মিঃ প্রমথ চৌধুরীও কলিকাতার চল্‌তি ভাষাকেই বঙ্গসাহিত্য রচনার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা মনে করেন। তিনি কলিকাতার চল্‌তি ভাষার নাম দিয়াছেন "মাতৃভাষা", আর এতকাল যে ভাষায় বঙ্গ-সাহিত্য রচিত হইয়া আসিয়াছে তাহা নাকি আমাদের ধারকরা ভাষা। বলা বাহুল্য তাঁহার এইমত সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া এই মতের আলোচনা হইতেছে, অনেকেই এইমত নিতান্ত অসার বলিয়া মনে করেন। গতবৎসর আষাঢ় মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় আমি এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম "মাতৃভাষা" যদি সাহিত্যে চলে, তবে কলিকাতা অঞ্চলের মাতৃভাষার ন্যায় মেদিনীপুর, মানভূম, যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রামের মাতৃভাষাগণও সমানভাবে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়া প্রচলিত সাধুভাষার সঙ্গে এক

মস্ত লড়াই বাধাইয়া দিবে। ইহাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। মিঃ চৌধুরী তাহার পরে সবুজ পত্রে ও অন্যান্য পত্রিকায় এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু একথার জবাব এপর্য্যন্ত দেন নাই। "ভারতীর" লেখক রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়া সেই "মাতৃভাষা"কে আবার "চল্‌তি ভাষা" নামে বঙ্গসাহিত্যে চালাইতে চান। তাঁহার কথা এই, রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যসম্রাট্, তখন সামান্য সাহিত্যসেবীগণ তাঁহার ভাষায় লিখিতে বাধ্য। "বর্ত্তমান সাহিত্যরথী যেপথ তৈরি করে দিচ্ছেন, সে পথে তোমার আমার মতো সামান্য কারবারিকে চল্‌তেই হবে।"

কিন্তু সাহিত্যসম্রাট্ ত এদেশে নূতন হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও ত ইহার পূর্ব্বে সাহিত্যসম্রাট ছিলেন। তাঁহার আমলে সাহিত্যক্ষেত্রে democracy ছিল, এরূপ autocracy হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে যদি autocracy যুগের অবসান হইয়া থাকে, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে কি তাহা এখনও চলিবে? বঙ্কিমচন্দ্র যখন পূর্ণমার্ত্তণ্ড-তেজে সাহিত্যগগনে উদিত ছিলেন, তখন আরও কত ছোট বড় সাহিত্যিক বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং পুস্তকাদিও কত লিখিয়াছেন। গদ্যসাহিত্যে ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং পদ্যসাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কত লেখক বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার যাহা classics তাহা তো ইঁহাদেরই রচনা। কিন্তু কই, ইঁহারা কেহই ত বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাষার অনুকরণ করেন নাই। সাধুভাষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ইঁহাদেরই ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও অবশ্য সাধুভাষা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত ইঁহাদের ভাষার পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও ক্রমশঃ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলাতে "লম্ফত্যাগ" "নিদ্রাগমন" লিখিয়া বিষবৃক্ষে "গরু ঠেঙ্গাইয়া" ছিলেন। তাঁহার ভাষা প্রথমে অনেকটা সংস্কৃতঘেঁসা ছিল, পরে তাহা কথোপকথনের সরল ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কথোপকথনের সরল ভাষায় তো দোষ নাই, কিন্তু সেই ভাষার সঙ্গে যদি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হয়—যাহা একজেলার লোকে ব্যবহার করে অন্য জেলার লোকে করে না—ইহাই আপত্তিজনক। এইরূপ প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারে বঙ্গসাহিত্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতির পথে বাধা পড়িবে।

এই ধরুন উপরের উদ্ধৃতাংশে আছে—"আজকের দিনে কলকাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন,—সমস্ত বাংলাদেশ সেই দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে।" এই বাক্যে অবশ্য কলিকাতার চল্‌তি ভাষা অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষায় রচিত। কিন্তু একজন ঢাকাবাসী বা চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে ইহা চলিত ভাষা নহে, এবং তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও এরূপ ভাষায় লিখিতে পারিবেন না, লিখিলেও তাহা সহজ ও স্বাভাবিক হইবে না, তাহা ধারকরা জিনিষের ন্যায় কৃত্রিম হইবে এবং পদে পদে সেই কৃত্রিমতা ধরা পড়িবে। আবার তিনি যে কলিকাতার চল্‌তি কথা লিখিবেন, হয়ত তাহা তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও কলিকাতাবাসীর ন্যায় উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। যে সকল সাহিত্যরথী উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান করেন—যাঁহারা "বাঙ্গলা" শব্দকে "বাংলায়," "কি" শব্দকে "কী" তে, "উড়াইয়া" কে "উড়িয়েতে" "হইতেছেকে" "হচ্ছেতে" বিকৃত করিতেছেন, তাঁহারা ঢাকা ও চট্টগ্রামবাসী লেখককে কোন ভাষায় লিখিতে বলেন জানিতে ইচ্ছা করি। কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিক শব্দ যখন তাঁহারা বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার ভাষায় পুস্তকাদি লিখিলেও যখন তাহা অন্য জেলার লোকে বুঝিতে পারিবে না, অবশ্যই তাঁহাদিগকে সাধু ভাষায় লিখিতে হইবে। কলিকাতার প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিলে উল্লিখিত বাক্যটি এইরূপ দাঁড়ায়:—

"আজকার দিনে কলিকাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়াছেন—সমস্ত

বাঙ্গলাদেশ সেই দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে।” বলা বাহুল্য ইহাই সাধুভাষা, বাঙ্গলা ক্লাসিকের ভাষা, এবং ইহাই সমগ্র বঙ্গদেশের চল্‌তি ভাষা। অবশ্য কথোপকথনের চল্‌তি ভাষা নহে, লেখার চল্‌তি ভাষা। মেদিনীপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশের লোক এখনও এই চল্‌তি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে, চিঠিপত্র লেখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য রাজকার্য্য প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের লোকের কথোপকথন মেদিনীপুরের লোকে, অথবা মানভূমের লোকের কথোপকথন ময়মনসিংহের লোকে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এই সাধুভাষায় তাহাদের মধ্যে চিঠি পত্র লেখা হয় বলিয়া এই সকল জেলার লোক সকলেই নিজদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, এবং সেই পরিচয়দানে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করে। নচেৎ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানভূমের লোক এত আন্দোলন করিতেছে কেন? এই সাধুভাষাই বঙ্গদেশের “lingua franca.” ইংরেজী সাহিত্য যে “King's English” এ লিখিত, তাহাও এইরূপ প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত সাধুভাষা। তাহা লণ্ডনের Cockney dialect ও নহে, আবার Yorkshire এর গ্রাম্য dialect ও নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করি, সাধুভাষা কি মরিয়া গিয়াছে? অথবা “অব্যবহারে মরে আস্‌ছে?” অথবা “অচেনা অজানা হয়ে এসেছে?” অথবা “তাহার গতি থেমে গেছে?” বলা বাহুল্য এসব কবির কল্পনা। যিনি এরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই কলিকাতার যোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাটীর বাহিরের অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গসাহিত্যও কি তিনি পড়েন না? কলিকাতা হইতে যে সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় তাহাও কি তিনি কখন দেখেন না? সে গুলি কি কলিকাতার চল্‌তিভাষায় লিখিত? কখনই না। সুতরাং সাধুভাষার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্পাদনের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। মফঃস্বলের কথা দূরে থাকুক নিজ কলিকাতার শতকরা ৯৯ জন লোকেও যখন এখন পর্য্যন্ত সাধুভাষায় চিঠি লিখিতেছেন, পুস্তক রচনা করিতেছেন, সংবাদপত্র লিখিতেছেন, তখন সাধুভাষার এত শীঘ্র শীঘ্র গঙ্গাযাত্রা করা সম্ভব হইবে কি? যে “মোঁড়লকে” তাঁহার নিজ বাসস্থান কলিকাতার লোকে মানে না, তাঁহাকে ঢাকা বা চট্টগ্রামের লোকে মানিবে কেন?

কলিকাতার চলতিভাষা ব্যবহার করাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কোন অভিমানের কারণ আছে কি? তাহা কখনও নহে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী শিক্ষিত লোকেরা প্রায় সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক পশ্চিম বঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া থাকেন—লেখাতেও করেন, কথোপকথনেও করেন। বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের লোকদিগের সহিত মিশিতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ অনেকেই তাঁহাদের ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করেন। গ্রন্থরচনাতেও পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণ যতদূর সম্ভব তাঁহাদের প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিশুদ্ধ সাধুভাষা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ঢাকাজেলাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আর “বাড়ীর থনে আইছি” বলেন না, “বাড়ীর থেকে আইছি” অথবা “বাড়ীর থেকে এসেছি” বলেন, এবং লিখিবার সময় “বাড়ী হইতে আসিয়াছি” লেখেন। মিঃ পি, চৌধুরী যেমন পাবনা জেলার লোক হইয়াও খাস কলিকাতার ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, ঢাকা ফরিদপুর কি বরিশালবাসী এরূপ অনেক লোক আছেন যে তাঁহাদের কথা শুনিলে তাঁহাদিগকে যেন কলিকাতাবাসী বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের পশ্চিমবঙ্গের ভাষা অবলম্বন করা বিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান নাই। যাহা সুন্দর, শ্রুতিমধুর, বিশুদ্ধ ও সুমার্জ্জিত তাহা গ্রহণ না করাই নির্ব্বুদ্ধিতা। মাতৃভাষার সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? যেখানে যে সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে দেখিব তাহা তুলিয়া আনিয়া মায়ের শ্রীঅঙ্গ মনের সাধে সাজাইব। চাই কি সে ফুল কলিকাতার ইডেনগার্ডেনেই ফুটুক অথবা চট্টগ্রামের পাহাড়েই ফুটুক। তবে সে ফুল স্বাভাবিক হওয়া চাই, কৃত্রিম হইলে চলিবে না। যে পূর্ব্ববঙ্গের লেখক

কলিকাতার চলতি ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ ভাষায় ইচ্ছা করিলে পুস্তক রচনা করিতে পারেন, যেমন মিঃ চৌধুরী সবুজপত্রে লিখিতেছেন। তাঁহার লেখনীতে সে ভাষা আদৌ অবলম্বনীয় নহে। এই ধরুন, আমি যদি সে ভাষায় পুস্তকরচনা করি, তবে প্রতিছত্রে আমার idiom এর দোষ ঘটিবে। আমি দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান হেতু পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছি বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ গর্ব্ব ছিল। কিন্তু আমার "উড়িষ্যার চিত্র" হইতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক ঝুড়ি idiom এর ভুল বাহির করিয়াছিলেন। আমার "ধ্রুবতারা" হইতেও আমার আর একটী বন্ধু অনেক গুলি idiom এর ভুল ধরিয়াছিলেন। অবশ্য এসব ভুল কথোপকথনের ভাষায় ছিল। সুহৃদবর সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তক "গৃহশ্রী" কতকটা কলিকাতার কথোপকথনের ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে বিস্তর idiom এর ভুল আছে। ফলতঃ যে ভাষা আমাদের মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা রক্তমাংসের সামিল করি নাই, তাহা আয়ত্ত করা যে কতদুর কষ্টসাধ্য তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। যাঁহার কলিকাতার চল্‌তি ভাষা আয়ত্ত করিবার সুযোগ ঘটে নাই, তিনি কি হাজার প্রতিভাশালী হইয়াও সাহিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন? পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি বীণাপাণির বরপুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের হৃদয়ের কবিত্ববহ্নি কি তবে তাঁহার হৃদয়েই নির্ব্বাপিত করা উচিত ছিল? বলাবাহুল্য ইহা নিতান্ত জোর জবরদস্তীর কথা। সাহিত্য-সম্রাটের পেয়াদা ডিক্রিজারিই করুন, অথবা তাঁহারা পুলিস জামিন মুচলিকায়ই আবদ্ধ করুন, গোবিন্দচন্দ্র দাসের ন্যায় কবি কখনও তাঁহার চিরাভ্যস্ত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার চল্‌তি ভাষায় কাব্য রচনা করিবেন না। করিলে তাঁহার লেখা সব মাটি হইবে। কলিকাতার চল্‌তি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের লোককে বাল্যকালে কলিকাতায় গিয়া প্রাইমেরী স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা যে সাধুভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাও ত তাঁহাদের "মাতৃভাষা" নহে? সাধুভাষা যেমন তাঁহারা কষ্টস্বীকার করিয়া আয়ত্ত করেন, কলিকাতার চল্‌তি ভাষাও সেইরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন। কিন্তু সাধুভাষা বহুকালের অভ্যাস বশতঃ আমাদের মাতৃভাষার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালে যাহারা কখনও ছাপার বই পড়িত না, তালপাতায় কলার পাতায় লিখিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, তাহারাও চিঠিপত্র লিখিতে বসিলে "করছে" না লিখিয়া "করিয়াছে" লিখিত, "করতে আছে" না লিখিয়া "করিতেছে" লিখিত, "তিনির" না লিখিয়া "তাঁহার" লিখিত। এই সকল কথোপকথনের ভাষা সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিলেই সাধুভাষা হইয়া দাঁড়ায়। যে লোকটী বসিয়া আছে তাহার পক্ষে সোজা হইয়া দাঁড়ান যতটা স্বাভাবিক, এই কথোপকথনের ভাষার সাধুভাষায় পরিবর্ত্তিত হওয়াও ততটা স্বাভাবিক। যে মুখে "করতে আছে" বলে, তাহার পক্ষে "করিতেছে" লেখা যতটা সহজসাধ্য "কোচ্ছে" লেখা ততটা সহজসাধ্য নহে, বই দেখিয়া লিখিলেও মুখে উচ্চারণ করা একেবারেই সম্ভবপর নহে। আমরা বাল্যকাল হইতে যে সকল ছাপার বই পড়িয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিতেছি, সে গুলি সাধুভাষায় লিখিত বলিয়া, সাধুভাষা আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ হইয়াছে। এইরূপে সাধুভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য। কলিকাতার চলিতভাষা যদি কখনও এইরূপ ভাবে সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়, তবে তাহাও সাধুভাষার ন্যায় আমাদের মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু তাহা দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। একজন সাহিত্য-সম্রাট যত বড় ক্ষমতাশালীই হউন, তিনি একবার রথ চালাইয়া গেলেই তাঁহার রথের চাপে এইরূপ ভাঙ্গাগড়া হইতে পারে না। তিনি হয়ত অনেক জিনিষ সহজে ভাঙ্গিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্থলে অন্য জিনিস গড়িয়া তোলা ততদুর সহজ-

সাধ্য নহে। একটী চঞ্চল শিশু অতি সহজে এক আঘাতে একটা পুতুল ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু সেইরূপ আর একটী পুতুল গড়া তাহার বাপেরও অসাধ্য।

আর এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার পক্ষে প্রকৃতিই বাধা দিবে। সাহিত্য-সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত সৈন্যবল লইয়াও সেই প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সমস্ত বঙ্গদেশ যদি আজ কলিকাতার চল্‌তিভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করে, কালই দেখিবে জেলায় জেলায় সেই ভাষার কত পার্থক্য হইয়া দাঁড়াইবে। একটা প্রবাদ আছে যোজনান্তরই আমাদের কথিত ভাষার পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ইহার কারণ কি? দেশের জল বায়ুর পার্থক্য দ্বারা আমাদের গলার স্বর ও উচ্চারণ প্রণালীর পার্থক্য ঘটে। তৎপরে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংস্থান, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, বিভিন্ন চিন্তা প্রণালীর দ্বারাও কথিতভাষায় বিভিন্নতা ঘটে। আবার ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সংস্পর্শে আসিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জেলার কথিতভাষা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মুসলমান প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে অনেক আরবী ও পারসী ভাষা কথিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আবার পণ্ডিতবহুল নদীয়া জেলায় কথিত ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। বঙ্গদেশের সীমান্ত জেলাসমূহে, যেমন মেদিনীপুর, মানভূম, দিনাজপুর, চট্টগ্রামে, যথাক্রমে উড়িয়া, কোল সাঁওতালী, হিন্দুস্থানী ও মগদিগের ভাষা কথিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে কিম্ভূতকিমাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। নিজ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে ইংরেজী কথা এত বেশী চলিয়া গিয়াছে, যে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের চলিতভাষা ইংরেজী না জানা মফঃস্বলবাসীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সাহিত্য-সম্রাটের খাস বাঙ্গালাভাষা—যদি তাহাকে King's Bengali বলিতে চাও ত বলিতে পার—তাহাও ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালীর বোধগম্য নহে এরূপ আমি কোন কোন উচ্চশিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি। সুতরাং তাঁহার কিম্বা তাঁহার পার্শ্বদবর্গের চল্‌তিভাষাতো দূরের কথা, কলিকাতার সাধারণ কথোপকথনের চল্‌তিভাষাও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হওয়ার অনেক বিলম্ব আছে। পূর্ব্ববঙ্গের জিহ্বা কোন ক্রমেই আমের স্থানে "আঁব" উচ্চারণ করিতে রাজি হইবে না। তাহা চিরদিন আম্রের অপভ্রংস "আম" উচ্চারণ করিবে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক সেই "আম" পাঠাইতে লিখিলে দ্বারভাঙ্গার লোকই হউক অথবা মালদার লোকই হউক সেই আমের পরিবর্ত্তে কখনও জাম পাঠাইবে না।

আর একটা কথা বলিয়া আমি এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। ভারতীর লেখক বলেন "এমন যদি কোন দিন আসে যখন ঢাকার পথে এমনিতর করে রথের চাকা ঘর্ঘর শব্দে চল্‌তে থাকবে তখন সমস্ত বাংলাদেশ ঢাকার দিকেই অবাক্ দৃষ্টি ফেরাবে—সেই রথের আগে তাহার হৃদয়ের নমস্কার আপনি অবনত হয়ে পড়বে।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না। কারণ এরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবপর নহে। সাহিত্য সম্রাটকে "হৃদয়ের নমস্কার" দেওয়া এক কথা—এতদিন আমরা মাথার নমস্কারই জানিতাম, ইহার পরে হয়ত কবে শুনিব মস্তকের ভ্রমণ, কারণ সব জিনিষকে ভেস্তা করিয়া ফেলাই হইতেছে এখনকার দিনে কৃতিত্বের লক্ষণ—যাহা হউক হৃদয়ের নমস্কার অথবা শিরের নমস্কার এককথা আর সাহিত্য-সম্রাটের হাতের অক্ষর, মাথার চুল, গায়ের চাদর, লেখার ছাঁদ, অন্য কমা সেমিকোলনের অন্ধ অনুকরণ করা আর এক কথা। সাহিত্য-সম্রাটকে যদি কেবল ভাষার রাজা বানাইতে চাও তবে তাঁহার অবমাননা করা হইবে। তিনি ভাষার রাজা নহেন, ভাবের রাজা। লোকে তাঁহার পূজা করে তাঁহার ভাষার জন্য নহে, তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ ভাবের প্রস্রবণ ছোটে বলিয়া। তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভাবের লহরীলীলা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হয়, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁহার অনন্যসাধারণ ভাবের খাতিরে লোকে তাঁহার ভাষার দোষ সহ্য করে। যেমন কোন কোন বিখ্যাত গায়ক কি বাদকের মুদ্রাদোষ থাকিলেও তাঁহার গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া লোকে সেই মুদ্রাদোষ

দেখিয়াও দেখে না। যদি ঢাকায় কখনও কোন সাহিত্য-সম্রাট আবিভূর্ত হন আর তিনি যদি সাধুভাষা ছাড়িয়া ঢাকার চলতি ভাষায় পুস্তক রচনা করেন, তবে তিনিও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অনন্যসাধারণ ভাবের জন্য পূজিত হইবেন কিন্তু তাঁহার ভাষার জন্য উপহসিত হইবেন। সাধুভাষা ছাড়িয়া কেহ কখনও তাঁহার ঢাকাই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবে না এ কথা ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালী চিরদিন যে সাধুভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে সেই সাধুভাষারই সেবা করিবে। এই সাধুভাষাই বঙ্গের চলতি ভাষা এবং বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। কেবল বঙ্গদেশবাসীর নহে, বঙ্গের বাহিরে—সুদূর পশ্চিমে, মান্দ্রাজ বোম্বাই সিংহলে, উড়িষ্যা আসামে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছেন, যাঁহারা হয়ত কখনও কলিকাতার চলতি ভাষা কি জানেন না, এই সাধুভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা এবং তাঁহাদের লেখার চলতি ভাষা। এই সাধুভাষা দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিকট যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কলিকাতার চলতি ভাষা দ্বারা তাহা কখনও পারিবেন না। বঙ্গসাহিত্যে এক সম্রাট আছেন, আর এক সম্রাট হইবেন—এক সম্রাট কলিকাতার ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, হয়ত আর এক সম্রাট ঢাকার ভাষায় করিবেন—কিন্তু আমরা কোনও সম্রাট বিশেষের দিগ্‌বিজয়ের খাতিরে কখনও সর্ব্বতোবিজয়িনী জননী বঙ্গবাণীর গৌরব খর্ব্ব করিব না। তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী সমগ্র ভারতবর্ষে উড্ডীয়মান হউক, তাঁহার রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে ভারতের গগণ ভেদ করিয়া পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

"রাজা ও প্রজা"।

প্রস্তাবনা।

রাজার স্বরূপ, রাজার প্রয়োজন, বেদে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে; লোকহিতার্থ গৃহীতশরীর ঋষিগণ রাজার বেদবর্ণিত স্বরূপ যাহাতে সকলে যথাযথভাবে দেখিতে পান, রাজার বেদপ্রদর্শিত প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন, এই উদ্দেশ্যে রাজার স্বরূপ ও প্রয়োজন বিষয়ক বেদোপদেশ সমূহের বিশদভাবে সুগম ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসমুদায়ে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, নীতিশাস্ত্রে রাজার স্বরূপ সমুজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, রাজার প্রয়োজন সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রনিকর পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়, রাজার স্বরূপ ও রাজার প্রয়োজনবোধ সুখশান্তি প্রার্থী মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। পরমেশ্বরের স্বরূপদর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, রাজার তত্ত্বান্বেষণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা যে তাঁহাদের সুখবোধ্য হইবে তাহা বিশ্বাস হয়।

রাজার স্বরূপদর্শন ও রাজার প্রয়োজন বোধ সুখশান্তি প্রার্থী মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক

রাজাকে বৈদিক আর্য্যজাতি দেবতা জ্ঞান করিতেন, বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে প্রকৃত রাজা নররূপে অবতীর্ণ মহতী দেবতা, মানুষ নহেন।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ

বিশ্বসম্রাট্ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্বপ্রতিনিধিরূপে প্রেরিত রাজাকে যাঁহারা দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহারা কখনও ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শনে পারগ হয়েন না, তাঁহারা কখনও রাজাকে যথার্থভাবে ভক্তিকরিতে সমর্থ হয়েন না। জীব ভগবান্‌কে ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে জানিতে পারে না; শাস্ত্রের উপদেশ, করুণাময় ভগবানই জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভাবকে প্রবোধিত করেন, জীবকে মহাকর্ষণসূত্র বা বিশ্বজনীন প্রেমরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করেন, পিতৃরূপে মাতৃরূপে, গুরুরূপে, ভ্রাতৃরূপে, বন্ধুমূর্ত্তিতে, ধনদাকারে

স্বধর্ম্মপরায়ণ

স্নেহময় নিয়ামক বা শাসকরূপে, এক কথায় সর্ব্বভাবরূপে জীবকে দর্শন দেন, স্বীয় স্বরূপ জানান। তিনি ভিন্ন জীবের যে আর কেহ প্রকৃত উপকারক নাই রক্ষাকর্ত্তা নাই, অভাববিমোচক নাই, জীবকে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা তাহা বুঝাইয়া থাকেন। বাস্তবরূপদর্শন যে স্থানে অসম্ভব বা সুখসাধ্য নহে, তৎস্থানে প্রতিকৃতি দ্বারা বাস্তবরূপদর্শনের ইচ্ছা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হইয়া থাকে। স্বরূপের উপাসনা সম্ভব না হইলে প্রতীকের উপাসনা করিতে হয়, প্রসিদ্ধ- পূর্ব্বপ্রমিত (known or ascertained previously) অর্থের সাধর্ম্ম্য—সাদৃশ্যজ্ঞান (knowledge of similarity) হইতে সাধ্যের—প্রমেয় অর্থান্তরের সিদ্ধি হইয়া থাকে, পরমেশ্বর এই নিমিত্ত রাজাকে স্বীয় শক্তিবিশেষ দ্বারা পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট করে সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যসম্পাদনার্থ স্বীয় প্রতিনিধিরূপে মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করেন; লোকে রাজাতে পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, প্রকৃত রাজার স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, প্রকৃত রাজার হৃদয়রমণ রূপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইবে, এই উদ্দেশ্যে রাজারূপে অবতীর্ণ হয়েন। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এই নিমিত্ত স্বীয় প্রভাব দ্বারা ইনি সকল প্রাণীকে অভিভূত করিতে পারেন, প্রতাপে রাজা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদির সমান, রাজা অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট। বালক হইলেও রাজাকে সাধারণ মনুষ্যবোধে অবজ্ঞা করিবে না, রাজা বস্তুতঃ মানুষ নহেন, রাজা মনুষ্যরূপে বিদ্যমান প্রধান দেবতাবিশেষ।

শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত শুক্রনীতিসার নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দেবাংশসম্ভূত, অপিচ যে রাজা ধর্ম্মবিলোপী, প্রজাপীড়ক, সে রাজা রাক্ষসের অংশভূত, সে রাজা অসুরাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজাতে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, গুরুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, বৈশ্রবণত্ব, (ধনপতিত্ব) ও যমত্ব (দণ্ডধরত্ব) এই সপ্তগুণ নিত্য বিদ্যমান থাকে, কখন অন্যথা হয়না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—প্রজাগণ যে ধর্ম্মাচরণ করে, ধর্ম্মপালক রাজাই তাহার মূল কারণ, প্রজাগণ রাজভয়েই পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে পারেনা। চন্দ্রসূর্য্যের অনুদয়ে জীবগণ যেমন ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়, কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, রাজা না থাকিলে প্রজাগণও সেইরূপ পালকবিহীন পশুনিকরের ন্যায় ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। রাজা যদি রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে বলবান্ বলপূর্ব্বক হীনবলদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিত, তাহারা স্ব-স্ব-সামর্থ্যানুসারে পরম আগ্রহেও তাহা রক্ষা করিতে পারগ হইত না, তাহা হইলে, কেহই এই বস্তু আমার এইরূপ জ্ঞান করিতে পারিত না, তাহা হইলে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, অথবা অপর কোন বস্তুই স্বায়ত্ত থাকিত না। গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া লোকে যেমন স্বচ্ছন্দে গৃহমধ্যে নিদ্রা যায়, নৃপতিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মনুষ্যগণ সেইরূপ অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সুখে নিদ্রা যায়। যাঁহার অবস্থানে সকলেই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে, যাঁহার অভাবে সকলেরই অভাব উপস্থিত হয়, যিনি পিতার ন্যায় প্রজাকে রক্ষা করেন যিনি সর্ব্বদা প্রজার গুণসাধনে তৎপর যিনি পুষ্টিবিধাত্রী ও অপরাধ সমূহের ক্ষময়িত্রী মাতার ন্যায় প্রজাবর্গের পোষক ও ক্ষমাশীল, আচার্য্য যে প্রকার শিষ্যকে সুবিদ্যা অধ্যাপন ও হিতোপদেশ প্রদান করেন, যিনি সেইপ্রকার প্রজার বিদ্যাদাতা ও হিতোপদেষ্টা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ধর্ম্মাবতারবোধে সর্ব্বান্তঃকরণে আদর করা আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রের প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। এমন পরম হিতকর রাজাকে—বিশ্বসম্রাটের প্রতিনিধিকে দেবতাজ্ঞান করাকে যাঁহারা অর্দ্ধসভ্যোচিত বলিয়াছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন, রাজা যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, রাজা যে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের সারভূত অংশদ্বারা প্রজাপতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট পদার্থ তাহা নিঃসন্দেহ। রাজভক্তি যথার্থভাবে পরিপুষ্ট হইলে সর্ব্বসুখনিদান পরমেশভক্তি লাভপূর্ব্বক মনুষ্য কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।

রাজাতে দেবতাবুদ্ধি অর্দ্ধসভ্যোচিত হইলেও এইরূপ বুদ্ধি যে হিতকরী শান্তি-সুখবিধাত্রী, তাহা নিশ্চিত। রাজার জীবন রাজাকে দেবতাজ্ঞানে পূজক, অর্দ্ধসভ্য-বোধে উপেক্ষিত বৈদিক আর্য্যজাতির সমীপেই যে অনেকতঃ শঙ্কাবিহীন, ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে তাহাই বলেন। প্রকৃত রাজভক্তি কাহাকে বলে বৈদিক আর্য্যজাতিই তাহা জানিতেন, এখনও অবিকৃত বৈদিক আর্য্যবংশধরগণই তাহা জানেন, রাজাকে দেবতাবোধে দেখিতেন, তাই শুদ্ধ রাজভক্তি বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়কেই তাঁহার উপযুক্ত আসনরূপে স্থির করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালক রাজা স্বভাবতঃ কল্যাণগুণগ্রামবিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই কল্যাণগুণ সমূহের নিশ্চয়ই পরভাব আছে, অপরিচ্ছিন্নভাব বা পূর্ণরূপ আছে; ঈশ্বর বা ভগবানই পিতৃত্বাদি কল্যাণগুণ নিকরের আশ্রয়, ভগবানেই ইহারা পূর্ণভাবে বিদ্যমান; বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রনিবহ *এই নিমিত্ত ভগবানকেই মূল রাজা বলিয়াছেন,*—মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক যাঁহারা ধর্ম্মসংরক্ষণাদি রাজকার্য্য সম্পাদন করেন, শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশিষ্ট-তেজঃ সম্ভূত রাজপ্রতিনিধি।

যাঁহারা রাজাকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, রাজার স্বরূপ তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঠিকভাবে পতিত হয় না। বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহ রাজাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, যাঁহারা সেই দৃষ্টিতেই রাজাকে দেখিয়া থাকেন, রাজার স্বরূপদর্শনের চেষ্টা যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহা বুঝেন। আমরা এই জন্য বলিয়াছি, পরমেশ্বরের স্বরূপদর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, রাজার তত্ত্বান্বেষণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা তাঁহাদের সুখবোধও হইবে। দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজার প্রয়োজন, পূর্ণভাবে না হইলেও ঈষৎসভ্য মানুষ হইতে উচ্চতম সভ্যতা সোপানারূঢ় মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই যে উপলব্ধি করেন, তাহা স্থির। যাঁহারা রাজাকে দেবতাজ্ঞান করাকে অর্দ্ধসভ্যোচিত ব্যবহার বলিয়াছেন, তাঁহারাও অরাজক জনপদ যে বিবিধ দোষের আকর, রাজা না থাকিলে মানুষের যে ক্লেশের সীমা থাকে না, মানুষের অপায়পরিহার হয় না, তাহা হইলে দুর্ব্বল যে বলবান-দিগদ্বারা সদা উৎপীড়িত হয়, অভিভূত হয়, অরাজক জনপদে যে ভীষণ পাপের স্রোতঃ প্রখর বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহা স্বীকার করেন।

পাশ্চাত্য সুধীবর্গের মধ্যে অনেকের মতে এক প্রভুক -একরাজায়ত্ত রাষ্ট্র (Monarchical Government) সুসভ্যজাতির মধ্যে থাকা উচিত নহে। জার্ম্মন দেশীয় পণ্ডিত বুক্‌নার (L. Buchner) বলিয়াছেন 'রাজনৈতিক সম্বন্ধানুসারে কোন ব্যক্তি প্রজা বা রাজা (প্রভু) হইতে পারে না'। পণ্ডিত বুক্‌নার প্রজাতন্ত্র রাজ্যকেই (Republican form of Government) আদর করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস, কালে সমস্ত সভ্য রাজ্য প্রজাতন্ত্ররাজ্যে পরিণত হইবে। আমরা পণ্ডিত বুক্‌নার প্রভৃতি পাশ্চাত্য কোবিদ-কুলের সহিত একমত হইতে পারি নাই। বেদে, স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রসমূহে একরাজায়ত্ত রাজ্যেরই প্রশংসা আছে, এক প্রভুক রাষ্ট্রই যে প্রাকৃতিক নিয়মে হওয়া উচিত শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আমাদের ইহাই ধারণা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, রাজার অভিষেক সময়ে আচার্য্য সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীর 'একজনই রাজা হইন' এইরূপ ইচ্ছাভিব্যঞ্জক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।* একরাজায়ত্ত রাষ্ট্রই যে বেদের অভিমত ইহা হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পণ্ডিত বুকনার বলিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি সমূহের নিয়ামকরূপে মানিতে যাইব কেন? ব্যক্তি বিশেষকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মনে করিব কেন? সকলের সমান স্বাতন্ত্র্য না থাকিবে কেন?

* "সমন্তপর্য্যায়ী স্যাৎ সার্ব্বভৌমঃ সার্ব্বায়ুষ আন্তাদাপরার্দ্ধাৎ পৃথিব্যৈ সমুদ্র পর্য্যন্তায়া একরাড়িতি"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।৪।১

"সমন্তপর্য্যায়ী দেশতঃ কালতঃ সর্ব্বব্যাপী স্যাৎ; স্যা অন্তাৎ সমুদ্রতীরপর্য্যন্তং সার্ব্বভৌমত্বং দেশব্যাপ্তিঃ, আপরার্দ্ধাৎ পরার্দ্ধশব্দাভিধেয় কালসংখ্যাপর্য্যন্তং সর্ব্বায়ুষত্বং কালব্যাপ্তিঃ এবম্বিধো ভূত্বা সমুদ্রপর্য্যন্তায়া পৃথিব্যা এক এব রাজা অস্ত, ইতি অনয়েচ্ছয়া আচার্য্যো মহাভিষেকেণ তমভিষিঞ্চেৎ। সায়ণভাষ্য।

একপ্রভুক রাজ্যই হউক্, বা সাধারণ প্রজাতন্ত্র রাজ্যই হউক, উভয়কেই নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। রাজা যদি রাজধর্ম্ম বা নিয়ম (Law) অতিক্রম করেন, স্বেচ্ছাচারী হন্, প্রজাপীড়ক হন্, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহা হইলে, তাঁহার রাজ্য স্থির হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, রাজাকে ধর্ম্মের শাসনে থাকিতে হইবে, ধর্ম্ম রাজারও নিয়ন্তা। বৈদিক আর্য্যজাতীয় ভূপালবর্গ শাস্ত্রনিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবিহিত আচরণ করিতে পারিতেন না, নৃপতি বলিয়াই যে তিনি সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবেন, ধর্ম্মের শাসন অবজ্ঞা করিবেন তাঁহার সে সুযোগ ছিল না। রাজা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বটে কিন্তু কোন বিষয়েই তিনি সর্ব্বস্ব (All-destroying) ক্ষমতাশালী হইতে পারিতেন না, রাজাকে যোগ্যমন্ত্রি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত ; রাজ্যরক্ষার কথা ত দূরের, শাসনকার্য্যও কোন নৃপতি একাকী নির্ব্বাহ করিবার অধিকারী ছিলেন না। ফলতঃ আধুনিক রাজনীতিকুশল বা বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ যে সকল সুবিধার জন্য একরাজায়ত্ত রাজ্যের পরিবর্ত্তে সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্যের কামনা করেন, বেদাদিশাস্ত্রবর্ণিত একরাজায়ত্ত রাজ্যে প্রজাগণের ততোঽধিক সুবিধা ছিল। প্রজাতন্ত্ররাজ্যের যে সকল দোষ আছে, বেদাদিশাস্ত্রবর্ণিত একরাজায়ত্ত রাজ্যে সে সকল দোষ থাকিতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতিপন্ন হয়, সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত নহে। যাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত নহে তাহার কখনও স্থিরাস্থিতি হইতে পারে না৷ বিজ্ঞান (Science) ঐশ বা প্রাকৃতিকনিয়মসমূহেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, ঐশ (Divine) বা প্রাকৃতিক নিয়মনিবহের আবিষ্কারই বিজ্ঞানের প্রয়োজন_বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অতএব যাহা ঐশ বা প্রাকৃতিকনিয়মবিরুদ্ধ, তাহাই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। আমাদের দেহরাজ্যের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়, সাধারণ বা প্রজাতন্ত্ররাজ্যপদ্ধতি প্রাকৃতিক নহে ভূততন্ত্র ও গণিততন্ত্র ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহও সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য যে অপ্রাকৃতিক, তাহাই প্রতিপাদন করে।

পণ্ডিত বুক্‌নার বলিয়াছেন, এক ব্যক্তিকে অন্যব্যক্তিবর্গের নিয়ামকরূপে মান্য করিতে যাইব কেন? এক ব্যক্তিকে সর্ব্বেসর্ব্বা (All in all) বলিয়া মনে করিব কেন? ব্যক্তিমাত্রের সমান স্বাতন্ত্র্য (Freedom) না থাকিবে কেন?

পণ্ডিত বুক্‌নারের এই সকল কথা শ্রবণান্তর আমাদের মনে হইয়াছে, ইহারা বিশুদ্ধচিন্তাপ্রসূত কথা নহে, ইহারা প্রকৃততত্ত্ববিদের উক্তি নহে। সঙ্কীর্ণহৃদয়, জ্ঞানহীন, প্রেমশূন্য সাধারণ লোকব্যবহার পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক যেরূপ ধারণা হয়, পণ্ডিত বুক্‌নার সেইরূপ ধারণানুসারেই এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কোন স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুরশাসন রাজার রাজ্যের ছবি সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক পণ্ডিত বুক্‌নার এইরূপ মনোভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা শব্দের আমরা বহুশঃ ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সাধারণের পরিজ্ঞাত আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার যে অর্থ বেদ হইতে পরিগৃহীত হয়, তাহা যদি সাধারণের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে স্বাধীনতার জন্য লোকে এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত না।

'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা, 'তন্ত্র' শব্দ 'প্রধান' এই অর্থের বাচক। যাঁহার আত্মাই প্রধান, আত্মেতর বা পর যাঁহার প্রধান নহে, যিনি আত্মেতর বা পরের বশীভূত নহেন, পরের বশে যাঁহাকে থাকিতে হয়না, যিনি অন্যের অযথা নিদেশবর্ত্তী নহেন, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি স্বাধীন। ভগবান্ মনু সুখ ও দুঃখের লক্ষণ কি, তাহা জানাইবার জন্য বলিয়াছেন, 'যাহা পরবশ—পরপ্রার্থনাদিসাধ্য তৎসমস্তই দুঃখহেতু, এবং যাহা আত্মবশ, স্বায়ত্ত তৎসমুদায় সুখহেতু, পারতন্ত্র্যই দুঃখের এবং স্বাতন্ত্র্যই সুখের কারণ।

স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, সুখ ও দুঃখের মনুসংহিতায় যে লক্ষণ

উক্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, 'স্ব' ও 'পর' এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, অগ্রে তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে, 'স্ব' ও 'পর' এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ না জানা থাকিলে, স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের বা সুখ ও দুঃখের স্বরূপাবধারণ কদাচ হইতে পারেনা। 'স্ব' বা আত্মার স্বরূপদর্শন হইলে জীবের আর কোন দুঃখ থাকেনা, জীব তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বতন্ত্র হয়, আত্মবশ হয়, আত্মদর্শন হইলে পারতন্ত্র্য থাকেনা, আত্মদর্শন হইলেই জীবের সর্ব্বসুখময়ী অবস্থাতে জীবের স্বরূপে অবস্থিতি হয়। স্ব বা আত্মার প্রকৃতরূপ যাঁহার জ্ঞাননেত্রে প্রতিফলিত হয় নাই, স্থূলদেহকেই যিনি আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাঁহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়, মনঃপ্রাণ প্রভৃতিই আত্মরূপে পতিত হইয়াছে, 'আমি' বলিতে যিনি স্বীয় বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তিনি কিরূপে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের রূপ দেখিতে সমর্থ হইবেন? যিনি দেহের অধীন, ইন্দ্রিয়বর্গের অধীন, আন্তর-বাহ্য প্রকৃতির অধীন, অতএব যিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অধীন, যিনি মৃত্যুর ক্রীড়াপুত্তলিকা, যিনি পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারের দাস, কামক্রোধাদি রিপুগণের নিদেশবর্ত্তী, আধি-ব্যাধির বশগ, তিনি কিরূপে স্বাতন্ত্র্যের শান্তিময় রূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারেন? যাঁহার আত্মজ্ঞান যে পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরতন্ত্রতা—পরাধীনতা সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ, তিনি সেই পরিমাণে বাধনালক্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। ধনকুবের হইলেও তিনি অসুখী, লৌকিক রাজা হইলেও তিনি পরাধীন, অন্যের উপর কিছুদিনের জন্য প্রভুত্ব বা অত্যাচার করিতে পারিলেও তাঁহার হৃদয় শান্তিনিকেতন নহে, সন্তোষের বাসস্থল নহে, ভয়বিরহিত নহে। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখিতে পান, যাঁহার দৃষ্টিতে আত্মা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বভূতকে যখনি আত্মস্থিত, আত্মা হইতে অব্যতিরিক্ত বলিয়া জানিতে পারেন, যাঁহার আমি (অহং) পদবোধ্য অর্থগর্ভে বিশ্বজগৎ বিদ্যমান, তিনি কাহাকেও (অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া) বাধা দেন না সুতরাং কাহারও নিকট হইতে বাধা পাননা, যিনি কাহাকেও পর ভাবেন না, অতএব যিনি অন্যের দৃষ্টিতে পরমাত্মীয়, পরমপ্রেমাস্পদ, সর্ব্বস্ব বা বিশ্বপতিই যাঁহার তন্ত্র—যাঁহার প্রধান, স্বীয় পরিচ্ছিন্ন অহংকে যিনি পরমাত্মাতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষ বা আত্মার নিত্যদাস হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ স্বাধীন, তিনিই প্রকৃত স্বতন্ত্র, তিনিই যথার্থ স্বাধীন, তিনিই প্রকৃত স্বতন্ত্র, তিনিই বস্তুতঃ স্বরাট্, তিনিই পরম সুখময়, তিনিই অমৃতস্বরূপ। পরবুদ্ধির যত বিস্তার হয়, স্ব বা আত্মজ্ঞানের তত সঙ্কোচ হয়, দুঃখের বিষয় মাত্রাও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রী—

বর্ষা-প্রভাতী।

(১)

বরষা শেষের শুভ্র শোভার সুন্দর সূচনায়—
আজি প্রান্তরে মন মোর হরে
স্নিগ্ধ শীতলতায়!
রূপার কাঠির পরশ-পরাণে লাগেরে—
গগনে রৌপ্য দেউটি জ্বলিয়া জাগেরে
মালতী লতিকা ললিত কিশোর প্রসূনে
গন্ধে পূর্ণ পর্ণে পর্ণে ভূষণে,—
আবেগ-আকুল প্রভাতকিরণমদিরা;
ফলিত লোহিত বিম্ব অধরে লাগেরে!

(২)

চামেলী ফুটিয়া টুটিল সোণার কিরণে.
রক্তবৃন্তে চুম্বন দিল হিরণে—
সাঙ্গ করিল গন্ধ-গহন জীবন,
উষার সোণার পাত্রে, মোহন-মরণে

প্রভাত আলোর লোহিত জয়ের তিলকে
শরৎরাণীর ললাটে আঁকিয়া দিল কে?
কমলগন্ধ, কোরক-জনম ত্যজিয়া,
জাগিয়া উঠিল, কোমল প্রভাত-চরণে!

বরজশবদে কাঁপিল মেঘের কালিমা
আকাশে খেলিল আলোকের সাথে মিলিমা!
গগন ভাতিল জ্যোতির বাদন-আঘাতে
নিমেষে ছাপিয়া প্লাবিয়া সোণার কিরণে

(৩)

সজল শস্যে শ্যামল ধরণীধন্যা,
শীর্ষে শীর্ষে ছুটিছে হরিত-বন্যা
অরুণ-তলে তনুরাগ-জ্যোতি ভাতিছে
অনুরাগ-রাগে রঞ্জিত লাবণ্য!

প্রবাহ-বাহনে ক্লান্ত সরসী মরতে,
নবযৌবন-ভারে বিনম্র মরতে
তড়িত-গতি সে মন্থর হল আজিকে
মুকুর-স্বচ্ছ-চিকণ-শোভায় ধন্য!

(৪)

ঊষায় অসিত রক্ত রেশমী বসনে,
হস্তে তাম্র কুসুমপাত্র-ভূষণে
থমকি' থামিলে সোণার শোভার দুয়ারে
চাহিলে জগতে কমল-আঁখির প্রভাতে!

বোধনে জাগালে অলস-আবেশ মন যে,
লভিতে লুব্ধ তোমার পুণ্য ধন যে—
নয়ন মেলিয়া তোমার অরুণ আভাতে
দেখিনু ফুটাল হসিত গগন-সরোজে!

কোমল সে দল খুলিল তোমার বাণীতে,
গন্ধ ছুটিল চরণে ধন্য মানিতে;
নয়নের জলে ধৌত পরাণ খানিতে
পড়িল তোমার নবীন-কোমল কর যে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

ভূতের বাহন

কাল বিড়াল দেখিলে অনেক বর্ষীয়সী গৃহিণী "দূর্ দূর্" করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, "কাল বিড়াল রাত্রিকালে ভূত হয়।" অর্থাৎ কিনা, ভূতগুলির মধ্যে যেগুলি নেহাত বেহায়া কিছুতেই মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায় না, সেইগুলিই দিনের বেলা কাল বিড়ালের মূর্ত্তি ধরিয়া লোকালয়ে বিচরণ করে; আর যখন রাত্রি হয় তখন তাহারা স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বভাবোচিত আহারবিহার বা তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে আবার বিড়াল মাত্রেই ভূতের বাহন বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন রাত্রিযোগে যখন ভূত কোনও মানুষের সঙ্গ লয় তখন প্রথমে সে বিড়ালের আকার ধরিয়া মানুষের আগে আগে বা পিছনে পিছনে ছুটে, পরে সুযোগমতে তালগাছের ন্যায় পা ও গগনস্পর্শী মস্তক বাহির করিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়ায়।

মার্জ্জার জাতি যদি মানুষের আইন-কানুনের প্রতি মনে মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত, তবে এদেশে মানহানি আইনের প্রচলন হওয়া অবধি বাঙ্গালার আদালতে আদালতে যে কত মানহানির মোকদ্দমার ধূম পড়িয়া যাইত, সেকেলে গৃহিণী আদালতে জবাবদিহি করিতে করিতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেন তাহা অনুমান করাও দুষ্কর। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা Statisticsএ দক্ষ, তাঁহাদের উপর এই মৌলিক অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত করিয়া আমরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত রহিলাম। বিড়াল জাতি যে এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ মোকদ্দমা করিবার জন্য, কদাপি আদালতে আসে নাই ইহা ঠিক। এ বিষয়ে আমাদের মনে যতটুকু সন্দেহ ছিল আমাদের এক আইনজ্ঞ বন্ধু বিশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক Indian law port প্রভৃতি যাবতীয় আইন বিষয়ক সংবাদপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া সে সন্দেহ টুকু নিরাশ করিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বিড়ালজাতির আর যে দোষই থাকুক না কেন, তাহারা মামলা-বাজ নহে। আমার বোধহয় তারা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সেয়ানা।

তাহারা দুর্ণামগ্রস্ত হইয়াও মানুষের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া থাকিতে প্রস্তুত তথাপি নিজ স্বত্ব সংরক্ষণ বা সংস্থাপন জন্য একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে রাজি নয়। তাহারা বোধ হয় ভাবে, সুনাম না হয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু মানুষ জাতি যদি রাগ করিয়া পাতের ভুক্তাবশেষ মাছের কাটা ও দুটি ভাত না দেয়, তবে কি সুনামে উদর পূর্ত্তি হইবে।

বিড়াল নিজে সুনামের জন্য উদ্বিগ্ন না হইলেও ইংরেজি শিক্ষার মহিমায় ও ইংরেজি আচারাদি অনুকরণের গুণে বিড়ালের প্রতি যে লোকের অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ষীয়সীগণ যাহাই ভাবুন, নবীনারা বিড়ালের প্রতি বিরূপ নহেন। বিড়াল ইদানীং শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না মহিলাকুলের আদরের সামগ্রী, কোলের রত্ন। আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেরূপ কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তবে শুনিতে পাই, বিড়ালের সৌভাগ্য ইদানীং এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, কোনও কোনও সমুন্নতরুচি মহিলা নিজ সন্তান কোলে লওয়ার ভার আয়ার উপর দিয়া বিড়াল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিড়ালের চক্ষু সেকালের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত না, সেদিকে হরিণের প্রতিপত্তি প্রায় একচেটিয়া ছিল; ইদানীং শুনিতে পাই মার্জ্জারের প্রতাপে হরিণকুল বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই যে বঙ্গসাহিত্য হরিণ anachronism হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিড়াল যদি মানহানি লইয়া একটা হৈচৈ উপস্থিত করিত, তবে কি তার এতদূর সৌভাগ্য হইত? বিড়ালের বুদ্ধির বাহাদুরি আছে ইহা কে অস্বীকার করিবে? বিড়ালের বিষয়-বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন বিষ্ণুশর্ম্মা, তাহার প্রমাণ হিতোপদেশের সেই জরদ্গবনামা গলিত নখ নয়ন গৃধ্র ও দীর্ঘকর্ণনামা "নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চন্দ্রায়ণ-ব্রতাচারী" মার্জ্জারের কথা; আর সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এই ইংরেজ রাজত্বের যুগে। আমার বোধ হয় মানুষের মধ্যে যাহারা মান-রক্ষার জন্য মানহানির মোকদ্দমা করেন বা করিতে ইচ্ছুক তাহারা গৃহমার্জ্জারের দৃষ্টান্ত হইতে প্রচুর সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

আমাদের দেশে মার্জ্জারকুলের দশা যাহাই হউক, পাশ্চাত্যদেশ যে এতকাল মার্জ্জার-কুক্কুরের ভূস্বর্গ ছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। সেই পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমদানি করা রুচির প্রভাবেই আমাদের দেশে মার্জ্জার কুক্কুরের অবস্থা কিঞ্চিৎ ফিরিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই পশ্চিম দেশ হইতে বিড়ালের সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ইংরেজি ভাষা আশ্রয় করিয়া বিড়ালের একটা প্রবল অখ্যাতি পূর্ব্বদেশেও ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কাল বিড়ালের ত বুঝি বা জীবন সংশয় উপস্থিত। জানি না ইংরেজি নবীনগণ এবার কি করিবেন তাহাদের হস্তেই বিড়ালজাতির ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।

মিঃ ইলিয়ট ও ডোনেল একজন ইংরেজি ঔপন্যাসিক। তাঁহার Sorcery Club নামক উপন্যাস এদেশের অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। ওডোনেল সাহেব যদি কেবল কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে কাহারও কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। কল্পিত কুচরিত্র লোককে যত ইচ্ছা বিড়ম্বিত কর তাহাতে কাহারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। দীনবন্ধু মিত্রের ঘটিরাম ডিপুটি কল্পনারাজ্যের জীব, তাহার বিড়ম্বনা দেখিয়া বরেণ্য প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ব্বিসের কোনও ঘটিরাম বৃত্তি কর্ম্মচারী যে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন এরূপ কথা এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়কে দেখিয়াও এপর্য্যন্ত কোনও মুচিরাম লজ্জায় মুখ ঢাকা দেন নাই। কিন্তু কবি বা ঔপন্যাসিক যদি কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া "বাস্তবতার" আলোচনে প্রবৃত্ত হন তবে ভয়ের কারণ আছে।

সে যাহাহউক কিছুদিন হয় পূর্ব্বোক্ত ওডোনেল সাহেব "অকাণ্ট রিবিউ" নামক কাগজে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি নাকি তার সারসত্য আলোচনার ফল, উপন্যাস সৃষ্টি নহে। তিনি বলেন বহু বহু ভূতের বাড়ীতে পরীক্ষা দ্বারা আমি এই

সারসত্যে উপনীত হইয়াছি যে বিড়াল নিজে ভূত না হউক ভূতের সাগরেদ্ ভূতের বাহন ত বটেই। অনেক স্থলে ভৌতিক উৎপাতের—বিড়ালই একমাত্র বিশ্বাস যোগ্য মানযন্ত্র স্বরূপ।

কথাটা এই, ওডোনেল সাহেব সাহেব হইয়াও ভূত মানেন, এমনকি প্রকাশ্যে জগৎসমক্ষে নিজ বিশ্বাস ব্যক্ত করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। বঙ্গদেশের অনেক বীর পুরুষ রজনীতে একাকী গৃহ হইতে বাহির হইতে অক্ষম হইলেও দিবাভাগে ভূতের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কেননা তিনি ইংরেজি শিক্ষিত। ওডোনেল সাহেব ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী নহেন, শিক্ষিত ইংরেজ, তাহাতেই এই প্রভেদ। সে যাহা হউক ওডোনেল সাহেব ভূত মানেন এবং তিনি নাকি ভূয়োভূয়োঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, কোনও স্থানে ভৌতিক কোনও জীবেরসঞ্চার হওয়া মাত্র বিড়াল তাহা সর্ব্বাগ্রে টের পায়। বিড়াল প্রাকৃত জীব হইলেও অতিপ্রাকৃত জগতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে। ভৌতিক উৎপাতের সহিত ঈদৃশ সহানুভূতি ও ভূতের সহিত পরিচয় জীবজগতে যে কেবল এক বিড়ালেরই আছে এমন কথা ওডোনেল সাহেব বলেন না; এই কথাটি বিড়াল জাতির পক্ষে কিঞ্চিৎ আশ্বাসপ্রদ বটে। তিনি বলেন, "কাক, পেচক, শৃগাল প্রভৃতি অনেক জীবেরই ভৌতিক ঘটনার সহিত সহানুভূতি থাকা সম্ভব, আমি কেবল বিড়াল লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি।"

ওডোনেল বলেন, কোনও পরিবারের মধ্যে মরণ বা তত্তুল্য কোনও গুরুতর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বিড়াল তাহা সর্ব্বাগ্রে টের পায়। ভৌতিক-দর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন (এবং নানা প্রমাণ দর্শনে ওডোনেল সাহেব ও বিশ্বাস করেন) যে, বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু বা উৎকট ব্যাধি আসন্ন হইলে সেই বাড়ীতে নানা অতিপ্রাকৃত জীব সঞ্চরণ করিতে থাকে। হইতে পারে, ইহারা আসন্ন মরণ বা আসন্ন ব্যাধি ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, স্নেহ, বা যে কোনও রকমের সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ। ইহাও সম্ভব ইহাদের কতকগুলি হয়ত নারকী জীব, নিজের দলে আর একজন বাড়িতেছে বা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে—মনে করিয়া ইহাদের উল্লাস হয়—এবং সেই উল্লাস বশে তাহারা সেই বাড়ীতে আসিয়া তাণ্ডব করিতে থাকে। হয়ত বা ইহাদের কেহ কেহ মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মাকে সঙ্গে করিয়া যমালয়ে নিবার জন্যই আগমন করে। যে রূপেই হউক ইহাদের সঞ্চরণে ভাবি অমঙ্গল সূচিত হয়, বিড়াল সেই সঞ্চরণ ও আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করিতে পারে। কি ভাবে করে, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। বিড়ালের তদানিন্তন ব্যবহার দর্শনে মনে হয়—বিড়াল ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা ভূতের সঞ্চার বুঝিতে পারে, সম্ভবতঃ চক্ষে বিশেষ কিছু দেখিতে পায় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি ভূতের গায়ে গন্ধ আছে? ওডোনেল সাহেব তদুত্তরে বলেন, ভূতের গায়ে গন্ধ থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দেখা যায় যে, সকল জীবের গায়েই একরূপ গন্ধ আছে, অনেক জীব প্রবল ঘ্রাণশক্তি দ্বারা তাহা টের পায়। শিকারের সময় কুকুর ঘ্রাণশক্তি দ্বারা শিকারীর কিরূপ সাহায্য করে তাহা সকলেই জানেন। ইদানীং কুকুর দ্বারা চোর ডাকাত ধরিবার নিয়মও কোনও কোনও পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অচিরেই আমাদের দেশেও ঐ নিয়ম প্রচলিত হইবে। চোর ডাকাতের গায়ের গন্ধ আমরা টের পাই না কিন্তু শিক্ষিত কুকুর টের পায়। এ অবস্থায় ভূতের গায়ে গন্ধ থাকিবে এবং ভূতের সাগরেদ বিড়াল জাতি তাহা টের পাইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

অনেকে ভাবিতে পারেন বিড়ালকে দর্শন-শক্তির বাহাদুরি না দিয়া ঘ্রাণ-শক্তির বাহাদুরি দিবার বিশেষ হেতু আছে কি? আছে; বিড়ালের ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। দেখা গিয়াছে বাড়ীতে মৃত্যু সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে বিড়াল এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে, মাথাটা একবার এপাশে আরবার ওপাশে সঞ্চালন করিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে যেন কিসের আঘ্রাণ লয় এবং অস্থির ভাবে একবার বাড়ীর সদরদরজার দিকে একবার অন্দর মহলের দিকে দৌড়াদৌড়ি করে। কখনও কখনও সে ভীত ও করুণ স্বরে "মিউ মিউ" করে, তাহার

শরীর ঘন ঘন কাঁপে এবং কিছুতেই সে অন্ধকারে থাকিতে চায় না। বিড়াল যদি ভূত দেখিত তাহা হইলে হয়ত যেন অলক্ষিত কিছুর ভয়ে ছুটাছুটি করিতেছে এ ভাবটা হইত না।

বিড়াল যে কেবল ভূতের সঞ্চার অনুমান করিতে পারে তাহা নহে, কোনও কোনও বিড়ালের ভূতের প্রতি চৌম্বকাকর্ষণের মত একটা আকর্ষণ আছে। যেখানে ভূতের গতি বিড়াল যেন ভয়ে ভয়ে, নিজের অনিচ্ছাসত্বে, যেন কিসের আকর্ষণে সেই দিকে যায়। কখনও কখনও মনে হয় যেন ভূতটি বিড়ালের ঘাড়ে চাপিয়াই আসিয়া উপস্থিত হয়, ভূতের আবেশে বিড়াল ছট্‌ফট্‌ করে, যেন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।" বিলাতে সেকেলে বিশেষতঃ গ্রাম্যলোকের মধ্যে একটা সংস্কার আছে রাস্তায় চলিবার সময় যদি বিড়াল লোকের পথ কাটিয়া চলিয়া যায় তবে সেটা একটা গুরুতর দুর্লক্ষণ। তাহাতে সেই লোকের অথবা তাহার প্রিয়তম কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সূচিত হয়। ওডোনেল সাহেব এই সংস্কারকে নিতান্ত ভিত্তিহীন বলেন না। আসন্ন মরণ বা আসন্নশোক লোকের চারিদিকে নানারূপে অতি প্রাকৃত জীবের সঞ্চরণ সর্ব্বদর্শী (clairvoyant) লোকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাদের কোনও কোনও জীব লোককে নিয়তির পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কেহ কেহ বা সহানুভূতি বশে বা মজা দেখিবার জন্য সাথে সাথে চলে। এই সকল ভূতের বিড়ালের প্রতি আকর্ষণ আছে বলিয়াই বিড়াল সেই লোকের পথে আসিয়া পড়ে। হইতে পারে, কোনও কোনও ভূত বিড়ালের স্কন্ধে চাপিয়াই একবার দেখা দিয়া যায়, কিংবা লোককে সতর্ক হইবার উপদেশ দিয়া যায়। এরূপ স্থলে বিড়ালকে ভূতের বাহন বলিয়া গালাগালি বা অভিসম্পাত না করিয়া বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত।

বিড়াল হয়ত বলিবে, "আমরা কৃতজ্ঞতা চাইনা। আমরা যাই বটে, কিন্তু আমরা জানি না কেন যাই। তোমরাও কি সব সময়ে সবকাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া কর? তোমরা যাহা বল তাহা ত অনুমান মাত্র। ভালরূপে না জানিয়া শুনিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাইয়া আমাদিগের যে ভূতের সহিত ঘনিষ্ঠতার অপবাদ দেও ইহা কি যুক্তিযুক্ত না ন্যায়সঙ্গত? দোহাই তোমাদের ধর্ম্মের—আর যদি তোমরা ধর্ম্ম না মান, দোহাই তোমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রের, তোমরা এইরূপ অন্যায়, অযৌক্তিক, অসামাজিক আচরণ হইতে বিরত হও।"

বিড়ালের আপত্তি, বিড়ালের অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া যদি ওডোনেল সাহেবের কথায়ই প্রত্যয় করা যায়, তবুও একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় এই হইতে পারে—বিড়াল কি কেবল লোকের অমঙ্গলই সূচিত করে? মঙ্গলের কোনওরূপ পূর্ব্বাভাস কি টের পায় না। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। ওডোনেল সাহেব স্বয়ং এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই। তবে বিড়ালের পক্ষে গৃহস্থের ভাবিমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব মনে করেন না। তাঁহার বিশ্বাস, কোনও গুরুতর এবং অনেক স্থলে অতর্কিত বিপদ ঘটিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে যমলোকের জীবগণ যেরূপ বাড়ীতে আনাগোনা করিতে থাকে, অপ্রত্যাশিত সম্পদ বা মঙ্গল লাভের পূর্ব্বেও বাড়ীতে কোনও কোনও শ্রেণীর অতি প্রাকৃত জীবের সঞ্চরণ অসম্ভব নহে। এরূপ সময়ে সকল বিড়ালই যে তাহা টের পাইবে ইহা আশা করা যায় না। বিপদের পূর্ব্ব সূচনা ও সকল বিড়াল সমান ভাবে টের পায় না। ওডোনেল সাহেব বলেন ভাবি মঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা যদি কোনও বিড়ালের থাকে তবে সে সাদা বিড়ালের থাকিবার সম্ভাবনা অধিক। দেখা গিয়াছে অমঙ্গলের সম্ভাবনা অধিক টের পায় কালবিড়াল। বিড়ালরাজ্যেও কি তবে ভগবান্‌ সাদাকালায় এতটা প্রভেদ করিয়াছেন? অসম্ভব কিছুই নহে। সে যাহা হউক কাল বিড়ালের প্রতি প্রাচীনা গৃহিণীগণের আক্রোশ যে নিতান্তই অমূলক ছিল তাহা বলা যায় না।

যাহারা বিড়াল লইয়া অধিক লীলা খেলা করেন তাহারা জানেন, অনেক বিড়াল অপেক্ষাকৃত ক্রূরপ্রকৃতির লোকের নিকট ঘেঁসিতে চায় না, আবার সম্ভবতঃ কোমল হৃদয় লোক দেখিলে সে লোক নিতান্ত অপরিচিত

হইলেও তাহার নিকট আসে, এমন কি তাহার সম্মুখে বিশ্রব্ধভাবে ক্রীড়াকৌতুক করিতেও প্রবৃত্ত হয়। বিড়াল কিরূপে লোকের চরিত্র টের পায় তাহা অনুসন্ধান-যোগ্য। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কি কুচরিত্র লোক কি সাধু মাহাত্মা সকলেই নাকি নিজ নিজ চরিত্রের প্রভাবে অসৎ ও সৎ নানা প্রকৃতির ভৌতিক জীব আকর্ষণ করেন। ঐ সকল জীব বা আত্মা সেই সেই লোকের শরীরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার আলোক ও গন্ধ বিস্তার করিয়া বিচরণ করে। বিড়ালগণ ও অন্যান্য ইতর শ্রেণীর জীব ঐ গন্ধ আঘ্রাণ করে। কেহ কেহ বা ঐ আলোক ও দেখিতে পায়। বিড়ালের যদি লোকের চরিত্রজ্ঞান ক্ষমতা বাস্তবিকই থাকে তাহা বোধ হয় ঐরূপে উৎপন্ন হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত কবিরত্ন এম্, এ।

সাগরের প্রতি।

ভুলালে আমায় ভুলালে!
হিল্লোলি' নীল দোদুল দোলায়
দুলালে আমায় দুলালে!
ওগো চঞ্চল অকূল পাথার!
অন্তরে মোর ঠাঁই নাহি আর,
একোন্ মদির পরশ আমার
বুলালে গো প্রাণে বুলালে!
ভুলালে আমায় ভুলালে!

চিরন্তনের কাহিনী
বসি' বসি' সদা গভীর ছন্দে
গাহিছ কি দিবা যামিনী?
মর্ম্মনিলীন কোন্ কথাগুলি
উর্ম্মিলীলায় ওঠে ফুলি' ফুলি'?
জাগে কি অধীর কল্লোল তুলি'
অনাদি ছন্দ বাহিনী,
চিরন্তনের কাহিনী?
কি মায়া ভরেছ নয়নে!
কি বিপুল স্নেহ ওঠে উচ্ছ্বাসি'
শ্যাম সৈকত শয়নে!
জননীর মত শতবাহু দিয়া
ধরা-কন্যারে রেখেছ বাঁধিয়া,
স্নেহের লাবণি পড়ে উছলিয়া
স্নিগ্ধ সুনীল বয়ানে;
কি মায়া ভরেছ নয়নে!

ভুলালে গো মোরে ভুলালে!
বক্ষে জড়ায়ে মায়ের মতন
দুলালে গো মোরে দুলালে!
ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ অপার,
নিম্নে অথির নীল পারাবার,—
নীলের মদির পরশ আমার
বুলালে গো প্রাণে বুলালে!
ভুলালে আমায় ভুলালে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ

উত্তরাপথ ভ্রমণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেদারনাথ দর্শন করিয়া বৈকালে গৌরীকুণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তথায় সেই রাত্রি ও পরদিবস একবেলা বিশ্রাম করিয়া ২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার বদরিকাশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে মৈখণ্ডা নামক চটীতে, পুরাতন প্রস্তরের মন্দিরে স্থাপিত মা মহিষ মর্দ্দিনীর দর্শন লাভ করিয়া, পূর্ব্ব পরিচিত পথে নালা চটী পর্য্যন্ত আসিয়া ভিন্ন পথে চলিতে লাগিলাম নালা চটীতে দুইটী রাস্তা মিলিত হইয়াছে। একটী পর্ব্বতের উপর দিয়া গুপ্তকাশীর দিকে গিয়াছে, অন্যটী বাম দিক দিয়া নীচের দিকে নামিয়া মন্দাকিনী অতিক্রম করিয়া বদরির দিকে গিয়াছে,

আমরা একণে শেষোক্ত পথে চলিতেছিলাম। মন্দাকিনী পার হইয়া প্রায় ১ মাইল চড়াই অতিক্রম করিলেই শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত 'উখীমঠ'। ২৬শে বৈশাখ আমরা তথায় পৌঁছিলাম। একটী সমুন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই মঠটী অবস্থিত। সম্মুখে পশ্চাতে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, শৃঙ্গের পর কেবলই শৃঙ্গ শ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। মঠটীর চতুর্দ্দিকে অগনন পুষ্পবৃক্ষ, তাহাতে রাশি রাশি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া পার্ব্বত্য সমীরণ সুগন্ধে ভরপূর করিয়া তুলিতেছিল। গাছে গাছে বন্যবিহগের সুমধুর কাকলি ও দূরে মন্দাকিনীর অবিশ্রান্ত জলপ্রপাতের গম্ভীর তান, যেন সেই মঠটীকে নন্দনের সৌষ্ঠব প্রদান করিতেছিল। স্থানে স্থানে শীতল স্বচ্ছ জলের ঝরণা সকল, বুঝিবা সেই পুরাকালের ঋষিদিগের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব্ব সামগানের অনুকরণ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছিল। স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, তার সেই পূর্ব্বগৌরব ভ্রষ্ট হইয়া আজ কেমন যেন একটা শ্রীহীন অবস্থায় তাহা দর্শকদিগের হৃদয়ে একটা মৌনবেদনা জাগাইয়া তুলিতেছিল।

বহুদিন যাবত মঠটী শাঙ্কর সম্প্রদায়ের হস্তচ্যুত হইয়া, অধুনা একজন গৃহী মোহান্তের তত্বাবধানে রহিয়াছে। মহান্তের উপাধি, "রাউল সাহেব" তিনিই সেখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত, পুরাতন প্রস্তরের ফটক পার হইলেই প্রশস্ত বাঁধান চত্বর, তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ, মাঝখানে সুন্দর একখানা মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে, বহুমূল্য রত্নালঙ্কার বিভূষিত স্বর্ণময় বদরিনারায়ণের বিগ্রহ, দুই পার্শ্বে তুঙ্গনাথ ও কেদারনাথের সুবর্ণময় প্রতিকৃতি স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তর উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও নানারূপ পুষ্পহারে সজ্জিত। এমন সুন্দর মন্দিরে এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শীতের কয়মাস এই স্থান হইতেই কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা হইয়া থাকে, কারণ অতিরিক্ত তুষার সম্পাতে, কেদারনাথের মন্দির তখন সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া যায়। কাজেই ততদিন সেই স্থানে যাওয়া বা কেদারনাথের মন্দির খুঁজিয়া বাহির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাড়ায়।

উখীমঠ স্থানটী বেশ জমকাল, এখানে ডাকঘর ও দোকানপসার প্রভৃতি আছে, মঠের চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীদিগের বস্তি, স্থানটী অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল। মঠটী দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আরও কতকটা চলিয়া 'গালিয়াবগড়' নামক চটীতে মধ্যাহ্ন যাপন করিলাম, 'কাঁকড়াগড়' নামক একটী রম্য গিরিপ্রস্রবণের কিনাড়ায় চটীটী অবস্থিত। এই চটীর পর হইতে তুঙ্গনাথ পর্য্যন্ত......মাইলব্যাপী অতিশয় কঠোর চড়াই আরম্ভ হয়। বৈকালে সেই ভীষণ পথে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। এইক্ষণে আমরা যুগযুগান্তরের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান বিশাল বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা সমাবৃত, গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম। স্থানে স্থানে বৃক্ষশ্রেণী এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে দিবাভাগেও তথায় সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না; তার উপর শীঘ্রই চতুর্দ্দিক ঘনঘটাচ্ছন্ন করিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নির্জ্জন অরণ্যের ভীষণতা আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। পথে অন্য যাত্রী নাই, সকলেই কোনও না কোন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভিজিতে ভিজিতে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। ভয় ও শঙ্কায় হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কোনও বিশাল মহীরুহের অন্তরালে দাড়াইয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম, কখনও বা সুন্দর পর্ব্বত গুহাতে আশ্রয় লইতেছিলাম। কিন্তু হিংস্র জন্তুর ভয়ে কোন স্থানেই অধিকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিতে সাহস হইতেছিল না। কোনরূপ ত্রাস শঙ্কিতচিত্ত হইলে, দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা আমাদের স্বভাব। মাঝে মাঝে নির্জ্জন গিরিকন্দরে উপবিষ্ট হইয়া তিনজনে মিলিয়া' প্রবীণ দার্শনিকের ন্যায় কতই না গবেষণা করিয়া হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু বোধ করিতেছিলাম। ভয় পাইলে আবার সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অভ্যাস। যাহার তিন পুরুষেও কখনও সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা করে নাই

সেও কোনও ভীতিজনক স্থান অতিক্রম করিতে হইলে, অনেক-সময়ে গলা ছাড়িয়া দুই একটী পদ আওড়াইতে ক্রটী করে না। আমরাও অগত্যা তাহাই করিলাম। জোরে গাহিতে গাহিতে চলিলাম :—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী॥
ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ চলিয়াই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থিত দোমলি ভিটা নামক বাটীতে আশ্রয় লইলাম। এখানে শীত অতিশয় কঠোর, তদুপরি দুর্য্যোগে সে দারুণ শীতের প্রকোপ আরও ভীষণতর হইয়াছিল। অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে, যথাবিহিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আজ যেন শীতের প্রকোপ অতিশয় অসহ্য বোধ হইতেছিল। হস্তপদ যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল তার উপর উষার নীহারসিক্ত শীতল বাতাস শরীরের অনাবৃত স্থানে যেন তীক্ষ্ণ সূচীকার ন্যায় বিদ্ধ হইতেছিল। এরূপ দারুণ শীতের আমাদের ধরেণা ছিল না তাই দাস্তানা (jloves) সঙ্গে লই নাই। আজ কিন্তু অনাবৃত হস্তে, লাঠিগাছিও ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছিলাম না। ক্রমাগত চড়াই চলিতে ছিল। পরিশ্রমে শীত কিঞ্চিৎ বিদুরিত হইল, আরও দুই মাইল চলিয়া 'চোপতা' নামক চটীতে পৌঁছিলাম। এখান হইতে দুইটী রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে, একটী নীচদিয়া বদরির দিকে গিয়াছে। অপরটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত 'তুঙ্গনাথ' শিবের মন্দির হইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত রাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আমরা তুঙ্গনাথের পথে চলিতে লাগিলাম। আরও দুইমাইল অতিশয় কঠোর চড়াই অতিক্রম করিতে হইবে। অতিশয় সন্তর্পণে উঠিতে লাগিলাম, তখন একটু একটু রৌদ্র উঠিতেছে, চতুর্দ্দিকের সীমাবিহীন ধবল তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা প্রভাত সূর্য্যের রজত রশ্মি গায়ে মাখিয়া, যেন গৌরব-মণি মুকুট শিরে ধারণ করিয়া, অপূর্ব্ব হাস্যচ্ছটায় আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছিল। বিহ্বল অন্তঃকরণে সে গরিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পথ চলিতেছিলাম। পর্ব্বতের গায়ে গায়ে নানাজাতীয় অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া প্রভাত সমীরণে একটা মাদকতা ঢালিয়া দিতেছিল। যতই উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম, বৃক্ষলতাদি ততই বিরল হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত বরফরাশি দেখা যাইতে লাগিল, তার পর, অনন্ত ধবল তুষাররাশি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতেছিল না। এখন আর সূর্য্যদেবকে মোটেই দেখা যাইতেছিল না, চতুর্দ্দিকে নিবিড় কুজ্ঝটিকার ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘরাশি আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, চারিদিকের পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি ক্রমে কুয়াসার যবনিকার অন্তরালে লুকাইতে ছিল। এখন মনে হইতেছিল যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি, এ যেন উপকথাকথিত মেঘমালার রাজ্য।

নিবিড় কুজ্ঝটিকাশ্রেণী ভেদ করিয়া বরফের উপর দিয়া আরও অনেকটা দূর অগ্রসর হইলে, উচ্চ-পর্ব্বত চূড়ে অবস্থিত তুঙ্গনাথের মন্দির দেখা যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সাদা মেঘ, ও শুভ্র কর্পূর তুল্য অনন্ত তুষার শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সে অপূর্ব্ব মন্দিরটি যেন শূন্য মার্গে অবস্থিত বলিয়া মনে হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, এই সমস্ত মন্দির শীতকালে সম্পূর্ণ বরফের নীচে পড়িয়া যায়, কাজেই মন্দিরে প্রবেশের একটি বৃহৎ দরজা ব্যতীত অন্য কোনও দরজা বা জানালা নাই। ভিতরে জমাট অন্ধকার। একটী প্রকাণ্ড ঘৃতের প্রদীপ সে অন্ধকার ঈষৎ দূর করিতে সক্ষম হইতেছিল, সেই অস্পষ্ট আলোকে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি ও অন্যান্য দুইএকটী বিগ্রহ দর্শন করিলাম।

তুঙ্গনাথ পর্ব্বতের ন্যায় এত উচ্চ পর্ব্বত এদিকে আর নাই, অধিকন্তু মন্দিরটী পর্ব্বতের ঠিক শিখরদেশে অবস্থিত হওয়ায় ও সমস্ত বর্ষব্যাপী ধবল তুষাররাশি দ্বারা মণ্ডিত থাকায় তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দর্শকদিগের নয়নযুগল তৃপ্ত করিতেছিল।

একটী চটীতে, অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে কিছুক্ষণ বসিয়া অবসন্ন হস্তপদ সবল করিয়া লইয়া পুনরায় ভিন্ন রাস্তায় নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। এই উচ্চ 'চড়াই' হইতে নামিবার রাস্তাও অতিশয় কঠিন, প্রায় তিন

মাইল রাস্তা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া নামিতে হইল। তুঙ্গনাথের 'চড়াই' করিবার সময় মনে হইয়াছিল, কোন রকমে কষ্ট করিয়া একবার চড়াইটুকু শেষ করিতে পারিলে উৎরাই করিবার সময় বেশ আরাম পাওয়া যাইবে, কিন্তু এখন দেখিতে পাইলাম যে নামিবার রাস্তাও কোন ক্রমে সোজা নহে! ভেকের মত ক্রমাগত লাফাইতে লাফাইতে আমাদের সর্ব্বশরীরে বেদনা হইয়া গিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপে চলিয়া 'ভুাংউড্ডার' নামক চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। দৌলতরাম নীচের রাস্তায় আসিয়া এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এখানে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া বৈকালে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।

চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, জমাট মেঘের ধূসর আঁচল উড়াইয়া, যেন ঊর্দ্ধমুখে, কোনও এক প্রবীণ যোগীর ন্যায় ধ্যান-নিমগ্ন। চতুর্দ্দিকের বিশালকায় বনস্পতিসমূহ যেন নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতে যেন সেই ধ্যান-নিমগ্ন দেবতার শুভাশীষ বর্ষিত হইতেছিল। মুগ্ধ নেত্রে সেই বিরাট অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য, স্থানে স্থানে রম্য গিরিপ্রস্রবণসমূহ অবিরল কলতানে বহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা সুন্দর প্রস্রবণের কিনারায় প্রস্তর খণ্ড সকলের অন্তরালে, অসংখ্য কুসুমভারে সজ্জিত অগণন পুষ্পবৃক্ষগুলি, বায়ুসঞ্চালনে হেলিয়া দুলিয়া যেন একটা আনন্দের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। গাছে গাছে বন্য বিহগের সুমধুর কাকলিতে যেন সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

রাস্তা ক্রমাগতই নীচের দিকে চলিয়াছে। ছয় মাইল চলিয়া আমরা একটী সুন্দর উপত্যকায় আসিয়া পড়িলাম। 'মণ্ডল' নামক চটী অতিক্রম করিয়া, একটী সুন্দর গিরিনদীর উপর সুদৃশ্য কাষ্ঠসেতু পার হইয়া, সমতল পথে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তার দুই ধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ, মৃদুল হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছিল। স্থানে স্থানে পাহাড়ীদিগের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখা যাইতেছিল। অদূরেই ছোট্ট নদীটী নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এক্ষণে আর আকাশে তেমন মেঘ ছিল না, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু পর্ব্বতের চূড়ে ঝিকি মিকি করিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল কিন্তু পর্ব্বতের উপর হইতে এখানে শীতের প্রকোপ অনেকটা কম, তিন চার ঘণ্টার মধ্যে দারুণ শীতের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা যেন বসন্তের মধুরতাময় রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। গত কয়েকদিন যাবত আমরা ক্রমাগতই কর্কশ পার্ব্বত্য প্রদেশ ও লোকালয়শূন্য বিশালকায় বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা সমাচ্ছাদিত নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, আজ স্বভাবের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। পথের ধারে ছোট ছোট কণ্টকপূর্ণ ঝোপে এক প্রকার হলদে রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল পাকিয়া রহিয়াছিল, দুই একজন সাধুকে সেগুলি খাইতে দেখিয়া আমরাও কয়েকটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। বড়ই সুস্বাদু সে ফলগুলি, পকেট পুরিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খাইতে লাগিলাম।

'আরাম' চটীতে আরামে রাত্রিবাস করিয়া, পরদিন সকালে পুনরায় পথে বাহির হইলাম। সুন্দর শস্যপূর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। স্থানটী বেশ উর্ব্বর কাজেই সেখানে অনেক পাহাড়ী বসবাস করিয়া থাকে। প্রায় ছয় মাইল পথ চলিলে গোপেশ্বর শিবের মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

গোপেশ্বর স্থানটী বেশ জমকাল, এখানে অনেক দোকান পসার ও পাকা বাড়ীঘর আছে, বাজারের বামে মন্দির; প্রস্তর নির্ম্মিত অতিশয় পুরাতন মন্দিরে 'গোপেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত। কথিত আছে যে অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানটী সম্পূর্ণ জঙ্গলাবৃত ছিল। একদা একটী গাভী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া মৃত্তিকা নিম্নে লুক্কায়িত একটী শিবলিঙ্গের উপর স্বীয় বাঁট হইতে দুগ্ধ বর্ষণ করে। লোকে তাহা জানিতে পারিয়া সেই শিবলিঙ্গের পূজা অর্চ্চনা করিতে

থাকে ও ক্রমে তাহার উপর মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং কালক্রমে স্থানটী বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। সেই হইতেই বনমধ্যে প্রাপ্ত সেই শিবলিঙ্গ, গাভী কর্ত্তৃক পয়ঃস্নাত হইয়াছিল বলিয়া 'গোপেশ্বর' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রধান মন্দিরের চারিদিকে আরও অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে তিনখানি পুরাতন ধরণের তরোয়াল একত্র গ্রথিত করিয়া ত্রিশূলাকারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, যে কোনও একটী যুদ্ধের জয়স্তম্ভ স্বরূপ সেটী সেখানে স্থাপিত হইয়াছে।

গোপেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আরও তিন মাইল অতিক্রম করিয়া 'চমৌলী' পৌঁছিলাম। চমৌলির অপর নাম লালসাঙ্গা। অলকানন্দার উপর লোহার ঝুলান সেতু পার হইয়া কতকটা দুর উপরে উঠিলেই বাজার। বাজারে অনেকগুলি চালা, তাহাতে অনেক দেশীয় লোক বেচাকেনা করিয়া থাকে, স্থানটী একটী ক্ষুদ্র সহরের ন্যায়, একটী ক্ষুদ্র হাঁসপাতাল, একধারে একটী পুলিশের আড্ডা ও একটী পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস ও কয়েকখানা দোকান পসার সেই পার্ব্বত্য জনপদকে সহর আখ্যা প্রদান করিতে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অলকানন্দা অনেকটা নীচে, সর্ব্বদা তাহার কূলে যাতায়াত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু উপরে কয়েকটী স্বচ্ছ শীতল জলের ঝরণা থাকাতে যাত্রীদিগকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দেবপ্রয়াগ হইতে একটী রাস্তা সোজা বদরির দিকে গিয়াছে। সেই রাস্তাটী এই স্থানে আসিয়া, কেদারের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বদরি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যাহারা রামনগরে যাইয়া ট্রেন ধরেন, তাহাদিগকে লালসাঙ্গা পর্য্যন্ত আসিয়া দেবপ্রয়াগের রাস্তায় কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইতে হয়, সেখান হইতে রামনগর যাইবার ভিন্ন রাস্তা আছে।

চমৌলীতে মধ্যাহ্ন যাপন করিয়া বৈকালে পুল পার হইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। মণ্ডল চটী হইতে চমৌলী পর্য্যন্ত রাস্তার সমতলতা ও প্রকৃতির কমনীয় কান্তি যেরূপ আমাদিগকে হর্ষান্বিত করিয়াছিল, চমৌলী পরিত্যাগ করিয়া, তাহার অদ্ভুত বৈষম্য দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। সমতল গ্রাম্যপথের পরিবর্ত্তে, প্রস্তরসঙ্কুল বন্ধুর অপ্রশস্ত পথে আমাদিগকে চলিতে হইতেছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্যামল শস্যভরা গমের ক্ষেতে পাহাড়ীদিগের স্মিত-সরল মুখগুলি যেমন একটী প্রীতি ও প্রফুল্লতার ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল, তৎপরিবর্ত্তে গগনচুম্বি কঠোর ধূসরবর্ণের উলঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী আজ যেন আমাদিগের নয়নকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। শান্তিও ও সচ্ছন্দতাপূর্ণ পাহাড়ীদিগের গৃহে, বালক বালিকাদিগের বিহগকূজন সদৃশ হর্ষোচ্ছ্বসিত কোলাহলের তুলনায় বেগবতী মন্দাকিনীর উদ্দাম জলপ্রপাতের অবিরাম কল্লোল যেন অনেকটা একঘেঁয়ে বলিয়া বোধ হইতেছিল।

অনেক চড়াই উৎরাই করিয়া দশ মাইল অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যায় 'পিপলকোটী' পৌঁছিলাম। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ে সুন্দর অধিত্যকায় পিপলকোটী অবস্থিত। বাজারের চতুর্দ্দিকে অনেক সমতল ভূমি, তাহাতে ফলভরে আনত গমের গাছগুলি সান্ধ্য সমীরণে কম্পিত হইতেছিল। দূরস্থিত ঝরণার জলপ্রপাতের অস্ফুট নিনাদ যেন একটা করুণ সুরের মত কাণে আসিতেছিল। পুনরায় প্রকৃতির হাসিভরা মুখখানা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

পিকলকোটীতে বদরিনারায়ণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত একদল যাত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের নিকট শুনিলাম যে নারায়ণের মন্দিরের দ্বার একবার অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব্বেই খুলিয়াছে। মন্দিরের দ্বার খুলিতে কিছু বিলম্ব আছে ভাবিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে পথ চলিতেছিলাম। কাজেই এবার নূতন করিয়া পথের Programme করিয়া লওয়া হইল। যাহা হউক প্রত্যুষে পিপলকোটী পরিত্যাগ পাঁচ মাইল চলিলে গরুড়গঙ্গা নামক স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে গরুড়গঙ্গা নামক একটী ক্ষীণা নির্ঝরিণী অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তীরে গরুড়জীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে সুন্দর বাঁধান ঘাট গরুড়গঙ্গার জলে নামিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, গরুড়গঙ্গায় নাকি

একপ্রকার অদ্ভুতক্ষমতাসম্পন্ন কৃষ্ণ প্রস্তর পাওয়া যায়। সে প্রস্তর সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে তাহা তথায় আটকাইয়া যায়, এবং সমস্ত বিষ টানিয়া লইয়া আপনিই খসিয়া পড়ে। আমাদের দেশে এই প্রস্তর 'বিষ পাথর' নামে পরিচিত, আমি একবার এই প্রকার একটী প্রস্তরের ক্ষমতা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অবশ্যই গরুড়গঙ্গায় সেই প্রকার একখণ্ড প্রস্তরের সন্ধান লইবার আমাদের অবকাশ হয় নাই, সে জন্য আজও মনের ক্ষোভ সম্পূর্ণ যায় নাই।

গরুড়গঙ্গা ছাড়িলেই একটী চড়াই। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে, ঝাউগাছের মত একপ্রকার গাছের সারি, তাহার কাষ্ঠে একপ্রকার সুমিষ্ট গন্ধ বর্ত্তমান। সে পথে আরও পাঁচ মাইল চলিয়া 'পাতাল গঙ্গা' নামক একটী স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। অগণিত উপলখণ্ডের উপর দিয়া একটী শীতল স্বচ্ছ জলের ধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সে সুন্দর গিরি-প্রস্রবণটী পাতালগঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাতালগঙ্গা চটীর অদূরেই তাহা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। চটীটী সেই ক্ষুদ্র প্রবাহের অতিশয় সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পাতালগঙ্গা চটীতে মধ্যাহ্ন যাপন করিয়া বৈকালে আরও ৯ মাইল অগ্রসর হইয়া খটৌনী চটীতে রাত্রিবাস করিলাম। খটৌনী হইতে চারি মাইল পথ চলিলে সিংধার নামক চটীর নিকটে রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। একটী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া, আচার্য্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত 'যোশীমঠ' হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে নামিয়া গিয়াছে, অন্যটী সিংধার হইতেই নীচের দিকে নামিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে পূর্ব্বের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রাস্তায় চলিয়া আমরা যোশীমঠে পৌঁছিলাম।

ক্রমশঃ।

'ভবঘুরে।

কাব্যের ভবিষ্যত।

(পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

অদ্যকার এই প্রবন্ধে আমি 'কাব্য' কথাটা যে অর্থে ব্যবহার করিব, সংস্কৃত আলঙ্কারিকের 'রসাত্মক বাক্য' এই সংজ্ঞাদ্বারা তাহা বোধগম্য হইবে না। 'কাব্য' বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা উহার ব্যাপক অর্থ নহে।

কাব্যের প্রসার অনন্ত, কারণ মানুষের মনোরাজ্যে তাহার অধিকার। নিখিল কল্পনার লীলানিকেতন মানবচিত্তের সেই অনাবিষ্কৃত রহস্যলোকেরই মত কাব্যের জন্ম ও বিকাশ রহস্যময়। কবে কোন্ সৃষ্টি প্রভাতে মন্থনোদ্ভূত অমৃতের মত ইহা জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তনের মধ্যেও মানবচিত্তকে অমরত্বের প্রথম সন্ধান দিয়াছিল তাহা আজ শুধু কবিকল্পনার বিষয়। অনাদি বারিধিবক্ষে প্রথম তরঙ্গলীলায় যেমন করিয়া সৃষ্টি-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ নিখিলের মানস-সরোবরে পুষ্পবিকাশেরই মত এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য-বলে কাব্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিশ্বসৃষ্টির চিরন্তন গতিলীলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া অনন্তের অভিমুখে রূপ হইতে রূপান্তরে কাব্যের অপ্রতিহত-অভিযান চলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন আপাতদৃষ্টিতে পারম্পর্য্যবিহীন বলিয়া মনে হইলেও মানবচিত্তের ক্রমাভিব্যক্তির সহিত ইহাও বিকাশের দিকে চলিয়াছে। ইহার চরম পরিণতি কোথায় পারি পার্শ্বিক ঘটনাবলীর মধ্যে তাহার আভাষ অনুসন্ধান করা অসমীচীন হইবে না, যদিও বর্ত্তমানে তাহা সুস্পষ্ট ধারণার বহির্ভূত।

কাব্যের প্রকৃতি নিরূপণ করিতে যাইয়া একটি মাত্র প্রকৃষ্ট সংজ্ঞায় কেহই তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। কাহারো মতে—"পরি-দৃশ্যমান জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য ও চাঞ্চল্যের অন্তরালে যে চিরন্তন ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে কাব্য তাহারই প্রকাশমাত্র।······কবিতা বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, তাহার অন্তর্নিগূঢ় শাশ্বত সত্যের অভিব্যক্তি।" কেহ

বলিয়াছেন—"কাব্য নিখিল জ্ঞানের আদি ও অন্ত, ইহা মানবচিত্তের মতই অবিনশ্বর।" আবার কেহ বলেন—"কাব্য মানবচিত্তে ভগবদনুভূতির উদ্বোধক।"

Matthew Arnold কাব্যকে "জীবনের সমালোচনা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সমালোচনা একটী আদর্শের অনুযায়ী এবং সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিধিনিয়মের অনুসারী হইতে হইবে। Matthew Arnold এর এই অভিমত অনেকেরই মনঃপুত হয় নাই, কারণ ইহাদ্বারা কাব্যের গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু সে যাহাই হউক কাব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ অনুধাবন করিলে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় যে প্রকৃত কাব্যের ভিত্তি যে সত্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতির উপর নিহিত তাহাতে কাহারো মতদ্বৈধ নাই।

ধর্ম্মের সহিত কাব্যের সম্বন্ধ অতি নিকট। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাব্য মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতে তাহার প্রাণ-রস লাভ করিয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কবির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত। লোকচক্ষুর নিকট কবি বিশ্বাসীই হউন আর নাস্তিকই হউন তাঁহার যে কবিতা অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহা তাঁহার গভীর সত্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্যবোধ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। এই সত্যানুভূতিই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিমাপ। ধর্ম্ম এখানে কোনও দেশ ও কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে—ইহা অনাদি কালের, অনন্ত যুগের—নিখিল মানবচিত্তের চিরন্তন অবলম্বন।

সত্য যাহা তাহা শাশ্বত, অবিনশ্বর। সাধক-কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যদিয়া সহস্ররূপে এই সত্যকেই প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। প্রকৃত কবিতা শুধু এই জন্যই অনন্ত কালের, প্রকৃত কবি শুধু এই জন্যই দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন।

কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ কাব্যসাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা কাব্যের প্রতি অবিচার করিয়া বসিব। তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও ক্রমবিকাশের পরিচয় পাইতে হইলে বিশ্বমানবের অন্তরের দিক হইতে সমগ্র ভাবে তাহাকে দেখিতে হইবে। দেখা যায়, অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কয়েকটী বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়া কাব্য বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বাস্তবতা, কল্পনা ও সত্যানুসন্ধান—মোটামুটিভাবে বলিতেগেলে বিশ্বকাব্যে প্রধানতঃ এই তিনটী অবস্থার পরিচয় পাই। স্মরণাতীত যুগে মানুষের অন্তর যখন শিশুচিত্তের মত, সদ্যোবিকশিত কুসুমকলিকার মত, ধরণীর শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝখানে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, শিশুমানব যখন অপরিসীম বিস্ময়ে বিশ্বপ্রকৃতির পানে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিল, বিহঙ্গকাকলীর মত স্বতঃ উৎসারিত তাহার তখনকার যে ভাষা তাহাতে শুধুই বিস্ময়, শুধুই আনন্দ, শুধুই স্তুতিগান। শিশুর অস্ফুট কলভাষের মত তাহা জন্মান্তরের আভাষ প্রদান করে। বিস্ময়-মুগ্ধ মানবচিত্ত তখন বিপুল অনুভূতির উচ্ছ্বাসে বিহ্বল, অব্যক্ত সম্ভ্রমে প্রকৃতির সমক্ষে মানুষ তখন ভক্তের মত অবনত।

এই অপরিসীম বিস্ময়ের ফলস্বরূপ মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির শক্তিনিচয়ের পূজক হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীস্, মিশর, ভারতবর্ষ ও Scandinaviaর দেবদেবী ও দৈত্য-দানবগণ প্রধানতঃ এই প্রকৃতির শক্তিসমূহের মূর্ত্তি-কল্পনা মাত্র। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা এই রূপেই আমরা অনুসরণ করিতে পারি। এই রূপেই Romance ও মহাকাব্যাদির উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ এই রূপেই Nature-worship হইতে Super-nature এর কল্পনায় আসিয়াছিল।

অতীতের বিভিন্ন যুগের কাব্যসাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বর্ত্তমানকাল হইতে আমরা কি আভাষ পাইতেছি আমি সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

মানুষের চিন্তা যে ক্রমশঃ কল্পনা হইতে সত্যে আসিয়া পৌঁছিতেছে বর্ত্তমান যুগের বিশ্বসাহিত্যে আমরা তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।

বর্ত্তমান যুগ transition এর যুগ; কল্পনা হইতে সত্যে, বস্তু হইতে ভাবে এই transition চলিতেছে। ইংলণ্ডে Wordsworthian যুগের রোম্যাণ্টিক সাহিত্য হইতে এই transition সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে বলা যাইতে পারে। Wordsworth হইতে আরম্ভ করিয়া Irish Revival এর কবিগণ পর্য্যন্ত একটা ধারা অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় Idealism ক্রমে ক্রমে Mysticism এ আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের আভাষ, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার অনুভূতি মানুষকে ধীরে ধীরে ভাবুকতা হইতে আধ্যাত্মিকতায় আনিতেছে।

Realism, Idealism, Mysticism প্রভৃতি কথাগুলি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা প্রায়ই ভুল বুঝিয়া বসি।

সাহিত্য-সমালোচনায় চরমপন্থীতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় কারণ সাহিত্যে একের ও অন্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দ্দেশ করিতে গেলে ভুল হইবার সম্ভাবনা। এক ধরণের সমালোচক আছেন, যাঁহাদের Bernard Shaw "Watertight-compartment critics" বলিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপকে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আপনাদের চরম মত প্রকাশ করিয়া বসেন।

Realism বা বস্তুতন্ত্রতা, এবং Idealism বা ভাবুকতা পরস্পর-বিরোধী তো নহেই বরঞ্চ একের সহিত অন্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। বস্তু কথাটাকে আমরা সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝি বলিয়াই এত গোল। বস্তু ভাবের অবলম্বন। যাহাকে নির্ভর করিয়া ভাবরাশি গড়িয়া উঠে তাহাই উহার বস্তু বা Subject Matter, যদি তাহার বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য না-ও থাকে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। নিত্য নূতন সৃষ্টিতেই কবিপ্রতিভার সার্থকতা, সুতরাং কবি পদে পদে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে যাইয়া আপনার মৌলিকতা বিনষ্ট করিতে পারেন না।

Mysticism বা আধ্যাত্মিকতা * ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিস। এই আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্যসাধনার প্রাণ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় জগত বিরাজমান Mystic কাব্য তাহারই আভাষ দিতে প্রয়াসী। এ জগত অনুভূতির জগত, কবি শুধু তাহার আভাষ দিয়া থাকেন। অনুভব করিবার শক্তি যাঁহার নাই তাঁহার নিকট কবির ইঙ্গিতগুলি দুর্ব্বোধ হেঁয়ালী মাত্র।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে এই Mysticism এর ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ, ইয়ুরোপের ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, Irish Revival এর কবিগণ প্রভৃতি এই ভাবের উপাসক।

ইবসেন, মেটারলিঙ্ক কাব্যসাহিত্যকে সত্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন এই হিসাবে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যরথীগণ অপেক্ষাও উচ্চস্তরের কবি, আর অন্ততঃ এই হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদিতরূপে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

এই যে Mysticism এর যুগ ইহা অন্তর্দৃষ্টির যুগ। সত্যের প্রকাশকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিবার একটা অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের কাব্যসাহিত্যে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। সমসাময়িক বর্ত্তমান জগতের ঘটনাপরম্পরা কতকটা আকস্মিকভাবে এই পরিবর্ত্তনকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। অকস্মাৎ যাহা উদ্ভূত হয় মানুষ স্বভাবতঃই তাহাকে একটু দ্বিধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, সুতরাং এই renaissance কে রক্ষণশীল জগত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সে দিন অদূরবর্ত্তী যখন মানুষের উদ্বুদ্ধ অন্তর এই পরিবর্ত্তনের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

সহস্র ব্যর্থতার বেদনায় নিপীড়িত হইয়া মানুষের অন্তরের অন্তরে আজ এই ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে—

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে Mysticism কথাটাকে আমি আধ্যাত্মিকতা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। Obscurity ও Mysticismএর মধ্যে পার্থক্য স্মরণ না রাখিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে না।—লেখক।

"আঁখি মেলে তোমা অনেক খুঁজেছি,
আর আঁখি মেলে নয়,
বাহিরের চাওয়া শেষ, দেখি যদি
ভিতরে চাহিলে হয়।"

প্রাণে ও প্রকৃতিতে, চেতনে ও জড়ে, খণ্ডে ও ভূমায় যে কাল্পনিক বিরোধের অন্তরাল ছিল, ধীরে ধীরে তাহা অপসারিত হইতেছে, নশ্বরতার মধ্যে শাশ্বতের সন্ধানে আজ বিশ্বচিত্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যক্ষকে অতীন্দ্রিয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া কবিচিত্ত উপলব্ধি করিতেছে,—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে,
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ আবার ফিরে যেতে চাহে সুরে,
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।—
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই অনেকের মনে হইতেছিল যেন ইহা বিশ্বের ভবিষ্যৎ আনন্দযুগের মঙ্গল-নির্দ্দেশ। ভাব ও বস্তু Rationality ও Animalityর চিরন্তন দ্বন্দ্বের এইখানেই শেষ। বাহুশক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস পাশ্চাত্যজগতকে যে পথে লইয়া যাইতেছিল তাহাই যে অবলম্বনীয় নহে এই মহাপ্রলয় তাহারই নিষ্ঠুর ইঙ্গিত মাত্র। নতুবা যুগ যুগ ব্যাপী "প্রচুরতম মনুষ্যের প্রভূততম সুখসাধনের" এই যে বিপুল আয়োজন তাহা কিয়ৎকালের মধ্যেই একান্ত ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবে কেন? অন্তরকে মানুষ অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সহস্র প্রচেষ্টাকে যে প্রাণ-রস জীবনী সঞ্চারে সঞ্জীবিত করিবে তাহার মূল উৎসকে চিরদিন সে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। গণ্ডীর পর গণ্ডী আঁকিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনকে সহস্র কাল্পনিক বেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ রাখিতেই মানুষ ব্যাপৃত ছিল। "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নীতির সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা মানুষকে চাণক্য ও Machiavelliর মন্ত্রশিষ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু মানুষের সহজাত intuition এই আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে অনেকবার মাথা তুলিয়াছে। জাতীয়তা ও সার্ব্বজনীনতার দ্বন্দ্ব গ্রীক্ দার্শনিকদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহুবার চলিয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিকগণ 'বিশ্বসাম্রাজ্যের' স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আলেকজান্দার এবং নেপোলিয়ানও সে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ানের স্বপ্নের সহিত গ্রীক্ স্বপ্নের কত প্রভেদ!

সার্ব্বজনীনতার এই intuitive কল্পনা জাতীয়তার বিরুদ্ধে চিরদিনই অলক্ষ্যে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। International Law ইহার এক প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি। মানবচরিত্রের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম এতকাল আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, কারণ স্বার্থ ও পরার্থের সংগ্রামে আপাতদৃষ্টিতে এতকাল স্বার্থই জয়ী হইয়া আসিয়াছে; পরার্থই যে স্বার্থ এ ভাব মানুষ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। Democracyর সঙ্কীর্ণ খাতে বিশ্বজনীনতার লুপ্তপ্রায় ধারা কোনরূপে এতকাল বহিয়া আসিয়াছে। ব্যক্তি ও সংঘের মধ্যে যখনই মানুষ গণ্ডী আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা সামাজিক সুখ দুঃখের উপর যখনই পদাঘাত করিয়াছে তখনই Democracy এবং Universalism মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্স, রুষ এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার প্রধান সাক্ষী।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে বিশ্বজনীনতার ক্ষীণধারা নবশক্তি লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে তাহার চিরস্থায়ী ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মন্ত্রের নবজাগরণ বিশ্বের কল্পনাপ্রবাহকে বেশীদিন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই, কারণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব যে সংঘের (massএর) মর্ম্মবেদনার

রাক্ষসী মূর্ত্তি, সেই সংঘই আপনার কর্ত্তব্য-বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ইংরেজী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার খুব একটা উল্লেখ-যোগ্য অভিব্যক্তি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ জাতির স্বাভাবিক রক্ষণশীলতাই বোধ হয় ইহার কারণ। ইংরেজী সাহিত্যে আভিজাত্য একটু বেশী, সাধারণের প্রাণ স্পন্দন ইহাতে বড় একটা অনুভূত হয় না। প্রাচীন যুগে Chaucer প্রভৃতির সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে জন সাধারণের আলেখ্য যতটা পাওয়া যায় পরে আর ততটা পাওয়া যায় না। Burnsএর 'A man's a man for a' that' নামক কবিতার ন্যায় কবিতা ইংরেজী সাহিত্যে বেশী দেখা যায় না।

কিন্তু সে যাহাই হউক ইংরেজী সাহিত্য বিশ্বজনীনতার বর্ত্তমান যুগের renaissanceএ পরোক্ষভাবে সহায় হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শতাব্দীব্যাপী ভাব-বিনিময়ে এক নবসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে যাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ সম্পত্তি, যাহা বিশ্ব-চিন্তার বাণী-মূর্ত্তি।

সার্ব্বজনীনতার এই বর্দ্ধনশীল কল্পনা বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যকে দিন দিন সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছে। বিশ্ববাণীর কল্পনিকুঞ্জে মানুষ এক আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে যেখানে দ্বেষ নাই, বিরোধ নাই, ঘৃণা নাই, অন্যায় নাই, যেখানে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণে কোনও প্রভেদ নাই। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সত্যানুসন্ধান হইতে আমরা কাব্যের এক মহামঙ্গলময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইতেছি।

বর্ত্তমান যুগে আর একটী বিষয় সকলেরই চক্ষে পড়িতেছে—তাহা পরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাসে শিথিলতা। জড়জগতের উপর আংশিক প্রভুত্বের গর্ব্বে মানুষ অন্তর্জগৎকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বৈষ্ণবের 'অহৈতুকী ভক্তি' আজ প্রায় কবি-কল্পনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও প্রমাণের উপর বিশ্বাস নির্ভর করিতেছে। প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, চিরাগত সংস্কার, সামাজিক বিধিনিয়ম মানুষের চিত্তের উপর অধিকার হারাইয়াছে।

কিন্তু যে জড়বিজ্ঞান মানুষকে যুক্তি ও প্রমাণের দাস করিয়া তুলিয়াছিল মানুষ যখন তাহার শক্তির অসীমতায় অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে তখন তাহার অন্তর অবলম্বন লাভ করিবে কোথায়? ইয়ুরোপের মহা-প্রলয়ে আজ চারিদিকে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছে।

ধর্ম্মের বাহিরের রূপকে মানুষ অবজ্ঞা করিতে পারে, Ceremony বা প্রথা কুসংস্কারের গণ্ডীতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সত্যকে মানবচিত্ত স্বীকার করিবেই। যে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ চেষ্টায় কাব্য আজ আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া যাহা যুগ যুগ বিশ্বের চিত্তপিপাসা মিটাইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তাহা মানুষের লক্ষ্যবিহীন অন্তরকে পথ নির্দ্দেশ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমগ্র জগতের যিনি ভাগ্যবিধাতা তাঁহারই অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বিশ্বের কাব্যসাহিত্য আজ এই গৌরবময় মহা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জগত-কবি-সভায় যে আজ ভারতবর্ষের ঋষি-কবি বরমাল্য লাভ করিলেন, এই অভূতপূর্ব্ব সংঘটনকে যদি আমরা বিশ্বের অন্তরের দিক হইতে না দেখি তবে তাহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা হইবে না। যে আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের প্রাণ, যাহার কণামাত্র লাভ করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্য জগত আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে মানবের নিরাশ্রয় চিত্ত তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। যে প্রাচীন ভারতবর্ষ জগৎগুরুর গৌরবময় আসন হইতে নামিয়া বসিয়াছিল তাহার সেই পরিত্যক্ত আসন গ্রহণের নিমিত্ত আবার আহ্বান আসিবে।

জানিনা সেদিন আবার মধুর সামছন্দে ভারতের তপোবন মুখরিত হইবে কি না। সে কল্পনার ভবিষ্যতে হয়ত বিশ্বমানব গুহাহিত শাশ্বত সত্যের সন্ধান লাভ করিবে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদ রেখা মুছিয়া যাইবে, ধরণীর ললাট হইতে অধর্ম্ম ও অন্যায়ের কালিমা-লেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, অমৃতের পুত্রগণ অন্ধকারের পরপারাস্থিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিবে এবং—

"নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,

একটী প্রেমের মাঝারে মিশিবে
সকল প্রেমের স্মৃতি,—
সকল কালের সকল কবির গীতি ”

হয়ত সেই মহামিলনের যুগে মিলনতীর্থের যাত্রীগণ দেবদর্শনতৃপ্ত ভক্তের মত, উচ্ছ্বসিতস্বরে গাহিয়া উঠিবে,—

"হে মোর চিত্ত। পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ;
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে—
বন্দন করি তারে।"

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

স্বপ্ন-মিলনে।

স্বপ্ন যদি হইত সফল !—
সংসার-মরুর মাঝে তেমতি মোহিনী-সাজে
তুমি ফিরে আসিতে কেবল।
এ শূন্য কুটীর মম
পূর্ণ হত নিরুপম
আনন্দে আলোকে হাস্যে সঙ্গীতে শোভায়,—
উথলিত সুধা-সিন্ধু বিশুষ্ক হিয়ায়।
যত সাধ, যত আশা,
যত তৃষা, ভালবাসা,
সকলি সার্থক হ'ত তোমারি মাঝার,
আরাধ্য বাঞ্ছিত নিধি লভি আপনার।
সারা বুকে জ্বালি তুষানল
বিকচ জীবনখানি শ্মশান হ'ত না রাণী,
হ'ত না বহিতে আঁখি-জল।
স্বপ্ন যদি হইত সফল!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "ব্রতকথা"* পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তিনি "শৈব্যা", "মহরম" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্রতকথাগুলির অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বে ভারতী, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে হিন্দুমহিলাগণ যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, গ্রন্থকার এই পুস্তকে সেগুলির অনুষ্ঠান প্রণালী ও আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন। "সম্পদনারায়ণ", "ফুলকর," "কর্ম্মাদী", "মাঘমণ্ডল", "একচোরা" প্রভৃতি ব্রত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষত্ব। পশ্চিমবঙ্গে এগুলির নাম শুনি নাই। দেশভেদে আচার ভেদ। কিন্তু যে দেশে যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, এই সকল ব্রত নিয়মের উদ্দেশ্য খুব মহৎ এবং পবিত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন, "উহাতে সংযম, সহিষ্ণুতা, স্নেহ ও করুণার এক সুমহান্ আদর্শ বিরাজিত দেখিতে পাই।" প্রাচীনকাল হইতে এই মহান্ আদর্শে হিন্দুনারীর চরিত্র গঠিত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল ব্রতনিয়ম অনুষ্ঠান তাঁহাদের চরিত্রগঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এখনও হিন্দুনারীর চরিত্রে যে সংযম তিতিক্ষা স্নেহপ্রীতি, জাগরূক রহিয়াছে, এই সকল ব্রত নিয়মের অনুষ্ঠান তাহার প্রধান কারণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব শুভ অনুষ্ঠান সমাজে আর বেশীদিন টিঁকিবে বলিয়া বোধ হয় না। যে ইহ-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বগ্রাসী পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ কবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ফলে ক্রমে সংযমের স্থলে বিলাসিতার এবং ত্যাগের স্থলে ভোগের পূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ যেমন দিন দিন ধর্ম্মবিশ্বাসহীন হইতেছেন, আমাদের হিন্দুমহিলাগণও তাঁহাদের সেই পথের অনুসরণ করিবেন। এইরূপে

* প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী ঢাকা। মূল্য ৷৹ আনা।

কিছুকাল পরেই এই সকল ব্রতকথা পুরাতত্ত্বের নিভৃত কোঠায় স্থানলাভ করিবে।

নরেন্দ্রবাবু এই সকল ব্রত-নিয়মগুলি সমাজে জীবিত থাকিতে থাকিতে ইহাদের অখণ্ডিত চিত্র সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কারণ কাল ক্রমে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী হইবে।

নরেন্দ্রবাবুর ভাষা বেশ সরল প্রাঞ্জল ও মিষ্ট। কিন্তু প্রথম তিনটী কথায় তিনি কলিকাতা অঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়া ভাল করেন নাই। আমার মতে এইরূপ ভাষা স্থায়ি সাহিত্য রচনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, এবং আমাদের জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায়। ময়মনসিংহ বাসীর কলিকাতার ভাষায় বই লেখা ঠিক যেন বাঙ্গালীর ছেলের সাহেব সাজা। তুমি হ্যাট্ কোট্ প্যান্ট্ কলার নেক্‌টাই ঠিক ঠিক রকম পরিলেও কিছুতেই তোমার কৃত্রিমতা ঢাকিতে পারিবে না। ইহাতে বাঙ্গালীর ছেলের আত্ম-সম্মান বাড়ে না, বরং কমে। কারণ খাঁটী বাঙ্গালী ইয়ুরেশিয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা কে না বলিবে? সেইরূপ আমাদের চিরপ্রচলিত সাধুভাষার মর্য্যাদা ও এই "ক্যাল্‌কেসিয়ান্" ভাষা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। নরেন্দ্রবাবু এই "ক্যাল্‌কেসিয়ান" বাঙ্গলার অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক idiom এর ভুল করিয়াছেন; তাহা ত করিবেনই। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে "ক্যাল্-ক্যাসিয়ান্" ভাষা চালাইতে চান এই পুস্তকখানি আমি তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে বঙ্গসাহিত্যের দশা কি হইবে। তাঁহারা বঙ্গসাহিত্য সেবাকে কি মারাট্টা পরিখার মধ্যে সীমা-বদ্ধ করিয়া রাখিতে না চান, তবে অনেক লেখক বাধ্য হইয়া বীণাপাণির ভোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাদেশিকতা মিশ্রিত এক খিঁচুরী প্রস্তুত করিবেন। তাহা বঙ্গবাসীর প্রীতিকর হইবে কি! আশা করি নরেন্দ্রবাবু পরবর্ত্তী সংস্করণে এই সকল ভুল সংশোধন করিবন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "মধুর সাধন" আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি; স্থানে স্থানে মুগ্ধ হইয়াছি।

আজ কালকার কুহেলিময়, দুর্ব্বোধ গীতি কাব্যের দিনে এমন প্রাণস্পর্শী অথচ মধুর, এমন শান্তরসাশ্রিত অথচ উন্মাদক কবিতা পাঠের সুবিধালাভ সৌভাগ্যই বটে।

সাধক রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কবি এই যে সহস্র সাধন সঙ্গীত গাহিয়াছেন তাহা ভাষার ঝঙ্কারে যেমন মধুর, ভাব সম্পদেও তেমন অতুলনীয়।

ভগবান্‌কে মাতৃভাবে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আনিয়া তাঁহার সহিত অন্তরতম স্নেহ-সম্বন্ধ পাতিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা ভারতবাসীর নিজস্ব। তাই শিশু-পুত্র যেমন মায়ের সহিত নানা ভাবে নানা ছলে খেলা করে, তেমনি কবি জগজ্জননীকে স্নেহময়ী মা বলিয়া তাঁহার নিকট খাবার জন্য আবদার করিতেছেন:—

"আয়মা ঘরে আয় সকালে,
(আমার) ক্ষুধায় জীবন যাচ্ছে চলে
এদিক সেদিক যেওনা আর
একাজ ও কাজ সেকাজ ব'লো।"

কখনো অভিমানে শিশুর মত ঠোট ফুলাইয়া বলি-তেছেন:—

"ফাঁকি দিতে খুব শিখেছে
(হেন) কুশিক্ষা কোথায় পেয়েছ
পিতৃশিক্ষা পাষণতায়, পিতাপেক্ষা পটু আছ"

অথবা:—

সদাই বদন রেখেছ ভারী,
(যেন) কতই তোমার ধার ধারি,
(যেজন) খাটিবে যেমন, পাবে মজুরী তেমন
(তুমি) কৃপা ক'রে কবে কারে দিয়েছি বেতন
খাটায়ে মজুরী দিয়ে, এত কেন জাঁকজারি?"

কখনো বা সাধক আরাধিতকে ওঝা, তেলীর মেয়ে, মালিনী, খলিকা, মুটে, বেনে বুড়ী, মুদি ঘটকমেয়ে, কুম্ভকরী প্রভৃতি দৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তুলনা করিয়া নূতন নূতন ভাবের তরঙ্গে বিভোর হইয়া ভাসিতেছেন।

গানের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ভাব অনুসারে নানা উচ্ছ্বাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। যেন শ্রেণীবদ্ধ মিষ্টান্নের দোকান। "অনুরাগ", "আব্দার", "শারদ", "খেলা", "ভক্তি" প্রভৃতি।

কবি যে উপমা লইয়া খেলা করেন তাহার ভাষা যেমন সুরের ঝঙ্কারে তালে তালে নাচিয়া উঠে, তাহার ভাবও তেমনই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়া চিত্ত পরিব্যাপ্ত করে। নিম্নে একটী মাত্র উদাহরণ দিতেছি:—

"ভক্ত ধনী এক এক খানি ভক্তিজাহাজ বোঝাই করে।
মালগুলি সব নিচ্ছ কিনে
ঠকিয়ে গরীব খরিদ্‌দারে
ভবের হাটে লুটে পুটে বড় বড় খরিদ্‌দারে।
(তাদের) সদাই চেষ্টা প্রেমের কোঠা
গরীবে না পেতে পারে।
যে যত রপ্তানি কর, সবই যাবে তার ভাণ্ডারে
মিলে মিশে খরিদ কর, এক মালিতে একি দরে।"

তার পর, ভাষা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহা গিরিনদীর স্রোতের মত অবিরাম গতিতে তর তর বহিয়া যাইতেছে। কোথাও রচনার খটমট নাই, শব্দের অনাবশ্যক ঝঙ্কারে ভাবের অভাব পূরণের চেষ্টা নাই, ঘষিয়া মাজিয়া অলংকার পরাইবার প্রয়াস নাই; উহা সাধক বাঙ্গালীর সরল অনাবিল বাঙ্গালা, যাহা কৃষক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। বাস্তবিক Goe the ঠিকই বলিয়াছেন:—

"If to your heart your tongue be true,
Why hunt for words with much ado?"

প্রাণে ভাব থাকিলে ভাষা সেবাদাসীর ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবেই।

'আমরা মধুসূদনের সার্থক নামা "মধুর সাধন" পড়িয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে এই অভিনব রত্নটীর জন্য সাধক কবিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

তীর্থ-ভ্রমণ।

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত।

(তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা)

এই পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা বর্ণনাতীত। ইহার পাঠকালে একটী কথা, যাহা আমার হৃদয়ে আদ্যোপান্ত উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা অগ্রে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পুস্তক যে সময় লিখিত, সে সময় বঙ্গের ইদানীন্তন সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত মাতৃভাষা মাতৃগর্ভে নিহিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আধুনিক মাতৃভাষায় একজন সিদ্ধহস্ত সুলেখক কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও জাতির হৃদয়ের ভাষায় প্রাণের কথা সর্ব্বযুগেই অদ্বৈত, যথা,—রামপ্রসাদি গান অনন্তকাল অপরিবর্ত্তনীয়। বঙ্গভাষার চরমোন্নতির কালেও ভক্তের প্রাণের ভাষার মার নাই।

গ্রন্থকারের বর্ণনা পাঠকালে মনে হয়, যেন, গ্রন্থবর্ণিত সেই সেই দেশে উপস্থিত থাকিয়া সেই সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইহাতে বর্ণিত তীর্থাদি-স্থানসকলে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং স্বচক্ষে সেই সকল প্রাণারাম দৃশ্যাবলী দর্শন করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। যাঁহাদের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য না ঘটে, তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন, তাহা হইলে, গৃহে বসিয়াই সম্মুখে সেই সকল দেবদুর্লভ অপূর্ব্ব হৃদয়পাবন দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া পুলকিত হৃদয়ে আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকের স্থূল কলেবর দর্শনে, সমস্ত পড়িবার ধৈর্য্য থাকিবে কিনা সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যেন রুদ্ধশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম।

* প্রাপ্তিস্থান—২৪৩।১ নং অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।
মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।৹ সদস্য পক্ষে ১৲ এবং শাখা সভার সদস্য পক্ষে ১।৹।

এস্থলে আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈদৃশ হৃদয়পাবন অপূর্ব্ব নদনদী, তীর্থাশ্রম, ভগবানের লীলাভূমি, পূর্ব্ববৃত্তকথা, পুণ্যশ্লোক-কাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু ভগবদ্ভক্ত আর্য্য-হৃদয়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও সেবনীয়, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসে উপভোগ করা যায়। সমস্ত বিষয় একটু বিবৃত করিয়া বলিতে গেলে, এ ভূমিকা অতিদীর্ঘ হইয়া পড়ে, এজন্য আমি দিঙ্‌মাত্র উল্লেখ করিয়া, মাতৃভাষার সুসন্তানগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা একটীবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

'রোজ-নাম্‌চা' বা ডায়েরী লেখার প্রথা, আমি জানিতাম, সম্পূর্ণ এ কালের কথা। কিন্তু এ গ্রন্থে তাহা সুপ্রণালীতে যথাযথ লিপিবদ্ধ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

পুস্তক পাঠে জানিলাম, গ্রন্থকার যৎকালে এই সকল তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি ভীষণ শূলবেদনা হইতে যদিও আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শরীর যৎপরোনাস্তি কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবস্থায় এরূপ সুদুষ্কর আয়াস-সাধ্য সঙ্কটাকীর্ণ স্থান সকল পরিভ্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রকৃত হৃদয়ের শক্তি অপরাজেয়। সে শক্তি দৈব, মানুষ কোন বাধাই মানে না। সেই শক্তির প্রভাবেই দুর্ব্বলা পুত্রপ্রাণা অবলা দহ্যমান অনলদগ্নিময় গৃহ হইতে নিজ প্রাণাধিক শিশুসন্তানকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন,—বীরপুরুষেরও দুরারোহ অত্যুচ্চতম গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া ঈগলপক্ষীর কবল হইতে প্রাণের শিশুসন্তানকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বে ভারতের পতিপ্রাণা সতীরা এই শক্তির প্রভাবেই অনলস্ত চিতানলকে অমৃতশীতল পুষ্পশয্যা জ্ঞান করিয়া পতিদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অম্লানমুখে নিজ কলেবর ভস্মসাৎ করিতেন।

এই পুস্তকে আনুপূর্ব্বিক ও অবিকল বর্ণনা গ্রন্থকারের শুধু হৃদয়ের নহে, তদীয় মস্তিষ্কেরও অসামান্য শক্তির পরিচায়ক। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাল্যকালে হিতোপদেশে পড়িয়াছিলাম—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥

সেই সিদ্ধ পুরুষের বাণী এই মহাবংশে পুরুষপরম্পরায় সার্থক দেখিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা একালে বিরল। স্বদেশের পুণ্যশ্লোকগণের কথামৃত পাঠে মানব-জীবনের স্রোত অপূর্ব্ব কল্যাণপথে প্রবর্ত্তিত হয়। এই জন্যই ভারতীয় জ্ঞানসিন্ধু-বিশ্ববন্ধু মহাপুরুষেরা একবাক্যে বলিয়াছেন,—

"মহাত্মনাং হি চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেব হি।"
পুণ্যময় জীবন-চরিত নিত্যই সকলের শ্রোতব্য।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

Regtd. No. C. 746.

VOL. 6. Nos. 5 & 6.

AUG. & SEPT., 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Raad, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ M R Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I C.I.E I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ J. G. Cumming, C. S. I.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C,S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M. A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

Pseudo Callisthenes	Prof. J. N. Das Gupta M. A. (OXON). ...	141
The Despondency of Arjun ...	N. Mukerjee M. A. Bar-at-Law ...	147
Alauddin Khiliji—The benavolent Despot	Bamacharan Chatterji M. A.	150
Weather Folklore	... ...	153
Indian Student Sketches ...	Prof. T. O'donnell (Agra College) ...	157
Glories of the Sanskrit Literature ...	Govinda Ch. Mukerji M. A., B. L. ...	160
Sir William Ramsay	... ...	174
The Common origin of the Religions of India	Sir Guilford Molesworth K. C. I. E. ... (Journal of the East India Association)	175

সূচী

	বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
১।	প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	১৩৯
২।	শারনাথ	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকিশোর সেন	১৪৪
৩।	ভাদ্রে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	১৪৭
৪।	সভাপতির অভিভাষণ	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	১৪৮
৫।	উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্ এ	১৬৩
৬।	ভাষার আকার ও বিকার	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম্ এ, ডি এল ...	১৬৪
৭।	অভাবে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব চৌধুরী	১৭১
৮।	লুকোচুরি ঐ	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	১৭১

THE DACCA REVIEW.

Vol. VI.	AUG. & SEPT., 1916.	Nos. 5 & 6.

PSEUDO CALLISTHENES

The Syriac Version.

I.

The Syriac version of the Pseudo Callisthenes is an old familiar thing to the European scholastic world. Some time ago Budge was able to place in our hands an English rendering of this legendary story* of Alexander in a most acceptable form, and he discussed some of the problems connected with it in a most interesting fashion. Unfortunately that version is little known to our younger generation of historical students. I therefore propose to string together a few of the striking episodes of the story in the hope that our friends may be tempted to read and examine it critically for themselves. On the present occasion I shall confine myself mainly to that part of the story which is likely to appeal to us most in India, that part, namely, of the career of Alexander where our great dreamer of imperialism comes into direct contact with India, fights his duel with Porus, interviews the Gymnosophists and has his experience of the wondrous talking trees. As is well known, Alexander's dealings with the Persian monarch and the Persian royal family after the defeat of Darius illustrate some of the noblest traits of his character. The Syriac version contains nothing which in any way detracts from the nobility that popular imagination has always

* The life of Alexander as given by eastern writers, contains little that can be deemed authentic. *Malcolm.*

1. True to his *chivalrous instincts*, the victor had the body (of Darins) buried with all pomp at Persepolis— Sykes.

After this the ambassadors of the king of Persia came to him with letters proffering ten thousand talents and all Mesopotamia, and his daughter in marriage, and Darius himself to become his friend and associate, if he would cease from war ; such conditions that if I were Alexander, said Parmenio, I would accept them. So would I, said Alexander, if I were Parminio.

Purchas his Pilgrims.

associated in this connection with the memory of the mighty conqueror of old. And similarly about Darius, we come across nothing that militates against the popular estimate of his weakness and indecision which brought about his ruin. Let us note in what light Darius is presented before us, for example, in what follows.

Darius being vanquished by Alexander, came to a certain river, and finding it frozen, he himself crossed over it in his chariot; but when the army of Darius came to the bank of the river, the troops began to cross over it, and suddenly the ice of the river melted under them, and the army was drowned in the river, and those that remained upon the other side of the river were slaughtered by the Macedonians. Then Darius went into his palace, and threw himself upon his face on the ground, and began to weep for the army of the country, for all the warriors of the country were dead and had perished, and for the land which had been emptied of its mighty men; and he began to say: "Woe is me, which of the stars is it that has destroyed the kingdom of the Persians? I, Darius, who subdued many lands and cities and nations, and reduced a multitude of islands and towns to slavery, have now entered my palace in flight and discomfiture. I, who with the sun traversed the world—but in brief, it is not right for a man to rely upon his destiny, for if his luck turn and there be an opportunity, it lifts up and exalts the most despised of men and seats him above the clouds, while it brings down the lofty from his height and casts him into the depths." And when he had said this, he rose up from his palace and collected his thoughts, and composed a letter to Alexander and wrote to him thus: "From Darius the king to my lord Alexander. Know first of all that thou art born a man; and I will give thee this token that even thou mayest not meditate anything too great for thee. Because even the mighty Xerxes, who shewed me the light,—he whom the Greeks so loved, as thou must have heard*,—meditated something too high for him, and afterwards, having given his mind to greediness, he who lacked nothing, neither gold nor pearls, nor precious stones nor statues of brass, when his good luck left him, returned from Hellas defeated. And now, call thou these things to mind, and be gracious to us and have mercy upon us, for we have now fled to thee for refuge. Behold now my mother and my wife and my daughter, those who have been given to me by the gods as a joy from the god of gods; they were famed and honoured throughout the whole world; do thou take them as thy slaves. And I will show thee the treasure which my ancestors laid up from the beginning upon

* The Syriac text appears to be corrupt n this passage.

the earth. And I will entreat the gods that henceforth thou mayest be master over the Palhaye (Parthians), and the Persians, aud the rest of the nations of the world, all the days of thy life; because Zeus hath exalted thee. Farewell."

The mighty monarch of an once all-powerful empire throws himself on the ground and begins to weep after his defeat at the loss of his army. He lays at the feet of the Victor all the treasures of his kingdom, his mother his wife and his daughter, and begs—"do thou take them as thy slaves." When however Darius realises that the humiliating submission will not avert the ruin hanging over him, he appeals to Porus. :—

"From Darius the king of kings to Porus the king of the Indians, greeting. I have written letters to thee before, asking for assistance in the ruin of my house, because the savageness and fury of this evil beast, which is come against me, do not, as it seems to me resemble man's; it casts itself into the sea. and loves battle by water, and does not wish to give back to me my mother and my wife and daughter, neither does he desire to make peace with me in any way whatsoever. Therefore I have no resource but of necessity am bound to fight with him. Now thus will I do; either I will take his country from him, or myself will no longer go about among the living in this world. Have pity then upon me at this time, and avenge me that am despised. Remember too the mutual love and friendship, and confidence which existed between our fathers, and give orders to gather together troops from every place and bring them with thee to the Caspian gates, which are called Virophhagar; and I will give to every single man of those who come to my assistance every month three horses and six darics and corn and straw and hay and whatever food he requires; and to thee will I give the half of whatever spoil and booty they make."

In the end the nobles of Darius acted treacherously and two of his generals, we are told, stabbed him with their swords, driving them right through his back. Here, let us note in what light Alexander, as contrasted with Darius, is made to appear before us. * Wben

According to these authorities, (Persian historians) during the heat of battle, two of the soldiers of Darab taking advantage of his being unguarded, slew him, and fled to Alexander, from whom they expected a great reward. That monarch, the moment he learnt what had happened, hastened to the spot where the Persian king had fallen. He found him in the pains of death, stretched upon the ground, and covered with dust and blood. Alexander alighted from the horse, and raised the head of his enemy upon his knees. The soul of the conqueror was melted at the sight, he shed tears, and kissed the cheek of the expiring Darab; who, opening his eyes, exclaimed:—"The world has a thousand doors through which its tenants continually enter, and pass away!" "I swear to you," said Alexander, "I never wished a day like this! I desired not

Alexander came up to Darius, and saw that he had been mercilessly stabbed and lying on the ground, he let fall tears from his eyes upon Darius, and spread over Darius the purple garment with which he was clothed, and sat down by him, and laid his hand upon the breast of Darius, and said to Darius, sorrowfully: "Rise up, Darius: be lord again over thy land, and take the royal crown of Persians, and be again renowned for greatness. I swear an oath by all the gods that I say this in sincerity and do not speak falsely; I will restore and give to thee alone the crown and kingship, because I ate salt at thy table when I came to thee as a spy. *And now stand up and play the man; for it does not become a king to be in trouble because his luck turns away from him for a little while.** We are all men, and are yoked to fate, and as fate wills so it exalts us. Arise now, and play the man, and take thy country, and henceforth thou shalt have no trouble or sorrow through me. Say then now, who these are that stabbed thee, and I will take vengeance for thee upon them."

When Alexander had spoken all these words, Darius heaved sighs and let fall tears from his eyes, and took Alexander's hand from his breast and brought it to his mouth and kissed it, and said to him: "My son Alexander, never let thy mind be lifted up by vainglorious arrogance; for thou doest and performest and orderest all deeds and works and orderings like the gods, and thou mayest imagine in thy mind that thy hands have reached heaven. Then it will be necessary for thee to fear what may happen in the hereafter. Because of this it is certain to me that fate is known neither to the king nor to the meanest among men, and that the final destiny of men is hidden and concealed from all. Look now what I

to see your royal head in the dust, nor that blood should stain these cheeks!" When Darab heard his conqueror mourning over him, he sighed deeply, and said, he trusted his base murderers would not escape: that Alexander would not place a stranger on the throne of Persia: and that he would not injure the honour of his family; but marry his daughter, Roushunuk. The moment after he had expressed these wishes, he expired: his body was instantly embalmed with musk and amber, wrapped in a cloth of gold, and placed in a rich coffin adorned with jewels. It was, in that state, carried to the sepulchral vault with the most extraordinary honours. Ten thousand men with drawn swords preceded it: ten thousand more followed, and an equal number marched on each flank. Alexander himself. with the nobles of Persia, and the great officers of his army, attended the obsequies as mourners. The moment the funeral was over, the two murderers of Darab were hanged. Some time afterwards, Alexander married Roushunuk, and nominated the brother of the late king to the sovereignty of Persia: but his power does not appear to have been established, as the policy of Alexander led him to divide that empire into ninety different principalities.

MALCOLM.

* The italics are mine.

was, and what I am: I who proudly subdued and captured countries and lords and many kings of the earth trembled at me; and now I am cast away like the lowest of all men. And of all the host of my generals and officers and ambassadors, not one is near me now to close my eyes, except these hands of thine, O king, doer of good things. Let the Macedonians and Persians sit in mourning for me, and let the two armies become one, and let the seed of Philip and Darius be one. And as for Ariodocht (Irandokht) my mother, regard her now as if thou thyself wert born of her, and consider my wife as thy sister, and take my daughter Roshnak (Roxane) for thy wife, that the seed of Darius and of Philip may be mingled in her." Then Alexander brought his hand to the face of Darius, who said, "Into thy hands I commend my spirit;" and straightway his soul departed.

Then Alexander gave orders to wash the body of Darius, and to array him in royal apparel, and that all the officers of the Macedonian and Persian armies should march in full armour before Darius; and he together with the Persian nobles bore the bier of Darius, and he went on foot to the grave, and the bier of Darius was carried to the grave upon their shoulders.

After a few days Alexander wrote the following letter to the mother and wife of Darius. "From king Alexander to Irandokht and Estehar (Statira) greeting. At the time when king Darius opposed us with hostility, we sought to avenge ourselves according to the will of God. Although we sought the victory over Darius, we did not desire his death. On the contrary, our desire was that he might live and be under our dominion. We found him however stabbed by the hand of his troops and lying upon the ground, with very little life left in him. I was very grieved for him, and because of my sorrow I threw over him the purple robe with which I was clothed, and covered him. And I asked him, 'who is he that slew thee?' But when he had begun to give me instructions concerning his mother and his wife and Roshnak (Roxune) his daughter, his life departed from him, and he was unable to speak to me concerning other matters. We therefore sought out the evildoers by stratagem, and found them, and slew them as they deserved. We ordered the body of Darius to be buried and to be guarded honourably and fittingly. And we commanded a new grave to be made beside the grave of his father, and his body to be embalmed with spices, and to be laid in the grave. And now we bid you keep yourselves from sorrow and grief, for we will reestablish you in your royalty; therefore remain where ye are, until we have arranged the matters which require arrangement. We command also that Roshnak the daughter of Darius be our consort; therefore do reverence to Roshnak as to the wife of Alexander."

On the eve of the celebration of the marriage feast Alexander wrote a letter to Roshnak as follows: "From Alexander to Roshnak my sister greeting. I send thee clothes and other ornaments for thine own self, and to Irandokht the mother of Darius, and Estehar (Statira) his wife, for themselves. Accept them and keep for thyself these clothes and ornaments. First of all be pleasing to the gods; then pay due reverence to Irandokht and Estehar, and hold them in honour; and fear thou the command of Olympias my mother, and do not exalt thyself beyond measure. If thou doest these things, both I and thou shall be praised exceedingly and all the gods be well pleased with us." Then Alexander took Roshnak to wife.

The letter I have just quoted has a strange appeal for the Indian reader. Because the sentiments it conveys are the time-honoured sentiments of an Indian householder. The Greek hero on the eve of his marriage writes to his bride elect, and exhorts her to be in the first place, pleasing to the Gods. "Then" he adds, "honour your father's mother and your own mother. Do thou also fear the commands of my mother and do not exalt thyself over much." Not a word is to be found about his own self, excepting this that the pursuit of these ideals on the part of the wife would make their wedded life praiseworthy in the estimation of man and "approved" in the eyes of Heaven. Have we not here one of these basic principles on which rests the solidarity of the entire domestic economy of an orthodox Hindu household? A striking illustration of the approximation between the ancient Greek mind and the trend of Hindu thought, if the letter under reference be not a later oriental interpolation.

How pale and colourless by the side of this letter is the somewhat pointless corresponding epistle in the *Ethiopic* version of the Pseudo—Callisthenes, which runs thus:—

"I give thanks unto God Almighty, Who hath given the Persians unto me, and Who hath made them subject unto me by thy marriage (with me), and behold, I rejoice and am glad in thee

The incident which has most laid hold of the Oriental peoples to proclaim Alexander's chastity is that which happened in connexion with the mother, wife and daughter of Darius. when Parmenion suggested to him that the Persian royal women should share the usual fate of female captives, he replied that it would be a disgraceful thing for the Greeks having fought and overcome men to allow themselves to be vanquished by women. Elsewhere Alexander says that he has neither seen nor does he desire to see the wife of Darius, who was said to be a most beautiful woman, and that he has not allowed any man to speak of her beauty in his presence.

These facts, in whole or in part, must have found their way all over the East, and they no doubt, greatly impressed the Oriental imagination.*Budge's Introduction to the Ethiopic version of the Pseudo Callisthenes.*

and in them by reason of this thing. And I have written to my mother to tell her of what I have seen and of my marriage with thee, in order that she may deal graciously with thee and may treat thee with becoming reverence because of it, and may send to thee such things as are necessary for a queen for I have heard concerning thine honourable estate, and thy beauty, and thine understanding, and thy renown."

J. N. DAS GUPTA.

THE DESPONDENCY OF ARJUN.

"On *Kuru's* plain, the scene of righteous wars,
Tell me, O Sonjoy, how the rival powers,
Athirst for blood. beneath each standard fought?
What doughty deeds my sons and nephews wrought?"
Thus *Dhrita-Rashtra* of his kinsman asked,
And *Sonjoy* in review the war thus passed;
"O'er yonder, reverend sage, the *Pandav* clan
In serried ranks, behold, their battle plan."
King *Duryodhan* thus to old *Drona* said,
Whilst he surveyed his cousins' troops arrayed.
"What a vast host extends o'er all the field,
Disposed by *Drupadi's* son in war-craft skilled
(Thy pupil once but now thy foeman turned,)
And other warrior-chiefs, behold, around—
All peers in Prowess of *Arjun* and *Bhim*—
Match-less in Bow and Shaft, so stern and grim
Mark *Yu-yu-dhance* here, and *Virat* there
And vetern *Drupad*—all commanders tare
Mark *Che-kitana* and *Dhris-ta-ketu*,
And *Purujit* and Kunti-bhoja too;
Yu-dha-manyu, for feats of strength renowned,
Not less *Utta-manyas*, (a sovereign crowned)
Mark *Kashi's* King, the more conspicuous viewed,
And *Shaivya* brave, (with strength of bulls endued);
And last, not least, *Subhadra's* valiant son,
And *Drau-padi's*—all warriors not unknown"
"Now turn thine eyes and our bold chiefs behold,
The leaders in war in the *Kourav* fold,
And deign, O sage, their honoured names to know
And by our own strength guage that of our foe.

"Thyself art first and foremost in our band,
And, next in order, *Bhishma* holds command;
Next *Karna*, ever victor in the field;
And *Kripa* then, a leader sage and skilled
And *Vikarna* and *Ashwathaman* view,
And *Som-Dutt's* brave son, *Jaya-dratha* too.
And many' many more, (a numerous band),
Resolved to die for me—their King and land.
What zeal divine! What martial skill behold
What wondrous handling of arms manifold!"
"Howe'er disposed with strategy of war
Our numerous troops beneath brave *Bhishma's* care,
Yet seems the force by mighty *Bhima* led
More than a match and better far arrayed."
Then turning to the warriors on his side
These words of caution the King said aside
"Maintain, ye Warrior-princes, each his post
Round Bhishma's flag against the hostile host:
"Lo! as if to dispel his false alarms
Bhishma now raised above the clang of arms
" A lion's roar upon his wreathed shell.
At once what mingled sounds the ear assail.
Loud rung all drums and Kettle drums around.
And conches and horns mixed with trumpets' sound,
Madhav blew on his shell, "Punch-Janya" named,
And *Dhananjoy* on the "Dev-Datta" famed,
And *Bhima*, (lo! for gruesome deeds renowned),
Blew on the "Paunder" blasts of ominous sound.
On "Ananta-Vijoy" *Yudhisthir*,
And martial *Nakul* on the "Su-ghosh" too
And on "Mani-Push-Pash" *Shahadev* raised
A mighty blast; and next for valour praised
Kashi's king, and next sexless *Shikhandin*
Blew on their conches a tumultuous din.
Then blew *Dhrista-Dyumna and Virat* too,
And *Saty-ki*, (the chief none could subdue);
And *Drupad*, and Draupadi's each brave son
And *Son-vadra* blew on their shells well-known."
Thus each with his own conch the tumult swelled,
And lo! the *kourav* hosts with panic paled!
"Now *Madhov* led forth *Arjun's* car of war
Before the *Kourav* hosts midst arrowy shower.

A team of milk-white steeds the
chariot bore,
Foaming at mouth and steaming hot
all o'er.
"Midway between these rival armies'
train
Halt thou my car, (he cried), immortal
swain!
Hold back thy steeds while I my
foes survey
And find one not unworthy my steel
to slay."
"At once he stopped the car-th'
Immortal Swain,
Midway between those rival armies
train,
And, face to face with *Bhishma* and
with *Dron*
"Behold thy foes, (he said), O *Prithu's*
Son!"
"There he viewed, each at his appointed
post,
Kinsmen 'gainst Kinsmen ranged in
either host
Lo! Sires and son and brothers, all
there lay,
And comrades and friends eager for
the fray;
And, moved to pity, he threw down
his bow,
And thus be-spake in accents sad and
slow:
"What joy, *Janardan*, comes of kins-
men slain?
What though, O Keshav, all the worlds
we gain?
A double curse would settle on my
head—
The living reft of joy, of rites the dead!
With clans wiped out rites immemo-
drial die.
The *Manes*, ah! in vain for soul-cakes
sigh.
And, reft of rites, fall from their god-
like state.
(The sexes thus uneven), the women
mate
With castes inferior, and mixed
offspring breed.
Such make no offerings, sprung from
stranger-seed.
Lo! all a-tremble are my limbs with
fear!
What dryness too doth in my mouth
appear
What heart-faint now un-nerves me
to defend!
Lo! with what horror stands my hair
on end!
I would not, O *Janardan*, wage this war
Of extripation and spill kinsmen's gore.
'Twere better I be by *Duryodhan* slain,
Un-armed and un-resisting, on this
plain."
"Thus spake *Dhanan-joy* to the
Immortal Swain,
Mid-way between the rival armies
train,
And, much depressed, sunk on the
Chariot-seat,
And his stout heart, un-nerved, all
trembling beat!"

N. MUKERJEE

ALAUDDIN KHILJI—THE BENEVOLENT DESPOT.

Among the Pathan rulers of India the figure of Alauddin Khilji stands out most prominently. He was one of the greatest of the Pathan rulers of the country, who in spite of many faults was a well-meaning ruler and had the wellbeing of his people at heart. It must be remembered that he was no constitutional monarch whose activities are so wisely limited by parliamentary laws and enactments in civilised countries modern times. The present-day monarch has little or no initiative in the government of his country. But such were nor the limitations imposed upon a ruler of Alauddin's age. A monarch of those days was the veritable father of the people. In him was vested all power, all initiative either for the weal or woe of his subjects. The king's will was supreme. None dared disobey him. But in spite of the unlimited authority which the kings enjoyed in those far-off times they had often to consult their supporters, the leaders of religious communities and be guided by them. In the case of Pathan rulers who were mostly adventurers from all sorts and conditions of life, who were men of ability, daring and intelligence, who could play for big stakes deftly and well, these limitations on their autocratic will and power was even greater; they had to please the Omrahs and the nobles who helped them to ascend the throne and confer favours on them; because these were the men, who occasionally raised the standard of revolt and brought about great unrest in a country, where the major part of the population was naturally opposed to the ruling class Alauddin himself was troubled with many such uprisings among his nobles and subjects which were mainly directed towards dethroning him. Such attempts naturally brought various calamities in their train.

In the present paper we do not propose to record the conquests, the wars, the pomp and grandeur of Alauddin's court. We propose however to study the ways and methods of his government. Enough records have been preserved for us by Muhamadan historians to enable us to get an insight into these things. His drink legislation (if we may so term it) his municipal government, his fiscal policy are extremely interesting though they have all been thrown into the shade by the achievements of another ruler far greater than he, far more sagacious and noble than he, viz Akbar the great.

We have already referred to uprisings, among his nobles and to the serious attempts that were made to dethrone him. Sorely troubled by these, Alauddin sent for his trusted nobles and asked them to enlighten him as to the causes, which were mainly responsible for this undesirable state of things. After

careful deliberation the Omrahs seem to have discovered four causes underlying there troubles. The Tabakat Akbari records them and they are as follows :—that such disturbances may be either (1) due to the ignorance of the king as to the actual condition of the people, or (2) the inordinate use of spirituous liquor by the people which excited their passions, and led them to participate in there unseemly disturbances, or (3) to the fact that there was a good deal of unity, among the Amirs and Omrahs, which enabled them to act in concert ; or. (4) to the possession of money by persons having base minds, which led them to hatch wicked projects and schemes. Alauddin accepted the conclusions arrived at by his Omrahs, and at once proceeded to act upon their advice with a view to remedy the rotten state of affairs, which existed at that time. His very first step in this direction, was to confiscate all villages, which were held as a pious endownments or as a service grant or as an estate. Any pretext was considered valid in bringing this about. This reminds us of a similar incident in English history. Thomas Cromwell, minister of Henry VIII adopted such a policy when he confiscated the properties belonging to the monasteries. The effect of this confiscation was, that people were reduced to great straits and all talk of rebellion in the kingdom disappeared in no time. He next proceeded to break down the power of the nobles. To effect this he set spies upon them, which prevented their free intercourse with each other. This spy system was introduced with so much rigour that the nobles were placed in an unenviable position. In time, the intercourse between the nobles became so rare, that, many of them could not recognise each other.

The method which Alauddin adopted for suppressing drunkenness among his people is interesting to a degree. The first thing that he did was to throw out all wines from the Royal cellars in a prominent place in the city and have it spilt on the ground. After doing so he issued proclamations, orders and decrees throghout the whole kingdom, prohibiting the use of wines. But he did not rest here. In Delhi he seems to have had recourse to drastic methods of curing drunkenness. He dug a well, wherein, those, who acted against the royal orders, were kept confined, which had a very deleterious effect upon their healths. The terror, which these drastic methods created in the mind of the people, soon led them to abjure the evil habit of drinking.

After having successfully suppressed disaffection among the people and nobles he turned his attention towards the amelioration of the condition of his subjects. He discovered, that, headmen of different communities tyrannised a good deal over them. This was due to the fact, that, they appropriated a good deal of the agricultural produce of the land for their own use and were

therefore in affluent circumstances. This they claimed as the perquisite of the office they held. They also claimed a preferential treatment in the matter of the payment of taxes. Alauddin changed this. He ordered that one-half of the produce by actual measurement should be taken by the state without any distinction being made between the rich and the poor. Many other perquisites claimed by the headman such as the grazing charges were also ordered to be paid in to the royal treasury. The effect of this was far-reaching as it reduced the power of these headmen a good deal and at the same time increased public revenue.

Alauddin seems to have possessed certain modern ideas regarding the separate function of the church and state. We read in the Tabakat Akbari that, Alauddin repeatedly said, that, orders and rules of government depended solely on the judgment of the sovereign, and the law of the Prophet had no concern with them. The trial of disputes, the decision of suits and the methods of worship were the province of Kazis and learned men. In this matter certainly, Alauddin possessed very startlingly revolutionary ideas especially for a Muhammadan. In Turkey up to the present time religion and government are intimately mixed up together.

We now turn towards the discussion of his municipal administration. He introduced certain rules for cheapening the necessaries of life. Though these rules were at first introduced mainly for the convenience of his army, yet the facilities which were so created were enjoyed by every subject of his. Some of the provisions which he made for regulating the market are as follows :—

(i) The market people were not allowed to have any power of fixing the price of grains. The prices were fixed by the Sultan himself.

(ii) Inspectors of grain markets were appointed to see whether the orders of the Sultan were carried out or not.

(iii) The establishment of a state granary, wherein was stored the share produce of crown lands. This was sold at a fixed rate in the event of the deficiency of grains in the market.

(iv) Reports of the market prices were daily submitted to the Sultan.

(v) When drought prevailed people were only allowed to buy what was proportionate to the number of persons in the family.

Infraction of any of the market rules was severely punished.

Similar rules were also made for the sale of cloth, horses and even the ordinary necessaries of life. A strict eye was kept on the shop-keepers so that they might not use short weights. Provisions were also made to prevent the sale of goods elsewhere at prices higher than those prevailing in the Imperial market.

This short study of Alauddin's rule, government and policy gives an insight into the workings of his mind. He

certainly appears to us to have been a well meaning despot, who sincerely wished to rule his people well, and make them wealthy and prosperous.

Bamacharan Chatterji, M. A.

WEATHER FOLKLORE.

By Lionel E. Adams, B. A.

As the life of people becomes more civilised and artificially protected against wind and wet, cold and heat, the less is there personal need of weather forecast; and we often find city dwellers indifferent to, if not absolutely unconscious of climatic conditions. But to the countryman, whose personal comfort and business success depend upon the weather, the observation of weather phenomena is of daily importance. Putting aside the systematised lore of the priests of ancient peoples, it is to the cultivators of the land and to the toilers of the sea that we owe the accumulation of weather folklore that should be collected in book form before it is forgotten.

Perhaps the most familiar weather forecasts relate to sunset and sunrise. Virgil, in his first book of the "Georgics," has collected some interesting folklore relating to the subject. He says: "The Sun, too, will give some tokens both when he rises and when he sinks beneath the ocean-floor. Surest the tokens which attend him, whether he brings them with returning morn or shows them to the peeping stars! When his birthhour sees him sicklied over with blemishes, cloudcast, and half his orb withdrawn, suspect rain, for the south wind, foe of tree and corn and herd, is driving from the deep. If either at dawn the rays break scattered through dense clouds, or Aurora rises pale from Tithonus' couch of saffron—alas! the vine leaf will but feebly champion in ripened clusters, so thick on the roof will dance the rattling shafts of hail. And this it will serve thee yet more to remember, when, with the traversed sky behind him, he is in act to depart; for often we may see shifting hues flit across his countenance. If these are dark, rain is heralded; if red, the storm-wind; but let specks begin to mingle with his ruddy flames, and shortly thou wilt see all nature turmoiled with wind and cloud alike... But if his orb is bright alike when he brings back the day, and when he veils the day he brought, then the storm-cloud's menace is vain, and thou wilt see the woods swaying before the bright north wind" *

We find the same forecasts, more concisely put, in Matthew xvi, 2 and 3: "When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And, in the morning, It will be foul weather

* Jackson's translation.

to-day : for the sky is red and lowering." To the same effect are our old country rhymes :

"An evening red and a morning grey
Are sure sign of a fine day
An evening grey, and a morning red,
Sends the shepherd wet to bed."
"A rainbow in the morning,
Is the shepherd's warning ;
A rainbow at night
Is the shepherd's delight."

Finally we find the following up-to-date pronouncement in "Whitaker's Almanack," based on the observations af Admiral Fitzroy: "A rosy sky at sunset, whether clouded or clear, a grey sky in the morning, a low dawn (that is, when the first signs of the dawn appear on the horizon,) all indicate fine weather. A red sky in the morning indicates bad weather, or much wind ; and a high dawn (or when the first signs of the dawn are seen above a bank of clouds) presages wind."

It will be noticed that in all the foregoing forecasts there is exceedingly little in the way of discrimination among the various sorts of sunsets ; that is to say, the different phenomena accompanying a red sunset or sunrise. We all know, for instance, that in an English summer, when the Sun sets as a red ball in a clear sky, the following day will be fine ; but when surrounded by lurid, crimson-tinted clouds rain is most likely to follow. Again, when the Sun appears as a crimson disc through the mist of a winter morning a fine day is assured ; but a gorgeous red sunrise in a clear sky is a very sure sign of a bad day to follow, It is not a little curious that in Palestine a red sunset should have been considered in any way ominous, as in that region the sunsets are nearly always red, due to the haze of desert dust, and rain rare ; though it must be remembered that in ancient times much land that is now desert was under cultivation, and the climate not so arid as at present day.

A "mackerel sky," which is caused by two cross-currents of air rolling the clouds into "pills," is supposed to herald rain, and, after a spell of fine weather, does so correctly, one of the two currents being the changing wind that is about to upset the present condition. But exactly for the same reason after a spell of wet weather such a sky is a hopeful sign of a change for the better. I have heard the following rhyme at sea :

"Mackerel backs and mares' tails
Make lofty ships carry low sails."

"Mares' tails," of course, indicate wind.

The poet Virgil goes on to describe the action of various animals, most of which are recognised to-day by country people as indicative of an impending change in weather conditions. Before a gale, he says, "the wave can scarce refrain from assailing the crooked keel when the fleet cormorant comes flying back from mid-ocean and its shriek nears the shore ; when the sea-coot (gull) is sporting on dry land, and the heron quits her familiar marsh to soar above the clouds of heaven."

Regarding impending rain he writes: "Never man was harmed by rain but he was forewarned,......Often light chaff and fallen leaves will flit about thee, and feathers dance on the water-top. ......The heifer looks up to heaven, sniffing the breeze with wide-opened nostrils; or the twittering swallow flits round her mere; the frog croaks his immemorial plaint in the mud. Often the ant threads her narrow path and brings out her eggs from their inmost cells; an army of rooks will quit its pasturage in long array with the beating of a cloud of wings. Then the villainous raven stalks in solitary state along the dry strand, and full-throatedly invokes the rain. Not even the girls, as they card the midnight wool, are unware of the rain whenever they see the oil flicker in the burning lamp and a mushroom growth gather on the wick." Concerning the passing of the rain and the approach of fine weather he continues: "The uncleanly swine forgets to toss the dishevelled straw with his muzzle." I have heard country people say that pigs toss about the straw when rain is at hand, but I have no notion if this be the case. Finally, Virgil describes the joyfnl cawing of the rooks foretelling the clearing of the clouds.

Most of these saws are familiar to country dwellers in England, and were common to various peoples two thousand years ago, and much might be written about the explanation of some of them. A few more that are not so generally known may be of interest.

Perhaps field labourers and fishermen know better than the rest of mankind how, before thunder or rain, flies become intensely troublesome and midges bite viciously. This activity among insects is doubtless immediately perceived by the trout, which are well known to bite freely during a thunder-shower.

Not long ago our gardener remarked that he had heard the yaffles cry and prophesied rain. The next day it rained steadily. Now the Green Woodpecker is commonly known to country people as the "rain-bird," but whether it does utter its laugh more before rain than at other times I cannot say. I have often noted it pretty continuously when no rain followed. Near Aylesbury, on April 12th 1911, I heard the laugh insistently on the change of wind from north-east to west; the rain, however, did not come for several days.

I have several times noticed that rabbits will feed in the open field during the day when a rainy night follows. An observant keeper always explained that the rabbits knew that the night would be wet, and they therefore took their meal before the rain came.

In the South of England farmers and others have predicted rain, always accurately, by the smoke from chimneys lying low; and at sea during stormy weather I have often noticed the smoke from the funnel drifting over the surface of the sea.

On a certain sunny afternoon in July, 1909, a farmer called my attention to the way in which the leaves of some oaks were turned up, showing their undersides and foretelling rain. A few minutes later I came across the keeper, who remarked the same fact. Asked if he could explain it, he said the wind blew them up, a current of air being drawn up around the tree, the reason of which he did not understand; which was all very obvious, but hardly informing. Later in the afternoon I noticed the white undersides of poplar were conspicuous, and in the evening rain came. The distinctness of detail on the hills around had indicated rain during the day.

One fine afternoon last August I cycled a few miles from home without suspecting a change. However, a thunderstorm came on, and I sought shelter in an outhouse, where I was joined by a roadmender, who was putting on a heavy overcoat. I asked how he came to have a coat on such a warm day, and he told me that he had anticipated the storm from the fact of the leaves falling from the trees during the morning, which had been calm and still, and that during his dinner-hour he had gone home to fetch his coat.

One of the quaintest, and perhaps most reliable, auguries that I have come across was that of an ancient mariner with whom I used to foregather on Dover Pier. He told me that in the cellar of his house was an iron water-pipe which he consulted daily by feel: "If the pipe sweated it would rain for sure." He knew nothing about condensation, but he had discovered the sequence of events.

Most people must have come upon little-known weather saws: these are always worth noting and testing and trying to account for, but this takes time. It is remarkable that Gilbert White has nothing to say on this subject.

INDIAN STUDENT SKETCHES.

"POETIC JUSTICE"

"Sir, I have been attacked and insulted, and...and water has been poured on me", said Jyote Ram as he rushed into the Warden's study. He was a sensitive young first year student, and now his eyes were dilated and he was panting with excitement.

"Please sit down" said the Warden gently, pointing to chair.

"Sir," he began again, "I was doing nothing. I was lying down on my bed. Muttra Prasad came in, and told me, 'Go out of my way, bacchha'. But I was not in his way, and he pulled me off the bed, and poured water on me, and gave me hard words."

Where is your room?" asked the Warden.

"I am in the hall, sir" he replied, "along with three more first year students."

"Where is Muttra Prasad's room?" asked the Warden.

"He is in a single-seated room near the hall, Sir," he said.

Did your bed prevent Muttra Prasad from getting into his room?" said the Warden.

"No Sir," said he, there was plenty space, and he also attacks and gives hard words to other students."

"Never mind about the other students," said the Warden. "Did you annoy Muttra Prasad in any way?"

"No Sir, never" said he, "I fear him and always try not to meet him."

"Very well", said the Warden, "would you please ask the monitor to come to my bungalow?"

And Jyoti Ram went out still excited and gave the message to the monitor.

When the monitor came along he corroborated Jyote Ram's statement, and also said that Muttra Prasad was habituated to bullying the younger students in the boarding-house. Once when the monitor remonstrated with him, Muttra Prasad turned on him and declared that he was longer in the boarding-house than the monitor, which was true, and that he did not care about any one, not even the Warden. The Warden after all was human and immediately sent a written order to Muttra Prasad to leave the house before six o'clock that evening. As soon as he received the order he came to the Warden's bungalow ready to prove that he was completely innocent of any charge that his enemies might have brought against him, and that his expulsion was unjust in the extreme. The Warden however did not give him a chance of adopting this line of defence.

"Did you receive my order?" asked the Warden; "Yes Sir" he replied, "and I am completely confused. What have I done?"

The Warden simply took out a copy of the boarding-house regulations and

pointed to Rule 7 which stated that any inmate of the boarding-house can be immediately removed at the discretion of the Warden.

"But Sir" said Muttra Prasad, "I have done nothing. Besides my life will be ruined if I am expelled. I have been six years in the boarding-house and the disgrace will be great. Give me one chance more."

The Warden shook his head saying.

"I won't change my order. Good afternoon."

Muttra Prasad didn't rise, and there was a long pause, a pause of minutes, when the Warden again said that he wouldn't change the order.

"You can expel me from the the boarding-house," said Muttra Prasad, "but you are our Warden and you can't send us away from your house."

This was distinctly impertinent and the Warden had some difficulty in restraining his temper. At last he said very quietly :—

"In consideration of your long residence in the boarding-house, I'll give you the option of being removed either by my bearer or by my sweeper."

Muttra Prasad went back to pack up and whether by accident or design all the inmates of the boarding-house were present on the front verandah when the ekka came along to take away himself and his effects. The Crowd then loudly remarking, evidently for his benefit, about the great disgrace of being expelled, and how his life was surely ruined. This was too much for him, so he shook his fist at them and swore he'd have revenge. The only reply was a series of extra-low salams as the ekka started, then a chorus of laughter as it began to draw away, and finally a rousing cheer as it turned out of the Gate of the compound.

After this, affairs went on smoothly in the Boarding-house No. 6, under the monitorship of Raghuvansh Lal. He was a Punjabi in his fourth year, and had a good deal of influence. All the minor difficulties that keep constantly cropping up in a boarding-house were always settled by him satisfactorily. The Warden was only troubled once throughout the year and that was by mistake. Neypal Singh lodged a complaint that Morori Lal had beaten him in the tennis-court and pointing to a tiny trickle of blood on his leg said :—

"Sir, I am seriously wounded."

"Why did Morori Lal wound you?" asked the Warden.

"A ball was hit far away, and I refused to follow it, and then he attacked me."

"But surely," said the Warden, "you must have said something to him."

"I only said that he wasn't a gentleman," he replied.

And did you by any chance hit Morori Lal" asked the Warden.

"Sir," said he, "Morori Lal pushed me and I fell against him."

"I'm afraid," said the Warden "I'll have to hear the other side of the story before coming to any decision."

Next day Raghuvansh Lal, the monitor, brought along Nepal Sing and Morori Lal to the Warden's bungalow, and said they were both sorry.

"'Twas my mistake, sir," they both said almost in one breath.

"I'm afraid," said the Warden smiling "that the mistake was really mine for being in my bungalow when Nepal Singh came along with his complaint."

Then they all laughed and went away with light hearts.

At the present time the students were much too busy preparing for examinations to have any time for quarrels. Unfortunately the be-all and end-all of a college student's existence is passing of examinations. Weeks before the day of examination they begin to get excited, and on the first morning they are almost next-door to nervous breakdown. This was especially the case with Jyoti Ram, and his state of mind wasn't a bit improved when he was accosted half way to the Hall by a burly servant demanding the sum of Rs. 5/- which he declared was due to his master Muttra Prasad; Joyti Ram denied the debt, but the servant caught hold of him with the intention of bringing him to the police station, until he was fortunately rescued by some of his fellow students.

When the monitor heard of this in the evening, he saw clearly enough the intention of Muttra Prasad—the desire to revenge himself on Jyoti Ram by preventing him from putting in an appearance at his examination. He enticed the servant to the boarding-house by saying that Jyoti Ram was now willing to pay the Rs. 5/-, and found out by a more or less forcible means of persuasion that Muttra Prasad had promised him two rupees if he succeeded in recovering the debt. Also Muttra Prasad suggested the surest way to get the money was to meet Jyoti Ram on his way to the examination and bring him off to the police station if he refused to pay. Then he enticed Muttra Prasad himself to the boarding-house by saying that he had just heard two or three important questions which were going to be set in their next examination.

When Muttra Prasad arrived he was supplied with questions—not examination questions,—but questions nevertheless which he was forced to answer. The method of forcing was the same as that employed against his servant—a combination of cold water and hockey-stick.

Then the monitor—who by the way was also a law student delivered judgment.

(1) Whereas Muttra Prasad filed a wrongful claim for Rs. 5, he was sentenced to pay the sum of Rs. 5 to the court.

(2) Whereas Muttra Prasad promised Rs. 2 to his servant, the said Rs. 2 was to be handed over to his servant.

(3) The said servant in consideration of his ungentlemanly behaviour to pay a fine of Rs. 2.

(4) The total amount Rs. 7 to be spent in sweetmeats as a small compensation for the trouble and annoyance caused to the inmates of the boarding-house.

5. Muttra Prasad to hand in a confession to the Warden, who at the suggestion of the Court would consider the advisability of allowing him to sit for his examination.

The Warden did seriously consider the advisability of allowing Muttra Prasad to sit for his examination and kept him in suspense for some days. Eventually he received permission, but consistent to the last, ended by getting plucked for copying.

GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

(গ) এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। শ্রুতিঃ।

"Whomsoever He wants to take over to worlds higher and better than these. He causes him to do good works, on the contrary, whomsoever He wants to degrade to lower and darker worlds He causes him to do bad works."—Sruti*

We have shown before from texts cited from the Vedanta-Darsan and the Srutis that the Vedantists hold that the Jiva is not only the enjoyer of the cosmic modifications, but is also an active participator in bringing about those modifications which constitute the heterogeneity of the universe, but that being a dependant being its activity is in every case superdirected by the Supreme Lord, the source of all powers, the almighty God. In addition to those, the following may also be cited as corroborotive of the dependence of Jiva on the omnipotent Power :—

(১) অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা অন্তঃপ্রবিষ্টং কর্ত্তারমেতম্ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরোহয়মাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরোহযময়তি স অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ। শ্রুতিঃ।

"The Universal Soul which permeates everything is also its controller. It is really the impermeative, immortal Essence which directs every soul from within it, although its existence there is not even suspected by the latter, for the individual soul is as it were the body of the Universal Soul, which directs it from within as the individual soul directs the corporate body."—Sruti.

(২) তদ্ যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়মুৎসর্জ্জদ্ যাতি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি। শ্রুতিঃ॥

*In the Brahma-vaivarta Puran, Lord Krishna (*i. e.* the supreme Lord) is said to be both karma and the cause of karma :—

কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সোহপি তদ্ধেতুরূপশ্চ কর্ম্ম তেন ভবেৎ সতি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

This is supported by the Sruti-text :—গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা। কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা। শ্রুতিঃ।

"Just as a heavily laden cart overridden by the carter proceeds over the road making various noises and sounds, so at the time of death the individual soul with its burden of accumulated deeds, memory and heredity * and overridden by the supreme soul takes its flight to the other worlds making sounds like hikka, hikka etc.—Sruti.

(৩) তথাপি স্বক্ষরূপত্বান্নজীবাৎ পরমোহহরিঃ।
ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোঽপি সন্॥
মহোপনিষদ্॥

'On account of its minute forms the Jiva although really distinct from the supreme soul which is also its director, is ever being identified with It by the ignorant'—Mahopanishad.

The cosmic modifications brought about by the Jiva superdirected by the Supreme Lord are also the causes of its enjoyment; for as the Jiva acts upon cosmic matter, so the latter reacts upon it in the form of pleasure and pain, hence matter is said to be enjoyable and Jiva, the enjoyer. The following texts are cited in support of the contention :—

(ক) তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকং। শ্রুতিঃ॥

"What is called inert matter is really possessed of the quality of infatuating the enjoyer so as to make him forget his real self"—Sruti.

(খ) প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। গীতা॥

"Being infatuated by the attributes of Primordial cosmic matter, people are engaged in the performance of works for the gratification of desires and senses"—Gita.

The Jivatma or individual soul can subdivide itself into an infinite number of forms, each of which is a replica of the other :—

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ॥ শ্রুতিঃ।

"The Jivatma can be one, three, five, seven, nine, again eleven, eleven hundred and twenty-thousand."—Sruti.

Many of these characteristics of the Jiva are to be found beautifully summarised in the following couplets quoted from 'Vedanta-koustubha or Sreenivashacharjya :—

জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনং
শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যং।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥
অনাদিমায়া পরিযুক্তরূপং।
ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎপ্রসাদাৎ॥
বেদান্ত-কৌস্তভঃ॥

"Jiva is knowledge as well as the knower † is subordinate to or dependent upon Hari (*i. e.* the Supreme Lord),

* (a) তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ।
শ্রুতিঃ।
(b) পূর্ব্বজন্মনি যা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মনি যদ্ধনং।
পূর্ব্বজন্মনি যা নারী অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥ স্মৃতিঃ।

† The fact that a thing can at the same time be knowledge and the knower is according to Baladeva Vidyabhusan a matter of faith only based uppon the Sruti-texts, for its cannot be proved otherwise :—জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা

capable of assuming definite corporate forms as well as of relinquishing them, very minute in dimension and different in different bodies, infinite in number and connected with Maya (মায়া) from time immemorial. It can only be known through the grace of almighty God".—Vedanta-Koustubha.

From all these it appears almost certain that the Jiva of the vedantists approaches very closely the micro-organisms of modern science and that the heterogeneity of the universe has resulted from the interaction of such micro-organisms and matter, in which the former are the active modificators and the latter, the passive modifiability. The identity of vedantic Jiva with modern micro-organism is further confirmed by the following Sutra quoted from chap. II. sec *i. e.* of the vedanta-Darsan.

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি। বেদান্ত দর্শনম্ ॥

The Sankhya controversialist says that in the previous examples although the change of position and the movement of chariots, carts etc. are really due to their connection with living things such as the charioteer, the carter and the animals, the same cannot be said of the change of milk into curds or of rain-water into saccharine or acid juices in the fruits of trees; hence as these changes do occur spontaneously without the agency of any living organism, so Primal Cosmic matter of itself changes into various forms for the enjoyment of the Purusha or individual soul. To this the vedanta answers that even in such cases the modification is really brought about by some conscious organic life. Baladeva Vidyabhusan in commenting on the above sutra quotes a text from Sruti, that the change is really brought about by the supreme soul. * The assumption is really untenable, for as the supreme soul permeates everything material or non-material or both and from the very beginning, the last possible change of milk etc. would in that case be also the first possible change. The assumption is also antagonistic in spirit to Sutra 5th of the same chapter of the same book † where the Sutrakar

ভোক্তা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি ষট্প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতিবলাদেব তথা স্বীকৃতং ন তু যুক্তিবলাৎ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি হি নঃ স্থিতিঃ। জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽয়মিতি স্মৃতেশ্চ। বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে ॥

* ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে যথা চাম্বুবারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদি বিচিত্ররসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তত্তদ্ভুবনরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ন তু স্বতঃ রথসূতাদি দৃষ্টান্তেন। তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধং। ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে। The sum and substance of the 'antarjyami Brahman' is that the Universal Soul permeates and directs everything, material and non-material (vide Vrihadaranyakopanishad, chapter III. Brah. vii. sec. 3—23).

† ননু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাত্মাকারেণেতি চেত্তত্রাহ। "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।" অবধৃতৌ চ শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ অন্যত্রাভাবাৎ।. বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে তর্হি চত্বরাদি-

says that if the contention that Prakriti or primordial matter spontaneously changes into Mahat, Ahankara etc. simply in the presence of the purusha or individual soul, just as grass eaten by the cow spontaneously changes into milk and flows into its udder in the presence of the calf, were correct, then the same change might have taken place in the pasture where the calf grazes. But as no such change takes place in the pasture, is it not reasonable to infer that the change of grass into milk is not spontaneous but is brought about through the agency of the conscious organic being called cow?

As the vedanta-Darsan is founded on sruti-texts, it cannot deny the all-pervading character of the universal soul or paramatma ‡ from the very beginning, whence it follows that as the universal soul permeates everything whether matter or soul or both. It cannot be said to be the immediate cause of the modification of milk into curd, for in that case as said before there cannot be any sequence of changes, the last and the first remaining identical from the very beginning to the end. Therefore the inference is natural that the change of milk into curd or of rain-water into acid or saccharine juices as well as of into milk is brought about through the direct agency of some conscious organisms called Jivas, different from the universal soul or paramatma.

Besides, we know from the discoveries of modern science that milk is curdled through the agency of a kind of micro-organism called lactic microbe, which as it responds to stimuli, assimilates outside materials and subdivides, can be none other than organic life, although opinions differ as to whether this and such other microbes are to be classified as animals or vegetables. * Professor Mitchinkoff has obtained a sugar-producing

পতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প তথেতি। বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে। It is lent just to say that Baladeva here acknowledges the fact that the change of grass into milk is accomplished through connection with some special organic being *i. e.*, the cow) and that such connection arises from and depends upon the will of the almight God.

‡ (a) তদ্‌যথা রথনাভৌ চ—রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ। শ্রুতিঃ।

(b) যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥
শ্রুতিঃ।

(c) সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।
শ্রুতিঃ।

* Microbe is defined in the 'Century Dictionary' recently edited by the late Professor W. D. Whitney PH. D., L. L. D. as follows. A minute living being not distinguished primarily, as to its animal or vegetable nature. The term is frequently applied to various microscopic plants or their spores and has further come to be almost synonymous with bacterium. Taken in this latter sense, microbes are regarded as essentially polymorphous organisms adapting themselves to varied conditions of existence, which in turn influence the form taken by them. For this reason their classification has often varied, since their distinction into genera and

microbe from the intestines of the dog, which if cultured in the human body, is in the opinion of the said Professor able to arrest human decay and old age brought on by another kind of microbes. Recently a thin, grey threadlike worm about a third of an inch in length and carrying upon its head two little glands filled with a corrosive secretion, was found to eject this secretion every few minutes on to the iron-railing of a particular railway line in Italy. The ejection had the property of rendering the iron soft and spongy, when the worm at once proceeded to devour it. A rail taken up and broken, was found to be hollow. The disease which attacks old coins is surmised to be due to the presence of micro-organisms. Quite recently Professors S. N. Vinogradskif and H. Morlisch announced in Berlin their discovery of a remarkable species of bacteria, which grows only in solutions that contain carbonate of iron. Another striking faculty of these germs is that in the total absence of other sources of carbon they are cap-

---

species does not rest on precise data. They are instrumental in the production of fermentation, decay and many of the infectious diseases affecting man and the lower animals—Century Dictionary.

Two branches of science have grown up lately, Bacteriology and Protozoology. Speaking in a rough way, it may be said that the first has to do with lowly members of the vegetable world and the second with corresponding members of the animal kingdom. Both sciences have much to do with diseases, but it is only of late years that "Protozoology" has been recognised. Such afflictions as tuberculosis are due to bacteria. Sleeping sickness on the other hand, is caused by protozoa. The two kinds of organisms are not necessarily antagonistic, but there are certain known cases in which the protozoon feeds on the bacterium and there are other cases in which the most elementary of animal cells can be consumed by the simplest of vegetable organisms. The following couplets by J. Lu Hagadorn very facetiously describe some well-known groups of microbes with their characteristic forms.

"A gay Bacillus, to gain him glory
Once gave a ball in a laboratory.
The fete took place on a cover-glass,
Where vulgar germs could not harass.
None but the cultured were invited
(For microbe cliques are well-united),
And tightly closed the ball-room doors,
To all the germs containing spores.
The staphy lococci first arrived—
To stand in groups they all contrived ;
The streptococci took great pains
To seat themselves in graceful chains.
While, somewhat late, and two by two,
The Diplacacci came in view.
The Pneumococci, stern and haughty,
Declared the Gonococci naughty,
And would not care to stay at all
If they were present at the ball.
The ball began, the mirth ran high
With not one thought of danger nigh.
Each germ enjoyed himself that night
With never fear of the Phagocyte.
'Twas getting late, and some were "loaded",
When a jar of formalin exploded,
And drenched the happy dancing mass
Who swarmed the fatal cover-glass.
Not one survived, but perished all
At this bacteriologic ball."—J. Lee Hagadorn.

able of extracting carbon from carbonic acid. The microbes in order to gain one part of carbon produce from iron-carbonate 700 parts of oxide of iron. It is now an established truth of the bacteriological science that atmospherical nitrogen can be fixed in the soil through the agency of microbes. In Russia Dr. Winogradsky had shown that the bacteria turned the nitrogenous refuse in the soil first into ammonia and then into the nitrates that form the most needed of all plant foods.

How minute in dimensions these organisms might be is proved by the discovery of two kinds of microbes called 'spirillum Parvum' and the 'Pseudomonas Indigofera' by Esmarch. They are about 1—10,000 millimetre in diameter or 1—300,000 of an inch. Saidukuf, the eminent botanist is of opinion that yet smaller organisms exist only to be discovered by the 'ultra-microscope' such as the one made and perfected by Sidentopi and Sigmondi.

If the expectations based upon the ultramicroscope prove to be justified, scientists shall probably reach the smallest possible organism; for, according to the calculations of Enera, a microbe 1—600,000 in. in diameter, if such exists, would only contain 1,000 molecules of albumen, while the microbe 1—3,000,000 in. in diameter would only contain ten molecules. Thus the microbe containing one single molecule would only be 100 times smaller than the smallest microbe visible by means of the ordinary microscope; and "it may well be," says the Kol-nische zeitung, 'that the ultramicroscope will penetrate to the very limits of life."

The longevity of some of these organisms so small in dimensions, under circumstances very much adverse to ordinary life, is simply astonishing. For example, the cells of the blue green sea-weed of the hot springs survive in very hot water and are believed to be the last remnant of the very early vegetation of the earth. The normal life-time of the 'infusoria'—the tiny creatures that live in drops of water—is a few hours only; but if they are taken out on a slip of glass and dried, they may be kept in suspended animation for thirty years. Dropped into water at the end of that period, their tissues slowly re-absorb moisture and presently they are swimming about once more cheerful as ever. M. Nestter, the eminent French scientist records an instance of some bacterial spores which have been recovered from some earth attached to fragments of moss that had been put away in a cabinet since 1852. The earth was completely dried and desiccated-conditions most destructive to bacterial life, yet he recovered 89,200 living spores from a gramme of it. Another example of moss which had been wrapped in a paper-envelope since 1824 yielded 19000 bacteria per gramme. The investigations of Drs. Russell and Hutchinson showed that heating the soil by blowing hot steam through it

left the beneficial microbes* unkilled and that immediately after heating they began to increase in an amazing degree. Who knows that there may not be some truth in the commonly rejected story of the salamander? † Scientific researches have also revealed the fact that at absolute zero, the point at which there is no *heat* whatever and which has been experimentally fixed at 273° below zero-centigrade, germ-life is not extinguished. This amazing degree of coldness has been produced by Prof. Kammerling once at his laboratory in the University of Leyden, Holland. Thus insensible alike to heat and cold and absence of moisture, a microbe, although of very small dimension is able to resist those adverse circumstances to which larger animals succumb. ‡ 'But what the germ lacked in size' said Sir Berkeley Moynihan of Leeds, last month, in opening a tuberculosis exhibition in Huddersfield, 'he made up in productive capacity, for if they were to start at noon that day, one organism by next morning which have produced so many children that there would be one for every human being on the face of the globe. Of the 3,000,000,000 tubercle bacilli that would then exist each one was capable of bringing into the world as large a family by the noon of the following day.'

It is also a proved scientific fact that when all bacterial life has been destroyed in or excluded from a given solution or other organic preparation and all further access to it completely shut up (as by hermetic sealing) the solution or preparation remains uniformly unchanged for any length of time. Milk, soup, solution of gelatine etc. may be kept

* Professor F. Lohnis, of Leipzig in an inaugural address at the opening of the new agricultural section of the British Association said:— 'If only, the agriculturist knew every different kind of bacterium in the soil and could control it as he controls the farm animals or the kinds of crop, he would gain a new power beside which even the introduction of artificial manures would seem small." The Professor mentioned several of the trends of modern research, especially in the directions of losses of nitrogen and the effects of decomposing cellulose. Drs. Russell and Hutchinson are of opinion that there are certain bodies in all soils of a protozoic nature which are more readily killed by heat than the bacteria themselves. They therefore formulated the hypothesis that soil-sickness is due to the protozoa killing down the fertilising bacteria of the soil.

† A kind of lizard or other reptile formerly supposed to live in or be able to endure fire. In Pliny's Natural History X. 67., salamander is described as a sort of lizard, which seeks the hottest fire to breed in but quenches it with the extreme frigidity of its body. In the same book, Pt XXIX. chap. 4, Pliny tells us he tried the experiment once, but the creature was soon burnt to a powder. In the Middle Ages of Europe, salamander was regarded as a being of human form living in fire, forming one of the four classes of nature-spirits which corresponds to the element fire, the others called *sylphs*, *undines* and *gnomes*, being the elemental spirits of air, water and earth respectively.

‡ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ গীতা।

long in a fresh state if kept in air-tight vessel from and in which all bacterial life has been expelled and destroyed. Since, by excluding all lactic microbes from fresh milk and cutting off any further access to it, the milk may be prevented from getting curdled for an indefinite period of time, the contention of Baladeva that the change of milk into curd is really due to the presence of the all-pervading Universal Soul, becomes untenable. The fact is that modern commentators in their eagerness to prove that all things seen or unseen are impermeated by one Universal Supreme Lord without a second have overlooked facts of a minor nature smacking of materialistic dualism. Indeed Baladeva Vidyabhusan seems to have confounded the nature and functions of the two souls, viz, the Jivatma or individual soul and Paramatma or Universal Soul. Paramatma or Universal Soul is omnipotent, omniscient and omni-present, while Jivatma is parvi-potent, parvi-scient and parvi-present by nature, incapable of conceiving the vastness of the universe. Then again Paramatma is independent, being omnipotent and omni-present, while Jivatma is dependent on and connected with Paramatma, being parvi-potent, parvi-present and parvi-scient.* In the Srutis, the Paramatma or Universal Soul is described as being the only Regulator of the universe and everything that occurs in it. It is owing to the all-pervading presence of the Universal Soul that everything in the universe is kept in its proper place, unable to overstep the bounds set around it. It is, in short, identical with the Supreme Law or the cosmic order which regulates the even flow of all phenomena and noumena, the natural sequence of all cosmic things whether material or spiritual as expressed in the following texts cited from the Sruti :—

(১) এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভুতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। শ্রুতিঃ।

"This is the Supreme Lord, who rules over all things, governs the universe consisting of moveables and immoveables and supports all things made of elements ; It is the bridge which upholds the differentiation caused by time, place and circumstances and prevents the commingling of the various created worlds."—Sruti.

(২) এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। শ্রুতিঃ।

"O Gargi, it is owing to the regulative power of the Akshara (*i. e.* the everlasting Supreme Lord) that the sun and the moon retained in their respective spheres, regularly discharge their appointed duties."—Sruti.

* (a) অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা। শ্রীভাগবতে। হে ধ্রুব নিত্যস্বরূপস্বভাব ভগবান্ অপরিমিতা অনন্তা ধ্রুবা নিত্যাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি সর্ব্বগতা বিভবো ভবেয়ুস্তর্হি ভবান্ শাস্তা জীবা শাস্যা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ স ন স্যাৎ তেষাং তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতরথা তেষাং অণুত্বে সতি সোঽনিয়মেন কিন্তু নিয়ম এব তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ।

(b) মৎস্থানি সর্ব্বভুতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ গীতা।

(৩) যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি। শ্রুতিঃ। "He who rules everything from within."

—Sruti.

(৪) ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম। শ্রুতিঃ। "The Supreme Lord is both Rita (*i. e.* the Regulator of the material or objective world) and Satya (*i. e.* the Regulator of the subjective or spiritual world)."

—Sruti*

Let no one for an instant think that we are identifying the 'Jiva' of the Rishis is all respects with the micro-organism of modern science. Far be it from our intention. Our only object in bringing the micro-organisms of modern science into prominence is to show that such organisms whether bacterial or protozoic do really exist, although owing to their extremely attenuated dimensions, they are incapable of being detected by our dull senses unless aided by artificial appliances such as the microscope and the magnifying glass, and that some at least of these organisms, so microscopic in dimension, are capable of surviving those adverse circumstances which prove fatal to much larger and stouter organisms. These organisms do probably belong to the 'lowest type of life and may be called Jivas' in the general sense in which the word is applicable to all things of a living nature. * The word 'api' অপি of the Sutra referred to above may be

* Besides the Sruti-texts quoted above there are Smriti-texts as well which do fully support the regulative function of the Universal Soul or Paramatma. For example, Vidyaranya-Swami's Panchadasi is very explicit on the points :—

(a) শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু ভূতেষু॥
বস্তুধর্ম্মা নিয়মেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।
অন্যোন্যধর্ম্মাসাংকর্য্যাদ্বিপ্লবেত জগৎখলু॥ পঞ্চদশী।

(b) ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে।
গীতা।

(c) নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাং॥
বিষ্ণুপুরাণম্।

* In the Smriti works all organic substances are subdivided into four classes, *viz.* oviparous (অণ্ডজ), viviparans (জরায়ুজ), germinating or sprouting (উদ্ভিজ্জ) and those engendered by heat and damp (স্বেদজ) :—

ভূতানাং জন্মসর্ব্বেষাং বিবিধানাং চতুর্ব্বিধম্।
জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জ স্বেদজং চোপলক্ষয়েৎ॥ মহাভারতম্॥

In the Manu-Sanhita the 'swedajas' (স্বেদজা) are said to denote such organic lives as the gnats, mosquitoes, lice, flies and fleas, in fact all germ-lives that originate in damp places aided by heat and warmth :—

স্বেদজং দংশমশকং যুকামক্ষিকমৎকুণং।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥ মনুসংহিতা॥

In Europe, the old notion that life might originate from dead organic matter has long since been dismissed as an idle myth. Wherever maggots and worms appear in decaying meat or foul liquors, the living things are now known to have originated from eggs. Pasteur and Tyndall have laid at rest all doubts upon this point. It is however interesting that in the Chhandogyopanishad, one of the most authoritative of the sruti-texts, the divisions is in three classes, omitting the 'Swedajas' of the smritis :—

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।" শ্রুতিঃ।

The word 'জীবজ' (Jivaja) of the text is explained by the commentators as equivalent in meaning to 'জরায়ুজ' or viviparous. Sutra 22 of

taken as hinting at their low position in the scale of organic life, as if to say that if such minute organisms, provided as they are with very imperfectly developed organs and senses could bring on such modifications as the curdling of the milk, etc., then how much more others provided with more perfectly developed organs of sense and action. Bacteriological science, which is of very recent growth, is at last realising the fact that far back beyond these microscopic organisms that do chiefly exist as parasites of cells, there might be others of a more minute dimension yet undetected, which play quite a different part. For example, Professor E. A. Minchin of the Lister Institute, Chelsea, in opening the debate on the fascinating question of the 'Origin of Life' at a meeting of the British Association for the advancement of Science held at Dundee September 14, 1912, declared "that he believed that back beyond the lowest forms of life which are known to exist only by the disturbances caused by them as parasites of cells, we shall find living things exist which as free organisms, produce in their environments effects which we have not yet perceived." Strictly speaking the 'Jivas' of the Rishis are such free organisms, which although possessing finer material bodies constituted of subtle elements only are much more sentient, much more knowing and intelligent than these parasitical organisms, which in spite of their minute forms do prossess two bodies, the one constituted of the subtle and the other of the gross elements. *

It may now be asked, that if the 'Jiva' of the Rishis be in the strictest sense a

---

Book III Sec I of the Vedanta-Darson distinctly mentions the fourth subdivision 'Swedaja' of the Smriti-works under the term of 'সংশোকজ' as included in the third sub-division of the sruti-text *i. e.* the sprouting class (উদ্ভিজ্জ). The sutra referred to being :—" তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য" which is thus explained by Baladeva :

"উদ্ভিজ্জমিতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপ্যবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ। উভয়োরপি ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বসাম্যাৎ। লোকে ভেদোক্তিস্তু জঙ্গমত্বাস্থাবরত্বভেদমাদায়।" That is to say the class Swedaja (স্বেদজ) is to be considered as included in the division called 'উদ্ভিজ্জ,' because both originate by sprouting and germination, the trees from the earth and the germs from water and damp places. They are differentiated simply because the swedajas are locomotive while the vegetables are stable.

We have shown before that two branches of microbic science have grown up lately under the names of bacteriology and proto-zoology; the former dealing with what appears to be lowly forms of vegetable life and the letter with corresponding members of the animal kingdom. That these form lowly members in the scale of organic life is referred to in the following Sruti-text :—

য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্। শ্রুতিঃ॥

There is a corresponding passage in the Chhandogyopanishad, where instead of any distinct names, all are included under the term 'ক্ষুদ্রাণি' which may either mean of very small dimension or occupying a low position in the scale of life ; the latter seems preferable from the context as well as from Sutras 19, 20, 21 and 22 of Bk. III. sec. I of the Vedanta Darsan.

* স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন কাপি দৃশ্যতে। পঞ্চদশী।

kind of free organism whose material body is constituted of subtle elements only and therefore extremely minute in dimension then in sutra 5 of Book II section ii of the Vedanta Darsan above referred to—where the change of grass into milk is said to be brought about through the instrumentality of the cow—how can the term be appropriately applicable to it and to such large animals as the elephant, the human being, the monkey etc.? To this the answer of the Rishis is plain and explicit, for they say that located in the heart of every such animal is a conscious micro-organism with a body composed of the subtle elements only to which the term 'Jiva' is strictly applicable. That the visible bodies of such animals are constituted of the gross elements, being the temporary habitats of these micro-organisms, whose subtle bodies are much more lasting, much more light than their gross outer coverings. That death is but dissolution of these gross, visible bodies and commences from the time when the 'Jiva' leaves off its temporary habitat. The following texts are cited in proof of the assertion made here :—

(১) হৃদি হ্যেষ আত্মা। শ্রুতিঃ। The Jivatma or individual soul resides in the heart—Sruti.*

(২) হৃদয়স্থ মধ্যে লোহিতং মাংসখণ্ডং যস্মিংস্তদ্দহরং পুণ্ডরীকং কুমুদমিবানেকধা বিকসিতং হৃত্তাকাশে পরে কোশে দিব্যোঽয়মাত্মা স্বপিতি।
সুবালোপনিষদ্।

In the heart of every animal is a piece of flesh of a red color, where is situated the small lotus with its petals blown in all directions like those of the real lotus of the pond, in the inmost sheath of which sleeps the heavenly atma (*i. e.* the individual soul)—Subalopanishad.†

* The word 'atma' is used in various senses in the Sruti and the Smriti-texts, but principally as synonymous with the individual and the universal souls. In commenting on the word 'atma' (আত্মা) occurring in a certain Sruti-text and meaning universal soul, Baladeva remarks: -ইহাত্মশব্দো জ্ঞানানন্দরূপং বিভুবস্তু প্রতিপাদয়তি। অততি প্রকাশতে ইতি অত্যতে গম্যতে বিমুক্তৈরিত্যততি চ ব্যুৎপত্ত্যা তস্য সিদ্ধেঃ। উপনিষচ্ছব্দবদস্যানেকার্থবোধকত্বং। ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে! In the text quoted above from the Prasnopanishad, the word is used in the sense of Jivatma or individual soul as explained by the commentators and as appears from other Sruti-texts of a similar nature (vide Kathopanishad, valli vi, section 17; Swetaswataropanishad, chap. III. sec. 13; Mundakopanishad II. Pt. II. sec. 6. etc.) As the Universal Soul or Paramatma is omnipresent and permeates everything, it cannot have any locality fixed by space for its habitat.

† The substance of the heart called mycardium is almost entirely muscular, the muscle is a peculiar striated one, of a deep-red color; its fibres are *intricately* disposed in two sets, auricular and ventricular, separated by fibrous *rings* which surround the auriculo-ventricular orifices. The cavities or orifices of the heart known as the ventricles and the auricles are probably referred to in the Sruti and the Smriti-works as the Guhas (*i. e.* caves) where the soul resides, as "আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।" শ্রুতিঃ। "স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।" স্মৃতিঃ। Professor Arthur Keith at a

(৩) জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে। শ্রুতিঃ॥ *

"This visible corporate body of ours becomes subject to death or dissolution when bereft of its indeweller, the Jiva, which however does not die with it" —Sruti.

(৪) স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা
অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পুর্ষু পুরিশয়ঃ। শ্রুতিঃ

"He the creator assuming the shape of a bird (*i. e.* endowed with a subtle body) entered all gross bodies in the form of a 'purusha.' The soul is called 'Purusha' from the fact of its lying in all bodies, which are as it were its residential quarters †—Sruti.

---

demonstration connected with the Museum of the Royal College of Surgeons, showed by the aid of specimens that some remarkable advances had lately been made in our knowledge of the structure, functions and diseases of the heart. The most remarkable of these, is a small mass of tissue which has been named the 'peace-maker' of the heart, because it is apparently within this small mass of tissue that the beat of the heart has its origin. Dr. Thomas Lewis, of University College, using the latest methods of electrical investigation found that the site of the new structure was also the point at which the heart-beat appears. It is the chief centre for the activity and regulation of the heart. As regards the word 'হৃদ্যাকাশে' of the text it is proper to say that as the Rishis consider the human body to be a miniature copy of the larger world (পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড of the Sanskrit Literature and the microcosm-macrocosm of the Greek Literature), the heart or rather the hollow space of the heart is said to correspond to the pure etherial space (পরম ব্যোম) of the universe, which is said to contain a record of all events past, present and future (vide Vrihadaranyaka, chap. IV Brah. ii. sec. 3; chap. III. Brah. 8. sec. 4; Chhandogya, chap. VIII. Pt. I. section 3—4.)

* Vidyaranya-Swami, the author of the Panchadasi, remarks that from the Sruti-text cited above it is not to be inferred that the subtle material environment of the Jiva (উপাধি) is immortal, but that it is comparatively more lasting than the gross body, accompanies the soul in its various peregrinations and is only dissolved when the soul merges in the universal Soul or Paramatma:—

জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ।
ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঽর্থঃ কিন্তু লোকান্তরেগতিঃ॥
পঞ্চদশী॥

Also compare,

ততঃ সবেদনঃ সদ্যো জীবঃ প্রাচ্যবতে ক্ষরাৎ।
শরীরং ত্যজতে জন্তুশ্ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু॥ মহাভারতম্।

† The individual and the universal souls are sometime represented in the Sruti-texts as two birds sitting close together in the human body which is likened to a tree (vide Rigveda, Mandal 10, Sukta 114, Rik 4; Mundakopanishad 3-1-1). The metaphor is a popular one as it is to be found in many Smriti works and is probably the origin of the Bengali song which begins "এক শাখীপরে, দুবিহগবরে, সুখে বসবাস করিতরে।"

In the following texts cited from the Mahabharat and the Gita the visible gross body of ours is also called the habitat or residential quarter of the soul. The nine doors mentioned in the first two texts cited, refer to the two ear-holes, two nasal cavities, two eye-openings, one mouth-orifice and the two openings of the organs of generation and evacuation:—

(a) নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্। গীতা।

(b) নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈং সমন্বিতম্।
ব্যাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥
মহাভারতম্।

(c) অস্থি স্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিং পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥
জরাশোক-সমাবিষ্টং রোগায়তন মাতুরং।
রজস্বলমনিত্যং চ ভূতাবাসমিমং ত্যজ॥
মহাভারতম্॥

Mr. Edison, the world-renowned scientist of America in the course of his recent travels in Europe was interviewed by a special correspondent of the "New York World" at Ragatz, Switzerland, when in answer to a question of the interviewer as to how long a man can live, is said to have uttered the following among other things :- "That it is a matter of how long he can successfully combat the thousands of conditions which are warring against him. In the beginning all life was unicellular. Perhaps the original combination of atoms was simple accident, perhaps not—I do'nt know. Anyhow the unicellular forms held undisputed sway for many thousands of years. Then gradually multi-cellular forms of life of which man is the highest product developed and the unicelled forms at once sought their destruction and so through all the ages the fight has gone on and to-day our deadliest enemies are still the minute unicellular bacteria, that do their work unseen and by the majority of the people of the world unheard of. Man is armed to the teeth, so to speak, against these invisible invaders. The corpuscles of the blood run to a torn tissue and build a wall to prevent entrance into the blood of bacteria or foreign matter. The swaying hairs or ciliae of the wind-pipe are constantly lashing back the dust particles which work havoc in the delicate mechanism of the lungs. And so on throughout the body there are ever watchful guards constanly fighting adverse conditions. * Man is made of the same materials as other animals, being merely a more highly deve-

* The eminent scientist probably refers to Professor Mentchinkoff's theory of the 'Phagocytes,' now accepted by practically every biologist of note in the world. The 'phagocytes' are, according to the Professor, certain white globules of the blood or lencocyte, which exercise a very remarkable action in our system. These which may be called the policemen of the human organism are living germs of great voracity endowed with astonishing mobility and preying upon the harmful microbes that find their way in such astonishing numbers into our systems. They would seem to be possessed of some extraordinary 'flare' or sense of smell which immediately attracts them in large numbers to those parts of the organism where the harmful microbes are present. In a normal and healthy condition, the phagocytes readily overcome and absorb their prey, viz. the harmful microbes but when we become unwell and the malignant germs are numerous, the phagocytes show greatly increased activity, but under certain conditions, the harmful microbes become too numerous for the phagocytes who in turn fall a prey to the microbes. It is in fact a case of ceaseless struggle that is going on in our organisms—a struggle in which from the germ point of view the fittest survive.

(b) "The old wives' tale that a dog can heal a sore by licking it seems to be no mere superstition. Experiments have proved that the normal saliva has the power of destroying the vitality of numerous dangerous germs. The mucous secretion in which the microbes are caught, acts on the latter, lessening their resistance, hindering or entirely preventing their development, preventing them also from advancing further and reaching the internal cavities of the body"—New York Herald.

loped animal than the rest. *The finished unit is of course different, but the fundamental cells are the same.* Embryology, in fact shows us that man from his inception to actual birth passes successively through all states of Darwinian evolution. At one time the embryonic child is supplied with gills like a fish; at another time he shows the characteristics of a dog and so on. The fact that he has no animal foe pitted against him is simply that he has combatted former adverse environments. His foe now is the invisible bacteria and also those casualties which in legal parlance are called 'the acts of God."

Sir Oliver Lodge, the eminent electrician, in a very lucid article on the problem of the origin of life in the 'Contemporary Review' of last year, says:—'I myself assumed in the first chapter of 'Man and the universe' in 'Life and Matter' and elsewhere—that a positive result in so-called spontaneous generation will some day be attainable and that a low form of life may come into being under observation, and let us consider what it will really mean when such a thing happens. All that the experimenter will have done will have been to place certain things together —to submit, for instance, chemical compounds to certain influences. If life results, it will be because of the properties of those materials and of the laws of interaction of life and matter, just as truly as when a seed is put into the ground. It will be a step beyond that truly, but it will be a step not of a wholly dissimilar kind. The nature of life will not be more known than before. *Antecedent life can certainly prepare a suitable habitat, but perhaps a life-receiving preparation may be produced in other at present unknown ways.* In an early stage of civilisation it may have been supposed that flame only proceeded from antecedent flame, but the tinder-box and the lucifer-match were invented nevertheless."

Professor H. Wager in the course of his address at the opening of the Dundee-meeting of the British Association, already referred to said:—'The more we see of these minute forms of life, the more impossible it becomes to conceive how life arose. Even when the living amœba—so nearly linked to the inanimate—is analysed there is something elusive which defies the scientist. *Despite the æons of evolution, it is practically impossible to differentiate the cells of men's bodies and the cells of the toadstool.*"

Sir William F. Barrett in an interesting article in the 'Quest' on 'Telepathy and the spiritual significance of Nature' argues "that beneath and beyond all external causes in evolution there is some inscrutable, directive and selective force ever at work within the organism. Evolution in nature tends towards an upward and expanding life* whereas forces which

* This is also a specialty of the Jaina-philosophy, which holds that the 'Jiva' is ever ascending upwards and that it attains final emancipation on reaching the luminiferous ether.

"জীবস্য সদোর্দ্ধগতিরালোকাকাশ স্থিতির্ব্বা মুক্তিঃ।"

জৈনদর্শনং।

are purely mechanical and chemical tend to simpler aggregations, to degradation, not development. A power ever imminent, operative and transcendent appears to be revealing itself in the manifold forms of life. The most reverent scientific thought is surely tending towards Swedenborg's view *that the Duty is in each single thing.*"

GOBINDA CHANDRA MUKHERJEA.

SIR WILLIAM RAMSAY.

The death of Sir William Ramsay on July 23, has deprived the world of one of its greatest men and science of a pioneer whose work has opened up the richest fields of research explored in modern times. For several months the sympathies of scientific men have been with Sir William on his bed of affliction, and rebellious thoughts have surged through the minds of all of us that such an intellectual giant should have been rendered helpless when his dominating influence was most needed in national life. Though he was sixty-three years of age, he was much younger in spirit and vigour; and until last November everyone who knew him supposed that he had a long period of activity still in front of him. He has now passed to his rest, and no words can express the grief felt by his countless friends and admirers at the loss sustained by them and by the nation. His genius was undoubted, and in personal characteristics, as well as in productive work, he represented science at its highest and best. His funeral is taking place at Hazlemere Church, High Wycombe, as we go to press, but the place where his remains should rest is Westminster Abbey, for the honour which he brought to his country would have been justly recognised by this mark of national recognition. The greatness of his work, and the high regard in which it is held, were shown in an article on Sir William Ramsay in our series of "Scientific Worthies" in "Nature" of January 11, 1912. His memory will be cherished with affection by all who came under the influence of his attractive personality, and his contributions of knowledge will constitute a permanent monument to him in the fields of science. The nation itself has been exalted by his achievements, and a memorial of them should be placed where all may see and be uplifted by the spirit of scientific life so fully manifested in him.

THE COMMON ORIGIN OF THE RELIGIONS OF INDIA.

By Sir Guilford Molesworth, K. C. I. E.

(In the Journal of the East India Association).

The principal religions of India are Hinduism, Buddhism and Muhammadanism. A study of these religions is most interesting, and it irresistibly leads to the conclusion that these religions, though now debased and overlaid with various accretions of mediæval growth, have the same common origin, and were, in fact, originally identical ; that their God was our God—the God who "in sundry times and divers places spake in times past to the fathers by the prophets" (Heb. i. 1).

It is therefore a question for serious consideration whether, instead of attempting to demolish these religions, it would not be wiser to endeavour to restore them to their original purity by freeing them from those accretions by which they have been corrupted, and to afford common ground upon which the lovers of true religion might meet ; to do, in fact, that which has given rise to the Buddhist religion and to the Brahmo Samaj and kindred movements.

The question of identity of origin may be narrowed down to two groups :

1. Hinduism and its offshoots, Buddhism, the Sikh religion and the Brahmo and Arya Samaj, the earliest records of which are contained in the Vedas and other sacred writings of the Hindus.

2. Jews, Muhammadans and Christians, the earliest records of which are contained in the Bible.

The Vedas.

The Vedas, or sacred writings of the Hindus, written in Sanscrit, are a collection of hymns, invocations, and prayers, compiled from about 1500 to 500 B. C., and probably some of them are contemporaneous with Abraham. Many of the Veda hymns may sometimes seem childish and commonplace to the European mind, but a strong religious sentiment predominates them. They prove that the Hindu religion was originally monotheistic ; they throw light upon the manner in which the attributes of the One God have led to polytheism, and they furnish wonderful coincidences or parallels with our Scripture which indicate their origin from the same inspiration. The aberrations of mediæval Hinduism are unknown in the Vedas. The principal Vedas are the Rig-Veda, the Yajur-Veda, the Sama-Veda, and the Atharva-Veda. The oldest and most important of these is the Rig-Veda, which the Brahmins believed to have been in existence 3000 B. C., and from it the other Vedas appear to have borrowed largely.

Manu, the great Hindu lawgiver about 500 B.C., recognizing the Veda, says :

"Whatever doctrine rests not on

the Vedas must pass away as recent, false and fruitless."

Even the laws of Manu, if found on any point to be at variance with a single passage of the Veda, must be regarded as at once overruled.

ORIGIN OF POLYTHEISM.

The attributes of the Deity were numerous. As in the Christian religion we have innumerable attributes of the Deity to bring Him down to mortal comprehension, such as the "Almighty," the "Omniscient," the "Omnipresent," the "Light of the World," the "Triune God," the "Word," the Dayspring from on High," "Heaven," "Jehovah," "Jove," the "Elohim," the Creator," the "Preserver," the "Paraclete," the "Morning Star," the "Sun of Righteousness" : so in like manner the poets of the Vedas, with the characteristic imagery of the East, symbolized the Deity. The Vedas speak of "Dyaus" (the bright), "Dyu" (the sky or heaven), hence Zeus, Zeus-pater, Jupiter, Deus, the Deity, Dieu. Also "Varuna" "Deva" (bright), "Ushas" (the dawn or dayspring), "Agni (*ignis*, fire), "Indra" (day), "Prithvi" (the broad), "Mittra" (the sun), etc.

The Vedas show incontestably that all these are interchangeable, representing the one God :

"That which is one the wise call in diverse manners Agni Yama......Wise poets make the beautiful winged manifold, though He is one (Rig-Veda, i. 164)....They call Him Indra, Mittra, Varuna, Agni ; then is He the well-winged heavenly Garutma....He was our born Lord of All, all that is. He established the earth and sky, who is the God to whom we shall offer sacrifice. He who gives life and strength in whose hand is immortality and death, who governs all men and beasts. He whose greatness the snowy mountains, the sea, and the distant rivers, proclaim. He through whom the sky is bright and the earth firm (Rig-Veda, i. 2, 121).

"Agni (fire) held the earth ; He established the heavens by beautiful words (Rig-Veda, i. 67).

"Varuna (heaven) stemmed the wide firmament ; He lifted on high the bright and glorious heaven. He stretched out apart the glorious sky and the earth (Rig-Veda, vii. 86).

"Through want of strength, Thou strong and great God, have I gone wrong. Have mercy, All Mighty (Hymn to Varuna, Rig-Veda, vii. 86).

"Whenever we men, O Varuna, commit an offence before the heavenly host, whenever we break the law through thoughtlessness, punish us not for that offence."

It is not difficult to account for the gradual transition from monotheism to polytheism by the symbolization of the attributes of the Deity, thus endowing them with separate entity. The Greek and Roman mythology affords innumerable examples of this kind. When once the polytheistic element has been introduced, there is no limit

to the number of gods. Every hero becomes a god. Even in our days, a sect has sprung up in India that worships General John Nicholson as "Jahn Nikalsen."

I am not sure that I did not myself run some risk of being deified; for a fakir told me that I was believed to be the brother of Juggernath, in allusion to my connection with railways and the locomotive engine, which is held to be a rival to the Car of Juggernath.

In the Veda is found a belief in a personal immortality:

"Where is the eternal light of the world? Where the sun is placed in that immortal and imperishable world, place me. O Soma...where there ishappiness and delight, where joy and pleasure reside, where the desires of our desire are attained, there make me immortal."

Again, the trinity of the Godhead is clearly shadowed in an address to Agni:

"Giver of life and immortality, one in Thine essence, but to mortals three, displaying their eternal triple form as fire on earth, as lightning in the air, as sun in heaven."

Again, in an address to Vishnu:

"Hail to thee, Mighty Lord, the world's Creator, Supporter, and Destroyer, three in one, one in thine essence, tripartite in action."

The story of the universal flood is described, in which Manu (not the lawgiver) is instructed by Vishnu to build a ship and take on board of it the seven sages, and the seeds of all existing things. And Vishnu (the preserver), in the shape of a fish, directed the course of the ship until it was safely homed on the top of a high mountain.

Again, in the Rig-Veda appears a parallel to the interposition of the Deity in the sacrifice of Isaac by Abraham, in which King Harischandra, the father of the boy, bound his victim, whetted his knife; but before the blow was struck the boy's prayer for delivery was heard, and a message from Varuna granted him a reprieve and remitted all further claim from Harishandra.

PARALLELS FROM THE VEDA AND THE MAHA-BHARAT.

"In the beginning there was neither ought nor nought. There was neither sky nor atmosphere about ... there was neither death nor immortality, there was neither day nor light nor darkness; only the Existent One breathed camly, self-contained; nought else there was, nought else above, beyond."

"In the beginning God created heaven and the earth. And the earth was without form and void; and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved on the face of the waters" (*Gen.* i. 1, 2).

"The mighty Varuna who rules above looks down upon these worlds, his kingdom, as if close at hand. When men can imagine they do ought by stealth, he knows it. No one can stand or walk or softly glide alone, but Varuna detects him and his movement spies. ... Whoever should flee far beyond the sky would not escape the grasp of Varuna the King" (*Atharva-Veda*, iv.).

"Yearning for him Farseeing, my thoughts move onward as kine to their pastures" (*Address to Varuna*).

"Who in this world is able to distinguish the virtuous from the wicked? Both alike the fruitful earth supports, on both alike refreshing breezes blow, and both alike the waters purify."

"Lay up the only treasure. Amass that wealth which thieves cannot abstract nor tyrants seize."

"Heaven's gate is very narrow and minute; it cannot be perceived by foolish men, blinded by the illusions of the world. ... Its massive bolts are pride and passion, avarice and lust."

"Conquer a man who never gives by gifts, subdue a truthful man by truth, vanquish an angry man by gentleness, and overcome the evil man by goodness. Treat no one with disdain, with patience bear reviling language, with an angry man be never angry. Blessings give for cursings. Never meet an angry man with anger, nor return reviling for reviling. Smite not him who smiteth thee."

"Thou knowest my downsitting and mine uprising. Thou understandest my thoughts afar off. ... If I take the wings of the morning," etc. (*Ps*. cxxix.).

"And the hart panteth after the waterbrooks, so panteth my soul after Thee, O God" (*Ps*. xlii.).

"That ye may be children of your Father which is in Heaven: for He maketh the sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust" (*Matt*. v. 45).

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven" (*Matt*. vi. 19).

"Strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it" (*Matt*. vii. 14).

"Whosoever shall strike thee on thy right cheek. turn to him the other also. ... Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you"

(*Matt*. v. 39, 44).

"Pride not thyself on thy religious works ; give to the poor, but talk not of thy gifts ; by pride religious merit melts away, the merit of thy alms by ostentation" (*Maha-Bharat*).

"When thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret ; and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly" (*Matt.* vi. 3, 4)

"Do not to others that which if done to thee would cause thee pain ; this is a sum of duty ... a man obtains a proper rule of action by looking on his neighbour as himself" (*Ibid.*).

"Thou shalt love thy neighbour as thyself" (*Mark.* xii. 31).

"An evil-minded man is quick to see his neighbour's faults, though small as mustard seed ; but when he turns his eyes towards his own, though large as Bilva fruit, he none discerns" (*Ibid.*).

"Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye ; then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye" (*Matt.* vii. 5).

ACCRETIONS OF HINDUISM.

Max-Muller, the great authority on Indian religion, has written :

"Does caste, as we find it in Manu, and at the present day, form a part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with an emphatic "No !" There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of caste ; no authority for the degraded position of the Sudras ; there is no law to prohibit the different classes of the people from living together, from eating and drinking together ; no law to prohibit the marriage of the people belonging to different castes ; no law to brand the offspring of such marriages with indelible stigma....From a European point of view there is, no doubt, even in the Veda, a great deal that is absurd and childish, and from a Christian point of view there is little we can fully approve. There is no trace in the Veda of the atrocities of Siva and Kali, nor of the licentiousness of Krishna, nor of most of the miraculous adventures of Vishnu. We find in it no law to sanction the blasphemous pretensions of a priesthood to divine honours, or the degradation of any human being to a state below the animal. There is no text to countenance laws which allow the marriage of children, and prohibit the marriage of childwidows ; and the unhallowed rite of burning the widow with the corpse of her husband is both against the spirit and letter of the Veda" ("Chips from a German Workshop," Max-Muller, vol. ii., p. 311).

MUHAMMADANISM.

It is scarcely necessary to state that Muhammadanism and the Jewish and

Christian have the same origin; that Allah of the Muhammadans is the God of Abraham, Isaac and Jacob.

Muhammadanism was the outcome of a revolt against the degraded condition into which the Jewish and Oriental Christian religions had fallen. It was an endeavour to reform. There can be little doubt that at the outset Muhammad was a conscientious and sincere reformer, but how far his success changed his character, or how far his zealous followers attributed to him motives and actions that were not in reality his, it is difficult to ascertain. Certain it is that most of the evils of Muhammadanism, as it now exists have been the work of his followers after his death.

At the outset, Muhammad proclaimed the Unity of the God of Abraham. He taught that the Creator ruled the universe with love and mercy, and that He alone was to be worshipped; that the decrees of life must be placed in His hands in trust and love. The Koran was compiled after his death under the orders of Kalipha Abu Bekr, but the first version of it was so full of errors and contradictions that it was revised under the orders of Kalipha Othman, and the original version was destroyed.

Much of the historical portion of the of the Koran has been largely drawn from the Jewish Scriptures, though with some degree of inaccuracy.

BUDDHISM.

Buddhism was a revolt from the errors and aberrations of mediæval Hinduism. It extends over nearly one-fourth of the human race.

The great moral duties enforced by Buddha are—

"Kill not; steal not; lie not; commit not adultery; drink not strong drink; exercise charity, and benevolence; be pure; be virtuous; be patient; be forbearing; be courageous; be contemplative; seek after knowledge.

Bishop Brigandet. in his Life of Gautama, the Buddha of the Burmese, has said:

"Whether Buddhism be reviewed in its extent and diffusion or in the compound nature of its doctrines, it claims the serious attention of every inquiring mind. ...Though based upon capital and revolting errors, Buddhism teaches a surprising number of the finest and purest moral truths. ...It may be said in favour of Buddhism that no philosophico-religious system has ever held to an equal degree the notion of a Saviour and Deliverer, and the necessity of His mission for procuring salvation, in a Buddhist sense, of man; but by an inexplicable and deplorable eccntricity the pretended Saviour, after having taught man the way to deliver himself from the tyranny of his passion, lands him after all into the bottomless gulf of a total annihilation."

In this last sentence it would appear that the Bishop's view of Buddhist annihilation is mistaken.

Is Nirvana Annihilation?

The meaning of Nirvana (or Niebban of the Burmese), the great goal to be reached by Buddhists, has been a subject of much dispute. At one time Max-Müller held the opinion that it meant annihilation. He likened it to the blowing out of a lamp; but later investigation led him to abandon the notion that it involved nihilism. The word Nirvana, from *Nir*, a negative, and *wana*, a desire, signifies freedom from *desire*—in other words, freedom from self or selfishness. It cannot mean annihilation, because Buddha himself in his lifetime, at the close of his first discourse at Benares, stated that he had arrived at the state of Nirvana, and experienced the cessation of desire, and he observed: "This is my last birth. Henceforth I shall have no other stage of existence" meaning thereby that he was not subject to further incarnations, to which he had been subject before his attainment to Nirvana.

In Buddha's Dharmapada, or Path of Virtue, Niebban is spoken of as a state of happiness, of knowledge, of immortality, all of which are inconsistent with annihilation.

Amongst the Sanscrit synonymous terms for Nirvana, or Niebban, are "Achuta" *A*, not and *chuta*, death, or freedom from death—*i.e.*, immortality; "Tunhakkhaya," destruction of desire; "Amatu," from *A*, not, and, *mara*, to kill: not liable to death—*i.e.*, immortality.

I have sometimes discussed the question with Buddhist priests but I have not been able in any case to find that they consider Nirvana, or Niebban, to be annihilation. A missionary in Burma with whom I discussed the question wrote to me from Tongoo: "My interpreter and several of the Buddhists often use the word Niebban of the Christian Heaven. Certainly the common people in no way realize the idea of annihilation. To them Niebban is simply a place of happiness."

When I have questioned the Buddhist on the problem of creation, they have repudiated the idea that Buddha was in any way a creator, and when I pressed the question, "By whom was the universe created?" the answer has been: We do not know."

The Brahmo Samaj

The Brahmo Samaj movement was first started in 1828, as a reaction against the corruption and misconceptions of Hinduism, by Rajah Ram Mohun Roy who denounced these accretions, refuted polytheism, and advocated a return to the principles inculcated in the phlosophic "Upanishads" of the Vedas. The movement did not make much progress until it was revived, about 1842, by Debendra Nath Tagore, a wealthy resident of Calcutta, under whose auspices it made great grogress and gained a large number of adherents. Its progress, however, was subsequently interrupted by divisions respecting the

inspiration of the Vedas, which led to a split, and this was accentuated by the sanction of Keshub Chandra Sen to the marriage of his daughter, aged fourteen, to the Rajah of Cooch Behar, although he had previously denounced the Hindu principle of child-marriages.

Keshub Chundra Sen was the most eloquent and able champion of the Brahmo Samaj. It is unfortunate that the movement should have also been checked by the want of sympathy and passive resistance of some Christian missionaries in India. I was present at a very large meeting of the Brahmo Samaj in Calcutta in which Keshub Chundra Sen spoke of Jesus Christ as—

"The greatest and truest benefactor of mankind, who originated that mighty religious movement that scattered blessings on untold nations and generations." And he added :

"Blessed Jesus! Immortal Son of God! May the world appreciate Him and follow His footsteps!"

Here seemed to be common ground on which Christianity might have met Hinduism and paved the way to Christianity, affording the Christian missionary the opportunity to press on the Hindus the arguments used by St. Paul with the Athenians :

"Whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you" (Acts xvii. 23).

But advantage was not taken of the opportunity.

The objections that have been raised to a recognition of all that is good in Indian religions are twofold :

1. That the nearer any religion approaches Christianity in its moral aspect, the greater is the difficuly in conversion to Christianity.

2. That the "utter and complete degradation of Hinduism is so great that no religion that is in any sense of God could have fallen so low," and that "Satan was the inventor of Hinduism."

With regard to the first objection, it may be replied that, even should the recognition fail to end in conversion to Christianity, there would be a great gain to humanity in the rescue of so many from the foul accretions of Hinduism and in bringing them into touch with Christian ethics.

With regard to the second objection, it is illogical to attribute the evil to Satanic influence, and to deny heavenly influence in the case of the good. On similar grounds it might be argued that the Jewish religion was of Satanic origin as evidenced by the degraded idolatry into which it has lapsed from time to time, and which has been a fertile source of denunciation by the prophets.

THE SIKH RELIGION

The Sikh religion was due to another reaction against the various accretions of the Hindu religion, and to a desire to restore its pristine purity by "Guru" (or spiritual guide) Nanak, who in 1469 summed up its creed as follows :

"There is but one God whose Name is true; the Creator, devoid of fear and

enmity, immortal, unborn, self-existent, great and bountiful, He is and was and ever shall be."

Mr. Macauliffe, I.C.S., in an article on the Sikh Religion published in the ASIATIC QUARTERLY REVIEW of July, 1910, says that

The Sikhs claim that their religion prohibits idolatry hypocrisy, caste exclusiveness, the cremation of windows, the immurement of women, the use of wine and other intoxicants, tobacco-smoking infanticide, slander, pilgrimages to sacred rivers and tanks of the Hindus; and it inculcates loyalty, gratitude for favours received, philanthropy, justice, impartiality, truth, honesty and all the domestic virtues known to the holiest Christians. It would be difficult to point to a more comprehensive ethical code."

In justice to our missionaries, it must be admitted that there are some—and I hope many—who take a wider view of that which is good in Indian religions. Amongst these may be named the Rev. Dr. Caldwell, S.P.G., missionary, and afterwards Bishop, in Tinnevelly, who in 1874 exdressed the following views in Congress:

"I recognize in Hinduism a higher element—an element which I cannot but recognize as Divine, struggling with what is earthly and evil in it, and frequently overbrone, though never entirely destroyed. I trace the operation of this Divine element in the religiousness, the habit of seeing God in all things and all things in God, which has formed so marked a characteristic of the people of India during every period of their history. I trace in it the conviction that there is a God, however erroneously His attributes may be conceived, in whom or through whom all things have their being. . . . Nor need we hesitate to recognize in such ideas a Divine origin, seeing that in every human society, especially in the domain of morals, we may always and everywhere see a Divine purpose working itself into shape."

The following extract is from the inaugural address of Professor Max-Muller at the Congress of Orientalists in 1874:

"I feel the time will come when those who at present profess to be most disquieted by our studies will be the most grateful for our support; for having shown by evidence that cannot be controverted, that all religions spring from the same sacred soil, the human heart; that all are quickened by the same Divine Spirit, the still, small voice; and that though the outward forms of religion may change, may wither and decay, yet as long as man is what he is, and what he has been, he will postulate again and again the infinite as the very condition of the finite: he will yearn for something which the world cannot give."

REVIEW.

SAHITYA-SOPAN.

BY R. K. DOSS ESQ.
Barister-at-Law.

It is a pleasure to find that a busy lawyer like Mr. Doss should have found time to write a book for the young folks. It deals with a variety of subjects, and is written in chaste simple and idiomatic Bengali. One unique feature of this book is that it strikes an altogether new path in the choice of subjects. The author has taken a sensible and sober view of importaut matters like the effects of British Rule, Loyalty to the King, Indian Economics and Duty towards Parents. In his chapter on Bengal the author has given a birds'-eye-view of the importanth istorical events from the time of Hindu and Budhistic Kings down to the British administration during the viceroyalty of Lord Chelmsford. Biographies of eminent men like Gokhale, Kitchener, Ram Mohan Roy, Iswar Chandra Vidyasagar, Rani Swarnamai form exceedingly delightful reading. The Chapter on Health will amply repay perusal. The pictures and get-up of the book are also excellent. We wish it all success.

G. H. D.

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড। } ঢাকা—ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৩। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার।

প্রাণীর চলা-ফেরা চাল-চলনের বিষয়গুলি লইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে।

প্রথম বিভাগটিকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ Reflex action নাম দিয়াছেন। বাঙ্গালায় ইহাকে কি বলিব জানি না,—অনিচ্ছা-সঙ্কলন বা স্বতঃসঙ্কলন নাম দিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। এই ব্যাপারটি বড়ই অদ্ভুত। আমরা যখন কোন কাজ করিতে যাই, তখন আগে সেই কাজের কথাটা মনে মনে ভাবিয়া লই; তারপরে সেই ভাবনার বিষয়টা মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয় এবং ভাবনার অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য মস্তিষ্কই আমাদের দেহের মাংসপেশীর উপরে হুকুমজারি করে। এই হুকুম অমান্য করিবার শক্তি দেহের কোন অংশেরই নাই,—কাজেই হুকুম অনুসারে কাজ হয়। যখন আমরা পাতের ভাত হাতে করিয়া মুখে দিই, বা হাতের কলম দোয়াতে দিয়া তাহাতে কালী লাগাইয়া লই,—তখন আমাদের হাতের মাংসপেশী মস্তিষ্কের হুকুম তামিল করে এবং মস্তিষ্কের হুকুমটা আমাদের চিন্তা বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা উত্তেজিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে এই শ্রেণীর সঙ্কলনগুলি আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা নিয়মিত হয়। কিন্তু যাহাকে আমরা Reflex action বা স্বতঃসঙ্কলন বলিতেছি, তাহার উপরে প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করিতে পারে না। সে যেন কলের গাড়ীর অবাধ গমন,—স্তবস্তুতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাষ্পের জোর হইলে কল যেমন আপনিই চলে, উপযুক্ত উত্তেজনা পাইলে প্রাণীর দেহ ঠিক্ সেই প্রকারেই সঙ্কলন দেখায়,—প্রাণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা স্তব-স্তুতি ইহার উপরে প্রভুত্ব করিতে পারে না।

স্বতঃসঞ্চলনের উদাহরণ দুর্লভ নয়। আমাদেরি দেহে ইহা দিবারাত্রি কাজ করিতেছে। আগুনে হাত ঠেকিলে, হাতখানি আপনা হইতেই আগুন হইতে সরিয়া আসে; চোখের কাছ দিয়া ঢিল চলিয়া গেলে, চোখ আপনি বুজিয়া যায়; আহারের সময়ে গলায় ভাত বাধিলে, কোথা থেকে কাশী আসিয়া গলার ভাত-গুলিকে উদরে লইয়া যায়। এই সকল কাজের জন্য আমাদিগকে একটুও চিন্তা বা চেষ্টা করিতে হয় না। আগুনের তাপ পাইলেই হাতখানা যন্ত্রবৎ দূরে চলিয়া আসে, ঢিল ছুটিয়া আসিতেছে দেখিলে চক্ষুও যন্ত্রবৎ বুজিয়া যায়। ইতর প্রাণীদের মধ্যে স্বতঃসঞ্চলন আরও সুস্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রিকালে যখন পতঙ্গের পাল আলোর দিকে ছুটিয়া চলে, তখন স্বতঃসঞ্চলনেই তাহাদের দুর্গতি হয়। আলোকের স্পর্শে পতঙ্গের দেহের এক অংশ উত্তেজিত হইয়া পড়িলে, তাহাদের দেহের অপর অংশও সেইপ্রকারে উত্তেজিত হইবার চেষ্টা করে। ইহারি ফলে পতঙ্গ আলোকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। দেহের চেষ্টাকে বাধা দেয় পতঙ্গের এমন শক্তি নাই, কাজেই আলোর দিকে যন্ত্রবৎ চলা ব্যতীত ইহাদের আর অন্য উপায় থাকে না। কেঁচো ও উই প্রভৃতি প্রাণীর দেহে আলোক লাগিলেই তাহারা অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া পড়ে। এ গুলির সকলই স্বতঃসঞ্চলনের উদাহরণ।

প্রাণীর চলাফেরার দ্বিতীয় বিভাগটিকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ Instinct নাম দিয়াছেন। বাঙ্গালায় আমরা ইহাকে স্বাভাবিক সংস্কার নাম দিব। ইহা স্বতঃসঞ্চলনেরই কাছাকাছি ব্যাপার কিন্তু স্বতঃসঞ্চলন নয়। স্বাভাবিক সংস্কারে প্রাণীর যে চাল-চলন হয়, তাহা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাণিগণ অর্জ্জন করে না; কোনটী জন্মগ্রহণমাত্রেই প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেয় এবং কোনটি প্রাণীর বয়োবৃদ্ধির সহিত স্ফূর্ত্তি পাইয়া তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়।

স্বাভাবিক সংস্কারের বশীভূত হইয়া প্রাণীরা যে সকল কার্য্য করে, তাহার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। শিশু মৌমাছির ডানা গজাইলেই সে ফুলের মধু ও পরাগ সংগ্রহের জন্য ছুটিয়া বাহির হয়; সে জন্মেও ফুল দেখে নাই এবং ফুলের মধু যে কি প্রকার পদার্থ তাহাও উহার জানা থাকে না,—কিন্তু এই সকল অনভিজ্ঞতা ফুল চিনিয়া মধু আহরণে বাধা দেয় না। মৌ-মাছির এই কার্য্য সম্পূর্ণ সংস্কারজ। গো-বৎস জন্মগ্রহণের পরক্ষণেই মাতৃস্তনের সন্ধান করে; শিশু মাকড়সা জন্মিয়াই সূত্রনির্ম্মাণ করিয়া জাল বুনিতে আরম্ভ করে; হংস-শাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়াই জলাশয়ের দিকে ছুট্ দেয়;—ইহার প্রত্যেকটিই স্বাভাবিক সংস্কারের উদাহরণ। প্রাণীদিগের ঐ সকল কার্য্য অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার উপরে একটুও নির্ভর করে না; উহারা যেন পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া খুব সহজভাবে ঐ কাজগুলি করিয়া ফেলে।

প্রাণীদিগের চলা-ফেরার তৃতীয় বিভাগটি আমাদের সুপরিচিত। এই বিভাগের সকল কার্য্যই অভ্যাসগত এবং শিক্ষাসাপেক্ষ। বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগ করিয়া এই শ্রেণীর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এবং প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি তাহাদিকে চালনা করে। প্রাণীদিগের মধ্যে মানুষেই এই শ্রেণীর চলা-ফেরার অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। স্নান-আহার লেখাপড়া উঠাবসা প্রভৃতি যে সকল কাজ আমরা নিয়তই করিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। এ গুলিকে আমাদের দেহ যন্ত্রবৎ করে না; আমরা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বের শিক্ষানুযায়ী এগুলি করিয়া থাকি। পক্ষী যখন তাড়া পাইয়া উড়িয়া যায়, এবং বিড়াল মাছ চুরি করিয়া যখন গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে পলাইয়া যায়, তখন তাহারাও যন্ত্রবৎ চলে না। এই কাজগুলি তাহাদের শিক্ষা করিতে হয় এবং কাজে লাগাইবার সময়ে বিবেচনা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রাণীদিগের পূর্ব্ববর্ণিত তিন প্রকার কার্য্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। প্রথম অর্থাৎ স্বতঃসঞ্চলন (Reflex action) ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ কেবল জড়-ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জড়পদার্থ মাত্র যেমন বাহিরের বিচিত্র শক্তির অভাবে নানাপ্রকার

কার্য্য দেখায়, প্রাণীর জড়দেহ ঠিক্ সেই প্রকারেই বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিয়া স্বতঃসঞ্চলন দেখায়। পতঙ্গ যখন আলো দেখিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে যায়, তখন সে স্বেচ্ছায় যায় না; পতঙ্গ-দেহের আলোক প্রাপ্ত অংশে এক প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু দেহের অন্ধকারময় অপর অংশে তাহা ঘটে না। রাসায়নিক অবস্থার এই বৈষম্য পতঙ্গদিগকে পীড়া দেয়, তাই সে দেহের উভয়াংশের রাসায়নিক অবস্থা একই প্রকার করিবার জন্য আলোকের দিকে ছুটিয়া চলে। অন্ধকার স্থানে গাছ জন্মিলে তাহার ডালপালা যেমন আলোর দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়, পতঙ্গেরা ঠিক সেই প্রকারেই আলোর দিকে অগ্রসর হয়। তাপের বৈষম্যে যেমন বায়ুর প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীর আকর্ষণে যেমন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত ঢিল মাটিতে আসিয়া পড়ে, প্রাণীর স্বতঃসঞ্চলনও সেই প্রকারেই নানা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে।

অনেক প্রাণীরই দেখিয়া শুনিয়া চলা-ফেরা শিখিবার শক্তি আছে। পক্ষি-শাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না, মাতার সাহায্যে উহার কৌশল শিক্ষা করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই বাক্যদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না,—দেখিয়া শুনিয়া ভাষা শিক্ষা করে। এই সকল প্রত্যেক উদাহরণ দেখিয়া বুদ্ধিমান প্রাণীর পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর চলা-ফেরার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় না। শিক্ষা ও অভ্যাসই ইহার ভিত্তি।

কিন্তু বিনা শিক্ষায় এবং বিনা অভ্যাসে জন্মের পরেই প্রাণীগণ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সুবিবেচকের ন্যায় যে সকল কাজ করে, সে গুলির কারণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। আমরা সে গুলি দেখি এবং তাহা স্বাভাবিক সংস্কারের ফল বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে রত তাঁহারা ইহাতে শান্ত থাকিতে পারেন না, বিষয়টির গোড়ার খবর জানিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই কারণে গত শত শত বৎসর হইতে প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার লইয়া নানাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া আসিতেছেন;—আজও ইহার বিরাম হয় নাই। প্রাণীর সংস্কারজাত চলা-ফেরা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তির সংস্পর্শে প্রাণিদেহে যে সকল স্বতঃসঞ্চলন (Reflex action) দেখা দেয়, তাহার সহিত প্রাণীর সংস্কারজ চলা-ফেরার অনেকটা ঐক্য আছে। প্রাণীর জীবনের কার্য্যে আজকাল এমন অনেক ঘটনা ধরা পড়িয়াছে, যাহা স্বতঃসঞ্চলনের মধ্যে পড়িবে কি সংস্কারের কোঠায় থাকিবে, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। এই সকল কারণে প্রাণীর সংস্কারজ কার্য্যের উৎপত্তি নিরূপণ বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসের উন্নতির যুগে তথায় অনেক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং প্রকৃতির সকল রহস্যেরই ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেন। বলা বাহুল্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাঁহাদের সেই সকল ব্যাখ্যান টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অনেকগুলিকেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং কতকগুলিকে পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গ্রীক্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্লেটো ও আরিষ্টটল্ প্রাণীদিগের সংস্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন,—প্রাণীদিগের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যজাতিরই হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি আছে,—অপর প্রাণীরা যাহা করে, তাহা কেবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া করিয়া ফেলে। ইতর প্রাণীর কেবল প্রবৃত্তি ও অনুভূতি আছে, মানুষের ন্যায় তাহাদের বুদ্ধি বা বিবেচনা-শক্তি নাই। বলা বাহুল্য গ্রীক্ পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্ত এখন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ইতর প্রাণিগণ যে অনেক সময়েই বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করে, ইঁহারা তাহার অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারাও প্রাণীর সংস্কারজ কার্য্য লইয়া আলোচনা

করিবার সময়ে গ্রীক্ পণ্ডিতদিগের ন্যায় ভুল করিয়া ছিলেন। ইতর প্রাণিগণ বুদ্ধির অধিকারী নহে, এবং তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা কোন প্রকার দৈবী শক্তির প্রভাবে করে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। ডেকার্টেস্ (Descartes) বলিতেন প্রাণী ও যন্ত্র উভয়ই এক শ্রেণীর পদার্থ। যন্ত্রের চলাফেরা ইচ্ছা অনুসারে নিয়মিতভাবে চলিলেও তাহাতে যেমন বুদ্ধির আরোপ করা যায় না, সেই প্রকার ইতর প্রাণীদের চলা-ফেরার মধ্যে নিয়ম থাকিলেও, তাহা বুদ্ধির ফল বলা যায় না। প্রাণীরা যাহা করে, তাহা সম্পূর্ণ ঈশ্বর-দত্ত সংস্কারের বশেই করে। এই জন্যই তাহাদের চাল-চালনে মনুষ্যসুলভ বৈচিত্র্য দেখা যায় না; জীবন ও বংশরক্ষার অনুকূল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াই তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। সংস্কারজ কার্য্য ছাড়া প্রাণীরা যে স্বাধীন বুদ্ধি-প্রয়োগে অনেক কার্য্য করে ডেকার্টেস্ তাহা ধরিতে পারেন নাই এবং ধরিবার চেষ্টাও করেন নাই।

ইহার পরেই প্রতিবাদের পালা আরম্ভ হইয়াছিল। নানাদিক্ হইতে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীন সিদ্ধান্তের ভুল দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাণিগণ যে, সময়ে সময়ে মানুষের মতই বুদ্ধি বিবেচনার সহিত কার্য্য করে, তাহার শত শত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বুক্‌লার (Buchler) সাহেব নব্য সিদ্ধান্তীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক সংস্কার এবং বুদ্ধি এই উভয়কেই অবলম্বন করিয়া প্রাণীমাত্রেই চলা-ফেরা করে। সংস্কারজ বুদ্ধি শিক্ষাসাপেক্ষ নয় এবং তাহা পুরুষানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। এই কথাটা এই সময়েই পণ্ডিতদিগের মুখে প্রথমে শুনা গিয়াছিল।

এই ত গেল বিষয়টির পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা। ইহার পর জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডারুইনের আবির্ভাবকালে তাহার পুনরালোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যে অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ডারুইন্ বিজ্ঞানের নবমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই সাহায্যে প্রাণীর সংস্কারজ কার্য্যেরও ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। প্রাণিজাতিমাত্রেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে, কিন্তু তথাপি কখন কখন আপনা হইতেই সেই সকল আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তনগুলি যদি প্রাণীর জীবন ধারণের অনুকূল হয়, তবে তাহা প্রাণীর সঙ্গ ছাড়িতে চায় না,—সেগুলি পুরুষানুক্রমে সন্ততিপরম্পরায় বিকাশ পাইয়া প্রাণীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। ডারুইন্ বলিয়াছিলেন, কেবল আকৃতি লইয়াই যে প্রাণীর এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নয়; প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া প্রাণিগণ চলা-ফেরাতে যে সকল বৈচিত্র্য দেখায়, মাঝে মাঝে সে গুলিতেও পরিবর্ত্তন আসিয়া দেখা দেয়, এবং কল্যাণকর হইলে তাহাই পুরুষ পরম্পরায় বিশেষ গুণ হইয়া দাঁড়ায়। যে গুলিকে আমরা সংস্কারজ কার্য্য বলি, ডারুইনের মতে তাহা ঐ প্রকারেই উৎপন্ন হইয়া প্রাণীদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কাজেই ডারুইনের কথা সত্য বলিয়া মানিলে বলিতে হয়—প্রাকৃতিক উত্তেজনার বশে প্রাণিগণ যে-সকল স্বতঃসঞ্চলন (Reflex action) দেখায়, তাহাই স্থায়ীরূপ গ্রহণ করিলে সংস্কারের উৎপত্তি হয়।

ডারুইনের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি লইয়া পণ্ডিতমহলে ঘোর তর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লামার্ক (Lamarck) বলিয়াছেন, প্রাণিগণ নিজেদের জীবনকালে যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, তাহার কিয়দংশ সন্তানসন্ততিতে সংক্রমিত হইয়া যায় এবং ইহা হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। স্পেন্‌সার্ হেকেল্ প্রমুখ একদল পণ্ডিত লামার্কের এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—শিকারী কুকুরকে ছাড়িয়া দিলে সে যখন শিকার বাহির করিয়া আনে, তখন ইহাই বুঝা যুক্তিসঙ্গত যে, কুকুরের পূর্ব্বপুরুষ কোন প্রকারে শিকার বাহির করিবার কৌশল শিখাইয়াছিল এবং সেই কৌশলই পুরুষানুক্রমে ঐ কুকুরজাতির মধ্যে সংক্রমিত হইতেছে। যে সকল কার্য্য প্রাণিগণ বুদ্ধি-প্রয়োগে শিক্ষা করিয়া অভ্যাসে পরিণত করে, তাহা প্রথমে সেই সকল প্রাণীর বিশেষ

গুণ হইয়া পড়ে, এবং তাহাই ভবিষ্যতে সন্তানসন্ততিতে পৌঁছিয়া জাতিগত বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। এই বিশেষত্বগুলিই প্রাণীর সংস্কার। বুদ্ধিপ্রয়োগে পূর্ব্ব-পুরুষগণ যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহা পরপুরুষে পৌঁছিলে আর বুদ্ধিপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, তখন প্রাণিগণ ঐ পৈত্রিক ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যন্ত্রবৎ চলা-ফেরা করে। এই জন্য সংস্কারজ ব্যবহারে বুদ্ধির লেশমাত্র আবশ্যক হয় না।

বুদ্ধিপ্রয়োগ দ্বারা অভ্যস্ত ব্যবহারগুলি পুরুষান্তরে সংক্রমিত হইয়া সংস্কারে পরিণত হয়, এই সিদ্ধান্তটি গত শতাব্দীতে অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ পণ্ডিত উইস্ম্যান (Weismann) ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কোন প্রাণী যদি বুদ্ধির চর্চ্চা করিয়া সেই শ্রেণীর সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান হয়, তবে তাহার বংশে বুদ্ধিমান সন্ততির জন্ম সম্ভবপর; কিন্তু যদি কোন প্রাণী বুদ্ধিপ্রয়োগে তাহার চাল-চলনে কোন বিশেষত্ব আনিয়া ফেলে, তবে তাহা ঠিক সেই আকারে সন্ততিতে সংক্রমিত হয় না। মনে করা যাউক, কোন ব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রমে এমন হারমোনিয়ম বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছে যে, বাজাইবার সময়ে তাহার যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয় না, হাতের কুড়িটা অঙ্গুলি ঠিক পরদার কলের মত পড়িয়া যায়। লামার্কের শিষ্যগণের সিদ্ধান্ত সত্য হইলে বলিতে হয়,এই প্রকার একজন ওস্তাদের সন্তানবর্গ হারমোনিয়ম বাজানো গুণটি সংস্কাররূপে লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না; বড় ওস্তাদের পুত্রকেও কষ্ট করিয়া গান-বাজানা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জীবনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাভ করে, তবে অনেক সময়েই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সন্তানে সংক্রমিত হয়। পণ্ডিতের পুত্র খুব প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া নষ্ট না হইলে প্রায়ই মূর্খ হয় না।

লামার্কের ও ডারুইনের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়াই উইস্ম্যান্ ক্ষান্ত হন নাই; কি প্রকারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই প্রাণিগণ সংস্কারজ ব্যবহার আয়ত্ত করে, সে সম্বন্ধে তিনি এক নূতন সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছিলেন। যে মূল জৈব-সামগ্রী (Gerums) বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রাণীর সৃষ্টি করে, তাঁহার মতে ঐ জিনিসটাই সংস্কারের আধার। উদাহরণ দিলে তাঁহার বক্তব্যটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, একই পরিবারে এবং একই আবহাওয়ার মধ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলের মেজাজ সমান হয় না। কেহ হয় ত খিট্‌খিটে, কেহ হয় ত সদাপ্রফুল্ল; কেহ অসম্ভব গম্ভীর, কেহ বা ভয়ানক চঞ্চল। এই ব্যাপারগুলিকেই উইস্ম্যান্ সাহেব মূল জৈব-পদার্থের (Gerums) পরিবর্ত্তনের ফল বলিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনটা পিতৃ বা মাতৃপক্ষের বিশেষত্ব দ্বারা উক্ত জৈবপদার্থে মুদ্রিত থাকে এবং পরে তাহা হইতে প্রাণীর জন্ম হইলে উহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা আমিষাহারকে অকারণে বিষবৎ মনে করে; আবার এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা আমিষাহার ব্যতীত অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেহ জন্মের পর হইতেই চোখে কম দেখে; কেহ অসাধারণ সঙ্গীত-জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উইজ্‌ম্যানের মতে, এগুলিও মূল জৈব-পদার্থের পরিবর্ত্তনের ফল। তিনি এইপ্রকারে প্রাণীর সংস্কারকেও মূল জৈব পদার্থের পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফেলিয়াছেন। মানুষ যেমন উক্ত পরিবর্ত্তনের ফলে কখন রঙ-কাণা রাত-কাণা, প্রভৃতি নানা প্রকৃতি লইয়া জন্মে, ইতর প্রাণীরাও ঐপ্রকারের নানা ভাল মন্দ গুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মন্দগুণ লইয়া জন্মিলে তাহাদের সংসারে স্থান হয় না, জীবন সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়া অল্পদিনেই জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হয়; কিন্তু ভাল গুণ লইয়া জন্মিলে তাহারা সংসারে উন্নতি করে এবং নিজেদের বংশ সুপ্রতিষ্ঠ রাখে। উইজ্‌ম্যানের মতে এই প্রকারে লব্ধ জীবনরক্ষার উপযোগী সদ্‌-গুণাবলীই সংস্কাররূপে প্রকাশ পায়।

অল্পদিন হইল উইজ্‌ম্যানের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত লইয়া অনেক

আলোচনা হইয়াছে এবং আজও সেই আলোচনার অন্ত হয় নাই। কিন্তু উইজ্‌ম্যানের পরে আজও কেহ বিষয়টীতে নূতন করিয়া আলোকপাত করিতে পারেন নাই। উইজ্‌ম্যানের সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও এসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আজও অজ্ঞাত আছে বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না। তিনি মূল জৈবপদার্থের যে পরিবর্ত্তনের কথা কল্পনা করিয়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে পরিবর্ত্তন কিপ্রকারে হয়, তাহা আজও কেহ সুস্পষ্ট বলিতে পারেন নাই। প্রাণীর কতকগুলি ধর্ম্ম কেন জৈব-পদার্থের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং কতকগুলি কেন করে না,—এই প্রশ্নেরও উত্তর উক্ত সিদ্ধান্তে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, সংস্কারের উৎপত্তির স্থূল ব্যাপারগুলি ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও, মূল বিষয়টা আজও রহস্যাবৃত আছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শারনাথ।

১৩১৮ বাং ২৪শে আশ্বিন একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুণ্যভূমি কাশীধাম হইতে শারনাথ দর্শনে রওয়ানা হইলাম। আমরা দুই বন্ধু, সুতরাং একা গাড়ীতে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম। পশ্চিমাঞ্চলে একা গাড়ীর ভাড়া অনেক কম।

শারনাথ বৌদ্ধগণের পবিত্র তীর্থধাম। ইহা ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রীতিপ্রদ ও ভ্রমণকারীর নিকট অতি মনোরম স্থান। শারনাথ বারাণসীর উত্তরে অনুমান ২।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাশীর পূর্ব্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবী উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কাশীর উত্তরসীমানা বরুণা ও দক্ষিণসীমানা অসি। এই দুই নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুবিস্তৃত ভূভাগই বারাণসী নামে অভিহিত। অল্পক্ষণ পর আমরা বরুণার উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক বারাণসীকে পশ্চাতে রাখিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সহরতলীর বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ততই আমাদের নয়নে অধিকতরভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোথাও বৃক্ষরাজির শোভা, কোথাও শ্যামলক্ষেত্রের মধুরতা, কোথাও দীনহীন কাঙ্গালের পর্ণকুটীরের ম্লানপ্রভা, কোথাও কৃষক বালকের সরল চাহনি আমাদের চিত্তকে নানাভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সদ্যপ্রসূত প্রাণাধিক পুত্রের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোধন ও মাতা গোতমীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া জগতের কল্যাণার্থ ভিক্ষুবেশে জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগর হইতে বিদায় লইলেন, এবং ক্রমে দুই বৎসর নানাদেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে গয়াক্ষেত্রে—উরুবিল্ব বনে উপনীত হইলেন। উরুবিল্বের পার্শ্ববাহিনী প্রসন্নসলিলা নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদীর সুমধুর কল কল নিনাদ ও প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি আগন্তুকের মন প্রাণ কাড়িয়া লয়। শাক্যসিংহ এ হেন উপবনে উপস্থিত হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন। এবং ইহাকেই সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করতঃ এক বিটপীমূলে সমাসীন হইয়া ধ্যাননিরত রহিলেন। তিনি একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল যে কল্পনাতীত উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা কে না অবগত আছেন? তাঁহার তপস্যার কাহিনী কি আর কহিব—তিনি এই দীর্ঘকাল একটি কি দুইটী তিল কিংবা তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়াই দিনপাত করিতেন। সেই সময় তথায় তাঁহার আরো ৫ পাঁচ শিষ্য সাধন ভজন করিতেন। ক্রমাগত ছয় বৎসর সাধনায়ও তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পরিলেন না। অথচ তাঁহার এই কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বুদ্ধদেব অনাহারে শরীর পাত করা অপেক্ষা এই সাধন মার্গ পরিহার করা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন এবং নিরঞ্জনার শীতল জলে অবগাহন করিয়া শান্ত হইলেন। তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন ভিক্ষু স্থানান্তরে গমন করিলেন। সে সময় বুদ্ধদেব কিছুদিন সুজাতানাম্নী রাজকন্যার

প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণে সুস্থতা লাভ করিলেন। এবং অতঃপর "বোধিদ্রুম" মূলে উপবিষ্ট হইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। বোধিদ্রুমের ইতিবৃত্ত আমরা এক্ষণ উল্লেখ করিব না। প্রবন্ধান্তরে ইহার সবিশেষ পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল।—এরূপে এক বৎসর গত হইলে "মহাত্মা সিদ্ধার্থ বোধিতরুমূলে ধ্যানযোগে উপবেশন পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষ লাভের অবলম্বন সেতু বৌদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিলেন।" ভগবান বুদ্ধদেব এক্ষণ হৃষ্টচিত্তে মুক্তির সমাচার প্রচারে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পবিত্র শারনাথ ক্ষেত্রেতাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। প্রাগুক্ত ৫ জন শিষ্য বুদ্ধদেবের সৌম্যমূর্ত্তি ও তাঁহার বদনকমলে অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আমরা যে পূর্ব্বে সুজাতানাম্নি মহিলার কথা উল্লেখ করিয়াছি তিনি কাহারো মতে কৃষককন্যা বলিয়া পরিচিত। আমরা তাঁহাকে রাজপুত্রী নামেই অভিহিত করিলাম।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাশী ভারতের শীর্ষস্থানীয়। ভারতে কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে সর্ব্বপ্রথম কাশীধামে উপনীত হইতে হইত। কাশীতে যখন যে ধর্ম্ম, যে আচার, যে মত গৃহীত হইত তাহাই ক্রমে ভারতের ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইত। কাশী ভারতের কেন্দ্র ভূমি ছিল। বুদ্ধদেব কাশীর সন্নিহিত সাধনক্ষেত্র শারনাথে অবস্থান করিয়া তাঁহার গরীয়ান্ ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত রহিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন এবং প্রকৃত শান্তিলাভের অধিকারী হইলেন।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকল্পে কতরূপে কত কার্য্য যে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শারনাথে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়—এই স্মৃতি সংরক্ষণার্থ যে এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি শারনাথ বক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর্য্যটকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আমরা শারনাথে উপনীত হইয়া এই স্তূপ দর্শনমাত্র অবাক্ হইলাম। স্তূপটী কত উচ্চ! কত মহান্! কত ভাব উদ্দীপক! ভারতের বিভিন্ন স্থানে এক একটি বৌদ্ধ স্তূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকের মনে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস জাগ্রত করিয়া দেয়। শারনাথের স্তূপ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল রাজপথ নির্ম্মাণকালে শারনাথের মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ভগ্ন অট্টালিকা হইতে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এক সুবৃহৎ অট্টালিকায় সুসজ্জিত রহিয়াছে। এ সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বৌদ্ধযুগের ভাস্কর কার্য্যের প্রশংসা করিতে বারংবার ইচ্ছা হয়। ছোট বড় অসংখ্য শিলামূর্ত্তি। সকল মূর্ত্তিই বুদ্ধদেবের। কোন মূর্ত্তি সুষুপ্ত—শায়িত। প্রত্যেক পুত্তলিকায়ই বুদ্ধদেবের গাম্ভীর্য্যের ও প্রেমপ্রবণতার ভাব পরিব্যক্ত আছে। বুদ্ধদেবের একটি বড় মূর্ত্তি দেখিলাম। তিনি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তাঁহার উপরে ছত্র রক্ষিত আছে। এই ভাবেরই প্রতিকৃতি উক্ত শিলামূর্ত্তিতে লক্ষিত হইল। ভূ-প্রোথিত অট্টালিকায় যে সকল অমূল্য সামগ্রী বিনষ্ট হইতেছিল ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয় উদ্ধার করতঃ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। যে ভারত সিংহাসন লাভ করিয়া হিন্দু-দ্বেষী যবনরাজগণ ভারতের অতুল্যকীর্ত্তিকলাপ ধ্বংশ করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনেই সুদূরবাসী ইংরেজ অধিরূঢ় হইয়া ভারতের নষ্ট ও বিলুপ্ত দ্রব্যের উদ্ধার সাধনে সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দে অধীর হইবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বহুগবেষণার পর ভারতের প্রাচীন বিলুপ্ত গৌরবের কথঞ্চিৎ উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা অনন্তকাল ভারতবাসীর ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের কৃতজ্ঞ কুসুমাঞ্জলী লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

আবিষ্কৃত ভগ্ন অট্টালিকা কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটি প্রকোষ্ঠে এক ইন্দারা নয়নগোচর হইল। শারনাথে দুই একটী ইষ্টকমঞ্চ—একটী বিশাল স্তূপ

একটী ভগ্ন ভূপ্রোথিত অট্টালিকা এবং অধুনা সুনির্ম্মিত অট্টালিকা মধ্যস্থ অসংখ্য সুরম্য প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত দর্শন যোগ্য আর কিছুই নাই। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—শারনাথে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার এমন কিছুই নাই। কিন্তু এখানে আসিবামাত্র মানসনেত্রে যে সকল চিত্র দৃষ্ট হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! স্থান-মাহাত্ম্যে পাষাণ হৃদয় দ্রব হইল—তখন বন্ধুর হাত ধরিয়া সাশ্রু নয়নে ভারতের অতীতযুগের চিত্র দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শাক্যবংশের সৌভাগ্য—ভগবানের আবির্ভাব। জগতের সুদিন—সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ। মানবের শোক-দিন—বোধিসত্ত্বের মহানির্ব্বাণ। গৈরিক বসন পরিহিত প্রশান্ত শ্রমণগণের ও তাঁহাদের শিষ্যগণের উদ্যম উৎসাহ ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইলাম। ভারতের—ঘরে ঘরে "অহিংসা-পরমধর্ম্ম" এই গাথা কীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া ধন্য হইলাম। ফলতঃ শারনাথে আসিলে বুদ্ধযুগের ইতিহাস একে একে মনোমধ্যে জাগরূক হয়। তখন হৃদয় যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট হয় এবং ইহার ফলে যে কি বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায় তাহাতে মনে হয় শারনাথে আইসার শ্রম বিফল হয় নাই। বস্তুতঃ এক এক স্থানের যে এক একটী বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অতঃপর আমরা শারনাথের স্মৃতি লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাশী প্রত্যাগমন করিলাম।

পূর্ব্বে শারনাথে অনেক মন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্তু এক্ষণ সর্ব্বধ্বংসী কালের অপ্রতিহত প্রভাবে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়োএনসাঙ ভারতে আগমন করতঃ শারনাথে আসিয়া কতকগুলি স্তূপ দেখিতে পান। তাহার এক একটি স্তূপের সহিত এক একটি অতীতযুগের সাধনরাজ্যের স্মৃতি জড়িত ছিল। তিনি তৎকালে শারনাথে একটি পিত্তলের বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ববিদ্ বিজ্ঞবর কানিংহাম বলেন—শারনাথের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তূপে যে সকল বর্ণনা দৃষ্ট হয়, একমাত্র আগ্রার ভুবনবিখ্যাত তাজমহল ছাড়িয়া দিলে, এমন কোন ভারতীয় মন্দির নাই—যাহাতে এতাধিক বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে।

শারনাথের অপর নাম মৃগদাব, ইহার আর একটী নাম ঋষিপত্তন। বৌদ্ধগ্রন্থে শারনাথ ও মৃগদাব নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে এক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান বর্ণিত আছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "পূর্ব্বকালে দেবদত্ত ও বোধিসত্ব এই দুইজন মৃগদেহ ধারণ করিয়া এই স্থানে হরিণের রাজা হইয়াছিলেন। দেবদত্তের অধীনে পাঁচ শত এবং বোধিসত্বের অধীনে পাঁচ শত হরিণ ছিল। এই অঞ্চলের রাজা মৃগয়া উপলক্ষে এই বনে আসিয়া মৃগ শীকার করিতেন। একদিন রাজা মৃগয়ায় আসিয়াছেন, এমন সময়ে মৃগরাজ বোধিসত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মহারাজ, আপনি মৃগয়া উপলক্ষে এই বনে আসিয়া বহুসংখ্যক মৃগবধ করিয়া থাকেন। একদিন গত হইলে মৃগয়ালব্ধ হরিণ পর্য্যুসিত হইয়া পড়ে, আপনার আহারের উপযুক্ত থাকে না। আপনি কৃপা করিয়া মৃগয়া বন্ধ করুন, আমাদের পাল হইতে প্রত্যহ একটি হরিণ আপনার আহারের জন্য যাইবে, আপনি তাহাকে বধ করিয়া আহার করিবেন। এই প্রকারে আপনি প্রত্যহ সদ্য মাংস আহার করিতে পারিবেন—আমরাও কতককাল বেশী জীবিত থাকিতে পারিব।' রাজা এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন এবং মৃগয়া বন্ধ করিলেন। তদবধি একটির পর একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে উভয় পাল হইতে মৃগ প্রত্যহ রাজসন্নিধানে আসিতে লাগিল। এক দিবস দেবদত্তের পালের একটি মৃগীর পর্য্যায় উপস্থিত হইল। মৃগীটি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল। মৃগীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গর্ভস্থ শিশুও বিনষ্ট হইবে ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—'প্রভু আমি মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্ভস্থ শিশুটীও বিনষ্ট হইবে, ইহার প্রতিকার করুন। আমার শিশুর মরিবার পালা এখনও উপস্থিত হয় নাই।' দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগীকে ভর্ৎসনা করিলেন, কোন প্রতিকার করিলেন না। হরিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্বের নিকট উপস্থিত হইল ও তাহার

দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং রাজ-সন্নিধানে যাইতে লাগিলেন। যখন মৃগরাজ বোধিসত্ত্ব রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন তখন এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজধানীর বহুলোক মৃগরাজকে দেখিবার জন্য একত্রিত হইল। ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, পরে দ্বাররক্ষকের নিকট অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অবশেষে মৃগরাজ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি স্বয়ং কি জন্য আগমন করিয়াছেন?' মৃগরাজ হরিণীর কথা নৃপতির নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন,—'গর্ভবতী মৃগী আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদরস্থ সন্তান বিনষ্ট হইবে, এই দুঃখে তাহার পরিবর্ত্তে আমি আসিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মৃগরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মৃগরাজ, আমি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি প্রকৃতই পশু, কারণ আমার হৃদয়ে করুণার লেশমাত্র নাই! আর আপনি মৃগ দেহধারী হইয়াও মনুষ্যোচিত দয়া ও কারুণ্য লাভ করিয়াছেন। আপনি প্রকৃত মনুষ্যপদ বাচ্য।' রাজার হৃদয় বিষাদ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মৃগরাজকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—'মৃগরাজ, আমি আর কখনও মৃগ শীকার কিম্বা বধ করিব না। মৃগগণ স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বনে বিচরণ করিতে পারিবে।' তদবধি মৃগগণ স্বচ্ছন্দে এই বনে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই এই বনের নাম মৃগদাব বা শারনাথ হইয়াছে। শারনাথ শব্দ শার্ঙ্গনাথ শব্দেরই অপভ্রংশ। শার্ঙ্গনাথ বা শারঙ্গনাথ হইতেই শারনাথ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।"

জনৈক লেখক অনুমান করেন—মহাদেবের নাম অনুসারে শারনাথ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাদেবের অপরনাম শারঙ্গনাথ! শারনাথে অদ্যাপি শিব-মন্দির আছে। সুতরাং মহাদেবের নামানুসারে এস্থানের নাম শার্ঙ্গনাথ ক্রমে শারনাথ হইয়াছে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। শারনাথ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না—বিজ্ঞবর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইহার মীমাংসা করিবেন।

শ্রীমনীন্দ্রকিশোর সেন।

ভাদ্রে।

আগে গৃহ পূর্ণ ছিল এখন গৃহ খালি।
আগে প্রাণে জোছনা ছিল এখন মেঘের কালী!
ভরা ভাদ্র আজো বাড়ীর চতুর্দ্দিকে জল,
পুবাল বায়ে তুফান বয় জল করে কল্ কল্!
রুগ্ন দেহে এসে গৃহে পড়ছে তাকে মনে,
জানিনা আর কবে দেখা হবে তাহার সনে।
সন্ধ্যাবেলা আগের মত জ্বলেনা আর বাতি,
নাই সে পুণ্য প্রদীপ শূন্য প্রাণে আঁধার রাতি!
মায়া শূন্য, স্নেহ শূন্য, প্রেম শূন্য বাড়ী,
রান্না ঘরে শূন্য পড়ে জলের কলস, হাড়ি,
ফুল শয্যা ফুল শূন্য, সিউলি গাছের তলে,
কে আদরে যত্ন করে লয় সে কুসুম তুলে?
গন্ধ আনে মন্দ মলয় প্রাণ করে আকুল,
বাগান ভরে থরে থরে ফুটছে কত ফুল!
নীল আকাসে জোছনা হাসে, পাখীরা গায় গান,
কেমন করে শূন্য ঘরে রাখব ধরে প্রাণ?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ

সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ, আজ সাতাশ বৎসর পর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির মুখ দর্শন করিলাম, চক্ষু তৃপ্ত ও দেহ পুণ্য হইল। এই সাতাশবৎসর কত স্থান ঘুরিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের গাঢ় নীলবর্ণ চিত্রিত তরুরাজি, সুদীর্ঘ শাল ও শ্যামায়মান নারিকেলপংক্তি এবং প্রকৃতির প্রিয় রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আম্রকণ্টকীর বাগান দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে যেন কি খুঁজিয়া পাই নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের কচিৎ বিরল কচিৎ ঘন অরণ্যানী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু সেই শোভাসমৃদ্ধির মধ্যেও একটা অভাব বোধ করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গ ভিন্ন কোথায় বিশাল-অম্বরা নদীর এইরূপ উদ্দাম খেলা দেখিব? ধবল-বসনা ধলেশ্বরীর প্রবল লীলার স্রোতে কোথায় আর তেমন করিয়া গা ঢালিয়া জুড়াইব? পদ্মার ন্যায় কোন্ নদী সমুদ্রকে ছোট করিয়া চক্ষুর সমক্ষে আঁকিবে? মেঘনার ন্যায় কোন নদী ধরাতলে মেঘের নিনাদ শুনাইবে? সাভারের সিন্দুরোজ্জ্বল তীরে দাঁড়াইয় এক দিকে বিশাল তরঙ্গের আবর্ত্তন, অন্যদিকে সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভায় সমুজ্জ্বল গুবাক-পংক্তির শোভা দেখিয়া শৈশবে যে বরেণ্যা প্রকৃতিকে প্রণাম করিতাম—সেইরূপ ভৈরব মধুর দৃশ্য বঙ্গে আর কোথায় পাইব? যেখানে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরী মিলিত হইয়াছে—সেই নারায়ণগঞ্জের তটভাগে শীতলাক্ষের জলরাশির যে মহাচিত্র চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে, সেরূপ গৌরবান্বিত দৃশ্য আর কোথায় মিলিবে? অতি শৈশবে এই বিশাল নদীতরঙ্গে যখন ক্ষুদ্র তরণীতে ভাসিতাম, তখন মনে হইত আমি পক্ষী হইয়া অম্বরে উড়িতেছি! যে দেশে মেঘের গর্জ্জনে ধরণীবক্ষ তরঙ্গায়িত হইয়া দুলিয়া উঠে, সেই দেশ আমাদের দেশ, যে দেশে মেঘ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া থাকে, এবং পৃথিবী তরঙ্গ তুলিয়া স্বর্গ ছুঁইতে চাহে, আমাদের সেই দেশ! যে দেশের নদীর তীর কোথাও প্রস্তরদৃঢ়, তরঙ্গের ভীষণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া শত শত বৎসর স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, আর কোথাও মেঘের সঙ্গে ভীম নাদে আছ্‌ড়াইয়া জলগর্ভে পড়িতেছে, আমাদের সেই বিচিত্র ভৈরব দেশ!

পশ্চিমবঙ্গের নীলাভ বনভূমির দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, শীর্ণকায়া ভাগীরথীর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া আমাদের দেশের নদী, আমাদের দেশের বন্যা আমি ভুলিতে পারিনাই। পশ্চিমবঙ্গের বর্ষা শুধু বৃষ্টিপাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, কিন্তু আমার কল্পনা সেই বর্ষার সন্ধান করিত, যে বর্ষা জলস্থলের ভেদ ভাঙ্গিয়া ফেলে; যে বর্ষায় নদ, নদী, ক্ষেত ও ডাঙ্গা এক হইয়া যায়,—যাহাতে ডাঙ্গার উপর নৌকা চলে এবং সর্ব্বত্র এক মহান্ সর্ব্বব্যাপী জলের মহিমা প্রকাশিত হয়। কৈশোরে সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে হইত, বর্ষার রৌপ্যস্রোতঃ পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে;—মনে হইত এমন করিয়া যদি ভক্তির বাণ ডাকে, তবে কঠিনের কাঠিন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সর্ব্বত্রই সরস কোমলতার প্রস্রবণ ছুটাইতে পারে। কতদিন বর্ষারাণীকে আকাশের গায়ে নীলাম্বরীর ন্যায় মেঘপংক্তির আঁচল ছড়াইয়া, কেতকীর মালা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র যেন তাহার তরঙ্গায়িত বসনের ন্যায় উড়িয়া যাইত; কখনও মনে হইত, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে দৈত্যপুরীর স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া চূর্ণস্ফটিকবিন্দু অবিশ্রান্ত মর্ত্ত্যলোকে পড়িতেছে; কখনও মনে হইত বর্ষারাণী মাথা হইতে তারার ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চূর্ণ মেঘকুন্তলরাজি অসীম অম্বরে এলাইয়া দিয়া বিদ্যুতের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে যেন কাহার দিকে চাহিতেন, সে কে তাঁহার সন্ধান পাইতাম না। কখন বা একমাত্র পুত্রহারা জননীর ন্যায় সারাদিন অঝোরে কাঁদিতেন। আমি মনে মনে বলিতাম, "তোমার বালগোপালকে ডাকিয়া দেই, আর কেঁদোনা, আমি খুঁজিয়া আনি।" কখনও বর্ষা মুক্তবেণী—কজ্জলবর্ণ কেশগুচ্ছ আকাশপটে দোদুল্যমান। কখনও বর্ষা মুক্তবেণী—এলোকেশী। কখনও বর্ষা অট্ট-

হাস্যোগ্রা, কখনও আবর্ত্তশোভিতা, কখনও তাহার মূর্ত্তি নীলোৎপলদলশ্যামা, আবার "ক্বচিৎ সুপুষ্পিতবৃক্ষৈর্ম্মালাভিরূপশোভিতা।" পূর্ব্ববঙ্গের নদনদীর বিশালপটে অঙ্কিত বর্ষা আমার কল্পনাকে এমনই ভাবে উদ্বোধিত করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাসকালে এই বর্ষা, এই অসীম জলদৃশ্যের জন্য আমার চক্ষু অতৃপ্তভাবে বৃথাই সন্ধান করিয়াছে। গঙ্গার পবিত্র ধারায় স্নান করিতে করিতে মনে হইয়াছে, কোথায় সেই মহাগঙ্গা যাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা পতিতগঙ্গা আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন! পতিতপাবনীর কূলে দাঁড়াইয়া আমি সেই পতিতা পদ্মার জন্য কাঁদিয়াছি। আমার মন ও চক্ষুকর্ণ একত্র হইয়া ভৈরবনাদিনী পদ্মার সুবিস্তৃত অকূল জলসম্পদে হারাইয়া যাইতে চাহিত। আমাদের পদ্মা রাজরাজেশ্বরী, ভগীরথের নির্দ্দিষ্ট পথ ভুলিয়া যদি তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতেই আসিয়াছেন; তিনি কখনও আমাদের কীর্ত্তি ও গৃহাদি নাশ করিয়া অকূলে ভাসাইয়াছেন, কখনও আমাদের ক্ষুদ্র তরীখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কুলুকুলু স্বরে গান শুনাইয়াছেন, কখনও আরক্তনয়নে চাহিয়া আঘাত করিয়াছেন, কখনও বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এই স্নেহশীলা অথচ প্রগল্‌ভা, মমতাময়ী অথচ অত্যাচারিণী মাতা শাস্ত্রের অভিশপ্তা হউন, আমাদের গৌরবান্বিতা জননী, ইহার উদ্ধার করিবার শক্তিনাই, আমরা বিশ্বাস করিব না।

পূর্ব্ববঙ্গের নানাদিক্ হইতে এক্ষণে ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হইতেছে। আমি বিদেশে বাস করিয়া স্বপ্নে দেখিতাম, যেন রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের আহ্বানে গোপীচন্দ্র তাঁহার কন্যা অদুনাকে বিবাহ করিতে সাভারে আসিতেছেন। অদুনার মত সুন্দরী নারী এবং গোপীচন্দ্রের মত সুন্দর পুরুষ তখন বঙ্গদেশে আর ছিল না। আমার মনে হইত, চম্পকের হার কবরীতে বাঁধিয়া কুমারী নববধূ স্বামীর বাড়ীতে যাইবার জন্য স্বর্ণদোলা হইতে নামিয়া সাভারের নদীতীরে পাদুখানি ফেলিতেছেন; তাঁহার চরণের আল্‌তার রঙ্গের সঙ্গে সাভারের সিন্দুররঞ্জিত তীরভূমির রঙ্‌ মিশিয়া যাইতেছে। এক দিকে ধলেশ্বরীর বিশাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হইয়া ভৈরবরবে কাঁদিতেছে,—অন্যদিকে কানাই ও বংশাই নদী অন্তঃপুরের শোকগুঞ্জনের ন্যায় মৃদুস্বরে বিনাইয়া দুঃখগীতি গাহিতেছে। রাজদম্পতী সহ "মধুকর" নৌকা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ঠেলিয়া চলিতেছে; অদুনার দুইটি করুণ শোকার্দ্র চক্ষে সমস্ত আকাশের নীলিমা প্রতিভাত হইতেছে, এবং তাঁহার কবরীর চাঁপাফুলের ঘ্রাণ সাভারের স্মৃতিটুকুর ন্যায় তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। গোপীচন্দ্র অদুনাকে বিবাহ করিয়া পদুনাকে দানে পাইয়াছিলেন। এই বিবাহবাসরের কথা ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা এককালে সমস্ত ভারতে গীত হইত। এখনও মহারাষ্ট্র দেশের রঙ্গমঞ্চে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসও অদুনা পদুনারা শোকগাথা অভিনীত হইয়া থাকে; এবং সেদিনও রবিবর্ম্মা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ও অদুনা-পদুনার বিচ্ছেদপ্রসঙ্গে যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। অদুনা গোপীচন্দ্রের পা ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু গ্রীষ্মকালে তোমাকে দণ্ডপাখা দিয়া ব্যজন করিব এবং শুইবার জন্য শীতল পাটি বিছাইয়া দিব, তুমি ছেড়ে যেও না। যদি নিতান্তই সন্ন্যাসী হইবে আমাকে সন্ন্যাসিনী করিয়া লও।" রামচন্দ্র যেরূপ সীতাকে রাক্ষসের ভয় দেখাইয়াছিলেন, গোপীচন্দ্র যখন সেইভাবে রাণীকে বাঘের ভয় দেখাইলেন,—তখন অদুনা স্বামীর শ্রীচরণে মাথা লুটাইয়া বলিলেন,

"থাউক না কৈন বনের বাঘ
তাহে নাহি ডর।
নিত্ কলঙ্কে মরণ হউক
স্বামীর পদতল।"

কিছুতেই কিছু হইল না, গোপীচন্দ্র পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। শেষবার অদুনা "তুমি হবে বটবৃক্ষ, আমি তোমার লতা, রাঙা চরণ বেড়িয়া রব ছাড়িয়া যাবে কোথা" বলিয়া তাহাকে স্নেহডোরে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিটপী আশ্রয় দিল না, ছিন্নলতা

চ্চিত হইয়া রহিল। তখন অদুনার বিলাপে পাষাণ গলিয়া গেল। তখন অশ্বশালায় অশ্ব এবং হাতীশালায় হাতী অবিরত অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল এবং রাজ-অন্তঃপুরে শুক, শারী ও শ্যামার কণ্ঠধ্বনিতে আকুল করুণার সুর বাজিয়া উঠিল। দ্বাদশ বৎসর পরে রাজা যোগিবেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আঠার বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এখন বয়স ত্রিশ বৎসর, এখনও সেই অনবদ্য কান্তি, পূর্ণ যৌবন, দীর্ঘ সাধনায় পুণ্যদেহ জ্যোতির্ম্ময়। প্রাসাদদ্বারে কেহ তাঁহাকে চিনিল না, বা অভ্যর্থনা করিয়া লইল না। ইন্দ্রিয়সংগ্রামে বিজয়ী রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন, অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহাকে অর্ঘ্যদ্বারা বরণ করিয়া লইল না; পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা তাঁহার আরতি করিল না; মঙ্গল ঘট, তুলসীমঞ্জরী, কদলীবৃক্ষ, আম্রশাখা এবং মাগধ বন্দীর গীতিদ্বারা তিনি অভিনন্দিত হইলেন না। যোগিবর নির্ভীকভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদুনা এই অপরিচিতের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া রাজদ্বারের প্রহরীদ্বারা কুকুর লেলাইয়া অতিথিকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পাইলেন। ভীমগর্জ্জনে রাজপুরী কাঁপাইয়া কুকুর ছুটিল, কিন্তু প্রভুকে চিনিতে পারিয়া লাঙ্গুলদ্বারা আনন্দ জ্ঞাপনপূর্ব্বক রাজ যোগীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। চমৎকৃত হইয়া অদুনা রাজদ্বারের ঐরাবত হাতীকে অভ্যাগতের দিকে ছুটাইয়া দিলেন; প্রকাণ্ডকায় হস্তী তাঁহার নিকটে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সেও তাহার প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছিল। তখন রাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "বনের পশু তোমাকে চিনিল, আর আমার সর্ব্বস্বকে চিনিয়াও চিনিতে পারিলাম না।" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী যোগীর পায়ের কাছে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সাভারের রাজকুমারীর এই প্রেম কাহিনী একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে গীত হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগীতি গাইবার জন্য যে যন্ত্র নির্ম্মিত হইল, তাহার নাম হইল "গোপীযন্ত্র"। ভাটিয়াল রাগিণী উহার সঙ্গে মিলাইয়া একতানে গীত হইলে, কাহার সাধ্য না কাঁদিয়া থাকিতে পারে।

হরিশ্চন্দ্রের নামচিহ্নিত দুই এক খানি ইষ্টক ঢাকা মিউজিয়মে আছে, তাহা দেখিলে এই ভাবের কত প্রাচীন গৌরবজনক ইতিহাসের কথা মনে হয়!

সেনভূমির অধিপতি চন্দ্রসেনের দুই দৌহিত্রীর পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহারা সেনবংশপ্রদীপ প্রথম বল্লালের সেনাপতি পদ্মদাস হইতে দশম স্থানীয় চণ্ডীবরের সহোদরা ছিলেন। এই দুই কন্যার একজনকে বিক্রমপুরের রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন এবং অপরটিকে বিক্রমপুরবাসী উক্ত রাজবংশীয় কানুর্খা বিবাহ করেন। চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা প্রভৃতি কুলজীগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এই দ্বিতীয় বল্লালমহিষীকে আমি কল্পনার তুলিতে আঁকিতাম। মনে হইত, ধূসর সন্ধ্যায় বল্লাল বাড়ীর গবাক্ষ ধরিয়া পরিজনসহ তিনি উত্তরদিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া আছেন, সঞ্চরমাণ মেঘরাজি দেখিয়া তিনি মনে করিতেছেন, বুঝি বিজয়ী রাজসৈন্যের অশ্বের খুরোত্থিত ধূলি দেখা যাইতেছে। কিন্তু সহসা সেই মেঘরাজির বক্ষ ভেদ করিয়া প্রাণঘাতক উল্কার ন্যায় একটি পারাবত দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে সহসা বিশাল রাজপ্রাসাদে অস্ফুট ক্রন্দনশব্দ শ্রুত হইল; তার পর দেখিলাম, চিতার আগুন আকাশ ছাইয়া জ্বলিতেছে; সেই আগুনে কত অনবদ্যরূপ, যৌবন, কত অনাঘ্রাত যুথিপুষ্পের মাল্য পুড়িয়া ছাই হইল। কল্পনায় দেখিলাম, সেই সংবাদ পাইয়া সাম্রাজ্ঞীর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র, দিগম্বর, নীলাম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার সসৈন্যে সুয়াপুর হইতে বিক্রমপুরের দিকে ছুটিয়াছেন!

এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য অধিকদিনের নহে; কিন্তু আমার মনশ্চক্ষু কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের বহু পূর্ব্ব অধ্যায়ে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কখনও দেখিয়াছি তথাগতের পাদপদ্মে প্রাণ অর্পণ করিয়া কোন রাজচক্রবর্ত্তী কানাই নদের তীরে বিশাল বাজাসনবিহারের পত্তন করিতেছেন; নাঙা, বা মুণ্ডিত-শীর্ষ ভিক্ষু ও শ্রাবকের দল যে স্থানে থাকিয়া সেই

বিহারে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন—সেই পল্লী "নান্না" নামে আখ্যাত হইতেছে। কখনও দেখিয়াছি বিক্রমপুর-বাসী রাজকুলসম্ভূত কোন অসামান্য প্রতিভাশালী যুবক সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রকে তন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া যে অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা তিব্বতবাসী লোকেরা নতমস্তকে শুনিয়া, তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম বৌদ্ধ বিশ্বের সর্ব্বত্র সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারিত হইতেছে। কখনও দেখিতে পাইয়াছি যে, বিক্রমপুরবাসী আজন্মকুমার ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রধান শীলভদ্রকে নালন্দার শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণ তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া চন্দন তিলক পরাইয়া দিতেছেন এবং সেই বৃদ্ধ আচার্য্যের পাদমূলে বসিয়া ইয়ানুসাঙ্ প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। কখনও দেখিতে পাইয়াছি, যেন বজ্রাচার্য্যগণ ও বজ্র-যোগিনীরা নানা তন্ত্র-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া অসামান্য শক্তি ও পাণ্ডিত্যে সমগ্র দেশকে চমৎকৃত করিয়া জবামাল্য ধারণ পূর্ব্বক দীপঙ্করের জন্মস্থানে বিশাল মন্দির স্থাপন করিতেছেন। তাহাতে যোগিনীরা বজ্র-মতে তন্ত্রসাধনা করিয়া এরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন যে, সেই স্থান বজ্রযোগিনী আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব কতবার কতস্থানে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন ময়মন-সিংহের গড় জরিপার পত্তন হয় নাই, যখন একডালার অস্তিত্বই ছিল না, যখন রামপাল স্বীয় পুত্রত্যাগ দ্বারা ন্যায় ও সত্যব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখান নাই, এক কথায় যখন সেনবংশ ও পালবংশের নাম জগতে উচ্চারিত হয় নাই, কল্পনানেত্রে দেখিয়াছি সেই অতীত যুগে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্-অশোক-প্রেরিত দূতেরা বংশাই নদীর তীরে 'ধর্ম্মরাজিকা' স্থাপন করিতেছেন। সেই অশোকস্তম্ভ দর্শন জন্য দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিতেছে, সেবা ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম ও যজ্ঞ ত্যাগের ধর্ম্ম শুনিয়া তাহারা নূতন তথ্যের আলোকে আলোকিত হইতেছে। সেই ধর্ম্ম-রাজিকা বা ধামরাই গ্রাম বাজাসন বিহারের অদূরবর্ত্তী।

আমি যাহা বলিলাম, তাহাদ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহি যে, শুধু প্রস্তরলিপি কুড়াইয়াই আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব না। অতীত যুগ যেন আমাদের চক্ষে কেবলই পাষাণ না হইয়া যায়। তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আর কি হইল!

ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে প্রাচীনকালের কলাশিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন বহুবিধ মন্দির, ইষ্টকগৃহ ও প্রস্তর-খণ্ড পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছু নিদর্শন আপনারা ঢাকা মিউজিয়ামে স্থাপন করিয়াছেন। দেববিগ্রহের সংখ্যা নাই। দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর বৌদ্ধ তারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে ধ্যানী বুদ্ধ, হরদুর্গা, সরস্বতী, শ্রী, সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্য্য এবং গণেশাদির প্রস্তরমূর্ত্তি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। আপনারা সেই সকল মূর্ত্তির ইতিহাস জানিতে ব্যস্ত। মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সন, তারিখ, তাহার নাম, এবং খুব বেশী হইলে পূজার ধ্যানটি জানিতে পারিলেই Societyর journalএর জন্য একটা বড় প্রবন্ধের খোরাক হয়। তাহার পর দেবতারা মিউজিয়ামের এককোণে বিশ্রাম-সুখ লাভ করুন, তাহাদের আর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। দৈবাৎ আবার কোন কলাশিল্পের অনুরাগী বিশেষজ্ঞের পরিদর্শন উপলক্ষে বিশুদ্ধ শিল্প ও ইতি-হাসের অনুরোধে এই বিশ্রামাগার আক্রান্ত হয়, এবং বিগ্রহদিগের গাত্রসঞ্চিত ধূলি মার্জ্জিত করিয়া গজকাটির দ্বারা তাহাদের নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির মাপ গ্রহণ করা হয়।

দেববিগ্রহের সঙ্গে আমাদের এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। সামুদ্রিক অদ্ভুত আকারের কোন শম্বুক বা কোন প্রস্তরী-ভূত কঙ্কাল যেরূপ জীবজগতের ইতিহাসের কোন একটা বিশেষ যুগের তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করে এই সকল বিগ্রহ আমাদিগকে অনেক সময় প্রাচীনকালের কল্পনাশক্তির সেইরূপ একটা বিশেষ স্তর বা পর্য্যায় বুঝাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে একদিন কলিকাতা সাহিত্যপরিষদ্ গৃহে জনৈক বিখ্যাত কীর্ত্তনওয়ালার কীর্ত্তন হইতেছিল। দেখিতে পাইলাম

পরিষদের বিশাল গৃহের স্তম্ভে স্তম্ভে ফুলমালা ঝুলিতেছে এবং কীর্ত্তনীয়া শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পদাবলী গাহিতেছেন। বহুবিধ বাসুদেবের মূর্ত্তির দিকে পিছন ফিরিয়া কীর্ত্তনীয়া গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিলেন। হায়, যাঁহাদের জন্য এক সময়ে অম্বরচুম্বী বিশাল মন্দির উত্থিত হইয়াছিল এবং মন্দির শোভা সম্পাদনের জন্য শত শত শিল্পী খাটিয়াছিল, যে দেবতার ভোগের জন্য শত শত গ্রামের উপস্বত্ব নিয়োজিত ছিল, এবং বহু উদ্যানের অজস্র পুষ্পসম্ভারে যে দেবতার কণ্ঠমালা গ্রথিত হইত, যাঁহাদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়ার দল নতজানু হইয়া সাষ্টাঙ্গে গান গাহিয়া কৃতার্থ হইত, হয়ত যাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সময়ে শত শত ভক্তহৃদয়ের রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, আজ সেই সকল হতভাগ্য বিগ্রহকে কীর্ত্তনীয়ারা পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতেছে। বিশাল গৃহের স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পমালা ঝুলিতেছে দেখিলাম, কিন্তু হতভাগ্য বিগ্রহের দিকে ভুলক্রমেও কেহ একটি পুষ্প ছুঁড়িয়া ফেলে নাই।

হ্যাভেল্ সাহেব এই সকল মূর্ত্তির প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। যে জাতি আনন্দময়কে চাহিয়াছে, যে জাতির ঋষি ব্রহ্মানন্দ বুঝিয়া ছিলেন, সেই জাতির ভক্ত-শিল্পী এই সকল মূর্ত্তি গড়িয়াছিল। তাহারা যখন মূর্ত্তি রচনা করিত, তখন তাহারা জানিত যাঁহাকে তাহারা গড়িতেছে, তিনি তাহাদের আরাধ্য; তাহারা ভক্তির সহিত খুঁজিত এবং বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক কোন সাধ্যাতীত মানববুদ্ধির অগম্য মহাশক্তিকে দৈববলে বলী হইয়া লোক চক্ষুর গোচর করিতে প্রয়াসী হইত।

এই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পাথরে দেবভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। শান্ত নিশীথে পঞ্চপ্রদীপের আলো জ্বালিয়া ধূপধুনা ও পুষ্পবাস সহকারে একাকী এই প্রস্তরমূর্ত্তির কোন একটির সন্নিহিত হইবেন, হয়ত দৈবকৃপায় এই উপেক্ষিত বাসুদেবের অধরে অনাবিল কুসুমকোরকের মত, স্বপ্নবিভোর অপোগণ্ড শিশুর হাসির ন্যায় এক নির্ম্মল আনন্দের ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। চারিদিকে যোগী ও সিদ্ধপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া ভক্ত-শিল্পীর হস্ত সেই অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের আভাস প্রস্তরে ফলাইতে পারিয়াছিল। সেই এক ফোটা আনন্দের জন্য সম্রাট্ তাঁহার হীরকখচিত মুকুট নামাইয়া নতজানু হইয়া মন্দিরের দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেন এবং তাহারই কিরণে শত শত ভক্তের হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হইয়া যাইত।

আমি হিন্দুর সুরে এই কথা বলিয়া সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত দেখাইতেছি এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। যে সৌন্দর্য্য অপার্থিব ধ্যানে পরিকল্পিত হইয়াছে, জগৎ তাহার পূজক। ম্যাডোনার চিত্র দেখিয়া যিনি বিশ্ব-জননীকে না দেখিয়াছেন, ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষের মুখ দেখিয়া যিনি ভালবাসার অসীম শক্তি ও ক্ষমার পাঠ না পড়িয়াছেন, তাজমহল দেখিয়া যিনি বিরহের অমর অশ্রু প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। আপনারা মিউজিয়মে প্রবেশ করিয়া একথা ভুলিয়া যাইবেন না যে, এই মিউজিয়াম শত শত বিচিত্রগঠন দেবমন্দিরের পবিত্র কার্য্যের ভার লইয়াছে। যে দ্বার দিয়া আপনারা সেই গৃহে ঢুকিবেন, সেই দ্বারাদেশ একদা ভক্তিগঙ্গা নিজে আসিয়া প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন। শত শত চক্ষু একদা অশ্রু প্রবাহের ভিতর দিয়া যাহা দেখিয়াছিল, আজ কি তাহা শুধু সকৌতুক দৃষ্টির গ্রাহ্য? আমি এই মাত্র বলিতে চাই, প্রাচীন ভক্তির পথকে আপনারা স্পর্দ্ধার পদক্ষেপে বিদলিত করিয়া যাইবেন না।

প্রাচীন ইতিহাসের মন্দিরে বিনম্রভাবে প্রবেশ করিবেন, প্রাচীন কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহা হইলেই শুধু মৃদুস্বরে তাঁহার গুপ্ত মন্ত্র বলিয়া দিবেন, সেই মন্ত্রে নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের পরিচয় হইবে। তখন বুঝিবেন, প্রাচীন প্রস্তরীভূত জীব-কঙ্কাল নহে, শত শত কোমলস্বরে আপনার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে এবং দেখিতে পাইবেন প্রাচীনেরা যে পুষ্প ও ফলের ডালি লইয়া দেবতার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বাসি হইয়া যায় নাই।

কষ্টিপাথরের শত শত বাসুদেব মূর্ত্তি বিক্রমপুর অঞ্চলে সুলভ, বাসুদেবের এক সময় পূর্ব্ববঙ্গে অবাধ অধিকার

ছিল এই সকল বিগ্রহ দৈবদুর্ব্বিপাকে ভগ্ন হইয়া গেলে উজ্জ্বল কাল পাথরের আরাধ্য মূর্ত্তির জন্য এদেশবাসীরা একবার করুণস্বরে কাঁদিয়াছিলেন। যাহা কিছু কাল, তাহাই তাহাদের আরাধ্যের স্মারক হইয়াছিল। তাই ভক্তগণ মেঘ দেখিয়া কাঁদিতেন, তমাল দেখিয়া আলিঙ্গন করিতেন এবং যমুনার জলকে কালোর রাশি ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে যাইয়া পড়িতেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কাল, কিন্তু কাল কষ্টিপাথরে তাঁহার বর্ণ মাহাত্ম্য যত সুন্দর হইয়াছিল, বুঝি আর কিছুতেই তাহা হয় নাই। এইজন্য কৃষ্ণবর্ণের মাধুর্য্য বাঙ্গালার পদাবলী ভরা। সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধরণের পদ সুলভ নহে।

প্রাচীন ইতিহাসের পথে কতকটা প্রাণ, কতকটা ভক্তি লইয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। এ পথে শুধু কঙ্কর তুলিয়া গবেষণা করিলে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রাণে আঘাত লাগিবে, অন্ততঃ এ দেশবাসীর পক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আমাদের রক্ত যাহাদের রক্ত হইতে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহারা যেখানে শির নত করিতেন, সেখানে মাথা উচু করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত গবেষণা জালবিস্তৃত করিলে দেশের ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য আমাদের অনধিগম্য হইয়া থাকিবে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগুলি যাহা ছিল, এখন কি তাহাই আছে? আমি বহুদিন দেশে আসি নাই, আমি বিদেশে অনেক সময় যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া দেশের কথা স্মরণ করিয়াছি। আমি বিদেশে কোন কোন স্থান দেখিয়াছি, ভ্রাতাকে এক মুষ্টি অন্ন দিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর মনে করেন তিনি তাহাকে ঋণজালে আবদ্ধ করিতেছেন। কনিষ্ঠ সহোদর চোরের ন্যায় ভয়ে ভয়ে সেই অন্ন গলাধঃকরণ করিতেছে; আরও দেখিয়াছি, পিতা বাড়ীর সরকারের ন্যায় উপার্জ্জনশীল পুত্রের কথায় কথায় তাড়া খাইতেছেন এবং পরিবার অর্থ শুধু স্ত্রী পুত্র কন্যা বুঝাইতেছে। তখন পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী মনে পড়িয়াছে; যেখানে ভ্রাতা ত দূরের কথা, শ্রীদাম সুদাম সখারাও ভ্রাতার মত স্নেহাদর পাইতেন; যে বৃন্দাবনে পর কেহ ছিল না। যে যেখানে রাত্রি উপস্থিত হইত, সেইখানেই প্রতিবেশিনী মা হইয়া তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন এবং পুত্রগণের সঙ্গে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতেন; যেখানে গুরুজনের প্রীতি অবাধ ছিল, স্নেহের পাত্র রোগে পড়িলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা চলিয়া যাইত, কিন্তু তাঁহারা তিরস্কার কিংবা প্রহার করিতে ভয় পাইতেন না; যেখানে অতিথিগণ সামান্য ত্রুটীতে চটিয়া উঠিতেন এবং চলিয়া যাইবার ভয় দেখাইতেন, তাহাতে গৃহস্থ আড়ষ্ট হইয়া পড়িত। যেখানে গৃহিণী দিনান্তে আহার করিতেন, এমন সময়ে অভুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, হাসিমুখে তাহাকে ভাতের থালা ছাড়িয়া দিয়া নিজে উপবাসী থাকিতেন; যেখানে নন্দীভৃঙ্গীর ন্যায় ভৃত্যেরা গৃহস্থের ঘরে আধিপত্য করিত এবং কর্ত্তা মনে করিতেন না যে, তিনি তাহাদের প্রভু ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, এক বই দুই প্রতিপালকের অস্তিত্ব কেহ স্বীকার করিত না। যেখানে দিনান্তে যখন কোন মন্দিরে কাঁসর ও শঙ্খ বাজিয়া উঠিত, তখন শিশু যেরূপ মায়ের কোলে যাইতে ব্যস্ত হয়, তেমনই ব্যগ্রতার সহিত লোকে আরতি দেখিতে ছুটিত; যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল, কিন্তু ভেদবুদ্ধি ছিল না; ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রণাম পাইয়া মনে করিতেন না যে, তিনি মস্ত বড় হইয়া গেলেন এবং শূদ্র মনে করিত না যে প্রণাম করিয়া সে ছোট হইয়া গেল; যেখানে মুসলমানগণ হিন্দুর হুকায় টান দিতে না পারিয়া মনে করিতেন না যে, হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেছেন এবং হিন্দু, পীরের সিন্নি দিয়া মনে করিতেন না যে, তাঁহারা অধর্ম্মের কাজ করিতেছেন; যেখানে রাজা মহারাজ একত্র হইয়া উৎসব করিতেন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি দরিদ্র চাকরকে শুধু bearer অথবা boy বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না। বিদেশে অনেক স্থানে এই সকল ভাবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় দেখিয়া মনে হইয়াছে, হায় আমার জন্মভূমিতে যাইয়া বোধ হয় এই সব দৃশ্য দেখিব না! বুঝি বা আমাদের বৃন্দাবন পূর্ব্বের মতই আছে। আমি অনেকদিনকার

খবর জানি না, তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, সেই অনাবিল স্বর্গীয় ভাব এখনও আছে কিনা! যদি না থাকে তবে সে বড় দুঃখের কথা! চন্দ্রাবলীর কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া মথুরায় কৃষ্ণ একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমি আর কি ব্রজ তেমন পাব?" বহুদিন প্রবাসে থাকিয়া স্বীয় পল্লীতে ফিরিবার সময় সকলেরই মর্ম্মে মর্ম্মে এই সুর বাজিয়া উঠিবে—"আর কি ব্রজ তেমন পাব?" আর কি তথায় সেই দশহরার দিনে সমাজের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সাড়া পাইয়া থাকে? বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ একত্র হইয়া সেইরূপ প্রীতির ভাবে গা ঢালিয়া থাকে? এবং সমাজে কি দোলোৎসবে আবির ও কুঙ্কুম লইয়া নর নারী এখনও সেইরূপ আনন্দচ্ছটায় আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন! আর কি মহোৎসবের দিনে বিনা নিমন্ত্রণে শত শত দরিদ্র গৃহস্থের অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিয়া উদর তৃপ্তি করিতে পারে? আর কি তথায় পরের মাতারা নিজের মাতার মত স্নেহ আদর দেখাইয়া থাকেন? আর কি সধবার ললাটে সেইরূপ উজ্জ্বল বড় সিন্দুরের ফোটা দেখিতে পাব? আর কি শুধু শাঁখার গৌরব রত্নচূড় ও হীরকবলয়ের গর্ব্বকে ছাপাইয়া উঠিয়া থাকে? আর কি তুলসীতলায় শ্যামসন্ধ্যায় স্নিগ্ধ দীপালোকে সধবার মাথার সিন্দুরের দাগ পড়িয়া তাহা কোমল রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করে? আর কি শুদ্ধস্নাতা বিধবারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ করিয়া উপবাস ও বিবিধ কষ্ট সহ্য করেন?—এবং কথকতার পুণ্য পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া বধূগণ সজল চক্ষে ত্যাগ ও সতীত্ব ধর্ম্মের জন্য তেমনই লালায়িত হন? বিবাহ-বাসরে দুর্গোৎসবে আর কি করুণস্বরে তেমনই নহবৎ বাজিতে থাকে এবং শরৎকালে আগমনী গান ও শেফালিকা সম্পাতে পল্লীকে আবেশে উন্মাদিত করে? "আর কি ব্রজ তেমন পাব?" এই সুরের রেশ আমার কাণে এখনও বাজিতেছে। বড় ভয় হয়, বড় আশঙ্কা হয়, বুঝি এই সকল পাইব না; তবে কুবেরকে কি রিক্তহস্তে দেখিতে আসিয়াছি অথবা বীণাচ্যুত নারদ ও গাণ্ডীবহীন পার্থের নিকটে আসিয়া শুধু মহত্ত্বের শোকান্ত পরিণাম দেখিয়া যাইব? সেই পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী যে আমাদের স্বপ্নের বিলাসস্থল, আমার চক্ষে নববৃন্দাবন তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন দেখিয়া ছিলাম এখন কি তেমনই আছে? যদি না থাকে, তবে বলুন সেই আনন্দ ও ত্যাগের পরিবর্ত্তে আপনারা কি দিয়া আপনাদের পল্লী উজ্জ্বল করিয়াছেন? যদি দুর্গোৎসব তেমন ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত না হয়, উপাসনা ও ধ্যানধারণার আগ্রহ কি বাড়িয়াছে? দোলোৎসবের পরিবর্ত্তে মাঘোৎসব বা অন্য কোন ধর্ম্মের উৎসব কি সেইরূপ সার্ব্বজনীনতা লাভ করিয়াছে? দেবমন্দির যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তবে কতগুলি ভজনাগার গড়াইয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন? যদি বারমাসের তের পার্ব্বণ বিদায় দিয়া থাকেন, তবে ছেলেদের আনন্দ ও শিক্ষাদিবার জন্য কি কি নূতন উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলুন? আনন্দহীন হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। রমণীরা যেখানে দিন রাত্রি সীতা সাবিত্রীর কথা লইয়া কাঁদিতেন, ঠাকুর সেবার জন্য নৈবেদ্য সাজাইতেন ও চন্দন ঘষিতেন, এখন কি কুন্দনন্দিনীর কাহিনী পড়িয়া তাহারা তেমনই পবিত্র হইতেছেন? তাঁহাদের আলপনা দেওয়া এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করার ক্ষমতা ও শিক্ষা যদি নষ্ট হইয়া থাকে, তবে কি শুধু লেসবুনন করিয়া কি তাঁহারা আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছেন? যেখানে বিধবারা এককালে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন ও চিরকর্ম্মঠ ধর্ম্ম-জীবনের পথে অবিরত সমাজের প্রশংসা পাইয়া উৎসাহিত হইতেন, সেখানে সেই উৎসাহবিচ্যুত ও একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা শিক্ষা প্রদান অথবা শিল্পপটুতা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন কি, না একান্তরূপে নির্ভরতাশূন্য ও আধ্যাত্মিক জীবনে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছেন? এক কথায় আমরা কেবলই ভাঙ্গিতেছি না ভাঙ্গিয়া কিছু গড়িতে পারিতেছি?

আমরা প্রাচীন সামাজিক প্রীতির ভাব ও উৎসবের স্থলে একটা নূতন জিনিষ পাইয়াছি—তাহা জাতীয়তা। আমাদের ছেলেরা এখন জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত। এই জাতীয়তা জিনিষটা কি তাহা আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

যেরূপ গণিতশাস্ত্র শিখিতে হইলে এক দুই তিন প্রভৃতির গণনা দ্বারা শিক্ষা সুরু করিতে হয়, শাস্ত্র ও কাব্য পড়িবার পূর্ব্বে ক, খ, গ পড়িতে হয়, সেইরূপ সমগ্র দেশটাকে আপন বলিয়া চিনিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক শিক্ষা অভ্যাসের দরকার। ভগবান্ যে আঙ্গিনা আমাদের প্রথম লীলাক্ষেত্র করিয়া গড়িয়াছেন, তাহার শিক্ষা প্রথমে কতকটা সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যে স্থানে প্রথম আসিয়া পৌঁছিলাম ও দেখিলাম প্রেরণ-কর্ত্তা রাশি রাশি কর্ত্তব্যের মধ্যে আমাদিগকে ফেলিয়াছেন, সেই গুলির মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। চক্ষু মেলিয়া যে করুণার মূর্ত্তি প্রথম দেখিয়াছিলাম যাঁহার হৃদয়ের পীযুষ আমাদিগকে অমর করিয়াছে, যিনি রক্ষাকর্ত্রী ভগবতী হইয়া আমাদিগকে পালন করিয়াছিলেন, সেই জননীকে ভক্তি করিতে না শিখিয়া দেশের কল্পিত মূর্ত্তি দাঁড় করিয়া তাহার পদে অর্ঘ্য দেওয়া বাতুলতা নয় কি? 'আমার দেশ' আমার দেশ বলিয়া যে চীৎকার করিতেছি, সে দেশ জিনিষটা কি? কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে অশ্রদ্ধা করিতেছে; পিতামাতাকে পূজা করিতে ভুল হইতেছে; গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেছি; পল্লী সম্বন্ধে যে স্নেহডোরে সকলে ভাই ভাইয়ের মত বাঁধাছিলাম, সেখানে হিংসা দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণের সে নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, সে ত্যাগ নাই, তথাপি তিনি জাতির মাথায় উঠিয়া থাকিবেন; অপরাপর শ্রেণীরা ব্রাহ্মণকে ডিঙ্গাইয়া গায়ের জোরে একটা স্থান গড়িয়া লই-বেন; সমাজের সর্ব্বত্রই হিংসা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। যাহা এক ছিল, তাহা আমরা শতখণ্ড করিতেছি; যাঁহারা এক ছত্রের নীচে ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ একটা ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া কাহারও কোন খাতির রাখিবেন না। এই যদি আমাদের অবস্থা হইয়া থাকে, তবে দেশ দেশ বলিয়া আমরা চীৎকার করিতেছি, সে দেশটা কোথায়? বোম্বে বা কাশ্মীরে যাইয়া অপরিচিতের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আসিলেই কি সৌভ্রাত্র স্থাপিত হইল? না উত্তরে অম্বরচুম্বিত হিমাচল ও দক্ষিণে নীলাঞ্চলনিভ সাগরের কথা বলিয়া গান বাঁধিয়াই কি আমরা দেশটা পাইলাম? আমরা দেশের প্রতি কি ভালবাসা দেখাইয়াছি যে, এই মহারাজ্যটা এক করিয়া ফেলিবার মত আমাদের বলসঞ্চয় হইয়াছে? এই নিদাঘতাপে তাপিত পল্লীগুলি জলাভাবে স্থলোদ্ধৃত মীনের ন্যায় ধড়্ফড়্ করিতেছে, আমরা কি দেশের লোকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কূপ খনন বা পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দিতেছি? প্রাচীন পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করিবার চেষ্টা ও আমাদের নাই। আমরা কি নিরন্ন লোকদিগকে মহোৎসবে ডাকিয়া খাওয়াইয়া থাকি? কিংবা অতিথি অভ্যাগতদিগকে অকপটভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদ্যোগী হই? উৎসবের আনন্দ কি আমরা পল্লীবাসী গরিব ও ধনী এক হইয়া উপভোগ করি? দেশকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেরূপ আপন করিয়াছিলেন, আমরা কি তাহাই করিতে পারিয়াছি? মোটকথা, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে সমস্ত সমাজের ভিতর বিলাইয়া দিয়াছিলেন, দুষ্ট অহমিকাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া তৎস্থলে ভগবানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা দুষ্ট অহমিকাকে আশ্রয় করিয়া আত্মাভিমান স্ফীত করিয়া বাড়িয়া উঠিতে চাহিতেছি মাত্র। এদেশ বৌদ্ধ জৈন, ও বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাশ্রিত। এদেশ হিংসামূলক জাতীয়তা-অভ্যাস করা শেখে নাই। এদেশের যাহা কিছু গৌরব অহিংসা ও প্রেমের কথা লইয়া; যে দেশ ২৩ জন তীর্থঙ্করের পদধূলিতে পবিত্র, যে দেশ হইতে কপিলাবস্তু অদূরবর্ত্তী, যে দেশের নবদ্বীপ ভক্তিগঙ্গায় সকলকে ডুবাইয়া দিয়াছে, যে দেশে চণ্ডীদাস গোবিন্দ-দাসের সুরে ভগবদ্ভক্তির অলকনন্দা বহিয়া যাইতেছে, সে দেশে ভক্তি-প্রেম-বিবর্জ্জিত তেজের বাড়াবাড়ি

কখনই টিঁকিবে না। হায়, বসোরা যদি মনে করে গোলাপ অতিছোট, অশ্বত্থ অতি বড়, এই ভাবিয়া যদি গোলাপের চাষ উঠাইয়া দিয়া অশ্বত্থের বীজ বপন করে, তবে বসোরার সে কি দুর্গতি। নারদ যদি বীণা ছাড়িয়া গাণ্ডীব ধরেন, তবে নারদের কি দুর্গতি!

এ দেশ চিরকালই বড় কথা কহিয়া আসিয়াছে। আমরা যাহা পরম মঙ্গলকর, সেই সাত্ত্বিক ধর্ম্মের কথাই বলিব। মনে করিবেন না, এই সকল কথা মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়, তাহা ব্যবহারে লাগে না। আমরা অবশ্যই বলিতে পারি, আমরা সত্যবাদী ও চরিত্রবান্ হইব; যেখানে ভক্তি দেখান দরকার সেখানে মাথা উচু করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইব না; যেখানে দুঃখ কষ্ট, সেখানে আত্মপর ভুলিয়া সেবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিব; নিজের দুঃখের কথা সারাদিন ভাবিব না; সে ভার ভগবানের উপর দিয়া পরের দুঃখের কথা ভাবিব; জীবের সেবা করিয়া ধন্য হইব; ইন্দ্রিয়ের হস্তিগুলি সংযমের শিকলি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিব এবং সারাদিন কর্ম্ম করিয়া বধূ যেমন দীপ হস্তে নিশীথে শয্যাগৃহে গমন করিয়া দয়িতের পদে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ পরিশ্রম-ক্লান্ত-দেহ প্রতিদিন দিবাবসানে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দিব। স্পর্দ্ধার সহিত জাতিটা গড়িতে চেষ্টা করিব না, প্রত্যেকে যদি বিশ্বাসী চরিত্রবান্, সংযত ধর্ম্মভীরু হই, তবে জাতি আপনিই গড়িয়া উঠিবে। আমরা যদি মারিতে কাটিতে না পারি, তবে আমাদিগকে বিপদের দিনে কে রক্ষা করিবে? এই প্রশ্ন অনেকে করিয়া থাকেন, ঐ যে শেফালিকা তরুটি অজস্র ফুলদান করিয়া প্রভাতে রিক্তহস্ত হয়, সারাদিন কুঁড়িগুলি ফোটে, এবং প্রাতঃ সমীরণের সঙ্গে আবার নিজের সর্ব্বস্ব পরকে বিলাইয়া দিয়া সেবা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখায় উহাকে যিনি রক্ষা করেন, আমাদিগকেও তিনিই রক্ষা করিবেন। যখন মাতৃগর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ট হয়, তখন তাহার মত নিঃসহায় কে থাকে? কিন্তু কে তাহার জন্য মাতৃ-অঙ্কে সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছেন? কে অমৃতনিভ দুগ্ধধারপূর্ণ স্তন তাহার মুখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের এক একটি বৃক্ষের নিম্নে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়া কিঞ্চিন্যূন শত বৎসরের দীর্ঘ আয়ু কাটাইয়া দিয়াছেন। কে সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল? শুভকর্ম্মে নিরত থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব "দিশোভুজ সহস্রেষু ব্যাপ্ত-লোকত্রয়ং স্থিরা" জননীর আয়ুধমণ্ডিত সহস্র হস্ত সেই জীবন রক্ষার জন্য দিকে দিকে প্রসারিত আছে।

কিন্তু শুভকর্ম্ম করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু হয়, তবে সে মৃত্যুতে লোক অমর হইয়া থাকে। কোন্ দিন দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল এক দেবপুত্র নিষ্ঠুরভাবে হত হইবার সময় বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, ইহারা না বুঝিয়া আমাকে মারিতেছে, তোমার অবোধ সন্তান-দিগকে ক্ষমা কর", সে কথা এখন ও সমস্ত সভ্যদেশের বিজয়কিরীটের মত, আশীর্ব্বাণীর মত পবিত্র হইয়া আছে। নেপোলিয়নের বীর-দাপ, ইজিপ্টের পিরামিড্ এই বাক্যের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ। এদেশে ক্ষমার কথা বল, সংযমের কথা বল, দানের কথা বল, কীর্ত্তনের জন্য মৃদঙ্গ লইয়া আইস, দেখিবে, বন্যার মত ভাবের স্রোতে দেশ ডুবিয়া যাইবে। শুভকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে কে রক্ষা করিবে, এই ভাবিয়া আকুল হইও না; প্রত্যেক শুভচিন্তা, প্রত্যেক শুভকার্য্যের পশ্চাতে বিশালশক্তি আছে। কোথা হইতে সাহায্য আসে, মানব-বুদ্ধির অগোচরে কে বিপদের দিনে রক্ষা করে, শূন্য থলি ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শীরাও ভাবিয়া পান না। আমরা ভাবি আমরা একক, এই জন্যই না আমাদের এত ভয়। ওরে ভ্রান্ত, তুমি একক নহ, তুমি নিঃসহায় নহ, তুমি দুর্ব্বল নহ, তুমি ক্ষুদ্র নহ, এই সত্যে বিশ্বাস কর; শুভ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া প্রতিপদে সহায় পাইবে। 'যাহাকে কেহ দেখে নাই, তাঁহার ছায়া চক্ষের সমক্ষে ভাসিবে, তিনি হস্তে সামর্থ্য দিয়া যাইবেন, হৃদয়ে বল দিয়া যাইবেন; তাঁহার প্রীতির কার্য্য যে করে সে অপোগণ্ড শিশুর মত দুর্ব্বল

ও ক্ষুদ্র হইলেও ধরিত্রী স্বয়ং মা হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন।

কর্ম্মের প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যদি অগ্রসর হই, তবে আমাদের নিরীহতা বা কোমলতার জন্য লজ্জিত হইবার কারণ নাই। যে বিশ্বে অসিধার-পত্র দৃঢ় পার্ব্বত্য-তরু স্পর্দ্ধা সহকারে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বিশ্বে কি যুঁই ফুলটি একটু স্থান পায় নাই? কে ভাল, কে মন্দ, কে বড়, কে ছোট, তাহার বিচারের দরকার নাই। আমার নিজের বিশ্বাস যুঁই কি মালতী ফুল, যাহার প্রকৃতি আত্মদান, উহা ক্ষুদ্র হইয়াও বড়। কীটের দাঁত, ঝাপ্‌টা বাতাস, এমন কি শিশুর হাত হইতে আত্মরক্ষার সামর্থ্যও ত তাহার নাই, তথাপি এমনই অম্লান সৌন্দর্য্যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে সাজাইয়া রক্ষা করিতেছেন যে, ঐরূপ নিষ্কলঙ্ক সুন্দর জীবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তেজের দ্বারাই কি সর্ব্বত্র আত্মরক্ষা হইয়া থাকে? এমন যে কাইসর, তিনিও নিজের তেজে পুড়িয়া মরিতেছেন। সিজর, নেপোলিয়ন, কেহই তেজের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। বরং যদি বিশ্বাস থাকে, আমি বিপদে পড়িলে জগতেই আমার রক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চিত আছে, তবে নিজের উদ্দাম সংহারশক্তি উদ্বোধিত না করিলেও চলিতে পারে। এই ভক্তিপ্রেম ও দয়ার ক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি পরপীড়ন ও পরদুঃখদায়ক কর্ম্ম করিব না। এখানে অশোক মহারাজের এত বড় কলিঙ্গ বিজয়ের গৌরবটাও ছোট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কলিঙ্গ-বিজয়ে যে রক্ত-পাত হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি যে অনুতাপাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা পাষাণের গাত্রে অমর হইয়াছে ও অশোকস্মৃতি অপূর্ব্ব মধুরিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি পরের সেবায়, পরের সুখের জন্য আত্মনিবেদন করিয়া দিব। যিনি এত বড় জগৎটা রক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে আমি নির্দ্দিষ্ট অন্নজল পাইব। কিন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, এ দেহ যাইবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তথাপি আমি আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ ভারটা নিজের মাথায় লইয়া কেবলই জীবনটা খড়্গ শাণিত করিয়া কাটাইব, এরূপ বিড়ম্বনা যেন ভোগ না করি। যদি একটি কুষ্ঠগ্রস্ত বা অন্ধের পার্শ্বে বসিয়া তাহার দুঃখের ভার স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার একবিন্দু অশ্রুও মুছাইতে পারা যায়, তবে তাহাতে কি জীবনের অন্ততঃ কতকটা সার্থকতা হয় না! যে স্থানে বজ্র আছে, বিদ্যুৎ আছে, তীক্ষ্ণবিষ গোক্ষুর সর্প আছে—ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রের তাণ্ডব লীলায় সংহার কার্য্য চলিতেছে, সেই স্থানে—তাহাদিগেরই পার্শ্বে, সেই বিপজ্জাল বেষ্টিত হইয়া শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া আছে,—ক্ষুদ্র কামিনী, জাতি, যুথি, গোলাপ, তাহাদের অমৃতময় জীবনের গন্ধ বিতরণ করিয়া ও রূপ দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা কি সহস্র বিপদ্ সত্বেও এই ভাবে শুধু দয়া ও সেবার মহিমায় মণ্ডিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না? এই ধর্ম্ম পবিত্র গঙ্গাধারার কুলুকুলুর ন্যায় আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ইহার নাম আত্মদান—আত্মপ্রতিষ্ঠা নহে। ইহা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে, ঘরে ঘরে জননীরা এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছেন; ইহা বক্তৃতা নহে,—ইহা মন্ত্র; ইহা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা নহে,—ইহা জীবনব্যাপী সাধনা; ইহাতে সংস্কারকের আস্ফালন নাই, কিন্তু ইহা বিনয় সহকারে গুরুর উপদেশ প্রতীক্ষা করে; ইহা পরকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস নহে, পরকে আপন করিবার বাঞ্ছা; ইহা ইহকালের কীর্ত্তিলোলুপ নহে, ইহকালের সঙ্গে পরকালের প্রীতিস্থাপন; ইহা জাতীয়তা নহে, সার্ব্বভৌমিকতা। এই ধর্ম্ম আমাদের সাধুরা শিখাইয়াছেন, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আমরা বাহিরের কোলাহল শুনিয়া এই ধর্ম্মের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার দশদিক্ ব্যাপী প্রলোভন-রূপ দুষ্ট দশাননের হাতে ধরা পড়িব। হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে এই ধর্ম্মের অমৃত ভাণ্ড লইয়া হয়ত অদৃশ্য-ভাবে যোগিবর বসিয়া আছেন, তিনি সুবিধার প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন সমস্ত জগতে সেই অমৃত বিতরণ করিবেন। ইন্দ্রিয় বিভ্রমে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া—

ইষ্টের অনুসন্ধানে বিফলকাম, পরিশ্রান্ত-পিপাসু জগৎ যখন তাহা চাহিবে, তখন সেই মহাদান আরব্ধ হইবে। তখন ভারতবর্ষরূপ পুণ্যতীর্থে আমরা যোগিবরের সেই অমৃতভাণ্ডের যেন সেবাইত হইতে পারি।

পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার এই অভিভাষণ শেষ করিব। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানগণের সংখ্যাই বেশী; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা জাতীয় গৌরব ও শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও একান্ত উদাসীন। অধুনাতন ভারতবর্ষ বিশেষভাবে মুসলমান-কীর্ত্তি-চিহ্নিত। পূর্ব্ববঙ্গের এমন কোন্ নগর বা বৃহৎ পল্লী আছে, যেখানে অস্তমিত হিন্দুগৌরবের শিখরদেশে সমুজ্জ্বল মোস্‌লেম কীর্ত্তির সুপ্রকাশ হয় নাই? প্রতি পল্লীতে মন্দিরের পার্শ্বে মস্‌জিদ আকাশ স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে! কত রাজ প্রাসাদের বক্ষে মুসলমানগৌরব-বিঘোষী প্রস্তর-লিপি অঙ্কিত হইয়াছে! কত পল্লীর হিন্দু নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহারা মুসলমানী নামে পরিচিত হইয়াছে। ঢাকা মস্‌লিনের ন্যায় কত শিল্পকলা মুসলমান বাদসাহ ও ওমারহগণের আশ্রয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান চক্ষুঃ উন্মীলন করা মাত্র এদেশের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদের বিজয়দৃপ্ত পূর্ব্বপুরুষগণের সংবাদ পাইবেন,—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অটল বিশ্বাসে গড়া একেশ্বর-বাদের মহিমা প্রস্তরে প্রস্তরে অঙ্কিত দেখিতে পাইবেন। হিন্দুগণ স্বভাবতঃই বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিতে বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। মুসলমানগণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ তাঁহাদের কীর্ত্তি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু এই রাশি রাশি প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের উদ্ধারের কল্পে মুসলমানগণ এপর্য্যন্ত অতি সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন। অম্বরচুম্বী মস্‌জিদচূড় আকাশের মেঘের কাছে তাহার দুঃখেরবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে; মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্যবাহী প্রস্তর ফলকের উপর নিরুদ্বেগে বসিয়া গ্রাম্য কৃষক তাম্রকূট সেবন করিতেছে; নবাব এবং বাদসাহদের ভগ্ন প্রাসাদ বাদুর ও পেচকের স্বরে নিনাদিত হইতেছে। প্রাকারবেষ্টিত কত দুর্গের অভ্যন্তর ভূমি হলচালনার ফলে শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। যে বিজয়কাহিনী একদা সমস্ত প্রদেশে উচ্চবাদ্যরবে বিঘোষিত হইয়াছিল, ধরিত্রী সে কথা বক্ষের মধ্যে সংগোপন করিয়া রাখিয়াছেন; কারণ সেই কীর্ত্তিমানদিগের বংশধরেরা তাহা শুনিতে চাহেন না।

যাঁহারা স্বীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার ভিত্তির উপর জাতীয় কর্ম্মজীবন গঠন করিবেন, তাঁহারা নিজদের পরিচয় আগে ভাল করিয়া জানুন। যদি মুসলমানগণ তাহা না জানেন, তবে তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা নিশ্চয়ই হিন্দুসভ্যতার কুক্ষিগত হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদের জাতীয়ত্ব ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে। যেখানে প্রতিবেশীরা সচেষ্ট ও কর্ম্মঠ, সেখানে জড়বৎ হইয়া থাকিলে তাঁহারা কিরূপে প্রতিবেশীদের প্রভাব এড়াইবেন? পূর্ব্বপুরুষগণের মূলধন ভূপ্রোথিত সুবর্ণভাণ্ডারের ন্যায় তাঁহাদের কোন উপকারেই লাগিবে না। বহু মুসলমানের গৃহে আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে গুলি বৎসর বৎসর কীটদষ্ট ও অগ্নিদগ্ধ হইয়া নষ্ট হইতেছে। অধুনাতন হিন্দুর তাহা অনধিগম্য; মুসলমানগণ সে গুলির উদ্ধার ও রক্ষার কি উপায় করিতেছেন? অযোগ্য পুত্র যেরূপ অবহেলায় পিতৃসম্পত্তি খোয়াইয়া পথের ভিখারী সাজে, আপনারা কি তাহাই হইতেছেন না? বিভারেজ ষ্টাপলটনের ন্যায় দুই একজন বিদেশীয় পণ্ডিত মোস্‌লেম ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবেন না। আপনারা যদি নিজের পায়ের উপর নিজে না দাঁড়ান, তবে কেহ কাঁধে করিয়া আপনাদিগকে চাঁদ ধরাইয়া দিতে পারিবেনা। মোক্ষমুলার প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষীরা আমাদের প্রাচীন তত্ত্বের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের সন্ধান দিয়াছিলেন; এখন আমাদের বহুসংখ্যক লেখক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রদর্শিত পথে কাজ করিতেছেন। ইহাদেরই চেষ্টার ফলে হিন্দু-সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় ভবিষ্যতে সম্পা-

দিত হইবে, আমরা আশা করিয়া থাকি। যে নগরীতে এই সমবেত বুধমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে মুসলমান গৌরব ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু ঢাকায় একখানি ইতিহাসও মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। পণ্ডিত প্রবর মৌলবী সৈয়দ আওলাদ হোসেন খান বাহাদুর যে সকল তথ্যের উদ্ধার করিতেছেন তাহা আমাদের বিশেষ আশা ভরসার স্থল, একথা এখানে বলা কর্ত্তব্য।

শুনিয়াছি হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ আছে; আমি কিন্তু আমার জীবনে তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। আমি জানি আমাদের গ্রামের মুসলমান কৃষক আবদুল শুধু আমাকে দেখিবার জন্য ত্রিপুরা গিয়াছিল। তাহার বাড়ী সুয়াপুর হইতে ত্রিপুরা কতদূর! সে আমার লিখিত বহি পড়ে নাই, সে একান্ত নিরক্ষর, কিন্তু সেই গ্রাম্য জীবনের স্নেহের ডোর, যাহার মত কোমল অথচ কঠিন বন্ধন আর কিছু আছে বলিয়া আমার জানা নাই, সেই বন্ধনে সে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মুসলমানগণের মধ্যে আমার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন, যাঁহারা আমার সহোদরের ন্যায়। হিন্দু, মুসলমানের জলপান করেন না, এজন্য ত কখন তাঁহারা আমাদের পর ছিলেন না। মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেওয়ার জন্য কোন হিন্দু নিগৃহীত হন নাই। তবে এই অশ্রুতপূর্ব্ব বিদ্বেষের সৃষ্টি কেন হইল? ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের পল্লীগ্রামের ডুরি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাই শুধু মুসলমান হিন্দুতে নহে, ব্রাহ্মণেও অপরাপর জাতিতে বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ত্যাগের স্থলে ভোগ আসিয়াছে—পরসেবার স্থলে আত্মসেবার বাহুল্য হইয়াছে; সমাজের হিতের পরিবর্ত্তে লোকে স্বীয় প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। এমন দুর্দ্দিনে মুসলমান হিন্দু এবং হিন্দুর মধ্যে সহস্র প্রকার জাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের তীক্ষ্ণ অস্ত্র শাণিত করিতেছে। ইহা ভারতবর্ষের মৃত্যুবাণ হইবে। এই বঙ্গদেশে গঙ্গা শতমুখী, ইহা অশ্রুরদেশ, এখানে তেজ ও বিক্রমের বাড়াবাড়ি হইলে ভাব্রুরাজ্যে অনাবৃষ্টি হইবে; আমরা সকলে শুকাইয়া মরিব। এই প্রীতির বসরা হইতে সৌহার্দ্দের গোলাপ ছিঁড়িয়া ফেলিলে ইহা সাহারার অগ্নিবালিতে পরিণত হইবে।

মূলতঃ মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর কলহের কোন কারণ নাই। ইরাণ তুরাণ হইতে কতজন মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন? এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই আমাদের স্বগণ—আমাদের জ্ঞাতি। আমাদের এই উভয়জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ হয় ত অনেক সময় একসঙ্গে দাঁড়াইয়া বিজয়ী পাঠান সৈন্যের পথ অবরোধ পূর্ব্বক হিন্দুমন্দির রক্ষা করিবার সঙ্কল্পে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এককালে আমাদের শুধু একই ধর্ম্ম ছিল, এমন নহে, অনেক স্থানে আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এখনকার কালে কোন বিরোধ নাই, আমাদের মধ্যেও এখন বহুসংখ্যক লোক একেশ্বরবাদী; বিশেষ কোন বৃহৎ বিটপী যেরূপ নানাদিগ্‌দেশাগত পক্ষিবৃন্দকে আশ্রয় দিয়া থাকে, এদেশও সেইরূপ আমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আশ্রয়মহীরুহস্বরূপ। এই যুগ ধর্ম্মকলহের যুগ নহে—ইহা পরস্পরের প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা শিখাইবার ও শিখিবার যুগ।

পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তর হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এদেশের খুব উচ্চ অঙ্গের কবি, তাঁহাদের রচিত কাব্যগুলির ও অধিকাংশ আজ পর্য্যন্ত হস্তলিখিত পুঁথির আকারে রহিয়া গিয়াছে। আলাওলের পদ্মাবৎখানি এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মুদ্রিত করিলেন না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দসম্পদ্ আনয়ন করিয়াছেন, আলাওল তাঁহাদের অগ্রণী। যে দেশের সামান্য কৃষকশ্রেণীর মুসলমানগণ আড়াইশত বৎসর যাবৎ আলাওলের সুগভীর সংস্কৃতাত্মক কাব্য রক্ষা করিয়াছেন, সে দেশে সংস্কৃত চর্চ্চা কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আপনারা কল্পনা করিতে পারেন। আলাওল তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত স্তোত্র উদ্ধৃত

করিয়াছেন, পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃ শাস্ত্র লইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং "প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রতঝঙ্কৃত, হুহুত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে। মলয়সমীর সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত পতি অতিরস ভাবে। প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিলতমালদ্রুম, মুকুলিত চুতলতা কোরকজালে। যুবজনহৃদ আনন্দে পরিপুরিত রসমল্লিকামালতীমালে।"—প্রভৃতি সুচ্ছন্দ কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার বাড়ী ছিল ফতেয়াবাদ; ইনি আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করিয়া এই কাব্যগুলি লিখিয়াছিলেন। ইনি আপনাদের উপেক্ষিত। আলোওল হইতে প্রাচীনতর কবি সঞ্জয় ও পরমেশ্বর কবীন্দ্র। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় সঞ্জয়কৃত মহাভারতের কিয়দংশ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই মহাভারত খানি বঙ্গীয় মহাভারতগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখন পর্য্যন্ত আপনারা তাহা মুদ্রিত করেন নাই। সঞ্জয়কৃত মহাভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলার উপাখ্যান সে কালের কাব্যের মধ্যে খুব উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য,—উহা বহুকারুরচিত ভগ্ন দেবালয়ের প্রস্তরচুড়ের মত অনাদৃত হইয়া আছে। বলা বাহুল্য রাজেন্দ্র দাস পূর্ব্ববঙ্গের কবি। সঞ্জয় ও রাজেন্দ্র দাসের কাব্য আপনারা কীটের মুখে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন; উহা শীঘ্রই অগ্নিদেব কিংবা বরুণ আহুতিস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, নতুবা কীটগণ তাহাদের খাদ্য চিনিয়া লইবে; বঙ্গীয় মহাভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন এই ভাবে লুপ্ত হইবে। তাহার পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর,—যাঁহার কবিত্বচ্ছটা চট্টগ্রাম হইতে রাঢ়দেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বস্থান একদা উজ্জ্বল করিয়াছিল—যিনি হুসেন সাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন, তাঁহার রচনা বিকৃতভাবে কোথায় কিভাবে ছাপা হইয়াছে, আপনারা তাহার কোন খোঁজই রাখেন না। আপনারা আপনাদের দেশের একজন বড় কবির মর্য্যাদা এইভাবে রক্ষা করিতেছেন। সুখের বিষয় দ্বিজবংশীর পদ্মপুরাণ হাইকোর্টের উকিল সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টা ও ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু দ্বিজবংশীর প্রতিভাময়ী কন্যা চন্দ্রাবতীর খোঁজ আপনারা রাখেন কি? চন্দ্রাবতীর কাব্যে শোক ও চিরবিরহের অশ্রু মথিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জীবনে প্রেমের অপূর্ব্ব প্রতিঘাতে যে কবিত্ব নিঃসারিত হইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অমৃত। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের মত সুন্দর রামায়ণ বাঙ্গালায় হয় নাই। চন্দ্রাবতীর 'কেনারাম দস্যুর উপাখ্যানটি ভক্তি ও প্রেমের নির্ম্মল অশ্রুস্বরূপ, এরূপ স্নেহাসারে সিক্ত করুণ রস বাঙ্গালার অতি অল্প কাব্যেই আছে। আপনারা চন্দ্রাবতীকেও ভুলিয়া রহিয়াছেন! ইনি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ বরিশাল হইতে মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু নারায়ণদেবের আপনারা কি গতি করিয়াছেন?

ঢাকার সাহিত্য পরিষদ "শ্যামদাসের মীনচেতন" প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু শ্যামদাসের নাম জাল, এই কাব্যের রচয়িতা ফতেজুল্লা চট্টগ্রামবাসী। কাব্যের নামও 'মীনচেতন' নহে, ইহার নাম 'গোরক্ষ বিজয়'। গোরক্ষনাথ কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিজয়ী গুরুভক্ত সন্ন্যাসী জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। গোরক্ষবিজয় খুব প্রাচীন গ্রন্থ; ইহা কত প্রাচীন ঠিক বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ ইহার মূল অংশ মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে গাথার আকারে প্রচারিত ছিল, পাঁচ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে ফতেজুল্লা নামক মুসলমান কবি ইহা বর্ত্তমান আকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই কাব্যে দুই একটি স্থানে রুচি-বিগর্হিত কথা আছে; অত প্রাচীন জিনিষে এমন কিছু অবশ্যই থাকা স্বাভাবিক যাহা আধুনিক রুচির সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল পড়ে না। কিন্তু এই কাব্যে ইন্দ্রিয়বিজয়ের যে উচ্চ আদর্শ আছে, গুরুভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, কবিত্বের যেরূপ সহজ সুন্দর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গভাষায় আদি স্থানটি গোমুখীর ন্যায় তীর্থক্ষেত্র বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। বটতলা পশ্চিমবঙ্গের কবিগণকে জীর্ণবাস পরাইয়া লোকসমাজে আনিয়াছেন,

আমাদের পূর্ববঙ্গের কবিগণের পক্ষে সেরূপ সামান্য পরিধানও জোটে নাই। পূর্ববঙ্গের অন্যতম আদি কবি হরি দত্ত প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার কাব্য এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা ত বহুদিনের প্রাচীন লেখক। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে জপ্‌সা নিবাসী জয়নারায়ণও তাঁহার ভগিনী আনন্দময়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইঁহারা ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং উক্ত কবির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার যোগ্য। আনন্দময়ীর সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গালা কবিতা শৈলশৃঙ্গের মত কঠিন ও বিস্ময়োদ্দীপক, জয়নারায়ণের কবিতা শৈলনিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায় কোমল ও লীলামুখর। দৃষ্টান্ত রূপে আনন্দময়ীর কবিতার কিয়দংশে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না ঃ—

"হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে, ॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা ॥
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হারকুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে ॥
গলদ্‌রাগিনী কেউ মাতিয়া অনঙ্গে।
গলদ্ভূষণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে ॥
দেখি সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভাগে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥
সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে।
ঝণত্‌ ঝণত্‌ গলত্‌ গলত্‌ পড়ে নীর অঙ্গে ॥
সখী চন্দ্রভাগে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলাতে ॥"

জয়নারায়ণের রচিত বহু কাব্য আছে, এখনও সেগুলি উদ্ধার করা যাইতে পারে; কিন্তু আর দশ বৎসর পরে ইঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ আর কিছুই থাকিবে না। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আনন্দময়ী ও জয়নারায়ণের রচিত দুইখানি কাব্য আছে; যদি এই দুইখানি পুঁথি নষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দুই প্রতিভাবান। কবির কীর্ত্তির মঠ হয়ত সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উক্ত দুই কবি রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি ও তাঁহার সমসাময়িক। রাজবল্লভের কীর্ত্তি পূর্ববঙ্গে স্থান পায় নাই; পদ্মার গর্ভে তাহা বিলীন হইয়াছে। আর তাঁহার জ্ঞাতিদের কবিত্বকীর্ত্তি —যে কীর্ত্তি কাল ধ্বংস করিতে পারে না, যাহা প্রস্তর হইতে দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া বিশ্বাস ছিল,—সেই কীর্ত্তিরাশি ধীরে ধীরে আপনাদের বিস্মৃতি-পদ্মা গ্রাস করিতেছে। এই পরিবার বড় দুর্ভাগ্য। ইঁহারা সমস্ত রাজসম্পত্তি ও ইঁহাদের অপূর্ব্ব কবিত্বফল বঙ্গদেশে বিলাইয়া দিয়াও এদেশে কোন চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারিলেন না। ঢাকার সাহিত্য-সেবকগণ কি পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য সম্পদ্‌ রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইবেন না? যাঁহারা এই সহরে বড় বড় ইমারৎ প্রস্তুত করিয়া স্বীয় যশের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার করিয়া তাঁহারা কীর্ত্তিমান্‌ হউন। ইতিহাস একথা প্রমাণিত করিয়াছে যে, যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কবিদিগকে সাহায্য করেন, তাহারাও কবিদের তপস্যার ফলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন। আসন্ন শরৎকালে আপনারা যেরূপ পল্লীতে পল্লীতে রাশি রাশি সিউলি ফুল পাইবেন, সেইরূপ এককালে অসংখ্য কবির গান পাইয়াছিলেন, তাহা এখন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। একবার পল্লী খুঁজিয়া সেগুলি উদ্ধার করার কি উপায় নাই?

আমি আর আপনাদিগের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিতে চাহি না। এই সভা রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখনও আমার কর্ণে তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব বাগ্মিতার রেষ বিজয় দুন্দুভির মত বাজিতেছে। সব্যসাচী গাণ্ডীব ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে দাঁড়াইলে তাঁহাকে যেরূপ দেখাইত, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভায় দাঁড়াইলে তাঁহাকেও সেইরূপ দেখাইত। তাঁহার কবিত্ব ও তেজোদৃপ্ত ভাষা নারদের বীণার মত বাজিয়া

। আজ তাঁহার আসন শূন্য। এবং ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে আপনারা তাঁহার আসনে বসাইয়াছেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া গেলে বিগ্রহের সিংহাসনে যে সে বিচরণ করে, সুতরাং আশ্চর্য্যই বা কি? কিন্তু বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর এই সাহিত্য-সমাজের পৃষ্ঠপোষক, তাঁহার নাম সংযোগে ইহা উজ্জল হইয়া রহিয়াছে।

হে স্বদেশবাসী মহোদয়গণ! আপনাদিগকে দেখিয়া আমি ধন্য ও পবিত্র হইলাম। বিনীতভাবে আপনাদিগের সৌহার্দ্দ ও প্রীতি ভিক্ষা করিতেছি। আমার এই অভিভাষণে যে সকল ত্রুটী বা হীনতা আছে, তাহা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। আমি বহুদিন পরে দেশে আসিয়া আপনাদের স্নেহামৃতে অভিষিক্ত হইতে চাহিতেছি। সেই অমূল্য দান হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

উপসংহারকালে আমি ভগবানের নিকট আমাদিগের রাজা ও তাঁহার বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইষ্টকামনা জানাইতেছি। আমাদের দেশ এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অংশ; এখন আমাদের সকলেরই আপৎকাল। এখন কায়মনোবাক্যে আমাদের রাজার শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প করিবার সময়। দুর্দ্দিন চিরদিন থাকেনা, এমন যে ভাদ্রমাসের ঘনীভূত মেঘ তাহাও কাটিয়া যায়, এবং মুক্ত রবি কিরণে বিশ্ব প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদের রাজার ও রাজ্যের বিপদ্‌ও সেইরূপ বেশীদিন থাকিবে না। কিন্তু আপৎকালের বন্ধুত্ব ও সহায়তার কথা চিরদিন মনে থাকে। দুর্দ্দিনের অবসানে যেন উদাসীনতা বা শিথিলতার জন্য আমাদের লজ্জিত না হইতে হয়। যাহারা কায়িক শক্তি বা অর্থ-সহায়তা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, একাজ শুধু তাহা-দিগেরই নহে। আমরা সকলে মিলিত হইয়া যদি রাজার মঙ্গলের জন্য ভগবানকে ডাকি, তবে সেই অকপট প্রার্থনায় তাঁহার আসন টলিতে পারে; একদা ইংলণ্ডের লোক এইরূপ প্রার্থনার বলে আরমেডার ন্যায় বৃহৎ বিপৎকেও বিনা রক্তপাতে ধূলিকণার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

উদ্বোধন

(পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত)

যাঁহার গোপন বীণা ছন্দে ছন্দে নিখিলের মাঝে
বাজিছে মধুর,
যাঁহার নয়নবিভা জাগে সদা নভোনীলিমায়
স্নেহে ভরপুর,
যাঁর প্রেম-আকর্ষণ অণু মাঝে পরমাণুরাশি
করেছে বিলীন,
নিখিল বরণমাঝে বর্ণাতীত রূপরাশি যাঁর
রাজে চিরদিন,
হিয়ার কম্পনে যাঁর আনন্দে অধীর ধরাতল
কাঁপে থর থর,
করুণার মন্দাকিনী প্লাবনে ভাসায়ে দিল
বিশ্ব চরাচর,
বিকশিত কুসুমের পরিপূর্ণ মর্ম্মকোষে যাঁর
প্রাণের বিকাশ,
সীমায় অসীমরূপে কায়ামাঝে ছায়ায় যাঁহার
গোপন আভাষ,
ছন্দাতীত ছন্দঃ যিনি, নিখিলের চিদানন্দ রূপ
অনাদি অপার,
আজি এ সভার শিরে ঝর ঝর পড়ুক ঝরিয়া
আশিষ তাঁহার।

স্বাগত স্বাগত আজি হে সাধক! হে মহা ঋত্বিক্!
সুধী গরীয়ান্!
স্বাগত মন্দির মাঝে বঙ্গবাণী জননীর যত
ভকত সন্তান!
আজি যে এসেছ সবে প্রাচীনা এ নগরীর নব
দেউল মাঝার,
পরিপূর্ণ নত প্রাণে হৃদয়ের পর্ণপুটে ভরি
কুসুম সম্ভার,—
এসেছ ছুটিয়া সবে বঙ্গভাষা জননীর হেথা
পূজিতে চরণ,
জানিনা কি দিয়া আজি হৃদয়ের অন্তঃপুরে সবে
করিব বরণ।

স্মৃতির শ্মশান এই গৌরবের পুণ্যপীঠভূমে
এস এস আজ!
অতীতের কত কথা আজো বুঝি আছে লুকাইয়া
এরি ধূলি মাঝ;
নহে শুধু রাজধানী অতীতের ইতিহাসে গড়া,—
এযে তীর্থ ধাম,
সাহিত্যের তপোবন, ঋষির উদাত্তবাণী যেথা
বাজে অবিরাম।—
আজি শুধু জাগে মনে কবে কোন্ উষার আলোকে
ফুলের মতন,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে বঙ্গের নবীন ভাষা ধীরে
মেলিল নয়ন;
উঠিল মঙ্গলগান জাহ্নবীর পুণ্যতটভাগে
পুলক অধীর,
কল্লোল জাগিল ধীরে বুড়ীগঙ্গা-লহরী-লীলায়
উদার গভীর;—
নাহি সে সাধক আজ, শূন্য তাই বঙ্গভারতীর
কনক মন্দির,
মূক সে বাঁশরীরব, নীরব পূরব আজি তাই,
চোখে বহে নীর;
বাণীর দেউল এই—এযে তাঁরি শুভাশীষ মাগে
লভেছে জনম,
আজিকে তাঁহারি লাগি' বেদনিয়া উঠিছে পরাণ,
ঝরিছে নয়ন।

স্বাগত স্বাগত সবে, এই মহাতীর্থ ভূমি মাঝে
এস তবে আজ,
আনন্দ বহায়ে দিক্ শুভ এই আনন্দ-উৎসব
হৃদয়ের মাঝ।
যাঁহার কল্যাণকর জাগে বিশ্বে সর্ব্বসাধনায়
নিত্য অবিরাম,
আজি এ সভার মাঝে তাঁহারি চরণতলে যাক্
সবার প্রণাম।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ভাষার আকার ও বিকার।

বাঙ্গলা ভাষা—কোনটা তার ঠিক আকার কোনটা বা তার বিকার, কোনটা সাধু কোনটা অসাধু, কোনটা শিষ্ট কোনটা বা অশিষ্ট, এই কথা লইয়া বহুদিন হইল আলোচনা হইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাঙ্গলা বই লিখিতে আরম্ভ করেন তখন পণ্ডিত সমাজে একথাটা উঠিয়াছিল—কথা হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগরী ভাষাটা ঠিক খাঁটি সংস্কৃত নয়, আর একটু সহজ ও সরল। বিদ্যাসাগরী ভাষা!—তার সম্বন্ধেও এই কথা! কিন্তু ব্যাপারটা খুব ঘোরাল হইয়া উঠিল যখন টেকচাঁদ ঠাকুর তুলিলেন এই ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা। তিনি সংস্কৃত একেবারে বর্জ্জন করিয়া ঠিক রোজ যে সব কথা ব্যবহার হয় সেই কথায় তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিলেন। তখন বিদ্যাসাগরী ও টেকচাঁদী দলে ঠোকাঠুকী লাগিয়া গেল, কেহ বলিল বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃতের পোষ্যপুত্র, উহা বাঙ্গলা নহে—কেহ বলিল, ভাল বাঙ্গলার আদর্শ বিদ্যাসাগরী ভাষা, টেকচাঁদী ভাষা ছেবলার ভাষা, এভাষার লেখা বইয়ের এমন একটা ভঙ্গী আছে যাতে পিতা পুত্রে একসঙ্গে বসিয়া ইহা পড়িতে পারে না, যদিও ইহার বিষয় কিছুই দোষের না হউক।

এই আন্দোলন যখন চলিতেছে তখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে তাঁহার উচ্চাসন বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। যদিচ তিনি দুর্গেশনন্দিনীতে বেশ একটু সংস্কৃত ঘেঁসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন কি নায়ক নায়িকার প্রেমসম্ভাষণে বা ঠাট্টা তামাসাতেও যথেষ্ট সংস্কৃত ও সমাসযুক্ত শব্দ চালাইয়াছিলেন, তবু তিনি শীঘ্রই তাঁহার আপনার ভাষা—যে ভাষায় তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব বেশ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে সেই ভাষা—পাইয়াছিলেন। সেই ভাষায় তিনি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টেকচাঁদী ভাষার সমালোচনার যে শক্ত উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন।

তার পর এক শ্রেণীর লেখক দাঁড়াইলেন যাঁহারা বুঝিবা টেকচাঁদকেও ছাড়াইয়া গেলেন—রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে তাঁর এই ভাব ছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে তিনি ও রবীন্দ্রনাথ একখানা সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন, তা'র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণের এই ছেলেমো ঢল ঢল কান্তি"। কথাটা শুনিয়া বঙ্কিমবাবু—যিনি টেকচাঁদীর পক্ষে উকীল হইয়াছিলেন—চটিয়া উঠিলেন—এবং তাঁর কথায় "ছেলেমো" কাটিয়া "বালসুলভ" করা হইল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নানাস্তরে নানাভঙ্গী আছে, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার, বাঙ্গলার শব্দের ইঙ্গিত, সমস্তই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া এক এক যুগে এক এক ভঙ্গীতে লিখিয়াও আগাগোড়া ভাষার ভিতর এমন একটা জোর, এমন একটা প্রাণ ও একটা বৈচিত্র্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বের কোনও লেখকের ভিতরই ছিল না। ইদানীং রবিবাবু তাঁর মধ্য যুগের সংস্কৃতবহুল ভাষা ছাড়িয়া আবার খাঁটি বাঙ্গলার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এক দল লেখক, যাঁদের শক্তি বা প্রতিভা রবির মত দ্যুতিমান না হ'লেও বেশ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়, তাঁরা রবিবাবুর হালের এই ভাষার ভঙ্গীটাকে আদর্শ করিয়া তাঁদের গুরুকেও এ বিষয়ে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধদলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চলিত ভাষা লিখিব না পোষাকী একটা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিব এই কথা লইয়া বিদ্যাসাগরের যুগে যেমন আজও তেমনি দুই দলে বিরোধটা বেশ জমিয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁরা পুরাতনের বা পোষাকী ভাষার পক্ষপাতী তাঁরাও চান না যে বিদ্যাসাগরী ভাষা আবার ফিরিয়া আসুক। এমন খুব কম লোকই এখন আছেন যাঁরা বিদ্যাসাগরের মত বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের মত নির্ভেজ সংস্কৃতমূলক ভাষায় আগাগোড়া পুরা জোর রাখিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন। আমার হয় তো এবিষয়ে বিবেচনাটা খুব পাকা না

হইতে পারে, কিন্তু মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছাড়া আজ-কালকার লেখকদের মধ্যে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষায় সমান জোর রাখিয়া কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবু জগদিন্দ্রনাথের ভাষা, এমনকি কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা, বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের ভাষার চেয়ে অনেক কম সংস্কৃত-ঘেঁসা। আজ যদি কেহ বিদ্যাসাগরের মত সীতার বিলাপ লিখিতে বসেন তবে নূতনপন্থী ও পুরাতনপন্থী কেহই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি না। এই সেদিন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় চলতি ভাষার উকীলদের উপর যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার ভাষার বিদ্যাসাগরী অপেক্ষা টেকচাঁদের ভাষার সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশী। আজকালের পুরাতনপন্থীরা খুব বেশীদূর গেলে বঙ্কিমবাবুর ভাষা পর্য্যন্ত যাইতে চান—তাও হয়তো তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। নূতনপন্থীদের মধ্যে "সবুজপত্রে" আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে ভাষার প্রচলন করিয়াছেন তাহার উপরই ইঁহাদের বেশী রাগ। তা'র বিশেষ কারণ বোধহয় এই যে তিনি কেবল কলিকাতার চলিত শব্দ ব্যবহার করেন না, সেই ভাষায় সুবন্ত তিঙন্ত এবং কৃৎতদ্ধিতও চালান।

এই আন্দোলন যাহা এখন আবার নূতন হইয়া খুব বেগে দেখা দিয়াছে তাহাতে আমি যোগ দিব একথা এতদিন ভাবি নাই, কারণ আমার বরাবরই বিশ্বাস যে ভাষার আকারটা কিরূপ হইবে সে বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডার মত এমন নিষ্ফল আলোচনা আর নাই। এপর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাবান্ লেখক পরের বাঁধা ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না, সুতরাং আমরা মজলিস করিয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া যদি বা একটা ভাষার স্বরূপ বাঁধিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি, তার গণ্ডীর ভিতর আমরা প্রতিভাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিব এরূপ আশা করা বড় স্পর্দ্ধার কথা। এই বিশ্বাসে আমি এপর্য্যন্ত এই নিষ্ফল আন্দোলনে যোগ দান করি নাই। অবশ্য তাহাতে যে আমাদের ভাষা বা সাময়িক সাহিত্য খুব বেশী দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এমন না হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে উভয় পক্ষের উকীলের নিজ নিজ পক্ষসমর্থনের ব্যগ্রতায় কতকগুলি গোড়ার কথা হইতে সবার দৃষ্টি যেন কিছু সরিয়া গিয়াছে। সেই কয়টি কথা একটু আলোচনা করিবার জন্যই আজ আমি আপনাদের বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।

সাহিত্য একটা আর্ট। সব আর্টের মত ইহারও ভিতর ও বাহির দুইটা দিক আছে। ভিতরের জিনিষটা হইল ভাব ও বাহিরের জিনিষটা তাহা প্রকাশের প্রণালী, তাহার technique. ভিতরের জিনিষটাই আর্টের প্রকৃত সম্পদ, কিন্তু সেটা যদি অতি নোংরাভাবে প্রকাশ করা যায় তবে সেটা লোকের মনের ভিতর পৌঁছায় না বলিয়াই technique এর যা কিছু সমাদর। মনে করুন একটি কবির মনে একটি সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি যদি তুলি লইয়া সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কেবল কতকগুলা রং ছড়াইয়া যান, তবে তাঁর মনের ভাব তিনি অপরের মনে ঠিক পৌঁছাইতে পারিবেন না। অপর পক্ষে যদি সেই ভাব লইয়া একটি কৃতী শিল্পী নিপুণভাবে রঙের প্রয়োগ করিয়া একটি ছবি আঁকেন তবে তাহাতে ভাবটি এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিবে যাহাতে তাহা একেবারে লোকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিবে।

সুতরাং এই প্রকাশের ব্যাপারে বাহাদুরী না থাকিলে তুমি ভাবসম্পদে যত বড় ধনী হও না কেন সাহিত্যে তোমার স্থান নাই। কিন্তু সব জাতি যে কারণে ঠিক এক ভাষায় কথা বলে না, এক মূল ভাষা যে কারণে মুখে মুখে নানারূপ হইয়া যায়, ঠিক সেই কারণেই এই প্রকাশের প্রণালী সম্বন্ধে কোনও বাঁধা একটা মাণদণ্ড করা যায় না। একথা বলা চলে না যে ঠিক এমনি করিয়া প্রকাশ না করিলে তোমার ভাব বাজারে কাটিবে না। গোটা তিন চার মৌলিক রঙ লইয়া, তুলি টানিবার দুই চারটী ভিন্ন ভঙ্গিতে সব চিত্রকর কাজ

করেন, কিন্তু প্রতিভাবান চিত্রকর এমন কেহ হন নাই যাঁর technique ঠিক আর কোনও চিত্রকরের হুবহু নকল। ছবি আঁকার নানা প্রণালী, নানা school বা বিদ্যাবংশ জগতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির মূলে কোন ও মহাপ্রতিভাশালী চিত্রকরের কলা-বৈচিত্র্য, তাঁহার technique এর বিশেষত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া Raphael এর প্রণালী ভাল আর Rembrandt এর প্রণালী ভাল নয়, Reynolds এর প্রণালী অনুসরণ যোগ্য, Turner এর চিত্র আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে না এমন কথা বলা চলে না। Rembrandt যদি Raphael এর প্রণালীর নকল করিতেন তবে তাঁহার ছবি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভাল হইত একথা বলা চলে না।

আসল কথা, প্রত্যেক কলাবিতের প্রণালী তাহার প্রতিভার ফল। প্রতিভাবান শিল্পীর বিশেষত্ব কেবল ভাবে নয় তাহার প্রকাশের প্রণালীতেও ফুটিয়া উঠিবেই। সেখানে যদি তাঁহার বিশেষত্বটাকে চাপিয়া রাখা যাইত তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইতে পারিত না। কেবল প্রতিভা-বৈচিত্র্য নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যেও technique এর প্রভেদ হইতে বাধ্য। এক এক প্রণালীর এক একটা বিশেষত্ব আছে ও এক এক প্রকার ভাবপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতা আছে যাহা অপর প্রণালীতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। Hogarth এর ব্যঙ্গচিত্র যদি Raphæl এর প্রণালীতে অঙ্কিত হইত তবে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকাশতো হইতই না, তাঁহার রসিকতা একেবারে মাঠে মারা যাইত। ব্যঙ্গ-চিত্র Pen and Inkএ যতটা খোলে Oil Paintingএ তেমন খুলিতেই পারে না। তৈলচিত্রের ভিতরেও, রাফেলের বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁহার পদ্ধতি যেমন খাপ খায় অন্য বিষয়ের সঙ্গে, তেমন খাপ খায় না। শান্ত-স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি বা সেণ্ট সিসিলি বা স্বর্গের শিশুগায়কদের ছবি যেমন রাফেলের চিত্রকলায় খোলে ভাবের সংঘর্ষ-পূর্ণ ছবি সে প্রণালীতে তেমন খোলে না। তারপক্ষে বরং রেম্ব্রাণ্টের প্রণালী শ্রেষ্ঠ।

চিত্রকলা সম্বন্ধে যে কথা সাহিত্যের আর্ট সম্বন্ধে সে কথা ষোল আনা খাটে। একই সময় সেক্সপীয়ার ও Ben Jonson কবিতা লিখিয়াছেন, Bacon দর্শন ও ব্যবহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ভাষা কি এক? এক সেক্সপীয়ারের ভিতরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাষার ভঙ্গী ভিন্ন। Burkeএর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ খুব ওজস্বী, Bright এর বক্তৃতার জোরও কম নহে; কিন্তু Burke কে যদি Bright এর ভঙ্গীতে বলিতে বাধ্য করা হইত কিম্বা Bright কে Burke এর ভাষায় কথা কহিতে হইত তবে কি বিসদৃশ ব্যাপার দাঁড়াইত! এ প্রভেদ যে কেবল ভাষার একটা ভঙ্গীতে তাহা নয়, প্রায়ই শব্দ চয়নের প্রভেদ হইতে এই প্রভেদ জন্মায়। Burke এর সবচেয়ে ভাল অংশ গুলিতে লাটিন গ্রীক কথার ছড়াছড়ি—Bright যেখানে খুব তেজের সহিত খুব অন্তঃস্পর্শী ভাষায় কথা কহিতেছেন সেখানে তাঁহার ভাষা প্রায় নির্ভেজ Anglo Saxon. Dickens চলতি ভাষা বা slang এর ব্যবহার করিয়া কথায় যে রকম জোর দিয়াছেন, তাঁহাদের যদি কেবল পুঁথির ভাষা ব্যবহার করিতে হইত তাহা হইলে সে জোর সে ভাষায় থাকিতে পারিত না। Samuel Weller কে যদি Dickens কেতাবী ভাষায় কথা বলাইতেন তবে Pickwick Papers এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য মাটি হইত। আর আজকালকার সবচেয়ে শক্তিবান্ বক্তা Lloyd George কে যদি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যাইত যে slang ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে বোধ হয় তাঁহার শক্তির অর্দ্ধেকটা অপ্রকাশ থাকিত।

আজ কালকার ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী বক্তৃতা-গুলি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে এমন একটা নূতন ভঙ্গী আসিয়াছে, এমন একটা নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে যাহা সেকালে ছিল না। ইহা হইয়াছে চলতি ভাষাটা খুব বেশী পরিমাণে সাহিত্যের ভিতর আসিয়া পড়ায়। অনেকে মনে করেন ইহাতে ইংরাজী ভাষার অবনতি হইয়াছে—Classic ইংরাজী উঠিয়া গেল বলিয়া অনেকে দুঃখ

করেন। যাহা গিয়াছে তাহা যে মন্দ, তা'র যে কতকগুলি বিশেষ গুণ নাই এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু যাহা নূতন হইয়াছে তাহারও গুণের দিকটা না দেখিলে চলিবে কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে যে ভাষায় যার প্রতিভা পরিস্ফুট হয় সেইটাই তা'র ভাষা। সুতরাং ভাষাটা ভাল না মন্দ সে বিষয় বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে দুইটি জিনিষ, প্রথম লেখকের প্রতিভা আছে কিনা এবং সে প্রতিভা তাঁহার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা, কথাটি লেখক যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাবের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জক কিনা। তাহা ছাড়া আর একটা সাধারণ দিক দেখিবার আছে সেটা এই যে ভাষাটা আর্ট হিসাবে সুন্দর হইয়াছে কিনা—অর্থাৎ আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির কাছে সেটা ভাল লাগে কিনা। এক হিসাবে ইহা পূর্ব্বের বিষয়টির আর একদিক মাত্র, কারণ আর্ট হিসাবে সুন্দর না হইলে ভাবের পূর্ণ ব্যঞ্জনা হইতে পারে না, আর ভাব যদি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে তবে ভাষার কোনও কলাঘটিত ক্রটি থাকিতেই পারে না—তা' হউকনা সে ব্যঞ্জনা কলায় তখনকার প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

যদি কোনও লেখকের ভাষা এই ওজনে ঠিক দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহাকে মন্দ বলিতে গেলে আমাদের সমালোচনা ঠিক দাঁড়াইবে না। তখন যদি আমরা খুঁটিয়া দেখিতে বসি যে লেখক কোন কথাটি কোন দেশ হইতে লইয়াছেন ভাষার কোন ভঙ্গীটী পূর্ব্ব বা পশ্চিম বা উত্তর বা দক্ষিণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া ভাষার গুণাগুণ বিচার করিতে বসি তবে আমাদের সমালোচকের মর্য্যাদা হারাইতে হইবে। কারণ একথা এখন না মানিয়া উপায় নাই যে শব্দের মধ্যে কুলীন অকুলীনে ভেদ নাই। শব্দ জগতে এমন কেহ অন্ত্যজ নাই যাহাকে আমরা গণ্ডী বাঁধিয়া সাহিত্য হইতে দূরে রাখিতে পারি। মানুষের ভাবসম্পদ নানাদিক দিয়া বাড়িয়া চলিতেছে, সাহিত্যের ভিতরে এবং সাহিত্যের বাহিরে নিয়তই একটা চেষ্টা চলিতেছে নূতন নূতন ভাব প্রকাশ করিবার বা পুরাতন ভাবের নূতন প্রকাশ বাহির করিবার। সেই চেষ্টার ফলে নূতন শব্দ বা শব্দ সমাসের সৃষ্টি হইতেছে, কতক বা সাহিত্যে কতক বা অসাহিত্যিক লোকের মুখে মুখে। এবং প্রায়ই এমন দেখা যায় যে লৌকিক শব্দের ভিতরে এমন একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে একটি ভাব যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় প্রচলিত সাহিত্যের কোনও শব্দ বা প্রবন্ধে তেমন সুন্দররূপে তাহা হয় না। আমরা যদি পণ করিয়া বসি যে সাহিত্যে যে শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া বাহিরের কোনও শব্দ বা শব্দসমষ্টি, লৌকিক কোনও ধাতু বা নূতন কোনও প্রত্যয় গ্রহণ করিব না এবং কেহ গ্রহণ করিলে তাহাকে অপপাত্রিত করিব—এবং যদি আমরা এ পণ রক্ষা করিতে পারি তবে আমরা লাভ কি করিব জানি না, কিন্তু আমরা হারাইব অমূল্য সম্পদ—ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায় অবহেলা করিব।

কোনও শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বা কথা কহিবার কোনও ভঙ্গী আমরা সাহিত্যের কুলীন সমাজ হইতে বাহিরে রাখিব একথা বলা চলে না। সব কথাই সাহিত্যে চলিতে পারে, শুধু দেখিতে হইবে যে তাহা মানাইয়া চালান হইল কি না। ভাষার একটা প্রাণ আছে তা'র সঙ্গে সমীকৃত করিয়া যে শব্দ ব্যবহার করিব তাহাই সাহিত্যে চলিবে—ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া না লাগাইতে পারিলে সে শব্দ খাপছাড়া হইয়া থাকিবে। তাহাতে ভাষা কদর্য্য হইবে। সুতরাং কথাটা বা কথার ভঙ্গীটা কোন দেশের তাহাতে কিছু আসে যায় না। দেখিতে হইবে যে তাহা মানানসই হইয়াছে কি না, তাহাতে ভাষার শক্তি বা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে কি না?

বাস্তবিক কোনও একটা তর্কের উত্তেজনায় ছাড়া আমরা ভাষা সমালোচনায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না। সবুজপত্রের সম্পাদককে বা রবীন্দ্র বাবুকে যাঁরা কলিকাতার কথা ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন তাঁহারা রামপ্রসাদের গানের ভিতর কোনও ভাষার ক্রটি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়ের হাসির গান বাঙ্গালার সব প্রদেশের লোকের মুখে লাগিয়া আছে কিন্তু তা'র বার আনা খাঁটি কলিকাতার ভাষা। দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধেও কেহ এ আপত্তি করেন না, বাউলের গান প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতে ভাষার প্রাদেশিকতা সকলেই অনায়াসে হজম করিয়া থাকেন। সুতরাং কলিকাতার ভাষায় ব্যবহার হইয়াছে বা কোনও প্রাদেশিক ভাষার ভেজাল পড়িয়াছে বলিয়াই যে পুরাতন-পন্থীরা সব সময়েই ভাষায় দোষ ধরেন এ কথা সত্য নহে। কোনও একটা লেখার ভঙ্গী যদি আমাদের পছন্দ না হয় তবে অনেক সময় আমরা তার এটা সেটা লইয়া দোষ ধরি—বাস্তবিক যে দোষকে সব সময়েই আমরা দোষ বলিয়া মনে করি তাহা নাও হইতে পারে।

এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে রবীন্দ্র বাবু যদি কলিকাতার ভাষা চালাইতে চান তবে আমরা কেন না ঢাকায় ভাষা চালাইব। রাজসাহীর লোক কেন না রাজসাহীর ভাষা চালাইবেন? আমি বলি কোনও বাধা নাই, যদি আমাদের সে শক্তি থাকে, যাহাতে ঢাকায় ভাষাকে ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারি। রবি বাবু ইহা করিয়াছেন, তাঁহার দেশের ভাষা লইয়া—আমরা পারিব কি? যদি পারি, এবং যদি আমাদের লেখার মধ্যে সেই প্রতিভায় বিকাশ থাকে তবে সমস্ত বঙ্গবাসী আদর করিয়া আমাদের লেখা পড়িবে। Burns তাঁহার প্রাদেশিক ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন সমস্ত ইংরেজ তাহাকে ইংরাজী ভাষায় মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। Scott এর গ্রন্থে Scotch ভাষার ছড়াছড়ি বলিয়া তাঁহার বই যে কোনও ইংরাজ তাহার শেলফ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে এরূপ শোনা যায় নাই। পুরাতন পন্থীর ইহাতে প্রথম আপত্তি, যে যদি সবাই তা'র নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করে তবে বাঙ্গলা ভাষা এক থাকিবে না বহু হইয়া যাইবে এবং আমরা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিব না। এটা বাড়াবাড়ী। প্রথম আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গলা ভাষার একটা প্রাণ আছে তার সঙ্গে সমীকরণ না হইলে কোনও কথা বা কোনও কথার ভঙ্গী সাহিত্য চলিবে না। সুতরাং যাহা কিছু লিখিলেই যে তাহা সাহিত্যে চলিয়া যাইবে এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ কথিত ভাষা শুনিয়া সকলের সব দেশের কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইলেও সেই ভাষাটা লেখা হইলে বোঝা তত কঠিন হইবে না। আর যদি কোনও প্রতিভাবান লেখকের লেখায় এমন কথা থাকে যাহা আমি জানি না, চেষ্টা করিয়া আমি সে কথা শিখিয়া লইব, যেমন আমরা সবাই অল্পবিস্তর চেষ্টা করিয়া স্কটের উপন্যাস পড়িবার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি স্কচ কথার মানে শিখিয়াছি।

ইঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে যদি কলিকাতার কথা দিয়াই ভাষার নমুনা ঠিক করিয়া দেওয়া হয় তবে পূর্ব্ববঙ্গের লোক আমরা বড় বিপদে পড়িব, কারণ, কলিকাতার ভাষা তো আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতার চলতি কথায় আমাদের লিখিতেই হইবে এমন কথা কে কবে বলিয়াছে—যদি কেহ বলিয়া থাকে—এ বিবাদে সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক কি কথা যে না বলা হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—যদি কেহ বলিয়া থাকে সেও সমান ভুল করিয়াছে। যে কেহ ভাষার একটা বাঁধা নমুনা ধরিয়া বলিতে যায় যে এমনটি না হইলে তোমার ভাষায় স্থান নাই সেই ভ্রান্ত। আমরা লিখিব বাঙ্গলা ভাষা, তা' এক একজনের লিখনভঙ্গী এক এক রকম হইবে বই কি? কেউবা শব্দ চয়ন করিব বেশীর ভাগ সংস্কৃত হইতে, কেউ বা যত্নের সহিত চয়ন করিব পূর্ব্ববঙ্গেরই ভাষা হইতে সেই শব্দ ও ভাষার ভঙ্গী যাহাতে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। যদি আমার সে প্রতিভা থাকে তবে আমার শব্দবিন্যাস এরূপ হইবে যে তাহাতে ভাষার বিচিত্র শক্তি হয়, ভাষা আমার সমৃদ্ধ ভাবের যোগ্য বাহন হয়—তবে সেই ভাষার সৌষ্ঠব আদর করিয়া প্রশংসা করিবে সকল দেশের লোক।

রবীন্দ্র বাবু ও তাঁহার বর্ত্তমান পন্থা যাঁহারা অনুসরণ

করিতেছেন তাঁহারা ভাষার এই স্থায়ী উপকার করিতেছেন যে তাঁহারা কথিত ভাষার সম্পদ ও শক্তিতে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ওজস্বী করিয়া তুলিতেছেন।—এই যে ভাষার শক্তির একটা অপরিজ্ঞাত উৎস ইহা টেকচাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার মুখে ইহার বিচিত্র লীলা দেখাইয়া তিনি আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চলতি ভাষায় এমন অনেক কথার ভঙ্গী আছে যার পূরা জোরটুকু সাধুভাষায় তরজমা করাই বলে না। "সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আর আমি ফিরছিনে,"—একথাটা সাধু ভাষায় ঠিক এই force রক্ষা করিয়া বলা যায় কি না জানি না। এখানে "ফিরছিনে" কথাটার ভিতর এমন একটা ঝোঁক আসিয়া পড়ে যার সম্পূর্ণ অর্থ "ফিরিতেছি না" "ফিরিব না" "কদাপি ফিরিব না" "কিছুতেই ফিরিব না" প্রভৃতি কোনও কথায় প্রকাশ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের আজকালকার রচনা হইতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত অনায়াসে দেখান যায় যাহাতে কথিত ভাষার এই শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়; এই যে কথিত ভাষার শক্তি ইহা কেমন করিয়া সাহিত্যের ভিতর সুন্দরভাবে গ্রহণ করা যায় তাহা আমাদের বিশেষ অনুশীলনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হালের রচনায় এই চলিত ভাষায় প্রয়োগের সুন্দর নমুনা দেখাইয়া দিয়া আমাদের এ নূতন পথে আলো দেখাইয়া চলিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবু শুধু ইহাই দেখাইয়াছেন যে কথিত ভাষার দ্বারা আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে এবং আমাদের ইহাকে সেই সম্পদ দিতে হইবে। তিনি একথা কোনও দিন বলেন নাই যে সে সম্পদ কেবল কলিকাতার কথায়ই আছে, আর, আমরা পারিনা পারি, কলিকাতার কথা আমাদের লিখিতেই হইবে! কথাটা এই যে কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভিতর টানিয়া আনিয়া ভাষার শক্তি, ও সৌষ্ঠব বাড়ান যায় কিনা। কোথাকার কথিত ভাষা সটা মোটেই ভাবিবার কথা নয়। শক্তি যে বাড়ে, সৌষ্ঠব যে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাহার পরিচয়! শুধু কলিকাতার ভাষা বা চলতি ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বলিয়াই যদি আমরা তাহার উপর চটিয়া না বসি তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার প্রতিপাদ্যটা সংক্ষেপে এই যে ভাষার একটা কোনও বাঁধা নমুনা এবং শব্দের একটা নির্দ্দিষ্ট সমষ্টী লইয়া যে আমরা গণ্ডী বাঁধিয়া দিব ইহা হইতেই পারে না। যাহার শক্তি যে প্রণালীতে পরিস্ফুট হয় যে তাহার প্রতিভা যে উপায়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারে সেই তাহার প্রণালী, সেই তাহার উপায়। সে যদি চলতি ভাষার আশ্রয় লয় তাহাতে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে যদি সে ভাষা ঠিক লাগাইবার ক্ষমতা তাহার থাকে—তাহার সৌন্দর্য্যের অন্ধি সন্ধি যদি তাহার এমন জানা থাকে যাহাতে শব্দবিন্যাসে সে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

তবে কথা হইতে পারে যে শিক্ষানবিশদের কাছে কোন্ আদর্শ উপস্থিত করিব? যাহাদের সে উচ্চ অঙ্গের প্রতিভা নাই অথচ বলিবার দুটো কথা আছে তাহারা কাহার পন্থা অনুসরণ করিবে? ইহার সহজ উত্তর এই যে প্রতিভাবান লেখকদের আদর্শই আদর্শ তাহাদের পথই পথ। ছেলেদের যদি বাঙ্গলা শিখাইতে চাই তবে তাহাদের ইহা বলিলে চলিবে না যে তোমরা বিদ্যাসাগর ও বড় জোর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়া অন্য কাহারও আদর্শ অনুসরণ করিও না। তাহাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা,—বিদ্যাসাগর হইতে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলের লেখা পড়িয়া তাহাদিগকে অবসর দিতে হইবে বাঙ্গলা ভাষার শক্তির কেন্দ্রগুলি আয়ত্ত করিতে—সেই কেন্দ্রগুলি আয়ত্ব হইলে, সে নিজের শক্তি ও প্রতিভার উপযোগী ভাষা আপনি গড়িয়া লইতে পারিবে। আমরা যতই কেন ঝগড়া করি না, আমাদের বিচারের ফল

যেন ছেলেদের মুখের ভিতর গুঁজিয়া না দেই। সাধুভাষা বা কথিত ভাষায় গুণাগুণ বা জাতিকুল লইয়া আমরা যতই বিচার করি না কেন, শব্দ বা রচনাপ্রণালীর একটা আর্য্য-সমাজ গড়িয়া অন্ত্যজ ভাষাকে তফাৎ রাখিবার যত চেষ্টা করি না কেন প্রকৃত প্রতিভাবান লেখকের রচনা হইতে আমোদ লাভ ও তাহার সম্যক অনুশীলনের সুযোগ হইতে যেন আমরা পরবর্ত্তীদের বঞ্চিত করিবার চেষ্টা না করি। চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে—ব্যর্থ না হইলে আমরা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি করিব।

পরিশেষে একটা কথা বলা বোধ হয় আবশ্যক। কথিত ভাষায় লিখিতে গেলেই যে তা'র ভিতর প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িবেই এ কথা আমি স্বীকার করি না। কথিত ভাষায় আমাদের দেশভেদে যতই কেন তফাৎ থাকে না, মোটের উপর সে ভাষারও বেশীর ভাগ কথা সকল দেশেই এক, তফাৎটা কেবল উচ্চারণের। কতককথা অবশ্য ভিন্ন—সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রয়োগ বা কৃৎ তদ্ধিতের চেহারা হয় তো খুবই ভিন্ন—কিন্তু এত ভিন্ন নয় যাতে তাকে এক ধাঁচে, একটা Standard dialectএ দাঁড় করান না যায়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা স্পষ্ট হইবে। বাঙ্গলার যে প্রদেশেই যাই না কেন কথিত ভাষায় "যাহার" বা "তাহার" কথার প্রয়োগ দেখিতে পাইব না, দেখিতে পাইব "যার" ও "তার"—তবে উচ্চারণে কোথাও যার "য"টা zএর মত হইয়াছে, কোথাও বা সহজ J, কোথাও বা খুব sharp j—হইয়াছে। "পুকুর" কথাটা সকল দেশে না চলিলেও বেশ ব্যাপকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় রহিয়াছে—তবে কোথাও বা তাহাকে বলে "পুকুর" কোথাও "পুখুর" কোথাও "পুখোইর।" "কাত" কথাটা সব দেশেই আছে। তবে কোনও দেশে বা তা'কে বলে সোজাসুজী কাৎ, কোথাও বলে "কাইৎ"। এমন অনেক শব্দ চলতি কথায় আছে। আর ক্রমশঃই সেগুলির একটা standard উচ্চারণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে, সেটা যে সব সময় খাঁটি কলিকাতার উচ্চারণ তাহা নহে। এই দরুণ "দুপুরে"র খাঁটি কলিকাতার কথা "দুকুর" কিন্তু standard ভাষায় সেটা "দুপুর"—লুচিকে "নুচি" এবং "নৌকা"কে "লৌকো" standard ভাষায় বলে না। "করলুম" ও "গেলুম"এর চেয়ে "করলাম" ও "গেলাম" এই standard ভাষায় চলতি বেশী। এই যে standard ভাষা ইহার উচ্চারণ প্রণালী অনুসরণ করিয়া যদি এই সব শব্দ লেখা হয় তবে বাঙ্গলায় কোনও দেশ নাই যেখানে ইহা বোধগম্য হইবে না। কতক কথা—বিশেষতঃ কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের নাম আছে তার সম্বন্ধে হয় একথা বলা যায় না যথা, কলিকাতার ভাষায় ধুচুনি চুপড়ি প্রভৃতি, আমাদের ভাষায় ছোচা, ধুতি প্রভৃতি। তা'ও জিনিষের কথা লিখিতে গেলে প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার ছাড়া তো উপায় নাই। হোচা বা খরা বলিতে যে জিনিষ বুঝায় এবং হোচা বাওয়া বা খরা বাওয়া যে ক্রিয়ার নাম তাহাকে আমরা সাহিত্যের ভিতর আসিতে দিব না একথা বলা চলে না। আর যদি সাহিত্যে আনিতে হইলে যদি তাহার একটা পোষাকী নাম দিতে যাই তাহা হইলে যে একটা কঠিন ব্যাপার হইবে। সুতরাং "হোচা বাওয়ার" কথা যদি আমার লিখিতেই হয় তবে "হোচা বাওয়া"ই লিখিতে হইবে। এবং যিনি আমার কথা বুঝিতে চান তাঁকে অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটির মানে শিখিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। তবে, যাহা বলিতেছিলাম, এই শ্রেণীর প্রাদেশিক কথার সংখ্যা—সর্ব্বপ্রদেশের সাধারণ কথার তুলনায় কম। এমন কথা ব্যবহার করিবার অবসর খুব বেশী হয় না। এবং কদাচিৎ যাহা ব্যবহার করিতে হইবে সেই কথা লইয়া যে বিভ্রাট তাহাকে অতিমাত্র বাড়াইয়া একটা ভাষার বিভীষিকার সৃষ্টি করা সঙ্গত নয়।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা একটা আর্টের সমালোচনা করিতেছি। যে ভাষার সমালোচনা করিতেছি তাহাতে ভাষার সৌষ্ঠব ও শক্তি কতটা রক্ষা হইয়াছে কেবল তাহাই আমরা বিচার করিতে পারি। সেই বিচারে যাহা

ভাল দাঁড়াইবে তাহাই ভাল, তাহাতে যাহা মন্দ হইবে তাহাই মন্দ; তার পর তাহা হইতে হিত কি অহিত হইবে, সমাজের পক্ষে সেটা উপকারী হইবে কি অপকারী হইবে, জাতীয় একতার অনুকূল কি প্রতিকূল হইবেসে বিচার কেবল সাহিত্য হিসাবে ইহার সমালোচনায় সব মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

অভাবে।

পূরণিমা হ'তে অমানিশা ওগো!
অ মি, শতগুণে ভালবাসি;
অমানিশা কাল সেই মোর ভাল,
চাহিনা ফুল্ল শশীর হাসি।

অমানিশা রাতে ভাবি মনে মনে,
যাক্, আজিই হইবে শেষ;
এবে পূর্ণিমা আসিবে আসিবে,
না রহিবে তিল দুঃখ লেশ।

পূরণিমা রাতে জ্যোছনা জোয়ারে,
হই পুলকিত যত আমি;
থেকে থেকে মনে কে জানি কে বলে,
হের—আসিতেছে ঐ দুখেরি যামি।

শ্রীচারুভূষণ দেব চৌধুরী।

লুকোচুরি

লুকোচুরি খেল্‌বি কত আর
মা আমার?
হরিত চিকের আড়াল থেকে
পিকের গলায় ডেকে ডেকে
অইযে দিলি সাড়া!
অম্‌নি ছুটে কাছে আসি
হেসে পালাস্ সর্ব্বনাশী,
মা তোর কেমন ধারা?
প্রেমে তোমার পূর্ণ হৃদি—
নদীর কলকল,
শিউলি মূলে সিক্তচুলে—
আঁখি ছলছল!
অই যে তোমার রাঙা চরণ—
দীঘীর জলে ফুটি,
দিকে দিকে আঁচল খানি
পড়্‌ছে লুটি পুটি—
শুভ্র আকাশের বনে।
লুকোচুরি খেল্‌বি কত
মাগো আমার সনে!
কভু বেড়াস্ মেঘের রথে—কভু ছায়াপথে।
ধর্ত্তে গেলে পাইনা নাগাল,
ছুটে পালাস্ খুলে আগল,
আমি যে মা বদ্ধ পাগল
নিজের ঘরে ঘুরি।
ইচ্ছা করে বুকে রাখি
রাঙা করে পরাই রাখি,
কমল পরাগ অঙ্গে মাখি,
যাস্‌নে মাগো উড়ি।
হাসিভরা মুখখানি তোর
দেখ্‌ছি ভোরের বেলা,
অপরাজিতার খোপার মাঝে
কাল কেশের মেলা!
স্নিগ্ধসরস পরশ খানি
লাগ্‌ছে এসে বুকে,
আপ্‌নি এসে দিস্‌মা ধরা—
বাদর শেষে আদর করা;
চাইতে গেলে, "নাই" টি মেলে
তাই সে মরি দুঃখে!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

Regtd. No. C. 746.

VOL. 6. No. 7.

OCTOBER, 1916.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

By Special Appointment

To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

S. A. MAJID & Co.

Certificated Opticians

12 Patuatuli, Dacca.

OPTO—Eye. METRY—to Measure.

A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India

Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Raad, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ J. G. Cumming, C. S. I.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M. A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M, A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

The Problem of Moral Evil ...	Prof. G. H. Langley M. A. ...	185
Pseudo Callisthenes ...	Prof. J. N. Das Gupta, M. A. (OXON) ...	197
The Ceremonial of Tea or Cha-no-yu of Japan ...	Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E.	200
A Peep into the Intelligence Department of the Moghul Period ...	Khan Sahib Syed Abdul Latif B. L. ...	204
Life of Pestalozzi and His Method ...	Kunju Behari Har, M. A, B. L. ...	207

সূচী

	বিষয়।	লেখক গণের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	অশোক চরিত	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১৭৩
২।	উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ	১৮৮
৩।	গীতার সহজ তপস্যা বা আত্মোৎকর্ষের সহজ সাধন প্রণালী	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ...	১৮৮
৪।	রাক্ষস (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, ...	১৯১
৫।	আবার ভাষার কথা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ ...	১৯১
৬।	পুরীধাম (কবিতা)	শ্রীযুক্তা দাক্ষায়ণী দেবী	১৯৬
৭।	বঙ্কিম প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস	১৯৭
৮।	অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ	শ্রীযুক্ত সতীসচন্দ্র রায় এম্, এ	২০৩
৯।	ছোট কথা	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ	২০৫

THE DACCA REVIEW.

VOL. VI. OCTOBER, 1916. No. 7.

THE PROBLEM OF MORAL EVIL.*

It is the purpose of this paper to make an analysis of the experience of evil, to consider whether in any way it differs essentially from the experience of good, and to discuss the metaphysical assumptions which such an analysis implies. The problem may be approached by a brief exposition of its treatment in the writings of Croce. This modern Italian philosopher, in some important respects, confirms the belief concerning evil which is current in the Christian religion. The argument however is not pragmatical, for Croce's treatment of the problem is philosophical and entirely independent.

I.

Moral judgement is passed by Croce upon acts of will, and he assumes the reality of will. The latter is regarded as real, not merely as universal, but also as expressed in the acts of individuals, for apart from particular expressions will cannot exist. It is in the creativeness of will, he reminds us, especially in such acts as are moral, that we get the most complete experience of Reality. A brief exposition of Croce's thought concerning will is then necessary for an understanding of his view of evil. Finite will, he says, is a union of freedom and necessity. The question of the freedom of the will does not arise. Every act of will is free ; if it were not, it would not be will. Such an act consists in the creation in individual consciousness of an entirely new existence. It is necessitated in so far as it is conditioned by the situation in which it occurs, but is free in that it leads to a new creation. By the situation of an act of will Croce means the environment in which it takes place, the environment including both the external or natural surroundings and the internal or conscious. But he makes clear that the situation cannot affect the will save through the medium of the desires, or tendencies to action,

* Paper read before the Dacca Philosophical Society, November 1916.

within the individual consciousness. In affirming then that the creative act takes place within a given situation, Croce is maintaining—as against Kant—that it is realized in and through the desires.

Now as a positive reality every act of will is good. It satisfies a desire, or we might even say is an expression of the joy of creation. By it some end is attained which is sought by the individual, and whatever attains an end is, according to Croce, good. Here Croce is directly opposed to all those thinkers who regard every act of a finite being as an expression of evil. An act of will, they hold, springs from a desire, and a desire indicates a need, in other words an imperfection or evil. This is not the case in Croce. Will, for him, is spiritual activity, and the activity of the spirit is Reality. James Ward is also of this opinion. He argues that the theory which infers evil from the presence of finite will rests upon a false psychology. It may be that desire sometimes indicates dissatisfaction, and that the act of will is an attempt to supply a need; but it is also true that the natural exercise of the will is the source of all human joy. Man is not necessarily a spoiled child, always crying for something which he does not possess, but acts spontaneously because it is life so to act. And further it should be borne in mind that will is not desire, but the control of desire. Will transforms desire into the organ of its own creativeness.

The question now arises: if moral judgements have reference to acts of will, and if every act of will as a positive reality is good, what is evil? Croce's answer to this question seems to be twofold. Evil is either (a) weakness of will, failure to will; or (b) a moment in the volition which realizes the good.*

As regards the former alternative Croce describes evil as anti-will; and since by will he means the union of the free creative act with the necessity which flows from the situation in which it takes place, by anti-will he means the failure of the creative act to realize itself in the given situation. Such failure may take two forms. Anti-will may, on the one hand, appear as external determination by the conditions of consciousness, determination, that is, by the law of physical causation; or, on the other hand—paradoxical as this may seem—as the absolute loosing of the creative act from its conditions. This latter is the conception of will which Kant describes as the entirely free good will, but Croce has grasped the truth that the isolation of the will from its concrete situation is tantamount to the negation of will altogether. When thought is directed to the desires as the conditions of will, the failure of will appears as the strife of desire with desire, in contrast with will, which is the triumph of the creative act over the desires.

But evil is further represented as a necessary moment in the good volition. Although all acts of will as positive

are good, they may be classified into those which realize a merely personal end and those which seek the universal, that is, the moral good. This is not a distinction between good and bad acts. Those which lead only to personal gratification attain an end and so are good. Croce designates this as economic good in contradistinction from the moral good which realizes the universal. Although good, however, is not here discriminated from evil, the distinction renders the consciousness of evil intelligible. When, in a given situation, one seeks a personal end by an act of will, and thereafter apprehends the universal or moral good as it should be manifested in that situation, there may be contradiction between the personal end which is already attained and the moral good which is now sought. Thus the individual may become conscious of strife between personal gratification and the moral good; and, if so, he will understand that the moral good can only he attained in so far as the effects of the former act of will are annulled. Now it must be again remembered that the difference does not lie in the character of the desires which lead respectively to self-gratification and to the moral good. Desires, as such, are non-moral, and conceivably any desire can under appropriate circumstances become an expression of the moral good. Consciousness of evil arises when the two desires contend for dominance within the same situation. It is then found that within identical circumstances there can only be one expression of the moral good, and therefore that the good cannot be enjoyed apart from the suppression of desire for self-gratification. So an act of will which as a positive existence is a good (economic good) may be regarded as evil in so far as it strives against the attainment of the universal (moral) good.

Here, in the opinion of Croce, the explanation is found of the belief that evil cannot be sought as evil, but only under the form of the good. Drunkenness may be considered an evil, but no man seeks it in the moment when he comprehends its character as evil. In becoming drunk man gratifies a desire, and so far is experiencing a good. Its character as evil is only grasped with the advent of such voluntary activity as aims at the actualisation of the moral good, which is destined to supplant the merely personal desire. Thus drunkenness is sought as a good, but not being the moral good, is subsequently experienced as an evil contending with the moral good. It is only evil then in so far as a further voluntary process is initiated by means of which it must be negated.

Some light may be shed upon Croce's theory by applying it to a particular instance of moral evil. We were told not long ago that when the bodies of prisoners who had died from typhus through neglect in the camp at Wittenberg were carried out for burial, they

were frequently greeted with cheers by the inhabitants of that city. There can be no question as to the moral character of this act by which the dead were insulted, and we will endeavour to apply the analysis to this instance. Firstly, the judgement is passed upon an act of will which realizes an end within a given situation. The situation is the highly intense emotional condition of a people at war in the presence of an object which has stirred the emotion. The end attained is the gratification of personal desire by insulting the dead, and this according to Croce creates an entirely new condition of consciousness. As an act of will attaining this personal end it is good; but it is possible to imagine that the people of Wittenberg after gratifying their desire, became conscious of a wider good involving the duty to respect the dead by controlling present emotion. Apprehension of this wider good would necessarily be accompanied by awareness of its opposition to the former act of self-gratification, and would lead to a volition negating its effects. This experience of opposition is the consciousness of evil. Showing disrespect to the dead as an act is good, but as negating the realisation of the good in that situation it is evil. As evil, however, it has already ceased to exist, and only remains as awareness of opposition to the positive process by which it is being supplanted. Evil as failure of will would have been illustrated had the situation culminated in irresolution instead of in the act by which the dead were insulted.

In this opinion Croce is opposed to those who deny the reality of evil. Evil is not an illusion, but is real, although not real as a positive existence. Further, he is opposed to those who assume that the good is transcendent, and that all actual experience is necessarily evil. On the contrary, experience is essentially good; and the moral good, if it is to be attained, must be realized in acts of the finite will. Thus emancipation is not the fruit of an intuitive apprehension of the soul's identity with the one eternal and infinite Spirit, in which the distinction of objects is submerged and every desire stilled;* but consists

* So far as I understand the main current of thought in Hindu philosophy, evil is there supposed to have its origin in ignorance (অবিদ্যা or অজ্ঞান), since ignorance gives birth to desire (বাসনা) which is necessarily accompanied by pain (দুঃখ). By ignorance is meant absence of true knowledge, *i. e.* knowledge of the Self (আত্মা) as identical with the one infinite, eternal, and unchangeable Spirit (ব্রহ্মন্). It does not, therefore connote that which is commonly implied by this term, but signifies rather what is generally described as knowledge, to wit, the knowledge which implies consciousness of a 'many', and distinguishes between particular objects. Ignorance thus includes the knowledge of the plain man and even that of the scientist. From such discrimination of objects of experience there necessarily arises the desire for some of these objects; and since desire implies a want—the absence of the desired object—it is a sign of imperfection, and is accompanied by pain. For this reason salva-

rather in the spiritualising of desires by means of that spiritual activity which flows from the comprehension of the universal. *

II.

We pass now to the statement of our own attitude towards the problem of evil by a comparison with Croce's theory.

In our opinion Croce is right in insisting on the reality of will as creative spiritual activity, and in emphasising the fact that the good must be realized in the actual circumstances of life by acts of the finite will. He is also right in his assumption that there are grounds for belief in the final triumph of the good. We hold, however, that he errs in his opinion that no moral distinction can be made between good and bad acts of will, so far as their actual existence is concerned, all alike in this respect being good.

Surely the essential feature of a morally bad act of will, is that the individual is conscious of the good at the moment of its performance; and in this it differs radically from every good volition. Croce assumes that a moment of time intervenes between the act of will which realizes a merely personal end, and the apprehension of the moral good. But is this so? On the contrary, do not the diverse ends strive together in the same consciousness? The objection may be raised that this may also be

tion (मुक्ति) is attained by the intuitive knowledge of the Self as identical with Brahman. This knowledge is the immediate experience of unity, in which there is no distinction between 'this' and 'that' or 'mine' and 'thine,' and in which therefore there can be no desire. In such a state, the operations of karma (कर्म) are transcended. Hence the ideal is not control of the desires, but their negation. It is recognized that good actions can modify the effects of evil actions, but emancipation is attained by knowledge and not by karma.

In stating what seems to me the main current of Hindu thought concerning evil, I am aware that other tendencies are also present. Although almost all Hindu systems agree as regards the origin of evil there is difference of opinion about the way in which liberation is attained. Some regard karma as the way of salvation. But they do not, like Croce, value good action for its own sake. Both good and bad action binds to earth, and it matters not whether we be bound by iron or by golden chains. Good action is only of value in so far as it prepares the way for a condition which transcends all activity. There is a difference of opinion also as to the kind of knowledge which gives salvation. Some regard the unity of the self with Brahman as the means, others the knowledge of the distinction between the self (पुरुष) and the not-self (प्रकृति).

* James Ward has some interesting remarks which are relevant here. He claims that the subject or noumenal Self is not out of time, save in so far as it is out of that abstract time, which destroys the continuity of creative processes. It is 'duration,' for the fact of 'duration' is implied in the fact of free activity or creativeness. Should this truth be grasped, it will be seen that the reality of the Self cannot be known by transcending and negating finite desires, but that it must be comprehended as expressed in and through individual experience. [Realm of Ends. Chap. XIV.]

characteristic of good acts of will since the desire for personal gratification may be compresent in consciousness and strive against the good. There is however a difference which is fundamental. In the case of the good act we are conscious of the desire for personal gratification as bad, and therefore as a desire to be suppressed ; whereas in the case of the bad act there is consciousness of the good as good, and so as that which ought to be willed.*

The exposition of the difference in point of view may be connected with the conception of freedom. For Croce, will is free spiritual activity which creates something entirely new in a given situation. But since every act of will is good, the fact of evil does not depend upon the fact of freedom. For us on the other hand evil signifies a misuse of freedom. The self chooses a merely transitory pleasure while it is conscious of the good. It was capable of choosing the good, and should have done so, but did not. For Croce, the self automatically chooses the good, a lower good if it is only aware of such ; but immediately it recognises a higher good it apparently leaves the lower by an inner necessity, and wills the higher.

Apart from some fundamental difference in good and bad acts of will it would not be possible for their effects to be so diverse, and there can be no doubt as to their diversity. In the first place such effects are differently related to future good volitions. The good is not completely attained in any single act of will, and any volition which expresses the good must bear some essential relation to preceding acts of the same individual. If the preceding acts are good their effects become embodied in volitions which further realize the good. The series of volitions is constructive, all subsequent volitions building upon the results of those which are past. This is not the case when the preceding acts are bad. Then the results are not embodied in the good volition, but must be annulled, otherwise the latter cannot take place. The effects of evil acts must be destroyed, but the effects of good acts make a permanent contribution to the realization of the good. Secondly, the difference is not only one which concerns the objective nature of the act, but it influences the subjective spiritual activity which is the source of the change. Every bad volition weakens the will for good, whereas this is strengthened by volitions which are good. Subjective

* There is a contradiction between Croce's assumption that the act of will seeking personal gratification and the apprehension of the good must be separated by a moment of time, and his further assumption that the personal end and the good are ends for the same situation. If they were not ends for the same situation one fails to see how there can be opposition between them, for any end can conceivably represent the morally good in some situation or other. Surely if they contend for the same situation they must be compresent in consciousness, for the act of will necessarily creates a new situation.

spiritual activity cannot be known as an object, yet every individual can become acquainted with this truth in his own experience, and by an examination of the characteristic effects of good and bad volitions. Thirdly, although the evil volition may gratify a temporary personal desire, it is the good alone that can give abiding satisfaction to the deeper needs of the Self. When an individual turns from evil desire to seek the good, he becomes aware that it is in the good alone that he can find true satisfaction. For this reason evil leads to discord within individual consciousness, and good to unity. Finally, evil seeking personal ends implies strife with other individuals, while good aiming at the universal means concord.

This view is confirmed by an examination of actual instances of moral evil. One or two examples from the works of Shakespeare will serve our purpose. The truth of the poet's descriptions must finally be judged by each one for himself from his immediate experience of evil. Shakespeare is an unprejudiced exponent of the psychology of the soul. He had no concern for any philosophical theory. His interest was entirely human, and he was gifted with extraordinary insight into the working of man's mind. In 'Macbeth' a veil is lifted, and the reader is permitted to behold the hidden working of spirits distraught with evil desires and performing evil acts. The emotions aroused by the witches in the mind of Macbeth as he conversed with them on the heath war against those nobler thoughts which were awakened by the voice of the upright Banquo. Retiring from the chamber of the sleeping king Lady Macbeth exclaims:

"Had he not resembled
"My father as he slept, I had done't"

She was more eager than her husband for Duncan's death, yet could not expel that sense of mercy which rebuked and restrained her. The sudden and bitter remorse of Macbeth after committing the murder also teaches the same truth. Again Shakespeare attributes the malignant effects of evil to this fact of the compresence of the good. The haunting consciousness of the good never leaves the victim of evil desire. It banishes sleep, and gives birth to utter despair:

"Methought I heard a voice cry,
'Sleep no more!'
Macbeth does murther sleep."

It is clear then that the good is in some way compresent in consciousness. When evil passion is actually being gratified, it cannot be present as willed; for, just as it is impossible to think two contradictory objects, so it is likewise impossible in the same situation to will two opposed ends. Still the good is present and is desired, although this desire is suppressed by the will for immediate pleasure. Further the gratification of the passion is willed as offering satisfaction *i. e.* as good, and not as evil. Macbeth and Lady Macbeth were bent on worldly power. But it does not follow that because an evil

act must be willed as good, it is necessarily good; on the contrary this seems to me to prove the instability of evil. For whereas good is always willed as good, evil can only be willed under the form of good.

A similar result is obtained from an ethical analysis of evil in a life. A study of Iago's character shows above all things that Iago is conscious of the good, although he deliberately planned to satisfy his brutal lust of revenge for Cassio's promotion. Conscious of the truth he lied—lied not only in word but in life.

'Though I do hate him as I do hell pains,
Yet for necessity of present life,
I must show out the flag and sign of love,
Which is indeed but sign."

The perpetration of his villainy involved the ruin of an entirely innocent and virtuous woman, who had done nothing to harm him. Iago was not only aware of this necessity, but was aware also that it was most vilely wrong; and yet he persisted. Undoubtedly he imagined that he would gain some personal satisfaction, but this does not redeem the character of his acts. With unerring judgement too, Shakespeare has indicated the disintegrating effect of these deeds of darkness. You remember those words of the dying Othello when he was told that Iago still lived.

"I am not sorry neither: I'd have thee live;
For, in my sense, 'tis happiness to die."

III.

The morally good act has been described as an act which expresses the universal in a given situation, and the evil volition as that which frustrates this kind of expression. The question now arises, what is this universal, and what exactly is meant by the affirmation that it may be expressed in a volition? The answer will lead to the metaphysical assumptions which are here implied. Many attempts have been made to define the universal good, but all alike appear to us to be unsuccessful. A significant characteristic of the 'good' seems to be that it evades definition. Does it follow then that 'good' is a meaningless conception, and that when we talk of realizing the good in a particular situation we are using a meaningless phrase? In no way. We simply imply thereby that it is truly universal. No universal can be defined. If it could, it would not be universal. A thing is not definable, unless it is commensurable with some other thing or things, and a true universal is incommensurable in its absolute completeness with any specific thing or things, or series or group of things. The good is everything which is good, but transcends all. It cannot be particularised in any single good or aggregate of such goods. This truth is borne out by ordinary experience. When a man says 'This is my duty,' is not duty something that obstinately, by its very essence refuses to be pinned down to

doing this or that, or to any combination of thises or thats? It is in the situation but goes beyond it, and beyond any thinkable sum of particular duties. The whole duty is willed in willing each duty, but is never exhausted by any or all experience. And yet the plain man wills it simply despite its indefineableness. It is in one sense the best known of all things, and in another, the least known, that is, the least circumscribed. If we try to define it by marking it down within limits the plain man objects. The prescribed duty is not the duty he wills. *

How can this universal good which transcends both the particular thing and the individual consciousness, be accounted for? Two explanations are presented to us. The first is as ancient as the writings of Plato, and as modern as those of Mr. Russell. According to this theory universals are unchangeable, and subsist in an eternal supersensible world. They are distinct both from particular things and from active spirit. It appears to us however that this view hypostatizes an abstraction, for as we have seen in this discussion, the universal is expressed in a definite situation through the activity of spirit, and we are not justified in assuming that it exists apart from either. The second explanation, however, remains. The universal may find its home in spiritual activity, and it is to spiritual activity that Croce ascribes its reality. Thus for him the universal is not a static changeless being, but on the contrary is life or creativeness. Neither is it divorced from the particular, for Spirit is ever expressing itself in particular situations.*

One metaphysical assumption is now evident. The finite individual in willing the good wills a universal that transcends the limits of his finite consciousness. This universal is spirit. Hence it follows that a spirit which transcends human spirits exists. In willing the good the individual is identifying his spiritual

* The character of the good as a universal is not affected by any theory of the development of the consciousness of good. It may be assumed that the sense of the good has evolved from beings entirely controlled by self-regarding impulses, as the result of the social habits of such beings. The self-regarding impulses, it may be considered, lead to society, and with society there begins to appear the distinction between good and bad acts, *i. e.* between those that tend towards the welfare of the society and those which do not. This distinction is first made in reference to the conduct of others, but afterwards judgement is passed on the Self. Be this as it may, the good as we are at present aware of it, possesses a certain essential character, and this cannot be wrested from it by pointing to the humbleness of its parents.

* "What is the universal? It is the Spirit, it is Reality, in so far as it is truly real, that is, in so far as it is the unity of thought and willing; it is Life, in so far as realized in its profundity as this unity itself; it is Freedom, if a reality so conceived be perpetual development, creation, progress. Outside the Spirit nothing is thinkable in a truly universal form." Philosophy of the Practical p. 444.

creativeness with the activity of the transcendent Spirit; or in the language of religion he is identifying his will with the will of God. "He wills" says Croce, "not his own self individualised, but that Self which being in all selves is their common Father.

A second ultimate assumption must be inferred from the discrimination of good and bad volitions. If, as we maintain, an act of will can, as a positive reality, be bad, the spring of spiritual activity in a finite being may be defiled. At the same time consciousness of the good as duty is an unassailable proof of the existence of a transcendent spiritual being who is not only incorrupt, but incorruptible. It is necessary, therefore, to distinguish between finite spirits and the supreme Spirit, and to maintain the relative independence of the former. In other words the analysis implies the truth of some form of theism.[1]

1. It may be asked: if there be a supreme spiritual Being, and if He be good, why does He permit the existence of real evil, even for a limited period? The answer to this question is in the fact of the existence of finite spiritual beings who are free and creative. The demand for the abolition of evil from the world amounts to a demand for the abolition of spiritual freedom from finite beings *i. e.* a demand for the abolition of the moral order. Now the perfection of God's creativeness is reached in His power to create finite beings spiritually free like Himself; and thus again, the demand is a demand for the negating of God's perfection.

IV.

There is an interpretation of evil which is world wide in its influence, and has been found for centuries in the thought of many races of people. It appears for instance in the Christian scriptures, the Bhagavad-gita, in the works of Plato and in the writings of some modern philosophers. Evil is here regarded as the struggle of the natural man against the spiritual, resulting in the subordination of the spiritual to the natural. A consideration of this view may throw some further light on our problem, and we will refer to it, as it is expressed in the writings of the German philosopher Eucken.

When by introspective analysis we examine self-consciousness, Eucken believes that we become aware of dual tendencies, which he describes respectively as natural and spiritual. This distinction is not between the physical and the psychical, but is a distinction within consciousness itself. The natural are those tendencies within consciousness which are the result of man's bodily nature, and of his connection with the physical world; whereas the spiritual are tendencies in an opposite direction and are revealed in aesthetic, moral and religious consciousness. As desire for Croce, so the natural for Eucken, is not in itself evil, but evil emerges with the struggle of the natural against the spiritual, and in the attempt of the former to rule the latter. The function of the natural is to obey, and

that of the spiritual to rule, and evil consists in the subversion of this authority. Plato's account is similar. The appetites and spirit belong to the natural man, whereas reason corresponds to the spiritual for Eucken. Reason is the rightful ruler of the citadel of the soul, and evil exists when the place of Reason is usurped, and it comes under the control of the appetites.[1]

Eucken makes clear that consciousness of evil only emerges with awareness of the spiritual, and the effort to attain thereto. It is a sign therefore of the reality of the spiritual, and carries with it the proof of its own condemnation. Hence it follows that the sense of evil will increase as one becomes more alive to the spiritual; the truth of this is confirmed by religious autobiography.

Again consciousness of the spiritual is evidence of the existence of an objective spiritual world which transcends individual existence, but with which the individual must be related. It is through the power of this transcendent spirituality that we become assured of victory in our strife with evil. Nevertheless before the individual can triumph he must make the power of the spiritual world his own. Such power does not assert itself externally but only through his own personality, and therein Eucken recognises the reality of the finite will.

From this account also then we see that evil is regarded as real, since connected with the will which is real, although it cannot claim the same value in Reality as the good. Consciousness of evil only emerges with consciousness of the good, and together therewith the recognition of the right of the good to triumph over evil. At the same time it is recognised that the bad volition is not merely evil as negative, but that there is a difference in positive character between the act of will which is bad and that which is good. The evil volition born from natural desires is an effort to annul that activity which arises from the apprehension of the spiritual world. Springing from the self it ends with the self as an individual, and thus opposes the activity which, born of the universal or

1 It may be interesting to consider the exact nature of such subversion of authority.

(1) Does the control of the spiritual activity of the self by natural desires mean a negation of the free activity by the pressure of impulses which act as natural forces; that is, the subjection of the will to the causality of nature? This was Kant's view. It assumes that so far as any change springs spontaneously from pure spiritual activity it is good, for the pure will is good, and thus actions in so far as they are free are good. Or (2) does it mean that free spiritual activity is identified with the tendencies of certain natural desires. After all, desires are not actions, but only incipient actions; they do not become actions until the Self is identified with them. This seems to me to be the true explanation. If (1) is true, evil can at most be weakness of will; while the truth of (2) implies badness of will.

spiritual, seeks to attain a good which is the good of all.*

V.

It may be considered fitting that we should attempt to apply this analysis of moral evil to expressions with which we have been familiarized in the present war. So in conclusion we will make one or two brief remarks to indicate the way in which such an application is possible.

First in so far as the war presents examples of the way in which lust for material power and national ambition overrides the consciousness of the good, there is no difficulty. The only point which it is necessary to note is that self activity, although opposed to the good, has been in a measure identified with national purpose. It is however always difficult to define the limits of the self. The life of a country gentleman may be thoroughly selfish although he takes pride in his large estates, his mansions, and his family traditions. And the nation may be merely a bigger family, a wider self, whose demands prevent us from responding to the claims of justice and humanity.

But secondly, suppose the individual, unconscious of a wider good, identify his will in an entirely unselfish way with the spirit of the nation, while the latter viewed objectively must be condemned as bad. In willing, the individual is not conscious of any opposition to the universal good. What he seeks is, for him, the good. And it certainly is not personal good, but is a good for which he is prepared to sacrifice his private advantage. What judgement then are we to pass upon such action? If our analysis be correct it must be pronounced good; and we believe that because good, the sacrifice—though mistaken—will build up greatness of character.

Finally, can the analysis be applied to what might be termed national acts? It is impossible to discuss here the validity of the concept of a national will, but there is a national consciousness of the good, and there are also national impulses which may conflict with such consciousness. Thus if the general trend of a nation's activity is determined by impulses which, aiming merely at that nation's prosperity and self preservation, conflict with the people's sense of the universally good, national life is evil; on the other hand, in so far as a nation's activities are determined by the good, they must be approved. Neither is there here less ground for faith in the final victory of good. A nation given to evil is a nation at war with itself. Deep down is the consciousness of good and the recognition of its worth, while above are surging waves of base passion. It may be that in their whirling motion these appear to have immense volcanic

* For the purposes of this discussion the 'spiritual' in Eucken may be taken as identical with the 'universal' in Croce.

force, but their merciless and unrestrained power is destructive; they forbode downfall not to the good, the rock against which they dash themselves, but to their own dread impetus. Driven on by passion for national self aggrandisement, frantic protestations are made of allegiance to the good; every action, however unworthy, being paraded under its banner. Proclamation is thus made of the right of the good to triumph. But how different the nation in so far as, with singleness of aim, it is devoted to pursuit of the good! Its life is not disrupted by contrary forces. Instead of frenzied motion, the entire energy of the nation tends to converge into one strong, deep life current, bearing its peoples towards their spiritual well-being, and bringing health to the world. [1] [2].

G. H. LANGLEY.

1. It is evident that a nation whose general activities must be regarded as evil, may contain within it individuals who make the nation's will their own, and yet who must be judged as good.

2. The metaphysical presuppositions depend entirely upon the analysis of evil as it exists in individual consciousness, and are not affected in any way by the truth or falsity of these remarks on national evil.

PSEUDO CALLISTHENES

II

The Oriental Translation Fund has been the means of placing within our easy reach in an acceptable form English versions of a number of immortal Classics of the Eastern World. These are not confined to any one branch of thought and literature, but relate practically to every department of Belles Lettres, History and Philosophy. To the histoircal student, one of the most interesting of these, is a volume entitled 'History of the Early Kings of Persia' which came to our hands so far back as 1832. The work is a translation from the original Persian of Mirkhond (Muhammad Ibn Khavand Shah) who died A. H. 903, at the ripe old age of 66. The translator is David Shea, who was attached to the Oriental Department in the East India Company's College—a name which to us in these competition days is a pleasant reminder of the old Haileybury of John Company. To the wider general interest which attaches to this volume, I propose to revert in a separate paper on a subsequent occasion. To-day I am anxious to invite reference to those sections of this Persian History in which our author deals with the reign of Darab and portrays the character and traces the career of Iskander, and I hasten to point out the

close and striking resemblance between these sections and the corresponding sections in the Syriac version of the Pseudo-Callisthenes. Indeed the correspondence is so close as inevitably to suggest the conclusion that here we have one of the Persian versions of the story embodied in the Pseudo-Callisthenes, though Mirkhond himself tells us that his account of the last moments of Darius is taken from *Tarikh Moajem* and whatever is related more at large in the *Mabsut* is by him recorded in the life of Iskander. Budge observes, "Between the 10th aud 14th Centuries a large number of works based upon Arabic compositions, were written upon Alexander and his deeds by Persian writers. Of these the most important are the histories of Firdausi, Nizami and Mirkhwand." The question which is thus raised regarding the relation between Mirkhond's History and the Pseudo-Callisthenes in its Syriac version cannot be profitably discussed here. But the close correspondence between the two to which I have invited attention is indicative of the once wide diffusion and general acceptance of the legendary story.

In reference to the last moments of Darius, and Alexander's bearing on the occasion, Mirkhond has the following—the *Mabsut*, as he tells us, being one of the main sources of his information :—

"At last, two of Dara's principal courtiers, urged on by their depraved natures and corrupt heart, conspired to assassinate him ; thinking by such a deed to procure the friendship of Su-ul Kurnain :—

'Alas' O vain imagination' O groundless hope ! "

Before they could employ sword or dagger to effect their purpose, Dara, perceiving the design of the traitors, reproached them with their ingratitude, and recalled to their minds how profusely he had lavished favour on them, during a continuance of many years. Last of all, he said : 'Do not build on my assassination as the means of recommending yourselves to Zu-ulKurnain's friendship : he is a sovereign ; and although princes are sometimes enemies to each other, yet they invariably put regicides to death, and look on it as unlawful to spare the murderers of a king.'

'Our former friends pay no attention to any thing :

Whatever I utter makes no impression on them.'

The two traitors, with the blows of their well-tempered sabres, soon hurled him to the ground, from off his fleet courser's saddle ; but before the vital spirit departed, Iskander, having opportunely come up, raised on his knee that head which yesterday was adorned with the imperial diadem, and which today he beheld dishonoured and prostrate in the dust. Having wiped the dust off Dara's face, and laying his hand on his breast, he exclaimed, with tears ; 'O king, if you banish alarm from

your bosom, and raise your head from the dust, I swear, by the Lord of Heaven and earth, that I will give you back your kingdom, your treasures, and all your possessions. Arise, Think no more of the past; grieve not to excess at the occurrence of calamity; for in the season of adversity princes surpass all mortals in patience. Let me know from what source this great calamity has befallen a powerful monarch like you, that I may inflict vengeance.' Dara kissed Iskander's hand; and placing it on his face, he wept, and thus made answer: 'O Zu-ul-Kurnain' never permit pride or presumption to find access to your soul: become not arrogant through the splendour of royalty. When you observe how the world has treated me, be apprehensive for yourself: place no reliance on the permanence of worldly prosperity; and be on your guard against the treasons of fortune and the revolutions of life; for accidental reverses allow no person to remain long in one state. The following is what I expect, from the excess of your goodness, and your perfect compassion that you regard my mother as your own; look upon my wife as a sister; and bind yourself in marriage to my daughter Rusheng. Iskander solemnly promised to execute all these requests: after which Dara

'Numbered some few moments longer, and ceased to exist.

The world said, with a smile, 'He, too, is now no more.

Zu-ul-Kurnain ordered the body of Dara to be washed in musk and ambergris, wrapped up in funeral clothes of gold and silver tissue, and to be laid in coffin set with all kinds of precious stones: ten thousand soldiers, with drawn swords, marched before the bier: the same number followed it; the same on on the right, and as many on the left. Zu-ul Kurnain was enabled to commit to the tomb the body of Dara in a manner suitable to the rank of a powerful king, in consequence of an agreement entered into with the chiefs and princes of Farsistan ;and no sooner had he terminated the funeral ceremonies, than they affixed to two gibbets, at the head of Dara's tomb, opposite each other, the two false traitors who had conspired against their lord; and suspended them by the neck.

After this, Iskander married Rushing.'

From the materials before them, our friends will have little difficulty in forming their own conclusions regarding the identity between Mirkhond's version and the Pseudo-Callisthenes. This similarity is equally noticeable in the subject-matter of the next incident in the career of Alexander to which I have now to refer, namely, his encounter with the Indian sovereign, Porus.

J. N. DAS GUPTA.

THD CEREMONIAL TEA OR CHA-NO-YO OF JAPAN.

The history of Tea.

Tea is not indigenous in Japan; indeed it is doubtful whether it is even really indigenous in China, whence it was brought to Japan eleven centuries ago by one of those wandering Buddhist monks, of whom there seems to have been in remote ages, an almost continuous stream coming through Korea to the land of *sun-rise* (Nihon) teaching and converting. Reading and writing, the making of porcelain, music, dancing, even a sort of foot-ball played with a shuttlecock and Heaven knows how many other arts and accomplishments, all were introduced in the same away. As for tea, it has been stated (in Japanese works) that though it has been cultivated for so long in China, of its first appearance there is no record; its true home is India. To this day, the finest tea, it is said, comes from Manipur and forms an important item of the Raja's income.

Legend about the origin of Tea

The Indian theory about tea would seem to be borne out by a Buddhist legend of the holy Indian saint Dharum (Dharma). He, it appears, like the Hindu Sanyasis, whom he would presumbly have looked upon as an abomination, was in the habit of taking upon himself austere vows. Upon one occasion he swore that for a term of 2 years he would not take his hands out of his sleeves. Once it chanced that, as he sat wrapt in contemplation, a wasp came and settled upon his forehead. This was trying, but the holy man was steadfast; his hands remained locked, and he only tried to wrinkle the creature off. On another occasion he bound himself to read the sacred books for a spell of time without sleepiug. But at last after long nights of studies, he was overcome, sleep conquered. When he awoke he was penitent and so ashamed that he drew a knife and cut off his eye-lids, in order that they might never close again. But the eye-lids thrown on the ground changed; assuming the shape of plants; they budded and took root and so was born into the world Tea, as a homoeopathic treatment for heavy, drowsy eyelids. The saint Atisha (Dipankara Srijnana of Bengal) when in about 1015 A.D. he was residing near Lhasa, an honoured guest of the king of Tibet, being once regaled with tea, declared that it resembled *Amrita*, the drink of the gods. To him tea had appeared as *soma rasa.*

The ceremonial tea

The ceremonial tea must not be confounded with the ordinary serving of tea for refreshment. The proper making and serving, and drinking of the ceremonial tea is the most formal of social observances, each step in which is prescribed by a rigid code of etiquette.

The tea, instead of being the whole leaf, such as is used for ordinary occasions, is a fine green powder. The infusion is made, not in a small pot, from which it is poured out into cups, but in a bowl, into which the hot water is poured from a dipper on to the powdered tea. The mixture is stirred with a bamboo whisk until it foams, then handed with much ceremony to the guests, who take it with equal ceremony and drink it from the bowl, emptying the receptacle at three gulps. Should there be a number of guests, tea is made for each in turn, in order of their rank, in the same bowl. For this ceremonial tea, a set of utensils is used, all of antique and severely simple style. The charcoal used for heating the water is of a peculiar variety; and the room in which the tea is made and served is built for that special purpose and kept sacred for that use. This art, which is often part of the education of women of the higher classes, is taught by regular teachers, often by gentlewomen who have fallen in distressed circumstances. It is said by the Japanese versed in the most refined ways that a woman who has learned the tea ceremony thoroughly is easily known by her superior bearing and manners an all occasions.

Miss Alicia Bacon from whose work on "Japanese girls and women" I have derived much of my knowledge of matters Japanese, writes as follows:—I remember with great vividness a visit paid to an old lady living near a provincial city of Japan, who had for years supported herself by giving lessons in this politest of arts-the *chanoyu*. Her little house of the daintiest and neatest type, seemed filled to overflowing by three foreigners, whom she received with the courtliest of welcomes. At the request of my friend, an American lady engaged in missionary work in that part of the country, she gave us a lesson in the etiquette of the tea-ceremony. Every motion, from the bringing in and arranging of the utensil to the final rinsing and wiping of the tea bowl, was according to rules strictly laid down, and the whole ceremony had more the solemnity of a religious ritual than the lightness and gaiety of a social occasion."

The discovery of the wonderful virtures of tea has been attributed to an Indian Yogi in very early times. In his wanderings in Maha Chin, he taught the Chinese the use of tea-*cha*. Who this Yogi could be, if presumably not the Mahadeva of the Hindus, whose home is on mount Kailas, the most sacred of all places on earth to the Indians and the Buddhist of Mongolia, Tibet and China alike?

Regarding the ceremonial tea Lord Redesdale in his "Garter Mission to Japan" observes as follows:—

"Tea sipping as a fine art! Why should it not be so? In the children drawing pictures on the sand or in the savage carving on a rock, was the promise of a Raphael or a Michael Angelo. How much more is the

drinking of a beverage, which began with the transcendental contemplation of a Hindu anchorite, entitled to develop into a hand-maid of religion and morality ? That calmness of mind, that serenity of temper, that composure and quietness of demeanour which are the first essentials of *cha-no-yu*, are without doubt the first conditions of right thinking and right feeling. The scrupulous cleanliness of the little room, shut off from sight and sound of the madding crowd is in itself conducive to direct one's thought from the world. The bare interior does engross one's attention like the inimitable pictures and bric-a-brac of a western parlour. The presence of kake monos (hanging scroll pictures) calls our attention more to grace of design than to beauty of colours. The utmost refinement of taste is the object aimed at, whereas anything like display is banished with religious horror. The very fact that it was invented by a contemplative recluse, in a time, when wars and rumours of wars were incessant is well calculated to show that this institution was more than a pastime."

Japanese view of the Cha-no-yu.

"Before entering the quiet precincts of of the tea-room, the company assembling to partake of the ceremony laid aside, together with their swords, the ferocity of the battle-field or the cares of Government, there to find peace and friendship. A *cha-no-yu* is more than a ceremony. It is a fine Art ; it is poetry with articulate gestures for rhythms ; it is a modus operandi of soul discipline. Its greatest value lies in this last phase. Not infrequently the other phases preponderated in the mind of its votaries, but that does not prove that its essence was not of a spiritual nature ! That is the way in which a Japanese gentleman and scholar looks upon 'cha-no-yu'". ('Bushido', by Inazo Nitabe, pp. 33-34.)

Tea, according to the Japanese historians, was introduced from China by the followers of Huyen-tshang and his disciples who had spread the altruistic form of Buddhism known as 'Mahayana' or the greater vehicle for going to supreme beatitude 'Nirvana'. They in China, Korea and Japan, created the ritualistsc ceremony of 'cha-no-yu' evidently to justify their drinking of tea infusion, because Buddhist monks are precluded from taking liquid in any form except pure water. They are even not allowed to take milk after midday i. e. 12 A.M. to 6 A.M. In Burma, Siam, Cambodia and Ceylon, good Buddhist monks even do not drink tea-infusion after midday. Unable to do without such an excellent beverage as tea, which cheers but not inebriates, they have invested the ceremony of 'cha-no-yu' with much solemnity. The Japanese with there characteristic love of refinement. have turned the method of taking tea into a fine Art. Although drinking tea-infusion is universal in China in the manner it is in Japan, the 'cha-no-yu' ceremony is not known in China,

New-year Festivities in Japan.

First among the annual festivals, and bringing with it much mirth and frolic, comes the Feast of the New-year. At this time father, mother, and all other members of the family lay aside their work, and their dignity, and join in the fun and sports that are characteristio of this season. Worries and anxieties are set aside with the close of the year, and the first beams of the New-year's sun bring in a season of unlimited joy for the children. For about one week the festival lasts, and the festal spirit remains through the whole month, prompting to fun and amusements of all kinds. From early morning until bed time the children wear their prettiest clothes, in which they play without rebuke. Guests come and go bringing congratulations to the family and often gifts for all.

The children's stock of toys is thus greatly increased, and the house overflows with the good things of the season of which 'mochi' or cake made from rice-dough, prepared always specially for this time, is one of the most important articles. The children are taken with their parents to make New-year's visits to their friends, and to offer them congratulations, and much they enjoy this as dressed in their best they ride from house to house in 'jin-rikshas' or 'kurumas'. And then, during the long, happy evenings, the whole family including even the old grand-father and grand-mother, join in merry games ; the servants, too, are invited to join the family party, and, without seeming forward or out of place, enter into the games with zest.

One of the favourite games is "Hyaku-nin-irshu", literally. "The poems of a hundred poets". It consists of 200 cards on each of which is printed either the first or last half of one of the hundred famous Japanese poems which give the name to the game. The poems are well known to all Japanese, of whatever sort or condition. All Japanese poems are short, containing only 31 syllables, and have a natural division into two parts. The one hundred cards containing the latter halves of the poems are dealt and laid out in rows face upwards, before the players. One person is appointed reader. To him are given the remaining 100 hundred cards, and he reads the beginnings of the poems in whatever order they come from the shuffled pack. Skill in the game consists in remembering quickly the line following the one read, and rapidly finding the card on which it is written. Especially does the player, watch his own cards, and if he finds there the end of the poem, the beginning of which has just been read, he must pick it up before anyone sees it and lay it aside. If some one else spies the card first, he seizes it and gives to the careless player several cards from his own hand. Whoever first disposes of all his cards is the winner. The players usually arrange themselves in two lines down the middle of the room, and the two

sides play against each other, the game not being ended until either one side or the other has disposed of all its cards. The game requires great quickness of thought and of motion, and is invaluable in giving to all young people education in the classical poetry of their own nation as well as being a source of merriment and jollity among young and old.

SARAT CHANDRA DAS.

A PEEP INTO AN INTELLIGENCE DEPARTMENT OF THE MOGHUL PERIOD OF INDIAN ADMINISTRATION.

BY

KHAN SAHIB SYED ABDUL LATIF, B. L.

Thanks to the enlivening influence of European methods of modern historical research, old-fashioned ideas pooh-poohing everything connected with the past administration of India, are gradually disappearing before the noonday light of newly-discovered truths. It is indeed a cheerful sign of progress that people, both here and in England are now found capable of looking on the bright side of things. Even Conservative Oxford has scholars like Professor Owen, finding redeeming features in the administration of the much maligned Moghul Emperors. Here in India savants like Professor Jadunath Sarcar have begun to see the bright side of Aurangzeb's character. Professor J. N. Das Gupta has of late treated his audience at the Calcutta University to the glowing aspects of the Muhamedan rule. Arm-chair critics are now rubbing their eyes in surprise that the Moghul rulers were not after all mere epicures as generally represented, but there were things in their government of the country really worthy of praise and emulation. For the further edification of such people let us usher them into the arcana of a department of the Moghul administration the existence of which appears to have been very little known. The different sections of the Intelligence Department under the British Administration are considered innovations in India, and indeed are things of recent growth. People unacquainted with the details of the Moghul Period of Indian History would, no doubt, wonder at the omniscience of the Provincial rulers of the present day to whom flows information of everything going on from one end of the country to the other. The Intelligence Branches of the Police, Agricultural and Commercial Departments, ever busy in keeping their Heads acquainted with the latest news, are their main sources of information. The Criminal Intelligence Department, considers its position in Indian polity as one of unique glory, for it is generally supposed that the system of espionage for the detection of dacoits

was, for the first time, inaugurated in India during the regime of Warren Hastings. A peep into the ever-living records of the Moghul period of Indian history, would, however, bring the modern faddist in touch with an Intelligence Branch, which, may perhaps be an eye-opener to him.

Consult that perennial source of all information relating to Akbar's administration,—the Ain-i-Akbari,*— and there you will find it recorded that the Moghul Emperors used to maintain special Intelligence Departments for the supply of all kinds of information which the Provincial Governors could not, in those days of intrigue, plots and counter plots, be ordinarily trusted to communicate. They were directly subordinate to the Emperor of Delhi, independent of local officials. In every Provincial Capital and important centre two special functionaries were maintained, one called "swani navis" and the other "waquiah navis". Their duty was to daily record and send news to the Emperor of all that transpired at local centres. As they had orders to work independently of one another, the report of intelligence sent by one necessarily checked that of the other. The 'waquiah-navis', was the official Court Recorder, and the 'swanih-navis' the official General Intelligence giver. The object of the system was not only to keep the Emperor daily informed of what transpired throughout the length and breadth of the Peninsula but to hold indifferent officers in check and encourage honest and active servants of the Empire to work without fear. Being subordinate to none of the Provincial heads, these Imperial Informers reported everything without the least hesitation and often cared not to spare even the highest officials. The following incidents will illustrate this.

It may be remembered that Emperor Aurangzeb's grandson, Prince Azim-us-shan, was the Governor of Bengal, Behar and Orissa for sometime. Ordinarily, one would suppose that a high personage like the Emperor's grandson was above the reporter's ken. But, strange as it may seem, once the 'waquah-navis' actually reported to the Emperor that, against the principles of Islam, the Prince had been taking part in the Hindu festival of Holi—the New Year of the Hindus. Aurangzeb's stoic temperament was at once roused and he wrote a most caustic letter to the prince, the following few lines of which would repay perusal :—

چیرهٔ زعفرانی بر سر - و حلهٔ ارغوانی
در بر - سن شریف چهل و شش -
آفرین برین ریش و فش

Chira-i-Zafrani bar sir ;
O hulla-i-arghawani dar,
bar ; sin sharif chahl-o-shash ;
afrin bar-in resh o fash.

English translation :— A saffron-coloured helmet on thy head, a red

* Ain-i-Akbari—Vol. I, pages 258-59.

garment on thy shoulder, thy venerable age verging on forty-six ; hurrah, on thy beard and moustache ! *

On another occasion the 'waquiah-navis' reported that the Prince had been indulging in 'Sauda-i-khas'—a particular kind of monopoly in traffic. This equally roused the ire of the Emperor who wrote to say that "he would not sanction any act of injustice, even by his sons or grandchildren," and at once struck off 500 horse from the Prince's military rank. Kar Talab Khan, a reporter once reported in the news sheet that the Nagdi contingent of troops were being instigated by Prince Azim-us-Shan to kill Kar Talab Khan, on account of his activity in the intelligence Department. The Emperor then wrote to the prince thus :—"Kar Talab Khan is an officer of the Emperor. In case a hair-breadth of injury in person or property happens to him, I will avenge myself on you, my boy"† The Prince was also asked to quit Bengal at once, and repair to Behar, leaving a Deputy Governor in Bengal. Accordingly he went to Patna, which was named Azimabad' after him.

It would appear that the Intelligence Department of modern India is very nearly akin to the system obtaining four centuries ago, and the methods adopted are more or less an unconscious improvement on the procedure of bygone days, although it may be supposed by some people that the present development of the department is due to the adoption of methods borrowed from other nations.

* Stewart's History of Bengal, p. 394 ; Translation of 'Reaz-us-Salatin' by Khan Bahadur Abdus Salam, page 246.

† Stewart's History of Bengal, p. 252 ; also 'Tarkh-i-Nasratjangi', Ms. 'Khorshed-Jahan Numa' by Elahi-Bakhash-al-Hossini (a manuscript in the possession of Mr. H. Beveridge, I. C. S., a copy of whicn is with Khan Bahadur Syed Aulad Hasan of Dacca).

LIFE OF PESTALOZZI AND HIS METHOD.

If Education is the most potent factor of civilization, education of the children must then be allowed a most conspicuous and important place. The present day civilization of Europe is largely if not mainly due to the improved method of education of the children adopted there within the last hundred years. That the Kindergarten System of Froebel stands up to date the best method of Elementary education in Europe, is now admitted on all hands. But the credit of discovering an essentially new principle belongs justly to Henry Pestalozzi. Froebel came strongly under his influence. He may be said to have improved upon and given a practical shape to a system which had however been invented by Pestalozzi. Pestalozzi may thus be truly styled the greatest teacher of modern times.

We will now try to describe briefly the life and method of this distinguished teacher.

Andrew Pestalozzi was a village pastor near Zurich in Switzerland. His son. John Pestalozzi was a surgeon with some reputation as an oculist. Henry Pestalozzi whose life we are going to discuss was a son to this surgeon. Henry was born on the 12th January, 1746. He lost his father when he was only five years old. The father left the family almost penniless. But Henry's mother, Susanna, with the invaluable assistance of an ideal maidservant managed to give her children a tolerably competent education and consequently had to live a most frugal life. From his ninth year Henry used to spend his holidays with his grandfather the pastor, in a neat small house in the vicinity of a beautiful hill with a small prattling river in front. While living there, he occasionally accompanied his grandfather on his daily visits to the school and to the sick and the poor of his parish. He was thereby early initiated into the realities of the life of the poor and thus learnt to feel a genuine sympathy for them. Pestalozzi used to say at an advanced age "The best way for a child to learn to fear God is to see and hear a good christian." This idea, most probably, had its origin from the revered memory of his grandfather. The philanthropic, peaceful and spotless career of a clergyman, ere long grew to be his ideal of life. Accordingly, he made up his mind to enter the Church and began to study theology.

In the middle of the eighteenth century the University of Zurich was famous for the spread of high education. Theology, Medicine and Law formed the three principal subjects open lo students of fifteen years of age and these three branches of study were brougut into great repute by three distinguished professors. The influence of these

professors upon their pupils was so great that they came to despise wealth, luxury and comfort and cared for nothing but the pleasures of the mind and soul and the untiring pursuit of justice and truth. So Pestalozzi, though as a schoolboy, he had not displayd much powers, after joining the College at the age of fifteen fast became a distinguished scholar. After finishing his study of Theology, however, he found that he lacked the capacity and the taste for preaching. So he gave up the ministry for the Law. The reigning spirit of patriotism of the day, enthusiastic lectures on History and Politics by a distinguished professor, experiences of the abject condition of the Swiss peasants—all these contributed to give him a leaning towards the law. In fact, there came a time when, in the eyes of his fellow citizens he came to be looked upon as a dangerous revolutionary. In course of time, however, he came to be convinced that the polical and material status of the people could not be improved unless and until they were saved from intellectual and moral degradation. In an election having sworn to support the best citizen they always find good reason for electing the worst. So their salvation lay not so much in political struggle as in their moral and social regeneration. He accordingly, gave up his legal studies and one day threw all his manuscripts on politics into the fire. In that epoch, writings of Rousseau were voraciously devoured by the youngmen, That philosopher was reported to have said "Agriculture is the best and happiest of all professions." In countries which are not free men are compelled to become mechanics but in free countries it is better to be an agriculturist." Bodmer, the most influential of the three professors of Zurich already spoken of, was also an extravagant eulogist of agriculture and desired that young gentlemen should set an example of an improved method of agriculture to the Swiss peasants. These were the circumstances which drew the attention of our hero to agriculture when he abandoned the law. With a great zeal for his new profession, he went to a village near Berne to learn improved methods of agriculture from a first rate agriculturist. Early in the autumn of 1768 Pestalozzi returned with full courage and confidence, to Zurich to find some suitable land. He purchased at first at Aargan some fifteen acres of land at the foot of a hill and in course of time became master of one hurdred acres. At first he had to settle temporarily in a small village 3 or 4 miles from his land. Soon afterwards he built a permanent house for himself at Neuhahf. Pestalozzi married Anna Schulthes in September 1769. She was a good musician, well read in poetry and herself a poet. She proved in every respect an ideal helpmate to our hero. Letters that passed between the pair between 1767-69 give us a fine idea of the great enthusiasm and contentment with which he took to agriculture. In

1770 he got a son, the only child he ever had. But his success as an agriculturist was not to last long. Pre-eminently a theorist with a childlike confidence in anybody and everybody he could seldom hope for material success in life. His failures became perceptible since his removal to his new house and at last in 1775 he found himself heavily plunged into debt. He says at this period "The dream of my life, the hope of making my house the centre of a wide sphere of benevolent activity was gone." It may at first strike one with surprise to learn that at this declining stage of his career as an agriculturist, when his pecuniary means were all but shattered he decided to make his house a refuge for the poor children. But, as a born friend of the poor, he could not help responding to the call of a spirit of philanthropy welling within him. It happens in the life of almost every man that in youth passion and idealism get the upper hand. Disappointment and contact with the stern realities of the world alone can dispel that state of illusion. Pestalozzi's pursuit of the law and agriculture was such an episode in his life. Failures in both and specially in the latter cured him of the youthful mania and ultimately brought him face to face to the life-work he was intended for. There was also a most worldly reason which called him to agriculture. He fell in love with Anna as early as in *1767*. But Pestalozzi's want of decent means of livelihood led the parents of the girl to withhold their consent to the union. It was to assure them of his prospect of a competency that Pestalozzi took so zealously to agriculture. Thus the inward spirit of philanthropy for the time being, gave way to sordid ambition. But the ruling passion of the man was not to remain eclipsed for a long time. In fact, a reaction against worldliness set in much earlier than 1775. Long before the failure in agriculture had even been anticipated he wrote on the 9th January, 1770.

"Why do I no longer take pleasure in speculative science? Why am I so little interested in the search for truths of the greatest importance? Can it be because the vainglory and examples that stimulated me in the town are now lacking to me? But I am resolved to attend earnestly to the development of my faculties, in spite of the distractions necessarily resulting from the work my position involves. O God, strengthen me in this resolution."

It was when he became a father that this dawning of a reaction against material interests got a firm hold upon him and took the form of a religious remorse. Looking upon the imparting of a proper education to his infant, as a sacred duty he first applied the ideas of Rousseau's Emile" to the education of his son. But he found that he was oftentimes compelled to deviate from Rousseau and to depend upon his own observations. At times, the me-

mory of his own education by an ideal mother stood him is good stead. It would be interesting to note here that immediately after her marriage Anna commenced a diary which was kept most regularly and in which her husband also oftentimes wrote. This diary gives us a connected history of the teaching of his son by Pestalozzi, of the failures of methods suggested by Rousseau and of the devices for which he had to fall back upon his own resources and the memory of his mother. From among a host of instructive and interesting passages of this Diary the following extracts are quoted below :—

Father or schoolmaster, avoid, above all things, hurry and excitement, let your work be done quietly and in order. The greatest joys are often the result of long and patient investigation. Do not let your own knowledge weigh too heavily on the child, rather let truth itself speak to him.......Train his eyes and ears but seldom ask him for an opinion. As a general rule, do not ask him to judge of things of which he is not in immediate need, but ask him for his judgement, only as Nature asks you for yours."

Lead your child out into Nature, teach him on the hilltops and the valleys. Should a bird sing or an insect hum on a leaf, at once stop your talk ; bird and insect are teaching him ; you may be silent.

But all this bestowal of care on the education of his son did not apparently prove very successful. Jacobli, for this was the name of his son, was placed in a school wnen he was 14 years of age. He was afterwards apprenticed to a commercial firm. But the boy did not succeed either in his studies at the school or in his apprenticeship. And this is not at all to be wonderd at ; for, the poor boy was a victim to the experiments of his father with his brains filled with a mass of original ideas not yet reduced to order. We may remark in passing that this boy died in 1800 and the parents bore the shock with a calm resignation. Then the mother writes of her son's death.

"It pleased God to take him to Himself by a painless death. May God's peace be on him in the grave and may the Divine pity welcome his soul."

His personal experiences of the salutary effect of the systematic efforts to educate his son convinced him that the best way of relieving the poor people was to give proper education to their children. This led him to decide to take up the noble work of educating the children of the poor in his own house dispite his reduced circumstances. In 1774 the experiment began, some 20 children of the poor went to live at Neuhawf with Pestalozzi. He clothed and fed them. They were always with him and they worked with him in the garden and the fields ; very little time was devoted to actual lessons. On account of the slenderness of his means, he had to appeal to the public and a few

responded to his call. On the nature of the education which Pestalozzi thought should be given to the poor children let our hero speak for himself :—

Poor children must be brought up in private establishments where agriculture and industry are combined and where the living is of the very simplest, they must learn to work steadily and carefully with their hands, the chief part of their time being devoted to this manual work, and their instruction and education being associated with it.

Alas, this "philanthropic career of our hero was not to continue long. He was daily growing poorer and finally in 1780 was reduced almost to the state of a beggar. Thus pressed by poverty, he had to give up the noble work at which he had unceasingly toiled for a period of five years. But this apparent ruin of his noble work proved in one sense to be a gain to the world. For, had it not been so, much of his time would then have been fully occuped by this work and Europe and for the matter of that, the whole civilized world, would have been deprived of a new method of education which has achieved such wonderful results in Modern Europe. Five years' experiments with the children of the poor gave him however, varied experiences and made him fitter to think and write on education. During this period he found that there lay of wealth of faculties and sentiments even among the ragged children and a natural development of them would conduce to the welfare, of the society in many aspects. While thus most reluctantly severed from a life of philanthropy, his never-failing friend, Iselin, suggested to him the idea of giving out his views on education which he could not by himself carry into effect for want of funds. This friend also offered him pecuniary help in the matter. Pestalozzi, at once and most eagerly, caught the suggestion and entered the arena as a writer on education. For the next 7 or 8 years he was mainly busy with writing. We may say that inspite of his indefatigable activity in the subsequent part of his life, he never ceased writing on educational reforms till his death. But a truly philanthropic man can not rest satisfied with writing alone. So, after the terrible onset of the French Revolution was wellnigh over, he wrote to the Directory to be allowed to open a school. The plan was nearly matured when, as a consequence of the tumult of the times the town of Santz happened to be devastated and an Orphanage became an immediate necessity there. Pestalozzi's heart at once glowed with kindness for the orphans and he forthwith applied to be placed of the head of the orphanage. He carried on his work in this field with unabated zeal for several years. But in the long run his new method did not find favour with the inhabitants of the locality and the Swiss government very prudently withdrew him from the post. But he was not the man to remain cut off for a long

time from what he looked upon his life-work, namely, the raising of the people by education. Unable to start a school for himself he now decided to become a schoolmaster. He offered his services in a school at Burgdrof, a small town in the Canton of Berne. He asked for no salary and only wanted permission to give lessons to the children. But even this request was not readily granted for the people found that this old man lacked many of the most ordinary qualifications of a teacher. But they could little perceive that this dreamer, as they called him, had almost an intuitive isight into the development of human nature which, indeed, he was never tired of contemplating. He was however permitted to teach in July, 1799. Thus began the career of Pestalozzi the school-master. After eight month's teaching the School Committee of Burgdrof gave him high compliments on the results of the annual examination. This was the first public recognition of the success of the method of Pestalozzi. In 1800, a Society of Friends of Education asked him to furnish them with a short account of his doctrines and method of education. His elaborate and interesting account was received with applause. He began that account by saying that he meant to psychologise human education. However self-denying and arduous his labours at Burgdrof may have been the Swiss Republic could pay him but scantily. So in his old age he had to struggle hard for maintenance. Besides, his was a new method little appreciated and sometimes rudely attacked by the people. Again, he had hitherto to work single-handed in the new field. All these circumstances had, now and then, a damping effect upon his mind. But ere long, he was fortunate enough to get a co-worker in one Hermann Kressy. This man, though originally a poor carrier and possessed of little learning took to the profession of a village-schoolmaster, as a work of love and he had a genuine love of learning. Kressy came as a schoolmaster near Burgdorf and his school was at first other than that of Pestalozzi. But owing to several circumstances, Kressy united his school with that of Pestalozzi. The educational ideas of Pestalozzi were, fort he most part, appreciated and soon after adopted by Kressy. This man served as a valuable assistant of Pestalozzi for a long time afterwards. After the two schools were united, the number of pupils began to increase and they felt the necessity of other teachers of their type. Within a few days, many co-workers flocked to their standard. Now commenced the palmy days of the school. The Society of the Friends of education highly extolled the working of the school. It was soon turned into a Normal school for primary school teachers and Pestalozzi annexed thereto an elementary school for the children of the poor. The reputation of the school now spread so far and wide that distinguished visitors who had before been

opposed to Pestalozzi could not but pay many a flattering compliment to him. They were amazed with the progress the little children made in arithmetic, drawing, geometry and other subjects. Above all, the paternal care which Pestalozzi and his assistant teachers bestowed on the children had a very chastening and almost a magical effect upon the pupils. Once a peasant, very surprised at what he saw, cried out "Why, this is not a school, but a family", to which Pestalozzi answered "That is the greatest praise you can give me, I meant to show to the world that there must be no difference between the home and the school." There arose even a proposal of turning the institution into a training college for Switzerland. But in the meantime, the breaking out of a counter revolution in Switzerland kept the proposal in abeyance. Pestalozzi now, that he had already made his mark was deputed to attend the Consulta in Paris. The reform of education being the uppermost thought in his mind, he talked on it profusely to the French Ministers and sought an interview with Bonaparte. He had, however, to meet a rebuff here as Bonaparte refused him an interview saying that he had nothing to do with a man who had only to talk of A, B, C. It may, however, be mentioned here to the credit of Pestalozzi that France, soon after, actually introduced the new method of elementary education devised by this man of mere A, B, C. On political grounds it was now decided to remove the seat of Pestalozzi's Institute from Burgdorf. Thus after spending a period of nearly five years with untiring activity Pestalozzi had to leave Burgdorf in July, 1804. And his scene of work was transferred to Yverdun the year after.

Yverdun had the honour of being the site of Pestalozzi's philanthropic work for a period of 20 years. Within the first few years the reputation of the Institute went far and wide. The new method of Pestalozzi was introduced into foreign countries and specially into Germany. The Institute was visited and highly spoken of by men of distinction. Charles Ritter, a distinguished teacher of geographical studies was one of the visitors in 1807. He almost idolises Pestalozzi. He says: "I have seen more than the Paradise of Switzerland, for I have seen Pestalozzi." Besides the Institute Pestalozzi founded at Yverdun a girl's school. His own daughter-in-law was at the head of the school. Some of the teachers of the Institute also taught here and the pupils invariably attended Pestalozzi at the evening worship. Naif, one of the colleagues of Pestalozzi founded a Deaf and Dumb school at Yverdun. We may form a general idea of the working of Yverdun Institute and specially of the physical work, from the following lines: The pupils enjoyed a great liberty. They could go in and out of the house at all hours as if they were at home and they scarcely abused their freedom.

No doubt their lessons generally lasted ten hours a day the first beginning at six and the last ending at eight. No lesson however continued for more than half an hour and each one was followed by a short interval during which children generally changed rooms. Again, some of the lessons consisted of gymmastics and some amusing sorts of manual labour. The last hour of the day was a free hour which the children devoted to what they called their own work. The youngest teachers, who were generally Burgdorf pupils were on the most friendly terms with the children. They played with them, bathed with them, walked with them and slept with them. When the weather was fair, some hours in the afternoon were devoted every week to military exercise. Gymnastics and some interesting games were played regularly. Skating formed a diversion in the winter and bathing in the lake and mountain excursions in the summer. The first day of spring was celebrated every year on the neighbouring heights. Gardening was a common occupation. Sometimes the children had little patches of their own and sometimes they worked in twos and threes under the supervision of a gardener. Bookbinding and cardboard work formed part of their manual work. They also made solids for the study of geometry. At the end of every year each pupil sent an album containing his drawings, maps, historical lessons and literary compositions, to his parents. The 12th January, the birth day of Pestalozzi was celebrated with decorations, dramatic performances and songs.

Success in the ordinary acceptation of the term Pestalozzi was not the man to have. This far famed Yverdun Insitute also had its decline and fall. And the reason is not far to seek. Pestalozzi had a literally childlike confidence in all he would come in in contact with and his heart was too full of the milk of human kindness. Accordingly he sadly lacked the administrative skill and the the executive power indispensably necessary to manage an institution. Niederer and Schmidt were the two distinguished assistants of Pestolozzi at Yverdun. The former has been called the philosopher of the Pestalozzian method, because it was he who reduced the ideas of Pestalozzi to some systematic order and all the later productions of our hero were more or less touched by his hand. But Schmidt was a strange contrast to Neiderer. His was eminently a practical nature. He possessed administrative abilities but was not so far from selfishness as Niederer was. So, there occurred a rapture between these two and Schmidt left the Institute in 1810. In his absence the Institute soon grew to be a scene of wild confusion. He was in the long run prevailed upon to return in 1815. Again Mrs. Pestalozzi fell ill in December 1815 and died on the 12th January, 1816. The grief of Pestalozzi

was, as a matter of course, profound. This sad bereavcment especially at so old an age gave a rude shock to his mental faculties and so he now gave up all power into the hands of Schmidt. This man now began to behave overbearingly with other masters and sometimes even with the pupils. Thus exasperated by him, the devoted band of masters began to leave the Institute one by one. The financial position of the Institute also rapidly declined. Niederer and Krusy left Pestalozzi in 1817 and others followed their example. In fact it is very distressing to behold how Pestalozzi naturally simple-minded and worn out with age, had to play into the hands of a shrewd and designing assistant. He would often try to bring about a reconciliation between Niederer and Schmidt but would on no account dismiss the latter. Schmidt was at last expelled from his post by the government and Pestalozzi too left along with him in March 1825. The public life of Pestalozzi thus came to a melancholy close.

Pestalozzi passed the remaining two years of his life with his grandson at Neuhauf. A born friend the poor, he ceaselessly occupied himself in that noble work to the last days of his life. He was even now vigourously trying to establish a poor school at Neuhauf. Not satisfied with this alone, he would now oftentimes go to the village school of Birr and teach there daily for several hours. During the winter of 1827 an idea struck his sympathetic heart that the poor people would spend their winter a bit more comfortably if the floors of their cattages could be strewn with gravel and two or three layers of matting would then be spread over it. Before taking steps to carry out this idea he thought of making experments of this for himself. Accordingly he would inspite of his feebleness and the inclemency of the weather, herself gather pebbles and throw them into an unfinished room of the house. He could not be prevailed to give up this work until he was compelled to do so by illness. This anecdote is truly characteristic of the man. He died a tranquil death on the 17th February 1827. His coffin was borne by schoolmasters. Besides men of distinction in all ranks of life. schoolmasters formed the funeral procession. Thus expired at the ripe old age of eighty a born friend of the poor, a devoted schoolmaster and the inaugurator of a New Method of Education.

PESTALOZZIAN METHOD.

In the course of the foregoing sketch of his life we have seen how Pestalozzi took up his pen for the Reforms of Education as early as 1780. Through a period of nearly 50 years since that date his contributions on the subject have been ample. From among the numerous writings the following works may be named by way of example.

The Evening hour of a Hermit; Leonard and Gertrude (4 volumes);

"How Gertrude teaches her children"; "How to teach Spelling and Writing; "Book for mothers"; "Elementary teaching of Number and Form." "The Natural Schoolmaster." "The Song of the Swan," "The Experiences of my life."

A historic study of these works will no doubt, exhibit a gradual expansion of his views on Education. Yet, there is manifestly one clear tune ringing through all his writings. As a consequence of the intensity of his sentiments and the exuberance of his ideas, there is oftentimes, reiteration of the same group of thoughts and lack of method in their treatment. Instead of attempting a summary of any of his works we try to give below a brief survey of his Method. The aim of Education is the development of man as a whole, that is the development of his body, mind and heart. This threefold development must proceed side by side and neither can be improved to the total neglect of any other. Thus there must be established a harmony in these three branches of development.

The growth of human nature is like the growth of a living, say, a vegetable organism. All the properties of a mighty oak lie latent in the tiniest acorn. Nature, slowly and surely, though imperceptibly unfolds them all by degrees. Similarly, myriads of qualities lie imbedded in the germinal state in every child which gradually sprout forth and acquire intensity and volume as the child grows up. In the case of a vegetable organism, we find an infallible and definite law of Nature. whereby its growth is regulated. There is a similar law of Nature guiding the destiny of human development. The first business of an educator should therefore be to find out that law and so to devise his scheme of education as to strictly follow the track of that law. Any method of education, antagonistic to, nay even indifferent to that law of Nature is destined to failure. In fine, principles of education should be based on the truths of Psychology and Physiology. The proper function of an educator is to lend a helping hand to Nature. His object should therefore be to devise—a series of graduated exercises conformable to Nature so that the course of Nature may be facilitated thereby.

As for Physical Education, Pestalozzi, keenly alive to the natural law of development introduced gymnastics among the children. Although the law of development in the domain of the body had not been ignored before him, yet, sometimes before his advent gymnastics fell rather into disuse in the educational system of Europe. He reintroduced it with a new vigour and devised a series of graduated exercises which have, however, been much improved upon by later generations.

As regards moral education, it begins naturally from the relations that subsist between an infant and its mother. A child almostly unconsciously forms of idea of love from maternal care, and

of faiths from the manner in which its mother promptly and unerringly administers to its wants. Rudiments of the idea of Justice, truthfulness and other moral sentiments also originate in its home from its domestic relations. Home is therefore the nursery for moral education. Pestalozzi does not attempt, however, to lay down a series of graduated exercises in this field.

It is in the field of intellectual Education that the work of Pestalozzi is of sterling worth and the Method which goes by his name is, in the main, a method of intellectual development. This, therefore, requires a fuller treatment.

Pestalozzi finds out that as soon as a child is born, the external world with its infinite variety of aspects is present before him. He has eyes, ears and other sense-organs to receive impressions from this manifold outer world and an internal organ to convert them into perceptions. Sense impressions are, therefore, the first things a child has to deal with. Thus all his ideas are based on sense impressions. Therefore for a healthy growth of a child's mind the first thing requisite is to bring him face to face with numerous objects whereby he may have a goodly stock of salutary and pleasing sense impressions. Beautiful and otherwise pleasing objects should be repeatedly presented to the child and each for a considerable length of time. He will thereby be able to form more or less accurate ideas. Intellectual growth is but another name for the growth of ideas. Therefore every branch of intellectual education should be based on sense impressions. To devise a scheme for the education of a child it is absolutely necessary, first of all, to investigate the simplest and primal ideas that arise and work in his mind and these should determine the elementary subjects of instruction for him. Before the days of Pestalozzi, Reading, Writing and Arithmetic were regarded as the elements of instruction. Pestalozzi went deeper still. He thought whenever anything new is presented to a child, a question that naturally arises in his mind is "what is it?" that is to say child tries to associate certain sound, with the idea which the new object has awakened in him. Thus a desire to give went to his idea by means of a sound is present in his mind. Another question naturally suggesting itself on the presentation of a new object is "what is it like? This is nothing but an enquiry into the "form" of the thing. Another question of a similar nature is how many are they? That is to say, the child likes to know the number of the thing. From these three sets of questions naturally occurring in the mind of a child, Pestalozzi concludes that sound or in other words language, form and number, these three should be the elements of instruction.

Now let us see what he says as to the particular methods to be applied to the teaching of these elementary subjects

and some other simple subjects akin to them.

Sense impression should be the basis of all sorts of instruction. This is a golden rule which must not be deviated from in the least by a teacher of language. Therefore it must be made sure before any attempt is made to teach a word to a child that he has well grasped the idea whereof the word is meant to be an expression. Accordingly, no name of anything should be introduced to a child, which he has not yet perceived. If a child is employed to use words meant to express ideas which are still unfamiliar to him, that does not at all help his intellectual growth ; on the other hand, it paralyses or destroys it.

Study of language should begin with the mother tongue. Let a child be first taught to see properly and then let him try to describe properly what he has actually seen. The educator should come to his help only when the child is panting for an accurate expression. Thus, a constant practice of speaking is the surest means of learning a language. As for the study of foreign languages one should begin with a foreign modern language. Here also, as in the case of the mother tongue, practice of speaking is the best of all means. Thus, an illiterate foreigner can teach another his language much more quickly and easily than a man of grammar. For the study of dead languages too, Pestalozzi tried to devise a method based on the principle of speaking. He also tried to devise a new method of the teaching of grammar. But his efforts were not very successful in these last two attempts. He has emphatically reiterated the idea that teaching of definitions is often a dangerous thing. A child should first of all grasp the idea of a thing ; if necessary, the thing should be accurately described by the teacher. When the learner's mind has thus been well prepared, then and not before, the definition of the thing should be allowed to come in.

As to the teaching of forms, this also should necessarily be based on sense-impressions. A child should first be made familiar with simple elements of forms *i.e.* with straight lines, curved lines and angles, and the complex forms should be introduced afterwards. An acquaintance with different forms will not only train the learner's eyes but also habituate him to make comparisons and to form judgments in as much as he will have to judge of the difference of shapes and sizes.

A knowledge of form should naturally lead to the art of drawing.

In the first stage of drawing, a child should be given a slate and pencil and be allowed to draw anything at random. This will serve to give the first training to the muscles of his hand. He should then begin linear drawing. He should gradually be acquainted with the difference between vertical lines, horizontal lines, oblique lines and parallel lines.

He should thereafter, be made to draw and distinguish between simple geometrical figures such as triangles. squares, oblongs and the like. When the drawing of objects is begun let the objects be present before the child. Copy-books for drawing should be made use of only at a later stage. At times, the child should be called upon to draw any graceful figure that suits his fancy. This will help him to cultivate his imagination and strengthen his idea of symmetry.

As for the teaching of writing linear drawing is the immediate preliminary to it. When a child has learnt to draw lines in various positions he will be in a position to write letters. Pestalozzi suggests that writing need not and should not follow the order of the alphabet.

Let a child begin with the easiest letters and then proceed to the more difficult ones. Thus I. J. K. should preceed B. D. G. Writing should not be allowed to come after reading. A child should first be taught to write a particular letter and he should, immediately after that, be taught the name of the letter. This is quite in consonance with the principle that a child should not be taught a word the idea whereof has not already been formed by him.

It was in the domain of numbers or in other words in arithmetic that the method of Pestalozzi produced the most visible results and was therefore appreciated the most by the people. As in the case of the other two elements sense-impressions must be the basis of the knowledge of numbers. Without association with objeets perceptible to the senses, a child might be taught in the abstract the mere names of numbers ; but then, they will remain without any meaning for a long time. For the purpose of teaching numbers by sense-impressions Pestalozzi devised what be called a Table of Units. This consisted of one hundred lines drawn in a well arranged and ingenious order. The act of seeing these lines made the children familiar first, with the ideas of one, two &c. and then with the names one, two &c. meant to convey these ideas. Thus the children learnt number by sight. After they had learnt number, they found out for themselves, with the table of units placed before then, answers to the questions of the following nature : What will one added to one be? What would be the remainder if 2 was taken from five? What would 3 times 2 be equal to? How many times could 2 be taken from 6? In short, this table of units well enabled the children to go through the operations of Addition, Subtraction, Multiplications and Division, by sight. For the purpose of teaching fractions by sense-impression Pestalozzi had another table called the table of Fraction This consisted of a number of equal squares, some whole and others divided from 2 to 10 equal parts, by horizontal lines.

Thus the children would learn by sight what $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{3}{4}$ etc. meant. They would also learn from this table how some fractions coming together would make up a whole number. Pestalozzi also devised another table which he called the table of fractions of fraction. In the former table the squares were divided into equal parts by horizontal lines only. But in this table, over and above equal division by horizontal lines, the squares were further equally divided by vertical lines. Thus, with the help of this table, the children would actually see before them what $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{2}$ $(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})$ meant and which fraction of the whole square it was equal to. The necessity and method of reducing two fractions to the same denominator would also be clear to the children from this table. All these sense-impressioning exercises on numbers would furnish an ample scope to the exercise of attention, observation and judgement of the learners. From the first table Pestalozzi would also show how all arithmetical calculations consist of increasing or decreasing of numbers by various methods which are simply intended to shorten the repetition of the formula : one and one is two and one from two is one.

In the sphere of Geography Pestalozzi's method has in a manner brought about a revolution. According to his method, a child should, first of all, be made to see and observe the country about his home. He would then draw for himself, a map of the portion of the country he had seen. He would correct his mistakes on a second visit to the spot. Having thus learnt to understand and read maps, his study of the subject would continue with a blank map hung on the wall. The following extract from the reminiscences of one of his pupils at Yverdun would be interesting here :

"The first elements of geography were taught us from the land itself. We were first taken to a narrow valley not far from Yverdun where the river Buron runs. After taking a general view of the valley, we were made to examine the details until we had obtained an exact and complete idea of it. We were then told to take some of the clay which lay in beds on one side of the valley and fill the baskets which we had brought for the purpose ; on our return to the castle, we took our places at the long-tables and reproduced in relief the valley we had just studied, each one doing the part which had been allotted to him. In the course of the next few days, more works and more explorations each day on a higher ground and each time with a further extension of our work ; only when our relief was finished were we shown the map which by this means, we did not see, till we were in a position to understand it."

As to the teaching of Geometry, the drawing of geometrical figures and the teaching of their names immediately after that, would furnish the beginning.

Then the children wonld be made to discover simple geometrical truths for themselves with the help of actual drawing. Thus the children would be very glad to find out by sight answer to the questions like the following. In how how many points do two straight lines cut each other? How many angles are there in a triangle? How many in a quadrilateral? In how many points does a circle cut a straight line or another circle? In how many points do two circles touch one another?

Pestalozzi's method of teaching the elements of Natural History was of the following description: A teacher would bring different objects under the children's direct observation and by judicious suggestions and leading questions he would encourage them to talk on those objects. Objects collected by the children themselves in their walks would be specially chosen for the purpose and they would be supplemented by minerals, plants, stuffed animals and the like. In the course of exercise on Natural History or any other exercise when it would be necessary to fix some new names in the memory of the children. Pestalozzi would make the whole class repeat each correct statement several times in a chorus. It had also a hygienic end in view because this would strengthen the chest of the learners by a uniform and systematic exercise of the organ of speech.

Singing also formed an important part of the curriculum of the children's school under Pestalozzi. He would first call upon the children to sing in their own way by imitation. This would serve to give the first training to their voice, ear and taste before they would learn to distinguish different notes.

Here we bring the our survey of the method of Pestalozzi to a close. We have seen how an emphatic assertion of the importance of sense impression which is the real foundation of all knowledge runs through the whole of it. And he had good reasons for it. He found that the invention of printing gave an undue importance to books. Books were confused with knowledge and words with ideas. Men thought that by teaching the child to read, that is to say, to pronounce certain groups of letters, they would furnish him with the key to the stock of universal knowledge. So men of mere letters passed for men of learning. Pestalozzi would wage war against this view of education, a view which was fraught with disastrous effects upon the well-being of Society.

KUNJA BEHARI HAR.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড ঢাকা—কার্ত্তিক, ১৩২৩ ৭ম সংখ্যা

অশোক চরিত

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র বিন্দুসার রাজ্যাধিকারী হন। বিন্দুসার প্রবলপ্রতাপে পঞ্চবিংশতি বৎসরকাল মগধের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গ্রীকলিখিত বিবরণসমূহে তিনি "অমিত্রঘাত" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বিন্দুসারের গ্রীকপ্রদত্ত উপাধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি জন্মে যে, তাঁহার প্রবল পরাক্রমে শত্রুকুল ভীত ও সঙ্কুচিত ছিল, বিন্দুসারের রাজত্বকালের অভ্যন্তরীন শাসনব্যবস্থা ও সন্ধি বিগ্রহের বিবরণ কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই। এই মাত্র জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে ও মগধ সাম্রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি ও পিতার ন্যায় গ্রীক রাজগণের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই সময় ডাইমেকস এবং ডিওনিসস নামক দুইজন গ্রীক দূত পাটলিপুত্রের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। মেগাস্থিনিসের ন্যায় তাঁহারা ও আপনাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ ভারতবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিন্দুসার বহু পত্নীক ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল সুভদ্রাঙ্গী, সুভদ্রাঙ্গী রূপসী কুলরাজ্ঞী স্বরূপিণী ছিলেন। তিনি চম্পানগরের (অঙ্গরাজ্যের রাজধানী, বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা প্রাচীন অঙ্গরাজ্য।) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ জনৈক দৈবজ্ঞের মুখে কন্যার অদৃষ্টলিপি অবগত হন এবং পরমা সুন্দরী সুভদ্রাঙ্গী রাজদৃষ্টিতে পতিত হইলেই মহিষীরূপে গৃহীত হইবেন বিশ্বাসে তাঁহাকে কৌশলক্রমে মগধের রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করেন। এখানে রাজান্তঃপুরের কর্ত্রী তাঁহাকে ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

অতঃপর মহারাজ বিন্দুসার তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দর্শন পূর্ব্বক মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া প্রধানা মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম অশোক বর্দ্ধন এবং কনিষ্ঠের নাম বীতশোক।

অশোক পরমা সুন্দরী মাতার গর্ভজাত হইয়াও কুৎসিত ছিলেন। অশোক ও বীতশোক ব্যতীত মহারাজ বিন্দুসারের আরো নবনবতি সংখ্যক পুত্রছিল।

অশোক অতি কদাকার, এজন্য পিতার অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এই অপ্রিয় পুত্রের মস্তকে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মহারাজ বিন্দুসার অশোককে তথায় প্রেরণ করেন। অশোক তথায় উপনীত হইয়া বিনা রক্তপাতে সুকৌশলে বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক প্রথম জীবনেই রাজনীতিজ্ঞতা ও মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করেন। বিদ্রোহ দমন অন্তে তিনি কিছুকালের জন্য শাসন ভার গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের মনোরঞ্জনে ব্রতী হন, অতঃপর মহারাজ বিন্দুসার তাঁহাকে অবন্তী দেশের (বর্ত্তমান মালব) শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে অবন্তীদেশ বিদ্যা বাণিজ্য ও সৌন্দর্য্যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রধান অংশরূপে পরিগণিত ছিল। অবন্তীর রাজধানী ভারতললামভূতা উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি কালে অশোকবিদিশা (বর্ত্তমান বেশ নগর, ইহা মধ্য ভারতের ভিলসার নিকট অবস্থিত।) নগরীর জনৈক শ্রেষ্ঠী বণিকের দেবীনাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন। বিন্দুসার অশোককে একাধিক বার প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; এজন্য বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস বর্ণিত পিতৃস্নেহশূন্যতারবিবরণ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়, অথবা এরূপ ও হইতে পারে যে, প্রথমতঃ অশোক কদাকার জন্য পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তারপর আপনার অসামান্য গুণগ্রাম প্রদর্শন করিয়া পিতার শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

উজ্জয়িনীতে অবস্থিতিকালে অশোক পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ অবগত হন। তিনি এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আগমন করেন। অতঃপর (৩৭২ খৃঃ পূঃ) মহারাজ বিন্দুসার কালগ্রাসে পতিত হইলে প্রতাপশালী মন্ত্রী খল্লাতক ও রাধা গুপ্তের আন্তরিক সহায়তা এবং যত্নে অশোক রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে বিপুল সমারোহে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুমন বা সুষীম আপন স্বভাবসিদ্ধ চপলতা ও হঠকারিতা বশতঃ মন্ত্রী সমাজের অপ্রিয় ছিলেন। অন্যান্য রাজকুমারেরও গুণাভাব ছিল। তাহা হইলেও বহুসংখ্যক রাজকুমারের উদ্যোগ ব্যর্থ করিয়া রাজপদ লাভ যে নির্ব্বিবাদে সাধিত হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ রাজ সিংহাসনে আরোহণকালে অশোককে নানাবিধ, বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এজন্যই তাঁহার সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাসে রাজ্যাধিকার উপলক্ষে অশোকের চরিত্র ঘোর কলঙ্কগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় এবং অন্য দেশীয় বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এতন্মধ্যে ভারতবর্ষের অশোক অবদান এবং সিংহলের মহাবংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাবংশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অশোক রাজ্য লালসায় নবনবতি সংখ্যক ভ্রাতার প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যের প্রাণরক্ষা করেন। অশোকঅবদানে ভ্রাতৃ হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুমন বা সুষীম, অশোকের অধিকারগত রাজপ্রাসাদে সসৈন্যে প্রবেশ জন্য উদ্যোগকালে দ্বার রক্ষার্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হঠাৎ পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অশোক অবদানে অশোক ভ্রাতৃহত্যা সম্বন্ধে নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার রক্ত লোলুপতার অনেক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা এখানে সেই সব চিত্র প্রদর্শন করিতেছি।

"একদিন অশোক মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ফল পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষকাণ্ড ছিন্ন করিয়া কণ্টকতরুতে জল সেচন করিতেছ। মন্ত্রী সভা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত অশোক স্বহস্তে কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া পাঁচশত অমাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। অন্তঃপুরের মহিলাবর্গ অশোকের কদাকারে বিতৃষ্ণ হইয়া উদ্যান হইতে অশোকবৃক্ষ পত্রচ্যুত করিয়া অবজ্ঞাসহকারে

উপহাস করিতেছিল, সম্রাট অশোক তাহা শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন। মন্ত্রীবর্গ রাজার এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া অনুরোধ করেন, মহারাজ! আপনি নিজ করে এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিয়া রাজ হস্ত কলুষিত করিবেন না। আপনার আজ্ঞা পালন নিমিত্ত একজন ঘাতক নিযুক্ত করুন। অশোক অমাত্যবৃন্দের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি চণ্ডগিরিক্ নামে এক দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ তন্তুবায় পুত্রকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পাপিষ্ঠ চণ্ডগিরিকের নৃশংসতা সর্ব্বজন বিদিত ছিল। অশোক এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিবার জন্য একটি সুবৃহৎ সুরম্য হত্যাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অট্টালিকার বহির্ভাগ মনোরম শিল্পকলায় সুসজ্জিত ছিল। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য জনসাধারণ প্রলুব্ধ হইত। এই ভীষণ গৃহে যে প্রবেশ করিত, সে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইত না। ঘাতকের প্রতি রাজার কঠোর আদেশ ছিল যে, যদি কেহ এই বধাগারে প্রবেশ করে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। এই বধ্যভূমির নাম ছিল নরক। বাস্তবিকই এই স্থানে প্রবেশ করিলে ভীষণ জ্বালাময় নরক যন্ত্রণা অনুভূত হইত। এই নরক যে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তির শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।" *

অশোক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা এবং মহাপ্রাণতা অসামান্য ছিল; তাঁহার প্রথম জীবন এইরূপ কলুষিত ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যুক্তি এবং প্রমাণ অশোককে অমানুষিক নৃশংসাচরণ সম্বন্ধে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। অশোকের বিরুদ্ধে আমরা চারিটি অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। (১) ভ্রাতৃ হত্যা, (২) মন্ত্রী হত্যা, (৩) নারী হত্যা, (৪) প্রজা হত্যা। দুইখানি প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থের (অশোক অবদান এবং মহাবংশ) একখানিতে অশোক কর্তৃক ভ্রাতৃ হত্যার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই, অধিকন্তু সর্ব্বাগ্রজ ভ্রাতার জীবন নাশের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ বৎসরেও তাঁহার একাধিক ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। উক্ত সময়ের উৎকর্ণে একখানি অনুশাসন লিপি * পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের এবং অন্যান্য জ্ঞাতিদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম মহামাত্রা নামে অভিহিত করেন। অশোকের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যা সম্বন্ধীয় অভিযোগের অমূলকতা প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রীহত্যা সম্বন্ধীয় অভিযোগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করিতেছি। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাসে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুমন বা সুষীম একদা পরিহাসচ্ছলে প্রধান মন্ত্রী খল্লাতকের মস্তকে স্বীয় অঙ্গুলি ত্রাণ (দস্তানা) নিক্ষেপ করেন। এই সামান্য অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত মন্ত্রী একতাবদ্ধ হন এবং অশোকের পক্ষাবলম্বন করেন। তাঁহাদের সহায়তা ও যত্নে অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। ঈদৃশ ক্ষমতাশালী মন্ত্রীবর্গকে তিনি অকারণে নির্ব্বিচারে হত্যা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং মন্ত্রীগণ তাঁহার ঘোর নৃশংসাচরণ সহ্য করিয়াছিলেন, এরূপ কথনও যুক্তিসিদ্ধ নহে। অশোকের নারীহত্যা এবং প্রজাহত্যা সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ভ্রাতৃহত্যা এবং মন্ত্রীহত্যার ন্যায় এই দুই অভিযোগও ভিত্তি হন। তবে কি জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে অশোক চরিত্র ঘোর কলঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে? এতদুত্তরে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যই এই সকল উপকথার সৃষ্টি হইয়াছিল। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ঘোর পাপী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পাপনাশক শক্তি এরূপ অসাধারণ যে, অশোকের ন্যায় ঘোর পাপীও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাদৃশ ধর্ম্মশীল এবং মহাপ্রাণ

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র প্রণীত অশোক।

* পঞ্চম গিরিলিপি।

হইতে সমর্থ হন। এইরূপ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই অশোকের প্রথম জীবন মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

অশোক রাজপদ লাভকালে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন; এই মত প্রামাণিক ও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কারণ ও সময় সম্বন্ধে একাধিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবংশে লিখিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুমন বা সুষীম নিহত হইলে তদীয় অন্তর্ব্বত্নী পত্নী পলায়ন করিয়া জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে উপনীত হন এবং তথায় একপুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই শিশু নিগ্রোধ নামে পরিচিত হন এবং বাল্যকালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একদা নিগ্রোধ রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী পথ অতিবাহিত করিয়া গমন করিতেছিলেন; এরূপ সময়ে অশোক তাঁহাকে দেখিতে পান, বালকের অপরূপ লাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে। অশোক তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করেন এবং তাঁহার মুখে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অমৃততুল্য ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। * মহাবংশে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রদত্ত হইল, এখন অশোক অবদানের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। এই গ্রন্থের মতে একজন অলৌকিক ভিক্ষু অশোকের জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী করেন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই ভিক্ষুর নাম উপগুপ্ত লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ বৌদ্ধগ্রন্থকর্ত্তৃগণ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের সময় সম্বন্ধে একরূপ নির্দ্দেশই দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সিংহাসনারোহণের চতুর্থ বর্ষে অভিষেক ক্রিয়ার সমকালেই তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* অশোকের দীক্ষাকালে নিগ্রোধের বয়স ৭ বৎসর ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থমতে নিগ্রোধ অশোকের সিংহাসন লাভের সমকালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অশোকের দীক্ষাকাল তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষ ছিল। অতএব স্পষ্ট অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে।

সুবিখ্যাত ভিনসেন্ট স্মিথ অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহ ধৃত কারণ এবং সময়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। অশোকের প্রথম জীবনের অমানুষিক নৃশংসাচরণের বিবরণ গ্রাহ্যযোগ্য নহে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস সমূহে যে অশোক চরিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর কষ্টিপাথরে ঐতিহাসিক তথ্য রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তবে অশোক চরিত উদ্ধার করিবার উপায় কি? অশোক স্বয়ং বহু সংখ্যক অনুশাসন লিপি প্রচার করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তৎসমুদয় মধ্যে অনেক গুলি অক্ষ পর্য্যন্ত ও অক্ষুন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অশোকের আদেশ লিপি সকল বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ; বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহের আলোকে উহা পাঠ করিলে তাঁহার জীবনের অনেক কথা আমরা অবগত হইতে পারি।*

আমরা অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের প্রকৃত কারণ এবং সময় নিরূপণ জন্য তাঁহার ত্রয়োদশ গিরিলিপির প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী † স্বীয় রাজত্বের নবম

* At the begining of the researches by European scholars, the Ceylon chronicles were of most service * * * It is not possible to understand them (Royal proclamations and official statements) without the light thrown upon them by the later accounts. Budhist India chap. xv.

† সমস্ত অনুশাসন লিপিতেই প্রিয়দর্শী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের নাম নাই। অতএব এই সকল অনুশাসন লিপি অশোক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ হইতে পারে। প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নতা প্রদর্শন করা আবশ্যক, সিংহলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংশে অশোক ও প্রিয়দর্শী নাম অভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক বর্ণনায়ই কোন স্থানে অশোক, কোনস্থানে বা প্রিয়দর্শী লিখিত হইয়াছে। অশোক বা প্রিয়দর্শীর পিতার নাম বিন্দুসার এবং পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান স্থিত স্তম্ভ অশোক নির্ম্মিত বলিয়া হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রিয়দর্শীর নাম বিদ্যমান। অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও প্রিয়দর্শী ও অশোক এক নামবাচক ছিল। সম্প্রতি নিজাম বাহাদুরের রাজ্যে একখানি অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে প্রিয়দর্শীর পরিবর্ত্তে অশোক নাম লিখিত আছে।

বর্ষে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন। এই যুদ্ধে দেড়লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হইয়াছিল, একলক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল, এতদপেক্ষা বহুগুণ নরনারীর জীবন নষ্ট হইয়াছিল। কলিঙ্গ অধিকারের সময় হইতে মহিমান্বিত রাজা সাগ্রহে প্রেমের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন, সে ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছেন এবং সে ধর্ম্মের উপদেশ প্রচারে নিরত হইয়াছেন। কলিঙ্গ বিজয়ে মহিমান্বিত রাজার অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ অপরাজিত দেশ অধিকার করিবার সময় হত্যা, মৃত্যু এবং বন্দীকরণ অবশ্য সংঘটিত হয় এবং তাহাতে মহিমান্বিত রাজা গভীর দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করেন। মহিমান্বিত রাজার পক্ষে এতদপেক্ষাও অধিক দুঃখানুভবের কারণ এই যে, এইরূপ একটি দেশে ব্রাহ্মণ, সাধু সন্ন্যাসী, নানা শ্রেণীর লোক এবং পিতা মাতা, গুরু এবং বয়োজ্যেষ্ঠের আজ্ঞাধীন এবং বন্ধুবান্ধব, পরিচিত জন, সহচর, আত্মীয় স্বজন, ক্রীতদাস ও ভৃত্যের অনুরাগী সদ্ব্যবহারী গৃহস্থ বর্গ বাস করেন। এবং এইরূপ ব্যক্তিবর্গ ক্ষতি, হত্যা এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করেন। যে সকল ব্যক্তি নিজে রক্ষা পান, তাহাদের স্নেহ ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু তাহাদের পরিচিত জন, সহচর এবং আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। যাহারা নিজে নিরাপদ থাকেন, এই ভাবে তাহারা ও দুঃখ প্রাপ্তহন। এই সমস্ত দুর্দ্দশা মহিমান্বিত রাজার গভীর দুঃখের কারণ, কারণ সমস্ত দেশেই অগণ্য সাধু সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ স্থানও বিরল, যেখানে কোন না কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বাস নাই। কলিঙ্গ দেশে যত লোক হত হইয়াছিল, যত লোক বন্দী হইয়াছিল, যত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার শতাংশ অথবা সহস্রাংশেরও ক্ষতি হইলেও তাহা এখন মহিমান্বিত রাজার গভীর দুঃখের কারণ হইবে।

আমরা অশোকের এই লিপিপাঠে তিনটি বিষয় জানিতে পারি। (১) কলিঙ্গ বিজয়কালে অসংখ্য নরনারীর মৃত্যু ও ঘোর দুর্দ্দশা হইয়াছিল। (২) এজন্য অশোকের হৃদয়ে প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল, (৩) কলিঙ্গ বিজয়ের সময় হইতে তিনি প্রেমের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ কলিঙ্গদেশের ন্যায় সমৃদ্ধ এবং প্রবলপ্রতাপদেশ (মেগাস্থিনিসের মতে কলিঙ্গ রাজ্যের ৬০হাজার পদাতিক সৈন্য, একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৭ শত রণহস্তী ছিল।) জয় করিতে একলক্ষ লোকের হত্যা সাধিত হয়; যুদ্ধের অনিবার্য্য ফল দুর্ভিক্ষ এবং পীড়ায় ততোধিক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এতদ্দর্শনেই অশোক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। এই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয় কাঞ্চনের মত বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাই তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অমৃত তুল্য উপদেশ দ্বারা তাঁহার প্রকৃতিগত গুণরাশি বিকশিত করিয়া তুলেন।

যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অশোক তাহাতে অনুরাগী হইয়া ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দেশ জয়ে বিরত থাকিয়া কেবল প্রেম ও সাম্য প্রচার করিবে। এই ইচ্ছা তিনি আপন অনুশাসন লিপিতে প্রকাশ করেন। আমরা ঐ লিপির কিয়দংশের অনুবাদ এখানে প্রদান করিতেছি।

যাহাতে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নূতন জয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা না করে, যাহাতে তাহারা তরবারিলব্ধ জয় প্রকৃতজয় বলিয়া বিবেচনা না করে, যাহাতে তাহারা তরবারিলব্ধজয়ে কেবল বিনাশ ও পাশবিক বল দেখিতে পায় এবং যাহাতে ধর্ম্মের জয় ব্যতীত আর কোন জয়ই প্রকৃত জয় বলিয়া গ্রহণ না করে, তজ্জন্যই এধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ হইল। ধর্ম্মের জয়ই ইহকালেও পরকালে সদগতি আনয়ন করে, তাহারা যেন কেবল ধর্ম্ম হইতেই আনন্দ লাভ করে, কারণ তাহাই ইহকালে এবং পরকালে মূল্যবান।*

সত্য সংকল্প অশোক উত্তরাধিকারিগণকে বিজয়ের পথে কেবল বিনাশ দেখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এজন্য ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি নিজেও আর দেশজয় জন্য তরবারি কোষোমুক্ত করেন নাই। বস্তুতঃ কলিঙ্গ বিজয়ের পর তিনি দেশ জয়ে বিরত হইয়াছিলেন।

* ত্রয়োদশ গিরিলিপি।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়াছিল, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহ নিরাপদ ছিল। কিন্তু দেশ জয়ের বিরতি সত্বেও যে সাম্রাজ্য অশোককর্ত্তৃক শাসিত হইত তাহা সুবিশাল ছিল। তাহার সুব্যবস্থার জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া সমগ্র মগধের অধিকার লাভ করেন। তারপর গ্রীক অধিপতি সেলিউকাস নিকেটরের সহিত সন্ধি সূত্রে পঞ্জাবের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী ভারতীয় অংশ পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তগত হয়, তৎকালে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সংলগ্ন ছিল, ফলতঃ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকসন্ধি অনুসারে আধুনিক কাবুল, কান্দাহার, গজনী, হিরাট প্রভৃতি স্থানের অধিকারী হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুরপর বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক এই বিশাল ভূখণ্ড উত্তরাধিকারক্রমে প্রাপ্ত হন। মালব ও গুজরাট বিন্দুসারের অধিকারভুক্ত ছিল। শক অধিপতি রুদ্রদামের শিলালিপি পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, কাঠিবার প্রভৃতি অশোকের শাসনভুক্ত ছিল। অশোক রাজত্বের নবমবর্ষে সুবৃহৎ কলিঙ্গ দেশ বিজিত হইয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অশোকের শাসনাধিকার ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহারাজ অশোক এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পাঁচটি প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা এই পাঁচটি কেন্দ্রের নামোল্লেখ করিতেছি। (১) তক্ষশিলা, (২) উজ্জয়িনী, (৩) সুবর্ণগিরি, (৪) তোষালি, (৫) মগধ। তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী এবং মগধ আমাদের পরিচিত; সুবর্ণগিরি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশের রাজধানী ছিল; নববিজিত কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা তোষালিতে বাস করিতেন। প্রত্যেক শাসন কেন্দ্রে একজন রাজ প্রতিনিধি অবস্থিতি করিতেন। "অশোকের শিলা লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে রাজপ্রতিনিধির পর রাজুকপদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাজুকগণ রাজস্ব ও রাজ্য শাসন সম্বন্ধে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। অপরাধী প্রজাকে শাস্তি প্রদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। প্রজার সুখ দুঃখের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের কল্যাণ সাধনে রাজুকগণ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি প্রজামণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিতেন, নানাবিধ সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং সাধুদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে নিয়ত আগ্রহান্বিত থাকিতেন। নরপতি অশোক তাঁহার চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়াছেন যে, "যেমন সুনিপুণ ধাত্রীর প্রতি সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া মানবগণ নিশ্চিন্ত ভাবে কালযাপন করে, আমিও তেমনি প্রকৃতি বর্গের সুখ সমৃদ্ধির জন্য রাজুকদিগকে নিয়োজিত করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। স্বাধীন ভাবে, নির্ব্বিঘ্নে এবং শান্তমনে তাঁহারা যাহাতে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত রাজ্য শাসন বিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি।"

বস্তুতঃ রাজুকগণ রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যখন যেরূপ আদেশ প্রদান করিতেন, একমাত্র সম্রাট ভিন্ন অপর কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না। রাজুকগণের পর প্রাদেশিকের পদ। প্রাদেশিকগণ রাজুকদিগের আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক রাজকার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। রাজুক ও প্রাদেশিকের সাধারণ নাম মহামাত্র। রাজুক, প্রাদেশিক, যুক্ত এবং অযুক্তগণ মিলিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সকল প্রকার রাজকার্য্যই লেখক শ্রেণীরদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। অশোকের সময় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী যে সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, তাহা এই শাসন বিভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজুক, প্রাদেশিক, যুক্ত এবং অযুক্তগণ প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর রাজকার্য্য এবং প্রজার অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রজামণ্ডলীকে সমবেত করিয়া আবশ্যক মত অশোকের রাজনিতি এবং ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন।

অযুক্ত দিগের কার্য্য অনেকটা শাসন কার্য্যের মতই ছিল। ইঁহারা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। মহামাত্রগণের উপর এক একটি প্রদেশের শাসন ভার অর্পিত ছিল। ইহারা দোষী ও নির্দ্দোষের বিচার করিয়া রাজবিধানানুযায়ী দণ্ড প্রদান করিতেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ রাজুক গণকে কমিশনার, প্রাদেশিকদিগকে ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার নামে অভিহিত করিয়াছেন।" *

রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। ভূমির রাজস্বই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উপায় ছিল। সমস্ত কৃষিভূমি রাজসম্পত্তি রূপে গণ্য ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর রূপে গৃহীত হইত। কোন কোন স্থলে এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত করও আদায় করিবার নিয়ম ছিল। প্রকৃতি পুঞ্জের যাতায়াতে সুবিধার জন্য রাজব্যয়ে পথ সমূহ নির্ম্মিত হইত এবং রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজপথে দূরত্ব জ্ঞাপক স্তম্ভ সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশোকের আদেশে রাজ কর্ম্মচারিগণ বৃক্ষ রোপণ করিয়া পথ সমূহ ছায়াশীতল করিয়া ছিলেন। পথিকদের ব্যবহারার্থ পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে কূপ খনিত হইয়াছিল। মহারাজ অশোক কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রুদ্রদামের শিলালিপি পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, সুরাটের শাসন কর্ত্তা কৃষি কার্য্যের জন্য গির্ণার হ্রদের জল ব্যবহারের সৌকর্য্যার্থ কৃত্রিম খাল খননও সেতু নির্ম্মাণ করেন। রাজধানী পাটলি পুত্র হইতে সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য মহারাজ অশোক কীদৃশ অবহিত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য রূপে এই শিলালিপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুবিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র জনপূর্ণ, বহ্বায়তন এবং বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজিশোভিত ছিল। হিউএনৎ সঙ্গের মতে অশোকের রাজধানী দানবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাদৃশনগরীর বাণিজ্য স্রোত শতমুখে প্রবাহিত হইত। এই বাণিজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিবিধ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এজন্য কর্ম্মচারিগণ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ শিল্পি ও শিল্পকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বিদেশীয়দের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহারা রোগের সময় চিকিৎসা এবং মৃত্যু অন্তে সৎকারের ব্যবস্থা করিতেন। বিদেশীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা বিদেশীয়দের স্বদেশ গমন কালে তাদের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষী দিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ জন্ম মৃত্যুর তালিকা রাখিতেন, নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ জন্য এইরূপ তালিকার প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীর উপর ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং করসংগ্রহের ভার ন্যস্তছিল। পঞ্চম শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ষষ্ঠশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের হস্তে সর্ব্বপ্রকার বিক্রীত দ্রব্যের কর আদায় করিবার ভার ন্যস্ত ছিল।

অশোকের রাজত্ব কালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কিপ্রকার ছিল, আমরা তাহার রেখাপাতমাত্র করিলাম, মহারাজ স্বয়ং অনলস ভাবে সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। উৎপীড়িত প্রজাকুলের পক্ষে রাজদ্বার অবারিত ছিল, তাহারা আপনাদের ইচ্ছামত সর্ব্বক্ষণ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আপনাদের অভিযোগ নিবেদন করিতে পারিত। বস্তুতঃ তিনি প্রজাপালন জন্য সর্ব্ব প্রকার শ্রম সহ্য করিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহার অপত্য তুল্য ছিল; প্রজাপালন জন্য তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। আমরা এই মত সমর্থনার্থ তাঁহার ধৌলাগিরিলিপির কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। "তোষলির শাসন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। আমি আমার মত যথার্থই কার্য্যে পরিণত এবং উপযুক্ত উপায়ে তাহা সম্পাদিত হইবার অভিলাষ করি, এবং আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের

* অশোক (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু) হইতে উদ্ধৃত। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

প্রধান উপায় আমার এই উপদেশ সমূহ। কারণ সাধু পুরুষদের প্রীতিলাভ করিবার জন্য তোমরা লক্ষ লক্ষ নর নারীর উপর কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছ। সমস্ত মনুষ্য আমার সন্তান, যেমন আমি ইচ্ছা করি যে, আমার সমস্ত সন্তান ইহকালে এবং পরকালে সমস্ত সুখ ও উন্নতি উপভোগ করিবে, সেই ভাবে সমস্ত লোকের সুখ ও উন্নতির জন্য ও আমার ইচ্ছা। তোমরা যতদূর সম্ভব সুফল লাভ করিতে অসমর্থ রহিয়াছ। অনেক লোক কেবল আংশিক ভাবে আমার উপদেশ পালন করে। সমগ্র উপদেশ পালন করিতে অবহিত নয়। এইরূপ লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, যেন নৈতিক নিয়ম প্রতিপালিত হয়। অনেক লোক কারাগারে প্রেরিত অথবা যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় কারাবাস অথবা যন্ত্রণা প্রদান নিবারণ জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ঈর্ষ্যা, অধ্যবসায়ের অভাব, কঠোরতা, অসহিষ্ণুতা, নিপুণতার অভাব, আলস্য এবং অসংযম সাফল্য লাভের অন্তরায়।"

অশোক এই লিপিতে লিখিয়াছেন যে, সমস্ত লোক তাঁহার অপত্য তুল্য। ইহা তাহার সুগভীর বিশ্ব মানব প্রীতির পরিচায়ক। এই মানব প্রীতিধর্ম্মভাব সঞ্জাত। অশোকের ধর্ম্মভাব বিস্ময়কর। আমরা যতই তদ্বিষয়ে আলোচনা করি, ততই আমাদের মস্তক তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে, অশোকের ধর্ম্ম ভাব প্রথমেই পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুট হয় নাই। ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মানুসারে পর্য্যায় মত পূর্ণতা লাভ করে এই ক্রমাভিব্যক্তির বিবরণ শান্তি রসাস্পদ এবং সর্ব্বথা আলোচনার যোগ্য। আমরা সংক্ষেপে সে বিবরণ উপহার দিতেছি। এতদর্থে প্রথম ক্ষুদ্রগিরি লিপির এবং অষ্টম গিরিলিপির আংশিক অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। মহিমান্বিত রাজা অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমি সার্দ্ধ দুই বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল উপাসক শিষ্য মাত্র ছিলাম, নিজে সবিশেষ পরিশ্রম করি নাই। ছয় বৎসর অথবা ততোধিক কাল অবধি আমি সঙ্ঘে যোগ দান করিয়াছি এবং নিজে কঠোর শ্রম করিতেছি। এবং এই সময় মধ্যে যাহারা সমগ্র ভারতবর্ষে যথার্থ মনুষ্যরূপে পরিগণিত ছিল, তাহারা আপন আপন দেবতাসহ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। (১) (অতঃপর) মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী সত্য জ্ঞান পথে (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক সদ্ব্যবহার, সম্যক উপজীবিকা আহরণ, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি দ্বারা অর্হৎত্ব লাভ উদ্দেশ্যে) যাত্রা করিয়াছেন। (২)

যে ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য সম্রাট্ অশোক অর্হৎত্ব লাভ উদ্দেশ্যে সমস্ত ঐহিক সুখ তুচ্ছ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মের জন্য তিনবার সমগ্র জম্বুদ্বীপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তিন বারই স্বীয় রত্ন ও ধন ভাণ্ডার প্রদান করিয়া সে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিতে স্বভাবতঃই আমাদের আগ্রহ জন্মে। ধর্ম্মপ্রাণ অশোকের ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বভাবতঃই কৌতুহল উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার অনুশাসন লিপি সকল আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত অবগত হইতে পারি। অশোকের ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি। তৎকালে ভারতবর্ষে তিন শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্মার্থী পরিদৃষ্ট হইত। (১) অর্হৎত্ব অভিলাষী (২) পরিব্রাজক এবং (৩) উপাসক। এই তিন শ্রেণীর ধর্ম্মমত মূলতঃ একরূপ হইলেও অনেক বিষয়ে প্রভেদ ছিল। অশোকের অনুশাসন লিপি হইতে আমরা যে ধর্ম্মমত অবগত হইয়া থাকি, তাহা উপাসক অর্থাৎ সর্ব্ব সাধারণের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা এখন অশোকের কতিপয় লিপির মর্ম্মানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

(১) প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপি।

(২) অষ্টম গিরিলিপি। সম্যক সংকল্প, সংকল্প ঠিক রাখা। সম্যক বাক্,—সত্য, সরল, প্রিয় বাক্য বলা। সম্যক সদ্ব্যবহার,—সদাচরণ। সম্যক জীবিকা আহরণ, সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন। সম্যক ব্যায়াম,—আত্ম সংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন। সম্যক স্মৃতি, ধারণা ঠিক রাখা। সম্যক সমাধি, জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সমূহের ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন।

He had set out for the Sambodhi, that is to say, he had set out, along the Aryan Eightfold Path, towards the attainment of the state of mind called Arhatship Buddhist India Page 283.

প্রথম গিরিলিপি,—(১) কোন জীবের বলিদান হইবে না। (২) জাতীয় ভোজের উৎসব হইবে না।

তৃতীয় গিরিলিপি,—(৩) পিতা মাতার অনুগত থাকা কর্ত্তব্য। (৪) বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। (৫) কোন প্রাণীকে আঘাত করিবে না। (৬) মিতব্যয়ী হইবে এবং কলহ হইতে দূরে থাকিবে।

সপ্তম গিরিলিপি,—দীন দরিদ্রের পক্ষেও (৭) আত্মজয় (৮) আন্তরিক পবিত্রতা (৯) কৃতজ্ঞতা (১০) বিশ্বস্ততা সকল সময়েই সম্ভবপর এবং কর্ত্তব্য।

নবম ও একাদশ গিরিলিপি,—(১১) মানবমণ্ডলী সৌভাগ্য লাভোদ্দেশ্যে পীড়া, বিবাহ এবং সন্তানের জন্য অথবা দূরদেশে যাত্রাকালে ব্রত ও উৎসবাদি ক্রিয়া করে। ইহা কুরীতি, ইহা নিষ্ফল। ধর্ম্মপালনই প্রকৃত সৌভাগ্য ব্রত ও উৎসব। এই ব্রত-উৎসব কুরীতি নহে, পরন্তু সুফলপূর্ণ। ক্রীতদাস ও ভৃত্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আচার্য্যদিগকে সম্মান প্রদর্শন ও প্রাণীর সহিত সংযত ব্যবহার ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদিগকে দান, সমস্তই এই ব্রত উৎসবের অন্তর্গত। ধর্ম্মানুসারে এই সকল এবং এই সকলের ন্যায় অন্যান্যই প্রকৃত উৎসব এবং ব্রত। এ জন্য যে কেহ, পিতা, ভ্রাতা, অথবা প্রভু এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন এবং বলিবেন, ইহাই কর্ত্তব্য; চির সুফল লাভ জন্য এই উৎসব এবং ব্রত সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। দান কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন দান, কোন সাহায্যই অন্যকে ধর্ম্মদান এবং অন্যের ধর্ম্মলাভের সহায়তা করার তুল্য নহে।

দ্বাদশ গিরিলিপি,—(১২) উদারতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সম্মান করিতে হইবে, অন্য সম্প্রদায়ের গৃহী এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এক সম্প্রদায় স্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করিবে না। আলাপে সংযম প্রার্থনীয়। প্রত্যেক মানুষই স্বসম্প্রদায়ের সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকর্ষ লাভ করুক।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি, (১৩) ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ধর্ম্ম কি? মোহের অভাব, পরোপকার, দয়া, উদারতা, সততা এবং পবিত্রতাই ধর্ম্ম।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি,—(১৪) মানুষ কেবল নিজের সৎকর্ম্ম দেখিতে পায়। মানুষ বলে, আমি এই সৎকার্য্য করিয়াছি। মানুষ তাহার অসৎকর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ হয়।

মানুষ কখনও বলে না, আমি এই অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। এইরূপ আত্মপরীক্ষা দুর্লভ। মনুষ্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে এবং বলিবে, এইরূপ কার্য্য অর্থাৎ ক্রোধ, অহঙ্কার নির্দ্দয়তা এবং পাশবাচার পাপজনক। আমি অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও লোকনিন্দা করিব না। ইহা ইহকালে শুভকর, পরকালেও নিশ্চয় শুভকর হইবে।

এই সকল অনুশাসন-লিপিতে ঈশ্বর, আত্মা, বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির কোন প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোন নূতন তত্ত্ব সমাবিষ্ট হয় নাই। কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয় নাই। কেবল বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত সরল নীতিতত্ত্ব সরলভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহা পালন করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়ের কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করিয়া থাকে। মহাপ্রাণ অশোক এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বিশ্বমানবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে মহত্ত্ব ও মাধুরী এবং প্রীতি ও নীতির ভিন্ন ভিন্ন পটলে অভ্যস্ত করিবার জন্য আমরণ মহা সাধনায় নিরত ছিলেন। এই মহা সাধনাই প্রধানতঃ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য কীর্ত্তিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার অমরলোকে প্রস্থানের পর প্রায় সার্দ্ধবিংশতাধিক দ্বিসহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, আজও তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণে কোটি কোটি মানব-হৃদয়-বিমল আনন্দ রসে সিক্ত হইয়া থাকে।

আমরা অশোকের সে মহাসাধনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক আড়াইশত বৎসর হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কত ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা নানাদলে

বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহারা ঐ সময়ে ১৮টী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত ছিল। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপন সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন বৌদ্ধমত ও দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা আবশ্যক। এই কারণ তিনি পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের এক সভা আহ্বান করেন। "অশোকের সভায় বৌদ্ধশাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার, বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। (১) এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান-নীতি, উপাখ্যান, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি নিবেশিত আছে।" (২)

মহারাজ অশোক ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সভার আহ্বান অন্যতম ছিল। তাঁহার অবলম্বিত অন্যান্য উপায়ের সবিস্তার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আমরা সপ্তম স্তম্ভলিপির আংশিক বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিতেছেন,—পুরাকালে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, লোকসকল ধর্ম্মের বিকাশ সাধন করিবে। কিন্তু তাহারা আশানুরূপভাবে ধর্ম্মের বিকাশ সাধন করে নাই। আমার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, প্রাচীন রাজন্যগণ লোকসকল কর্ত্তৃক ধর্ম্ম বিকাশের কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম এই আশানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কি উপায় অবলম্বন করিলে মানবজাতি আজ্ঞাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইবে? কি উপায়ে তাহারা আশানুরূপ ধর্ম্মের বিকাশ সাধন করিতে পারে? কি উপায়ে আমি ধর্ম্মের বিকাশ সাধনোদ্দেশ্যে অন্ততঃ তাহাদের কতকাংশ উন্নীত করিতে পারি? এই কারণে আমি ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিতে এবং ধর্ম্ম শিক্ষার বিধান করিতে সংকল্প করিয়াছি। তাহা হইলেই তাহারা এই সকল শুনিয়া সৎপথাবলম্বী হইবে এবং আপনাদিগকে উন্নীত করিবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিতেছি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতেছি। তজ্জন্য আমি অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিবে। সহস্র সহস্র লোকের তত্ত্বাবধান জন্য রাজুগণ নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মোপদেশ দান জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের অধিকতর সাধন জন্য আমি ধর্ম্মস্তম্ভ সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমি ধর্ম্ম মহামাত্রগণকে নিযুক্ত করিয়াছি এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছি। আমি মানুষ এবং পশুকে ছায়াদান জন্য পথপার্শ্বে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি। আমি আম্রকানন সকল প্রস্তুত করাইয়াছি। প্রত্যেক অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ সকল খনিত হইয়াছে, বিশ্রাম-গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। লোকের হিত-সাধন জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণও এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমি মনুষ্যকে ধর্ম্মাধীন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করিয়াছি। * * মহামাত্র এবং অন্যান্য রাজপুরুষ রাজার এবং রাণীদের অর্থ বিতরণার্থ নিযুক্ত রহিয়াছে। * * আমি যে কিছু সৎকার্য্য করি, লোকেরা তাহার অনুকরণ করে এবং তজ্জন্য পিতা মাতার আজ্ঞা পালন, গুরুর আজ্ঞা পালন, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, দরিদ্র এবং হতভাগ্যদের সহিত, এমন কি, ক্রীতদাস ও ভৃত্যের সহিত

---

(১) বিনয়পিটক অংশে বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী লইয়া সুত্ত, পিটক অংশ রচিত। বৌদ্ধ দর্শনের নাম অভিধর্ম্ম পিটক।

(২) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম্ম'। অশোকের ধর্ম্মসভার উল্লেখ অশোক-অবদান অথবা অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থে নাই। চৈনিক পরিব্রাজকগণও ইহার কোন প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করেন নাই। অশোকের অনুশাসন-লিপিতেও এতৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ নাই। কেবল সিংহল দেশীয় মহাবংশ এবং অন্যান্য গ্রন্থে অশোকের ধর্ম্ম সভার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহার বিবরণ কল্পনা-প্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিংহলদেশীয় বিবরণে আস্থা স্থাপন করিয়া অশোকের ধর্ম্মসভা ঐতিহাসিক ঘটনারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদের উন্নতি হইয়াছে এবং হইবে। * * * দুই উপায়ে লোকের ধর্ম্মবিকাশের সহায়তা করা হইয়াছে। যথা, ধর্ম্মসঙ্গত বিধান এবং ধ্যানের প্রবর্ত্তন। ইহার মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গত বিধানের প্রবর্ত্তন সামান্য ফলকর। ধ্যান অতি শ্রেয়ঃ। * * *

আমরা অশোকের এই লিপিপাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, তিনি মানবমণ্ডলীতে ধর্ম্ম প্রচার জন্য অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যথা (১) ধর্ম্মোপদেশ দান, (২) অনুশাসন লিপি প্রচার, (৩) মানুষ ও পশুর সুখসাধন, (৪) ধর্ম্ম মহামাত্রার নিয়োগ, (৫) দাতব্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা, (৬) ধর্ম্মসঙ্গত বিধানের প্রবর্ত্তন। (৭) ধ্যানের প্রবর্ত্তন, (৮) রাজচরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

এখন আমরা এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ অশোক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান জন্য বহুসংখ্যক প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই সকল প্রচারকের যত্নে ও উদ্যোগে ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল এবং অসংখ্য নরনারী সে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিল, এতৎসম্বন্ধে আমরা অশোকের ত্রয়োদশ অনুশাসন লিপি হইতে জানিতে পারি, যে সিরিয়া, মিশর, ফিলাডেলফাস্, মাকিডন এবং এপিরাশ নামক পঞ্চ গ্রীক রাজ্যের অধিপতিগণ তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অশোক তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল দেশ ব্যতীত আরও নানাস্থানে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহাবংশে ঐ সকল স্থানের একটী তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে সে তালিকাটী উদ্ধৃত করিতেছি।

	দেশের নাম।	প্রচারকের নাম।
১।	কাশ্মীর ও গান্ধার।	মজঝন্তিক।
২।	মহিষামণ্ডল। (গোদাবরী নদীর দক্ষিণ অংশ)	মহাদেব।
৩।	বনবাসী (কর্ণাট-মহীশূর)	রক্ষিত।
৪।	অপরান্ত (সিন্ধুনদের পশ্চিম-দিগস্থ ভারতের বহির্ভূত ব্যাক্‌ট্রিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ সকল)	যোগ, ধর্ম্ম ও রক্ষিত।
৫।	মহারাষ্ট্র।	মহাধর্ম্ম রক্ষিত।
৬।	যোগলোক (গ্রীস)	মহারক্ষিত।
৭।	হিমবন্ত (মধ্যহিমালয় অর্থাৎ তিব্বত প্রভৃতি)	ঝিম, দুরভিসার এবং মূসকদেব।
৮।	সুবর্ণভূমি (সম্ভবতঃ মলয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান)	সেন এবং উত্তর।
৯।	লঙ্কা।	মহেন্দ্র প্রভৃতি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্‌সঙ্গ ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য নামক রাজ্যদ্বয়ে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ দেখিয়াছিলেন। অশোকের অনুশাসন লিপিতেও এই দুই স্বাধীনরাজ্যে প্রচারক প্রেরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাবেরী নদীর দক্ষিণে মানকূট নামক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। এই রাজ্য সম্বন্ধে চৈনিক পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজধানীর অদূর পূর্ব্বদিকে একটি অর্দ্ধভগ্ন সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। এই সঙ্ঘারাম অশোক রাজার ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকে একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। মহারাজ অশোক ইহার নির্ম্মাতা ছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ প্রদেশ অশোকের শাসনাধীন না হইলেও তথায় অশোকের সাধনায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। সিংহলদেশীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, তদ্দেশীয় রাজার অনুরোধে মহারাজ অশোক স্বীয়-পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে তথায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের অক্লান্ত প্রচারের ফলে সিংহলের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিউএন্থ্‌সঙ্গ মহেন্দ্রকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ানও এইরূপই লিখিয়াছেন। হিউএন্থ্‌সঙ্গ প্রদত্ত বিবরণানুসারে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর-স্বভাব, যথেচ্ছাচারী ও অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তদীয় উৎপীড়ন ও

অত্যাচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এজন্য মন্ত্রী এবং পুরাতন কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসকাশে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজ অশোককে বলিয়াছিলেন,—অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে প্রজাকুল সন্তুষ্ট থাকে; যদি প্রজাকুল সম্মতি প্রকাশ করে, তবে শাসনকর্ত্তা শান্তিলাভ করেন। আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজনিয়ম দেখিয়া আসিতেছি। আমরা প্রার্থনা করি যে, মহারাজ এই চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করিবেন, এবং কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। মহারাজ অশোক এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রকে স্বসমীপে আনয়ন করেন। মহেন্দ্র এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন। মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সপ্তাহ মধ্যে মহেন্দ্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি অনুশোচনা বলে অর্হৎত্ব লাভ করেন। অশোক তাঁহার তাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, এবং তাঁহার বাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ফাহিয়ান মহেন্দ্রকে প্রথমাবধি শান্তশিষ্ট এবং নির্জ্জন-প্রিয় গৃধ্রকূটবাসীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অশোক রাজা ভ্রাতা মহেন্দ্রকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া নির্জ্জন বাসের জন্য দানবদের সাহায্যে পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহেন্দ্র ধর্ম্মবলে অর্হৎত্ব লাভ করেন এবং যোগবলে শূন্যে ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সিংহলদেশে উপনীত হন। আমরা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং মহেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহাতে সামঞ্জস্য নাই। এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিবরণের সামঞ্জস্য বিধান করিলে আমরা এই ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হই যে, মহেন্দ্র নামক অশোকের একজন পরমাত্মীয় প্রথমে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, তারপর সিংহলে ধর্ম্ম প্রচার করেন।

অশোকের আদেশে প্রচারকগণ ভারতে এবং ভারত ছাড়িয়া নানা দেশবিদেশে তাঁহার মতানুগত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া মহারাজ অশোক স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মমত বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সে সময় মুদ্রাঙ্কণ প্রথা ছিল না। পুস্তক কিম্বা গেজেটদ্বারা এখনকার রাজপুরুষেরা যেমন নিয়মাদি প্রকাশ করেন, তখন সেরূপ ছিল না। অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের মত এবং মহারাজের অনুজ্ঞা অবগত করান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অশোক একটি আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল আজ্ঞা ও নিয়ম সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত, তাহা সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে এই সমুদয় স্তম্ভে ও ফলকে খোদিত করা হইত। * মহারাজের ঈদৃশ আদেশগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) অশোক অনেক আদেশ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত করিয়াছিলেন। (২) অশোকের অনেকগুলি আদেশ শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। (৩) এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে আদেশ উৎকীর্ণ দেখা গিয়াছে। †

মহারাজ অশোক স্বধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে মানুষ ও পশুর সুখবিধানকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় দ্বিতীয় গিরিলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এখানে ঐ গিরিলিপির অনুবাদ প্রদান করিলাম।—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজ্যের প্রত্যেক

---

* ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন।

† অনুশাসন লিপির তালিকা।

	সংখ্যা।	সময়।	অভিষেক বর্ষ।
ক্ষুদ্র গিরিলিপি	৩	২৫৭ খৃঃ পূঃ	ত্রয়োদশ।
ভাবরী লিপি	১	ঐ	ঐ
গিরিলিপি	১৪	২৫৭—২৫৮ "	ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ।
স্তম্ভলিপি	৭	২৪৩—২৪২ "	সপ্তবিংশতি ও অষ্টবিংশতি।
ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি	৪	২৪১—২৩২ "	ঊনবিংশৎ ও অষ্টত্রিংশৎ।
স্মারক লিপি	২	২৪৯ "	একবিংশতি।
গুহালিপি	১	২৫৭—২৫০ "	ত্রয়োদশ, বিংশতি।
কলিঙ্গলিপি	১	২৫৫—২৫৬ "	
প্রাদেশিকলিপি	১	২৫৬—২৫৫	
মোট সংখ্যা—	৩৪		

চারু বাবুর অশোক হইতে উদ্ধৃত।

স্থানে এবং সেইরূপে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে, চোল, পাণ্ড্য, সতিয় পুত্র এবং কেবল পুত্রে, সিংহলে, গ্রীকরাজ এণ্টিও-কাসের রাজ্যে ও এণ্টিওকাসের সামন্ত রাজগণের শাসিত প্রদেশে, সর্ব্বত্র মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শীর পক্ষ হইতে দুই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—মানুষের চিকিৎসা ও পশুর চিকিৎসা। যে স্থানে রোগনাশক উদ্ভিজ, মানুষের প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং পশুর প্রয়োজনীয় ঔষধ অপ্রাপ্য সেখানেই তৎসমুদয় নীত ও রোপিত হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত স্থানে ফলমূলের অভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানেই তৎসমুদয় নীত এবং রোপিত হইয়াছে। পথের পার্শ্বে মানুষ ও পশুর ব্যবহার জন্য বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, কূপ খণিত হইয়াছে।

প্রজাদিগকে ধর্ম্মের পথে রাখিবার জন্য অশোক ধর্ম্মমহামাত্রা নাম দিয়া বহুসংখ্যক ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান জন্য আমরা পঞ্চম গিরিলিপির অনুবাদ করিতেছি।—মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—সৎকার্য্য কঠিন, সৎকর্ম্মকর্ত্তা কঠিন কার্য্য সম্পাদন করেন। আমার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। যদি আমার পুত্র ও পৌত্রগণ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমার উত্তরাধিকারিগণ আমার অবলম্বিত পথে গমন করে, তবে তাহারা সৎকর্ম্ম করিবে। যে কেহ এই অনুশাসন অবহেলা করিবে, সে অপকার্য্য করিবে; কারণ পাপকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ অতীতকাল অবধি ধর্ম্মমহামাত্রা নামে ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হন নাই। আমার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে ধর্ম্মমহামাত্রা নামক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন এবং অনুরক্ত প্রজাদের সুখ ও মঙ্গলবিধানকল্পে তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা আমার সীমান্তবাসী যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পেতেনিক প্রভৃতি জাতির সুখ ও মঙ্গল বিধানার্থ অভিনিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা সৈন্যের, ব্রাহ্মণের, ধনী ও দরিদ্রের এবং বৃদ্ধের সুখ ও মঙ্গল বিধান জন্য এবং বিশ্বস্ত প্রজাবর্গের পথ হইতে বিঘ্নবাধার দূরীকরণ জন্য এবং প্রজাবর্গকে অন্যায় অনধিকার হইতে মুক্ত রাখার জন্য নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা অন্যায় অবরোধ অথবা শাস্তি নিবারণ জন্য এবং অন্যায় অনধিকার দূরীকরণ ও মুক্তিদান জন্য নিযুক্ত আছেন। এই সকল কার্য্য করিবার সময় কোন ব্যক্তি বৃহৎ পরিবারের পালনকর্ত্তা কিনা; কোন ব্যক্তি বিপদকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল কিনা, অথবা কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে কিনা, তাহা বিবেচিত হইয়া থাকে। পাটলিপুত্রে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক নগরে তাঁহারা আমার ভ্রাতাভগিনীদের এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের পরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ধর্ম্মমহামাত্রগণ ধর্ম্মার্থী অথবা দানশীল অনুরক্ত প্রজাদের পরিদর্শন করেন। এই ধর্ম্মলিপি প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং প্রজাবর্গ এতদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। *

মহারাজ অশোক মুখ্যতঃ ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা, গৌণভাবে প্রজার অভাবমোচনকল্পে দাতব্যবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমহামাত্রা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট রাজপুরুষ রাজদান বিতরণ করিতেন। মহিষীদের প্রদত্ত দান বিতরণের ভারও এই সকল কর্ম্মচারীর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রাজধানীর এবং প্রাদেশিক রাজপরিবারের পক্ষে দানের নানা সুযোগ এই সকল কর্ম্মচারীই প্রদর্শন করিতেন। অশোকের দ্বিবিধ রাণীর গর্ভজাত কুমারদের দান বিতরণ জন্য এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৎকর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই তাদৃশ দান-ক্রিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ অশোক বিশ্বাস করিতেন যে, পরদুঃখকাতরতা, উদারতা, সত্যবাদিতা এবং পবিত্রতার বিকাশ সাধিত হইলেই মানুষ ধর্ম্মপালনে এবং সৎকর্ম্মে উৎসাহী হয়।

---

* ধর্ম্মমহামাত্রার নিয়োগের সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভিনসেণ্ট এ স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন।—

'In practice their system must have led to much espionage and tyranny.'

মহারাজ অশোক প্রকৃতিপুঞ্জকে পরদুঃখকাতর, উদার, সত্যবাদী এবং পবিত্র করিবার জন্য নানাবিধ বৌদ্ধধর্ম্মসম্মত বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আমরা এখানে একটি বিধানের উল্লেখ করিতেছি।—মহারাজ অশোক রাজকীয় মৃগয়ার প্রথা রহিত করেন, এতৎসম্বন্ধে অষ্টম গিরিলিপিতে যে তথ্য উৎকীর্ণ আছে, আমরা তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।—পুরাকালে রাজন্যগণ আমোদার্থ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তৎকালে মৃগয়া প্রভৃতি আমোদের অনুষ্ঠান হইত। অশোক তাদৃশ ভ্রমণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশ ও প্রজামণ্ডলীর পরিদর্শন, সাধুপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ধর্ম্মের আলোচনা এবং প্রচার জন্য পর্য্যটন করিতেন। অশোক স্বীয় রাজত্বের একবিংশবর্ষে একবার এইরূপ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মহাস্থবির উপগুপ্ত তাঁহার সহচর ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি এই সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থসকল—কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর এবং শ্রাবস্তী দর্শন করেন। উক্ত অনুশাসনলিপিতে অশোকের যে পশু প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ক্রমশঃ এতদুর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার জন্য পশুহত্যা সম্বন্ধীয় বিধির প্রচার করেন। অনেক পশুর হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মাংসাহার নিষিদ্ধ না হইলেও যে সকল পশুপক্ষীর মাংস মনুষ্যের ভক্ষ্য, তাহার হত্যা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বাধা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৎসরের মধ্যে ৫৬ দিন সর্ব্বপ্রকার পশুর হত্যা একেবারে নিষিদ্ধ হয়। যতদিন অশোক জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজপুরুষবর্গ প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক এই সকল বিধানের প্রতিপালন জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

প্রজামণ্ডলীকে ধর্ম্মশীল করিবার জন্য মহারাজ অশোক এইরূপ নানা বিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবিধান অপেক্ষা অন্তরনিহিত সৎপ্রবৃত্তির বিকাশসাধনই তাহাদিগকে ধর্ম্মশীল করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্য তিনি ধর্ম্মোপদেশ দান দ্বারা তাহাদিগকে আত্মচিন্তাশীল করিতে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন।

মহারাজ অশোক প্রজামণ্ডলীর অন্তরনিহিত সৎ-প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন জন্য আর একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইহা তাহাদের সম্মুখে স্বীয় মহজ্জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। অশোকের মহজ্জীবনের আলোচনা আমাদের পরম মঙ্গলজনক। কলিঙ্গ সমরোপলক্ষে অসংখ্য নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তপাত ও অন্যবিধ দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হয়। এই অনুতাপ তিনি যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তদীয় হৃদয়ের গভীরতা এবং সরলতার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তদবধি তিনি দেশজয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং পরদুঃখকাতরতা, উদারতা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা এবং সাধুতাবলে মানবজাতির হৃদয় জয় করিতে ব্রতী হন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের সমস্ত বাহ্যক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত প্রক্রিয়ায় আমরণ একাগ্র চিত্তে নিরত ছিলেন, যাহাতে গুরুজনে ভক্তি, দাস-দাসীর প্রতি প্রীতি, জীবে দয়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসী-কুলে শ্রদ্ধা এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমদর্শিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অশোক দানশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে ধর্ম্মদানই সর্ব্বোত্তম ছিল, এবং এই ধর্ম্মদান তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। অশোকের লিপিসকল তাঁহাকে একাধারে সংসারানাসক্ত সাধু-পুরুষ এবং ন্যায়দর্শী সম্রাটরূপে চিত্রিত করিয়াছে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার কিরূপ প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, ঐ সকল লিপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অশোকের এই প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠায় যে ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার নিজের ভাষায় প্রদর্শন করিতেছি।—

দেবগণের প্রিয় (রাজা) আগ্রহসহকারে সর্ব্বজীবের মঙ্গল, জীবন রক্ষার জন্য যত্ন, শান্তি এবং দয়ার প্রার্থনা করিতেছেন। দেবগণের প্রিয়পাত্র এই সমস্তকেই ধর্ম্মের বিজয় (নিশান) রূপে গণ্য করিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং সাম্রাজ্যের অপরান্তে বহুশত যোজন ব্যাপিয়া ধর্ম্মের এই বিজয়—নিশান বিস্তীর্ণ

করিয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার (প্রতিবেশী রাজন্যকুল) মধ্যে যবনরাজ এণ্টিওকাস এবং তাহার পর অপর চারিজন রাজা টলেমী, এণ্টিগোণাস, মাগ এবং আলেকজাণ্ডারের রাজ্যে, দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য এবং গ্রীক, কম্বোজ, লঙ্কা, ভোজ, পেতেনিক অন্ধ্র, পুলিন্দ, নাব, পণ্ডা, সকল স্থানেই তাঁহারা দেবগণের প্রিয়পাত্রের উপদেশ মান্য করিতেছেন। যেখানেই দেবগণের প্রিয়পাত্রের দূত প্রেরিত হইয়াছে, সে স্থানের লোকেরাই দেবগণের প্রিয়পাত্রের অনুজ্ঞায় প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছে, তারপর সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উপদেশ পালন করিতেছে এবং করিবে। চারিদিকেই এই বিজয়-নিশান প্রোথিত হইয়াছে।

মহারাজ অশোকের প্রবল ধর্ম্মোৎসাহে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর একটি ফল লাভ হইয়াছিল, তাহা স্থাপত্যের উন্নতি। এরূপ কথিত হইয়াছে যে, অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ দানবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিবরণ অতি রঞ্জিত এবং কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিবরণ পাঠে আমরা অশোকের স্থাপত্যের ব্যাপকতা এবং তাঁহার রাজপুরীর বিশালতা অনুভব করিতে পারি। তাঁহার শোভা ও সম্পদের আধার সুবিশাল রাজপুরী কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাঁহার স্তূপসকলও কালের প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াও দর্শকমাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ অশোকের আদেশে বৌদ্ধ তীর্থ সমূহের শোভাবর্দ্ধন জন্য অসংখ্য সৌষ্ঠবশালী স্তূপ, মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম এবং প্রশস্তি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্গত জাতক কথায় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল জাতক কথার প্রমাণে আমরা জানিতে পারি যে, অশোক যুগের পূর্ব্বে গৃহাদি নির্ম্মাণকালে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহাদি নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত ছিল। অশোক যুগে স্থাপত্যের উপাদান জন্য কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্রস্তর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌থসঙ্গ লিখিয়াছেন যে, অশোক রাজা পাটলিপুত্রের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তর দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে গৃহাদির কারুকার্য্য অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। বারহুতের ইষ্টক নির্ম্মিত স্তূপ, বুদ্ধগয়া এবং বেশনগরের রেলিং ও প্রশস্তি-স্তম্ভ সকল অশোক যুগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের চিহ্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ অশোকের স্থাপত্য-কীর্ত্তি,—মন্দির, স্তূপ, স্তম্ভ, ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে, যাহা কিছু অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে, তাহাও কালপ্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাঁহার নাম তাঁহার ধর্ম্মকীর্ত্তি অবিনশ্বর, কাল বিজয়ী। অশোক সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর কোটি কোটি সংসারক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই কীর্ত্তিকথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমরা পুলকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করি।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

উদ্বোধন।

(বসুমা "সাহিত্য-সমাজের" প্রথম অধিবেশনে পঠিত।)

স্বস্তি স্বাগত মনীষী সঙ্ঘ!
স্বাগত স্বস্তি সভাধিপতি!
স্বাগত সাধক ভকত বৃন্দ!
তোমাদেরে মোরা জানাই নতি।
কাব্য কোবিদ সুধার চকোর
ভাবুক রসিক ভকতবর্গ,
ভক্তি-সাগরে পুষ্প ডুবায়ে
রচিল যাঁহারা পূজার অর্ঘ্য—
বঙ্গবাণীর কণ্ঠ উজলি
শোভিছে যাঁদের পুষ্প-হার,
আজি এ শান্ত পুণ্য প্রভাতে
তাঁদের চরণে নমস্কার।

শঙ্কিত চিত্তে মন্দিরে আজি
এসেছি নবীন পূজারিবর্গ,
বন্দন তরে মন্থন করি
এনেছি ভক্তি-পুষ্প-অর্ঘ্য।
নিঃস্ব যদিও বিশ্বে আমরা,
তুচ্ছ যদিও এ দীনদান;
তুচ্ছ নহেত প্রাণের ভক্তি,
তুচ্ছ নহেত প্রাণের টান।
হৃদয়ের যত পঙ্ক কালিমা
অতল সাগরে হউক লয়,
শুদ্ধচিত্তে এ শুভ প্রভাতে
মহাভারতীর গাহরে জয়।

কণ্ঠে মোদের ধ্বনিয়া উঠুক
পুণ্যপূক্ত বেদের তান,
বীণায় মোদের উঠুক বাজিয়া
অতীত গৌরব-গরিমা গান।

আমরা তরুণ ভাবে সুতরুণ
কল্পজ্যোতিতে বক্ষ ভরি,
বঙ্গবাণীর পূজা মন্দিরে
চলেছি আশার পন্থা ধরি।
পুণ্য আলোকে চিত্ত জাগুক,
বিষাদ বেদনা হউক ম্লান;
সাধনা মোদের সার্থক হউক,
সার্থক হউক মোদের ধ্যান।

এসহে ভাবুক! এসহে প্রবীণ!
এস ওগো এস সগৌরবে!
এসহে সাধক বাণী উপাসক!
প্রীতি-রাখীডোর পরগো সবে।
চন্দ্র সবিতা গ্রহতারা মাঝে
আলোক যাঁহার নিত্য ভায়,
জ্যোছনার ধারা উছলি পড়িছে
যাঁহার চরণ-কমল ছায়।
বন্দনা যাঁর ঝঙ্কারি উঠে
কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জনে,
সার্থক হউক এ মধু মিলন
তাঁহারি করুণা সিঞ্চনে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

গীতার সহজ তপস্যা বা আত্মোৎকর্ষের সহজ সাধন প্রণালী।

তপস্যার কথা শুনিলেই হিন্দুর কঠোর ও জটিল সাধন প্রণালীর কথা আমাদিগের মনে আসে। কিন্তু এস্থলে আমরা সেই প্রণালীর কথা বলিব না, মহর্ষি ব্যাসদেব গীতাতে আত্মোৎকর্ষের যে স্বাভাবিক সরল প্রণালী আমাদের সাধারণ জীবনের জন্য বিবৃত করিয়াছেন তাহার কথাই এখানে আমরা বলিব।

আমাদের জীবন ব্যাপারে আমরা মনঃবাক্য ও কর্ম্মেরই বিশেষ সমবায় দেখিতে পাই। মনের দ্বারা আমরা যাহা চিন্তা করি, তাহাই বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করি এবং কর্ম্মের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করি বা নিষ্পাদিত করি। সাধারণ ভাবে ইহাই আমাদের জীবন প্রণালী। আমাদের জীবনের এই ত্রিধাত্মকতা বেদেই বিশ্লেষিত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

"যন্মনসাধ্যায়তি, তদ্‌বাদাবদতি, তৎকর্ম্মণা করোতি॥"

"যাহা মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়, তাহাই বাক্যের দ্বারা বলা হয় এবং কর্ম্মের দ্বারা করা হয়।"

এই প্রকারে জীবনের যে অঙ্গত্রয় আমরা প্রাপ্ত হইতেছি ইহাদের সম্যক্ পরিণতিতেই যে আমাদের জীবনের সম্যক্ উৎকর্ষ সংসাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি?

পূর্ব্বোক্ত অঙ্গত্রিতয়ের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে হইতে ইহাদের সম্যক্ পরিণতির জন্য তিনটির অনুশীলন একসঙ্গে হওয়াই একান্ত আবশ্যক। এই অনুশীলনের ফলে যখন একটী অন্যটীর বিরোধি না হইয়া তিনটিই পরস্পরের সহিত মিলযুক্ত হইবে তখনই প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে।

আমাদের আত্মোৎকর্ষের জন্য এই তিনটীর সম্যক্ অনুশীলনের গুরুত্ব মহর্ষি ব্যাস এরূপই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তিনি এই অনুশীলনকে গীতায়তপঃ নামে অভিহিত করিতে নিজেকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই। আমরা গীতার সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তপঃ সাধনের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং উপ উচ্যতে॥ ৪॥
অনুদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চযৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ৫॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতৎতপোমানস মুচ্যতে॥ ৬॥"

"দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয়।"

"অনুদ্বেগ-জনক সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ।"

"চিত্তশুদ্ধি, শান্তভাব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ।"

কর্ম্ম শরীরের দ্বারাই সম্পাদিত হয় তাহাতেই বেদের কর্ম্মের স্থলে গীতায় আমরা "শরীরের" উল্লেখ প্রাপ্ত হই।

আমাদিগের শরীর, মন, বাক্যের দ্বারা জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় বলিয়াই কোন কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হওয়ার কথা বলিতে হইলে "কায়মনোবাক্যে" কার্য্যটী কৃত হইয়াছে এরূপ বলা হইয়া থাকে। শরীর, বাক্য ও মনের এই যথোচিতরূপ যোগ কার্য্যে থাকিলেই তবে ইহাকে "কায়মনোবাক্যে" কৃত বলা যাইতে পারে। শরীর, মন ও বাক্যের এই যথোচিতরূপ যোগের জন্য আবার ইহাদের যথোচিতরূপ পরিণতিরও আবশ্যক। ইহাদের যথোচিত পরিণতি যে অনুশীলনের দ্বারা হয় তাহাই গীতায় "তপ" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এই তপঃ-সাধনে তপস্যার কঠোর নিষ্ঠা ও প্রণালীর আবশ্যক হয় না; জীবনের স্বাভাবিক অভ্যাসের দ্বারাই ইহার সাধনা হয়। এই অভ্যাসের মূলে এইটীই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হয় যে শরীর, বাক্য ও মনের মধ্যে যেন এক মিল থাকে কোনটীতে যেন কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত না হয়।

সুতরাং শরীর, বাক্য ও মনের মধ্যে সমন্বয়েই যে সাধনের প্রকৃত রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই সমন্বয় ভাবটীই আমাদের জীবনের সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়স্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের সাধন সম্বন্ধে তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—

"কর্ম্মনামনসাবাচা যত্নাদ্ধর্ম্মান্‌সমাচরেৎ।" বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২২শ অধ্যায়।

"মানবগণ যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণ করিবে।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

নীতিশাস্ত্রেও মন, বাক্য ও কর্ম্মের সম্পূর্ণ ঐক্যই নৈতিক উন্নতির প্রকৃষ্ট মানদণ্ড বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথাঃ—

"মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কার্য্যমন্যৎ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কার্য্যমেকং মহাত্মনাম॥"

"দুরাত্মাদিগের মনে একরূপ বাক্যে অন্যরূপ এবং কার্য্যে অন্যরূপ। মহাত্মাদিগের মনে, বাক্যে ও কার্য্যে সমস্তেই একরূপ অর্থাৎ মনে যেরূপ বাক্যেও সেইরূপ কার্য্যেও তদ্রূপ।"

এস্থলে দুরাত্মাদিগের মন, বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে অনৈক্য এবং মহাত্মাদিগের মন, বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ঐক্যের কথা হইতে মন, বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ঐক্য দ্বারাই যে আত্মার পরমোৎকর্ষ সাধিত হয় পক্ষান্তরে ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য দ্বারাই যে আত্মার অপকর্ষ সাধিত হয় তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

সন্ন্যাসীর এক নাম "ত্রিদণ্ডী" পাওয়া যায়। এই ত্রিদণ্ডী নামের ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে এইরূপে করা হইয়াছেঃ—

"বাগ্‌দণ্ড কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তাদণ্ডাঃ সত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ॥"

বায়ু পুরাণ ১৭শ অধ্যায়।

"বাগ্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড, এই ত্রিবিধদণ্ড যাঁহার দ্বারা নিয়মিত হয় তিনিই ত্রিদণ্ডী।" ইহার তাৎপর্য্য আমরা এই বুঝিতে পারি যে যিনি বাক্য, কর্ম্ম ও মন এই তিনের উপর দণ্ড প্রয়োগদ্বারা শাসন পরিচালন করিতে পারেন তিনিই "ত্রিদণ্ডী।" ত্রিদণ্ডীর অন্য এক অর্থ "যজ্ঞোপবীত"ও আছে। "যজ্ঞোপবীতের" তিনটী সূত্র, একত্র সংগ্রথিত হওয়াতেই 'ত্রিদণ্ডী' নাম হইয়াছে ইহাই ইহার সাধারণ ব্যুৎপত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের নিকট বাক্য, মন ও শরীর এই তিনের উপর দণ্ড পরিচালনের রূপকরূপে, ত্রিসূত্রের গ্রন্থি হইতে "ত্রিদণ্ডী" নাম হইয়াছে ইহাই যথার্থ ব্যুৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। ত্রিদণ্ডী রূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ দ্বারা মন বাক্য ও শরীরের উপর সম্পূর্ণ শাসন রূপ ব্রত দ্বিজগণ গ্রহণ করিতেন ইহাই ত্রিদণ্ডী ধারণের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ত্রিদণ্ডী ধারণেই যে আমরা আত্মোৎকর্ষের প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত হইতাম তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

সীতা চরিত্রের আলোচনা করিলে ত্রিদণ্ডের শিক্ষাকেই ইহার প্রকৃত মেরুদণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাহাতেই সীতা এই ত্রিদণ্ডের শিক্ষাদ্বারাই নিজ চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রখ্যাপিত করিতেছেন আমরা রামায়ণে দেখিতে পাইঃ—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মনা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"

উত্তরাকাণ্ড।

"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনেও স্থান দেই নাই। এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি; সেই সত্য বলেই ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন।"

স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকি ও সীতার চরিত্র-শুদ্ধি সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতে যাইয়া আপনার ত্রিদণ্ড শিক্ষার উপরই নির্ভর করিয়াছেন যথাঃ—

"মনসাকর্ম্মণাবাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥"

উত্তরাকাণ্ড।

"জানকী যদি নিষ্পাপা হন; তাহা হইলে আমি কায়মনোবাক্যে যে পাপকর্ম্ম করি নাই তাহার ফল পাইব।"

সীতা ও বাল্মীকি চরিত্রের উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে আমরা এই সত্যটীও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই যে কর্ম্মের দ্বারা না করিলেও মনও বাক্যদ্বারাও আমরা কোন বিষয়ে পাপ করিতে পারি। সুতরাং কোন বিষয়ে চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা কোন দোষ স্পর্শ না করিলে তবেই তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে কৃত বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। এই প্রকারেই মন, বাক্য ও

কর্ম্মের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হয়। এই সম্পূর্ণ ঐক্য দ্বারাই চরিত্রের পূর্ণোৎকর্ষ সংসাধিত হয়। কারণ মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা আচরণই 'চরিত্র' যেহেতু চরিত্র আচরণের অর্থই প্রকাশ করে। এই চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন যে 'তপস্যা' বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই তপস্যার সফলতা ও বিফলতার উপরই আমাদের জীবনের শুভাশুভ গতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহাতেই সাধারণ কথায়ও বলা হইয়া থাকে "লোকের পূর্ব্বজন্মের যেরূপ তপস্যা এই জন্মেও সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকে।" সুতরাং শরীর, বাক্য ও মনের সম্যক্ সাধনেই যে আমাদের প্রথম তপস্যা এবং ইহাদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনেই যে আমাদের পূর্ণ আত্মোৎকর্ষ রূপ সিদ্ধি তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাক্ষস।

(মুদ্রারাক্ষসের)।

রাক্ষস, রাক্ষস তুমি তাই বলি নহ বিভীষণ
ব্যবহারে বিপরীত তেজে দর্পে বীরেন্দ্র রাবণ
বিভীষণে কর ঘৃণা ভীষ্ম দ্রোণ আদর্শ তোমার
প্রভুভক্ত মন্ত্রিরাজ পূর্ণ রজোগুণের আধার।
তব বক্ষ ছায়াতলে বক্ষরক্তে প্রাণপুষ্টি দিয়া,
নন্দ রাজগণে তুমি পুত্র স্নেহে রাখিলে পালিয়া,
একে একে সবি গেল রাজপুরী হলো অন্ধকার
মূষিক পেচকগণে পূর্ণ হলো রাজ কোষাগার,
মেলিল অশ্বত্থবটে ডালপালা নন্দ হর্ম্ম্যপরে।
রাজলক্ষ্মী কেঁদে গেল গৃহ হতে উলূকের স্বরে,
তবু দেব, সেই গৃহে বক্ষে ধরি প্রভুদত্ত অসি,
নন্দরাজ চিতাভস্মে আগুলিয়া ছিলে তুমি বসি,
তখনো ভরসা তব চিতাভস্মে জাগিবে জীবন
ঢালিতে লাগিলে তাই তব অশ্রু জাহ্নবী পাবন।
প্রভুর মুদ্রাঙ্ক তুমি রক্ষা করি কৃপণের মত
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহীন দিবানিশা ছিলে অবিরত।
প্রাণত্যাগে রাজী তুমি মানত্যাগে বড়ই কাতর,
শত প্রলোভনে স্থির অচঞ্চল তোমার অন্তর।
লভিয়াছ পরাজয় তবু তুমি জয়োন্নত শির,
হেরেও জিতেছ তুমি দিগ্বিজয়ী সর্ব্বজয়ী বীর।
জয়ী সে যে ম্লান হয়ে তোমা পানে চাহে কৃতাঞ্জলি,
নিরস্ত্র দাড়ালে তুমি অগ্নি সম ভারত উজলি
চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্রোণ সম রাজনীতি রণে
মহানীতি শাস্ত্র তুমি জাগায়েছ কৌটিল্যের মনে
চাণক্যেরো গুরু তুমি, হে তপস্বী শুক্রাচার্য্য সম
হে প্রভু বৎসল মন্ত্রী ও চরণে নমো নমো নমঃ।

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ।

আবার ভাষার কথা।

গত ভাদ্র আশ্বিনের "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, ডি, এল্ মহাশয়ের "ভাষার আকার ও বিকার" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। নরেশ বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা যখন "সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষা" আলোচনায় যোগদান করিতেছেন, তখন আমরা আশা করি এই আন্দোলনের শীঘ্র একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে অন্য কোন কোন লেখক যে সকল অবান্তর কথা তুলিয়াছিলেন নরেশ বাবু তাহার অনেকগুলি ছাটিয়া ফেলিয়া মূল বিচার্য্য বিষয়টী অনেকটা পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তিনি যেভাবে বিষয়টীকে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, তাহাতে বিরোধের কথা অতি কমই আছে। আষাঢ়ের "ভারতী"র লেখক বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সাহিত্য-রথী যেদিকে রথ চালাইবেন, বাঙ্গালার ছোট বড় সকল সাহিত্যিককেই সেই

পথে চলিতে হইবে। এই কথাটা এতদূর স্পর্দ্ধামূলক ও যুক্তিহীন যে ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্ম আমি "ঢাকার রথযাত্রা" প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আমি সেই প্রবন্ধ লিখিয়া ভাল করিয়াছিলাম, তাহা না লিখিলে এই প্রসঙ্গে নরেশ বাবুর এই লেখা আমরা পাইতাম না। নরেশ বাবু স্পষ্টই বলিতেছেন,

"কিন্তু কলিকাতার চলিত কথায় আমাদের লিখিতেই হইবে এমন কথা কে কবে বলিয়াছে—যদি কেহ বলিয়া থাকে—এ বিবাদে সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক কি কথা যে না বলা হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—যদি কেহ বলিয়া থাকে সেও সমান ভুল করিয়াছে। যে কেহ ভাষার একটা বাঁধা নমুনা ধরিয়া বলিতে যায় যে এমনটি না হইলে তোমার ভাষায় স্থান নাই সেই ভ্রান্ত। আমরা লিখিব বাঙ্গলা ভাষা, তা' এক একজনের লিখনভঙ্গী এক এক রকম হইবে বই কি?"

ঠিক কথা। এ কথায় কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। যে লেখকের নিজের কোন একটা লিখনভঙ্গী (style) নাই, যিনি পরের লিখনভঙ্গী অনুকরণ করিয়া লেখেন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যাইতে পারে না। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের প্রত্যেকেরই এক একটা লিখনভঙ্গী আছে—বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন হরপ্রসাদ ইঁহারা সকলেই বঙ্কিমের যুগের লেখক হইলেও ইঁহাদের প্রত্যেকের এক একটা পৃথক্ লিখনভঙ্গী আছে। পদ্য লেখকদিগের মধ্যেও সেইরূপ। সুতরাং যিনি বর্ত্তমান সাহিত্যরথীর রচনারীতির অনুকরণ করিয়া ছোট বড় আর সকল লেখককে লিখিতে বলেন তাঁহার মত কিছুতেই বিচারসহ নহে।

তবে এস্থলে আমরা লিখনভঙ্গীর (style) সহিত লিখিত ভাষার যেন গোল না করি। উল্লিখিত দেশবিশ্রুত সাহিত্যিকগণের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লিখনভঙ্গী থাকিলেও তাঁহারা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা প্রাদেশিক শব্দ বহুল কথিত ভাষা নহে, তাহা সাধুভাষা। তবে কাহারও সেই সাধুভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশী, কথোপকথনে প্রচলিত শব্দ কম; আবার কাহারও লেখায় সংস্কৃত শব্দ কম, কথোপকথনে প্রচলিত শব্দ বেশী। নরেশ বাবুও লিখিয়াছেন—

"একই সময় সেকস্পীয়ার ও Ben Jonson কবিতা লিখিয়াছেন, Bacon দর্শন ও ব্যবহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ভাষা কি এক? এক সেকস্পীয়ারের ভিতরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাষার ভঙ্গী ভিন্ন। Burkeএর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ খুব ওজস্বী, Bright এর বক্তৃতার জোরও কম নহে; কিন্তু Burkeকে যদি Brightএর ভঙ্গীতে লিখিতে বাধ্য করা হইত কিম্বা Brightকে Burkeএর ভাষায় কথা কহিতে হইত তবে কি বিসদৃশ ব্যাপার দাঁড়াইত? এ প্রভেদ যে কেবল ভাষার একটা ভঙ্গীতে তাহা নয়। প্রায়ই শব্দ চয়নের প্রভেদ হইতে এই প্রভেদ জন্মায়।

... ... Dickens চলতিভাষা বা Slangএর ব্যবহার করিয়া কথায় যে রকম জোর দিয়াছেন তাঁহাদের যদি কেবল পুঁথির ভাষা ব্যবহার করিতে হইত তাহা হইলে সে জোর সে ভাষায় থাকিতে পারিত না। Samuel Wellerকে যদি Dickens কেতাবী ভাষায় কথা বলাইতেন তবে Pickwick Papersএর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য মাটি হইত।

এস্থলে একটা কথা ভাল বুঝিলাম না। Burke, Bright, Dickensএর style (লিখন ভঙ্গী) ভিন্ন হইলেও মোটের উপর তাঁহাদের ভাষা কি ইংরেজী সাধুভাষা (King's English) নহে? Dickens তাঁহার পাত্র বিশেষের মুখ দিয়া প্রাদেশিক Slang বাহির করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু Dickensএর ভাষা আর Sam Wellerএর ভাষা এক নহে। আমাদের কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্রের ভাষার মধ্যে পরস্পর যতটা পার্থক্য, Burke, Bright, Dickensএর ভাষার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য তাহার অধিক নহে। Dickensএর ন্যায় আমাদের দীনবন্ধুও তাঁহার নাটকের পাত্র পাত্রীগণের মুখ দিয়া প্রাদেশিক Slang বাহির করিয়াছেন; কিন্তু তাহা দীনবন্ধুর নিজের ভাষা নহে। দীনবন্ধুর নিজের ভাষা তাঁহার সমসাময়িক

খ্যাতনামা লেখকদিগের ভাষার ন্যায় সাধুভাষা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে এখন কথা হইতেছে যদি কোন প্রতিভাশালী লেখক কোন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যদিয়া তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাতে দোষ কি? কোনই দোষ নাই। আমিও নরেশ বাবুর কথায় সায় দিয়া বলি—

"এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাবান্ লেখক পরের বাঁধা ভাষারভঙ্গী গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না; সুতরাং আমরা মজলিস করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া যদি বা একটা ভাষারস্বরূপ বাঁধিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি, তার গণ্ডীর ভিতর আমরা প্রতিভাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিব এরূপ আশা করা স্পর্দ্ধার কথা।" আমিও বলি প্রতিভাকে ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখাও যাহা বেগবতী পদ্মা নদীকেও বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখা তাহা। তবে খরস্রোতা পদ্মাকেও যেমন কখনং সাড়াসেতুর ন্যায় জাঙ্গালের তলে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সেই জন্য প্রতিভার অবতার সাহিত্যরথীকে কতকটা প্রচলিত ভাষার বন্ধন মানিয়া চলিতে হয়। নচেৎ তাঁহার লেখা দুই চারিজন সমজদারের গণ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট আদরণীয় হইবে না।

নরেশ বাবু "মজলিস করিয়া বাগবিতণ্ডা করিয়া" ভাষার গণ্ডী বাঁধিয়া দিয়া তাহার মধ্যে প্রতিভাকে আটক রাখার কথা বলিয়াছেন, আমরা কিন্তু দেখিতেছি তাহার ঠিক উল্‌টা। প্রতিভাকে গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখে কাহার সাধ্য? প্রতিভাই বরং ভাষার একটা গণ্ডী বাঁধিয়া দিয়া বলিতেছেন "আমি মহাজন যে পথে যাইব তোমাদের সেই একমাত্র পথ।" তাহা না হইলে মিঃ প্রমথ চৌধুরী কলিকাতার চল্‌তি ভাষা বঙ্গের সর্ব্বত্র চালাইবার জন্য এরূপ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন কেন? তিনি কিম্বা তাঁহার কথানুযায়ী দুই একজন সেই পথে চলিতেছেন, চলুন। তাঁহাদের প্রতিভা সেই ভাবেই বিকাশ প্রাপ্ত হউক। সাধারণ লেখক সেই গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিবে কেন?

"এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাবান্ লেখক পরের বাঁধা ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না"—আমার মনে হয় নরেশ বাবু এখানে "ভাষার ভঙ্গী"র সহিত "লিখনভঙ্গী"র (style) গোল করিয়াছেন। এখানে তিনি style of writing মনে করিয়া ভাষার ভঙ্গী লিখিয়াছেন। নচেৎ প্রত্যেক প্রতিভাবান্ লেখকই তাঁহার লেখার জন্য একটা নূতন ভাষার আবিষ্কার করিয়াছেন, অথবা দেশজ, প্রাকৃত বা গ্রীক-লাটিন বা সংস্কৃত বহুল এক একটা নূতন ধরণের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এরূপ দেখা যায় না। style of writing বা বা লিখনভঙ্গী বাদ দিলে Burke, Bright, Gladstone Byron, Shelley, Wordsworth—Carlyle, Emerson, Macaulay—ইঁহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক প্রকার। অর্থাৎ ইঁহারা প্রত্যেকেই ইংরেজী সাধুভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। কবিবর Burns অবশ্য তাঁহার প্রাদেশিক ভাষায়ই কাব্য লিখিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাষায় এ পর্য্যন্ত আর কেহ কাব্য লেখেন নাই। মহাকবি Tennysonএর ভাষা প্রাদেশিক শব্দ বহুল হইলেও তাহা সাধুভাষার ধারা অতিক্রম করে নাই। সুতরাং প্রতিভাবান্ লেখকমাত্রেই এক একটা নূতন ভাষার যে আবিষ্কার করিবেন এরূপ কোন কথা নাই।

নরেশ বাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন "রবীন্দ্র বাবুও তাঁহার বর্ত্তমান পন্থা যাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা ভাষার এই স্থায়ী উপকার করিতেছেন যে তাঁহারা কথিত ভাষার সম্পদ ও শক্তিতে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ওজস্বী করিয়া তুলিতেছেন"... ... ... "রবীন্দ্রনাথ ইহাই দেখাইয়াছেন যে কথিত ভাষারদ্বারা আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে এবং আমাদের ইহাকে সেই সম্পদ দিতে হইবে। তিনি এ কথা কোনওদিন বলেন নাই যে, সে সম্পদ কেবল কলিকাতার কথায়ই আছে, আমরা পারি না পারি কলিকাতার কথা আমাদের লিখিতেই হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন কথা কোনদিন বলেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যগণ এই ভাবেই

ত "সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষার" আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখা যে নিতান্ত অসঙ্গত আশা করি তাহা নরেশ বাবুর কথায়ই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। নানা প্রকারে বঙ্গভাষাও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্ম রবীন্দ্রনাথের নিকট বাঙ্গালীমাত্রেই ঋণী, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু "গেলাম" স্থলে "গেলুম" এবং "করলাম" বা "করিলাম" স্থলে "করলুম" লিখিলে যে ভাষার সম্পদ বেশী বাড়ে এরূপ আমাদের মনে হয় না। বরং ইহা দ্বারা নরেশ বাবু কথিত ভাষার যে একটা standardএর কথা বলিয়াছেন তাহার অতিক্রম করা হয়। বলা বাহুল্য এই standardই কালক্রমে সাধুভাষা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নরেশ বাবু "ফিরছিনে" কথার সৌন্দর্য্য দেখিয়া খুব মুগ্ধ। তিনি বলেন—

"এখানে "ফিরছিনে" কথাটার ভিতর এমন একটা ঝোঁক আসিয়া পড়ে যার সম্পূর্ণ অর্থ "ফিরিতেছি না", "ফিরিব না" "কদাপি ফিরিব না", "কিছুতেই ফিরিব না" প্রভৃতি কোন কথায় প্রকাশ করা হয় না।" একথা সত্য। কিন্তু যাহারা কলিকাতাবাসী, কলিকাতার toneএ কথা কয়, তাদের মুখে ইহা যেরূপ সুন্দরভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাদের লেখারও ইহা সেইরূপ সুশোভন হয়। যাহারা মুখে "ফিরমু না বলে, তাহারা "ফিরছিনে" লিখিতে বসিলে তাহা তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত হইবে না, অধিকন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে আর পাঁচটা idiomএর ভুল করিবে সন্দেহ নাই। সেইরূপ "আমি না করছি" ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত এই নিষেধ বাচক কথাটী বেশ জোরের কথা, অল্প কথায় ভাবটী খুব জোরের সহিত প্রকাশ করে। "আমি মানা করিয়াছি", "আমি নিষেধ করিয়াছি" ইত্যাকার কথাতে তেমন জোর নাই। কিন্তু একজন কলিকাতাবাসী লেখক "আমি না করছি"—মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, কারণ তিনি "করছি" শব্দ কখনও ব্যবহার করেন না, তাহার পরিবর্ত্তে "করিয়াছি" বা "করেছি ব্যবহার করেন। আবার "না" শব্দের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিবেন না। "আমি না করছি" বাক্যটী খুব সুন্দর হইলেও তাঁহার পক্ষে ইহা কথায় কিম্বা লেখায় ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রাদেশিক শব্দ সুন্দর হইলেও তাহার লিখিত ভাষায় বানান সর্ব্বত্র সুবিধাজনক নহে। প্রতিভাশালী লেখকগণ তাহা চালাইলেও কালক্রমে অব্যবহারে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। রামপ্রসাদের গানে, কিম্বা দীনবন্ধুর নাটকে যে সকল প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত, তাহা কখনও সমগ্র বঙ্গদেশে চলে নাই। তাহা তাঁহাদের গান বা নাটকের মধ্যেই আটক রহিয়াছে। "কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভিতর টানিয়া আনিয়া ভাষার শক্তি ও সৌষ্ঠব বাড়ান যায় কি না"—তাহা রবীন্দ্রনাথের রচনায় experiment করা হইতেছে হউক। সেই experiment সফল হইবে কি না তাহা ভবিষ্যতের কথা। নরেশ বাবু লিখিয়াছেন—"এমন একটা কথা উঠিয়াছে যে রবীন্দ্র বাবু যদি কলিকাতার ভাষা চালাইতে যান, তবে আমরা কেন না ঢাকার ভাষা চালাইব? রাজসাহীর লোক কেন না রাজসাহীর ভাষা চালাইবেন? যদি বলি কোনও বাধা নাই, যদি আমাদের সে শক্তি থাকে, যাহাতে ঢাকার ভাষাকে ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারি। রবি বাবু ইহা করিয়াছেন, তাঁহার দেশের ভাষা লইয়া আমরা পারিব কি?"

আমরাও সেই কথাবলি। "প্রতিভাবান লেখক রবিবাবু কলিকাতার slang ভাষা চালাইতে চান বলিয়া আমরা সাধারণ লেখক ও যে কলিকাতা, ঢাকার বা অন্য কোন দেশের slang ব্যবহার করিব তাহার মানে কি? আমরা অবশ্য চির প্রচলিত সাধু ভাষাই ব্যবহার করিব। "বাঙ্গলা ভাষার এমন একটা প্রাণ আছে তারসঙ্গে সমীকরণ না হইলে কোনও কথা বা কোনও কথার ভঙ্গী সাহিত্যে চলিবে না। সুতরাং যাহা কিছু লিখিলেই যে তাহা সাহিত্যে চলিয়া যাইবে এমন নহে।" বাঙ্গলাভাষার এই প্রাণটা কি নরেশ বাবু খুলিয়া বলেন নাই। আমাদের মতে ভাষার প্রাণ ভাবের প্রাণ হইতে অভিন্ন। ভাবের প্রাণ থাকিলে, তাহা যেরূপ ভাষায় প্রকাশ কর না কেন তাহা সাহিত্য হইবে। এইরূপে কলিকাতার কথিত

ভাষায় যেরূপ সাহিত্য রচনা হইতেছে, ঢাকার কথিত ভাষায় ও সেইরূপ সাহিত্য রচিত হইতে পারে, রাজসাহীর ভাষায়, চট্টগ্রামের ভাষায়ও সাহিত্য রচিত হইতে পারে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের ভাষায় রচিত অনেক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। সে গুলিও বঙ্গসাহিত্য সন্দেহ নাই। মুসলমানী বাঙ্গলার কথা অনেকেই জানেন—'নোয়াখালী, কুমিল্লা চট্টগ্রামের মুসলমানী ভাষায় তাহা রচিত। নোয়াখালিতে বহুল প্রচারিত "চৌধুরীর লড়াই" নামক একখানা প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহা এই মুসলমানী ভাষায় রচিত। এ সকল ভাষার ও এক একটা প্রাণ আছে, অথচ আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষার সহিত তাহা কতদূর বিভিন্ন। সুতরাং ভাষার প্রাণ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে, বাঙ্গলা ভাষার সংখ্যা অসংখ্য হইবে।

এখন কথা এই, প্রাদেশিক ভাষায় ইতিপূর্ব্বে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সাধুভাষার প্রচলনের পর হইতে এখন সমগ্র বঙ্গদেশে সেই সাধু ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এখন আবার আমরা সেই প্রাদেশিক ভাষাসমূহে গ্রন্থাদি রচনা আরম্ভ করিব, না সাধুভাষাই চলিতে থাকিবে? দুই একজন প্রতিভাশালী লেখকের কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার ভাষায় গ্রন্থ রচনা না করিয়া নোয়াখালীর চট্টগ্রামের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে ও তাহা লোকে কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িবে। কিন্তু সাধারণ বঙ্গভাষার লেখকগণ কি তাঁহাদের নিজ ২ জেলার প্রচলিত "মাতৃভাষায়" গ্রন্থ রচনা করিবেন, না সমস্তবঙ্গে প্রচলিত সাধুভাষায় লিখিবেন? এই প্রশ্নের মাত্র একই উত্তর আছে। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে নরেশ বাবু আরও একটা ভাল কথা বলিয়াছেন। "কথিত ভাষায় লিখিতে গেলেই যে তা'র ভিতর প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িবেই একথা আমি স্বীকার করি না। কথিত ভাষায় আমাদের যতই কেন তফাৎ থাকেনা, মোটের উপর সে ভাষায়ও বেশীর ভাগ সকলদেশেই এক, তফাৎটা কেবল উচ্চারণের। কতক কথা অবশ্য ভিন্ন সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রয়োগ বা কৃতত্তদ্ধিতের চেহারা হয় তো খুবই ভিন্ন কিন্তু এত ভিন্ন নয় যাতে তাকে এক ধাঁচে, এ..টা standard dialect এ দাঁড় করান না যায়। "করলুম" ও "গেলুম" এর চেয়ে "করলাম" ও "গেলাম" এক standrd ভাষায় চলতি বেশী।"

যাঁহারা সাধুভাষার পক্ষপাতী তাঁহারাও ত এই প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিতে চান। নরেশ বাবু যে standard dialectএর কথা বলেন, তাহাই কালক্রমে সাধুভাষা নামে পরিচিত হয়। যদি কলিকাতার প্রাদেশিকতা বাদ দেওয়া হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা কিম্বা মিঃ পি চৌধুরীর লেখায় কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। "করলুম" "গেলুম" ছাড়াও এমন অনেক প্রাদেশিক শব্দ আছে যাহা কথিতভাষায় চলিলেও লিখিত ভাষায় চালাইলে গোল হইবে। সাধুভাষায় "পুত্র কন্যার" স্থলে "ছেলে মেয়ে" লিখিত ভাষায় বেশ চলিতে পারে। কিন্তু কলিকাতার অঞ্চলের "ছেলে পুলে" লিখা ঢাকার "পোলাপান" লিখিত ভাষায় চালাইতে গেলেই বিভ্রাট হইবে। হাজার প্রতিভাশালী লেখক হইলেও "পোলাপান" বঙ্গভাষার মধ্যে চালাইয়া নিষ্কৃতি পাইবেন না। "তোমার মেয়ে ছেলে কয়টী" একথার উত্তরে একজন পূর্ব্ব বঙ্গবাসী তাঁহার পুত্র ও কন্যাদিগের সমষ্টি বলিয়া পশ্চিম বঙ্গবাসীর নিকট সহজেই হাস্যাস্পদ হইবেন, কারণ "মেয়েছেলে" অর্থ কেবল কন্যা বুঝায় একথা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? এইরূপ দেশভেদে অনেক কথিত ভাষার idiom আছে যাহা লিখিত ভাষায় চালান কঠিন। এই সব প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া কথোপকথনের ভাষা লিখিত ভাষায় চালাইলে কাহারও কোন অল্প হইতে পারে না।

উক্ত আলোচনাদ্বারা এই কয়টী কথা বেশ সুস্পষ্ট হইতেছে যে—(১) যাঁহারা সাহিত্য সম্রাটের দোহাই দিয়া কলিকাতার slang লিখিত ভাষায় চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

(২) কোন প্রতিভাশালী লেখক হয় ত নিজের প্রতিভাবলে কোন অঞ্চলের slang লিখিত ভাষায় চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু অন্যে তাহা করিতে গেলে নিশ্চয়ই ভাষাবিভ্রাট হইবে।

(৩) কোন প্রতিভাশালী লেখক অন্য নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে যে একটা নূতন ভাষার আবিষ্কার করিতেই হইবে এমন কোন মাথার দিব্য নাই। তিনিও অনেক পরিমাণে প্রচলিত ভাষায় লিখিতে বাধ্য হন, তাঁহার style স্বতন্ত্র।

(৪) সাধারণ লেখকগণ প্রচলিত ভাষায়ই লিখিবেন, "নূতন কিছু করার" লোভ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) কথোপকথনের ভাষা লিখিত ভাষায় চালাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তাহা প্রাদেশিকতা বর্জ্জিত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

পুরীধাম।

ভারতের পুণ্যক্ষেত্র হে পবিত্র পুরী,
দারুরূপে ভগবান
হয়েছেন অধিষ্ঠান
যুগ যুগান্তর হ'তে তব বক্ষোপরি।

অজেয় যে পারাবার, নাই যার সীমা,
ঊর্দ্মিভুজ প্রসারিয়া
শ্বেত ফেন পুষ্প দিয়া
পূজিছে তোমারে সদা ভুলিয়া গরিমা।

তোমার প্রত্যেক স্থান, প্রতি বালুকণা,
ভক্তের চরণস্পর্শে
হইয়াছে বর্ষে বর্ষে
কি পবিত্র মহাতীর্থ নাহিক তুলনা।

চৈতন্য শঙ্কর আদি যত মহাজন
তোমার পবিত্র ক্রোড়ে
শুয়েছেন চিরতরে,
স্বর্গদ্বার ধরায় যে অমর ভবন।

সীমা হ'তে সীমান্তের কত নর নারী
নিরখিতে জগবন্ধু
তেয়াগিয়া ভাই বন্ধু
এসেছে তোমার দ্বারে প্রাণ তুচ্ছ করি।

মহতের সঙ্গলাভে হ'য়েছ মহান,
উদার তোমার রীতি,
দূর করি ভেদ নীতি
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল তব সকলি সমান।

অতীতের শিল্পকলা, কত ইতিহাস
হিন্দুর গৌরব যাহা
তোমাতে রয়েছে তাহা
দিতে সাক্ষ্য সময়ের করি উপহাস।

ওহে চির পুরাতন, হে চির নবীন,
অনন্ত জলধি-তীরে
অনন্তকালের তরে
ভারত গৌরব হ'য়ে থাক নিশিদিন।

শ্রীদাক্ষায়নী দেবী।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ

(১)

বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর একটী জনরব উঠিয়াছিল যে তিনি স্বীয় জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সময় গত না হইলে প্রকাশিত, হইবে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাহার পর দেখিলাম তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। ভাবিলাম ঘরের ছেলে ঘরের অনেক কথাই অবগত; সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুকে সাধারণে ভাল করিয়া জানিবে ও চিনিবে। কিন্তু কৈ, পুস্তক মধ্যে সেই সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্রকে ত ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁহার দম্ভপূর্ণ রোষ কষায়িত নয়নভঙ্গি মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু তাঁহার সরলতা স্নেহ মমতা বা কারুণ্যের ছায়াও দেখিলাম না। জলদ জাল মণ্ডিত বিশাল বদন ভাব দেখিলাম বটে, কিন্তু সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বর্ণভাতি সমন্বিত সহাস্য বদনখানি ত দৃষ্টিপথে আসিল না। এমনটা কেন হইল?

সত্য বটে বঙ্কিম বাবুর উদ্দীপ্ত যৌবন কালের কথা শচীশ বাবুর জানা অসম্ভব, কেননা কোথায় থাকিতেন তিনি আর কোথায় থাকিতেন বঙ্কিম বাবু; সুতরাং অনেক বিষয়ে তাঁহাকে বঙ্কিম বাবুর বন্ধু বান্ধব বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহার উপর শোনা কথার উপর আবার তিনি স্থানে স্থানে অযথা বর্ণ বৈচিত্র্য সম্পাদনে আসল খাস্তা করিয়া ফেলিয়াছেন। এখনও তাঁহার পূজনীয় খুল্লতাত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় জীবিত। এখনও কাঁঠাল পাড়ায় প্রধান পণ্ডিত পূজনীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়া কদমতলার সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বর্ত্তমান। চেষ্টা করিলে তাঁহাদের নিকট তিনি বঙ্কিম বাবুর অনেক কথা জানিতে পারিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা কেন হয় নাই তাহা বুঝিলাম না। হয়ত কোন বিশেষ অন্তরায় আছে। আর না থাকিলে তাঁহার খুল্লতাত পূর্ণ বাবুর লিখিত সুখ-পাঠ্য বঙ্কিম প্রসঙ্গ গুলি তাঁহার পুস্তক মধ্যে স্থান পায় নাই কেন?

পুস্তক খানিকে গ্রন্থকার প্রতিমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ভক্তের উপযুক্ত কথা বটে, আর তিনি সেই প্রতিমাকে ভাল করিয়া সাজাইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখও করিয়াছেন, আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে সে অভাব দুর করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা একদিন বঙ্কিম বাবুর রাশি রাশি ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইবে; এটা স্মরণ রাখিবার বস্তু। আর এক কথা শচীশ বাবু বঙ্কিম জীবনীতে এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা না লিখিলেই ভাল হইত। আমরা তাহার দুই একটী উদাহরণ পরে দিব।

পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। আবার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থেও সেই মহাশক্তি দ্বয়ের সত্বা অনুভূত হয়। তাই বুঝি ভবানিপতি হর গৌরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সংসারীকে সেই দুই মহাশক্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। আমরা শচীশ বাবুর গ্রন্থে জটাজূট সম্বলিত ফণিমালা বিশোভিত ডম্বুর নিনাদ মুখরিত বঙ্কিম বাবুর ধূর্জ্জটি মূর্ত্তি যেমন দেখিতে পাই, বরাভয় প্রদায়িনী করুণাময়ী জগন্মাতা গৌরীর কারুণ্য পূর্ণ ছবি তেমন দেখিতে পাই না। সত্য বটে বঙ্কিম বাবুর সে ভাব সাধারণ চক্ষুর অন্তরালেই অনেক সময় থাকিত, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ছিল না, একথা কেমন করিয়া বলিব। সাধারণে তাঁহার দম্ভদীপ্ত মুখচ্ছবিই প্রধানতঃ দেখিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহার উদারতা পূর্ণ সরস হৃদয়ের করুণাধারায় সিক্ত হইতেন।

বঙ্কিম বাবু আমার পিতৃবন্ধু। তিনি যখন বহরমপুরের ডেপুটী, আমার পিতা তখন তথায় সবজজ। বঙ্কিম বাবুকে অনেকদিন আমাদের বাসায় দেখিয়াছি, আমিও সময় সময় তাঁহার বাসায় গিয়াছি, তখন আমার বয়স ৯। ১০ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও সে

সময়ের কিছু কিছু স্মরণ হয়। বঙ্কিম বাবু তখন একটু কোপন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার উপর মুখ ভাব এত গম্ভীর ছিল যে আমরাও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইতে শঙ্কিত হইতাম। তাঁহার রাগ যেমন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, আবার তেমনি শীঘ্র নিবিয়া যাইত। তিনি যেদিন রাগান্বিত হইতেন সেদিন চেয়ার টেবিল, বাক্স, তোরঙ্গ হাঁড়ি কুঁড়ি যাহা সম্মুখে পাইতেন তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেন। আবার কিছুক্ষণ পরে যেন আর সে মানুষ নন্। যে সকল ক্ষতি করিয়াছেন হাস্য মুখে তাহাই দেখিতেন এবং তাহাদের সংস্কার বা স্থান পূরণ করিবার চেষ্টায় থাকিতেন। আমি দুই চারিবার তাঁহার এবম্বিধ রাগ দেখিয়াছি। তখন আমি অবশ্য তাঁহার কোন পুস্তক পাঠ করি নাই, কিন্তু তাঁহার "নদীর জল অবিরল সাগরেতে যায়" প্রভৃতি দু চারিটী কবিতার আবৃত্তি করিতে পারিতাম।

বঙ্কিম বাবু তৎকালে লোকের সহিত বড় একটা মিশিতেন না, সম্ভবতঃ মিশিবার ইচ্ছাও ছিল না। রেভারেণ্ড লালবিহারীদের সহিত তিনি নাকি একদিন প্রায় চারি ঘণ্টা কাল নলহাটী ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে বসিয়াছিলেন; কিন্তু একটী কথাও কহেন নাই। লালবিহারী দে দুই একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়াছি যে এমন ভাবে উত্তর পাইয়াছিলেন, যে তিনি আর বেশী কথা কহিতে সাহস করেন নাই।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচিত "পিতা পুত্রে" বঙ্কিম বাবুর তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাবের একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই সাধারণে বঙ্কিম বাবুর স্বভাব সম্বন্ধে অনেক টা আভাস পাইবেন।

৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুনসেফ, বঙ্কিম বাবুর মেজ দাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব্‌রেজেষ্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিম বাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীব বাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিম বাবুর জন্য একটী বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অন্ততঃ পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটী বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম। জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটা ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর কপাল কুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণ-পনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে আনন্দ সহকারে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিম বাবু আসিলেন আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি, এল, পাশ্ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতা পুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিম বাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিস পত্র চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়াছিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম; হায়রে। হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে। এপর্য্যন্ত বঙ্কিম বাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না; অধীনের প্রতি কপাল-কুণ্ডলাকারের করুণা কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতে ছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন "বঙ্কিম গেল হে?" আমি বলিলাম "হাঁ।" "তোমার সহিত দুদিনে একটিও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম "কথা কি, আমি যে, একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত, তাঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।" পিতা বলিলেন "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরতা পিতা পুত্র দুইজনে বঙ্কিম বাবুর সুবিধা, অসুবিধা কতদুর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিম বাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিম বাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল, বঙ্কিম বাবুর আদেশ মত পিতাকে তামাক দিল আমরা. তিন জনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিম বাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিম বাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—

"কাদামাখা সার হ'ল মোর, মাছধরা হল না।" এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়ারহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিম বাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্পগুজোব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিম বাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪|৫ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিম বাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুইজনে দেখাসাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টাকাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম ঘরে বসিয়া বঙ্কিম বাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিম বাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিম বাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল— রহস্তকায় রেনল্ডের কথা। তখন দুই জনে অসি ধারে মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক, দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে, দুই জনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন দিন, সেই হৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট; তিনি বয়সে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর "বন্ধুবৎসলতার" পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন?" পাঠক ইহা হইতেই হয়ত বঙ্কিম বাবুকে অনেকটা চিনিয়াছেন।

এই সময়ে বহরমপুরে গ্রাণ্টহলের সৃষ্টি। আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহারই যত্ন ও অধ্যবসায়ে অনেক টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই গ্রাণ্টহলে প্রায় প্রতি রবিবারে বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। অধিকাংশ প্রবন্ধই বঙ্কিমবাবু ও লালবিহারী দে কর্তৃক রচিত। প্রবন্ধ পাঠকালে বঙ্কিমবাবুর কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন জনিত বৈচিত্র্য অনুভূত হইত। কৌতুকপ্রিয় দে সাহেব তাহাই লইয়া রঙ্গ করিতেন এবং নানাছলে তাঁহার পঠিত প্রবন্ধের অপ্রিয় সমালোচনা করিতেন। বঙ্কিমবাবু তাহাতে হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইতেন। এই সকল সামান্য ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, বরং একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিলেই সঙ্গত হয়।

যে সময় বঙ্গভূমে ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু প্রভৃতি মনস্বীগণ জন্ম গ্রহণ করেন, সত্যই সে অতি সুখের সময়। সৌভাগ্যক্রমে এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যতীত সকলকেই আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত অল্পবিস্তর মিশিয়াছি। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমানে তখন ইঁহারা সকলেই মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় আসিতেন। সকলের সহিতই তাঁহার সখ্যতা ছিল।

যে সময়ে বঙ্কিমবাবুর জন্ম সে সময়ে বঙ্গে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হয় নাই। তখন দেশে রেলপথ ছিল না, টেলিগ্রাফের তার ছিল না, এত গাড়ী ঘোড়া ছিল না,

সম্ভ্রান্ত লোকে পাল্‌কী চড়িতেন, সাধারণের পদব্রজে বা নৌকা ও গোশকটে যাতায়াত চলিত। বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকভিন্ন শাল জমিয়ার পরিতেন না। গৃহস্থ সন্তান মোজা পরিতে লজ্জিত হইতেন, সহর ঘেঁসা ছেলে ভিন্ন শাল গায়ে দিত না, শীতকালে ফরাসী ছিটের রেজাই গায়ে দিয়া তৃপ্ত হইত। তখনও সহরে বাস করিবার স্পৃহা লোকের মনে জাগে নাই। তখন পল্লিগ্রাম ছাড়িয়া লোকে কলিকাতায় ছুটিত না। কলিকাতা বাসও সুখকর ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই বলিয়াছেন,

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই সুখে কল্‌কাতায় আছি।

তখন কলিকাতার অবস্থা যাহাই হউক কাঁঠালপাড়া স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য ছিল। দশম বর্ষীয় শিশুর তখন অম্লোদ্গার হইত না। খাদ্য সামগ্রী সুলভ ছিল লোকে প্রাণ পূরিয়া আহার করিত। তখন ইংরাজ বাঙ্গালিতে সদ্ভাব ছিল। অধিক কি কোন কেরাণীর অসুখ হইলে জজ মাজিষ্ট্রেট তাঁহার বাসায় তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, চিকিৎসা ও পথ্যের সুব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু আজি আর সে দেশ সে দিন নাই।

তাহার পর রুচী। বঙ্গে বহুকাল হইতে আদি রসের অভাব ছিল না, বৈষ্ণব কবিগণ তাহাতে ঘৃতা-হুতি দিয়াছিলেন কিন্তু চূড়ান্ত করিয়াছিলেন দাশু রায়, রাম বসু আর হরু ঠাকুর। এই আদিরসের দিনে যখন "বউও" এবং "শাশুড়ে" বলিয়া রসিকতা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। যখন কবিতায় রসিকতা চলিত, সেই আদিরস ঘটিত কাব্য প্রাণ দিলে বঙ্কিম জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাহার সংক্রমতা হইতে তিনিও অব্যাহতি পান নাই। দীনবন্ধু খোলা প্রাণে তাহা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু চাপা মুখে বঙ্কিম বাবু ও তাহা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার বাল্য রচনা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বঙ্কিম বাবুর জন্ম কালিন সামাজিক অবস্থা ভাল ছিলনা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অহিন্দু ভাব বেশী মাত্রায় দেখা যাইত। কিন্তু বলিতে কি তিনিও পূর্ণ মাত্রায় সেই সমাজের শিক্ষিত সম্প্র-দায়ের দশ জনের এক জন ছিলেন। অহিন্দু ভাব তাঁহার প্রাণে প্রাণে জাগরিত ছিল, কিন্তু তিনি যে নাস্তিক ছিলেন এ কথা স্বীকার করিতে পারিনা। তিনি সত্যবাদী ছিলেন কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন নাই, সুতরাং যিশু খৃষ্টের সকল আদেশ পালন করিতে না পারিলেও সত্যবাদী মানবের যে মুক্তি নিশ্চয় এই ধ্রুব ধারণা ছিল। ইংরাজি ১৮৮০ সালের কথা জানি তখনও বঙ্কিম বাবুর প্রাণে হিন্দু ভাব জাগরিত হয় নাই। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহাকে এজন্য অনুতাপ করিতে হইয়াছে।

বাল্য জীবন হইতে বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম জ্ঞানের অভাবের বিশেষ কারণ কি তাহা বুঝা যায় না। তিনি হিন্দু সন্তান, তাঁহার পিতৃদেব একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার জননীর কথা উল্লেখ বাহুল্য। তাঁহার গৃহে হিন্দু দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ধূপ ধুনার সৌরভাপ্লুত দেব মন্দির কাঁসর ঘণ্টার নিনাদে মুখরিত হইত। সে হেন হিন্দু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্কিম চন্দ্রকে শেষ জীবনে অহিন্দু আচার ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিতে হয় কেন? ইহা কি পূর্ব্ব জন্ম কৃত প্রবৃ-ত্তির নিবৃত্তির কারণ নহে। আর এই জন্য তিনি পরিতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি ব্রাহ্মণ এ ধারণা যদি পূর্ব্বে থাকিত তাহা হইলে এক জীবনেই অনেক উন্নতির আশা থাকিত। কিন্তু বিধাতার বুঝি সে ইচ্ছা নহে।"

সত্যই তাই, অহিন্দু ভাবের প্রধান উৎপত্তি কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে। নাম করিব না কিন্তু ভূদেব বাবুর সমসাময়িক অনেক ছাত্র বাহাদুরি দেখাইতে প্রকাশ্য ভাবে গোমাংস আহার করিতেন, বোতল পোরা মদ ঢক্ ঢক্ করিয়া গলায় ঢালিতেন। এই অত্যাচার প্রভাবে তৎকালিন্ কত মহামতী যে অকালে কালের কবলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্বা নাই, কিন্তু বঙ্কিম তাঁহাদের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়। তাঁহার অভ্যুদয় সময়ে সে প্রবল স্রোত আর তত বেগশালী নহে। তাহার উপর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা মেদিনীপুর ও হুগলিতে, তথাপি একটা

কেন হইল? বঙ্কিম বাবু কখন আপনাকে কাহারও নিকট ছোট বলিয়া মনে করিতেন না। কিরূপে, কি যশে, কি কর্ত্তব্য পালনে, কি সাহিত্য পরিচর্য্যায়, কি রাজকীয় কার্য্যে তিনি আপনাকে স্বয়ং শীর্ষ স্থান দিয়াছিলেন কিন্তু অত্যাংশেও যে তিনি বড় এ ভাব ছিলনা। কেহ তাঁহার অনাচার জনিত কোন কার্য্যের কথা উত্থাপন করিলে তিনি ভ্রুকুটী কুটিল নেত্রে বলিতেন "I hate hypocrisy."

সত্যই তিনি বাহিরে একটা ভিতরে একটা করিতেন না। আজ কাল কার রাম পাখী প্রিয় বাবুরা গোপনে সে সমস্ত উদরস্থ করিলেও বাহিরে হিন্দু। কিন্তু তিনি এভাবের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন পরে কি বলিবে তাহা কখন ভাবিতেন না। মুখের উপর স্পষ্ট উত্তর দিতে তিনি কখন কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

বঙ্কিম বাবু যখন কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেন তখন পথিপার্শ্বস্থ বৈঠকখানার পার্শ্বে তাঁহার একটী পায়খানা ছিল। পায়খানা যাইবার সময় ভৃত্য গুড় গুড়ীতে তামাকু সাজিয়া সটকাটী পায়খানা মধ্যে তাঁহাকে দিয়া আসিত। পথের কত লোক আড় নয়নে ডেপুটী ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের এই বাবুয়ানা বঙ্কিম-নেত্রে দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশী ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্যেরা তাহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতেন তাহা তিনি কখন ভাবিতেন না।

আমি দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবুকে একত্রে বর্দ্ধমানের বাসায় দেখিয়াছি। দীনবন্ধু বাবুর হৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাস কেহ ভুলিতে পারেন না। বাটীর ঝী চাকর পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইত। পাচক ব্রাহ্মণ উৎফুল্ল প্রাণে তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিত। এমনি তাঁহার হৃদয় ভরা আনন্দ ছিল। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে দিনবন্ধু বাবু "কমলে কামিনীর" পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছেন। শ্রোতা পিতৃদেব, তাঁহার সহপাঠি সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার ও বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিম বাবুর রসিকতার টিকা টিপ্পনি চলিতেছে, কিন্তু থাই পাইতেছেন না, গঙ্গাচরণ ও দীনবন্ধুর রস তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন। সেই ঘন ঘন হাস্য সেই আনন্দ ভরা হৃদয়, সেই সারল্য সেই রসামোদ আর দেখিতে পাই না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে আসিলে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্রের বাটীতেই থাকিতেন। তবে প্রায় আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। তিনি আসিলে আমরা যেন নিতান্ত পরমত্মীয় সমাগম হইয়াছে বোধে ছুটীয়া তাঁহার নিকটে যাইতাম, আর সানন্দ চিত্তে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতাম। তেমন সরল প্রকৃতি সদাশয় লোক আর জন্মিবে কি? আমি একদিন প্রাতে প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দন্তধাবন করিতে ছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "তোর জেঠাই মার কাছ থেকে বিস্কুট আন্‌ত?" মিত্র মহাশয়ের লক্ষ্মী স্বরূপিণী গৃহিণীকে আমি "জেঠাই মা" বলিতাম। বলিবা মাত্র জেঠাই মা এক থাল মুড়ি দিলেন। আমিও সেই দেশী বিস্কুট হাতে করিয়া উপস্থিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় থালাটী হাতে করিয়া চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দিয়া বলিলেন "এ বিস্কুট খাস্‌ তো?" হায়, সময়ে সময়ে তাঁর কত কথাই মনে পড়ে।

তিনি বর্দ্ধমানে আসিলে পিতৃদেব সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভোজ দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে অনুরোধ প্রায়ই রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাঁহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করান মাত্র; একদিন ভোজ আমাদের বাসায়। ভোক্তা বাবু দুর্গাদাস মল্লিক, বঙ্কিম বাবু, সঞ্জীব বাবু এবং আরও দুই একজন লোক। সাগরের একটা কড়া বাঁধ ছিল। সে বাঁধনীর ভিতর না আসিতে পারিলে তিনি খাওয়াইতেন না। সেটী এই যে, তিনি যাহা স্বয়ং পাক করিতে পারিবেন তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য ভোক্তারা আহার করিতে পাইবেন না। সুতরাং মেন্থ (menu) অতি সামান্যই হইত। কথিত দিনের মেন্থ ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম আদা দিয়া পাঁঠার মেটের অম্ল। আহারের সময় গগন ভেদী বাহবা পড়িতেছে। আর দেব হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায়

জড়াইয়া সহাস্যে পরিবেশন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন "এমন সুস্বাদু অম্লত কখন খাই নাই।" সঞ্জীব বাবু সহাস্যে বলিলেন" হবে না কেন, রান্নাটা কার জানত, বিদ্যাসাগরের।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি হাসির সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন "না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্য মুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।" বঙ্কিম বাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।

বিষবৃক্ষের একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর যে পত্র আছে; বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই উল্লেখে রহস্য করিয়াছিলেন হাসির তরঙ্গে সে কথার পরিসমাপ্তি হইলেও বঙ্কিমবাবু যেরূপ সরলভাবে তাহা লিখিয়াছিলেন অনেকে সে ভাব পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখী সরলপ্রাণে কমলমণিকে প্রাণের আশার আভাস দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কেননা কুন্দনন্দিনী তাহার পৃথিবীর সার সম্বল স্বামী রত্নকে কাড়িয়া লইতেছে। দোষ কাহার? বৈধব্যের না বিধবা প্রথার না স্বভাবের? এমন চিত্ত বিকৃতির ব্যাপারে সধবা বিধবার বাধা বিপত্তি আছে কি? আত্মচিত্ত দমন ক্ষমতা অভাবে মানব পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র তাই, দেবেন্দ্র তাই, হীরা তাই। শেষ আবার তাহারই অভাবে সতীলক্ষ্মী সূর্য্যমুখী, যিনি নগেন্দ্রের পায়ে কাঁটা ফুটিলে বুক পাতিয়া দিতে সম্মতা, তিনিও গৃহত্যাগিনী, তবে আর দোষ কাহার দিব? সূর্য্যমুখী লিখিলেন "আর একটা হাসির কথা—ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি তাঁহার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়. সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

কথাটা সূর্য্যমুখীর। সূর্য্যমুখী, চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি সম্পন্ন স্বামীর সুরূপা, যৌবনশালিনী কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগ দর্শনে ভীতা, ত্রস্তা, চকিতা, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কথা ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু তখনকার অনেকে তাহা ধরিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভাবিয়াছিলেন যে এই অংশটুকু সূর্য্যমুখীর পত্রে না থাকিলে পত্রখানির কোন প্রকার সৌন্দর্য্য হানি বা রসভঙ্গ হইত না। তাহার পর বঙ্গদর্শনে যখন "বিধবা বিবাহ" ও "বহুবিবাহ" পুস্তকের অযাচিত সমালোচনা ও সেই সঙ্গে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "তুলনার সমালোচন" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইল, তখন সত্য সত্যই ধোকা আরও বাড়িয়া গেল।

কবি নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে একটী কিম্বদন্তীর অবতাড়না করিয়া ইংরাজ জাতির উৎপত্তির এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

"বানর ঔরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে,
এইরূপ কিম্বদন্তী।"

কিন্তু এই কিম্বদন্তী কি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; না নবীন বাবুকে তাহার ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে হইয়াছিল?

অপরিচিত লোকের কাছে বঙ্কিমবাবু স্থির গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। রঙ্গ রস বা রসিকতা আদৌ করিতেন না কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কাছে সে গম্ভীর ভাব দেখা যাইত না। বর্দ্ধমানে আমার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর সাবিত্রী ব্রত উপলক্ষে প্রতিবৎসর অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। হাকিম, উকিল মোক্তার, আমলা ও স্থানীয় ভদ্রলোক প্রভৃতি কেহ বাদ যাইতেন না। সেই উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশস্থ বিখ্যাত বাগানের অতিউৎকৃষ্ট আম্র প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান হইত। এই উৎসবে বঙ্কিম বাবুরা তিন ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। সে দিন ব্রত উপলক্ষে আহার, সুতরাং বঙ্কিমবাবু কতিপয় পরিচিত ব্রাহ্মণের সহিত আহারে বসিয়াছেন। পিতা এদিক ওদিক করিয়া তত্বাবধান করিতেছেন। আহারান্তে দক্ষিণা দিবার সময় বঙ্কিম বাবু দুই হাত বাহির করিয়াছেন, পিতা বলিলেন "দুই হাতে দক্ষিণা নেবে নাকি?"

বঙ্কিম। না নিলে চলিবে না ভাই, গাড়ী ভাড়া একটা টাকা দিতে হইবে। তিন ভাইয়ের রোজগার দেখিতেছি ৸৹ আনা, বাকী।৹ আনা কি পকেট থেকে দিব?

দক্ষিণা।৹ আনা হিসাবে বিতরিত হইতেছিল। সত্য সত্যই তাঁহার দুই হাতে দক্ষিণা দেওয়া হইল

তিনিও সানন্দে পকেটে পূরিলেন। এ সরলতা এ আমোদ আজকাল কয় জন করিতে পারেন?

এই উপলক্ষে আর একটী রহস্য পূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার ও তাঁহার কৃতিপুত্র অক্ষয়চন্দ্র আহারে উপবিষ্ট। ভুলক্রমে অক্ষয় দাদা গঙ্গাচরণ বাবুর পার্শ্বে দক্ষিণমুখে খাইতে বসিয়াছিলেন। গঙ্গাচরণবাবু উত্তরমুখে উপবিষ্ট একটী ভদ্রলোককে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আপনি সেই খানে বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র মুন্সেফ্ (পরে ইনি ডিষ্ট্রীক্ট জজ হইয়াছিলেন) তিনি বলিলেন "ও দিকে বসিলেন যে?" গঙ্গাচরণবাবু সহাস্যে বলিলেন "দেখিতেছ না পুত্র দক্ষিণ মুখে বসিয়াছে, সুতরাং আমার উত্তর মুখে না বসিলে দোষ খণ্ডন হয় কৈ?"

হো হো শব্দে হাসির তরঙ্গ উঠিল। শেষে অক্ষয় দাদা উঠিয়া উত্তর মুখে বসিলেন। এ রহস্যপ্রিয়তা অধুনা বড়ই বিরল হইয়া উঠিয়াছে, পিতা পুত্রে তখন যে ভাবে বিশুদ্ধ রসামোদ হইত, এখন আর তাহা দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

অজ্ঞাত-পদকর্ত্তৃগণ।

আমরা প্রাচীন পদাবলি পুথির তালাস করিতে করিতে পাবনা জেলার ডেমরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবী লাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামে এক খানা সুবৃহৎ পদাবলি-সংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে ঐ পুথি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক ঐ প্রবন্ধ ১৩২১ সালের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুথিতে অভিরাম প্রভৃতি কুড়িজন অজ্ঞাত পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার প্রায় দুইশত অজ্ঞাত পদ ও উহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের অনেক গুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। পরিষৎ পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে আমরা পদ-রস-সার পুথির সংগৃহীত পদাবলির কয়েকটী বিশেষত্বের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা ও উক্ত কুড়ি জন অজ্ঞাত পদ কর্ত্তার নাম ও তাঁহাদিগের পদাবলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার স্তম্ভে উক্ত পদকর্ত্তাদিগের সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, কিন্তু মাত্র কয়েক জনে পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করার পরেই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ায় ঐ আলোচনা সমাপ্ত করা যায় নাই। তৎপরে আমরা পদরত্নাকর প্রভৃতি আরও কয়েক খানা প্রাচীন হস্ত লিখিত পদাবলি পুথি অনুসন্ধান করিয়া আরও ছয় জন অজ্ঞাত পদকর্ত্তার রচিত কয়েকটি পদ প্রাপ্ত হওয়ায় এবং এইরূপ বিষয়ের আলোচনা কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বোধ করায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, এই পদ-কর্ত্তাদিগের অধিকাংশের সম্বন্ধেই কোন, বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ জানা যায় নাই। অনেকের মাত্র দুই একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল উহা দেখিয়া তাঁহাদিগের কবিত্বের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করাও সমীচীন হইবেনা; তথাপি পদাবলি-সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে ইহাঁদিগের পদাবলির আলোচনা অপরিহার্য্য এবং প্রাচীন সাহিত্যের জীবন-সংগ্রামে জয়ী ইহাঁদিগের সেই অল্পসংখ্যক পদাবলি ও প্রাচীন সাহিত্যানুরাগীর নিকট যথেষ্ট কৌতুহল-জনক ও সমাদৃত হইবে মনে করিয়া আমরা এই পদ কর্ত্তাদিগের পদাবলি বহুল-রূপে উদ্ধৃত করিয়াই আমাদিগের প্রবন্ধের বিষয় সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমরা একটি একটি করিয়া এই পদকর্ত্তাদিগের পদাবলির আলোচনা করিব; সুতরাং তৎপূর্ব্বে ইহাদিগের নাম ও পদাবলির একটি তালিকা দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ইহাঁদিগের কোন উল্লেখ নাই।

অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তৃগণের নাম।

		পদ-সংখ্যা।
(১)	অভিরাম	১
(২)	কমলাকান্ত	১১
(৩)	কাশীদাস	১
(৪)	কিশোর	২
(৫)	কুবের আনন্দ	১
(৬)	কৃষ্ণানন্দ	৬
(৭)	জয়চন্দ্র	৩
(৮)	জানকীবল্লভ	৩
(৯)	তরণীরমণ	৬
(১০)	দয়াল	১
(১১)	দীনবন্ধু	৪
(১২)	ধনঞ্জয়	৩
(১৩)	নিত্যানন্দ	১৪৬
(১৪)	নীলাম্বর	১
(১৫)	বদন ...	১
(১৬)	বল্লভীকান্ত	২
(১৭)	বীরবাহু	১
(১৮)	ভাগবতানন্দ	১
(১৯)	মন্মথ ...	৪
(২০)	রাঘব ...	১
(২১)	রাজচন্দ্র	১
(২২)	রাসানন্দ	৭
(২৩)	সর্ব্বানন্দ	১৭
(২৪)	স্বরূপচরণ	১
(২৫)	হরিবংশ	১

আমরা এখন যথাক্রমে এই পদ-কর্ত্তৃগণ ও তাঁহাদিগের পদাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১)

অভিরাম।

অভিরামের ভণিতা-যুক্ত মাত্র একটি পদ আমরা 'পদ-রস-সার' পুথিতে পাইয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক অভিরামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং একটি মাত্র পদ দেখিয়া তাহা কোন্ অভিরামের রচিত স্থির করা অসম্ভব। পদামৃত-সমুদ্র, পদ-কল্প-তরু প্রভৃতি মুদ্রিত পদাবলি গ্রন্থ-সমূহে অভিরামের ভণিতাযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় নাই। 'পদ-রস-সার' পুথিতে অভিরামের এই পদটি সংগৃহীত না হইলে—অভিরাম নামে যে একজন পদ-কর্ত্তা ছিলেন—এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিত। পদ-কল্প-তরুর বিরাট্ সংগ্রহে অভিরামের কোন পদ উদ্ধৃত না হওয়ায়—এই পদ-কর্ত্তা অভিরাম বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান হয়। অভিরামের সে একমাত্র পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

বালা ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি না ভাবিহ আন।
বহুত মিনতি করি পাঠাইল কান॥
বৈঠই তরুতলে করিছে ভাবনা।
অন্তর জর জর বিরহ বেদনা॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত কম্প শরীর।
অথির-নয়নে কভু হোয়ত থীর॥
অতয়ে কহলু হাম করহ পয়াণ।
ক্ষণেক না জানিতে হোয়ত আন॥
শুনইতে ঐছন কহতহি রাই।
উচিত না মানিয়ে হাম তাহা যাই॥
তুরিতে আনহ না জানে মরু আশ।
মিলল শ্যাম-পাশে অভিরাম দাস॥

বিশেষত্ব-হীন এরূপ একটি মাত্র পদ দেখিয়া উহার রচয়িতার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না—তবে একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে এই পদ-কর্ত্তা অভিরাম তথা-কথিত ব্রজ-বুলি রচনায় তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। অভিরাম যে একটি মাত্র পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন—কোন মতেই এরূপ অনুমান হয় না; সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাত ও বিলুপ্ত-প্রায় অন্যান্য পদাবলীর যাহাতে নষ্টোদ্ধার হইতে পারে সেজন্য প্রাচীন-সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তিদিগের মনোযোগ প্রার্থনীয়। প্রতিবৎসর বিভিন্ন স্থানে নানা সাহিত্য সম্মিলন ও বৈষ্ণব-সম্মিলন হওয়া সত্ত্বেও এই সকল বিলুপ্ত-প্রায় পদাবলি সংগ্রহের জন্য যে এখন পর্য্যন্ত রীতিমত কোন সমবেত চেষ্টা প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিশেষ

করিয়া বলিতে হইবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনের প্রধান সহায় মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত আমাদিগের এ সম্বন্ধে গতবর্ষে কলিকাতায় আলাপ হইয়াছিল। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনে সমাগত বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্যে অজ্ঞাত পূর্ব্ব পুথি ও পদাবলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ ও প্রবন্ধ-লেখকের সহিত সময়ান্তরে আলোচনা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু নানা কারণে তাহা আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদিগের বিবেচনায় এ সম্বন্ধে কেবল অনুরোধ উপরোধে ফল হইবে না; সম্মিলনের নিমন্ত্রণ-লিপির মধ্যেই অপ্রকাশিত প্রাচীন পুথি সম্মিলন-ক্ষেত্রে প্রদর্শিত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা, মূল্যবান্ প্রাচীন পুথির প্রদর্শনকারী দিগকে কেবল পুথি প্রদর্শনের নিমিত্তই উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা এবং সম্মিলনের কার্য্য বিবরণে প্রদর্শিত পুথি ইত্যাদির নাম ঠিকানা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করা আবশ্যক। সম্মিলন উপলক্ষে প্রতি বর্ষে যে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়—তাহার অত্যল্প অংশ ব্যয় করিলেই এই মহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইতে পারে। ভরসাকরি অতঃপর সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাবে অপ্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণ সংগ্রহকে সাহিত্যিক ও বৈষ্ণব সম্মিলন-সমূহের অন্যতম প্রধান কার্য্য-রূপে স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি স্থায়ী উপকারের সূত্রপাত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

ছোট কথা।

পৃথিবীতে বড়র দিকে সকলেই উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহে, ছোটকে কেহ গ্রাহ্য করে না। তাহা না করুক, কিন্তু ছোট যে—ক্ষুদ্র যে—সেও বিশ্বের ন্যায় বৃহৎ হয় —সমুদ্রের ন্যায় অপার হয়—রৌদ্রকরোজ্জ্বল মরুর ন্যায় দুস্তর হয়। তখন সে আর ছোট বলিয়া মরিয়া থাকেনা —আপনার দাবীকে অগ্রগণ্য করিয়া তাহা মানাইয়া লয়—তাহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবক আজ অনেক দিন পর একবার বাঙ্গালী জাতিটাকে পৃথিবীর দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইবে বলিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছে। পাল ও সেন-নরপালদিগের যুগে যে ঘটনা নিত্য ঘটিয়াছে, যাহার সহিত ভাবিবার বুঝিবার দেখিবার কোন-কিছুরই সম্বন্ধ ছিলনা। যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেমন,—এদেশেও তেমনি, মাতৃস্তনের দুগ্ধে লালিত হইয়া দেশের মাটী ও জলে পরিপুষ্ট হইত—আজ তাহারই সহিত অনেক কথা ভাবিবার আসিয়া জুটিয়াছে। সেকালে যাহা ছোট কথা—অতি সাধারণ কথা—অতি পুরাতন কথা ছিল, আজ তাহা তেমনি বড়—তেমনি "অসাধারণ"—তেমনি নানা বিষয়ে জটিল হইয়া উঠিয়াছে! সেকালে নীরবে যাহা ঘটিয়াছে—একালে নানাকারণে তাহা কল-কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে বাঙ্গালী সৈন্য-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবক স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, শুনিলে কোন্ বাঙ্গালীর চিত্ত হর্ষে গর্ব্বে স্ফীত হইবে না? এখনো সে দিন আসে নাই—আসিতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। যে রাজভক্তি ও দেশব্রত বাঙ্গালী যুবকদিগকে বহুবিপদ-সঙ্কুল কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান করিয়া লইয়াছে, সেই রাজভক্তি ও দেশ-ব্রত যেদিন তাহাদিগকে রাজবৈরী—ধর্ম্মবৈরী-মথনকারী বিজয়ী বীরের তিলক শোভায় শোভান্বিত করিয়া আমাদিগের শূন্য বক্ষে ফিরাইয়া দিবে—যে দিন আবার ভাই বলিয়া তাহাদিগের কণ্ঠ-লগ্ন হইতে পারিব, সেই দিন এই গৌরব গাথার দিন আসিবে।

আজ আর ইহা কাহারো অবিদিত নাই, যে মরণপথ-যাত্রী সন্তানকে শেষ আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত বঙ্গ-জননী অবরোধ প্রথাকে দূরে ঠেলিয়া প্রাণের আবেগে রেলষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালীকে কলঙ্ক-লিপ্ত করিয়াছে, কি বাঙ্গালীর

জাতীয় ইতিহাসের একটী গৌরবমণ্ডিত সূচনাকে উজ্জ্বল করিয়াছে—ভাইদের কৃপাণ ও কামানের মুখে প্রেরণ করিয়া এখন এ বিষয়ে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। অনেক কথার মত অনেকের নিকট ইহা একটী অতি নগণ্য ক্ষুদ্র কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সুপ্ত জাতির নবজাগরণের দিনে—জাগরণের এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত, বঙ্গজননীর এই অনুষ্ঠান বিশ্ববীজের ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও যুগধর্ম্মে বিশ্বের ন্যায় বিরাট। বঙ্গদেশে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকার সংখ্যা অল্প নহে। "বসুমতী" একখানি সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। গত ২৪শে ভাদ্র তারিখে বাঙ্গালী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকের কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করিয়া, আমি নিম্নে সেই সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গালার যুবকগণ, আমরা আজ তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা—বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক; যাহারা মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু দেশের যাহারা মেদ-মজ্জা, সেই দেশের লোককে নূতন আশার ও ভাবের কথা শুনায়; আমরা—যাহাদের রচনা রাজ-পুরুষদিগের সন্দেহশাণিত দৃষ্টি অতিক্রম করে না, কিন্তু যাহারা প্রতিদিন রাজাকে প্রজার অভিযোগের কথা জানাইয়া দেয়; আর প্রতিদিন অর্দ্ধলক্ষ দেশবাসীকে রাজার আদেশ ও উপদেশ—উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয়; আমরা—যাহাদের রাজভক্তিতে অকারণ সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া যাহাদের মনে ব্যথা দেয়, কিন্তু যাহারা রাজাপ্রজার সদ্ভাব-সংস্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিধি-বিধান-কঙ্কর কণ্টকিত পথে কেবল কর্ত্তব্যের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়; আমরা—যাহারা সর্ব্বত্র সমাদৃত হিন, কিন্তু যাহারা দেশের লোককে আপনার করিয়া তাহাদের স্বার্থ—আপনাদের স্বার্থ—, তাহাদের সুখ আপনাদের সুখ—তাহাদের বেদনা,—সেকালে অতি সাধারণভাবে আপনা হইতেই যাহা ঘটিত—একালে তাহার জন্য আলোকমালায় উজ্জ্বল ঐকতান বাদ্যে মুখর, বহুনাগরিকের উৎসাহে প্রদীপ্ত শোভাযাত্রার প্রয়োজন হইয়াছে।*—এমন হয়। নূতন পরিবেশ ব্যক্তিবিশেষকে যেমন নূতন নূতন কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করে—জাতিকেও তেমনি নূতন পন্থা নূতন চিন্তা নূতন কার্য্যের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যাহা স্বভাবের রীতি তাহাতে দোষের কিছু নাই। গত ভাদ্রমাসে যেদিন কলিকাতা টাউন হলে যোদ্ধবঙ্গযুবক-দিগকে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ দান করিয়া বঙ্গেশ্বর আপামর সাধারণের পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন, সেই দিন বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। যোদ্ধযুবকদিগের সেদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল দেখিয়া,কোন সংবাদপত্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। কহিয়াছিলেন—"It was a great demonstration, but would have been more generally successful had it been better *stage managed*" †

১২ সেপ্টেম্বর প্রথম যোদ্ধদল কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। তাহারা সংখ্যায় দশ জন ছিল। সপ্তাহ মধ্যেই দ্বিতীয় দল গঠিত হইয়া ৩২ জন নওসেরা যাত্রা করিয়াছিল।‡ তখন সম্প্রদায় বিশেষ হইতে যে ভাবে সৈন্যদলে লোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া একজন ইংরাজ পরিতাপ করিয়া কহিয়াছিলেন—"recruits were coming in at the rate of only *two-thirds of a man per diem*."* সম্প্রদায়ের যুবক দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতার বিশপ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"কলিকাতা হইতে ২৪০ জনের যাইবার কথাছিল, কিন্তু শুনিতেছি আজিও সে সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। ... ... যদি কেহ একবার কলিকাতার ক্রীড়া

* After the dinner they were garlanded &......The whole party consisting of nearly five hundred people then formed a torchlight procession from......to the station accompanied with band.—The Bengalee. 28. 10. 16.

† The Statesman—7th Sept. 16.

§ The Bengalee—21st Sept. 16.

* The Statesman—Sept. 6. 1916.

ক্ষেত্রগুলির দিকে চাহে, যদি কেহ ফুটবল ম্যাচের স্থানে যায়, অথবা একবার দেখে যে বিভিন্ন আফিস হইতে কত কর্ম্মচারী গৃহাগমন করিতেছে—তাহা হইলে সে কখনই এরূপ বলিতে পারেনা, যে আজ এই কলিকাতা নগরীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী যুবকের অভাব হইয়াছে।" ‡

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা কহিতেছি, তাহাদিগের নানারূপ সুবিধা থাকিতেও যখন এইরূপ উৎসাহ বাণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী যুবকের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শোভাযাত্রার আয়োজনে দোষ আপনাদের বেদনা মনে করিতে না পারিলে, আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। সেই আমরা—যদি দেশের লোকের পক্ষ হইয়া —প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকি, তবে দেশের লোকের হইয়া তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের যদি এই সকলই লক্ষণ হয়। তবে দেখা যাউক কিরূপে তাহারা "দেশের লোককে নূতন আশার ভাবের কথা" শুনাইতেছেন। "বাঙ্গালী" গত ২১।১০।১৬ তারিখে লিখিয়াছেন,—"বে-পর্দ্দা দৃশ্য,—যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় দেখিতেছি, নানা কীর্ত্তিতে স্বনামধন্য হইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি যশোহরের সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকাশ্য সভায় শত সহস্র পুরুষের মধ্যস্থলে নিজের প্রাচীনা মাতাকে উপস্থিত করাইয়াছিলেন—এবার আবার চূড়ান্ত করিয়াছেন। ৺পূজার পূর্ব্বে বেঙ্গল ডবল কোম্পানীর দ্বিতীয় দলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইঁহার পুত্র—কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত অধিক্রম মজুমদার এম, এ, বি, এল, নওশেরা যাত্রার জন্য দলের অন্যান্য সিপাহীর সহিত যখন হাওড়া ষ্টেসনে প্লাটফরমে সমবেত হইয়াছিল,—সেই সময় রায় যদুনাথের স্ত্রী হাওড়ার প্রকাশ্য ষ্টেসন-প্লাটফরমে শত শত দর্শকের সম্মুখে মুখ খুলিয়া উপস্থিত হইয়া নিজের পুত্র এবং অপরাপর সিপাহীগণকে ধানদূর্ব্বাদিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কেবল ইনিই একা নহেন, অটলবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক এক সিপাহীর জননীও এইরূপে মুখ খুলিয়া প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য সিপাহীগণকে ও নিজের সিপাহী পুত্রকে ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সেই "শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও" হাওড়া ষ্টেসনে সিপাহী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন। এই সিপাহীদল লাহোর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে তথায় সরলা দেবী চৌধুরাণী সমাগত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দানের জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কাদম্বিনী বা সরলার পক্ষে সবই খাটে! কিন্তু রায় বাহাদুরের স্ত্রী, আর ব্রাহ্মণ-জননী হিন্দুর পরম পবিত্র অন্তঃপুর প্রথা পদদলিত করিয়া প্রকাশ্যভাবে হাওড়া ষ্টেসনের মত ষ্টেসনের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদের কার্য্য করিলেন কোন্ সমাজনীতি অনুসারে? ইহাতে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং সরলাদেবী চৌধুরাণীতে আর এই মজুমদার পত্নী ও ব্রাহ্মণ জননীতে পার্থক্য রহিল কোথায়? পর্দ্দানশীন হিন্দু বঙ্গনারীকে এই কার্য্য করিতে দেওয়া তাঁহাদের অভিভাবকদের ভদ্রলোকোচিত কার্য্য হয় নাই।"

এইরূপ ভক্তি "নূতন ভাবের" কথা বটে—কিন্তু নূতন আশার কথা নহে। সমাজের সকল দিক হইতেই আমরা বঙ্গনারীকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়া থাকি। এই বর্জ্জন বিধি যে সকল অবস্থাতেই সমর্থন যোগ্য তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি এখনো ইহা না বুঝিয়া থাকেন, যে শুধু আমরাই আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না—নারীশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া শুধু আমরাই আর এযুগে বিশ্বসমাজে উপযুক্ত স্থান পাইবনা—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার

‡ Calcutta was asked to contribute 240 men and I understand the number has not yet been completed...... That there is really no lack of young manhood in the community here in Calcutta to-day, any one can see if he first walks round the playing fields, and watches the football matches or the clerks coming from the offices.

—Speech by Bishop of Calcutta at Commemoration of Founder's day at La Martiniere College.

জাতীয় ইতিহাসের একটী গৌরবমণ্ডিত সূচনাকে উজ্জ্বল করিয়াছে—ভাইদের কৃপাণ ও কামানের মুখে প্রেরণ করিয়া এখন এ বিষয়ে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। অনেক কথার মত অনেকের নিকট ইহা একটী অতি নগণ্য ক্ষুদ্র কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সুপ্ত জাতির নবজাগরণের দিনে—জাগরণের এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত, বঙ্গজননীর এই অনুষ্ঠান বিশ্ববীজের ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও যুগধর্ম্মে বিশ্বের ন্যায় বিরাট। বঙ্গদেশে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকার সংখ্যা অল্প নহে। "বসুমতী" একখানি সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। গত ২৪শে ভাদ্র তারিখে বাঙ্গালী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকের কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করিয়া, আমি নিম্নে সেই সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গালার যুবকগণ, আমরা আজ তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা—বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক; যাহারা মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু দেশের যাহারা মেদ-মজ্জা, সেই দেশের লোককে নূতন আশার ও ভাবের কথা শুনায়; আমরা—যাহাদের রচনা রাজ-পুরুষদিগের সন্দেহশাণিত দৃষ্টি অতিক্রম করে না, কিন্তু যাহারা প্রতিদিন রাজাকে প্রজার অভিযোগের কথা জানাইয়া দেয়; আর প্রতিদিন অর্দ্ধলক্ষ দেশবাসীকে রাজার আদেশ ও উপদেশ—উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয়; আমরা—যাহাদের রাজভক্তিতে অকারণ সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া যাহাদের মনে ব্যথা দেয়, কিন্তু যাহারা রাজাপ্রজার সদ্ভাব-সংস্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিধি-বিধান-কঙ্কর কণ্টকিত পথে কেবল কর্ত্তব্যের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়; আমরা—যাহারা সর্ব্বত্র সমাদৃত হিন, কিন্তু যাহারা দেশের লোককে আপনার করিয়া তাহাদের স্বার্থ—আপনাদের স্বার্থ—, তাহাদের সুখ আপনাদের সুখ—তাহাদের বেদনা,—সেকালে অতি সাধারণভাবে আপনা হইতেই যাহা ঘটিত—একালে তাহার জন্য আলোকমালায় উজ্জ্বল ঐকতান বাদ্যে মুখর, বহুনাগরিকের উৎসাহে প্রদীপ্ত শোভাযাত্রার প্রয়োজন হইয়াছে।*—অমন হয়। নূতন পরিবেশ ব্যক্তিবিশেষকে যেমন নূতন নূতন কর্ম্মে প্রবৃদ্ধ করে—জাতিকেও তেমনি নূতন পন্থা নূতন চিন্তা নূতন কার্য্যের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যাহা স্বভাবের রীতি তাহাতে দোষের কিছু নাই। গত ভাদ্রমাসে যেদিন কলিকাতা টাউন হলে যোদ্ধবঙ্গযুবক-দিগকে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ দান করিয়া 'বঙ্গেশ্বর আপামর সাধারণের পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন, সেই দিন বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। যোদ্ধযুবকদিগের সেদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল দেখিয়া,কোন সংবাদপত্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। কহিয়াছিলেন—"It was a great demonstration, but would have been more generally successful had it been better *stage managed*" †

১২ সেপ্টেম্বর প্রথম যোদ্ধদল কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। তাহারা সংখ্যায় দশ জন ছিল। সপ্তাহ মধ্যেই দ্বিতীয় দল গঠিত হইয়া ৩২ জন নওসেরা যাত্রা করিয়াছিল।‡ তখন সম্প্রদায় বিশেষ হইতে যে ভাবে সৈন্যদলে লোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া একজন ইংরাজ পরিতাপ করিয়া কহিয়াছিলেন—"recruits were coming in at the rate of only *two-thirds of a man per diem.*"* সম্প্রদায়ের যুবক দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতার বিশপ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"কলিকাতা হইতে ২৪০ জনের যাইবার কথাছিল, কিন্তু শুনিতেছি আজিও সে সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। ... ... যদি কেহ একবার কলিকাতার ক্রীড়া

* After the dinner they were garlanded &......The whole party consisting of nearly five hundred people then formed a torchlight procession from......to the station accompanied with band.—The Bengalee. 28. 10. 16.

† The Statesman—7th Sept. 16.

§ The Bengalee—21st Sept. 16.

* The Statesman—Sept. 6. 1916.

ক্ষেত্রগুলির দিকে চাহে, যদি কেহ ফুটবল ম্যাচের স্থানে যায়, অথবা একবার দেখে যে বিভিন্ন আফিস হইতে কত কর্ম্মচারী গৃহাগমন করিতেছে—তাহা হইলে সে কখনই এরূপ বলিতে পারেনা, যে আজ এই কলিকাতা নগরীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী যুবকের অভাব হইয়াছে।" ‡

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা কহিতেছি, তাহাদিগের নানারূপ সুবিধা থাকিতেও যখন এইরূপ উৎসাহ বাণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী যুবকের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শোভাযাত্রার আয়োজনে দোষ আপনাদের বেদনা মনে করিতে না পারিলে, আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। সেই আমরা—যদি দেশের লোকের পক্ষ হইয়া —প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকি, তবে দেশের লোকের হইয়া তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের যদি এই সকলই লক্ষণ হয়। তবে দেখা যাউক কিরূপে তাহারা "দেশের লোককে নূতন আশার ভাবের কথা" শুনাইতেছেন। "বাঙ্গালী" গত ২১।১০।১৬ তারিখে লিখিয়াছেন,—"বে-পর্দ্দা দৃশ্য,—যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় দেখিতেছি, নানা কীর্ত্তিতে স্বনামধন্য হইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি যশোহরের সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকাশ্য সভায় শত সহস্র পুরুষের মধ্যস্থলে নিজের প্রাচীনা মাতাকে উপস্থিত করাইয়াছিলেন—এবার আবার চূড়ান্ত করিয়াছেন। ৺পূজার পূর্ব্বে বেঙ্গল ডবল কোম্পানীর দ্বিতীয় দলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইঁহার পুত্র—কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত অধিক্রম মজুমদার এম, এ, বি, এল, নওশেরা যাত্রার জন্য দলের অন্যান্য সিপাহীর সহিত যখন হাওড়া ষ্টেসনে প্লাটফরমে সমবেত হইয়াছিল,—সেই সময় রায় যদুনাথের স্ত্রী হাওড়ার প্রকাশ্য ষ্টেসন-প্লাটফরমে শত শত দর্শকের সম্মুখে মুখ খুলিয়া উপস্থিত হইয়া নিজের পুত্র এবং অপরাপর সিপাহীগণকে ধানদূর্ব্বাদিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কেবল ইনিই একা নহেন, অটলবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক এক সিপাহীর জননীও এইরূপে মুখ খুলিয়া প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য সিপাহীগণকে ও নিজের সিপাহী পুত্রকে ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সেই "শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও" হাওড়া ষ্টেসনে সিপাহী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন। এই সিপাহীদল লাহোর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে তথায় সরলা দেবী চৌধুরাণী সমাগত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দানের জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কাদম্বিনী বা সরলার পক্ষে সবই খাটে! কিন্তু রায় বাহাদুরের স্ত্রী, আর ব্রাহ্মণ-জননী হিন্দুর পরম পবিত্র অন্তঃপুর প্রথা পদদলিত করিয়া প্রকাশ্যভাবে হাওড়া ষ্টেসনের মত ষ্টেসনের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদের কার্য্য করিলেন কোন্ সমাজনীতি অনুসারে? ইহাতে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং সরলাদেবী চৌধুরাণীতে আর এই মজুমদার পত্নী ও ব্রাহ্মণ জননীতে পার্থক্য রহিল কোথায়? পর্দ্দানশীন হিন্দু বঙ্গনারীকে এই কার্য্য করিতে দেওয়া তাঁহাদের অভিভাবকদের ভদ্রলোকোচিত কার্য্য হয় নাই।"

এইরূপ ভক্তি "নূতন ভাবের" কথা বটে—কিন্তু নূতন আশার কথা নহে। সমাজের সকল দিক হইতেই আমরা বঙ্গনারীকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়া থাকি। এই বর্জ্জন বিধি যে সকল অবস্থাতেই সমর্থন যোগ্য তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি এখনো ইহা না বুঝিয়া থাকেন, যে শুধু আমরাই আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না—নারীশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া শুধু আমরাই আর এযুগে বিশ্বসমাজে উপযুক্ত স্থান পাইবনা—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার

‡ Calcutta was asked to contribute 240 men and I uuderstand the number has not yet been completed...... That there is really no lack of young manhood in the community here in Calcutta to-day, any one can see if he first walks round the playing fields, and watches the football matches or the clerks coming from the offices.

—Speech by Bishop of Calcutta at Commemoration of Founder's day at La Martiniere College.

শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে, তিনি ইতিহাসকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারোন্মোচন কালে সে দিনও আমাদের পরম উদার অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালীর কর্ণে এই মন্ত্রই বাঙ্গালী জাতির উন্নতির মন্ত্র রূপে ধ্বনিত করিয়া কহিয়াছেন—

* সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে বঙ্গেশ্বর বলিয়াছেন—যতদিন বাঙ্গালার নারীসমাজে শিক্ষার শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুরুষের সহায় না হইবে, ততদিন কি সমাজে কি রাজনীতিতে—কোথাও বাঙ্গালী জাতির সম্পূর্ণ উৎকর্ষ লাভের ভরসা নাই। সে সুদিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে বটে, কিন্তু সে পথ এখনই অনেকাংশে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছে; ভবিষ্যবংশীয়ের কষ্টপথ তাই অনেকাংশে সুগম হইবার সম্ভাবনা।

"It is my own conviction, and I find it is the firm conviction of many of the Indian leaders in Bengal that the Bengali people will not attain full social and political development until the women of Bengal are educated to take their place alongside of the men. It may be a long time before this is brought about, but a great deal has already been done and the next generation will, in this matter, start from a much more advanced point than the present one has done."

যে সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন; বীরজনীর এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কোথাও সুব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানিনা; কিন্তু নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে আভাষ একটু আসিতেছে —

"বাঙ্গালী সৈনিকদিগের চতুর্থদলের যাত্রাকালে সৈনিকদিগের মধ্যে দুই জনের মাতা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অবশ্য স্ব স্ব পুত্রকেই আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া ছিলেন; কিন্তু অন্য যুবকগণ তাহাদের Commanders দিগের মাতাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ইহাতে "বেঙ্গলী" বাঙ্গালার স্ত্রী স্বাধীনতার পূর্ব্বসূচনা দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন।"

আমরা যে কতদূর অধঃপাতে গিয়াছি তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। ইণ্ডিয়ান মিরারের এমন দশা দেখিয়া আজ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গগত আত্মাও ক্ষুব্ধ হইতেছে সন্দেহ নাই।

'মিরার' বলেন, বাঙ্গালী পল্টনের হিন্দু সামাজিক প্রথার বিশেষ পরিবর্ত্তন সংশোধিত হইয়াছে। আমরা শুনিলাম, বাঙ্গালী মহিলারা যুবাদিগের শুভযাত্রা কামনা করিয়া তাহাদিগকে মাল্যভূষিত করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি লিখিতেছেন—

"According to the old time notion, the ceremany of garlanding the opposite sex, except in the case of very near relations, would be improper."

অর্থাৎ পুরাতন মতে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষদের ও পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকদের মাল্যদান অশিষ্টতার পরিচায়ক।"

ইহার উত্তরে "বসুমতী" লিখিয়াছেন—মাল্যদান ও মাল্যবদল যে এক নহে—মাল্য যে দেবতার নির্মাল্য রূপে গৃহীত ও সাদরে ভক্তিভরে ব্যবহৃত হয়, একথা হিন্দু সন্তানের অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। হিন্দুর ছেলে 'পরদারেষু মাতৃবৎ' জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহারা বন্ধুর মাতাকে মাতৃজ্ঞানেই প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়াছেন এবং মহিলারাও পুত্রস্থানীয় যুবকদিগকে মাতার মতই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদী মাল্য যুবকদিগের পক্ষে নির্ম্মাল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে কথা লইয়াও যাহারা বিদ্রূপের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না। বা বিকৃত রুচির পরিচায়ক ইঙ্গিত করিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

* The Bengali—17. 11. 16.

এই সকল উক্তি যদি কখনো বাঙ্গালার উক্তি বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে ও জাতির বিলুপ্ত হইবার সময় সন্নিকট হইয়াছে! কারণ মৃত্যু কালেই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে!

মানুষের স্বভাবই এই যে সে নূতন কিছু দেখিলেই ভীত হয়—সন্দেহের চক্ষে তাহাকে দেখে। কিন্তু তাই বলিয়া নূতন যাহা তাহারও কালপূর্ণ হইলে সে দেখা বিরত হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে বীর পুত্রকে বিজয় লাভ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বে শেষবার দর্শন মানসে রবীন্দ্রকুমার রুদ্র নামক সৈনিকদের জননী, এত সম্পাদকীয় মন্তব্য সত্ত্বেও ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত হইতেন না! * যাহারা নূতনের সূচনা দেখিয়া ভবিষ্যৎকে দর্শন করিতে পারেন তাঁহারা বঙ্গরমণীর এই অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়া বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—

Two purdah ladies, mothers of two of the young men blessed all the recruis and one of them garlanded them. The fact that two ladies should have emerged from their seclusion to honour the occasion indicates the unique importance which the ladies in Bengal attach to the recruiting movements and this is *just about as absolute a guarantee as could be asked for that the experiment will succeed*" †

বঙ্গরমণী অসূর্য্যম্পশ্যা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবরোধ প্রথা না মানিয়া বঙ্গীয় সেনাকুলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। ইউরোপীয় রমণীগণ অবরোধ প্রথার মধ্যে নহেন। তাঁহাদের সেই দেহ সেই সময় আপন আপন স্বামী পুত্রকে গৃহ কোণে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়! ইহারই নাম নবীনের আবির্ভাব। এমন যে ঘটিতে পারে কে পূর্ব্বে ইহা বিশ্বাস করিত! কিন্তু ঘটিয়াছে বলিয়াই সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই—

"It is something new in history, however for the women of a community to *encourage* and *even coerce* the men into being shirkers, and it is quite certain that no community can hope to make much progress so long as its women fail in this respect." *

সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া বিজলী বিজন পরিবিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে মন্তব্য রচনা যেরূপ আয়াস হীন উদ্বেগ বিহীন সখের কর্ত্তব্য সম্পাদন- প্রাণাধিক পুত্রকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ সেরূপ নহে! করতালি চঞ্চল বক্তৃতা মঞ্চ হইতে অনায়াসেই পরের ছেলেকে যুদ্ধে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারা যায়—কিন্তু নিজের ছেলেকে স্বহস্তে বরণ করিয়া বিদায় দিতে হইলে যেরূপ বৃহত্তর প্রাণের পরিচয় দিতে হয় তাহার জন্য এখন বাঙ্গালার নবীন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা স্বহস্তে আপন আপন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া সেই শোণিতসিক্তহস্তে বাঙ্গালীর ললাটে গৌরব তিলকদান করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী জাতির নমস্য-তাঁহারা বিশ্বত কুখ্যাত অধুনা দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতির পরমপূজনীয়।

স্নেহ কাহারও ধার ধারে না—স্নেহ কোনো সম্পাদকেরই মন্তব্যকে স্বীকার করিয়া লয় না। বাঙ্গালীর এই পরীক্ষার দিনে মাতৃস্নেহ যদি হাবড়া ষ্টেশনের প্লাটফরম পর্য্যন্ত ও পুত্রের অনুগমন করিয়া থাকে—যদি সেখানেও নয়ন আসারে সিক্ত করিয়া বীরপুত্রকে আশীর্ব্বাদের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত করিয়া থাকে—তাহাতে হিন্দু সমাজের ক্ষোভ করিবার কিছু নাই,—গৌরব করিবার অনেক আছে। ইহা খেলার যুদ্ধে সখের সৈনিকের বিদায় যাত্রা নহে—ইহা মরণ যজ্ঞের যুক্তবেদীর উপর নিষ্কাম আহুতি। ইহা অধুনা ব্রত কথায় পর্য্যবসিত বীর বাঙ্গালীর গৌরব কাহিনী নহে—ব্রত ধারিণীর যজ্ঞাসমাপন। ইহাকে শিরোধার্য্য না করিয়া উপায় নাই—ইহার দীক্ষা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—ইহার মন্ত্র বাঙ্গালার প্রতি জননীর কর্ণ কুহরে যখন ভেরীনাদের ন্যায় বাজিয়া উঠিবে, সেই দিন বাঙ্গালীর

* The Bengalee—12-4-16.
† The Statesman—26-9-16.

* The statesman—6-9-16.
† The Bengalee—24-11-16.

কলঙ্ক কালিমা বিদূরিত হইবে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী সমাজে নূতন ভাবের নবীন বন্যা—নবীন আশার প্রথম উষালোক পুনরাবদ্ধ বিস্মৃত নারীব্রতের উজ্জ্বল দীপ শিখা। যে কর্ত্তব্য পালনের মহদুদ্দেশ্যে বঙ্গনারী হিন্দু সমাজের অবরোধ প্রথাকে না মানিয়া কালীঘাট, বারানসী বা পুরুষোত্তম গমন করেন, লাঙ্গলবন্দে ত্রিবেণীতে বা গঙ্গাসাগরে গমন করেন ইহাও বঙ্গনারীর সেইরূপ কর্ত্তব্য পালনের অপর একটী দিক--তাহা কামনা বর্জ্জিত ও আকাঙ্ক্ষা বিরহিত বলিয়া গৌরব মণ্ডিত ত্যাগের দ্বারা মহৎ—তাহা নারীহৃদয়ের দৌর্ব্বল্য অকলুষিত বলিয়া সম্পূজিত তাহা মাতৃস্নেহে পরিশুদ্ধ নারী এখানে মহাশক্তি। কে তাঁহার পূজা করিবে না?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

Regtd. No. C. 746.

VOL. 6. No. 8 & 9.

NOV. & DEC., 1916.

BANGIYA SAHITYA PARISHAT LIBRARY.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

REGINUS

To sufferers from bodily fatigue, nervous prostration, loss of memory, energy and manly spirit, constipation, loss of appetite sleeplessness, and other troubles, Reginus acts like magic. Bot. Re. 1 each.

DIABETES—the troublesome symptoms are quickly relieved. Excessive urination with discharges of Saccharine matter, high specific gravity, and all other troubles, are successfully combated. Bot Rs. 3 each.

ASTHMA—with dry cough, hard breathing, with sticky phlegm, tightness of chest, heavy perspiration, sleepless night, periodical fits, etc. Cured completely with our specific remedy. Bot. Rs. 5 each.

Ranaghat Chemical Works,
Ranaghat, Bengal.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Raad, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
J. G. Cumming, C. S. I.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C,S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
J. C. Kydd, M.A.
W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
T. T. Williams M.A., B.Sc.
Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M.A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M. A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P.. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
" Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra.
Jaladhar Sen.
Jagadananda Roy
Benoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

Indian Art Ideals ...	... Hemendra Prasad Ghose B. A. ...	223
An Introduction to the study of Archaeology ...	... Monmohan Ganguly B. E. ...	229
Indian Student Sketches ...	... Thos. F. O'Donnell ...	238
The "Indian Scientific Wizard" ...	... ...	246
The Guns	... D. G. D.	259

সূচী।

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
১। কাব্যে মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র	শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ	২১১
২। রঙ্গপুরের আত্ম-নিবেদন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, ...	২২১
৩। সাংখ্যদর্শনে ক্রমবিকাশ-বাদ	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বিদ্যানিধি	২২২
৪। একবিন্দু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুপচন্দ্র দে	২২৭
৫। অজ্ঞাত-পদকর্ত্তৃগণ	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ	২২৭
৬। পল্লীবন্দনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	২৩৪
৭। বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর তিন দিনের প্রবাস	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সরকার	২৩৫
৮। বঙ্কিম প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস	২৪৬
৯। অন্ধ বিশ্বাস	শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সরকার	২৫১

BANGIYA SAHITYA PARISHAD

THE DACCA REVIEW.

Vol. VI. | NOVEMBER, 1916. | No. 8. 9,

INDIAN ART IDEAL.

The building of a new capital for British India has been the occasion of a controversy over the adoption of the Indian style of architecture. While one section advances the cause of Indian art and another ridicules the idea of adopting Indian art ideals for a capital of British India—both seem to have lost sight of the significant fact that Indian art does not mean a particular style of architecture or a particular form of decoration. Consequently the controversy assumes the character of a purely academic discussion while the engineer and the architect proceed with their plans and estimates unmindful of the clamour of contending interests.

"Art at second hand"—as Sir George Birdwood expresses it,—"is already art in its decay: while nothing serves to maintain its perennial spontaneity and purity like the inspiration which comes of the contemplation of the best examples of foreign art."* And the strength of Indian art lies in its adaptability. As the influences which affect the arts of a country are always most satisfactorily traced in its architecture a study of Indian architecture convinces the art student of the power of assimilation possessed by Indian art. "Indian art has borrowed freely from Turanian, Dravidian, Greek, Sassanian, Mongol and European sources. It might indeed be plausibly argued that there is nothing original in Indian art, nor anything older in its minor arts than the sixteenth century, when the Mongol empire was established by Baber. But the assimilative power of the Hindus is as remarkable as their receptive power, and in the hands of their hereditary craftsmen everything they copy in time assumes the distinctive expression of Indian art. This is really owing to the homogeneous unity

* *Industrial Arts of India.*

given to the immense mixed population of India by the Code of Manu. It is a population of literally 'teeming millions' nearly all of one way of life and thought, and everything brought into contact with it is at length subdued to its predominant nature"* : whatever India touches with her magic wand she makes her own. But she never hesitates to touch the art ideals of other countries. On the other hand she has always exhibited an eagerness to cross the borderline between her art ideals and art ideals foreign to her. And her excursions into other people's provinces have always been undertaken with a view to the annexation of the richest and most fertile acres. We may admire the Ajanta paintings, the Bhubaneswar sculpture and the Budha Gaya architecture; but we must not think that they are the only examples of Indian art worth imitating or will suit the requirements of our times. Indeed they may now seem to be crude performances which do credit to the "long forgotten people" who finished them with infinite care.

We certainly advocate the cause of Indian art. But we must not lose sight of the fact that it is impossible to revise the art ideal of one age in another. Art, like literature, must conform to the taste of those who can pay for it. And art which does not receive the patronage of the upper clases who can appreciate and pay for it cannot be kept alive. This is why Indian art is in a stage of decay. The taste of the upper classes has been vitiated as much by want of culture as by the example of buildings stamped with official approval. Considered as temporary makeshifts for the deposit of departmental returns the Government buildings might pass uncriticized. "But"—as Mr. Growse puts it—"unfortunately the people of the country will not regard them from this purely utilitarian point of view. The Government is omnipotent, and if it chooses to lodge its servants at equal cost in sheds and godowns instead of in courts and places, it must not be from want of thought or skill, but because it deliberately prefers the shed and godown style of architecture. The latter style is therefore, the style which loyal subjects are bound to adopt if they would be in harmony with their rulers." This state of affairs is our only excuse for asking the Government to adopt—as far as possible—the Indian style of architecture in its buildings. But we cannot and must not expect a revival of the ancient art ideals of India. What we should expect is the application of Indian art to suit modern requirements.

Art ideals must change with changing times, and conform to environments. Art is the minister of beauty and a work of art is an object skilfully made. But such objects must give pleasure to

* Birdwood—*Industrial Arts of India.*

others or they will not be appreciated and will ultimately be abandoned. "No great painter ever painted a picture for the purpose of living in delighted contemplation of his own finished work, no sculptor would care to spend his life in a gallery of his own statues. Painters and sculptors must work for others. Dimly in the background of their mind, throughout their work, they must have some ideal recipient in view —an ideal recipient, the counterpart of themselves, capable of fully perceiving the beauty it is their aim to render, capable of thrilling responsive to the thrill of conception that they themselves experienced.*" What is true of the painter and the sculptor is true of all artists in whatever department of art it may be their lot to work.

How a change of style in art follows a change of ideas in society will be apparent from the change in the schools of painting before and after the Restoration in England. "When we alternately look at the works of the court painters of Charles I, and Charles II, and pass from the noble portraits of Van Dyck to the figures of Lely, the fall is sudden and we light on a bagnio. Instead of the proud and dignified lords, at once cavaliers and courtiers, instead of those fine yet simple ladies who look at the sametime princesses and modest maidens, instead of that generous and heroic company, elegant and resplendent, in whom the spirit of the Renaissance yet survived, but who already displayed the refinement of the of the modern age, we are confronted by perilous and importunate courtesans, with an expression either vile or harsh, incapable of shame or remorse."

It has been so in every age—in every country. During the time of Queen Anne the commonplace was gaining ground in every department of English activity. Looking at literature we find that the authors "comprehend only one kind of beauty; they establish only the precept which may produce it; they re-write, translate, and disfigure on its pattern, the great works of other ages; they carry it into all the different kinds of literature, and succeed or fail in them according as it is adapted to them or not. The sway of this style is so absolute, that it is imposed on the greatest, and condemns them to impotence when they would apply it beyond its domain."* And "in art as in politics the end of the reign of Anne completes a change long in progress from the ideal to the convenient. As in affairs of state the material interests of the country gentleman and of the trader took the place of the great causes which called out the enthusiasm of Cavalier and Roundhead in the Civil War, so in art painting became a mode of perpetuating the features of those who were rich enough to pay for having their portraits taken; and architecture, which had long forgotten the

* Conway—Domain of Art.

* Taine—*History of English Literature.*

life and beauty of the mediæval churches, was losing even the stateliness which Sir Christopher Wren gave to such buildings as the new St. Paul's and Greenwich Hospital. Even Wren could not give much of this high quality to steeples such as those of St. Bride's, Fleet Street, because the horizontal lines of an architecture derived from the Greeks through the Romans are unsuited to the soaring motive of a mediæval spire; nor could his domestic buildings, such as those at Hampton Court, altogether overcome the necessity of making the inmates comfortable at the expense of architectural beauty. His successor, Vanbrugh, in building Blenheim palace, sought out combinations neither graceful nor dignified in the hope of thereby avoiding that which was merely commonplace; but on the whole it was the commonplace which was gaining ground, and which ultimately pervaded the domestic buildings raised during the greater part of the eighteenth century."* When we gaze at the tawdriness and eccentricity of the palaces of Oudh and the tombs of Junagad into which the architecture of Shah Jehan tumbled over we cannot help thinking that they are only typical of a gorgeous reign which rose to sudden splendour only to drop down as suddenly. They remind us of a plant in a hothouse, that runs violently to redundant blossom, and bear the germs of swift decay in the very splendour of its buds.

It is interesting to follow the ramifications of the Hellenistic Schools and observe how in the hands of peoples of different characters, dwelling in widely separated regions, the Hellenistic tradition gave birth to all sorts of artistic offspring; in north-west India producing the Gandhara School of Sculpture, at the command of Buddhist priests; in Persia transformed into a totally different style; in Rome and all parts of the Western World otherwise modified."* And from these descendants of the Hellenistic school "there arose in a later artistic generation the Byzantine, Romanesque, and Musalman styles; each of them conditioned by the civilizations, the racial peculiarities of the people and the climates and natural resources of the countries of their birth."†

The meeting of two different ideals has often produced curious results in modifying the old or developing some new art ideal. In the East Buddhism seized upon the technical processes of the Greeks and "applied them to new purposes, thereby producing a new artistic ideal, which spread away to China, thence to Japan, and has endured to our own day." The Moslems brought to the country they conquered their own

* Gardiner—*History of England.*

* Conway—"Domain of Art",
† Ibid,

ideal. But when they came into the country India already had her own art ideal. And the art of the two people mixed and mingled to produce the Indo-Saracenic school whose achievements are still gazed at with wonder and admiration by art critics. "The most signal achievement of the French genius in art has been the creation of Gothic architecture; and, as the President of the Royal Academy reminded its students some years ago, the cradle of that architecture was the Royal Domain of Central France, a region in which the Celtic blood of the Cymri was mingled with the Latin element derived from the Romans, and with the Teutonic element furnished by the Franks. giving birth to that Gothic style which blends freedom with self-restraint, audacity with prudence, and science with emotion.*

It is easy to understand how the racial peculiarities of a people influence their art. These are Goethe's words, speaking of Greek art and literature—"Clearness of vision, cheerfulness of acceptance, easy grace of expression, are the qualities which delight us; and now, when we affirm that we find all these in the genuine Grecian works, achieved in the noblest material, the best proportioned form, with certainty and completeness of execution, we shall be understood if we always refer to them as a basis and a standard." And Greek art—as Professor Jebb has put it—"had sprung from a free, cheerful life, open to all the bright impressions of external nature, a life warmed by frank human sympathies, and lit up with fancy controlled by reason." No wonder the Greek artist, even in portraying passion, was mindful of balance, and placed certain limits upon the expression of individual character. The racial peculiarities of the Hindus had similarly influenced their art. And their art which embodied abstract conceptions or mystic dogmas in artistic work was always making an effort of symbolism.

The natural resources of a country play an important part in shaping or modifying its art ideal. "But for the quarries of the Aegean coasts, the school of Pheidias could not have arisen; the Parthenon could not even have been designed. * * * The Gothic architecture and sculpture of France were likewise in part the result of the admirable sandstone provided by Nature upon the spot. If the local rock had been marble, Cathedrals like those of Paris, Amiens, Rheims, and Chartres would never have arisen. There would have been cathedrals, no doubt, embellished with carved decoration, but the style of French mediæval architecture and sculpture would have been very different from what it actually was. Even a completed architectural style, removed from another country and built in a new material, thereby undergoes

* Professor Jebb on the Influence of the Greek mind on modern life—*in Aspects of Modern Study.*

change. Take for example the Cathedral of Trondhjem in Norway. The bluish soapstone from local quarries, which cuts almost like cheese, made its own qualities felt in every detail of the decoration. The English-Gothic style, which was the architect's model, was thus changed into something new, and endowed with a local significance."*

The desire to secure permanency must have been one of the reasons why stone was used in the temples of Orissa. But there was another reason. "The rare occurrence of bricks is due to the unsuitableness of the local earth for brick-making ; the earth of the locality generally contains an excess of silica and an insufficient proportion of alumina ; the bricks are necessarily brittle and soft."†

The natural resources of Bengal have left an indelible mark on the architecture of the province. In describing the temple at Kantanagar (Dinajpore) Fergusson wrote—"The exceptional style is that which grew up in Bengal proper on the relaxation of the Mahomedan severity of religious intolerance, and is practised generally in the province at the present day. It may have existed earlier, but no examples are known, and it is consequently impossible to feel sure about this. Its leading characteristic is the bent cornice, copied from the bamboo huts of the natives. To understand this, it may be as well to explain that the roofs of all the huts in Bengal are formed of two rectangular frames of bamboos, perfectly rectangular and flat when formed, but when lifted from the ground and fitted to the substructure they are bent so that the elasticity of the bamboo, resisting the flexure, keeps all the fastenings in a state of tension, which makes a singularly firm roof out of very frail materials. It is the only instance I know of elasticity being employed in building, but is so singularly successful in attaining the the desired end, and is so common, that we can hardly wonder when the Bengalis turned their attention to more permanent modes of building they have copied this one. It is nearly certain that it was employed for the same purposes before the Mahomeden sovereignty, as it is found in all the mosques at Gour and Malda."* In another place the same authority remarked—"The Bengalis, taking advantage of the elasticity of the bamboo, universally employ in their dwellings a curvilinear form of roof.†

Such are the influences which shape or modify the arts of one period which are but different expressions of the same ideal. And it is consequently impossible to revise the art ideal of the past in our midst. We often admire

* Conway—*Domain of Art.*

† Mano Mohan Ganguly- *Orissa.*

* *Indian and Eastern Architecture.*

† *Ibid.*

the art ideals of the past. "The glamour of the fame of Greece is liable to distort the vision of any save the most temperate in the presence of a genuine work of an artist of ancient Greece. Hence the exaggerated praise that has been bestowed upon Greek vases and Athenian tombstones." We are witnessing a similar tendency in India. This modern movement—while it is doomed to failure in its attempt to revive the art ideals of the past—will certainly do incalculable good if it can make Indians and Europeans remember the fact that architecture and the allied arts in India are still living "with unlimited capabilities of healthy expansion."* Indian art acts by suggestion and inspiration, breathing a grace and power of its own into materials and forms of a different origin. If we all remember this, Indian art will once more revive and blossom forth into something new and suited to the taste and requirements of modern India.

As Goethe said "Let each one be a Grecian in his own way, but let him be one;" so we say, let each one be a patron of Indian art in his own way, but let him be one.

HEMENDRA PRASAD GHOSE.

* F. S. Growse in the *Calcutta Review*, 1884.

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF ARCHAEOLOGY.

There are two tendencies noticeable in our researches. I shall style them, the ultra-scientific and infra-scientific in terms of Optics. The members of the ultra-scientific school reject everything as absurd which is not recorded in a copper-plate, coin or bas-relief. They do not attach the least importance to the ancient literature of the land such as the Ramayana, or the Mahabharata much less to the mythologies, or the traditional histories as the members of the infra-scientific school do. These have their importance in their own way as pieces of circumstantial evidence. I do not find any special claim of any of these two schools to be more scientific than the other. The highly refrangible ultra-violet rays of the spectrum, otherwise called the actinic rays may no doubt display a great chemical activity on the chloride or bromide of silver but they lack in the calorific value and do not come within the range of a highly sensitive thermo-electric apparatus.

There is still another school of Indian Archaeologists whose just claims were advanced by Dr. Fergusson who may be called the chief exponent of the school which may from the analogy of the spectrum be represented by the curve of luminosity. These three schools, again,

had their common exponent in the great Sir Alexander Cunningham and Dr. Rajendra Lal Mitra.

Archaeology as compared with history usually deals with the statical as opposed to the dynamic elements of humanity, but as the statical aggregates have on many occasions been disturbed by the dynamic elements of society, the former have very often assumed a complex character. These statical elements when encountered by dynamic ones are in a state of disturbance, or flux and are said to be transitional; and they continue in this state till they reach a different one and are restored to a state of equillibrium again. The "vis viva," or the kinetic energy of the dynamic elements renders them difficult of manipulation, or rather perverse in character so as to render them impossible for the purpose of scientific treatment.

"The ground of empiricism on which" Schopenhauer "noticed the historian to creep along" was urged by the German Philosopher as a truism most fatal to the attempt of historians like the author of the History of Civilisation in England.

The charge of empiricism is also brought against archaeological investigations, but this charge loses much of its force when we consider that the science of Chemistry inspite of its theories contains a vast mass of empirical knowlege. No theory avails in accounting for the various allotropic modifications of many of the elements found in nature; any branch of science such as Meteorology which deals with coefficients that cannot be accounted for is empirical in character to a considerable extent. The science of Hydraulics is empirical; those who have gone through the experiments conducted by Neville or Bazin will see that the results arrived at are in many cases as disconnected as those of a practical archaeologist; but do not the results establish a connection among facts placed under similar conditions, or among similar groups of facts? And it is here that the claim of Hydraulics, or Archaeology as a branch of science rests. Is not this knowledge systematized and as such does it not form a branch of science accordingly?

The aim of every branch of Science would be to detect a sequence, a continuity in the manifestation of a series of phenomena; if we notice a break in the continuity we must ascribe it to some cause that is yet to be discovered. Applied Archaeology has supplied the missing links on many occasions by supplementing the labours of Ethnography and Philology. The Pelasgic influence noticeable in the arts of Athens as contrasted with the Lacaedemonian State betrays a thorough admixture of the Turanian blood with the Aryan one; and if we conduct our researches still further we find two older forms of civilisation, the Egyptian and the Assyrian, from which the Hellenistic form has drawn much inspiration. There is no written record in support of this theory, but a glance at the Proto-Doric Pillars

of the tomb at Beni-Hassan, the volutes of the Pillars noted in the sculpture of Khorasabad and Koyunjik, the bell-shaped capitals of the pillars of the valley of the Nile would at once confirm this view. If we examine the Pillars of the Tower of Winds, a nice, elegant structure of Athens, we notice a clear reminiscence of the Egyptian type. A study of the Chinese Tha rising in many storeys reminds us of the Indian tope. The Pae-Lus, or the triumphal gate-ways characteristic of the Chinese bear an indelible impress of the Sanchi gate-ways. Thus we see India supplied many architectural models to China and hence to Japan. Applied Archaeology thus furnishes a sure key to unravel the mysteries of the hoary past wrapped up in obscurity. Again, by the reverse application of this method similar to the reversible chemical reaction, the Archaeologists by their study of Persian Architecture of the time of the Achaemenian kings, the tomb of Darius at Nakash-i-Rustum, the Chehil Minar, or the Great Hall of Xeres have fixed some of the details of the parent stock, flourishing in the valley of the Euphrates thus establishing a close affinity, a kinship between Nineveh and Persepolis.

The application of this method furnishes a surer key in case of a heterogeneous as compared with the homogeneous, self-contained type.

In a heterogeneous type, or a mixture of several types, its very constitution betrays itself, for it follows the natural law of reverting to one or other of the several types, it is composed of. This helps the research to a considerable extent in detecting the missing link, but in a comparatively homogeneous and self-contained type, such as the Egyptian, Assyrian, Indian, Chinese, the Archaeologist finds no way out of the tangle of historic isolation and in his vain endeavour to get out of this confusion propounds certain theories which have no sufficient data to justify them, which instead of solving the difficult and obscure questions, make them more elusive by lighting fires wihch may prove merely "Will-o'-the Wisps;" but the effect of these theories is positively mischievous. However we may try to rise superior to the vitiating influence of these theories we find the old leaven still clinging about our tongues.

Archaeology is not usually given its share of attention that is its due, as it is accused not without reason of indulging at times in the wildest generalities; another reason of its unpopularity is that it is invariably associated with scholarship which often degenerates into pedantry, or antiquarian dilettantism.

Since the discovery of the Laws of Evolution and Thermo-Chemistry, it has been found that all the different branches of knowledge are correlated to one another in some way or other, so that one branch of Science supplements the labours of another. An Archaeologist should therefore possess

a thorough general knowledge of the different branches of Science, art, history, etc. before he specialises in his branch.

The following lines by Flinders Petrie, the great Archaeologist, very forcibly express what attainments should be possessed by a student bent on archaeological pursuits:—

"A complete Archaeological training would require a full knowledge of history and art, a fair use of languages, and a working familiarity with many sciences."

He further goes on to say:—"Best of all is the combination of the scholar and the Engineer, the man of languages and the man of physics and mathematics, when such can be found."

As an illustration of the above I may take up the Science of Geology, the knowledge of which can be turned to good account in our Archaeological researches; a Geologist can ascertain the period in which a certain deposit, or accumulation, say sandy, alluvial, or detrital, may take place in a particular country, having due regard to its meteorological conditions, and when a buried edifice, or a stupa for the matter of that, is exposed, the archaeologist might refer to the geologist for roughly ascertaining the period during which so much accumulation has taken place. This method was followed by Petrie in in his Egyptian researches.

We are now carrying on digging operations at Taxilla, or Pataliputra; the geologist may be of great help in determining the probable period which will confirm as a circumstantial evidence the conclusions of the palaeographist, or numismatist based on their study of the inscriptions, or coins.

By the detection of the mineral palagonite in the variety of stone of which the cannon balls of Pratâpâditya, the illustrious king of Bengal, now preserved in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad were made, it has been ascertained that the Bengali king of the 16th century quarried the Rajmehal hills for the manufacture of those cannon balls.

The knowledge of Physics and Chemistry may help us in detecting the forgeries usually found in the collections of the Bactrian Coins.

The Archaeologist should be a good draughtsman and copyist; for, many of the finds cannot be removed from site and even if removed, they are spoiled irrevocably shortly after they are laid bare, by the removal of the protective covering of deposit or debris. Layard in his Assyrian researches had at first to suffer from his want of experience as a draughtsman; many remains could not accordingly be preserved by copies. The French Government realising the importance of drawing and copying placed an artist of acknowledged skill under Botta in his researches at Khorasabad to draw such parts of the monuments as could not be preserved or removed; but for

the drawings of Col. Mackenzie prepared about a century ago, the splendid carvings on the marble slabs with which the memorable stupa at Amarâvati was carved could not have been made known to the public. Though Photography has partially replaced the tedious process of copying still the importance of the latter cannot be overrated. Again, it is not possible to show some of the intricate details of architectural features by Photography; those who have studied the columns of the Hoysala period prevailing in Mysore will bear me out. We should, however, be very careful not to improve on the originals. The sketches are not meant to show the artistic skill of the copyists but for reproducing faithfully the objects copied. It is for this reason that the otherwise excellent engravings of Texier of the Sassanian period in Persia, have lost much of their value as they are suspected not without reason to be improvements upon the originals.

I might in this connection refer to the incorrect drawings by Daniell of Tirumalla Naik's Choultry at Madura or those of the Pagodas of Mahavallipuram in the monumental History of Art by Dr. Lubke. I have made a careful survey of the above places in Southern India and in doing so was struck by the inaccuracy of the sketches referred to above.

It will not be out of place to refer to the incorrect plan of the Gandhara room given in the supplementary catalogue of the Archaeological Collections of the Indian Museum published after the demise of Dr. Bloch; and I am sorry to state that out of only two plans in this catalogue one is wrong.

Every section, or plan should be drawn to a scale; it is better to adopt a scale which is used generally and not one arbitrarily chosen. A particular plan or section of an architectural specimen must not follow 2 scales to show different parts as we do to show the longitudinal section or gradient of a road, railway or drain. A few places not drawn to scale in Budh Gaya have lowered the value of the monumental work by Dr. Rajendra Lal Mitra.

"An inch of pot-sherd" they say "is worth all Herodotus". Making some allowance for the extravagant language in the above aphorism, we must say, that there is a great truth underlying it. The study of the comprehensive history of Herodotus fails to convey that sense of realisation, or majestic presence as is done by the site of the ruined arches and columns of the old walls of the Acropolis. The excavations of the Acropolis have exposed and laid bare the stratification in the ancient Attic religion and arts. Our knowledge of ancient Athens dating back to the Pelasgic period would not have been what it is to-day, if the Acropolis were not exposed down to the natural rock. We can now make a comparative study of the old Pelasgic fortifications, and the Periclean structures and Propylae that superseded the old gateways.

Architecture with sculpture as symbolical of constructive art has thus a great value for the historian, as it is stamped with an indelible impress indicating the date, purpose and the race introducing it in the scale of civilisation, not to speak of the indirect evidences it affords.

A scientific study of the ancient remains may help us in fixing their chronology. In order to prepare a chronometric scale based on architecture and sculpture we should fall back upon certain known historical events as permanent bench-marks ; we should first ascertain well-authenticated examples of known kings or chiefs.

There is a tendency to standardise the chronometric scale on the supposition that the examples of art or architecture of an age are better than those flourishing in a succeeding one ; nothing can be more mistaken than this. What have these theorists to say about the magnificent temple of the Sun-God at Konarka which succeeded that of Jagannath at Puri indicating a decadence of the Orissan style ? We all know that the temple of Lingaraja at Bhubanesvara which is decidedly superior to that of Jagannath preceded the latter ; we thus see that the three temples noted above reveal, as it were, a chronological sequence which can be best represented mathematically by a graph called the Sine curve ; but there is one danger which a student of archaeology is to guard against ; he should see that the examples of art or architecture which he takes up for elucidating a style are an integral part of the same style, and not an excrescence on the organic system.

We come across brilliant flashes of art in a period of depression and langour. These flashes might be mistaken for the continuity of the same steady light that used to illumine the most obscure and murky corners of the artistic history of a byegone age. We find the Zeus group in the frieze of the battle of the Titans on the altar at Pergamum in an age of the Laocoon and the Dying Gladiator, an age when physical suffering had been so faithfully depicted setting at naught the struggle in the human mind for the ascendency of a moral idea. These erratic artistic expressions, if I am permitted to use the term, are indicative of an approaching death, an ebbing away of an artistic life. Is not the Pergamene School a precursor of the advent of the Roman art and the termination of the Greek School ?

Monuments of handicraft often supply the connecting links found missing in the monuments of architecture and thus help the standardisation of the chronometric scale. Those who have studied Greek sculpture know well that the design of the representation in the pediment of the Parthenon that was destroyed has been recovered from similar designs with which the fictile vases are decorated. Hence the designs represented on such works of art may be studied with advantage as yielding

results of classical and historical importance. These pictures also serve to illustrate the evolution of myths and fables which they represent.

A study of the artistic productions of handicrafts shows different degrees of perfection attained in different. times; for instance, we find a great difference in artistic skill exhibited in the time of the Roman republic and that of the emperors such as Hadrian or Diocletian. It is known to all students of history of what great value are the prize vases in the Pan-Athenian games, the drinking horns of various shapes. the capacious amphorae and craterae, the little figures found in Bœotian tombs at Tanagra showing the effect of "antique polychrome in works of sculpture", and the marble candelabra many of which are preserved in the Galleria de Candelabri of the Vatican. The Cameo-Gonzaga preserved in the imperial collection of St. Petersburg, or that in the Marlborough collection depicting Cupid and Psyche, or the Indo-Saracenic Sardonyx Cameo of the Moghul period preserved in the Lahore Museum are worth study.

The devices stamped on the coins sometimes admit of a chronological classification. This can be best illustated by an observation of the Greek coins, the earliest of which are not found to bear the images of the divinities. We do not find the figures of the gods or the rulers on the earliest coins from Bœotia, Aegina or Ephesus. In place of the heads of the divinities such as Apollo, Artemis, or Pallas, or the rulers such as Alexander or Antiochus we come across the symbols of the tortoise, the bee or the shield. We notice the followlng chronological order in the selection of the devices with which the Greek coins are decorated.

Symbolical—the most ancient.

Religious—ancient up to the Alexandrian period.

Political—Post Alexandrian period.

A great task lying before our archaeologists is the deciphering of the ancient Geography of India. The only work worth mentioning on the subject is the Ancient Geography of India by General Cunningham; the location of the old sites with precision is calculated to facilitate our researches. In order to study the Ancient Geography of India one must study the great epics the Ramayana and the Mahabharata most thoroughly; their commentaries such as that by Ramanuja, or Nilkantha throw a flood of light in this direction; the Puranas form a great storehouse of geographical information.

I should admit here the great difficulty of identifying many old sites mentioned in the Ramayana, or the Mahabharata consequent on the change of the physical aspect of the country brought about by meteorological, seismic and physiographical agencies, but it is not at all an impossible task.

The Ramayana and the Mahabharata fortunately present a connected as compared with isolated, geography of

places which has a great value in the identification of the old sites. By way of illustration I might refer to the four routes described with so much precision in the Ramayana bearing relation to the principal events described therein. The routes may be briefly summarised as follows :—

(1) That by which Rama and Visvamitra journeyed to Mithila.

(2) That by which Bharata came from Girivraja to Ayodhya.

(3) That by which Rama travelled from Ayodhya to Lanka, or Ceylon.

(4) That along which Bhagiratha, the great king brought down Ganga from the Himalayas.

The above routes, if carefully examined, would convey an accurate idea of the geography of India, particularly of its northern part.

A map of India should be prepared noticing the old sites side by side with their modern names. I have prepared one for my own private use and I cannot say of what help it is to me when I have to identify the old sites.

It can very well be imagined what great difficulty a beginner is to experience in the identification of places such as Chola, Pandya, Kerela, etc. ; but if a map with an index on the plan set forth above be available he can at once see that Chola was the place about Tanjore, Pandya was the kingdom whose seat of Government was Madura, and Kerala was the modern Malabar.

Much time of the archaeologist is taken up in coming to a satisfactory conclusion after working his way through a labyrinthine maze of conjectures about the locale of ancient sites. Kiran Subarna, for instance, according to General Cunningham was situated in the district of Singhbhum ; according to Colonel Waddel it was near Burdwan ; according to Mr. Beveridge it was identical with Rangamati in the district of Murshidabad, and according to Dr. Fergusson it was somewhere in the district of Birbhum.

There is no mention of Persepolis, for instance, in the modern treatises on Geography ; so a student of archaeology is lost in confusion and sorely taxed when he comes across the name of Persepolis in ancient Persian history ; but the place becomes familiar to him when he learns that it is identical with the modern Istakr in Persia. I remember very well my difficulty in identifying the Cadusian country before I learnt that it was the low tract south-west of the Caspian belonging to Media rather than to Assyria.

As a student desirous of conducting Chemical researches has to undergo a preliminary training, such as the use of the balance, the preparation of standard substances for analysis, the calibration of measuring vessels, a student of applied archaeology has to submit himself to a similar training qualifying him for the task, he should make extensive tours and inspect the museums in different parts of the country, or else he would

fare badly like a Chemist or a Physicist without a laboratory experience.

What Prof. Sylvain Levi remarked about the collections of Dr. Stein, the great Central Asiatic explorer, should always be borne in mind; no national pride or prejudice should interfere in the working up of a document that an archaeologist may come across. It matters little to him whether Buddha, for instance, was a Persian, or a Scythian; his is a work of careful observation and systematic tabulation.

He must observe the facts and record them in an impartial way; nothing can be more mischievous than the recording of a false fact. It is known how many old coins and copper plates and inscriptions have been forged bringing disgrace upon the whole class of Archaeologists whose just labours are looked down upon with eyes of suspicion and distrust.

I may in this connection refer to the spurious Kushan coins forged by the late Chanda Mall of Rawalpindi whose skill deceived even authorities such as Sir Alexander Cunningham and Sir William Franks.

The forgeries of coins and inscriptions that we come across may be both ancient and modern. Dr. Fleet in his paper on the spurious Sudi plates published in Epigraphia Indica, Vol. III. has given a long list of Ganga copper plates which are ancient forgeries; mention may also be made of the four ancient grants from Faridpur which are all spurious as remarked by Mr. Rakhal Das Banerji in the Journal of the Asiatic Society of Bengal 1914 (Nov. & Dec.).

We should be very careful in gleaning the real truth from inscriptions which are usually couched in extravagant language. An inscription "per se" has very little value in many cases in enabling us to arrive at trustworthy conclusions. It is very difficult to detect the real substratum of fact cropping out here and there below the hard crust of unreliable descriptions. The composers of the "Pracasti" or eulogium are not to be relied upon in many cases, for the patronage of the kings or chiefs whose courts they resorted to naturally led them to travel beyond the bounds of historical accuracy and indulge in imaginative extravagances not consistent with known historical facts. Vachaspati Misra, the great logician and philosopher, the author of Nyaya Nibandhasuchi and Sankhya Tattva Kaumudi even could not free himself from this taint in composing the eulogium for Bhavadeva Bhatta incised on the slab in the temple of Ananta Vasudeva in Orissa.

Later on subsequent additions render the original very complex and I might refer to the inscription on the Manikiala Stone as read by Mr. Pargiter, and described in the Journal of the Royal Asiatic Society in 1904. I have noticed the Jaina inscription on the Tyagada Brahma pillar near the colossal image of Gomatesvara at Sravan Belgola in

Mysore partially defaced and replaced by a few lines recording the brief notice of the local chief Kanna by name who wanted to acquire a cheap immortality "by depriving the world" according to Mr. Rice, "of what was probably a most interesting information regarding the erection of the colossal image."

(To be continued.)

INDIAN STUDENTS SKETCHES.

It was a little after sunset and a goodly number of students were squatting on the little green oval before the New Hostel. They were all talking and laughing together and the excitement in the air was almost tangible. Perhaps a holiday and a Hindu festival had contributed somewhat to bring about that effect, and when the football captain suggested that they should celebrate the festival in a proper manner and have a fire, everyone agreed unanimously and instantaneously. It was just the one thing needed—a means to let off strain, to ease in some way by action the present almost painful nervous pressure.

There can't be smoke without a fire, nor a fire without material, so having decided unanimously that they would have a fire the next point was where they were to get the material. Off they marched in a body to Radheylal—the nervous native Superintendent of the Hostels.

"We want material for a fire," said the students.

"It is not the custom to have a fire", replied the Superintendent.

"But", said the students, "there is no college regulation against it."

"I cannot give you material", said Radheylal, "without the permission of Warden, and he is away."

"We must have a fire ; we must observe our religious customs," shouted the students becoming more and more excited by the opposition.

"I have no order to give you material", said the Superintendent, trying in vain to calm them.

"We'll get the material ourselves", they cried and away they rushed back to the front of the hostel.

Someone mentioned the word "chick" and that gave them a lead. Incidentally the "chicks" before each door were the private property of the students. In a few minutes the "chicks" were stripped from every door and piled in a heap in the centre of the grass plot. A bottle of kerosine oil and a few matches did the rest. Long streaks of flame shot up into the night amids the ringing cheers of the crowd of onlookers. This however was found to be too transient, too evanescent, and they looked about for something more substantial to feed the flames. Four or five wooden tennis-posts near at hand looked inviting and appropriate and many willing hands

weren't long in transferring them from where they stood quietly fixed in the soil to the more stirring and ardent region of the flames. Some old charpoys, broken doors, and disused chairs found by more adventurous spirits at the back of the hostel were hailed as a magnificent offering to the ruddy deity. The fire indeed was composed of a miscellaneous mixture, but the resultant was, to say the least of it, brilliant and the students looked upon their handiwork and shouted and clapped their hands, and thought that it was good.

In the meantime the Principal was enjoying the quiet of his domestic hearth. A few months previously there had been a riot during Mohurram time and a party of Mohammedan rioters attacked one of the hostels. Unfortunately one of the bricks which were flying about promiscuously happened to hit the Principal when he was courageously trying to separate the two parties and as a result of the accident he lost his eye. The shock to his nervous system was naturally considerable, and absolute quiet and rest without any undue excitements were the doctor's orders. Into this peace and quiet arrived a messenger with a brief note :—

SIR,

Most respectfully I beg to bring to your kind notice that the students have burnt a big fire in the New Hostel. I told them not to burn the fire but they did not hear me, and now they are burning it and I humbly ask your orders. Begging to be excused for the trouble,

Yours obediently
Radhey Lal.

Thoughts of strikes aud riots and worse than all, the idea of the New Hostel in flames caused the Principal to rush immediately over to the burning. The excitement amongst the students as well as the force of the fire was by this time almost exhausted and all that the Principal saw on his arrival was a smouldering heap in the middle of a deserted darkness. His first feeling was one of relief that the New Hostel was still intact, but this was quickly succeeded by one of anger. The mere fact that the students had fled to their rooms when he arrived was sufficient proof to him that they knew they had done wrong and were afraid of punishment. It was a premeditated revolt against authority and he determined to put it down with a strong hand. He called the monitors together and threatened rustication and the closing down of the college at the slightest re-appearance of anything like their recent behaviour. For the present he'd suspend judgment. The Warden on his return would fully investigate the matter and on receiving his report, he would proceed to deal severely with the principal offenders.

Here was a nice case for the Warden

to settle, with the students restless, an angry Principal and a Superintendent who was keenly suffering from the pangs of offended dignity.

The Principal when giving his orders to the Warden to investigate the matter produced Radhey Lal's note and related what he saw on arriving at the hostel. He also told the Warden what he thought about the whole affair and intimated that in his opinion strong measures were undoubtedly necessary. The Superintendent Radhey Lal gave minute details about the whole affair, down to the very words actually addressed to him by the students. He made his position absolutely clear. He refused the material and then in the absence of the Warden notified the Principal of the disturbance. He also intimated that he had more or less of a grievance considering the fact that the students had proceeded to light a fire without receiving the material in the orthodox manner. Thus equipped the Warden was prepared to settle the matter with the students.

He summoned a meeting of the monitors at his bungalow, and they all came in with long, serious, more or less sullen faces and sat down in a circle round his desk. They evdiently had their defence prepared, but they were not exactly prepared for what happened.

"Well" said the Warden after a few minutes' anxious silence, "I think it was rather a shame, *you* know, that *you* wanted to set fire to the New Hostel."

"But sir," they all began in a most righteously aggrieved tone of voice, and they got no farther for they looked up and saw the Warden smiling. They laughed in a relieved kind of manner but incidentally their little plan of campaign for the defence was knocked on the head and the Warden was able to start on fresh ground.

"Come, Rameshwar Nath" said he, addressing the senior monitor, "tell me exactly what happened."

"It is in our religion sir," replied Rameshwar Nath, "to have a fire on that day, and so some of the students burnt a fire. They don't think they were doing anything wrong. Then the Principal came over and threatened to rusticate us, and this is very severe because we didn't mean to do any harm."

"You burnt some College property," said the Warden.

"We'll pay the money for that," they said.

"Then *you* offended Mr. Radhey Lal, the Superintendent," said the Warden.

"We'll apologize" they all said.

"And about the Principal?" asked the Warden.

"You are our parent and guardian sir," they said, "and *you* will intercede for us with the Principal."

The Principal allowed himself to be successfully interceded and Radhey Lal graciously accepted the apology, especially as the estimating of the value of burnt property was in his hands, and

he probably got a bit of his own back in that way.

Next day Rameshwar Nath came along to the Warden and said :—

"Sir, some of us have been in the College four or five years and we have no fine recorded against us. It will be very hard on some of us who took no part in the proceedings if the money for the burnt property is collected as a fine. If you let us know the amount we will subscribe it and hand it over to the Superintendent."

The Warden told him the amount of what was a very liberal estimate, and the money was collected and paid within an hour.

No. V.

The Student's Mistake.

Mohan Lal was a first year man, lived in the third Boarding-house, and was the son of a Prime Minister in a Native State. Up to this time he had done pretty much as he liked in school and and he had conceived the idea that he could carry on in the same manner in college. He was intolerant of those whom he considered his social inferiors, and generally domineering in his attitude. His sole reason for being in college was to give him a mild training for an easy post which was waiting for him when he arrived at a suitable age.

Pratap Chandra was also a first year man, lived in the third Boarding-house, and was the son of a head-clerk who probably received as salary a monthly stipend of thirty rupees or thereabouts. He was a student meek, mild and industrious, and his ambition was to get his degree as quickly as possible and thus satisfy the expenditure of his parents by increasing his market value.

The Warden knew very little about either, as they had been in the College only a few months, except that as both attended his lectures he knew Mohan Lal to be intelligent but lazy and indifferent, whereas Protap Chandra was industrious, painstaking and attentive. Consequently when the latter came to lodge a complaint against Mohan Lal, the Warden was more or less inclined to be prejudiced in his favour.

"Sir," said Protap Chandra as soon as he was seated in the Warden's study, "I wouldn't have come to trouble you only for Mohan Lal insulted my guests. He is always annoying me and calling me hard names, and using abusive lauguage towards me from the beginning." "Why didn't you report him before?" asked the Warden.

"I spoke to the monitor about him, sir," said Protab Chandra, "but he wasn't mindful of what the monitor told him, and then I reported him to the Superintendent but he wasn't mindful of the Superintendent either." .

"Well," said the Warden, "why does he annoy you?"

"I can't say, sir," replied Protab Chandra, "I have never done anything to him and I never reply to him when he uses insulting language towards me."

"What insulting language does he use?" asked the Warden.

"I am ashamed to say, sir," was the reply, "but he despises me because I am poor and he is rich."

"Tell me how he insulted your guests," said the Warden.

"I had two friends," Protap Chandra answered, "staying with me in my room, and Mohan Lal came into the room and made joking and insulting remarks about them out loud. And it is a 'great disgrace upon me to have my guests insulted."

"Very well," said the Warden, "I'll look into the matter, and the next time you have cause to complain, come and report to me immediately."

The monitor admitted that Mohan Lal was causing a certain amount of trouble in the Boarding-house, and hadn't any excuse to offer why he didn't report him. The Superintendent said that he was intending to report him if he didn't improve. The Warden next interviewed Mohan Lal. The interview was short and one-sided.

"You have been reported to me," said the Worden, "as causing a certain amount of disturbance in the Boarding-house, and also disobeying the monitor and the Superintendent. As you are a new student I simply wish on this occasion to point out to you the seriousness of the faults you have committed. A repetition of such faults will have very grave consequences and you are to take this as a formal caution."

The Warden cut him short as he began to make excuses and try to defend himself. He told him politely he had his permission to depart. In most cases a formal caution is more than sufficient to bring a recalcitrant student to order, and the Warden expected that he for wouldn't hear much of Mohan Lal for some time at least. To his great surprise Pratap Chandra came along the very next day :—

"Sir," said he, "I wouldn't trouble you again so soon, but you ordered me to come to you immediately if Mohan Lal annoyed me. Last night before several other students he called me hard names and threatened me if I told again to the Warden."

"Very well," said the Warden, "you won't be troubled any more."

When Mohan Lal received the order to leave the Boarding-house, he was surprised, but then he thought he would be easily able to settle the matter. He did not bother about leaving immediately. When he found however that he was fined a Rupee for every day he remained in the Boarding-house after he received the order, he thought it better to leave. The next item was a deputation of some senior students to the Warden asking him to reconsider his decision. This of course was engineered by Mohan Lal :—

"It is a great disgrace," they said, "to be expelled from the Boarding-house. The rest of the students will think that Mohan Lal was removed for some very

bad reason, and his whole career will be ruined. Besides Mohan Lal is willing to pay any fine you may wish."

"I'm afraid," said the Warden, "I cannot alter my decision. Mohan Lal has disobeyed the Monitor, the Superintendent and the Warden. For any of these three offences he has rendered himself liable to expulsion. Moreover he got his chance, for he was formally cautioned. By repeating the same offence so soon after the formal caution he actually compelled me to remove him. I am willing however if he so desires it, to put up on the public notice-board the real reason of his expulsion. The students then can't make any mistake or labour under any misapprehension."

Finally Mohan Lal got his father to wire to the Principal and to send along two emissaries to have him reinstated. The Principal referred both the telegram and the emissaries when they arrived to the Warden.

"Owing to the fact," they began, "that Mohan Lal's father is a Prime Minister, and that his expulsion from the Boarding-house will be looked npon as a great disgrace, some special consideration might be shown."

"Owing to the fact," replied the Warden, "that all students are treated alike irrespective of their parentage, I can't see any reason for special treatment in this particular case."

"Is his expulsion permanent ?" was the next question.

"Permanent for this year," replied the Warden. "If Mohan Lal wishes to apply for admission to the Boarding-house next year, his application will be considered with the others."

Mohan Lal did apply the following year and was duly admitted. One notable lesson had been taught him, namely, obedience to legitimate authority. Other lessons he also learnt during his various terms, and he profited by them so well that in his final year the Warden considered him a fit and proper person to be appointed Monitor of the Boarding-house from which he had once been removed.

VI.

No. 36.

"Sir, Sham Lal, room No. 36 is very ill. Will you please send for the Civil Surgeon ?"

"What's the matter ?" asked the Warden.

"He is lying on his bed, and he is speaking nonsensical things and now he is unconscious," said the monitor of the northern wing of the New Hostel where Sham Lal lived.

"How long has he been ill ?" asked the Warden.

"I don't know sir," replied the monitor. He keeps by himself and goes with no one. He wasn't at lectures to-day or yesterday, and I went to his room to see what was the matter and then came over to you."

"I'll come along and see him," said the Warden and they started off for Sham Lal's room.

When they came to No. 36 they found a chair, a table, a bed and Sham Lal. The room somehow seemed barer than if it contained nothing. On the table were a few books, an earthenware ink-pot and a broken pen. A small battered tin trunk was more than half hidden away beneath the charpoy. Shiam Lal was stretched out at full length, half covered with a tattered resai. He was wonderfully thin, almost emaciated. His eyes were wide open and scintillated in the slightly darkened room. Now and again he spoke and his gestures though rapid were graceful. He didn't notice the Warden's entrance. For the time being he was past noticing anything. Then he began to talk again and this time more continuously. The Warden listened carefully and after a little while succeeded in following what he said:—

At last I understand. It puzzled me for a long time. Of course there is no such thing as day and night. The sun is the father and lights and warms every thing with his energy. The moon is the mother and the dancing stars are the merry children. She keeps one eye on her lord as he sleeps, and the other on her playful children. And the sun is constantly working to nourish all his little ones. He receives each spirit as it departs from its earthly body, and if it has not been debased by its sojourn on earth, then it provides beautiful refreshment for the little ones, and they all become brighter and more cheerful. But if it has had the misfortune to become debased during its sojourn on the earth, then the little ones go a-hungry and become thin and dull."

Just then the Civil Surgeon arrived and proceeded to examine him. After a most searching examination he couldn't find anything redically wrong with Mohan Lal. No one could answer all the questions he wanted to ask, so he had nothing to do but administer a soothing draught and wait until the patient recovered consciousness. When he did eventually recover the doctor found that he was almost in a complete state of exhaustion from want of proper nourishment. As a matter of fact he was on the verge of starvation. He lived such a quiet unobtrusive life that no one seemed to know anything about him or how he passed his time. When the students found out what was really the matter, they immediately subscribed more than enough to keep him for the remainder of the term.

The Warden determined to win Shiam Lal's confidence, but he found it a difficult task, until one day he offered him some books. The boy's face lit up with so much pleasure, that the Warden then and there brought him along to his study and allowed him to play about among his book-shelves. He lost all his shyness and talked and asked question after question. All his interest was in poetry and volume after volume he got through with surprising rapidity. Scott merely

amused him, and he scarcely knew enough of the English Language to appreciate to the fullest extent the music of Swinburne and Tennyson. Shelley seemed to be his favourite until one day the Warden with a certain amount of misgiving handed him a small volume of "Leaves of Grass." This delighted him beyond measure, and he spoke ever so eloquently in its praise. Its effect was exhilarating and whenever he felt depressed and out of sorts he never failed to find relief in the little volume. During all this time which spread over months the talk between the two had been mostly impersonal, but the boy had a most sympathetic nature and was greatly affected by kindness. Consequently when the Warden asked him one day about his future prospects and what he meant to do, the boy answered openly and freely for he felt he had met a friend.

"I mean to learn as much as I can in college," he said, "and then perhaps I can get something to do in teaching."

"But what about your parents?" said the Warden, "Don't they wish you to follow any special calling?"

He was silent for a time and at last answered in a wistful manner :—

"Sir, I have no parents or relations."

The Warden was naturally surprised for that is not the usual complaint with Indian students who seem to be blessed with innumerable and most obliging relations, for they always get dangerously ill or die or get married at the most convenient times. He didn't wish to pursue the matter any further, but of his own will Shiam Lal continued :—

"I remember being in a Mission school long long ago. They told me that my parents were dead and that this was to be my home until I was able to do something for myself. They were very kind to me. They taught me their religion but their god seemed to me too small. He seemed to devote all his attention to this earth and then only to a small portion of it. And there was confusion too. At one time he seemed to be definite and clear and at another very vague. And there seemed to be too many rules to be learnt. People learnt the rules and forgot about the real god. And they said that their god was the only god and that can't be right because God is every thing and their god is only a small point of him.

I studied very hard there and got a government scholarship which enabled me to come here. I had no money but the scholarship. This wasn't sufficient to buy my food so I had to do some tuition work as well. Then for a time I couldn't get any work, and I had to do with very little food for days. So I got ill and when I recovered the students gave me sufficient money for my food. I am happy now because I can read and think."

"Do you think a lot? asked the Warden.

"Yes" said the boy, "at night time especially when everything is quiet all kinds of thoughts come into my head and the time pases ever so quickly."

"Do you ever put any of these thoughts on paper?" said the Warden.

"I always try to," he replied, "but I can never put down exactly what I think. I can't find words with the proper meanings."

"Would you have any objection to showing me your attempts?" said the Warden.

"I'll bring them along to-morrow, sir," he said.

The next day the Warden received from Shiam Lal an untidy bundle of loose sheets of paper of all sorts and sizes. Back and front were alike covered over with extraordinarily neat Hindi characters. The Warden got permission to keep them for some days and immediately sent them off to a friend of his who was an authority in these matters. The answer came back in a very short time :—

"........you have had a real find. These effusions are evidently belonging to some hitherto undiscovered poet. The ideas are beautiful, but the crude expression points either to some very early date or to a lack of vocabulary due to incomplete education."

The Warden was delighted and brought Shiam Lal to the notice of a literary Raja, who willingly made the future career of Shiam Lal his special care. But the untidy bundle of loose sheets of paper was destined to be all the work of Shiam Lal, for he died during the following vacation.

THOS. F. O'DONNELL.

THE "INDIAN SCIENTIFIC WIZARD."

What Plants Feel.

With each advance in biology it has become increasingly difficult to frame a definition of an animal that would not also be a definition of a plant. The least organized plant is indistinguishable from an animal. Even in the higher forms, the resemblance between the two is close. Where there is a purposive structure or a perceptive organ in an animal, you will find something to correspond with it in a plant. If it is not actually an eye, it is foliage sensitive to light ; if it is not skin with sense of touch, it is a vegetal tissue that performs similar functions. Whatever difference there may be seems not so much physiological as psychological.

A series of investigations made by Professor Jagadis Chandra Bose, of Calcutta, has resulted in revelations of such far-reaching scientific importance that it may be doubted whether even this distinction now holds good. The barrier between the life phenomena of plants and animals is thrown down,

Even the commonest vegetable proves to be sensitive. Professor Bose has shown that plants have what may truthfully be called a nervous system—a simple type, to be sure, but still a nervous system. The discovery is of momentous interest. Psychology deals with consciousness; but without nerves, without some means of receiving impressions of storms and sunshine, heat and cold, there can be no consciousness. Grant that vegetation has nerves, and psychology must explore a region where only the botanist and the plant physiologist have entered. Professor Bose by no means holds that plants have anything like the intelligence of animals, but he has certainly demonstrated that they respond to external forces, not as so many living machines but as sentient organisms. By his extraordinary methods of inquiry he proves that they are *affected in a very human way* when stimulated from without. They are benumbed by cold, intoxicated by alcohol, suffocated by foul air, wearied by excessive work, stupefied by anæsthetics, excited by electric currents, stung by physical blows, exhilarated in sunshine, depressed in the rain, and killed by poisons or violence. In a word, they are responsive or irresponsive under the same conditions and in the same manner as a human being sometimes to a greater and sometimes to a lesser degree. Flowers and plants cease to be merely a few clustered petals, a few green leaves growing from a woody stem and perhaps a thorn or two. We must from a new conception of them—a conception that will relate them more closely to ourselves, far removed from humanity though they may seem.

An Eastern Scientist with a Western Reputation.

How these startling discoveries came to be made is a story as interesting as any in the annals of modern science, and one, moreover, that involves a very remarkable personality. The scientist from the East combines the inventivenss of a resourceful mechanical and electrical engineer with the penetration and imagination that a great scientist must possess. He had to design instruments of unprecedented delicacy and exquisite accuracy, and often to build them with his own hands. With none of those mechanical facilities at his disposal which every prominent European and American experimental scientist commands, with only Indian workmen to assist him, he laboured under discouraging difficulties before he could begin his investigations. A burning desire to know the truth accomplished miracles in mechanics and in pure research; for he belongs to the dynasty of scienists who have discovered great natural laws with simple means. His achievements prove once more that inspiration and tenacity of purpose count for more than a splendid laboratory lavishly endowed.

Although he is a native of India, there is not a trace of Oriental mysticism

in Dr. Bose, nor of that curious mixture of occultism and metaphysics which we associate with the East. Yet he has the synthetic mind of an ancient Hindu philosopher—synthetic because his investigation of plant life was conducted primarily for the purpose of scientifically proving that unity of all matter, living or non-living, which the old metaphysicians of his country had long preached.

No Dead Matter in the World.

It was soon after his graduation from Cambridge that Dr. Bose began the researches which have resulted in giving an entirely new aspect to various phenomena associated with life. At first he was concerned, not with living things, but with inorganic matter—gross, dead brute matter, as it used to be called. That was in the days when wireless telegraphy was still a dream, when Marconi was just beginning to experiment.

The Englishman Clerk Maxwell had theoretically demonstrated that light waves were merely visible electric waves. Then came the German Hertz who showed how it was possible to generate electric waves, which were invisible light waves, and to send them rippling out into space. To make "Hertzian waves" visible an artificial eye had to be invented. That was achieved by the Englishman Lodge and the Frenchman Branly, quite independently. Lodge called this artificial eye a "coherer." It was nothing but a glass tube filled with iron particles. When the electric waves struck the tube the particles were influenced in some mysterious way, so that their power of conducting an electric current was changed. They had also been inexplicably strained, so that they would not recover until the glass tube in which they were contained had been tapped.

If wireless telegraphy was to become a commercial reality, something better than this coherer was needed—something that was self-recovering, like a human eye. To discover that something involved a study of the whole theory of coherer action. Why was it necessary to tap the glass tube containing the iron particles?

To answer that question Dr. Bose began a painstaking investigation. He found that the iron particles of the coherer grew weary; they were actually fatigued because of overstrain; they had to be revived, and a tap (a stimulus in other words) revived them. That discovery prompted him to study other substances. Matter proved to be strangely capricious. He examined it as a biologist examines a muscle or a nerve—electrically. A piece of animal tissue that is dead reacts differently from a piece that is alive. There is an electric twitch when the living muscle or nerve is excited, a twitch that can be seen with the aid of a galvanometer—a delicate detector of electric currents. A dead tissue, on the other hand, gives no response. Tested thus, Dr. Bose found matter curiously alive in a real

and not in a figurative sense. He froze metals. and they became torpid like an icy muscle ; he poisoned them and then cured them ; he narcotized them and afterwards revived them ; he pinched them, and they responded electrically like living flesh ; he subjected them to ceaseless blows, and they grew tired and irresponsive ; he allowed them to rest, and the ability to respond revived. He performed hundreds of experiments which proved that inorganic matter is not dead.

So an inquiry instituted for the purpose of ascertaining why the particles in a coherer had to be tapped in order to respond again to electric waves ended by breaking down the barrier between organic and in-organic matter.

What Relation Are Metals to Plants ?

Ended ? This Eastern scientist is imbued with an enthusiasm that is boundless, with a curiosity that is insatiable, and with perseverance that is tireless. He had performed a life-work. He had addressed the Royal Institution and the Royal Society, and his discoveries had been acclaimed by the great physicists who are members of these two famous organizations as the most important and revolutionary that had been made for many a day. But, to his mind, his inquiry was anything but ended. If supposedly dead inorganic matter is so dramatically responsive to external stimulus, what may not be expected of organic matter ? Why not enter the field of plant life and discover what is the relation of metal to plant, and of plant to animal ? Perhaps a synthetic theory could be evolved which would link man, vegetation, the earth in one living whole.

Remember that this man is a physicist, not a physiologist. A mechanical engineer who decides to practise surgery on engineering principles is scientifically no bolder. To be sure, instruments have been used to fathom some of the mysteries of plant existence ; but they are instruments that have been invented, for the most part, by plant physiologists, and which have shown only in a coarse way how stem, leaf, and tendril respond to their environment.

Into this field entered Dr. Bose, in the spirit not of an intruder but of a constructive scientist seeking light. The result is a view of plant life from a totally new angle.

Pens with which Lilies and Cabbages Can Write

First of all, Dr. Bose set about the invention of new instruments—devices of unprecedented sensitiveness. If plants are to lay bare their secrets, they must be given the means of expressing themselves. In a broad sense, that is what Dr. Bose has done. His ingenious recorders are pens of incredible lightness with which lilies or cabbages may write down their impressions of the outer world in a script that we can understand. Use these

instruments intelligently and vegetation, hitherto mute, will whisper its story.

If the scientist has failed to credit plants with the possession of tissues and nerves similar to those of animals, it is because the physiologically significant movements must be enlarged thousands of times to be seen and measured. The invisible movements are in turn detected electrically. That is how Dr. Bose deals with infinitesimal twitches, starts, and tremors, which mean even more to him than a patient's trembling hand to a physician.

Enabled to express itself, a plant is found responsive to all the stimuli that cause an animal muscle to contract. A blow will make a muscle twitch ; a plant will also twitch when struck. A prick or a cut will cause both vegetal and animal tissue to give either a mechanical or an electrical twitch. Pinch a cauliflower stalk with tweezers, and a reflecting galvanometer—a detector of currents which, in this instance, may be considered an electrical substitute for a brain—can be made to move a beam of light many feet on a screen and thus to visualize the stalk's wincing and recovery. Whatever may be the nature of the violence to which animal or plant may be experimentally subject,—a drop of acid, the fumes of ammonia, the touch of a hot wire, the shock of an electrical current,—there is no difference in the character of the response.

Recording the Sensation of Mimosa.

The instruments used in these inquiries are beautiful in principle and construction. They are mechanical, optical, or electrical. Take the "resonant recorder," perhaps the most important as a type. A fine silk thread runs from one of the plant's leaves to a small lever supported in jewelled bearings. From the middle of the lever a thin wire extends vertically downward. The wire is bent at right angles, so that its sharpened tip just touches a smoked glass plate, which can be lowered at a unifrom rate by means of clockwork. That tip is a writer or pencil. By means of an electromagnet the writer can be made to vibrate a given number of times a second, so that it taps dots on the glass plate. Each dot marks a certain interval of time—one hundredth of a second, one fiftieth of a second, one tenth of a second, whatever time interval you please.

In one experiment Dr. Bose shocks the leaf of a mimosa electrically, and simultaneously starts the apparatus. The smoked glass plate falls; the bent tip of the water is electrically tapped against it; a curious dotted line is traced on the glass as the plant's leaf, suddenly excited, gives an answering twitch and pulls the lever by means of the attached silken thread. Not more than five seconds have elapsed. The dots that compose the line show that in one-tenth of a second the plant began to respond to the electrical shock. Count the number of dots, and at once it is evident that the leaf's convulsive fall was

completed in three seconds. The general character of the curve indicates how profound was the effect of the sudden excitement. The Mimosa has written down its perception of shock with recorder not only of minute time-intervals but also of minute leaf-movements.

All Plants are "Sensitive."

With his resonant recorder and with other equally delicate instruments of his own invention, Professor Bose has shown that the popular classification of plants into "sensitive" and "insensitive" is absurd. They are all sensitive, from the plebeian turnip and stolid radish to the aristocratic fern and the voracious pitcher-plant.

If a plant rests, it is reasonable to suppose that it must be weary. You cannot lift a weight or flex your arm more than a limited number of times. The muscles are easily fatigued. But after you have rested you can resume your exercise, as fresh as when you began. A plant, too, is fatigued after using its tissues; it too must have rest. The more excitable it is, the more it needs repose. In Dr. Bose's hands, a high strung mimosa conducts itself like a restive thoroughbred horse that has been frightened. Its excitement is apparent enough in the record traced by tremulous leaflets; and like an alarmed thoroughbred, it quiets down only after more than a quarter of an hour.

When you are struck, a measurable time elapses before you feel the blow. Biologists call that exceedingly short period between shock and response the "latent period." Plants have a similar latent period. It takes about one tenth of a second, on an average, for the mimosa to feel a shock; but sometimes the plant reacts as quickly as six one-hundredths of a second. Like an animal it responds better when it is in good than when it is in bad condition, and it is, more active when it is warm than when it is cold.

Experiment after experiment is performed to note the response of a plant to gases, liquids, and drugs. Ozone excites; coal-gas depresses; ether and chloroform stupefy; sulphuretted hydrogen, nitrogen dioxide, and sulphur dioxide kill. Now we know why it is impossible to raise many plants in cities. The sulphuretted hydrogen poisons them.

How Plants Behave when Intoxicated.

A plant responds to intoxicants in the same human fashion. When Dr. Bose subjects a mimosa to the influence of alcohol, he does not administer the liquid, but the vapour. Confined in its little chamber, mimosa drinks in the fumes. The effect is almost ludicrous. The plant is evidently intoxicated. It cannot lurch and reel, but it can and does indicate its intoxication by means of the resonant recorder in an inebriate script. In behaviour, a drunken mimosa differs in no essential from a drunken man. Its script shows exaltation

alternating with maudlin depression which seems almost repentant, A whiff of fresh air, and mimosa is once more restored to sobriety.

The practical significance of such experiments with drugs and gases can hardly be overestimated. Modern doctors have all but discarded the phial and the pill-box, not only because they find that nature should be given a chance, but also because they realize that they have been prescribing drugs by rule of thumb rather than scientifically. Research on drug action is vastly simplified if we can begin with vegetation. When the study is complete we will know when and how medicines ought to be administered.

Proofs that Plants have a Nervous System.

For the same reason, researches that Dr. Bose conducted on nervous impulse are of immense importance to humanity. Professor Wilhelm Pfeffer of the University of Leipzig, the Nestor of European plant physiologists, had decided some years ago that mimosa was nerveless. He chloroformed mimosa stalks without arresting the impulse in the plant. Had there been nerves, he argued, all transmission of excitation would have ceased. Pfeffer's dictum in these matters is almost final. Dr. Gottlieb Haberlandt, a distinguished professor of botany, in the University of Berlin and director of the Berlin Botanical Gardens, a scientist of commanding position, came to the same conclusion. He scalded mimosa stems, but still they transmitted excitation. Haberlandt attributed the propagation of stimulus to water pressure in the little stalk tubes. Squeeze one end of a rubber tube filled with water and the pressure will be transmitted to the other end in a wave. Thus Haberlandt explained the strange action of mimosa's leaves. If this rubber-tube theory is correct, a plant ought to transmit stimulus whether it is warm or cold, sick or healthy. A mechanical explanation cannot consider physiological action.

To ascertain whether or not plants have nerves, Dr. Bose deliberately coddled and pampered a mimosa. He kept it under glass, so that shocks from the outside could not reach it. Tie your arm to your side, and it will soon lose its strength from lack of exercise. The biceps will become weak and flabby. Such was the condition of the coddled mimosa. It looked sleek and flourishing. If Pfeffer and Haberlandt were right and the rubber tube theory held good, the plant's leaves would respond although they had no exercise.

Dr. Bose carried the plant to his recording apparatus—gave it a pen with which to express itself. The plant was paralyzed. It could not write. There it was, bloated and effete, stupidly silent. It had nerves, but they were numb from sheer laxness. Clearly, the rubbertube theory was wrong. Pfeffer's

choloroform, applied only to the outer stem, had not reached the nerves. Haberlandt's experiment in scalding was misleading, for the same reason.

Next Dr. Bose stimulated the plant. The effect was the same as exercise to an arm that has not been used. He rained blows upon the plant. Each shock was a question: "Do you feel that? And that? And that? Very slowly the plant recovered its lost activity, and at last it wrote down its response in a feeble but intelligible script. To avoid the possibility of error, Dr. Bose tried the effect of temperature. He warmed the plant, and found that it transmitted a shock more quickly than when it was cold. He chilled it, and it became so numb that it could write nothing. He dropped potassium-cyanide upon it,—one of the deadliest poisons,—and abolished all nervous impulse in as short a time as five minutes.

Pfeffer and Haberlandt are wrong. Plants have nerves. And they vary in their nervousness, too. The unexpected slamming of a door, the mere scratch of a pencil on a slate, is enough to set the nerves of many a man tingling, while another will placidly read a newspaper amid the din of a boiler factory. Similar extremes, as well as all the intermediate degrees of nervousness, are found in vegetation. There are placid plants that cannot be easily excited; there are others that literally start at the slightest disturbance.

Since a plant has nerves, it must take an appreciable time for it to respond to a shock. In a human being a nervous impulse travels at the rate of one hundred and ten feet a second. In lower animals it travels as slowly as two inches a second. How long does it take an impulse to speed along a plant nerve? Another inquiry was begun. Dr. Bose found that when a mimosa was in the best condition an excitation was transmitted with a velocity of thirty millimeters (1. 18 feet) a second. Fatigue depressed the rate of transmission; warmth increased it. What is more, he discovered that the impulse is transmitted in both directions along the nerve, and not always at the same rate.

If he had made no other discovery, Dr. Bose would have earned an enduring reputation in the annals of science. We know very little about paralysis in the human body, and practically nothing about its cause. The nervous system of the higher animals is so complicated, so intricate, that it is hard to understand its derangement. The human nerve dies when isolated. It is killed by the shock of removal, and responds for the moment abnormally and therefore deceptively. But, if we study the simplest kind of a nerve,—and the simplest is that of a plant,—we may hope to understand what occurs when a hand or a foot can not be made to move. To find out that plants have nerves, to induce paralysis in such nerves and then to cure them—such experiments will lead to discoveries that

may ultimately enable physicians to treat more rationally than they do the various forms of paralysis now regarded as incurable.

It is just as hard to study the heart in action as it is to study nervous impulses in the human body. The heart beats "spontaneously," as it is expressed. As long as life is to last, so long does it beat. In all nature there is nothing more magical, nothing more mysterious, than this steady beat, beat, beat of the human heart. No machine has ever been built that is so certain, so trustworthy, so generally unfailing. For decades it pumps blood through the system. It may waver, but it may never stop entirely if there is to be life. Something much simpler in structure must be found, something much more easily watched than this marvellous complex of tissue, if we would fully understand the theory of its action.

The Telegraph-Plant and its Automatic Pulsations

The phenomenon of automatic pulsation is not unknown in the world of vegetation. There is the telegraph-plant for example—common enough in East India. Its leaflets move up and down rhythmically, like a throbbing heart. Biologists were unable to understand the significance of these plant pulsations because there were no suitable recording instruments at hand. Each leaflet is small, and the pull that it exerts is so feeble that it cannot move an ordinarily light stylus against a recording surface. Here Dr. Bose's exceptional mechânical ingenuity came to his aid. He built a wonderful recorder, with lever and writing point so delicate that the slightest pull would move them. Connected by a cocoon thread with this instrument, the telegraph-plant makes some amazing revelations. Its pulsating tissue exhibits all the characteristics of an animal heart's rhythmic tissue.

In order to show that there is a perfect analogy between beating animal and beating plant tissues, Dr. Bose subjects his plants to all the tests that biologists apply to animals, and a few more that he himself conceives. A heart is slowed down by ether, the biologists say? "I, too, must experiment with ether," decides the Doctor. He places his plant in a chamber, and blows in some ether vapor mixed with air. The plant records its exaltation. It has been affected just as if it were human. Stronger ether vapor is admitred. The leaflets slow down just as does a heart under the influence of anæsthetic. Will the leaflets stop altogether if too much ether vapor is poured into the chamber? The heart will, we know. The Doctor tests the plant. For a minute or two the leaflets waver uncertainly; then they stop—the plant is quite still. Fresh air is blown into the chamber, and the effect is magical. Very slowly the leaflet begins to move, and once more the record is traced on the glass plate, weakly and uncertainly at first, but gathering strength as the

plant drinks in each new whiff of atmospheric oxygen.

Chloroform has an even more pronounced effect than ether. If a slight excess is administered, the leaflets stop altogether. The leaflet may even be killed. Sometimes it takes as long as half an hour to revive a telegraph-plant that has been thoroughly chloroformed.

Think, for a moment, of the significance of the experiments. We have been taught to believe that automatically pulsating tissues draw their energy from within, and to call this energy "vital force." If a beating leaf can be arrested and started again simply by controlling *external* forces, it is evidently absurd to explain its apparent automatic action by means of an *internal* vital force. Dr. Bose offers a new and more plausible theory, one that accounts for all spontaneous movements by the action of external forces only. A plant is the plaything of light, electricity, wind, and rain—of all nature's forces. Like the currents, drugs, and gases employed in Dr. Bose's experiments, these natural forces act as stimuli. We must imagine the little molecules of which plants are constructed, not only storing up all this energy as if it were water received by a vessel, but as receiving much more than they can store. Like water, the excess energy bubbles over, as it were, and produces the pulsations that have seemed so inexplicable. Thus is "vital force" stricken from the vocabulary of biology.

The phenomeuon of growth is another example of automatic activity. To study it in detail has never been possible, because the changes that occur are so slow that sometimes whole days must elapse before they can be noted.

Measuring How Much a Plant Grows a Minute

Even the proverbial snail travels two thousand times more quickly than the average plants grow. Yet, with a most marvellous instrument—the "cresco graph," he calls it—Dr. Bose succeeds in measuring the growth that takes place during a few beats of a pendulum. Growth is magnified a thousand, ten thousand, even a million times for some demonstrations. Although it would take an average plant two hundred years to cover a mile, yet by means of the crescograph the growth of a minute appears as a swift forward rush.

What is the tale of Aladdin and his wonderful lamp compared with the true story told by the crescograph? In less than a quarter of an hour the action of fertilizers, foods, electrical currents, and various stimulants can be determined. Think what that means! Instead of waiting a whole season, perhaps years, to discover whether or not it is wise to mix this or that fertilizer with the soil, one can now find out in a few minutes! An experiment in farming can be conducted as rapidly as a laboratory experiment in chemistry.

When growth stops, a decay sets in, which ultimately terminates in death.

But when does a plant die? Death, in an animal, is easily detected. The passage of life is marked by an unmistakable spasm, followed by a stillness that cannot be broken. But a plant seems to yield up its life so gradually that it is impossible to say at any particular moment, "Now it is dead." So far as mere appearance goes, stems and leaves that have been dead for hours, perhaps days, are deceptively alive. Dr. Bose is the first man that ever saw the death-throe of a plant, the first man who ever succeeded in fixing the precise moment when the spark of life that animates a blossom has been quenched.

The experiments on death are the most fascinating, the most dramatic perhaps, that Dr. Bose performs. He attaches a leaf to the registering lever of his instrument, this time an oscillating recorder, in which the smoked-glass plate is swung by clock-work toward and from the writing point. He places the plant in an inner vessel of water, which is in turn received by an outer vessel of water; the principle is the same as the double boiler in which housewives cook breakfast cereals. There must be no mechanical disturbances, nothing to shock the plant.

He heats the outer vessel very, very carefully—so carefully that the plant suspects nothing of its impending fate and is not in the least alarmed. The plate of the recorder oscillates rhythmically to and from the recording lever attached to the leaf. A dot is made whenever the smoked-glass plate touches the lever, aud that happens automatically as the temperature rises by single degrees. The Doctor has only to count the dots in order to ascertain the temperature.

The Death-Spasm of Plants.

As the temperature goes up, the leaf—mimosa is again the plant experimented with—rises and stands erect. It pulls on the recording lever; the dotted line on the plate assumes a downward direction, and upward movement of the leaf being translated into a downward movement of the writing point. The water in the inner vessel is becoming hotter and hotter. Thirty degrees, forty degrees, fifty-five degrees Centigrade, the temperature is tapped off on the plate. Down and down travels the dotted line on the oscillating plate. Then something remarkable happens. Abruptly the line shoots up. It is the death-spasm—the the last response of which the plant is capable. Sixty-degrees Centigrade (one hundred and forty degrees Fahrenheit), the record reads.

The Doctor tries to resuscitate the plant. He must be sure that what he has witnessed was indeed the quiver of death. He applies all the tests that his ingenuity can devise. He puts the plant in cold water and again couples the leaf with the instrument. There is no response—nothing but a record of

the water's temperature. He heats the water just as carefully as he did before. This time there is no down-wardly travelling line, not a sign of that sudden. upward movement which spells extinction. The plant is absolutely dead. That sharp inversion of the dotted line was indeed the death spasm translated into writing.

All Plants Die at the Same Temperature

It always occurs at sixty degrees Centigrade—this death-spasm. Dr. Bose has experimented with dozens of different species. They twitch and die at the same temperature—all of them. Now we understand what the curious movements of leaves and flowers mean when they are scorched or scalded. It is not simply the mechanical curling and twisting that heat produces in all things. It is a genuine death-throe.

The sudden paling of the passion-flower may now be interpreted as the end of life, and the quick opening and closing of a French marigold in hot water as the writhing of death. A new meaning is imparted to the variegated hues of flowers growing on the same stem ; for the stripes that crawl up on the petals of old blossoms, the coloured spots that grow larger and larger on leaves and flowers, and that are so highly prized by breeders of plants, prove to be dead areas when tested. What we have admired in many a curiously tinted petal is but a cadaverous beauty. All the wonderful, mysterious purple and red glow of autumn is but the hectic flush of death.

But Dr. Bose has not stopped here. Your vitality and mine is a variable factor. In youth, we are more resistant. As we age we succumb to killing forces more easily. When we are weary to utter exhausion, death comes more quickly than if we are fresh. Our resisting powers are broken down. Is it thus with a plant ?

It is astonishing to find how close, even here, is the resemblance between plant and animal. A young, tender spring gives up its life like a baby. A mature specimen fights hard. Tire out a strong, healthy bean plant,—Dr. Bose does it by electric shocks,—and its death-spasm occurs, not at the usual sixty degrees Centigrade, but at thirty-seven degrees. What is more, the lowering of the death-point is determined by the extent of the fatigue. Poison the plant with copper sulphate, so that its vitality is lowered, and the last quiver comes at forty-two degrees, a drop of eighteen degrees below the normal.

But One Kind of Matter in the Universe.

All this work on the effect of gases, poisons, drugs, and currents on plants was inspired, be it remembered, by the belief that life is everywhere, and that there is but one kind of matter in the universe, whether it be a complex man

or a simple iron one. In these boundless regions, beginning with the inorganic, proceeding to organic life and its sentient manifestations, this Indian scientist had been seeking an underlying unity amid chaotic and bewildering diversity.

He subjected all matter to qestioning shocks, and discovered that there is no difference in the reply. Patiently he added fact to fact in his explorations in the realms of living and non-living, and was amazed to find dividing frontiers vanishing. At last he reached a new conception, which includes in one magnificent sweep the dust beneath our feet, the protoplasmic ooze floatiug on a stagnant pool, and man himself. We can understand what passed through his mind when he stood before the Royal Institution and said :

"It was when I came upon the mute witness of these self-made records. and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things : the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago,

"They who see but one in all the changing manifestations of this universe, unto them belongs Eternal Truth—. unto none else, unto none else."

McCLURE'S MAGAZINE.

THE GUNS.

Great wonders are upon the deep,
But greater yet there be than those;
For I have seen where landward now
The hell of line of battle goes.

And I have seen the angry guns
Take stand upon their iron feet,
Their mighty mouths agape for blood
A-roaring for their daily meat.

These be the lion Lords of war
These be the hungry ones that gloat
When foemen thickly come, and belch
The thunder from their smoking throat,

And lick their lips with flame, and reap
Raw reddening flesh, and call agen
A fiercer harsher call for more
Long shuddering swathes of new-mown men

And their grim keepers cry them on
To make their savage children shout,
And, hearkening, greatly joy to hear
This voice of power speaking out.

And then the darkness comes, and they
Growl into silence, one by one,
To take a brief repose, and sleep
After their royal meal is done.

D. G. D.

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড। } ঢাকা—অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৩। { ৮ম, ৯ম সংখ্যা।

কাব্যে মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র। *

তোমারি চরণ করিয়ে স্মরণ
চলেছি তোমার পথে।
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমারে
ধরি এই মনোরথে।

—হেমচন্দ্র।

প্রবন্ধের মুখবন্ধে আমি বাঙ্গালার সাহিত্য-সাগর বঙ্কিমচন্দ্রেরও একটী কথা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। * * * কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহাত আমাদের হাতেই আছে; তাহা পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"

* ইতঃপূর্ব্বে 'প্রতিভা'-পত্রে মিত্রকবির সাহিত্যিক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। (অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১০২২)। এক কথায়, মিত্র-কবি ঢাকার সংবাদ-পত্র, সাহিত্যের স্রষ্টা ও তৎকালপ্রসিদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা কাব্য, কীচক বধ কাব্য, নির্ব্বাসিতা সীতা, কবিরহস্য, কবিকলাপ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং জানকী নাটক, প্রহ্লাদ নাটক, কৌতুকশতক প্রভৃতি প্রায় অর্দ্ধশত গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ৪১ খানা গ্রন্থ প্রকাশ এবং "ঢাকাদর্পণ", "অবকাশরঞ্জিকা", "মিত্রপ্রকাশ" প্রভৃতি সংবাদ-পত্র সম্পাদন করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে নবযুগ আনিয়াছেন। অধুনা ইঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত প্রায়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের অনেক স্থলই আমরা একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এস্থলে, একটী কথা বলাও সঙ্গত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ইঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন আলোচনা করা হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ মিত্রকবির কাব্য-সম্পর্কে আমরা যাহা বলিয়াছি, কাব্যামোদী পাঠক তাহাতেই কবির কাব্যের একটু সামান্য পরিচয় পাইবেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা ইঁহার কাব্য-সম্পর্কে আলোচনা করিব। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তাঁহার কাব্য-রচনায়, তিনি যে আত্ম-পরিচয় প্রদান বা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, এক হিসাবে এই প্রবন্ধটী উল্লিখিত পরবর্ত্তী প্রবন্ধটীরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কবির উদ্দিষ্ট পথে চলিয়াই কবিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অধিকন্তু, কবির কাব্যই যে কবিজীবনের প্রকৃত ইতিহাস, তাহাও বুঝাইবার প্রয়াসী হইয়াছি।

মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধশত গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ গ্রন্থই কাব্য; এই কাব্য-প্রতিভাতেই হরিশ্চন্দ্র অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কএকটী অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কাব্য-রচনায় তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

কবির অন্তর্জীবন কাব্যে প্রতিফলিত হয়—কবির কাব্যই কবির সুখ-দুঃখের ইতিহাস।

কবির কথায় কবিকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রেই আমাদিগকে কবির জীবনী-কথা বুঝিতে হয়। ইতঃপূর্ব্বে, পত্রান্তরে কবির কাব্যজীবনের বিকাশের ধারা প্রদর্শন করিয়াছি *। কবি আমরণ দরিদ্র ছিলেন; দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যের সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম করিতে করিতেই কবির কাব্য-প্রতিভা—মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি কাব্যে তাহা স্বহস্তেই চিত্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মিত্রকবি কবি ও কবিতার একটা মানসচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মিত্রকবির কাব্য-জীবনে তাহাদের একটা অনতিক্রম্য প্রভাব রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কাব্যে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের ছায়াপাত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব।

প্রথমতঃ আমরা মিত্রকবির দারিদ্র্যের কথাই তুলিব। কবি লিখিয়াছেন—

অরে দরিদ্রতা মোরে ফেলায়ে যাতনা ঘোরে
চূর্ণ কর তাতে দুঃখ নাই একটুকরে।
দেখে মোরে দীনহীন, আত্মীয় যে ভাবে ভিন
হরিশের অই দুঃখে ফেটে যায় বুক রে।

আত্মীয়-সমাজের গণ্ডী ছাড়াইয়া, আমরা দীনদরিদ্র কবিকে এক্ষণ কাব্য-সমাজে লইয়া যাইতেছি। দরিদ্র কবি অর্থাভাবে স্বরচিত কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব-বিধানে অসমর্থ; অথচ, কবি ইহাতে হৃদয়ের অন্তস্থলে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ে একটা দুর্ব্বিষহ দারুণ ক্ষোভ উথলিয়া উঠিতেছে। রামায়ণ মহাকাব্যের উপসংহার-ভাগে মিত্রকবির হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ। কবি বলিতেছেন—

ওহে প্রিয় রামায়ণ, অতি যাতনার ধন,
খণ্ড এক সমাপন আজি তব হইল। * *
তোমায় হে সাজাইতে, যত সাধ ছিল চিতে
নিদারুণ দৈন্য দোষে, পূর্ণ নাহি হইল।

দরিদ্র কবিকে আমরা এবার সংসারের রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া দিতেছি। গুণরাশিনাশী দারিদ্র্য কি ভাবে তাঁহার মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতেছে, নিন্দা. দ্বেষ, তোষামোদের রাজত্বে কবি কি ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছেন, কবির কাব্যে আমরা তাহারই সন্ধান পাইতেছি। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' কথাটি পাঠক-সমাজের অপরিচিত নহে। মিত্রকবি অন্নচিন্তার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

মহাকবি কালিদাস, তাঁহার কবিত্ব নাশ
অন্ন-চিন্তা করেছিল আছে যে প্রবাদ রে।
হরিশ বলিছে ঠিক, কে কহিছে তা অলিক,
ঘরে অন্ন না থাকিলে বড়ই প্রমাদ রে।

অথচ, 'প্রমাদ' জানিয়া শুনিয়াও কবি দীনতাকে স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতেছেন-

রে দীনতা সর্ব্বনাশি, আমার সর্ব্বস্ব নাশি,
যত দুঃখ দিবি দেনা সব আমি সহিব।
যদিও প্রহার তোর, যাতনা দিতেছে ঘোর,
দিক্ তাতে তিলমাত্র, ব্যথিত না হইব।
বৃক্ষমূলে হো'ক বাস, পরি শতগ্রন্থী বাস,
করা তুই উপবাস, তাও আমি করিব;

* "প্রতিভা"-পত্রিকার বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র" প্রবন্ধে প্রধানতঃ মিত্রকবির কাব্য-জীবনী আলোচিত হইয়াছে। মিত্রকবি ৪১ খানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২৫ খানাই কাব্য। এক্ষণ উহার অনেক গ্রন্থই লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই মানিতে হইবে।

যা তোর মনেতে লয়, কর সেই সমুদয়,
কিছুতেই আমি তোর দোষ নাহি ধরিব (১)

এস্থলে দরিদ্র কবি দীনতাকে উপহাস করিয়াছেন। এ উপহাসে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইতেছে। কবি আরও বলিয়াছেন—

কিন্তু ওরে ও দীনতা নীচ কয় উচ্চ কথা,
দরিদ্র দেখিয়া তাই মনে ব্যথা পাইরে।
তা নৈলে রে তোর তরে হরিশ প্রাণেতে মরে,
যদি, তাতে তার দুঃখ, একটুকু নাইরে।

মিত্র-কবিও 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'-সম্পর্কে একটী কবিতা লিখিয়াছেন; নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল :—

প্রভাত হইল রাত, লিখিবারে একপাত
পদ্য, মদ্যপায়ীমত ভাবভরে বসিলাম।
কল্পনা-কুহকে পড়ি, কত ভাবে ভাব ধরি,
জুটায়ে পুটায়ে মেনে কতটুকু লিখিলাম।
কিছুকাল পরে তার আগমন হ'ল মার,
কহিল জননী "বাছা কি কররে বসিয়া।
ঘরে নাই চাল খড়ী, বল্ কি দিয়া কি করি?
বউটী রয়েছে কোণে চুপ মেরে বসিয়া।
নাতিটী করিছে খেলা, খানিক হইলে বেলা,
খেতে দে 'ঠাকুমা' বলে আসিবে যে ধাইয়া।
ঘরে মুড়ী চিড়া নাই, কি দিব না ভেবে পাই,
যাও বাছা দাও সব কিনে কেটে' আনিয়।
শুনিয়া মায়ের বোল ভাবেতে বাধিল গোল
উড়ে গেল বুদ্ধিশুদ্ধি অন্নচিন্তা ঘেরিল।
কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে অর্থ পাই,
এই ভাবনার জালে কবিত্বও বেড়িল।

পিতৃ-বিয়োগের পর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে, "কীচক বধ কাব্যের" পাণ্ডুলিপি লিখিবার সময়ে, কবির মাতা ঠাকুরাণী 'তেল লুন লকড়ির' গুরুতর প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন; তখন 'কাপি' লেখা বন্ধ করিয়া, কবি সাময়িক মানসিক উত্তেজনায় এই কবিতাটী রচনা করেন। মিত্রকবি বিবাহ করেন নাই তাই কবিই পাদটীকায় লিখিয়াছেন—ইহার ৮ম,৯ম ও ১০ম পংক্তি "আরোপিত"। কেমন সত্যানুরাগ!

দরিদ্রের সামাজিক জীবনে দীনতার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

রে দীনতা দূর দূর! তোর মত কে নিঠুর?
গুণ-গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব করিলি রে করিলি।
হতমূর্খ ধনী যত, তারাইবা কহে কত,
দীন দেখে মান মোর হরিলি রে হরিলি।
আছিল আমার মন, সদা ন্যায়-পরায়ণ,
তুই তাতে ব্যতিক্রম ঘটালি রে ঘটালি।
আগে বন্ধু ছিল যারা, দীন* দেখে আর তারা,
না ঘনায়,—সে বন্ধুতা চটালি রে চটালি!

দরিদ্র কবির দীনতায় সমাজ চিরকালই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। বস্তুতঃ এস্থলে, 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়'। কবির 'দীনতা দারিদ্র্য দোষে' দোষাস্পদ হইয়াছে। এ সমাজ-রহস্য কবির অন্তর্দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই; পরন্তু ইহাতেই সমাজের উপেক্ষায় বা বাধায় তাঁহার মনুষ্যত্ব সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ছত্রে ছত্রে কবির অন্তর্দাহ কাব্যে স্ফুরিত হইয়াছে।

যে 'লোকালয়ে' অর্থই পরমার্থ, সেই লোকালয়ে
"যদিবা জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয়,
দরিদ্রতা দেহ মাঝে করি অধিকার রে,
যদিও দরিদ্র হই, কৃতাঞ্জলিপুটে কই
যেন নাহি থাকে দারাপুত্র-পরিবার রে।

(১) মিত্রকবির গার্হস্থ্য-জীবনের ইহাই নিখুঁত চিত্র। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে, পাঠকের সংখ্যা অত্যল্প ছিল; সুতরাং গ্রন্থ-রচনায় হৃদয়ের আকুলতা যত ছিল, তাহার একাংশও অর্থাগম হইত না। সুতরাং গ্রন্থ-রচনা ব্যবসায় ছিল না—লেখকের একটা অলজ্জনীয় ব্রত ছিল।

* এস্থলে, মিত্রকবি 'দীন' শব্দের দ্ব্যর্থ-প্রয়োগ করিয়াছেন। মিত্রকবির অন্তরঙ্গ বন্ধুর নাম ৺দীন বন্ধু সেন। তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের ফলে, মিত্রকবির পূর্ব্বতন অনেক বন্ধু অসন্তুষ্ট হন। এস্থলে দীন শব্দে কবি কৌশলক্রমে আত্মজীবনের এই কাহিনীও ব্যক্ত করিয়াছেন।

দারাপুত্র-পরিবার, পালনে না রলে ভার
আপনি দরিদ্র হলে একটুকু ভাবিনে।
হরিশ কহিছে ধাতানা শুনত খাও মাথা,
নিজের লাগিয়া তোরে খোসামুদী করিনে।

মিত্রকবি চিরজীবন অবিবাহিত ছিলেন; অথচ পরিবার-পালনের দুর্ব্বহ 'ভার' তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সাংসারিক জীবনে পরিবার প্রতিপালনে দরিদ্র কবি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাহার আভাষ রহিয়াছে।

দুঃখ-কষ্টের কঠোর পরীক্ষায় কবি বিচলিত নহেন; বরং মনুষ্যত্বের বিনিময়ে দরিদ্র কবি কাহারও তোষামুদী করিতে শিখেন নাই। "পোড়া পেটের" জ্বালায় 'নর-উপাসনা' চলে চলুক; কিন্তু কবির কথায়—

"আমরাই নারিলাম তোষামুদী করিতে।
দিনান্তে যোটেনা ভাত, ভেবে মরি দিন রাত,
কত কষ্ট পাইতেছি পোড়া পেট ভরিতে।"

তাই—

"হরিশের এই পণ, যদি যায় এ জীবন
তবু কভু তোষামুদী করিব না কাহারে।
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে, যায় যায় রহে রহে
প্রাণ গেলে ছারপ্রাণ রাখিতে কে চায়রে।"

দরিদ্র কবির এমনই দৃঢ় 'পণ'!

পেটের জ্বালায় চিরবিব্রত দরিদ্র কবিও মনের বলে তোষামুদী করিতে শিখেন নাই। এ দৃঢ়তাতেই তাঁহার কবি-প্রতিষ্ঠা। অন্যত্রও দরিদ্র কবি ভারতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"হে ভারতি! দয়াময়ী শতদুঃখে দুঃখী হই,
তথাপি 'মা' তোমা বই কমলারে কব না।
তোমারি মা! চিরদাস, বৃথা করি ধন আশ
পেচক-বাহিনী মার দাসত্ব লব না।
কৃতঘ্ন পামর ছেলে দু'দিন যাতনা পেলে
যায় যথা মাকে ফেলে, সে রকম যাব না।
বৈমাত্রের সহোদর হোক সবে কোটীশ্বর,
থাকুক পরম সুখে, ভাগী হ'তে চাব না।
মাতৃধন যা আমার হেন ধন কার আর?
দস্যুদের আক্রমণ, কভু তাহা খাটে না।
থাকিতে এমন ধন অবোধ অবিজ্ঞগণ,
দরিদ্র আমারে কহে তাই প্রাণে সহে না।
কিন্তু যবে বিজ্ঞচয়, তোমারি কিঙ্কর কয়,
তখন সে দুঃখ আর, কিছুমাত্র রহে না।
বৃক্ষমূলে হোক বাস, পরি শতগ্রন্থি-বাস,
করি নিত্য উপবাস, তাহে ভয় পাই না।
সমাজে হইয়া দীন, দুঃখে সুখে কাটি দিন
তবু "কমলার পুত্র" এ উপাধি চাই না।"

কাব্যজীবনের এ দৃঢ়তা মিত্রকবির কর্ম্মজীবনেও পরিস্ফুট। কবি দরিদ্র, তথাপি বাণীর বরপুত্র কবিকে দরিদ্র বলিলে তাঁহার "প্রাণে সহেনা"। তিনি প্রকৃত 'ধনীরও' একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন। পক্ষান্তরে,

"ধনী বলি যশ গাইব তোমার
যদি কর ধনের উচিত ব্যবহার"।

হৃদয়ের এ দৃঢ়তা লইয়া মিত্রকবি 'দরিদ্রের আক্ষেপ' সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বিধাতার উদ্দেশ্যেই এই আক্ষেপ-সঙ্গীত রচিত। তিনি লিখিয়াছেন—

"ওরে রে মূরখ বিধি! তোমার যতেক বিধি,
সব ভাল মানি আমি একটাও দুষিনা।
চাঁদে মৃগ-রেখা দিলা, পদ্মে নীর ভাসাইলা,
তাতেও তোমার দোষ কণামাত্র ঘুষিনা।
মূর্খে কৈলা ধনবান, নীচে দিলা উচ্চমান
যাহা ইচ্ছা কর; ইথে তোমা প্রতি রুষিনা।
কিন্তু বিজ্ঞ-মানিগণে তুচ্ছধন উপার্জ্জনে,
অজ্ঞ-অনুগত কৈলে, এই ক্ষোভ বড়রে।
হরিশ কহিছে সার, কিবা দোষ বিধাতার
করমের দোষ তব, কারে দোষী কররে।"

* অনেক স্থলে দারিদ্র্য "blessing in disguise"। বস্তুতঃ জীবন-সংগ্রামে দারিদ্র্য না থাকিলে, কোনদিনই কর্ম্মশক্তির লোকোত্তর বিকাশ ঘটে না। ফলে. জগতে দরিদ্রই সাধারণতঃ আত্ম-প্রকাশ করিয়া সমাজের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু 'দারিদ্র্য' আমরণ অধিকার বা প্রভাব বিস্তার করিলে. কর্ম্মশক্তির বিনাশ ঘটে; তাই কবি দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও, দারিদ্র্য লইয়া ঘর করিতে নারাজ।

মিত্রকবি কর্ম্মফলে বিশ্বাসী; তাঁহার মানসিক দৃঢ়তার ইহাই কারণ। তাই, শত দুঃখেও তিনি উদাসীন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ফলে নিন্দুকের বিদ্রূপে বা তোষামুদের সুরে কবি বড় একটা কর্ণপাত করেন না।

"কবি কহিতেছে ভাই নিন্দুকে আশঙ্কা নাই।" অথবা

"যারা তোষামুদে তোষে তোমায় নিয়ত।

*   *   *   *

তারাই তোমার দেখি দয়ার ভাজন।"

চিত্তের দৃঢ়তা না থাকিলে নিন্দায় বা তোষামোদে কবির চিত্তবিকার জন্মিত। তাহা হইলে, কবি একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না।

মিত্রকবি দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই শৈশবে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন; তাই প্রকৃতির পাঠশালায় আশৈশব তিনি স্বতঃই কবি-হৃদয়ের উপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াছেন। "মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র" প্রবন্ধে তাহা যথা-সম্ভব প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্য-জীবনের কথা আলোচনা করিব।

মিত্রকবি লিখিয়াছেন—

দেখিতেছি কতজন, দিয়ে ক'টী শব্দগণ,
অমূল্য কবিত্ব ধন কিনিবারে ধায়!
কবিত্ব কি গাছে ফলে? না, বেচে বণিকদলে?
যার ভাগ্য ফলে, সেই দৈববলে পায়!"

সংসারের মাপকাঠিতে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত কবি সত্য সত্যই দৈববলে 'দুর্লভ কবিত্ব-শক্তি' লাভ করিয়াছেন। আত্মানুভূতিতে কবি যাহা বলিয়াছেন, স্বভাব-কবির পক্ষে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কষ্টকল্পনার কবিকে কবির সিংহাসনে বসিতে হইলে, বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই করিতে হয়—তাহার কবিতায় প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়—সেই কবিতা কখনও মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিধ্বনিত হয় না, শুধু হৃদয়কে একটুকু স্পর্শ করিয়াই দূরে সরিয়া পড়ে। স্বভাব-কবির কবিতায় একটা উন্মাদ সুর বাজে; সেই সুর 'কাণের ভিতর দিয়া সহজেই মরমে পশে।' কষ্টকল্পনার কবি কএকটী শব্দমূল্যে কবিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। বস্তুতঃ—

"স্বভাবে সুকবি যারা,   বাগ্দেবীর পুত্র তারা,
বর্ষি কাব্যামৃত ধারা ভুবন ভাসায়।
কবিতা-পঙ্কজ-রবি,   কে আছে স্বভাব-কবি
চিত্রিবে প্রকৃতিচ্ছবি বর্ণ-বর্ত্তিকায়?"

তাই কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

"হরিশ জুড়িয়া কর   কহে, বিভো, কৃপা কর,
বিতর স্বভাব-কবি, এই ভিক্ষা পায়।
ছিন্ন-পদ-হস্ত-নাসা   অঙ্গহীনা বঙ্গভাষা,
ঘুচাও দুর্দ্দশা তার স্বগুণে কৃপায়!"

বস্তুতঃ, স্বভাব-কবি না হইলে, কাব্য-প্রতিষ্ঠা হয় কই? এক্ষণ পাঠক কবির বাণীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করুন।—

"নিন্দি-নিশানাথ-নিভা   কবিতা দেবীর কিবা
লালিত্য লাবণ্য নিরমল!
সুকোমল শব্দাঙ্গিনী   ত্রিবিধ স্বরনাদিনী (১)
বিমোহিনী অবনী-মণ্ডল।
শোক দুঃখ বিমর্দ্দিনী   সারসুখ-প্রদায়িনী
কবি-মনঃ-কল্পনা সম্ভূতা।
করুণাদি (২) রসাত্মিকা   জনগণ-প্রমোদিকা
শ্লেষ (৩) আদি দশগুণ যুতা,
অরসিক-বিগঞ্জিনী   বিরসতা বিভঞ্জিনী
ভাবপ্রাণা ভাবুক-ভাবিনী,
অলঙ্কার অলঙ্কৃতা   সাধুজন সমাদৃতা
রসিক রসনা বিলাসিনী,
পরিধান ছন্দবাস,   যতি যমকানুপ্রাস
মাঝে তার কাজ চমৎকার!
এই ভূষা এই বাসে   প্রবেশি হৃদয়াকাশে
বিনাশে অজ্ঞতা-অন্ধকার।
প্রকৃতির সহচরী   প্রকৃতিকে সঙ্গ করি
ধরাধামে করয়ে ভ্রমণ,

---

(১) হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত।

(২) করুণ, বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুত, শান্তি, আদিরস।

(৩) শ্লেষ, ওজঃ, কান্তি, সুকুমারতা, প্রসাদ, মাধুর্য্য, অর্থব্যাপ্তি, সমাধি, উদারতা, সমতা।

ভকত-বৎসলা দেবী ইহার চরণ সেবি
অমর হইল কত জন।
জ্ঞান-নেত্র আছে যার, সে এরূপ কবিতার
করিবারে পারে বিলোকন,
সে নয়নহীন যারা হেরিতে না পায় তারা,
দিবাকরে পেচক যেমন।"*

প্রকৃতির শিশু কবির মানস-চিত্রে কবিতা-দেবী কেমন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছেন।

এই কবিতা দেবীকে মিত্রকবির 'কাব্যসরোবরে'ও আমরা দেখিতেছি।—

"আয় মন, চল যাই কাব্য-সরোবরে,
সন্তাপ-সরোজ যাহে সদা শোভা করে।
নবরস-মধুপূর্ণ সে সরোজদল,
তাহা হ'তে মিষ্ট নহে পদ্ম-পরিমল।
কত না উপজে সুখ তাহার আঘ্রাণে,
ভাবুক-ভ্রমর মত্ত সেই মধু-পানে।
কল্পনায় বাঁধা সেই সরসীর তীর,
লালিত্য স্বরূপ তাহে নিরমল নীর।
নানাচ্ছন্দ হংসগণ সানন্দ অন্তরে,
দলে দলে সুকৌশলে বিচরণ করে।
যতি-যমকানুপ্রাস জলচরগণ,
সুখে ক্রীড়া করে, তাহা হেরি ভুলে মন।
অলঙ্কার-সারসেরা করিছে ঝঙ্কার,
শ্রবণে শ্রবণে হয় সুখের সঞ্চার।
এই সরসীর করি বারিবিন্দু পান,
স্নিগ্ধ হয় তাপিতের সন্তাপিত প্রাণ।
একবার পরশিলে এ বাপীর জল
নির্ব্বাপিত হয় নানা ভাবনা-অনল।
এমন সুখের সৃষ্টি করিছেন যাঁরা,
অহো, কিবা অলৌকিক শক্তিমান তাঁরা।"

তাই, এ মূর্ত্তিপূজায় চিরধ্যানমগ্ন কবি সকল দুঃখজ্বালা ভুলিয়া যান। মিত্রকবির মানসিক দৃঢ়চিত্ততার মূলেও ইহার শক্তি নিষ্ক্রিয় নহে।

কবি এই কবিতা-দেবীর পদে কাব্য-পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে নমস্কার জানাইতেছেন। তাঁহার ভাষায়,

"প্রফুল্লিতা সরসিজোপরি সমাসীনা,
মগনা পাষাণ-দ্রবকারী-গীতরসে,
সোহাগিনী-পুত্রীসমা অঙ্কস্থিতা বীণা
অমিয়া বরষে—কত অমিয়া বরষে!
গায়িছেন রাগ-রাগিণীর অধীশ্বরী,
একতান মনে তুলি তান সুমধুর,
হেন কালে এক কবি নতি করি
আহ্বানিল দেবীরে উড়িতে মনঃপুর।
ভকত-বৎসলা মাতা, ভকতে যেমন
স্মরিল, অমনি কণ্ঠে আটকিল তান,
চঞ্চলা হইল দেবী; স্থগিল বাদন;
স্থিরচক্ষে বাগীশ্বরী ইতস্ততঃ চান।
ঈদৃশী যে চিন্তাপরা, অভীষ্ট-বরদা,
নমি, লোটাইয়া শির তাঁর পদতলে,
রাখুন নির্ব্বিঘ্নে তিনি সজ্জনে সর্ব্বদা,
কবিকুলে অমর করুন কৃপাবলে।"

মিত্রকবি আশৈশব কবিতা-দেবীর সেবা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"কোথায় কবিত্ব? শৈশব-বান্ধব!
কল্পনার বীণা দাওহে করে;
গাওতো তুলিয়ে সুমধুর রব
মম স্বরসহ সমান স্বরে।"

শৈশব-বান্ধব কবিতাকে মিত্রকবি নানা-ভাবে, নানা দৃষ্টিতে দেখিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

আমরা কবিতা-দেবীকে দেবীমূর্ত্তিতে ও কাব্য-সরোবরে দেখিয়াছি। পরে তাঁহাকেই আবার দেখিলাম 'সরসিজোপরি সমাসীনা পাষাণদ্রবকারী গীতরসে মগ্না'। এক্ষণ কবিতা-দেবীকে শত্রুব্যূহে দেখিব। তার্কিক, সমালোচক প্রভৃতির উৎপাতে ক্ষিপ্তহৃদয়া কবিতা-দেবীকে

* এই 'কবিতাটীই'—"কবিতা-কুসুমাবলী"—পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রথমতঃ প্রকাশিত হয়। ইহাই মিত্রকবির সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা। 'প্রতিভায়' এই কবিতাটীর কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

রক্ষায় কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছি। কবির কথায়—

"হে কবিতা-কুরঙ্গিণি! বঙ্গারণ্য-বিহারিণি!
বিষম বিপদ আজি ঘটিল যে ঘটিল।
সম্মুখে কেশরী প্রায়, তার্কিকেরা গরজায়,
অই দেখ বোধ হয়! তোমা যেন গ্রাসিল।
চেয়ে দেখ পাছুপানে বধিতে তোমায় প্রাণে
বৈয়াকরণিক-ব্যাধ সসন্ধানে রয়েছে!
বামেতে শার্দ্দূল-ন্যায় আলঙ্কারিকেরা চায়,
স্থির নেত্রে খায় খায় হেন বোধ হতেছে।
দোষগ্রাহি-সম্প্রদায় শিকারী কুকুর প্রায়
দক্ষিণে ডাকিছে।—তুমি এত শত্রু মাঝারে!
বিভু তোমা এই বার, নির্ব্বিঘ্নে করুন পার,
ভগ্ন অঙ্গ কেহ যেন নাহি করে তোমারে।"

কবির মর্ম্ম-কাতরতা পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে; পরন্তু মিত্র-কবির যুগে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে—কাব্য-রচনায় কবিকে কত দিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইত মিত্র-কবি এস্থলে তাহার একটা চিত্র প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণ, কবি-সমাজ একরূপ নিরঙ্কুশ!

কবি কবিতার দোষ-গুণ এবং কবিকুলের সমাদর করিতে গিয়া কি ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য। মিত্রকবির মতে—

"লালিত্যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরে,
অনুপ্রাস আড়ম্বরে প্রভাকর-করে,
ওজঃগুণ-গরিমায় শ্রীকবিকঙ্কণে,
উপমায়, কল্পনায় শ্রীমধুসূদনে,
জিনে, হেন কবিদর্পী আছে যত জন,
মস্তকেতে ধরি আমি তাদের চরণ।"

মিত্রকবি তৎকালপ্রসিদ্ধ কয়েকজন কবির কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ বা কাব্য-সৌন্দর্য্যের অনুধ্যান করিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ছয়টী পংক্তিতে অপূর্ব্ব কাব্য-কৌশলে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কবি বা কাব্যোপাসক-সম্প্রদায় সম্পর্কে—মিত্রকবির সময়ে দেশের দশে কি মনে করিত, মিত্র কবির কাব্যে তাহার পরিচয় পাইতেছি। অবশ্য সকলেই * এ বিষয়ে বা এক বিষয়ে একমতাবলম্বী ছিলেন, আমরা তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। কাব্যেও "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। তবে, কবির কাব্যে এক সম্প্রদায়ের মত সাধারণতঃ পরিব্যক্ত হয়। দশের চিন্তার ফলে কবি অনুপ্রাণিত হন; তাই, তাঁহার কাব্যে যাহা থাকে, লোক-সমষ্টি সমাজে যখন যে ভাবের প্রাবল্য ঘটে, কবির কাব্যে তাহাই পরিস্ফুট হয়।

মিত্রকবির আক্ষেপের ভাষায়—

"সে দিন কোথায়—হায়, সে দিন কোথায়!
ছিল এই দেশ যবে খ্যাত কবিতায়।
কোথা কবি কীর্ত্তিবাস, কোথা কাশীরাম দাস,
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি যাঁরা বসুধায়;
কোথা শ্রীকবি-কঙ্কণ, কোথা সে কবিরঞ্জন,
মোহিত করিত মন যাঁরা রচনায়।
বাঙ্গালার কবীশ্বর, ভারত সদ্‌গুণাকর,
কবি রায়গুণাকর সবে বলে যাঁয়;
কি দুর্ভাগ্য মরি মরি নিদয় হৃদয় হরি—
অকালে তাঁহারে হরি প্রমাদ ঘটায়।"
"সুকবি ঈশ্বর গুপ্ত তিনিও হলেন গুপ্ত
কালগৃহে, প্রায় লুপ্ত কবি বাঙ্গালায়,
কবিত্ব প্রকাশে যাঁয়, পোড়াকাল গ্রাসে তাঁয়,
এ দুঃখ কহিব কায় হায় হায় হায়।
মধুর সুস্বরবান পিকগুরু করি গান
তুষি শ্রোতাদের প্রাণ হইলা বিদায়,

* কবিগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছিলেন; সেই সময় ঢাকা-সম্পর্কে তিনি একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন। মিত্রকবি সেই কবিতার প্রত্যুত্তরে তদ্দণ্ডেই মুখে মুখে একটী কবিতা রচনা করিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করেন। এই ব্যাপারে কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদনও তাঁহাকে প্রকৃত স্বভাব-কবিরূপে—সহজ রচনায় তাঁহাকে আপনার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদান করিতে এখনও ঢাকায় অনেকে জীবিত রহিয়াছেন। মাইকেলের জীবন-চরিত-গ্রন্থে মাইকেলের ঢাকা আগমন বা এই ঘটনার কোন উল্লেখই নাই।

তাঁদের ধ্বংসপ্রত্যাশী কঠোর কর্কশভাষী
বায়স পেঁচক আসি গাইয়া বেড়ায়,
আধুনিক কবিগণে, আহরিয়া প্রাণপণে
অলঙ্কার সযতনে, সাজান গাথায়।
পরিশ্রমমাত্র সার;—মণিময় অলঙ্কার,
কতক্ষণ প্রশংসার, কুরূপার গায়?
স্বভাবে পিকের স্বর জনগণ মনোহর,
অভ্যাসে কি সে সুস্বর লাভ করা যায়?
নাহি বেশ, নাহি ভূষা, স্বভাব-সুন্দরী উষা,
হেরে তারে কে না ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে যায়?

* * * *

ভুবন প্রমোদকর ঋতুকুল অধীশ্বর
মধু, সহ-সহচর, অকালে লুকায়!
আর সেই সুধাকরে, তেমন না সুধা ক্ষরে,
তেমন না পিকবরে সুধাস্বরে গায়!
আর সে উদ্যান মাঝে, সাজিয়া কুসুম সাজে,
বনদেবী না বিরাজে মধু-মমতায়।
আইল প্রাবৃট্‌কাল নাদিছে মণ্ডূকপাল,
গগনে নীরদজাল শুধু গরজায়।
লুপ্ত দেখি মহাকরে, গুপ্ত দেখি সুধাকরে
খদ্যোতেরা মানভরে প্রতিভা দেখায়।
ঝিঁঝি হইল বিমুখ, কোথা আর নাহি দুঃখ;
হায় পরিতাপে বুক বিদরিয়া যায়।"

এ মর্ম্মদাহী অক্ষেপ-স্তোত্রে মিত্রকবি বরেণ্য কবি-কুলের চরণে কেমন শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়াছেন! ইহাতে অতীত-বর্ত্তমানের কবি-সমাজেরও কেমন একটী চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিবেন।

কবির কথায়, কাব্য-কৌশলের সার্থকতা কি এবং কবির সৃষ্ট জগতে ও প্রকৃতির সৃষ্ট জগতে বিস্ময়-বৈচিত্র্য কোথায়, এক্ষণ তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ইহাতেই আমরা কাব্য-রচনায় কবির লক্ষ্যপথের সন্ধান পাইব। মিত্রকবি লিখিয়াছেন—

"নিজে কবি প্রাণ ত্যাজি কালের কৌশলে,
উপদেশ শিক্ষা দেন কাব্যের কৌশলে।'

কবির তিরোধানেও সমাজ-শিক্ষায় কবির উপদেশ নিষ্ফল নহে। কবি জীবিত না থাকিলেও—

"কিন্তু তাহাদের কাব্য যবে করি পাঠ,
তখনি হৃদয়ে বসে আনন্দের হাট;
সম্মুখে দাঁড়ায় যেন সেই কবিগণ,
নানা ছলে উপদেশ করিয়া প্রদান
করেন হৃদয়ে কত সুখের বিধান।"

প্রকৃতির সৃষ্ট জগত ও কবির সৃষ্ট জগত স্বতন্ত্র; কবির কথায়—

"ধাতার সৃজন হ'তে কবির সৃজন,
কার না হৃদয়ে করে বিস্ময়োৎপাদন?"

এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ—কাব্য-কৌশল। এ জন্যই কবি কবিকে যে ভাবে বুঝেন, সাধারণে কবিকে সেইভাবে বুঝিতে পারে না।

কবির কাব্য-জীবনের ইতিহাস দু' এক কথায় শেষ হইল—ইহাতে কাহারও তৃপ্তি জন্মিবে না, জানি; তথাপি সাধারণ পাঠকের হস্তে আমরা মিত্রকবির আত্ম-কথায় তাঁহার কবি-জীবনের একটী পূর্ব্বাপর-সংলগ্ন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আমরা প্রবন্ধান্তরে ইঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্য বুঝিতে চাহিব। ইতঃপূর্ব্বেও আমরা কএক স্থলে দেখাইয়াছি, কবি কাব্যে আত্ম-জীবনের দু একটী ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে একটু বিশদভাবেই তাহার আলোচনা করিব।

কবি ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন; ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই সময় কবি প্রধানতঃ—

(১) রামায়ণ মহাকাব্য (আদিকাণ্ড) ও

(২) নির্ব্বাসিতা-সীতা রচনা করেন। দুইখানা গ্রন্থই তাঁহার কাব্য-প্রতিভার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। জীবনের শেষ দিনে করুণ রসের উৎস নির্ব্বাসিতা সীতা রচনা করিয়া বাঙ্গালার এক অমূল্য সম্পদ বাড়াইয়া গিয়াছেন। 'মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র' প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, রোগের যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হইয়াও, প্রাণের আবেগে জীবন তুচ্ছ করিয়াও, তিনি বাগ্দেবীর সেবা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উভয় কাব্যেই কবি তাঁহার তাৎকালীন জীবন-যাত্রা-প্রণালীর স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। রামায়ণের উপ-সংহারভাগে মিত্রকবি লিখিয়াছেন—

"বিশেষ বিবিধ রোগ, উদ্যমে করিয়া যোগ
আশালতা অভাগার অঙ্কুরেই দহিল।
দিনেক দু'দিন নয় প্রায় হয় বর্ষত্রয়
করিয়াছি শয্যাসার নানামত ব্যাধিতে।
দারুণ উদরাময় কিছুতে না দূর হয়
উপসর্গ কত তায় নাহি পারি কহিতে।
কখন উপজি' কাশ হৃদয়েতে বাঁধে বাস
ফেলিতে পারিনা শ্বাস মরি প্রাণে গুমরি',
পা দু'খানি করি স্ফীত, কভু শোথ উপস্থিত
কভু অর্শ-রক্ত ক্ষরে কিবা দিবা শর্ব্বরী।
যেরূপ রোগের কোপ কোন দিন নাম লোপ
হ'ত যাইতাম চলি কৃতান্তের গারদে।
কালীর করুণা বলে আজিও অবনীতলে
বেঁচে আছি—মরি নাই, তাঁরি কৃপা-ঔষধে।
যা হো'ক হে রামায়ণ সয়ে নানা বিড়ম্বন,
খণ্ড এক সমাপন করিলাম যতনে।
রোগার চিন্তার ফলে কি জানি কি ফল ফলে
পণ্ডিত-মণ্ডলে বলে না জানি কি শ্রবণে।
শুনহে স্বরূপ কই যদি প্রাণে বেঁচে রই
যদি রোগমুক্ত হই পরমেশ কৃপাতে—
যদি বিজ্ঞ আঢ্যগণ করি তোমা আলোচন
করেন সাহায্যদান নিজগুণ দয়াতে,
তবেইত অনুরাগে তোমার অন্যান্য ভাগে
রামলীলা সমুদয় যথাক্রমে গাঁথিব।
নতুবা পরিচয়-পাত্র তুমিই রহিলে মাত্র
আমি দুঃখে ক্ষোভে লাজে লেখনীকে ত্যাজিব।"

ইহাই কবির ও কবিহৃদয়ের তাৎকালীন চিত্র। শাক্তধর্ম্মী মিত্রকবি তখন ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ৺কালী কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তাই কাল-ভয়বারিণী কালীর কৃপা-ঔষধে বা কালী কবিরাজ মহাশয়ের বিনামূল্যে প্রদত্ত কৃপা-ঔষধে তিনি রোগগ্রস্ত দেহটীকে কোন প্রকারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, পরিণামে ইহাই তাঁহার কালব্যাধি হইল—তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে রামায়ণের আদিকাণ্ডই মাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন; তখন "অযোধ্যাকাণ্ড" মুদ্রিত হইতেছিল মাত্র।

এই সময়ে—প্রায় পাঁচ বৎসর রোগযন্ত্রণাভোগের পর সেই 'নির্ব্বাসিতা সীতা'র বিলাপ সঙ্গীত—

"সম্পূর্ণ সঙ্গীত গাইয়ে আজি,
বিদূরিতে নিজ হৃদয়-সন্তাপ—
বড় সাধ করি বসিল সাজি!
* * *
নির্ব্বাসিতা সীতা বিলাপ-সঙ্গীত
মনোসাধে আজ হরিশ গায়।
শুনি শ্রোতা সবে হ'য়ে একচিত
দোষো, রোষো, তোষো যা ইচ্ছা যায় *

এই সঙ্গীতস্রাবী কবিতায় বা গীতিকবিতায় কবি আপনার হৃদয়ের একটী আলেখ্য প্রদান করিতেছেন। চিকিৎসকের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া, শয্যাশায়ী থাকিয়াও মিত্রকবি 'নির্ব্বাসিতা সীতা' রচনা করিয়াছেন। এই সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—রোগের প্রকোপে তাঁহার হস্তপদ প্রায় অসার হইয়া পড়িয়াছিল। এসময় মানসিক ব্যায়াম তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি, কাব্য-সৌন্দর্য্যের সাড়ায় বা স্পন্দনে কবির সকল অন্তরায়ই ঘুচিয়া গেল মিত্রকবি মুখে মুখে বিলাপ-সঙ্গীত গাইলেন; আর, তাঁহারই একজন ভক্ত-শিষ্য (২) 'কালী কলমে' তাহা লিখিয়া লইলেন। এই ভাবেই তিনদিনে 'নির্ব্বাসিতা সীতার' প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল—কবি রোগে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াও, 'মনোসাধে' 'নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ-সঙ্গীত' গাইয়া 'নিজ হৃদয়ের সন্তাপ' দূর করিলেন!

* একজন আধুনিক কবিও এই সুরের অনুকরণে কার্য্যারম্ভে বলিয়াছেন—

বিচারি বাখানি, দোষো, রোষো, তোষো
যাঁহার যেমন রুচি।
—কবি মহেন্দ্রকুমার সোমের 'কৃষক বালা' ১ পৃষ্ঠ।

(২) ইঁহার নাম—শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ মহাশয়; ইনি পরম বৈষ্ণব; ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরার মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

'নির্ব্বাসিতা সীতা'র শেষ দুই পংক্তি কবির লেখক-শিষ্য শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ মহাশয় সংযোগ করিয়া দিয়াছেন—

"কল্পনার বীণা হইল স্থগিত,
সীতা শোকে তার ছিঁড়িল তার।"

এই সময়ে, কবির চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—মর্ম্মদাহের অনুভূতিতে বাক্‌রোধ ঘটিল। তখন 'নির্ব্বাসিতা-সীতা-বিলাপ সঙ্গীত'

"গাইতে 'হরিশ' পারেনা আর।"

আমাদের দুর্ভাগ্য, কবির শিষ্য কবির অবস্থা দেখিয়া সাময়িক উত্তেজনায় যাহা বলিয়াছেন—তাহাই যেন শেষে দৈববাণী হইল। সত্য সত্যই সীতাশোকে তাঁর তার ছিঁড়িয়া গেল—কিছুকাল পরে কবি অমর ধামে প্রস্থান করিলেন। 'নির্ব্বাসিতা সীতা'ই কবির শেষ রচনা।

কবির কাব্যজীবনে সাময়িক প্রভাব বা তাঁহার কাব্য-প্রতিভা-প্রদর্শন বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা প্রদর্শন করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইচ্ছা করিয়াই, উদ্ধৃত অংশ কোন্ স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ করি নাই। কবির কাব্যালোচনায় ইহার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কবিকে কবির কথায় বুঝিতে গিয়া, আমরা কোন কোন স্থল প্রয়োজনানুরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা-প্রদর্শনের প্রকৃত সুযোগ লাভ ঘটে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, 'কোকিলকণ্ঠ' কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রকে তাঁহারই কবিতায় যতটুক ধরিতে পারিয়াছি, অকৃতী, অযোগ্য আমি আমার ক্ষীণ লেখনীতে তাহারই ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। প্রকৃত কাব্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি মূল কাব্যেই তাঁহার কবিতার রসাস্বাদন করিবেন। তাঁহাদিগকে 'সাত নকলে আসল খাস্ত' লইয়াই তৃপ্ত রহিতে বলি না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মিত্রকবি স্বদেশ, সমাজ, মাতৃভাষা, স্বগৃহ প্রভৃতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহারও বিস্তৃত আলোচনার স্থল নাই। আমরা নিম্নে প্রসঙ্গক্রমে কএকটী মাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহারা বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠে চিরদিনই দ্যুতিমান মুক্তাহারের ন্যায় শোভা বিধান করিবে।—

গৃহ—"স্বর্গ স্বর্গ করে লোক সার তার নাম,
ফলতঃ প্রকৃত স্বর্গ আপনার ধাম।"

অন্যত্র—"তোমার হৃদয় হ'তে-মৃত্তিকা লইয়া
সুখে মুখে পুরিয়াছি অমৃত ভাবিয়া।"

মাতৃভাষা—

"মাতৃসমা মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

অন্যত্র—"বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা পূরাও তাহার আশা।"

স্বদেশ—"ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।

* * *

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

অন্যত্র—"এদেশের তরঙ্গিণী জল
পান কৈনু পিপাসায়; এদেশের সমুদায়
মহীরুহ ক্ষুধায় দিয়াছে স্বাদুফল।
যে কিছু সাহস-বল আছে কলেবরে,
এদেশের শস্যচয় সে সব বিতরে।"

অন্যত্র—স্বদেশে যদিও করি কুটীরেতে বাস
কুটীরত নয় তাহা ইন্দ্রের আবাস।"

সমাজ-সেবা—

"যাহাতে কুপ্রথা হয় উন্মূলিত
যাতে ধর্ম্মস্রোত হয় প্রবাহিত,
দেশময় যত্ন করে যথোচিত,
এসকল কাযে স্বার্থ করে পরিহার
ধরায় মানব জন্ম সফল তাহার।"

কুপ্রথা—

"তোমরা মনুষ্য-জাতি জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি
অন্তরের তমোরাশি করেছ অন্তর;
তবু কুপ্রথার অধীনতা-পাশ
ছেদিবার কেন না পাও প্রয়াস?" *

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কুপ্রথা' সম্বন্ধে মন্তব্যও এস্থলে আলোচ্য।

রঙ্গপুরের আত্ম-নিবেদন।

(রঙ্গপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যিকগণের প্রতি)

কামরূপ রাজ্যে আমি সুপ্রাচীন সভ্যতার ধাম,
জীবনের নানারঙ্গে এবে মোর রঙ্গপুর নাম।
যবে প্রাগ্‌জ্যোতিষের জ্যোতিদীপ্ত ছিল প্রাচ্যদেশ,
ছিল মোর শৌর্য্যবীর্য্য শক্তি দর্প ঐশ্বর্য্য অশেষ,
সচীবত্ব সৈনাপত্যে রাজসৌখ্য করিয়াছি ভোগ,
সন্তোষক্ষেত্রের মহামহোৎসবে দিয়াছিনু যোগ,—
সে সব স্বপন সম যেন সব পুরাজন্ম কথা,
যৌবনের সেইদিন স্মরিতেও আজি জাগে ব্যথা।
শিশু বঙ্গভূমি যবে মত্ত ছিল শৈশব-ক্রীড়ায়,
জন্মিয়াছে সমতট সবেমাত্র সাগর-শয্যায়,
ভারত-বাণিজ্য-লক্ষ্মী তাম্রলিপ্তে সিংহাসনাসীনা,
তক্ষশীলা নালন্দায় বাজিতেছে বাগ্‌দেবীর বীণা,
তথাগত-তথ্য গীত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধে—
সংঘারামে সংঘারামে চৈত্যে চৈত্যে বিহারে সংসদে,
নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধে বাহুপাশে,
নির্গ্রন্থেরা ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্ব গ্রন্থ গ্রাসে,—
বুদ্ধের চরণে আমি শস্ত্ররাজি করিয়া স্থাপন
সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে শীর্ষে আমি করিনু বহন।
পূর্ব্বদিক্‌পাল হয়ে আর্য্যধর্ম্মে বৌদ্ধ রাজনীতি
রক্ষিলাম উভয়েরে দুর করি সর্ব্ব শত্রুভীতি।
আশ্রমের যজ্ঞবহ্নি, মন্দিরের আরতি-প্রদীপে
নির্ব্বাপিত হইবারে দেইনিক বেদীর সমীপে;
দেবালয়ে দেবালয়ে পূর্ণ ছিল এ শ্যাম প্রান্তর,
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের শ্রুতিপাঠে পবিত্র মুখর;
দানে ধ্যানে তপে জপে শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য-বিস্তারে,
ইহ পরত্রের মিল অপরূপ ব্রহ্মপুত্র পারে!—
স্বপ্ন সম লাগে আজ যৌবনের সেই পুরা কথা,
নয়নে ঝরায় আজ করতোয়া স্মরণের ব্যথা।
সে দিনো মা ভবানীর পাদপীঠে লভিয়া আসন
দুই হস্তে বিলালাম বিপ্রগণে ভূমি রত্ন ধন।
অমৃতের সাধনায় যাইলেন ভূলোকের রমা,
তপস্বিনী সত্যবতী, মোরি কন্যা মৈত্রেয়ীর সমা,—
মোরি কন্যা তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দেবী চৌধুরাণী,
তার কথা উপন্যাস নহে শুধু, ধ্রুব সত্যবাণী।
আরো বহু পূর্ব্বকথা হয়ত সে হবেনা বিশ্বাস,
এখন সম্বল মম বক্ষভরা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
পূর্ব্বের জীবন মম আজি হের আছন্ন জরায়,
মম রাজবেশ আজি ছিন্ন ভিন্ন মলিন ধূলায়;
লৌহিত্যের তীরে আজ পর্ণগৃহ নিরমাণ করি'
অজ্ঞাত জীবন যাপি এ বার্দ্ধক্যে বৈশ্যবৃত্তি ধরি'।
সন্তানে যোগান অন্ন কমলা মা আজো চুপে চুপে,
করুণা-আশীষধারা বহে আজো ত্রিস্রোতার রূপে।
এবে পুঁজি পয়স্বিনী গাভীগুলি আর পর্ণশালা,
সুশ্যাম কেদার খণ্ড মীননেত্রা তটিনীর মালা।

কি সৌভাগ্য আমি, মোর এ অজ্ঞাত বিজন কুটীরে
সোনার কমল গুলি এলে ভাসি প্রেমবন্যা-নীরে।
বঙ্গের ভরসা-ভূমি, সুধী বুধ জ্ঞানী গুণিগণ
করিলে এ অভাগার দীনগৃহে আতিথ্য গ্রহণ।
ভগ্ন গৃহে ছিদ্রপথে নবারুণ-রশ্মিরেখা সম
এস এস প্রিয়গণ বক্ষে এস চক্ষে এস মম!
এস এস বাণী-পাদ-পদ্ম-মধু-মত্ত অলিকুল!
মূর্ত্তিমান সামমন্ত্র সম এস ভাস্বর মঞ্জুল!
কোথা রাখি? অর্ঘ্য কই? কি কহিব ভাবি রুদ্ধ শ্বাসে,
আনন্দের বাষ্প ভারে কণ্ঠ মোর শুব্ধ হয়ে আসে।
জীর্ণ জনে কর ক্ষমা কৃতাঞ্জলি করি নিবেদন,
পাবন পরশে কর সব ক্রটী মালিন্য মোচন।
জ্ঞান-তীর্থ-যাত্রিগণ! যদি দিলে দেখা দয়া করে
প্রাচীন এ হৃদিবটতরুতলে বসো ছায়া-ক্রোড়ে।
হৃদয়-পঞ্জর-তন্ত্রী তোমাদের শ্রীকর-পরশে,
আজিকে উঠিছে বাজি' ক্ষীণস্মৃত সঙ্গীত-হরষে।
পাষাণ শিহরি' উঠে তোমাদের চরণ-ধূলায়,
তোমরা জাগায়ে তোল গুহাহিতে আলোকমালায়;
মূকেরে মুখর কর, ভেঙ্গে দাও মৌনীজন-ব্রত,
লুপ্ত লভে পুনর্জ্জন্ম, সুষুপ্তেরে করিছ জাগ্রত;

অভিশপ্ত লভে মুক্তি, নির্ব্বাসিত লভিছে স্বদেশ,
করুণায় মরুভূমি ধরে মণি মরকত বেশ।
দয়া করি আসিয়াছ যদি এই অজ্ঞাত আবাসে,
সভ্যতা-লক্ষ্মীর পাদ-পদ্ম-গন্ধ যথা নাহি আসে।
অতীতের প্রেতছায়া সম যেন জাগিছে স্বপনে
ক্ষীণ পরিচয় এর বর্ত্তমান জগতের সনে।
প্রতি ধূলিকণা মাঝে এ কুটীরে কত পুরা কথা
গুপ্ত আছে তার মাঝে গুমরিছে অতীতের ব্যথা।
গৌরবের লুপ্তস্তরে প্রতি তরু করি' রস পান,
রস-সাহিত্যের কথা কহিবারে উদ্বেলিত প্রাণ।
প্রতি শিলা-বক্ষ মাঝে বন্দী রহি' লৌহের কারায়
কাহিনী মাগিছে মুক্তি বঙ্গব্যাপী আনন্দ-মেলায়।
প্রত্যেক বল্মীক মাঝে বিরাজিছে কবিত্ব-বৈভব,
ভগ্ন দেউলের মাঝে সুপ্ত কত অতীত গৌরব।
উর্ণনাভ জালে ঢাকা সুপ্ত আছে কত বীণা বেণু।
ত্রিস্রোতা-সিকতে গুপ্ত সাহিত্যের কত স্বর্ণরেণু !
কত শত বৎসরের অকথিত স্বপ্ন সম বাণী,
সাধ যায় একে একে মর্ম্ম হতে টেনে টেনে আনি।

সঞ্জীবনস্পর্শ আনি' জড়িমায় জাগাও জীবন,
মুখর করিয়া তোল শিলাতরু ক্ষেত্র পথবন।
অতীতের গুরুভার বক্ষ হতে দাও লঘু করি',
নব জাগরণ-তীর্থে যোগ দেই রশ্মি-পথ ধরি'।
বাণীপদতলে রাখি' গৌরবের মোর পুরাতন,
জীর্ণ বাস ত্যজি' আমি চাহি বন্ধু, নূতন জীবন।
হেরিতেছি আনন্দের শুকতারা ব্রহ্মপুত্র-তীরে
ভোরের পাখীরা গাহ জয় জয় আমার কুটীরে।

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

সাংখ্যদর্শনে ক্রমবিকাশ-বাদ।*

পাশ্চাত্যদিগের দ্বারাই ক্রমবিকাশ মত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তৎপূর্ব্বে আর কেহই বৈজ্ঞানিকভাবে ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন নাই, ইহাই সকলের বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের মধ্যে যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটী ক্রমবিকাশ-বাদ পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদোৎপত্তির বহু পূর্ব্বেই গঠন প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা একটু নিবিষ্টভাবে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব।

সাংখ্যদর্শন জগতের প্রকৃত বিজ্ঞান নির্ণয় করিবার জন্য সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের আমূল বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহারই ফলে তিনটী গুণকেই মাত্র সমস্ত জগৎরচনার মূলসূত্ররূপে সাংখ্যদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিল। এই তিনগুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। জগতের সমস্ত পদার্থে সাংখ্যদর্শন ন্যূনাধিক মাত্রায় এই গুণত্রয়েরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাইয়াছিল। ইহা হইতে জগৎকে ত্রিগুণাত্মক দেখিতে পাইয়াই জগতের মূলগঠনকে সাংখ্যদর্শন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই "প্রকৃতি" শব্দটী বিশেষরূপেই অন্বর্থক। জগতের প্রকৃত রূপের দ্যোতক বলিয়াই ইহার নাম "প্রকৃতি" হইয়াছে। আমাদের বাহ্যাভ্যন্তর উভয় প্রকারের স্বভাব বুঝাইতে যে "প্রকৃতি" শব্দের প্রয়োগ হয় তাহাতেও আমরা পূর্ব্বোক্তার্থেরই প্রয়োগ দেখিতে পাই।

সৃষ্টির অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে সাংখ্যদর্শন সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তিনটী মূলভাব অবলম্বন রূপে বর্ত্তমান দেখিতে পাইয়াছিল। একটী জড়তার ভাব, একটী ক্রিয়ার ভাব ও একটী চৈতন্যের ভাব। জড়তাভাবের নাম সাংখ্যদর্শন দিয়াছে 'তমোগুণ', ক্রিয়াভাবের নাম দিয়াছে 'রজোগুণ' ও চৈতন্যভাবের নাম দিয়াছে 'সত্ত্বগুণ'। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির এতদপেক্ষা গুরুতম বিশ্লেষণ

* যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনে পরিগৃহীত।

পৃথিবীর আর কোন দর্শন বিজ্ঞানে হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা উল্লিখিত সাংখ্যদর্শন বিশ্লেষণটী উদ্ভাসিত দেখিতে পাই না। পরন্তু তাহার আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড় ও শক্তি (matter and force) সাংখ্য বিশ্লেষণের একদেশ মাত্র প্রদর্শন করে। 'জড়' সাংখ্যদর্শনের তমেরই আভাস প্রদান করে এবং 'শক্তি' সাংখ্যদর্শনের রজোগুণের আভাস প্রদান করে। এই উভয় 'জড়' ও 'শক্তির' সহিত পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মনস্তত্বের যোগ করিলে তবেই আমরা সাংখ্যদর্শনের সত্ত্বগুণের আভাস পাইতে পারি। পাশ্চাত্য-দর্শন, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের "শক্তিরূপ" শেষ সিদ্ধান্তকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়া তাহাতে চৈতন্যের যোগ সাধন করতঃ যে ইহার পূর্ণতাবিধানের প্রয়াস পাইয়াছে তাহাতেই সাংখ্যদর্শন সিদ্ধান্তের সারবত্তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়।

সত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের মাত্রাভেদ ও কার্য্যভেদদ্বারাই সৃষ্টি ও সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে। সুতরাং সমস্ত বিশ্ববিকাশের মূল রহস্য যে এই গুণত্রয়েই নিহিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তমোগুণটীই সর্ব্বনিকৃষ্ট গুণ। তমোগুণের দ্বারা কেবল জড়ভাব প্রকাশিত হয় তাহা নহে, কিন্তু অন্ধকারের ভাবও প্রকাশিত হয়। তাহাতেই তমঃ শব্দ তমোগুণ ও অন্ধকার উভয়েরই বাচক হইয়াছে। তমঃ শব্দের এই অন্ধকার অর্থ হইতেই প্রথম বিকাশ যে তমোগুণ হইতেই আরব্ধ হয় তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনাতে আমরা অন্ধকারকেই সৃষ্টির আদিতে বিরাজিত বলিয়া জ্ঞাত হই। এখানে আমরা বেদ ও মনুসংহিতা হইতে দুইটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তমআসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥" ৩

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

"সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।"—রমেশ বাবুর অনুবাদ।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" ৫

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়।

"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারব্যাপ্ত (তমোময়) ছিল, ইহার কোন চিহ্ন না থাকায় ইহা প্রত্যক্ষ অনুমান বা জ্ঞানের বিষয় ছিল না। সর্ব্বত্রই যেন নিদ্রিত ভাব ছিল।"

উদ্ধৃত বৈদিক বর্ণনায় আমরা অন্ধকার হইতে তপস্যার প্রভাবে এক প্রাণবস্তুর উৎপত্তির যে বিবরণ পাইতেছি তাহাতেই সমস্ত বিকাশতত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তমের পর যে তপের উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহা আমাদের নিকট তাপ বা তেজ বলিয়াই মনে হয়। তাপ বা তেজ হইতেই প্রথম ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সুতরাং তাপকে আমরা রজোগুণাত্মক বলিয়াই বুঝিতে পারি। এই তাপ বা তেজের বিশেষ পরিণামই প্রাণ বা চৈতন্য। এই প্রাণ বা চৈতন্যই সত্বগুণাকর।

বিশ্বসৃষ্টির জন্য প্রথম যে তেজোরাশি পিণ্ডীভূত হইয়াছিল তাহাই 'ব্রহ্মাণ্ড' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পিণ্ডীভূত তেজোরাশির পরিণামরূপেই পরম চৈতন্যময় পুরুষের আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডীভূত অণ্ডাকার তেজোরাশির মধ্য হইতে এই পুরুষের উৎপত্তি হয় বলিয়াই ইনি "হিরণ্যগর্ভ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনুসংহিতায় এই বিকাশতত্ব অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" ৯

১ম অধ্যায়।

"সেই (পিণ্ডীভূত তেজ) সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত সুবর্ণবর্ণ একটী পিণ্ড হইল। তাহাতে সকল সৃষ্টির জনক

স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন।" এই ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা, ইনিই বিধাতা বা ধাতা নামে আখ্যাত।

বেদের নিম্নোদ্ধৃত সৃষ্টিবর্ণনায়ও আমরা মনু-উক্ত বিকাশ-প্রক্রিয়ারই প্রথম কল্পনা দেখিতে পাইঃ—

"ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ॥ ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী॥ ২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথোস্বঃ॥" ৩

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯০ সূক্ত।

"১। প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল। পরে জলপূর্ণ সমুদ্র।

২। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোক দেখিতেছে।

৩। সৃষ্টিকর্ত্তা যথাসময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।" —রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এখানে 'তপঃ' 'তপস্যা' বলিয়া অনুদিত হইলেও ইহা তাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাপ বা রজোগুণের কার্য্য আরম্ভ হইলেই সৃষ্টি প্রসূত হইতে আরম্ভ করিল। যে প্রকারে রজোগুণের কার্য্য নিয়মিত হইতে থাকিল—তাহাই ঋত * বা বিশ্বনিয়ম হইল এবং যে উপাদানযোগে এই কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইল তাহাই সত্য বা বিশ্বের নিত্যোপাদান হইল। প্রথম তমোগুণের বাহুল্য হইতে অন্ধকারেরই মাত্র প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতে লাগিল। তাহাই 'রাত্রি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অন্ধকার হইতে জলীয় সূক্ষ্মবাষ্প আবির্ভূত হইল—ইহাই "সমুদ্র অর্ণবঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পরে চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি হইলে সংবৎসরাত্মক কালবিভাগ উৎপন্ন হইল। কিন্তু এই সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টি কেবল রজোগুণের কার্য্যের দ্বারা হইল না। তাপ বা রজোগুণের বিপরিণামরূপ চৈতন্যরূপ 'ধাতা' বা বিধাতা পুরুষ উৎপন্ন হইয়া তৎকর্ত্তৃকই সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টি হইল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দিবারাত্রি কালবিভাগ হইল। আকাশ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষও এই পুরুষ কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইল। বেদের 'ধাতা' যে মনুর ব্রহ্মার সহিত অভিন্ন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

উপরে যে বিকাশ-প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আমরা প্রদান করিলাম, তাহাতে আমরা প্রথম কেবল জড় বা অচেতনের বিকাশেরই উল্লেখ প্রাপ্ত হই—চেতনের বিকাশের উল্লেখ প্রাপ্ত হই না। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতে প্রথম যে মহত্তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহাও প্রথম জড়বিকাশ বলিয়াই বোধ হয়। কারণ মহত্তত্ত্বের পরবর্ত্তী 'অহঙ্কার', 'বুদ্ধি', 'মন' প্রভৃতি তত্ত্বই চৈতন্যানুপ্রাণিত তত্ত্ব। এই সমস্ত তত্ত্বেই পুরুষের বিশেষ যোগ বলিয়া এই গুলিকে চেতনসৃষ্টি বলা যায়—আর মহত্তত্ত্বের সহিত পুরুষ বা চেতনতত্ত্বের বিশেষ যোগ না থাকায় ইহাকে পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি বলা যায়। পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি যে বিজ্ঞানে চৈতন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় সাংখ্য দর্শনের মহত্তত্ত্বের প্রথম বিকাশে আমরা তাহাই প্রতিপাদিত দেখিতে পাই।

বেদ ও মনুসংহিতা উভয়ের বর্ণনায়ই জলের প্রথম উৎপত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদে আমরা জলের পর পৃথিবীরও উল্লেখ প্রাপ্ত হই। এই প্রকারে জলস্থলরূপ স্থাবরেরই যে প্রথম সৃষ্টি হয় তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। স্থাবর সৃষ্টি বিশেষরূপে তমোবহুল, কেবল উদ্ভিদেই আমরা প্রথম চেতনাসঞ্চারের লক্ষণ দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় উদ্ভিদের এই বিশেষত্ব অতি স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশিত হইয়াছেঃ—

"তমসা বহুরূপেন বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" ৪৯

১ম অধ্যায়।

"ইহারা বহুলরূপে তমোগুণের দ্বারা বাহিরের কার্য্য, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা অন্তঃচৈতন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহারা সুখদুঃখযুক্ত বলিয়াও প্রতীয়মান হয়।"

* ঋতের যেমন যজ্ঞার্থ আছে তেমনই নিয়ম অর্থও আছে।

উদ্ভিদসকল তমোগুণের দ্বারা সমাক্রান্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে রজোগুণের কার্য্য প্রকাশ পাইতে পারে না। জীবসৃষ্টির মধ্যেই প্রথম রজোগুণের কার্য্য বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবসৃষ্টির মধ্যেও একটী বিকাশক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের দশাবতার কল্পনা সেই-ক্রমেরই রূপক মাত্র। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের পর বামনাবতার। বামন অবতারই প্রকৃত মনুষ্য অবতার—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবতার সকলই জন্তু অবতার। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ইতর জীবের বিকাশই পূর্ব্বে হইয়াছে—মনুষ্যের বিকাশ অনেক পরে হইয়াছে। ইতর জীবে যেমন রজোগুণের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্যেও তেমনই সত্ত্বগুণের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাই মনুষ্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনুষ্যে সত্ত্বগুণের বিশেষ সঞ্চার হইলেও তিন গুণেরই প্রভাব তাহার উপর প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে এবং ইহাদের ন্যূনাধিক্য দ্বারাই মনুষ্যবিকাশের তারতম্য সঙ্ঘটিত হয়। এতৎসম্বন্ধে গীতাতে অতি বিশদ বর্ণনাই পাওয়া যায়:—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নাতি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্রসত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

—১৪শ অধ্যায়।

"হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন প্রকৃতি সম্ভূত গুণ আত্মাকে আবদ্ধ করে।" ৫

"হে অপাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মল হেতু প্রকাশক এবং শান্ত, সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখে আসক্তি দ্বারা এবং জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা বদ্ধ করে।" ৬

"হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহীকে কর্ম্মসকলে আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।" ৭

"হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত; এ জন্য সকল প্রাণীর মোহজনক জানিও। ইহা অনবধানতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতাদ্বারা দেহীদিগকে আবদ্ধ করে।" ৮

বিভিন্নগুণের প্রাধান্যদ্বারা কিরূপ বিশেষ লক্ষণ প্রকটিত হয় তাহাও পরিষ্কারভাবে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে!—

"সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥" ১৩

—১৪শ অধ্যায়।

"যখন এই দেহে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে জ্ঞানময় প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণকে বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত জানিবে।" ১১

"হে ভারতর্ষভ! লোভ, প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা সকাম কর্ম্মকরণেচ্ছা), কর্ম্ম সকলের আরম্ভ (উদ্যম), অশম (অশান্তি), এবং স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা) এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলেই জন্মে।" ১২

"হে কুরুনন্দন! বিবেকহীনতা, উদ্যমরাহিত্য, ভ্রান্তি, মোহ, এই সকল চিহ্ন তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয়।" ১৩

এই সমস্ত গুণত্রয়ের অনুশীলনদ্বারা জীবনের কিরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয় গীতায় তাহারও পরিষ্কার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"যদাসত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ংগত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনতমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥" ১৫

—১১শ অধ্যায়।

"যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়)।"

"রজোগুণে বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মৃতব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মে।"—আর্য্যমিশন অনুবাদ।

গুণানুশীলনের দ্বারা কেবল যে পরলোকেই আমাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়া থাকে তাহা নহে, ইহলোকেও যে বিভিন্ন পরিণতি হয় গীতার বর্ণনা হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়ঃ—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যেতিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥" ১৮

১৪শ অধ্যায়।

"সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে, আর নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা অধঃপথে গমন করে

এখানে আমরা যেন তিন গুণানুসারে ক্রমবিকাশের তিন প্রধান গুণেরই নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইতেছি। তমোগুণান্বিত জীব বিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত হয়; রজোগুণান্বিত জীব মধ্যস্তরে অবস্থিত হয় এবং সত্ত্বগুণান্বিত জীব সর্ব্বোচ্চস্তরে আরোহণ করে। ইহাই উন্নতির শেষ স্তর।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়াই আমাদের চৈতন্যের পরিস্ফুরণ হয়, মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রকৃষ্ট। বুদ্ধির অপেক্ষা আবার বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রকৃষ্ট। এইপ্রকার ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ আমাদের বিকাশের পরিমাপক হইতে পারে। গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক এই বিকাশ-প্রক্রিয়ারই আভাস প্রদানকরেঃ—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তুসঃ॥" ৪২

—৩য় অধ্যায়।

"ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলা যায়; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) তিনি সেই (আত্মা)।" —আর্য্যমিশন অনুবাদ।

মনুসংহিতায় এই বিকাশপ্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত অতি পরিস্কাররূপেই প্রদর্শিত হইয়াছেঃ—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥" ৯৫

—১ম অধ্যায়।

"স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তাদৃশদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবী জীবের মধ্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ হয় ও মনুষ্যদিগের মধ্যে মোক্ষ অধিকারী ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ হয়েন।"—৺ভরত শিরোমণির অনুবাদ।

চৈতন্যের ক্রমোৎকর্ষ দ্বারা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হইয়া কিরূপে সত্ত্বগুণ ব্রহ্মসারূপ্যে পর্য্যন্ত পরিণত হইতে পারে তাহাই আমরা উদ্ধৃত বিবরণ হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

সম্প্রতি মাত্র পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও শারীরিক ও মানসিক বিকাশই মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। পরন্তু সাংখ্যদর্শন স্মরণাতীতকালে উৎপন্ন হইলেও কেবলমাত্র গুণত্রয়ের কল্পনা দ্বারাই শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সমস্ত বিকাশেরই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছে। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়া ইহার পূর্ণতা যত সহজে সাধন করিতে পারে তত বোধহয় অন্য আর কিছুতেই পারিবে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

একবিন্দু।

অলখ-অসীম হে মহামহিম!
তোমারে কি যায় ধরা?

আমি
মেকীর কাঙাল—অনাথ আতুর,
ফকিরী করিয়া হয়েছি ফতুর,
তুমি প্রীতি—নহ প্রতিমা ধাতুর,
তোমারে কি যায় গড়া?

তবু,
শত বিশেষণে তোমারে সাজাই,
নূপুর পড়ায়ে নিকুঞ্জে নাচাই,
ঘটা করে কত ঘণ্টা বাজাই—
বিজয়-গরবে ভরা!

তুমি ব্যোমকেশ—সোম-দিগম্বর,
কে দিল এ বেশ?—বাঘের অম্বর?
সাধ্য কি আমার ওহে বিশ্বম্ভর
তোমারে ওজন করা?

পূর্ণানন্দে তবু পর্ণে পটে আঁকি,
শম্ভু বলে কভু কম্বুনাদে ডাকি,
রুদ্ররূপী শিবে বন্দী করে রাখি
মাটির মন্দির মঠে!

তুমি যে অন্ধের অমিয় ইন্দু,
বসুধার বুকে সুধার সিন্ধু,
আমি চাহি প্রভু শুধু এক বিন্দু—
কত বা ধরিবে ঘটে?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

অজ্ঞাত-পদকর্ত্তৃগণ।

(২)

কমলাকান্ত দাস।

কমলাকান্ত তাঁহার সঙ্কলিত 'পদরত্নাকর' নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের * অবসানে নিজের পরিচয়-স্থলে লিখিয়াছেন—

"মুঞি মূর্খ মতিহীন পতিত দুর্গত দীন
দুরিতে পূরিত কলেবর।
বিষয়-বিষের দাহে তনু মন স্থির নহে
ভব-রসে ভাবিত অন্তর॥
প্রভু মোর কৃপাসিন্ধু পতিতের প্রাণ-বন্ধু
কারে দিলা গরুড়ের ভার।
পদরত্নাকর নাম সংগ্রহ সুখের ধাম
মূর্খ-মুখে করিলা প্রচার॥
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা ভয় হয় চিতে
অন্তরে উপজে অতি ঘৃণা।
তথাপি তেজিয়া লাজ নৃত্য করি সভা মাঝ
প্রকাশিতে প্রভুর করুণা॥
রাঢ়দেশে অনুপাম সৎপল্লী সিউর গ্রাম
সাধু সন্ত মহান্তের স্থিতি।
পূর্ব্ব পক্ষ যোজনান্তে কণ্টক নগর প্রান্তে
পতিতপাবনী ভাগীরথী॥
তথি জাতি শ্রীকরণ সাধুসেবা-পরায়ণ
পিতা ব্রজকিশোর আখ্যান।
কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত সদ্‌গুণ-আধার শান্ত
বৈষ্ণবের দাস অভিমান॥
চৈতন্য প্রভুর গণ ছোট বড় যত জন
সভার চরণ ধরি শিরে।
কলির কবল হৈতে রক্ষা করি রাখ ভিতে
কৃপা করি কমল কাতরে॥
যুগ-যুগ্ম যুগল সমুদ্র শশি শাকে।
শুক্রবার সপ্তবিংশ দিবস বৈশাখে॥

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারের ৯৫০ সংখ্যক পুথি।

সহস্র অধিক সংখ্যা দুই শত সন।
তথি পরি ত্রয়োদশ অধিক গণন ॥
বর্দ্ধমানে নির্জ্জনে বসিয়া নিরন্তর।
প্রাণপণে পূর্ণ কৈল পদরত্নাকর ॥
বহু পরিশ্রমে এই পদরত্নচয়।
মধুকর-বৃন্তে মুঞি করিল সঞ্চয় ॥"

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে করণ-জাতীয় ব্রজকিশোর দাসের পুত্র কমলাকান্ত ১৭২৮ শাকে অর্থাৎ ১২১৩ সালে বর্দ্ধমানে বসিয়া পদরত্নাকর পুঁথিখানা সংগ্রহ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে পদরত্নাকরের যে হস্তলিপি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, উহাতে লেখকের নাম নাই কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তির পরে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত আছে। যথা—

"মহারাজ অধিরাজ অবনির ইন্দ্র।
বর্দ্ধমান ভূমির ভূপতি তেজচন্দ্র ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ গুণের সাগর।
বুদ্ধে বৃহস্পতি কৃপাপূর্ণ কলেবর ॥
তার কর্ম্মকারকগণের অবতংশ।
কায়স্থ কুলেতে রাধানাথ বসুবংশ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় সর্ব্বগুণাকর।
কৃষ্ণ-ভক্তি-সুধা-সরিৎ-পতির মকর ॥
স্মরণ ভজনে সদা আনন্দ হৃদয়।
সাধুসেবা লাগি মাত্র বিষয় আশ্রয় ॥
তাঁর অনুরোধে অনবধি পরিশ্রমে।
লিখিল পুস্তকরাজ পরম যতনে ॥
লিপি দোষ মতিভ্রম ইথে যেবা হয়।
শুদ্ধ করি লবে তাহা সব মহাশয় ॥
নবদ্বার পুরীর দ্বারের বাম ভাগে।
পক্ষ বসিয়াছে সমুদ্রের যাম্য দিগে ॥
সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে চন্দ্রের উদয়।
শক সংখ্যা সঙ্কেতে কহিল সুনিশ্চয় ॥
বারশত চৌদ্দসন মার্গশীর্ষ মাসে।
বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠ বিংশতি দিবসে ॥
বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদরত্নাকর ॥

লিপিকারকের স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ না করায় ও গ্রন্থ-সঙ্কলনের মাত্র এক বৎসর পরে সেই বর্দ্ধমান সহরে বসিয়া আলোচ্য হস্তলিপি পুঁথিখানা সম্পূর্ণ করিয়া গ্রন্থের পুষ্পিকা-স্থলে উদ্ধৃত বিবরণ লিপি বদ্ধ করায় আলোচ্য পুঁথিখানার লেখক যে স্বয়ং কমলাকান্ত এবং তিনি বর্দ্ধমান রাজের অন্যতম প্রধান কর্ম্মকারক রাধানাথ বসুর নিকট প্রাপ্ত উপকারের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহারই অনুরোধে এই প্রতিলিপি পুঁথি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়। আমরা কমলাকান্ত বা তাঁহার প্রধান সহায় রাধানাথ বসুর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। কমলাকান্ত কেবল পদ-সংগ্রহ-কার নহেন; তিনি পদরত্নাকর গ্রন্থে স্বরচিত যে কয়েকটি সুললিত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তিনি যে একজন কৃতী পদ-কর্ত্তা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। নিজের কৃত সংগ্রহে অন্যান্য পদকর্ত্তার পদ অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত না করিয়া পদামৃত-সমুদ্র-কার রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় স্ব-রচিত পদে নিজের সংগ্রহ-গ্রন্থ পূর্ণ করা বোধ হয় সুরুচি কিংবা শিষ্টাচারের অনুমোদিত নহে। সুতরাং কমলাকান্ত তাঁহার এই বৃহৎ পদ-সংগ্রহে স্ব-রচিত মাত্র ১১টি পদ উদ্ধৃত করিয়া যে বিলক্ষণ সুরুচি ও শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কমলাকান্ত নিজে পদকর্ত্তা হইলেও, আমরা পদ-রত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার মাত্র কয়েকটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি; সুতরাং আমাদিগের নিকট পদ-কর্ত্তা অপেক্ষা পদ-সংগ্রহ-কার বলিয়াই যে তাঁহার অধিক সমাদর হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ প্রাচীন ও নবীন যতগুলি পদ-সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে—তাহার মধ্যে নানা কারণেই কমলাকান্তের পদরত্নাকর যে একখানা উচ্চদরের সংগ্রহ-গ্রন্থ তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আমরা নিম্নে পদরত্নাকর পুথির কতকগুলি বিশেষত্বের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া কমলাকান্তের স্ব-রচিত পদগুলি উদ্ধৃত করিয়া কমলাকান্তের কবিত্বের পরিচয় দিব।

অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, বৈষ্ণব-পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণ এক একজন পদ-কর্ত্তার পদাবলী যেরূপ স্বতন্ত্র-ভাবে সংগ্রহ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—প্রাচীন সংগ্রহ-কারগণ সেরূপ করেন নাই। কোন একজন পদ-কর্ত্তার পদাবলী এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে—উহার দ্বারা সেই পদ-কর্ত্তার ভাষা, কবিত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা করার যথেষ্ট সুবিধা হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক সময়েই সেই পদগুলি কীর্ত্তন-গানের পালার অনুযায়ী সজ্জিত না হওয়ায় পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থের বিভিন্ন পদ-কর্ত্তার পদাবলির একত্র সন্নিবেশ দ্বারা রচিত পালাগুলির ন্যায় উহা পাঠক ও শ্রোতৃগণের কৌতূহল উদ্দীপন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কথকতার ন্যায় কীর্ত্তন-গানেও রস ও ভাবের সূক্ষ্ম-ক্রমানুযায়ী বিশ্লেষণই সমধিক উপযোগী ও প্রীতিকর হইয়া থাকে সুতরাং প্রধানতঃ কীর্ত্তনের পালা-রচনার উদ্দেশ্যে পদাবলী সাজাইতে যাইয়া রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস, কমলাকান্ত প্রভৃতি পদাবলি-সংগ্রহকারগণ যে নানাবর্ণের পুষ্পে বিচিত্র মাল্য গ্রন্থনের ন্যায় নানা পদ-কর্ত্তার নানারকম পদাবলি একত্র সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রাচীন পদ-সংগ্রহের এই গূঢ় ও মুখ্য উদ্দেশ্যটির কথা মনে রাখিলে, পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরত্নাকর প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির একটি অন্যটির পরে সঙ্কলিত হইলেও, পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহকারই যে কেবল নূতন পদদ্বারা নিজের সংগ্রহ পূর্ণ না করিয়া বেশীর ভাগে পূর্ব্বতন সংগ্রহের উদ্ধৃত পুরাতন পদদ্বারাই কি জন্য গ্রন্থ-কলেবর পূর্ণ করিয়াছেন—এই আপাত-দুর্ব্বোধ্য বিষয়টিরও সদুত্তর পাওয়া যাইবে। কেন না, একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, রস ও ভাবের হিসাবে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনের পালা রচনা করিতে ইচ্ছা করিলে—উহাতে পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তাদিগের প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পদাবলী সন্নিবেশিত না করিয়া কেবল নূতন ও অপ্রসিদ্ধ পদাবলীর দ্বারা পালা পূর্ণ করিলে উহা কোনরূপেই তাদৃশ প্রীতিকর হইতে পারে না। সুতরাং পালা-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যটি রক্ষা করিতে হইলে সংগ্রহ যত আধুনিক হউক না কেন উহাতে পুনরুক্তি অর্থাৎ পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ পদাবলীর পুনরুদ্ধার অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া পদরত্নাকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রহ-গুলির যে কোন বিশেষত্ব নাই ইহা বলা যায় না। পদরত্নাকর পুথিখানা আকারে বৈষ্ণব দাসের বিরাট সংগ্রহ পদকল্পতরুর অর্দ্ধেকের কম হইলেও ইহাতে সাকুল্যে ১৩৫৮টি পদের মধ্যে পদকল্পতরুর অতিরিক্ত প্রায় ৫০০ শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির রচিত বহুসংখ্যক পদ দৃষ্ট হয়। কীর্ত্তনানন্দ নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমরা পদরত্নাকর ও পদ-রস-সার গ্রন্থেও বিদ্যাপতির ঐ সকল পদের অধি-কাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি—নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে নাই এবং ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই বিদ্যাপতির এরূপ অনেকগুলি পদ ও পদরত্নাকরে পাইয়াছি। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা বিদ্যাপতির সেই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদাবলি হইতে কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

ধানশ্রী।

সুন্দরি মাধব তুহে অনুরাগি।
তুহুঁ ধনি ঐছন ভেলি কথি লাগি॥
যা ধরি তো সঞে ভেলি সন্তাপি।
তা ধরি সব দুখ ভেল উদাসি॥
তোহারি কাহিনি বিনু না সুনয়ে আন।
তুয়া গুণে বান্ধল প্রেম পরাণ॥
খনে খনে রাই বলি ছাড়য়ে নিশাস।
মুন্দল নয়ন না করে পরকাশ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর।
অন্তর বেদন কো কহু ওর॥
লাখ কলাবতি আছে ইহ ধাম।
সপনে না কাহুক না করয়ে নাম॥

এ তুয়া এ তুয়া করি তেজয়ে পরাণ।
বড়কা প্রেম বড় এক জান॥
বিদ্যাপতি ভণ প্রেম অগেয়ান।
তনু সঞে পরবশ করত পরাণ॥

তিরোথা ধানশ্রী।

কাহে এত কহ হরি তুয়া হাম এক।
এত দিনে সে সব ভেল পরতেক॥
লোরে খসল যত অঞ্জন মোর।
সে সব অধরে লাগি রহু তোর॥
তোহারি অধরে সে দশন খত দেল।
হামারি হৃদয়ে শাল বহি গেল॥
অতয়ে সে তুহুঁ হাম একই পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ ইথে নাহি আন॥

'নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি' ইত্যাদি গোবিন্দ দাসে সুপ্রসিদ্ধ খণ্ডিতার পদটি বোধ হয় বিদ্যাপতির এই পদের ছায়া অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ দাসের উক্ত পদের 'অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর॥' বাক্য অপেক্ষা বিদ্যাপতির 'লোরে খসল যত অঞ্জন মোর' ইত্যাদি বাক্যের বিদ্রূপাত্মক আক্ষেপ যে কত বেশী তীব্র ও করুণ তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গকে বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

সুহই।

নিকুঞ্জ মন্দিরে গুঞ্জরে ভ্রমর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ-বেদন
নিঠুর কান্ত না আব॥
সজনি রচহ হেন উপায়।
মধু-মাসে যব মাধব আওব
বিরহ-বেদন জায়॥ ধ্রু॥
অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভই গেল
ধনু শর করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চটুল হামারি মাথ॥
সে কুলে বিরহ ভসম করল
তিসর লোচন-আগি।
পুন হরি-কুলে জনম লভিল
হামারি বধক লাগি॥
ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
আকুল না কর চীত।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবি সহিত॥

মল্লার।

সজনি ছোড়লু জীবন-আশা।
দারুণ বরিখা জিউ ভেল অন্তর
নাহ রহল দূর দেশা॥ ধ্রু॥
বাদর ঝর ঝর নাহি দিন অবসর
গর গর গরজই রাতি।
অনিল অথীর থীর নহে অন্তর
দমকত দামিনি-পাঁতি॥
ঘন ঘন ডাহুকি ডহ ডহ ডাকই
চাতক পিউ পিউ বোল।
নাচত মত্ত শিখণ্ডক মণ্ডল
নিশি দিশি দাদুরি রোল॥
কোন কলাবতি কঠিন হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ।
বিদ্যাপতি কহ ধনি উতপত মহ
তুরিতহিঁ মীলব কান॥

কীর্ত্তনানন্দের হস্তলিখিত পুথি আমরা পাই নাই; লালগোলার পরম বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুরশিদাবাদ-হিতৈষী যন্ত্র হইতে বহুদিন পূর্ব্বে কীর্ত্তনানন্দের যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মুদ্রাকর-দোষে এতই অশুদ্ধিপূর্ণ যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলা যায় না। নগেন্দ্র বাবু যে হস্তলিখিত কীর্ত্তনানন্দ অবলম্বনে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা কতদূর শুদ্ধ ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়—একখানা হস্ত-লিপি পুথির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিতে গেলে অনেক ভুল থাকিয়া যায়।

নগেন্দ্র বাবু কেবল একখানা কীর্ত্তনানন্দ পুথির উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদের যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন আমরা পদরত্নাকর ও পদরসসারের সাহায্যে উহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ধরিতে পারিয়াছি; এস্থলে সেই সকলের উল্লেখ ও বিচার প্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐ সকল পদাবলীর সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিব। এস্থলে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পদরত্নাকর পুথির সাহায্য না পাইলে আমরা বিদ্যাপতির ঐ সকল পদাবলির প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এযাবৎ একাধিক কীর্ত্তনানন্দ, পদরত্নাকর কিংবা পদরসসার পুথি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ পুথিগুলির কোন এক খানা বিনষ্ট হইলে তৎসঙ্গে উহার নিজস্ব অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ গুলিরও যে বিলোপ সাধিত হইত তাহা বলা বাহুল্য। এ ভাবে প্রাচীন পদ-কর্ত্তাদিগের কত অমূল্য পদাবলি যে বিস্মৃতির অন্ধতমসে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বা যাইতে উদ্যত হইয়াছে, কে বলিবে? সুতরাং কার্য্যের গুরুত্বের হিসাবে প্রাচীন পুথির সংরক্ষণ ও প্রচারই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে—এ কথা বলিতে কোনই বাধা নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সাধ্য ও সুবিধা সত্ত্বেও যে ভাবে এজন্য চেষ্টা করা উচিত—আমাদিগের দেশের সাহিত্য-পরিষদ্ ও সম্মিলনগুলি আজিও সেভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না। এই প্রাচীন পুথির সংরক্ষণ ও প্রচার কার্য্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে ব্রতী না হইলে আমাদিগের দ্বারা যে প্রাচীন সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব কিংবা ইতিহাস কোন বিষয়েরই প্রকৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না—ইহাও কি বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য" নামক বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে যুগ-প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অজ্ঞাত-পূর্ব্ব নানা প্রাচীন পুথির আবিষ্কারে তাঁহার অনন্যসাধারণ উদ্যম ও চেষ্টাই উহার মূল কারণ বটে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় তাঁহার "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ-গান ও দোহা" নামক গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন—উহার মূল কারণ তৎকর্ত্তৃক নেপাল ও তিব্বত হইতে সুপ্রাচীন বাঙ্গালা পুথির আবিষ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পদরত্নাকর গ্রন্থে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পূর্ব্বতন পদ-কর্ত্তাদিগেরও অনেক অপ্রকাশিত পদ আছে। তদ্ভিন্ন চারিজন অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তার পদও আছে। কমলাকান্ত প্রমুখ এই চারিজন অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তার নাম ও পদসমষ্টি যথা—

পদ-কর্ত্তার নাম।	পদ-সমষ্টি।
কমলাকান্ত	১১
জানকীবল্লভ	৩
ধনঞ্জয়	৩
সর্ব্বানন্দ	১১

জানকীবল্লভ প্রভৃতি অন্যান্য পদকর্ত্তাদিগের রচিত পদাবলি যথাস্থানে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইবে; এস্থলে আমরা কমলাকান্তের রচিত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। প্রথমে একটি পূর্ব্বরাগের পদ—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার উক্তি দেখুন—

তুড়ী।

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে
এ কি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ॥
সই এ তোরে কহিনু সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রসপূর
ভুবনে না শুনি আর॥ ধ্রু॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা॥

নয়নের বারি নিবারিতে নারি
বয়ানে না সরে কথা।
না জানি কেমন করিছে জীবন
মরমে হইল ব্যথা॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী
সভাই শুন্যাছ ধ্বনি।
একা কেনে মোর দহে কলেবর
যেমন দংশিল ফণী॥
হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে
কোন সুনাগর-রাজ।
এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে
নাশিতে ধৈরজ লাজ॥
এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া
বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলি বাজয়ে সুন্দরি
অন্য কোন শব্দ নহে॥
শুনি বেণু-নাদ এত পরমাদ
হৃদয়ে ভাবিছ কেনে।
স্থির কর মন নহ উচাটন
কমল কাতরে ভণে॥

পূর্ব্বরাগের আর একটি ব্রজ-বুলি পদ যথা—

সুহই।

মলয়জ-লেপন মন্দ সমীরণ
কোকিল-অলিকুল-গানে।
উপনিত অতনু- বিকার লুকাওত
কত কত সে সব ভানে॥
হরি হরি বিষম-কুসুম-শর-জালা।
নব অনুরাগ ভার-ভরে সুন্দরি
দিনে দিনে দুবরি ভেলা॥ ধ্রু॥
কারণ বিণু ঘন অম্বু-কণা-গণ
লোচনে বহে অনিবার।
নিভৃত নিকেতনে সব সখিগণ সনে
করতহি পিরিতি বিথার
ঘন ঘন বাহির ঘন অভ্যন্তর
কহত ভয়মময় ভাষ।
করতলে সঘন বদন অবলম্বন
ঘন ঘন দীঘ নিশাস॥
সুখময় শয়ন নয়নে নাহি হেরই
ধরণি-শয়নে ঘন সাধ।
কমল কহত ধনি নব অনুরাগিণি
অতয়ে সে এত অবসাদ॥

অভিসার বর্ণনা যথা,—

ধানশ্রী।

চাচর চিকুর কবরি পর শোহন
কুসুমাবলি অনুপাম।
কালিন্দি-নীর তরঙ্গে বিরাজিত
জনু ঘন ফেনক দাম॥
মধুর বিহারিণি বালা।
মন্থর গমনে বিলোলিত উর পর
মঞ্জুল মণিময় মালা॥ ধ্রু॥
রঙ্গিণি সঙ্গিনি- কর-অবলম্বিনি
উজ্জ্বল অনুপম বেশ।
স্পন্দই বাম নয়ন জনু মনমথে
করত নটন-উপদেশ॥
লজ্জা-ভয়-যুত লোচন-অঞ্চলে
চঞ্চল চাহনি থোর।
কুবলয়-চয় উপ- হার দেই জনু
ভেটলি নন্দ-কিশোর॥
প্রথম সমাগমে দুহুঁ দোহাঁ দরশনে
ভাবে ভূষিত ভেল অঙ্গ।
কমল কহত দুঁহু অন্তরে উথলল
মনসিজ-সিন্ধু-তরঙ্গ॥

পুনশ্চ,—

ধানশ্রী।

সখী-করে ধরি চলল সুন্দরী
নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝে।
গমন মন্থর হেরি করিবর
চলিতে না পারে লাজে॥

অনঙ্গ-মোহিনী বালা।
অঙ্গের ছটায় সঙ্গিনী-ঘটায়
নিকুঞ্জ করিল আলা॥ ধ্রু॥
হসিত-বদনে নয়নের কোণে
নাগরের পানে চাঞা।
নীল নলিনী দিয়া যেন ধনী
নিকুঞ্জে ভেটিল গিয়া॥
রাই-প্রতিবিম্ব পাঞা শ্যাম-অঙ্গ
হইল হরিত-আভা।
সব সখীগণ চকিত-নয়ন
দেখিয়া দোঁহার শোভা॥
অনিমিখি হরি রাধার মাধুরী
নয়নে করিয়া পান।
ভুখিল চকোর যেন সুধাকর
পাইয়া পূরল কাম॥
* * *
দুঁহু রূপ হেরি সকল সুন্দরী
সুখের সায়রে ভাসে।
সে শোভা দেখিয়া কমলের হিয়া
ডুবল আনন্দ-রসে॥

শ্রীরাধার অঙ্গের সুপীত আভা সুনীল শ্যাম-অঙ্গে পতিত হইয়া, পীত ও নীলবর্ণের মিশ্রণে হরিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণের উৎপাদন করিতেছে—এই সুন্দর ভাবটি আমরা সংস্কৃত কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে অন্য কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; হিন্দি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের সুপ্রসিদ্ধ 'সত-সঈ' গ্রন্থের প্রথম দোহাটিতে এই ভাবের বর্ণনা আছে, যথা—

"মোর ভব-বাধা হরো
রাধা-নাগরি সোই।
জা তনকী ঝাঈ পরে
শ্যাম হরিত-দ্যুতি হোই॥"

অর্থাৎ—

সংসার-যাতনা মম করুন শমিত
শ্রীরাধিকা রমণী-রতন।
দেহ-কান্তি সনে যাঁর হইয়া মিলিত
শ্যাম হ'ল হরিত-বরণ॥

বিহারীলাল কমলাকান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। তাঁহার 'সত-সঈ' কাব্য হিন্দী দোহকাব্যের শীর্ষ-স্থানীয়; সুতরাং তাহা ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় সুপটু কমলাকান্তের নিকট সুপরিচিত ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কাজেই আমরা ইহা কমলাকান্তের মৌলিক রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেও কমলাকান্তের উদ্ধৃত পদগুলির পদলালিত্য ও বর্ণনার পারিপাট্যের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। তিনি মাত্রাশুদ্ধ নির্দ্দোষ ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় বাসুঘোষ, বলরাম দাস, নরোত্তম প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে উল্লিখিত পদকর্ত্তাদিগের সহিত তুলনা করিলে কমলাকান্তকে কবিত্ব-বিষয়ে কোনরূপেই তাঁহাদিগের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। কমলাকান্তের রচনায় পদ-লালিত্য ও বাহ্য চিত্রের বর্ণন-কুশলতা ব্যতীত রস ও ভাবের প্রগাঢ়তা কিংবা, উচ্চ অঙ্গের কল্পনা-শক্তির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না,—সুতরাং আমাদিগের নিকট তিনি পদ-কর্ত্তা অপেক্ষা পদসংগ্রহকার বলিয়াই যে অধিক সমাদৃত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা কমলাকান্তের আর একটি অভিনব মাত্রা-ছন্দের পদ উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত হইব।

গুর্জ্জরী রাগ।

শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম-শর- দাম অব
ভেল মুঝে শেল॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদ মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- রঞ্জ ভয়-
পুঞ্জ সম ভান॥
কোকিল-কল- ভাষে অব
ত্রাস ভেল চীত।

সঙ্গ-সুখ- লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত ॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ
মন্দগতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন ক্রম-
দাম সুখ দেল ॥
বিকচ ফুল- বিন্দ চিত
গন্ধ হরি নেল।
সরল-হৃদি কমল অব
তরল-গতি ভেল ॥

কমলাকান্তের এই পদটী সনাতন গীতার ঃ—

"কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুল-
মুজ্জ্বল কলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি
জল্পতি সবিষাদং ॥"

ইত্যাদি পদ ও শশিশেখরের—

"অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মন্দ-বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥"

ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত হইলেও তিনি সুকৌশলে অযুগ্ম চরণে ১২ মাত্রার স্থলে ১০ মাত্রার ও যুগ্মচরণে ১০ মাত্রার স্থলে ৮ মাত্রার ব্যবহার করিয়া ছন্দের বিলক্ষণ অভিনবত্বা সাধন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

পল্লী-বন্দনা।

(১)

ভকতি-নম্র, পুলক-কম্প্র, অযুত চিত্ত মাঝে,
অমিয়সিক্ত, পুণ্য-পৃক্ত, চরণ যাঁহার রাজে;
হৃদি-যন্ত্রণা-শোকে সান্ত্বনা, কণ্ঠে অভয়-বাণী,—
আমার পল্লীরাণী, সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

(২)

দীপ্ত তপন বরিষে কিরণ যাঁহার চরণ তলে,—
স্নেহ-নির্ঝর ঝরে ঝর্ ঝর্ আলোবর্ষণ ছলে;
জ্যোছনার ধারা পুলক-বিভোরা যাঁহার চরণ চুমি—
আমার পল্লীরাণী, সে যে গো আমার জনমভূমি।

(৩)

বিহগ-মুখর মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জমাঝে,
অযুত পাপিয়া কোকিলকণ্ঠে বন্দনা যাঁর বাজে;
মর্ম্ম মাঝারে ঝঙ্কারি উঠে যাঁহার কীর্ত্তি-বাণী,—
আমার পল্লীরাণী, সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

(৪)

চঞ্চলা যাঁর অঞ্চলে বাঁধা স্নেহের নিবিড়-বন্ধনে,
শান্ত শরতে আসে দশভূজা যাঁহার রসাল নন্দনে;
বাণী বীণাপাণি উজলি রয়েছে যাঁহার হৃদয়খানি,—
আমার পল্লীরাণী, সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

(৫)

অন্তিমে যবে করিব শয়ন, বিসরি ত্রাস লাজ মান,
তোমার পুণ্য-শুভ্র-উজল চরণে আমায় দিওগো স্থান
হৃদি-যন্ত্রণা-শোকে সান্ত্বনা, কণ্ঠে অভয়-বাণী,
আমার পল্লীরাণী—সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর তিনদিনের প্রবাস।

বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যমে এবার বড়দিনের ছুটিতে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে নানাস্থান হইতে বঙ্গভারতীর ভক্তবৃন্দ বাঁকিপুরে উপস্থিত হইয়া তিন দিন মার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছিলেন। আমি সাহিত্যের খবর রাখি না কাজেই সাহিত্যিক বলিয়া পরিচয় দিতে স্পর্দ্ধা করি না। তবু কি জানি কেন, বড়দিনের বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইতেই হঠাৎ কেমন একটা খেয়াল চাপিল বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে তিন দিনের প্রবাসী হইব। ইহার প্রস্তাবক সমর্থক ও অনুমোদক সকলই আমি কাজেই ইচ্ছাটা ভোটে টিকিয়া গেল। তখন কাহারও কোট, কাহারও সার্ট, কাহারও কম্বল, আর পথের সম্বল কয়েকটি রজতখণ্ড ও একখানা ডেলিগেটের সনদ-পত্র লইয়া শুক্রবার বেলা ১টায় শ্রীদুর্গা বলিয়া একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। সম্মিলন-যাত্রীদের বর্ণনায় যেমন পড়িয়া থাকি—ভাবিয়াছিলাম হয়ত পথিমধ্যে দু'এক জন সাহিত্যিক পাণ্ডার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিলেও বা ঘটিতে পারে, নানারূপ হাস্য পরিহাস ও কবিদের মস্তক চর্ব্বণ করিতে করিতে বেশ আরাম অনুভব করা যাইবে। কিন্তু Man proposeth God disposeth—কার্য্যক্ষেত্রে দেখিলাম সব ফক্কিকার—কবি কল্পনা; কোন সাহিত্যিক চুনোপুঁটির টু শব্দটি নাই! অগত্যা unfriended alone and melancholy হইয়াই যাত্রা করিতে হইল। তবে এক সাথী ছিল সে আমার সাধের কাপড়চোপড় বিস্কুটের বাক্স সম্বলিত পুঁটুলি।

নারায়ণগঞ্জ হইতে এক ভদ্রলোক পাতক্ষীর ও কমলা-লেবু লইয়া মাতৃদর্শনে কাশী যাইতেছিলেন। জাহাজে তাঁহার সহিত পরিচয় হইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। যেহেতু তাঁহার ঐ পাতক্ষীরের হাঁড়ির উপর আমার লোলুপ-দৃষ্টি সত্ত্বেও যখন একবার উহার মুখের ঢাকনি অপসৃত হইল না তখনই বেশ বুঝিতে পারিলাম লোকটা নিতান্ত অসামাজিক! শাস্ত্রোক্ত ষড়বিধ প্রীতি-লক্ষণের গোড়ারটীরই একেবারে অভাব। তারপর যখন পরদিন বাণ্ডেলে গাড়ীতে উঠিতে মহা ফাঁপরে পড়িয়া 'সদা মন হারাই হারাই' ও বিঘোর বিহারযাত্রার ত্রিবর্গ ফল হাতে হাতে লাভ করিবার আশা করিতে-ছিলাম—তখন দেখি বাস্তবিকই উক্ত ভদ্রলোকটীকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। বন্ধু হইলে কি তিনি এরূপ করিতে পারিতেন? তবে আশ্চর্য্য নয় যে তিনিও আমার মত বিপদে পড়িয়া ত্রাহি মধুসূদন করিতেছিলেন। কারণ সে দিন সকলেরই এক অবস্থা। তাহা পরে বলিতেছি।

শনিবার ভোরে নৈহাটি পৌঁছিলাম। নয়টার সময় গঙ্গায় স্নান করিয়া আহারাদি সমাপন করিয়া মনে করিলাম একবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীটা দেখিয়া আসি। ষ্টেশনের অনতিদূরেই রেলরাস্তার পার্শেই কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। বঙ্কিমবাবুর পুণ্য স্মৃতি বক্ষে লইয়া কাঁঠালপাড়াও সাহিত্যিক তীর্থস্থান হইয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বড়ই দুঃখ উপস্থিত হইল। যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাড়ীটা যে অচিরেই কালের ধ্বংসলীলার মহিমা ঘোষণা করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হয়ত কয়েক বৎসর পরে প্রত্ন-তাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণ ইহারই মন্দির-গাত্র হইতে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইবেন! অথচ বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করিলেই ইহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। পূর্ব্বে এই বাটীর সংলগ্ন প্রকাণ্ড চত্বর ছিল, এখন ক্রমে উহা রেলওয়ের কুক্ষিগত হইয়াছে। মন্দিরে রাধামাধব প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া ভদ্রাসনটী এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহারও পশ্চাৎভাগের দ্বিতল ছাতের উপর আগাছা ও বটগাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে ও স্থানটীকে জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই রাস্তার পাশে একটি জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য শিবমন্দির—মন্দিরে

পুরোহিতও নাই কাজেই দেবতাও নাই। তাহার নিকটই প্রকাণ্ড অধুনা জীর্ণ ইষ্টক স্তম্ভের উপর খড়ের ঘর। খড়ের ঘর বলিলাম—কিন্তু তাহাতে খড় নাই। বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীগণের ন্যায় শুধু চাল ক'খানি বিরাট বক্ষপঞ্জর বাহির করিয়া কোনক্রমে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে এই ঘর রাসের সময় যাত্রা, গান, নৃত্যবাদ্য ইত্যাদিতে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। এখন পেচক, চামচিকা ও বাঘেরও অযোগ্য। বাড়ীতে ঢুকিতে পথে বঙ্কিম বাবুর বিধবা ভগ্নীর সঙ্গে দেখা। আলাপ করিয়া জানিলাম যে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ-তুল্য বাটীর এক পাশে তাঁহারা আছেন; অধিকাংশ কোঠাই খালি পড়িয়া আছে। পূর্ণ বাবু (বঙ্কিম বাবুর ভাই) ও সতীশ বাবু (ভ্রাতুষ্পুত্র)-তাঁহারাও অংশীদার। কিন্তু তাঁহারা কলিকাতাই বাড়ী করিয়াছেন। শুধু পূজার সময় দিনকয়েকের জন্য এখানে আসেন। তবে রাধামাধবের ভোগারতি রীতিমত চলিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপ, হল-ঘর যাহা এককালে নানা সুরসিক সাহিত্যামোদীগণের হাস্যপরিহাসে ধ্বনিত ও উজ্জ্বল দীপাবলিতে আলোকিত থাকিত—আজ সেসব শূন্য, সে আলোক নির্ব্বাপিত; বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠেরই বর্ণিত দুর্ভিক্ষকালীন সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলীর ন্যায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগন্তুকের চক্ষে ভীতিপ্রদ। আমাদের সাহিত্যিকগণ প্রাচীন সাহিত্যিকদিকের বাস্তভিটা রক্ষার্থ অশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু কত বর্ত্তমান বাস্তভিট, যাহা এখন চেষ্টা করিলে অনায়াসে রক্ষা করা যাইতে পারে, যে অযত্নে ধসিয়া পড়িতেছে তাহার খোঁজ রাখেন না।

চারিটার সময় নৈহাটি ত্যাগ করিয়া বাণ্ডেলে সন্ধ্যার সময় লক্ষ্ণৌ এক্স্প্রেসে চড়িয়া বসিলাম। গাড়ীতে উঠিতে যে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা আর বলিবার নয়। কোন গাড়ীতেই পর্দে প্রমাণ যায়গা নাই—এ যেন দ্বিতীয় অন্ধকূপ হত্যার অভিনয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও দাঁড়াইয়া স্থান পাইতেছেন না—"অন্তে পরে কা কথা"। দৌড়িতে দৌড়িতে হয়রান হইয়া পড়িলাম, এদিকে গাড়ীও ৩। ৪ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করিবে না। এই সময় আমার কাশী-যাত্রীটী কোথায় লোকারণ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাহা হউক একজন টিকিট কালেক্টর অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেক শাসাইয়া অনেক বিনয়বচনে যাত্রীদের মানাইয়া এক গাড়ীতে চারি অঙ্গুলী পরিমিত স্থান করিয়া দিলেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল। 'বস্‌তে পেলেই শু'তে পায়'—আমিও এই নিয়মের ব্যত্যয় করিলাম না। আর, চার অঙ্গুলী পরিমিত স্থানে কি বসা যায়? তারপর আবার পুঁটুলিটি কোলের উপর। কতকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উপরে ঝুলন্ত খাটে যাত্রীদের মোটরি ইত্যাদি সরাইয়া কম্বলমুড়ি দিয়া তোফা লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। গাড়ীর যাত্রীদের ভিতর অনেকেই কুলী। একজন বাঁকিপুর-যাত্রী. ধনী, কিছু ইংরাজী-জানা বিহারীও ছিল। এক বৃদ্ধা দূর বাংলা মুল্লুক হইতে পুত্রের 'পিল্টি' (প্লেগ) হইয়াছে টেলিগ্রাম পাইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়াছে। হায় মাতৃস্নেহ!—হয়ত তাহার নয়নমণি একমাত্র পুত্র চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। আর এক বেঞ্চে দেখিলাম এক সুন্দরী পশ্চিমা যুবতী, বৃদ্ধা শাশুরীকে তুলিয়া খাওয়াইয়া, তাহার গাত্রাবরণ গরম কাপড়খানি তাহাকে দিয়া ও তাহাকে বেঞ্চে শোয়াইয়া নিজে আর এক বেঞ্চে উপবিষ্ট স্বামীর পদতলে বসিয়া দারুণ শীতে কাঁপিতেছে। দেখিলাম হাজার গরীব হউক, ওদেরও মনুষ্যত্ব, স্নেহমমতা, ভক্তি আছে। শেষরাত্রি চারিটায় আমরা বাঁকিপুর পৌঁছিলাম। পথের সৌন্দর্য্য অন্ধকারে কিছুই উপভোগ করিতে পারিলাম না।

ষ্টেসনে ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ সহ যোগেন্দ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন। সেই রাত্রেই পূর্ব্বে পাঞ্জাব মেলে সার আশুতোষ প্রমুখ নেতৃবর্গ আসিয়া উপস্থিত হন। সমাদ্দার মহাশয় পাটনা ষ্টেসনে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। কেহ কেহ পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিশতের উপর হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ পশ্চিমের এই দারুণ শীতে কাঁপিতে ২ সহাস্যবদনে সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

কাহারও কোনও অসুবিধা বা ত্রুটী হয় নাই। বাস্তবিক এই স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা, সুশৃঙ্খলা, কর্ম্মতৎপরতা ও বিনয়-নম্র ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অথচ ইহাদের অধিকাংশই ১০|১২ বৎসরের স্কুলের বালক মাত্র। ইহারা শুধু বাঁকিপুরে নয় অন্যত্রও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের আদর্শস্থল থাকিবে।

প্রতিনিধিবর্গের জন্য স্থানীয় Anglo-Sanskrit স্কুল ও ভূতপূর্ব্ব বিহার-প্রবাসী দেশবিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তবে সাহিত্যিক মহারথীগণের অনেকেই মথুরানাথ সিংহ, পূর্ণেন্দু বাবু ও সমাদ্দার মহাশয়ের বাড়ীতে 'ছাউনি' করেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন প্রাচ্যভাষাবিৎ ও ঐতিহাসিক জয়-সোয়ালের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। শুনা যায় তাঁহারা নাকি বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও পূর্ণেন্দু বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। তবে ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Birds of feather flock together, তাঁহারাও সেই প্রবাদ বাক্যের মানরক্ষার্থ ওরূপ করেন নাই ত?

১১ই পৌষ, রবিবার, আহারান্তে বেলা বারটায় স্থানীয় পার্শী রিপণ রঙ্গমঞ্চে সভার অধিবেশন হয়। প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ ও মূলে পূর্ণকুম্ভ, হলটীও পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়। সভাস্থল লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। এক পার্শ্বে চিকের অন্তরালে মহিলা-দিগেরও বসিবার স্থান হইয়াছিল। মাননীয় সার আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়, সুকবি চিত্তরঞ্জন দাস, ঐতিহাসিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বৈজ্ঞানিক শশধর রায় ও পরিষদের সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়গণের পৌরোহিত্যে ও বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার আব্দুল গফুর, আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, সুকবি দেবকুমার রায় চৌধুরী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কেদারনাথ মজুমদার, পরিব্রাজক রামলাল সরকার, মুসলমান কবি মোজম্মেল হক্, গল্প-লেখক জলধর সেন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, কাশীর চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়, মানভূমের নরেশচন্দ্র সিংহ, 'আর্য্যাবর্ত্তের' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও পরিষদের প্রাণস্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বহু হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিক ভক্তবৃন্দের সমাগমে ও সাহচর্য্যে বঙ্গবাণীর পূজার মন্দির অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

বিহার-প্রবাসী সুকবি মন্মথনাথ দে রচিত আহ্বান-সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন হয়। সে সঙ্গীতের—

"যেখানে তোমরা ফেলিছ চরণ—
পাটলিপুত্র পূত পুরাতন,—
স্মৃতির শ্মশান, তিমির মগন,
আজি সে ভস্মাগার।"—

প্রভৃতি ছত্রে পাটলিপুত্রের পুরাতন লুপ্ত গৌরবের একটা বেদনাপূর্ণ স্মৃতি স্বতঃই আকুলিত হইয়া উঠিতেছিল।

তারপর গতবর্ষের সভাপতি মহোমহাপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা। ইহা মোটেই তাঁহার উপযোগী হয় নাই! বক্তৃতান্তে অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মিলনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি ও টেলিগ্রামাদি পাঠ করা হয়, তৎপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পূর্ণেন্দু বাবুর অভিভাষণ। সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার—"চন্দ্রগুপ্তের এই রাজনৈতিক ভূমি, অশোকের বিশ্বব্যাপী প্রেমময় ভূমি, গুপ্ত ও পাল রাজাদিগের শিল্প ও সাহিত্যসেবিত ধর্ম্মভূমি, অর্থশাস্ত্রের জন্মভূমি, দাতব্য ও পশু-চিকিৎসালয়ের আদিভূমি, প্রাচীন ভারতের মধ্যাহ্ন ভূমি—এই ঐতিহ্যচুম্বিত পূত ভূমিতে 'তৃণানি' বিস্তীর্ণ করিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিতেছি"—ইত্যাদি কথায় যেমন অনাড়ম্বর বিনয় ও সরলতা সূচিত হইয়াছে তেমনি তাঁহার "বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তা ভগবতী ভারতীর বীণা সপ্তস্বরা, মাতার ভক্তগণ কেহ কোন সুর কেহ কোন স্বর লইয়া উন্মত্ত। সকল স্বরের ঐকতানিক মিলনই সাহিত্য"—

ইত্যাদি বাক্যে তেমনি তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, গভীরতা ও সাম্যবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটী অত্যাবশ্যক প্রস্তাবেরও অবতারণা ছিল। আর ছিল পাটালিপুত্রের গৌরবময় অতীত ভগ্নস্তূপের দীর্ঘশ্বাস, মগধের একটা 'বিশ্ববিকম্পনের' ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাস্তবিক পূর্ণেন্দু বাবুর অভিভাষণের মত সরল সংক্ষিপ্ত অথচ এরূপ জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে এরূপ সুন্দর অভিভাষণ আমরা কমই দেখিয়াছি।

মাইকেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মানকুমারী রচিত 'সরস্বতীবন্দনা' নামক কবিতা মাখনলাল দত্ত কর্তৃক পঠিত হইলে মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রস্তাবে ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রামলাল সিংহ উভয়ের সমর্থনে বিপুল হর্ষোত্থিত করতালির মধ্যে সার আশুতোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তখন সমাদ্দার মহাশয় তাঁহার গলে মাল্য ও বক্ষে প্রতিনিধির চিহ্ন কৃত্রিম মুকুট পরাইয়া দেন।

কি ভাষা-গৌরবে, কি ভাবগাম্ভীর্য্যে, কি উদ্দীপনায়, কি সার্ব্বজনীন উদারতায় উক্ত অভিভাষণ যে সকলেরই হৃদয়গ্রাহী ও মনোহারিণী হইয়াছিল তাহা সঘন করতালি ও সাধুবাদে প্রকাশ পাইতেছিল। তৎপর উপসংহারে যখন সভাপতি বাঙ্গলার অমর কবি হেমচন্দ্রের অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত কবিতার কয়টী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে পড়িলেন—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও"—

তখন বিপুল জনসঙ্ঘ উন্মত্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে দৃশ্য বাস্তবিক দেখিবার বিষয়, বর্ণনীয় নয়। সার আশুতোষও সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মাতৃনাম উচ্চারণ করিলেন।

যাঁহারা সার আশুতোষের অভিভাষণে কোন একটা জটিল সাহিত্যিক তত্ত্বের অবতারণা বা মীমাংসা দেখিতে পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্যই নিরাশ হইয়া থাকিবেন। সার আশুতোষ কোন একটা বিশেষ তত্ত্বের আড়ম্বর করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই,—'আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা—ইহাতেই আমাদের সাহিত্য। এই বঙ্গসাহিত্যই আমাদের প্রাণ। ইহাই আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন ও জাতীয় জীবনকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহাকে অনন্তকালের সম্মুখে অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কাজেই বাধাবিঘ্ন সমস্ত ধৈর্য্য সহকারে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, ভীত হইলে চলিবে না। অধিক উন্নতি শীঘ্র ও দ্রুতগতি হইতেছে না বলিয়া অধীর অথবা হতাশ হইলে চলিবে না। এই বঙ্গীয় ভাষা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী করিতে হইলে যাহাতে ইহা সমস্ত জাতীয় জীবনের ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে সেই সমস্ত জিনিস ইহার ভিতর প্রবেশ করাইতে হইবে। কেবল তাই নয়, আজ ইংরেজী ভাষা পৃথিবীতে যেরূপ আদৃত—যেরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে—যাহাতে এই হীন নগণ্য (এখন আর নয়) বঙ্গভাষাও সেই ভাষা হইতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত বাদবিসম্বাদ দলাদলি বিস্মৃত হইয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে বহুকালব্যাপী পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্র ধ্যান ও সাধনা চাই—যিনি বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিতে চান তাঁহাকে আপ্রাণ একাগ্রচিত্ত যোগীর ন্যায় সমস্ত শ্রম সমস্ত কর্ম্ম স্বেচ্ছায় ও সাহ্লাদে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তবেই বঙ্গভাষার—তথা বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গল, উন্নতি ও প্রসার।'

শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক যে দীর্ঘ পত্র দেন তাহাতে দুইটী প্রস্তাব করিয়া পাঠান—(১)রমেশ-ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, (২) ব্যোমকেশ মুস্তফীর দুঃস্থ পরিবারের জন্য সাহায্য সংগ্রহ। পত্র পাঠকালে সমাজপতি মহাশয় প্রস্তাবাংশ বাদ দিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই দুইটী প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

এতক্ষণ কোন গোলমাল হয় নাই। তারপর হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বহিয়া গেল। শশধর বাবু প্রস্তাব করিলেন যে পরিষদের মত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন'

আইনানুসারে অবিলম্বে রেজেষ্ট্রী হউক (কারণ বর্ত্তমানে ইহার কোন 'আইন-সঙ্গত স্থায়ীত্ব' নাই) ও কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট মনোনীত ব্যক্তিবর্গের উপর ইহার সম্পূর্ণ পরিচালনভার অর্পিত হউক। শশধর বাবু প্রস্তাব করিতে যাইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন—কেবল বারম্বার রেজেষ্ট্রী হউক বলিতে লাগিলেন 'অথচ আইন-সঙ্গত স্থায়ীত্ব'টা কি তাহা আইনজ্ঞ হইয়াও শত চেষ্টায়ও বুঝাইতে পারিলেন না। তখন হীরেন বাবু কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, বিপিন বাবুও একটু বলিলেন—পাঁচকড়ি বাবুও চুপ করিয়া থাকেন নাই, কিছু বিরুদ্ধেই বলিলেন। ফলে মহাগোলযোগ উঠিল। বিজয় বাবু ও মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র প্রস্তাব স্থগিত থাকুক বলিয়া আপত্তি করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি টিকিল না। তখন আশু বাবু দাঁড়াইয়া সমগ্র প্রস্তাবটী বুঝাইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উপস্থিত করিলেন।—প্রথম, সম্মিলন আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হউক ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল, পরিচালক সমিতির সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে। এখানে বেশ একটু মজা হইয়াছিল ; একজন প্রস্তাব করিলেন—দশ জন সদস্য করা হউক কারণ 'দশে মিলে করি কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ'। তিনি বসিবামাত্র আর একজন বলিয়া উঠিলেন—তাহা হইলে ভগবান ভূত হবেন কারণ প্রবাদ আছে 'দশচক্রে ভগবান ভূত'। তিনি প্রস্তাব করিলেন—'তিন জন হইলেই ভাল হয়।'

সার আশুতোষ দাঁড়াইয়া মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—দশজনে গাজন নষ্ট হইতে পারে আশ্চর্য্য নয়। আবার তিনজন বড় কম হয়। পাঁচ জন হইলে ভাল হয়। ইহাতে আর প্রতিবাদ হয় নাই। তখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—সার আশুতোষ পাঁচ জনের একজন হউন ও তিনিই অপর চারিজন বাছিয়া লউন। সকলের মতে তখন সার আশুতোষ দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন বাবুর ব্যারিষ্টারী চালের উল্লেখ করিয়া নিজে একজন সদস্য হইবেন স্বীকৃত হইলেন ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামেন্দ্র বাবুর নাম করিলেন—করতালি দ্বারা উভয়ই মনোনীত হইলেন। মুসলমান সমাজেরও একজন প্রতিনিধি থাকা দরকার কাজেই ডাঃ গফুর মনোনীত হইলেন। তৎপর সভাপতি একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন—"পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পশ্চিম বঙ্গের একটা বিরোধ চলিয়া আসিতেছে এরূপ কেহ কেহ বলেন—তা মোটেই শোভন নয়। কাজেই একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে এমন 'একজন খাঁটি বাঙ্গাল' চাই এবং আমি চিত্তরঞ্জন বাবুকে প্রস্তাব করি।" অধিকাংশের সম্মতিতে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। শ্রোতৃবর্গ একঘণ্টাব্যাপী বিপুল আন্দোলন হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কবি জ্ঞানাঞ্জনের 'বন্দনা' শীর্ষক কবিতা ও ললিত বাবুর 'ভারতীবন্দনা' গীত হইল। চৈতন্য-হিন্দী-সভা প্রতিনিধিবর্গকে উদ্যান-সম্মিলনে আপ্যায়িত করিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে সভা ভঙ্গ করিবার সময় সার আশুতোষ বলিলেন তিনি সেই রাত্রেই কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, চিত্ত বাবু তাঁহার আসনে উপবিষ্ট হইবেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সার আশুতোষকে ধন্যবাদ দিলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করা হয়।

চৈতন্য-হিন্দী-সভার উদ্যান-সম্মিলনের পর রাত্রি ৭টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত বিষয়-নির্দ্ধারণ-সমিতির অধিবেশন। অনেকেই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ গোলমাল হয় এখানে সেরূপ কিছুই দেখিলামনা। যদু বাবু প্রস্তাব করেন যে 'অন্যান্য বার প্রত্যেক শাখা-সভাপতির অভিভাষণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পঠিত হয়; এবার তাহা না হইয়া চারিটী শাখাসভার সভাপতির অভিভাষণই একস্থানে পর পর পঠিত হউক, তৎপর সভা চারি শাখায় বিভক্ত হউক।' 'বলা বাহুল্য পূর্ব্ব ব্যবস্থাতে অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন—কাজেই যদু বাবুর প্রস্তাবে আর বিশেষ আপত্তি হইল না। ইহা ছাড়া দু' একটী অতি সামান্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। দু'একটী পুরাতন প্রস্তাব একটু Enlarged ও revised ও হয়।

পরদিন সকালে বেলা ৮ টার সময় সভা আরম্ভ ও পূর্ব্বদিনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ব্যবস্থামত শ্রীযুক্ত

চিত্তরঞ্জন দাশ তৎপর বিজয় বাবু ও যতীন্দ্র বাবু পর পর তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। চিত্তরঞ্জন বাবুর অভিভাষণ ভাব ও ভাষাগৌরবে সুন্দর হইয়াছিল। তিনি শুধু বৈষ্ণব কবিদের ভাব, রস, রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু দৃষ্টিহারা, কাজেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তিনি অতি সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় যে দু'একটী কথা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই স্মরণ রাখা উচিত। যতীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, কাজেই শ্রোতৃবর্গ যে বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে শুনিয়াছিল এমত বলা যায় না। বেলা অতিরিক্ত হওয়ায়, শশধর বাবুর বক্তৃতা সকালে পঠিত না হইয়া বিকালে হয়। তারপর সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় ও মামুলী ধরণের গোলমাল উপস্থিত হয়। প্রতিনিধিবর্গ কেহ এখানে পাঁচ মিনিট ওখানে পাঁচ মিনিট করিয়া শাখায় শাখায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে, প্রতিবৎসরই এরূপ গোলমাল হইতেছে অথচ ইহার একটা প্রতিকার হইতেছেনা। আমার মনে হয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইচ্ছা করিলেই ইহার একটা কিনারা করিতে পারেন। সভাতে যেরূপ দেখা যায় কোন লেখকই তাঁহার বক্তৃতা বা প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় পান না। কোনটা বা আংশিক পঠিত কোনটা বা অর্দ্ধপঠিত অবস্থায়ই শেষ করিতে হয়। অনেকগুলি অপঠিত অবস্থায়ই গৃহীত হয়। এইরূপে শ্রোতাদের যে কি লাভ হয় তাহা জানি না। সভায় কি কি প্রবন্ধ পাঠ হইল—কে কোন বিষয়ে কি বলিলেন—তাহা বোধ হয় কেহই বলিতে পারেন না। এমত অবস্থায় সম্মিলনের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় বুঝা যায় না। এই স্থলে যদি সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিয়ম করেন যে প্রবন্ধাদি অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে তাহাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক ও সেই সমস্ত প্রবন্ধাদি হইতে সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পঠিত হইতে পারে শুধু এমন গোটাকয়েক ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছাই করিয়া একই স্থানে পরপর পঠিত হইবে—তাহা হইলে বোধ হয় ইহার একটা মীমাংসা হইতে পারে—সম্মিলনেরও সার্থকতা হয়। অন্যান্য মনোনীত প্রবন্ধ, যেরূপ অধিকাংশই হইয়া থাকে, সেরূপ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষা আজও সকল বিষয়ে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় নাই যাহাতে এরূপ কড়াকড়ি করা যাইতে পারে। এরূপ নিয়ম হইলে নব্য লেখকগণের উদ্যম অনেকটা দমিয়া যাইতে পারে কিন্তু এখন তাহাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। আমার মনে হয় অন্ততঃ যেরূপ অধৈর্য্য ও 'অবজ্ঞার সহিত অধিকাংশ প্রবন্ধ পঠিত ও শ্রুত হয় ও যেরূপ গোলমাল উপস্থিত হয়—তাহাতে কি নব্য কি পুরাতন কেহই বোধ করি বৃথা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কতক্ষণ গলাবাজি করিতে ইচ্ছা করিবেন না। এমনও দেখা গিয়াছে কোন লেখক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যাইতেছেন ও অথচ শ্রোতার মধ্যে সভাপতি মহাশয় ও কতিপয় চেয়ার টেবিল ব্যতীত আর কেহই উপস্থিত নাই। আমার বিশ্বাস হয় না এরূপ উচ্চসম্মান কোন নব্য লেখক পাইতে অভিলাষী কি না। মাঝ থেকে এই হয় যে সম্মিলন পুরাতন লেখকদের (যাঁহাদের লেখার মূল্য আছে) কৃপা-কটাক্ষ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়। যদি লেখকদিগকে উৎসাহ দিতেই হয় তবে পরিষদ অথবা সম্মিলন নিজব্যয়ে অথবা অল্প মূল্যে সমস্ত পঠিত ও অপঠিত মনোনীত প্রবন্ধ 'সম্মিলন সংখ্যা' নাম দিয়া একত্র ছাপিতে পারেন, তাহাতে একদিকে যেমন উৎসাহ দেওয়া হইবে তেমনি সম্মিলনের প্রবন্ধাবলীর বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইবে। আলোচনারও অনেক সুবিধা হইবে। এতগুলি কথা বলিলাম কারণ সভাপতি ও শাখা-সভাপতিগণের অভিভাষণ ছাড়া প্রবন্ধগৌরবে বাঁকিপুর সম্মিলন তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা।

সন্ধ্যার সময় প্রতিনিধিবর্গ পূর্ণেন্দু বাবুর বাটীতে উদ্যান-সম্মিলনে একত্রিত হন। তথায় উপচারের ত্রুটী হয় নাই, কীর্ত্তন আবৃত্তি ও গানবাজনারও বেশ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় রচিত কয়েকটী কীর্ত্তন বড় মধুর লাগিয়াছিল।

রাত্রে উক্ত রিপণ রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত অভিনীত হয়। চন্দ্রগুপ্তের লুপ্ত নগরী পাটলিপুত্রের ভগ্নস্তূপের উপর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় বড়ই সুশোভন, সময়োপযোগী ও স্থানোপযোগী হইয়াছিল। রাত্র ১২ টার পর অভিনয় শেষ হয়। তাহার পর খাওয়া, স্বেচ্ছাসেবকগণের এই রাত্রিতে 'বাঘের বিক্রম সম' বাঁকিপুরের হাঁমানীতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন প্রাতে ৮টায় আবার চারি শাখার অধিবেশন হয় ও ১০টায় সভার সাধারণ কার্য্য শেষ হয়। তৎপর যাদবেশ্বর তর্করত্ন দর্শন সম্বন্ধে ১০ মিনিট বক্তৃতা করেন। ইহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা ও ধন্যবাদের পালা। পূর্ণেন্দু বাবু বিনয়ের আধার, তিনি পূর্ব্বেই এক একজন করিয়া সকলের নিকট জোড়করে ক্ষমাপ্রার্থনা ও ত্রুটী স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আবার আর একপ্রস্থ apology চাহিলেন। তৎপর রামলাল সিংহ—পাটনার (পাঁচকড়ি বাবুর মতে) লর্ড কিচেনার (Kitchen—er)—কবিত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক ওজস্বী ভাষায় ২নং ক্ষমা প্রার্থনা বা apology করিলেন। ৩নং apology করিলেন বাগ্মী মথুরানাথ সিংহ। তৎপর পাঁচকড়ি বাবু ও সমাজপতি মহাশয় ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ঠিক নম্বরওয়ারি করিয়া তাহার পাল্টা জবাব দিলেন। পাঁচকড়ি বাবুর বক্তৃতা বেশ সরস হইয়াছিল। তৎপর মন্মথনাথ দে পাঁচকড়ি বাবুর Duke of Monmouth রচিত 'বিদায় সঙ্গীত' গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সে সময় সকলেরই প্রাণ একটু নরম হইয়া আসিয়াছিল। তারপর Anglo-Sanskrit স্কুলের সম্মুখে সকলের ফটো গ্রহণ করা হয়। সেখানে পাঁচকড়ি বাবু ও বিজয় বাবুর ভিতর বেশ একটু wit combat হইয়াছিল।

এবার আহার সম্বন্ধে একটু বলিব, নহিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। সকলেই জানেন এইরূপ ব্যাপারে আহারের কিরূপ ঘটা হয়। মোট কথা বাঁকীপুর প্রবাসীগণ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোন কিছুরই অভাব রাখেন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা বোধ হয় আরও কয়েকদিন গলাবাজি করিয়া বক্তৃতা শুনিয়া অক্লেশে কাটাইয়া দিতে পারিতাম কিন্তু আহারের চোটে নিশ্চয়ই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইত। তাই আমার এক কবি-বন্ধু রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন ইহার নামটা সাহিত্য-সম্মিলন না হইয়া ভোজন-সম্মিলন হইলেই মানাইত ভাল। ভোরে উঠিয়াই চা, মিঠাই, দুপুরে বিরাট ভোজন, তার ভিতর পাটনাই 'দশরথ' (বুঝ লোক যে জান সন্ধান) হইতে আরম্ভ করিয়া পোলাও মাংস; আর পাপর ভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া মিষ্টান্ন রাবড়ি পর্য্যন্ত—কপি, ডাল, আলু ত সবই পাটনাই এককথায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নাই। তার পর বিকালে আবার চা-মিঠাই এর পুনঃপৌনিক, তার উপর উদ্যান-সম্মিলন—পুনরায় বিরাট ভোজন। বাস্তবিক বাঙ্গালীর উদর যে কতদূর স্থিতিস্থাপক তা এই ভোজন ব্যাপার হইতে বেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হাজার হউক—বিধাতার যেমন অবিচার—নাক, চোক, কাণ, হাত, পা, সবই দুইটী করিয়া কিন্তু মুখ ও পেটের বেলায় সবে একটী বই দুইটী দেন নাই। আমার মনে হয় এই একটী 'দগ্ধোদরস্যার্থেই' যখন এত বিপত্তি ও প্রয়াস, এত মারামারি রক্তারক্তি, তখন দুইটা করিয়া পেট থাকিলে কি আর রক্ষা ছিল? বোধ হয় বিধাতা পুরুষও মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এতটুকু কৃপণতা করিয়াছেন।

বাঁকিপুরের সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন একদিকে সম্মিলন করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে তেমনি একটী সুন্দর প্রদর্শনীরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শনিবার দিন প্রদর্শনী-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ইহাতে অনেক তথ্যপূর্ণ জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল। তন্মধ্যে কলিকাতার বসন্ত বাবু প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞীয় কাষ্ঠনির্ম্মিত জিনিসপত্রাদি ও বহু প্রাচীন চিত্র উল্লেখ যোগ্য। চিত্র গুলির কোনটী ৭০০। ৮০০ বৎসরের প্রাচীন। (১) একখানি হাতির দাঁতের উপর চিত্রিত হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি—পার্ব্বতীর অঙ্কে গণেশ। (২) একখানি রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক—ইহার পরিকল্পনা বড়ই সুন্দর। রাধাকৃষ্ণ যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া, উপরে কদম্ব শাখে ময়ুর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে। চিত্রখানি বাদশাহী আমলের, তাহাতে মোগল আর্ট স্পষ্ট দেদীপ্যমান। এই চিত্রখানি শ্রদ্ধেয়

বিপিন বাবু বার বার দেখিয়াও তৃপ্ত হইতে ছিলেন না। এ ছাড়া আরও অসংখ্য প্রাচীন চিত্র, শিখগুরু তেগ সিংহের তরবারি (৫ । ৬ সেরের কম হইবে না) ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, লৌহবর্ম্ম, তান্ত্রিক পূজার নরমুণ্ড, হাজার বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথি, ভগবৎ গীতার হস্তলিখিত পারসী অনুবাদ, পুরাতন মুদ্রা ও রাগ রাগিণীর (মোগল আমলের) চিত্র প্রভৃতি বহু দর্শন যোগ্য জিনিস ছিল। অধ্যাপক যদুবাবু যথাসম্ভব প্রত্যেকটীর পরিচয় দিয়া দিলেন।

সম্মিলনের কথা বলিলাম, প্রদর্শনীর কথা বলিলাম, আহারের কথাও বলিয়াছি, এবার 'বিহার' সম্বন্ধেও একটু বলিতে হয়।

পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর—এই তিনটী প্রধান নগর লইয়া বিহারের রাজধানী। তিনটী সহরই পাশাপাশি ও গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। তবে দানাপুর একটু দূরে। পূর্ব্ব দিকে পাটনা, মধ্যে বাঁকিপুর (মুরাদপুর, বাঁকিপুর, মিঠাপুর) বর্ত্তমান শাসন-কেন্দ্র। পশ্চিমে দানাপুর—সেনানিবাস। বাঁকিপুরে সমস্ত সরকারী আদালত, আফিস, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গীর্জ্জা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। তা ছাড়া লাট সাহেবের বাড়ী, সেক্রেটারিয়েট্, হাইকোর্ট প্রভৃতি লইয়া পশ্চিমে এক নূতন সহর গড়িয়া উঠিতেছে।

পাটনা সিটি অতি প্রাচীন মুসলমান সময়ে সহর ছিল, এখন প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্র। সেখানে বড় বড় মহাজনের আড়ত ও ব্যাঙ্কারগণ আছেন। কিন্তু দিন দিন যেমন বাঁকীপুর বড় হইতেছে পাটনার আয়তন ও (local value) 'কদর' কমিতেছে।

পাটনার প্রাচীন হিন্দু নাম পাটলিপুত্র। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় শিশুনাগবংশীয় রাজা অজাতশত্রু বৃজ্জিজাতির আক্রমণ রোধ করিবার জন্য গঙ্গাশোণে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন (৪৯০ খৃঃ অব্দ)। সেই দুর্গের আশ্রয়ে প্রাচীরের বাহিরে দোকানদার প্রভৃতি অন্যসব লোকে ঘর বাড়ী করায় ইহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পাটলি গ্রামে ও তাহা হইতে পাটলিপুত্র সহরে পরিণত হয়। ৪৪০ খ্রীঃ অব্দে মগধের রাজা উদয় রাজধানী রাজগৃহ ছাড়িয়া পাটলিগ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাহার একশতাব্দী পরে দেখিতে পাই রাজগৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত ও রাজধানী পাটলীপুত্রে স্থায়ী ভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অবশ্য শোণ এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই পাটলিপুত্রই চাণক্য-সহায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের লীলা-নিকেতন। এখানেই গ্রীক দূত মেগেস্থিনিস্ তাঁহার দরবারে উপস্থিত থাকিতেন।

পাটলিপুত্রের অপর নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার অনুমান করেন সম্ভবতঃ 'কুসুমপুর' দুর্গ প্রাচীরের উপকণ্ঠ মাত্র। প্রত্যেক হিন্দু রাজাদের রাজধানীর বাহিরে প্রমোদ কানন বা ফুলবাগান থাকিত। কুসুমপুর এইরূপ উপকণ্ঠের শ্রেণীবাচক নাম। ক্রমে সহর বাড়িয়া উপকণ্ঠটিকে গ্রাস করায় কুসুমপুর স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া পাটলিপুত্রের একটি পাড়ায় পরিণত হইল। আবার কেহ কেহ বলেন পাটলিপুষ্প (Bignonia Snaveoleus) হইতে এই পাটলিপুত্র নাম গৃহীত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে পুষ্পপুরের অথবা কুসুমপুরের সহিত ইহার সাদৃশ্য কল্পনা করেন। যদুবাবু বলেন দাক্ষিণাত্যেও দেখা যায় "প্রত্যেক দুর্গের আশ্রয়ে কিন্তু বাহিরে একটি করিয়া গ্রাম আছে তাহাকে পেঠ, পেট্টা বা বাড়ী বলে। 'পাটলী' নামও ঐরূপে উদ্ভব হইয়াছে।"

প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর যে চিরকাল একস্থানে ছিল তাহা নয়। নদীর পরিবর্ত্তনে ও অন্যান্য কারণে অথবা রাজার ইচ্ছামত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সরিয়া গিয়াছে। দিল্লীতেও এইরূপ হইত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য্যসম্রাট্) হইতে গুপ্তবংশ ধ্বংশ পর্য্যন্ত আট শতাব্দীর অধিককাল পাটলিপুত্র মগধের ও মধ্যে পাঁচ শত বৎসর সমগ্র উত্তর ভারতের রাজধানী ছিল। মৌর্য্যযুগে পাটনা নগরী গৌরব ও বিভবের উচ্চশিখরে পৌঁছায়। মেগেস্থিনীস্ বলেন—'এই রাজধানী নয় মাইল লম্বা দেড় মাইল চওড়া প্রকাণ্ড উচ্চ শালকাঠের বেড় দিয়া ঘেরা। এই বেড়াতে ৬৪টা ফটক এবং ৫৭০ উচ্চ রক্ষীমঞ্চ (bastion) ছিল। বাহিরে ৩০ হাত গভীর ও ৪০০ হাত প্রশস্ত পরিখা সর্ব্বদা শোণ নদের জলে পূর্ণ।

রাজপ্রাসাদ কাঠের, কিন্তু পারস্যের রাজধানীর হর্ম্ম্য অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর!' (ম্যাক্‌ক্রীণ্ডল্‌ ৬৬—৬৮)

এই সহরেই সুঙ্গবংশীয় মহারাজ পুষ্যমিত্র দিক্‌বিজয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শকদিগের উপর্য্যু-পরি আক্রমণে যখন (খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দী) উত্তর ও পশ্চিম ভারত বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে তখন সেই সঙ্গে পাটনার অস্তিত্বও লুপ্তপ্রায় হয়। ৪র্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত মগধের জমিদার গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র ভারতের নেপোলিয়ান সমুদ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্র আবার উত্তর ভারতের রাজধানীরূপে সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করে। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনীক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আগমন করেন। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে পাটনার সমৃদ্ধি ও গৌরবের উল্লেখ দেখিতে পাই।—"রাজ-প্রাসাদের অংশগুলি মহারাজ অশোকের আজ্ঞায় দানবেরা নির্ম্মাণ করে। এমন দেওয়াল দরজা ও প্রস্তর খুদিয়া ছবি বাহির করা মানুষের কাজ নহে।" (Beal I, IV).

তারপর গুপ্ত-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে পাটলীপুত্রের গৌরব-সূর্য্যও অস্তমিত হইল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী পাটলিপুত্রের ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ'। এই সময় হুন আক্রমণ হয়। পাটলিপুত্রেও বোধ হয় তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়া-ধিপ শশাঙ্কের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। এই শশাঙ্ক কে ছিলেন—সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ আজিও একমত হইতে পারেন নাই শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন ইনি হয়ত গুপ্ত রাজাদের কোন সামন্ত ছিলেন, পরে গুপ্তদের ক্ষমতার হ্রাস হইলে ক্রমে গৌড়াধিপ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত বাংলার অধীশ্বর হন। এই শশাঙ্ক বৌদ্ধদ্বেষী (রাজনৈতিক কারণে) হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম উন্মূলিত করিয়া পোড়াইয়া ফেলেন। পাটলিপুত্রের বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তরাদি ভগ্ন করেন, বৌদ্ধবিহার-সমূহের বিনাশ করিয়া হিমালয়ের পাদ-দেশ পর্য্যন্ত আপনার বিক্রম বিস্তার করেন। বোধ হয় পাটলিপুত্র তাঁহার শাসনেই ছিল। কিন্তু শশাঙ্কের ক্ষমতা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। হর্ষবর্দ্ধনের উদয়ে শশাঙ্ক অস্তমিত হইলেন। সেই সময় চীন পরিব্রাজক ইউয়ান্‌ চোয়াং (৬১০ খৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন—'পাটলিপুত্র শ্মশান—জন-শূন্য, চারিদিকে বনজঙ্গল ও শত শত মন্দির সঙ্ঘারাম ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ।' (Beal II, 82-86)

পাঁচ শতাব্দীর পর মুসলমানগণের সময়ে পাটনা আবার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শেরসাহ (১৫৪১) পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে তথায় একটী ইটের দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। মোগল যুগে আবার বিহার প্রদেশের রাজধানী বিহার হইতে পাটনায় উঠিয়া আসিল। নবাবী আমলে পাটনা দেওয়াল দিয়া ঘেরা হয়। মোগল ও নবাবী আমলের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

১৯১২ খ্রীঃঅব্দে বিহার বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁকিপুর রাজধানী বলিয়া স্থির হয়। বাঁকিপুরেও দর্শনীয় স্থান অনেক আছে।—

সহরের বাহিরে ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে 'কুমরাহাড়' নামে একটি গ্রাম আছে (কুমার গুপ্তের নামানুসারে 'কুমরাহাড়' নাম হইয়াছে এইরূপ কেহ বলেন)। এখানে দুইটী মাটী ও ইটের ঢিপি আছে। ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত "প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁকিতে ও ব্যাকরণের মুষলে" এই কুমরাহাড়ে অনেক অপূর্ব্ব জিনিস বাহির হইয়াছে। ১৮৯৪ খ্রীঃঅব্দে গবর্ণমেণ্ট খনন আরম্ভ করেন, তাহাতে ঐ দুইটী ঢিপি বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ১৮৯৫—৯৬ সালে ওয়াডেল সাহেবের পরিদর্শনে পুনরায় খনন আরম্ভ হয়, তাহাতে কুমারহাড়ে, বুলন্দীবাগে ও দুইটী গ্রামে খোদাই করিয়া অনেক মূর্ত্তি, পাথর, শালের কড়িকাঠ, ছবিকাটা ও ইষ্টকময় ভিত্তি বাহির হয়। বুলন্দিবাগে একটী সুন্দর গ্রীক ও পারসীক ধরণের স্তম্ভশীর্ষ পাওয়া যায়। ওয়াডেল সাহেব বলেন এখানেই অশোকের প্রাসাদ ছিল। ১৮৯৭—৯৯ সালে কোনও নূতন আবিষ্কারই হয় নাই। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে রতন তাতার ব্যয়ে কুমরাহাড়ে আবার খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। অনেক গভীর মাটীর নীচে সমান সমান দূরে প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্ন খণ্ড পাওয়া যায়। একটি ১৪ ফিট লম্বা গোল স্তম্ভ পাওয়া

গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে এখানে বাড়ী ছিল। একজায়গায় ৭ ফুট ভিত্তির স্তর, তৎপর ১ ফুট ভস্মের স্তর ও তন্নিয়ে পুনরায় ৮ ফুট আন্দাজ ইষ্টক ভিত্তির স্তর দেখা যায়। ডাক্তার স্পুণার বলেন যে ইহাই মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ ছিল ও পারসিক কারিগরের দ্বারা পার্সিপোলিন রাজপ্রাসাদের (দারায়ুসের) হুবহু অনুকরণে তৈয়ারি। তাঁহার পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল (ঐতিহাসিক রাখালরাজ রায় মহাশয়ের মুখে যেরূপ শুনিলাম) যে উপরের স্তর মুসলমান আমলের। পরে তাঁহার এ মত বদলাইয়া যায় ও ক্রমে গুপ্ত হইতে শেষে উপরের ও নীচের উভয় ইষ্টক স্তরই মৌর্য্য যুগের বলিয়া বিশ্বাস হয়। তাহার মতে যে স্তম্ভগুলির উপর উক্ত প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল সে স্তম্ভগুলি প্রাকৃতিক কারণে বা অন্য কোন কারণে মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক সারিতে ১০টী করিয়া ৮ সারি স্তম্ভচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভগুলি ১৫ ফিট অন্তরে অন্তরে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন যে এই প্রাসাদ দ্বিতল ছিল, উভয় তলের মধ্যে কাষ্ঠের ছাদ ছিল। সেই কাষ্ঠ ছাদই অগ্নিযোগে অথবা কালক্রমে ভস্মস্তরে পরিণত হইয়াছে। স্পুণার সাহেব এখানেই নিরস্ত হন নাই। তিনি মহাভারতোক্ত ময়দানব নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহের সহিত এই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সভাগৃহের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া বলেন—"মৌর্য্য প্রাসাদ পার্সিপোলিসের অনুকরণে ও মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সভা চন্দ্রগুপ্তের সভা দৃষ্টে বর্ণিত।" তিনি আরও বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত, তৎমন্ত্রী চাণক্য, উভয়েই পারসিক এমনকি ভগবান বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত এবং মহাভারতোক্ত 'ময়দানব' অর্থাৎ অসুর ময় পারসিক দিগের দেবতা 'অহুর মজদ্' এর ভারতীয় সংস্করণ। যাহা হউক সে সমস্ত বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি মেগেস্থেনিস্ যে চন্দ্রগুপ্তের দারুময় প্রাচীরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কুমরাহাড়ে নয়—বুলন্দীবাগে তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কুমরাহাড় ও বুলন্দীবাগে অসংখ্য মাটীর পুতুল ও মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, ছোরা, স্বর্ণঅলঙ্কার, চর্ম্ম, তীর ও একটা চারফুট প্রশস্ত রথচক্র, হাতির হাড়, ১৪। ১৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ১০ ইঞ্চি প্রস্ত ও ৩½ ইঞ্চি পুরু প্রকাণ্ড ইষ্টক, বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, কেদারনাথ মজুমদার মোজম্মেল হকের সঙ্গে আমরা রাখাল বাবুকে লইয়া ও অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐতিহাসিক চিহ্নসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। তবে অধিকাংশ স্থলই জলে পূর্ণ। পোদিত জিনিসপত্রাদি স্পুনার সাহেবের বাড়ীতে আছে। পাটনায় যাদুঘর প্রস্তুত হইলে এ সমস্ত সেখানে রক্ষিত হইবে।

বাঁকিপুরের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য জিনিস খুদাবক্স পুস্তকালয়—ইহাতে অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পার্সী ও আরবি পুথি রক্ষিত আছে—এতদ্ভিন্ন অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী গ্রন্থ ও মূল্যবান প্রাচীন মুঘল যুগের চিত্রাদি রক্ষিত আছে। এরূপ মুসলমান গ্রন্থের মূল্যবান্ সংগ্রহ ভারতের আর কোথায়ও নাই। প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে এই পুস্তকাবলীর মূল্য খুব বেশী। তিনখানি চিত্র দেখাইয়া অধ্যাপক যদু বাবু বলিলেন—'এগুলি হইতে মুঘল যুগে ভারতে চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।' ১ম চিত্রখানি (১৬৪০ খৃঃ) আলীমর্দ্দান খাঁ শাহজাহানের সঙ্গে প্রথম দেখা করিবার দিন যে 'শাহনামা মহাকাব্য' তাঁহাকে উপহার দেন সেখানি। ইহাতে চীনা বুখারার আর্ট প্রতিফলিত। ২য় খানি 'তারিখ-ই-খানদান তাইমুরিয়া' নামক গ্রন্থের ছবিতে দেখা যায় চীনা ও ভারতীয় আর্টের কিরূপ খাপছাড়া মিশ্রণ হইয়াছে। এইসব চিত্রকরদের অধিকাংশই হিন্দু।

তৃতীয় গ্রন্থ, শাহজাহানের সময় রচিত 'পাদিশাহনামা'। ইহাতে ভারতীয় সূক্ষ্ম অলঙ্কারের ছটা, রঙ্গের বৈচিত্র্য, খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, অবয়বের কোমলতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

'মুরাকা'তে অবনতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তারপর ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্ণৌর জঘন্য চিত্রকলার উৎপত্তি, ইয়োরোপের প্রভাব দেদীপ্যমান। এসব

ছাড়া পারস্য, আরব, তুর্কী ও মধ্য এসিয়ায় অঙ্কিত বহু মূল্যবান্ ছবি, সুন্দর ফারসী হস্তাক্ষরের নমুনা ও বাদশাহদের স্বাক্ষর প্রভৃতি এখানে রক্ষিত আছে।

মহাত্মা খুদাবক্স অর্দ্ধলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই দ্বিতল পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়া নানা তথ্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি ও চিত্রে সুশোভিত করিয়া ইহা সর্ব্বসাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন।

স্থানীয় বারিষ্টার মান্নুক সাহেবের বাড়ীতে অনেক ভারতীয় প্রাচীন চিত্র ও মুদ্রা-সংগ্রহ আছে। দুঃখের বিষয় আমরা তথায় যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য, বাঁকিপুর ময়দানের উত্তর পশ্চিমে গোলঘর। যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দেখেন নাই তাঁহারা ইহার ধারণা করিতে পারিবেন না। ১৭৮৪—৮৬ খ্রীঃ অব্দে ইঞ্জিনিয়ার গার্ষ্টিন্ (Garstine) ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে এই বিরাট গুম্বজ প্রস্তুত করেন। পাথরে খোদা আছে—"মন্ত্রী পরিবেষ্টিত গবর্ণর জেনারেল এই সব প্রদেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহার অঙ্গস্বরূপ এই শস্যাগার কাপ্তেন গার্ষ্টিন্ কর্ত্তৃক ২০এ জুলাই ১৭৮৬খ্রীঃ সম্পূর্ণ করা হইল। প্রথমবার শস্যে পূর্ণ করিবার তারিখ—"

চিরকালের জন্য দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে এককণা শস্যও সঞ্চিত হয় নাই—ঐ তারিখের স্থান আজও খালি রহিয়াছে। এই জন্য সাহেবেরা ইহাকে গার্ষ্টিনের 'নির্ব্বুদ্ধিতার ফল' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকেন। চূড়ায় উঠিবার জন্য ১৪০টী সিঁড়ি বাহিরে গা বাহিয়া চলিয়াছে। সেখান হইতে পাটনা সমেত সমস্ত সহরটীকে সুন্দর মানচিত্রের মত দেখায়।

নূতন সহরে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এতদ্ভিন্ন আরও দর্শনযোগ্য স্থান ছিল তাহা দেখিবার অবসর হয় নাই।

বাঁকিপুর বেহারের রাজধানী—কাজেই বিহারীদেরই প্রাধান্য। বাঙ্গালী মুষ্টিমেয়। ইহার উপর বিহারী-বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল। আমার সঙ্গে একজন বেহারীর আলাপ হইয়াছিল। সে বলিল—'আমরা feeling খারাপ হইতে পারে এজন্য আমাদের Ripon Parsee থিয়েটার তোমাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি।' চৈতন্য সভার উদ্যান-সম্মিলন ও বোধ হয় সেই জন্য। যাহা হউক feelingটা খুবই খারাপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিহারীরা অধিকাংশই গরীব। সহরের অধিকাংশ ঘরই খোলার এমন কি 'হাইকোর্ট ভী খাপরা পোষ'। রাস্তাঘাট বড় অপরিষ্কার, ধূলিময়। বড় রাস্তা একটী, নদীর ধারের দৃশ্য বেশ সুন্দর। দেখিলাম তথায় দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এক বিপুল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। সহরে জলের কল নাই। নদী ও কুয়ার জলেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যাতায়াতের জন্য একার চলনই বেশী দুই ঘোড়ার গাড়ীও আছে। তবে আমরা বেহারে থাকিয়াও বিঘোরে পড়ি নাই কাজেই একাতেও চড়িতে হয় নাই।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে সুখের বিহার-প্রবাস কাটিয়া গেল। প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই মঙ্গলবার রাত্রেই চলিয়া যান। আমরাও আর অধিক উৎপীড়ন করিতে চাহিলাম না। তারপর বুধবারের উষায় যখন বৃক্ষশাখার পাখীরা প্রভাতী গাহিয়া উঠিল ও ধীরে ধীরে উষার অরুণচ্ছটায় পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তখন কম্বল-মুড়ি দিয়া দু'দিনের বন্ধু-বান্ধবদের হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তিন দিনের সুখ-স্মৃতি লইয়া গয়া ট্রেণে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেণে বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁকিপুরে কি দেখিলে?' ট্রেণে উঠিলে একটি সাহিত্যিকবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁকিপুরে কি দেখিলেন?' আমি আর কি বলিব? বলিলাম—'দেখিলাম বাঙ্গালীর হৃদ্যতা, সৌজন্য, আতিথেয়তা, প্রাণভরা সরসতা ও স্নিগ্ধতা, আর দেখিলাম বাঙ্গালী বিহারী হয় নাই। বাহিরে—বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব বিকৃত হয় নাই, সম্পূর্ণ বজায় আছে।' দেখিতে দেখিতে বাঁকিপুর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র সরকার।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

(২)

যখন শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন সেই সময় একদিন বঙ্কিম বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বঙ্গদর্শন চলিতেছে কেমন?" আমি উত্তর দিলাম "টায় টোয়।"

তিনি। কেন বল্ দেখি?

আমি। কমলাকান্তের অভাবটা পাঠকের বড় লাগিয়াছে।

তিনি "বটে" বলিয়া একমনে তামাকু খাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত অবিচলিত, স্থির, গম্ভীর। তাহারই কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে ঢুকিয়া কি একটা বস্তু পান করিয়া আসিলেন। উপস্থিত ছিলাম আমি ও কাঁঠালপাড়ার পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি আমাদিগকে বিদায় দিয়া লিখিতে বসিলেন। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইলে "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র পাণ্ডুলিপি আমায় পড়িতে দিলেন। এটা ঐশী শক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? তাহার পরই উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে তিনি ব্রাণ্ডী হুইস্কী সাকি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আর একদিন তৎকালীন বঙ্গদর্শনের কথা উত্থাপন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "এবারকার বঙ্গবাসী পড়েছ?"

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

তিনি। বঙ্গদর্শনের সমালোচনাটা পড়েছ কি?

আমি। পড়েছি।

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ওর সবটাই ভুল। যে গুলিকে দাদার লেখা ভাবিয়া ভাল নয় বলিয়াছে সেগুলি আমার লেখা, আর যেগুলি আমার লেখা মনে করিয়া ভাল বলিয়াছে সেগুলি দাদার লেখা।"

যখন "প্রচারে" শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় *"সংসার" (উপন্যাস) লিখিতেন, আমি তখন "নবজীবনে"* "মহামায়া" (উপন্যাস) লিখি। বঙ্কিম বাবু একদিন হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন "এবার তোমায় ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই।"

আমি কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিয়াছিলাম "ভেড়া কি ষাঁড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য?" তিনি যেন একটু প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই।

আর একদিনের কথা, আমি নবজীবন কার্য্যালয়ে গিয়াছি দেখি যে বঙ্কিম বাবু, অক্ষয় বাবু, আরও দুটী তিনটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন শ্রীযুক্ত করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন শিয়ালদহের মুন্সেফ ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে গল্প চলিতেছে। আমি পার্শ্বে বসিয়া আছি। তখন আমার বয়স একুশ বাইশ বৎসর মাত্র। আমার দুর্ম্মতি, আমি তাঁহাদিগকে গল্পোন্মত্ত দেখিয়া দরজার পার্শ্বস্থ একটী আলমারির অন্তরালে তামাকু খাইতে গিয়াছি। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর তীব্র দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। তিনি গর্হিত কার্য্য কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই আমাকে দারুণ লজ্জা দিয়া অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলেন "তারক, হুঁকার ভড়্‌ভড়ানিটে বড় কাণে বাজিতেছে।"

বঙ্কিম বাবুর সমালোচনাকে আমি বড় ভয় করিতাম। যখন প্রথম প্রথম উপন্যাস লিখি তখন সমালোচনার জন্য কোন কোন সংবাদপত্রে পুস্তক দিতাম, কিন্তু বঙ্গদর্শনকে দিই নাই। আমার প্রথম উপন্যাস "গিরিজা", যাহা তদানীন্তন ছোটলাট আমার পিতৃবন্ধু সার এসলি ইডেন সাহেবকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার প্রশংসাবাদপূর্ণ সমালোচনা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইলে বঙ্কিম বাবু পুস্তকখানি দেখিতে চাহেন এবং হাসিতে হাসিতে বলেন "সরকারি গেজেটে 'গিরিজা' 'successful imitation of Bankim Chandra' বলিয়াছে, এটা গালি না প্রশংসা?"

আমি বলিলাম "আপনার successful imitation আমার পক্ষে বড়ই গৌরবের কথা।" ইহার কিছুদিন পরে "ক্ষুদ্র উপন্যাস" শীর্ষক একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ স্নেহপরবশ হইয়া আমায় মিষ্ট মুখে বিদায় দিয়াছিলেন। তিনি যাহার উপর ঝাল ঝাড়িতেন তাহার হাড়ে হাড়ে রী রী করিত।

একবার হুগলীতে থিয়েটার, তখন বঙ্কিম বাবু তথায়

কর্ম্ম করেন। কলিকাতার ন্যাশন্যাল থিয়েটার কোম্পানি অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমার পরিচিত কয়েকজন অভিনেতা আমার নিকট চুঁচুড়ায় থিয়েটার করিবার প্রস্তাব করায়, আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম। অভিনয়ের দিন দেখিলাম চুঁচুড়ার জমিদার বাবু রমেশচন্দ্র মণ্ডল ও চন্দননগরের বাবু কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ষ্টেজ বাঁধাইতেছেন। ভাবিলাম ভালই হইয়াছে, আমি কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার ইচ্ছাসত্বেও প্লাটফরম না বাঁধাইয়া গোল বাঁধাইলেন। মঞ্চ না থাকায় ও তজ্জন্য দর্শকদিগের দেখিবার অসুবিধা হওয়ায় কান্তি বাবু প্রথম বেঞ্চে উপবিষ্ট কতকগুলি দর্শককে স্থানান্তরিত করিয়া আপনার পরিচিত কয়েকটি ভদ্রলোককে সেইস্থানে বসাইবার চেষ্টা করেন। এই লইয়া তুমুল কাণ্ড ঘটে। ভীষণ মারপিট আরম্ভ হয়। বসিবার বেঞ্চ মানুষের মাথার উপর পড়িতে থাকে। হাতের ছড়ি লোকের পৃষ্ঠদেশে স্থান পায়। বঙ্কিম বাবু, রাখাল বাবু, (তাঁহার জামাতা), তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিন বাবু, (অধুনা সবজজ), ডেপুটী বাবু শ্যামধর রায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জজ প্রভৃতি অন্যান্য সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকলেই বিব্রত, সাহেবেরা আপন মেম লইয়া ব্যস্ত; বঙ্কিম বাবু ব্যস্ত জামাতা রাখাল বাবুকে লইয়া। তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য আমায় অনুরোধ করায় আমি তাঁহাকে গ্রীনরুমে রাখিয়া আসি। এই উপলক্ষে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষরূপে প্রহৃত হইয়াছিলেন। কাহারও পিঠে ছড়ি ভাঙ্গিল, কাহারও কপাল দিয়া রক্ত ছুটিল, কাহারও বা গলবিলম্বী সোণার চেন যে কোথায় উড়িয়া গেল তাহার স্থিরতা হইল না। তখন রণ-বিজয়ীগণ আবার স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলে পুনর্ব্বার অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, স্বনাম খ্যাত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রাম ও মেঘনাদের অংশ অভিনয় করেন। অক্ষয় দাদা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে আমি চেষ্টা করিলে এতটা ঘটিত না। কিন্তু সেটা তাঁহার ভ্রম। চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ ছড়িগুলি সাদরে আমারই পৃষ্ঠে আশ্রয় লাভ করিত। যাহাই হউক আমি অব্যাহতি পাইলাম না। তাহার পরদিন "সাধারণী" সংবাদ পত্রে "ঘরের শত্রু বরযাত্রী" নামে একটী সুন্দর রঙ্গরসপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বুঝিলাম অক্ষয় দাদা ঝালটা আমারই ঘাড়ে ঝাড়িয়াছেন!

বঙ্কিম বাবু রাখাল বাবুকে যেমন ভালবাসিতেন, তাঁহার পুত্রগণকেও তেমনি স্নেহ করিতেন। একদিন তাঁহার কোন দৌহিত্র শ্বশুরালয়ে যাইবেন। দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইয়া। তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছেন। যুবকের মুখে রৌদ্রের আভা পড়িল দেখিয়া তাঁহার হস্তস্থিত ছাতাটী তাহার মাথার উপর ধরিলেন। তিনি তাঁহাদের মাতামহ না থাকিয়া যেন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুহারা হইয়া তাঁহারা না জানি কি মর্ম্মস্পর্শী শোক পাইয়াছেন।

যখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা আত্মহত্যা করেন তখন তাঁহাকে বড়ই বিচলিত দেখিয়াছিলাম। তিনি কয়েকদিন কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। তাহার পর হইতেই নাকি তাঁহার দেহে বহুমূত্রের সূত্রপাত হয়।

বঙ্কিম বাবু দানশীল ছিলেন, ভিক্ষার্থী কখনও তাঁহার নিকট বিমুখ হইত না। বর্দ্ধমানে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮৭৩ বা ৭৪ সাল বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে তিনি তথায় বেড়াইতে গিয়া তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া ২০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বিজ্ঞান সভায় ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। এরূপ অনেক দান তিনি করিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষের সময় একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে সঞ্জীব বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ তিন্তিড়ি বৃক্ষতলে ফেলিয়া তাহার পিতা নিরুদ্দিষ্ট হয়। পিতাঠাকুর মহাশয় কাছারি হইতে আসিবার সময় রোদনশীলা বালিকাকে দেখিতে পাইয়া সঞ্জীব বাবুর বাসায় লইয়া যান, তখন বঙ্কিম বাবুও তথায় ছিলেন। বালিকার পিতার সন্ধান না হওয়ায় পিতৃদেব তাহাকে আপন বাসায় আনিয়া কন্যার

তার প্রতিপালন করেন এবং স্বদেশে একটী বাগ্দী প্রজার সহিত তাহার বিবাহ দেন। বালিকার নাম ছিল "নন্দরাণী"। সে আজিও বাঁচিয়া আছে। বঙ্কিম বাবু কিন্তু কখনও সে বালিকাকে ভুলেন নাই, যখনই বর্দ্ধমানে আসিতেন তখনই তাহাকে দেখিতেন, তাহার সহিত রঙ্গরস করিতেন। সে কলের গাড়ীর ছড়া কাটিত তিনি তাহাই হাস্যবদনে শুনিতেন। পরে কলিকাতায় অবস্থানকালেও তাহার সংবাদ লইতে ভুলিতেন না।

বঙ্কিম বাবুর পিতা স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ২।৪ বার মাত্র দেখিয়াছি। প্রথম দর্শন পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া। বঙ্কিম বাবু আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যান। দূর হইতে দেখিলাম ঠাকুর দালানের মধ্যস্থলে তেজঃপুঞ্জ একটী সজীব দেবতা মূর্ত্তি বসিয়া আছেন। শুভ্র কেশ, দীপ্তিমান চক্ষু, কান্তিময় দেহ। তিনি আমাকে দুঃখ করিয়া বলিলেন "দিগম্বরের শ্রাদ্ধ সংবাদ আমায় না দিলেই ভাল হইত।" ইডেন সাহেব ছোটলাট হইবার পর দিগম্বর বলিয়াছিল, 'এইবার আমার রাজত্ব আসিল, এখন হইতে ক্রমান্বয়ে যত ছোটলাট আসিবে সকলেই আমার বিশিষ্ট বন্ধু। এতদিন আমি মন খুলিয়া লোকের উপকার করিতে পারি নাই। এইবার করিব।' সুতরাং দিগম্বরের অকাল-মৃত্যুতে অনেকের আশা ভরসা নষ্ট হইল।"

বঙ্কিম বাবু স্পষ্ট বলিলেন "শ্রাদ্ধে আমরা কেহ যাইব না, একি তোমার ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ যে বলিতে আসিয়াছ?"

পিতার মৃত্যুতে অনেক গণ্যমান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীর নিকট হইতে শোকসূচক পত্র পাইয়াছিলাম। তদানীন্তন ছোটলাট সার এসলি ইডেনও তদ্রূপ একখানি (condolence letter) পত্র দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ আফ্তাপ চাঁদ মহাতপ বাহাদুরের রাজ্য প্রাপ্তি (installation) উপলক্ষে তিনি বর্দ্ধমানে যাইয়া আমার পিতার কয়েকটী বন্ধুকে বলেন "দিগম্বরের ছেলেরা আমার সহিত দেখা করেনা কেন?" বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর পূজ্যপাদ পূর্ণ বাবু তখন হুগলীর স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার। তিনি ইহা শুনিয়া বলেন "তোমরা কেমন লোক হে, যাঁহার সহিত উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎ হয় না, তিনি তোমাদের দেখিতে উৎসুক অথচ দেখা কর না।" ইহার পর আমি বেল্‌ভেডিয়ারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি বিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অবশেষে আমাকে চাকরী করিতে বলেন এবং তাঁহার সেক্রেটারি অনারেবল হোরেস কক্‌রেন সাহেবকে পত্র দেন আমাকে সবডেপুটীর চাকরী দিতে। সে বোধ হয় ১৮৭৯ সালের কথা। তখন আমি তরুণবয়স্ক যুবক, এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ি। চাকরীর বাজারের বিশেষ খবর রাখি না। তাই কক্‌রেন সাহেবের কাছে চাকরী করিতে অস্বীকার করি। তিনিও আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। এই গর্হিত কার্য্যের জন্য আমি বঙ্কিম বাবু, সঞ্জীব বাবু, পূর্ণবাবু ও অপরাপর পিতৃ-সুহৃদ কর্ত্তৃক যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। তখন ভাবিতাম চাকরী না করিলে কি চলেনা? লাট সাহেব ক্রমে শুনিলেন যে আমি চাকরী না করিয়া পুনরায় পাঠারম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি হুগলী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল গ্রিফিথ্স সাহেবকে আমার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পত্র লেখেন। সেই পত্র পাইয়া তিনি ক্লাশে আসিয়া আমার অনুসন্ধান করেন। আমি সেদিন কলেজে যাই নাই। আমার সহপাঠী ও প্রিয় সুহৃদ বাবু প্যারীমোহন হালদার (অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এসেসরের হেড্ ক্লার্ক) আমাকে সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ দেন। তদানীন্তন দেব-প্রকৃতি সাহেবদিগের বন্ধুবাৎসল্যের ইহা একটী প্রকৃষ্ট পরিচয়।

যখন চাকরী করিবার আবশ্যকতা বুঝিলাম তখন চাকরীর বাজার বেশ গরম। বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম "আমার একটী চাকরী করিয়া দিন।" তিনি বলিলেন "আমি সাহেবদের সুপারিশ করিতে বড় নারাজ। তুমি নিজে চেষ্টা কর। যদি অকৃতকার্য্য হও বলিও আমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্তকে পত্র দিব তিনি সব্‌রেজিষ্ট্রী চাকরী করিয়া দিবেন। সম্প্রতি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশের জন্য

অনুরোধ করিয়াছি, তাহার চাকরী হইয়া না গেলে বলিতে পারিতেছি না।" কিন্তু বলিয়া দিলেন যে "বর্ত্তমান ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলির সহিত তোমার পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল তাঁহার কাছে যাও; সুবিধা হইতে পারে।" আমি একখানি পরিচয়-সূচক পত্র (Letter of introduction) চাহিলে বলেন "আমার সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই।"

যাহাই হউক আমি বেলি সহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং সাক্ষাৎ কালে আমার "গ্রন্থাবলী" প্রথম ভাগ তাঁহাকে উপহার দিই। তিনি সহাস্যবদনে পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন "I hope you will become second Bankim Chandra in time." বঙ্কিম বাবুর তাঁহার সহিত বিশেষ আলাপ না থাকিলেও তিনি বঙ্কিম বাবুকে যে বিশেষ রূপে জানিতেন, তাহা বুঝিয়া ছিলাম। তখন লায়ান সাহেব, অধুনা Hon'ble P. C. Lyon, তাঁহার Private Secretary ছিলেন। বেলি সাহেব তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন এবং বলেন যে আমার পিতা তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গলার ছোট লাটের এতাদৃশ সহৃদয়তা তখনও বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার কৃপায় এবং বঙ্কিম বাবু উপদেশে আমি অচিরে চাকরী পাইয়াছিলাম।

লোকের প্রকৃতি নানাবিধ। কেহ পরের জন্য সাহেবদের কৃপাপ্রার্থী, কেহবা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য। এ বিষয়ে নিষ্কাম ভাব ত দেখিতে পাই না। শচীশ বাবু লিখিয়াছেন (২৪৮ পৃষ্ঠা) "বঙ্কিম বাবু নিজের জন্য কখনও রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হয়েন নাই। আত্মীয় স্বজনের জন্য তিনবার ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। একবার জ্যেষ্ঠ জামাতার জন্য, দ্বিতীয়বার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের জন্য, তৃতীয়বার এই ক্ষুদ্র লেখকের জন্য।

বঙ্কিম বাবু তেজস্বী অথচ কার্য্যকুশল রাজপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিজের জন্য কাহারও কৃপা ভিক্ষার আবশ্যক ছিল না। শাসন ও বিচার কার্য্যে যে সকল গুণের আবশ্যক তাহাতে তাঁহার অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া স্বীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে হয় নাই।"

ইহাই যথেষ্ট। তাই মনে হয় প্রথমোক্ত অংশটুকু জীবনীতে না থাকিলেই ভাল হইত। শচীশ বাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তিনি কৃপা ভিক্ষা করিতেন না, তবে যেখানে না করিলে চলে না, সেখানে দায়ে পড়িয়া করিতেন। ইহাতে তাঁহার গৌরব রক্ষা হয় নাই। যিনি পরের জন্য অপরের কৃপাভিক্ষার্থী তিনিই বরং গৌরবার্হ।

বঙ্কিম বাবু অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। বঙ্কিম বাবু যখন ৫।৬ শত টাকা বেতন পান তখনও তাঁহার খরচপত্র কুলাইত না। অধিক কি কিছু দেনাও ছিল। এ কথা তাঁহাকে নিজমুখে আমার পিতার নিকট বলিতে শুনিয়াছি। ঋণ কন্যার বিবাহ ও পিতৃঋণ পরিশোধ জন্যই হইয়াছিল।

যাদব বাবু ২২৫৲ টাকা পেন্সন পাইতেন বটে কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কুলাইত না। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহশালী ছিলেন। তাঁহার এবং সঞ্জীব বাবুর আয় তখন কম ছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধ্যাতিরিক্ত সাহায্য করিতেন। এই সকল কারণেই নাকি তাঁহার ঋণের সৃষ্টি।

যাদব বাবু পুত্রদিগের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার জন্য পৃথক করিয়া দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে চারি ভাই থাকিলে ভবিষ্যতে এ স্নেহ মমতা ও সৌহার্দ্দটুকু থাকিবে না। এই বন্ধুত্ব বহুকাল যাবৎ ভ্রাতায় ভ্রাতায় অটুট ছিল। চারি ভ্রাতায় যখন একত্র বসিতেন তখন চারিটী গুড়গুড়ী পড়িত। একত্র তাস খেলিতেন, গান গাহিতেন এবং নানাবিধ রসামোদ চলিত। কিন্তু শেষে সেরূপ থাকে নাই। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের সহিত বঙ্কিম বাবুর মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল এবং তাহার পরিণামে সঞ্জীব বাবুকে শেষ জীবনে একটু কষ্টও পাইতে হইয়াছিল।

সঞ্জীব বাবু কিছু অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিলে বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে মাসিক ১০০৲ টাকা দিতেন, কিন্তু ইহাতে সঞ্জীব বাবুর কি হইবে? শেষে তাহাও দেন নাই ৫০৲ টাকা হিসাবে

দিতেন। না দিবার কারণও ছিল, কিন্তু আমি সে সকল গুহ্য কথা অপ্রকাশ রাখিলাম।

পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে যাদব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা হইলে বঙ্কিম বাবু ও পূর্ণ বাবু অন্যান্য আত্মীয়গণসহ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। একদিন বঙ্কিম বাবু পার্শ্বের ঘরে উপবিষ্ট এমন সময় পিতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল, তিনি ছুটিয়া গিয়া বলিলেন "অমন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন "আর কিছু নয় বঙ্কিম, মনের একটা কষ্ট আছে কিন্তু তোমায় বলিতে আর সাহস হয় না।"

বঙ্কিম। কেন বাবা?

যাদব। তুমি কয়েকবার আমার ঋণ শোধ করিয়াছ, কিন্তু কতবার আর বলিব?

বঙ্কিম বাবু অমনি বলিলেন, "সে সব ভাবিবেন না। দেনা আছে আমিও আছি; আপনি এ সময়ের যে চিন্তা তাহাই করুন।"

সেই মৃতপ্রায় মহাপুরুষের মন প্রফুল্ল হইল। তখন তাঁহার দেনা নাকি প্রায় ৪০০০৲ চার হাজার টাকা। বঙ্কিম বাবু সে সমস্তই পরিশোধ করিয়াছিলেন। এতটা পিতৃভক্তি অধুনা বিরল!

বঙ্কিম-জীবনীতে উল্লিখিত সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে। যাদব বাবুর চারি সন্তানের মধ্যে কাহার বংশ সমুজ্জলভাবে দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহাও নাকি তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন।

সমাজ ও স্বদেশের জন্য বঙ্কিম বাবু বড়ই ভাবিতেন, কিন্তু সেই বিশাল হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে কখন কোন ভাবের উদয় হইত তাহা অপরের বোধযোগ্য ছিল না। তাঁহার বুকের ভিতর আগ্নেয় গিরির প্রবল উচ্ছ্বাস চাপা ছিল। তিনি দেশকাল বুঝিতেন, হৃদয় দমন করিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাই তাঁহার অনেক ভাব সাধারণের অজ্ঞাত। "বন্দে মাতরম্" সেই চাপা প্রাণের চাপা রচনা। তিনি জানিতেন একদিন কোটী কোটী ভারত-সন্তান "বন্দে মাতরম্" মহাসঙ্গীত উচ্চকণ্ঠে গাহিবে, তাহার ধ্বনি হিমাদ্রি-শিখরে প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহা সাগর-বক্ষে নাচিতে নাচিতে দেশ দেশান্তরে ছুটিবে।

বঙ্কিম বাবু যে উদ্দীপনা-প্রভাবে "আনন্দ মঠ" রচনা করিয়াছিলেন সে ভাবে উহার পরিসমাপ্তি করিতে পারেন নাই। তাঁহার দুই একটী বিশিষ্ট বন্ধুর পরামর্শ মতে ইহার শেষ দুইটী পরিচ্ছেদ তুলিয়া নূতন দুইটী পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হয়। বঙ্কিম বাবু শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি সমাজ ও স্বদেশের নেতা ছিলেন, কিন্তু সে নেতৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, সকল কথা প্রাণ খুলিয়া বলিবার তাঁহার অধিকার ছিল না। তথাপি বলিতে হইবে যে তাঁহার উপন্যাস দেশে যে একপ্রাণতা সমুপস্থিত করিয়াছে, যে স্বদেশপ্রিয়তা জাগাইয়া দিয়াছে, তাহা অনেক বাগ্মীর নর্ত্তন কুর্দ্দনে হয় নাই।

শচীশ বাবু "বন্দেমাতরম্" গীত-রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে কাপির অভাবে কাজ বন্ধ আছে আর অমনি "বন্দেমাতরম্" গানটী বঙ্কিম বাবু লিখিয়া দেন। কিন্তু আমি অন্যরূপ শুনিয়াছি। আনন্দমঠ রচনার পূর্ব্বেই "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটী রচিত হয়। গানটী পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সেটী ছাপিবার বলবতী ইচ্ছা হওয়ায় তিনি ঐ কথা বঙ্কিম বাবুকে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে বলেন "এ গান ছাপিবার ও বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই, এ গানের গৌরব এখন হইবে না। যদি বাঁচিয়া থাক আর ত্রিশ বৎসর পরে এ গানের কি আদর হয় তাহা বুঝিবে।"

সত্য সত্যই তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবুর "মৃণালিনী" সম্বন্ধে একবার কোনও একটী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন "'কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।'—এটা আপনি কেমন করিয়া লিখিলেন? মৃণালে কণ্টক নাই। পদ্মের ডাঁটাকে মৃণাল বলে না, "নাল" বলে। মৃণাল মৃত্তিকায় থাকে, সেটা সাদা গোড়া। তাহা হস্তীতে সাদরে আহার করে।"

বঙ্কিম বাবু ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন "মৃণালে কাঁটা থাক আর নাই থাক, আর তাহা কর্দ্দমে থাকুক বা হস্তীতে আহার করুক, আমি মৃণালই বলিব। গানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারিব না। লোকেও বুঝে আমি কোন অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।"

তিনি বলিলেন, "তবে আপনার মত লোকেও কি ভুল লিখিছেন ?"

বঙ্কিম বাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "দোষ কি? দাশুরায় গাহিয়াছিলেন—

ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ ;

তাহাতে তাঁহার কি আসিয়া গিয়াছে ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

অন্ধ বিশ্বাস।

নকল কি এক আলোক হাতে এসে
ভুলিয়ে নিয়ে চল্‌লে সে কোন্ দেশে,
ধ্রুবকে মোর হারিয়ে দিলে নাথ !
চাতুরীর এই আদর দিয়ে মানা
জীবনে আর ছিল নাক জানা,
অনিত্যকে তাই বাড়িয়ে দিলেম হাত।
কামুষের অই আলোকপানে চেয়ে,
মোহের ঘোরে এলো চক্ষু ছেয়ে—
মিথ্যাচারের উঠ্‌লো নেচে জয়।
আলেয়ার সে আলো যতই সরে
পথহারা অন্ধ দিগন্তরে
শঙ্কা হানেমরণ-অভিনয়।

তার চেয়ে আজ আঁধার এসে ঘন
শুভ যাত্রার করুক আয়োজন ;
গভীর নেশায় দাওগো টুটে ঘোর।
তফাতের আজ সকল শূন্য ফাঁকা
কালোর বুকে রইবে আঁচল-ঢাকা,
নিতল তলে মিশিয়ে যাবে ক্লেশ।

ধরার শান্তি সুদূর হতে আজ টেনে
বুকের কাছে দিওনাক'এনে,
আদর দিয়ে করোনাক পর।
চরণ আমার যতই ভয়ে চলে,
সে যেন গো পথহারার বলে—
যে পথে সেই অচিন্ তোমার ঘর।

শ্রীঅদ্বৈতচরণ সরকার

VOL. 6. No. 10.

JANUARY 1917.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

(TRIED OVER 30 YEARS.)

Composition-Aswagandha-Coco. Munoomica, Damian. Phosphorus, &c.

REGINUS—Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

ASTHMA:—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

DIABETES and PILES are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.
RANAGHAT. BENGAL.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca
ahd
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
J. G. Cumming, C. S. I.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupa Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini KantaBannerji Bahadur, M.A
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
B. C. Allen Esq., B.A., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan.
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
Pramotha Nath Rai Chaydhuri of Santosh.
Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
Radha Kamal Mukerji, M.A.
Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra
Jaladhar Sen.
Jagadananda Roy.
Binoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law. Principal, Lahore Law College.

CONTENTS.

Old friends and new faces	... ...	i
The Paribrajaka of Pre-Buddhist India ...	Prof. Sukumar Dutt, M. A. ...	262
The Need of Agricultural Education in the schools	S. K. Mitra (University of California)	277
An Introduction to the Study of Archaeology	Monmohan Ganguly, B. E. ...	286
The Christmas	Moulvi Bahar-Uddin Ahmad ...	294

সূচী।

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
। বসন্ত-ভারতী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, ...	২৫৩
২। মগধের রাজবংশ	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	২৫৩
৩। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়-কৌশল	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ, ...	২৬০
৪। বন্দনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭১
৫। পরেশনাথ পাহাড়	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	২৭২
৬। অশোক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম	২৭৫
৭। চীনা ও জাপানি সমাজদ্বয়ের আব্‌হাওয়া ...	শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, ...	২৭৫
৮। সাঁঝে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	২৭৭
৯। বাঁশীরাজ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, ...	২৭৭
১০। আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ, ...	২৮০
১১। হরিশ্চন্দ্রের কীচকবধ কাব্য	শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ	২৮০
১২। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	শ্রীযুক্ত সমালোচক	২৮৪
১৩। গ্রন্থ-পরিচয়	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ...	২৮৭

OLD FRIENDS AND NEW FACES.

Official life in India is one long series of leavetakings and we are constantly reminded of what Byron said to Hobhouse ' Hobhouse, you should never have come; or you should never go.' Five years is the allotted span of life for an Indian Governor, and now the time has come for us to bid their Excellencies Lord and Lady Carmichael on behalf of all in Dacca a respectful farewell. It seems but yesterday that we welcomed His Excellency at the Ghat on the occasion of his first visit and listened to the speech, so characteristically humourous and kindly, which he then made to us. The pageant is now over and the Proconsul must leave us for ever. We wish him to know that his obvious fondness for and interest in our ancient city have made us one and all sincerely grateful. He leaves none but friends in Dacca.

It would be idle to suggest that our Governor has been able to do all that he hoped or expected to do when he first came to Bengal. All Governors no doubt have their disappointments. They find the world slower and possibly more stupid than they had thought it would be ; and in a new province there are many claims and many very obstinate people. But in this case there was also the pressure of circumstances far beyond any human calculation. The War at once extinguished all hope of large schemes and extended undertakings. Dacca University became the fabric of a dream and much else followed it. We talk of this, that, and the other as likely to come, but we all know that nothing new requiring large expenditure can possibly be inaugurated in our day, or indeed in our generation.

It is largely due to the tact aud persuasiveness of our popular governor that we have not felt this more; he has certainly reconciled us to our lot with extraordinary skill. The cards are tumbling about us but we go on playing like the good children Lord Carmichael persuades us that we are. If we dream our dreams are pleasant ones, and Dacca is a city of seeming

where the imaginative faculties have a better chance than in places further on the pathway to reality.

We cannot help adding that the personality of H. E. Lady Carmichael has made a profound impression upon all in this part of India. Her personal charm and her obviously deep and sincere interest in all that affected the daily life of the people gained her the admiration and gratitude of those who came even remotely under her influence. We may be allowed to apply to her the well-known lines of Spenser which have a feminine touch though they were written of Sidney :—

A sweet attractive kinde of grace,
A full assurance given by lookes,
Continuall comfort in a face,
The lineaments of Gospell bookes ;

When we turn in our journalistic way to the rising sun we feel full of hope. His Excellency Lord Ronaldshay has given valuable pledges of the interest that he takes in Dacca and no doubt he will pass a very considerable part of each year in our midst. We have been assured on very high authority that Dacca is a convenient place to do one's thinking in, and our new Governor will find lots to think about in Bengal ; at least most people do. But no doubt he will not always remain plunged in thought, the new Bengali legions will be thundering past for one thing, and so we may hope for some development in our body politic. There is a good deal that could be done in Dacca without seriously involving the straitened exchequer. Indeed Lord Ronaldshay may like to use Dacca as a kind of Municipal Laboratory in which useful experiments in town planning, drainage, local government and the like may be carried on. He will be able to watch the results on the spot and to draw his own conclusions as to our perfectibility, or the reverse.

But while we are deeply interested in the all-important question of what the new Governor intends to do for Dacca we must not lose sight of larger considerations. We are sure that he will receive from Bengal as a whole a hearty welcome and coming as he does at so critical a time he may be assured of what is termed the best construction. He may be certain of

one thing, that every one realises the heavy task he has undertaken. Journalists are fond of giving people advice, not always perhaps the best advice, but the best that they know. And so we venture with all respect to add our suggestion. Bengalis are above all things a humourous and light hearted people and they need not always be taken too seriously: many people too when they are angry are so with themselves quite as much as with any one else. But His Excellency will know all this quite as well as do. If hereditary instinct, political training, and an amiable and interesting personality can give Bengal what she requires, the future is indeed a bright one.

The Earl of Ronaldshay.

THE DACCA REVIEW.

VOL. VI. JANUARY, 1917. No. 10.

THE PARIBRAJAKA OF PRE-BUDDHIST INDIA.

Was the Fourth Asrama of Non-Aryan Origin?

—:o:—

THE PARIBRAJAKA.

Even in India of to-day the Paribrajaka is by no means an unknown figure. The history of this type of the religious wanderer who, in the picturesque Pali phrase, 'goes forth from the household into the houseless state' (*Agarasma anagariyam pabbajati*) dates back from unknown antiquity and is interesting from more than one point of view. For it was among this primitive community of houseless wanderers—these "dreamers and babblers of strange gospels," to quote the words of Kipling, that the germs of the two great religious systems, Buddhism and Jainism, were laid.

It would be difficult to generalise on the character of the truly miscellaneous community of *Paribrajakas* of Pre-Buddhistic India and the special attribute of this community which is emphasised again and again in Pali literature is their homelessness, their going forth from the household into the houseless state. Paribrajaka was probably their generic name, for the name denotes just their differentiating quality, but side by side with this general appellative, we find several other names, e. g. *Bhikku*, *Sannyasi* and *Sramana*. The exact connotation of these names is hardly indicated by their respective etymologies for so far as we can trace them the terms are used promiscuously and interchangeably. The names probably indicated some distinctions, but whether of rank, or of class or of external observances remains extremely uncertain. There is one distinction however that stands out very markedly and it is the distinguished position that is given to one class of *Paribrajakas*

who are called *Sramanas.* In the Kassapa-Sihanada-Sutta of Digha Nikaya, for instance, after each paragraph setting out the higher ideal of religious life it is said, "From that time, O Kassapa, is it the *Bhikkhu* is called a Sramana, is called a Brahmana." Evidently the position of the *Bhikkhu* was lower in the scale, and about the position of the *Sramana* we shall have occasion to speak at greater length later on.

But such distinctions as there might originally have been in the connotations of these various names tend afterwards to disappear; those who called themselves *Bhkkhus* are also called *Sakyaputta Sramanas.* The Hindu law-books, while treating of the fourth *Asrama* viz, that of the *Paribrajaka,* refer as an authority to a certain work, not extant, called *Sramanaka sutra.* The *Asrama* which is denominated as that of the *Bhikhhus* in Gautama is called that of the *Paribrajaka* in Vasista, Manu and later writers, the connotation of the one probably being felt to be the same as the connotation of the other. The name *Bhikhhu* or *Paribrajaka* again which we find in Gautama or Manu is often substituted for *Sannyasi* in the Upanishads. But what ever the names may be in the various citations and whatever the distinctions in detail, the common attribute attached to the condition of the Paribrajaka Sramana, Sannyasi or Bhikkhu is homelessness for the sake of religious life.*

It is worthy of note that this condition of life is never distinctly referred to in the Vedas unless it be in the mention of the Munis in the Rig Vedas. But the character the Rig Vedic *Munis* is wrapped in obscurity. They wander about, but whether this wandering is natural or supernatural is doubtful. Then again they have children. On the otherhand some of them wear soiled saffron cloths, keep long hair (but the *paribrajaka* is a *Munda*). It is difficult indeed to rely on such obscure hints. We donot know what exactly was the nature and motive of the wanderings of the *Munis* though a cognate condition is found in Munis, but the earliest mention of it occurs in the Upanishads. The condition of the Brahmachari as described in the Vedas is essentially different from this and specially in two respects; theBrahmachari is a student receiving instruction in Vedic lore while the religious wanderer, as clearly described in Pali literature is a teacher, philosopher, disputant; the Brahmachari again may wander from place to place, may indeed roam as far as the land of *Madras,* but it is always in search of a teacher or in order to learn sacrifice; the very idea of a Brahmacari is correlated to that of a Upadyaya or Acharya and this is a condition entirely different from the religious homelessness of the

* This class of religious men was not in early times strictly differentiated from another class who practised austerities in the forest. The difference comes in with the wandering habit of the former.

Paribrajaka. It is to be observed that the *Asrama* theory, which was invented at a much later stage, keeps these two conditions of life clearly and distinctly apart. A general view of the economy of primitive Aryan life and society as reflected in the *Vedas* will convince us that no place can be found therein for the Paribrajaka state of life. In fact neither of the terms I have referred to above which indicate this state is to be found in the Vedas. The conclusion is irresistible that the Aryans who originally settled in northern India did not bring with them the germs of this institution which also is not to be found among other primitive Indo-European communities. Dr. Rhys Davids is of opinion that the Paribrajaka is peculiar to India, and the probability amounts to a certainty that the conditions, motives, theories and practices that called the Paribrajaka into being were developed on the Indian soil and the problem is—how were they developed?

In the obscure XVth Book of the Atharva-Veda, however, it is probable, as Roth has supposed, that we have the earliest reference to the Paribrajaka. The whole book is devoted to a grotesque idealisation of the roving 'Vratya' a name which may be taken in various significations. It would be out of place to enter here on the standing controversy regarding the true interpretation of this mystical book. But there are certain points which we may well notice in passing. First, it will be observed that the 'Vratya' which may mean one of a non-Aryan or imperfectly Aryanised tribes—a point which will be important for us to consider in a different connection—that is idealised in the book is a 'Vratya' who has assumed a distinctly religious character; secondly if we consider the purely human attributes of the 'Vratya' as apart from the grotesquely superhuman attributes with which he is clothed, we shall find that it is not as a type of the perfect 'Brahmacharin', as Bloomfield supposes, that the converted 'Vratya' is idealised. The 'Vratya' is described as going away to the people, becoming the guest of the king as well as of the ordinary people to be honoured with humble reverence everywhere by his host, going to all points of the compass, and all this, though it fits in perfectly with the description of the Paribrajaka as we have it in Pali literature, hardly answers to the condition of the Vedic 'Brahmacharin'. The point need not be laboured further as the whole XVth Book of the Atharva-Veda is of such an obscurely mystical character that we shall scarcely be justified in holding that here we have the earliest mention of the Paribrajaka condition of life.

The 'Sramana' however is clearly mentioned by name in the 'Brihadaranyaka and references to the Paribrajaka abound even in the earlier Upanishads. As the 'Asrama' theory is gradually developed, we find the Paribrajaka condition of life discussed

in greater detail in the later Upanishads till 'Gautama', 'Vasistha', 'Manu' (Gautama however under the name of 'Bhikkhu') and other law-givers treat of this state of life as a settled stage, an 'Asrama'—the last and highest of all. The 'Asrama' theory however, originated in the Upanishads and developed in the Sruti literature, gives us a theoretical. idealistic and perhaps to a large extent sophisticated view of the Paribrajáka, but it is in Pali literature in which the theoretical character of the Brahminical books is conspicuous by its absence that we have the actual facts of the Paribrajaka condition of life as it prevailed in pre-Buddhistic times. There is no reason to doubt that the references in the Sanskrit and Pali literature are to the same class of people, though, as we shall show, the theory of the Brahminical books covers only a section of the whole vast and heterogeneous community who led the homeless life of the religious wanderer.

It is difficult, as I have said, if not impossible, to make out the gradation or classification which existed in all probability among the religious wanderers. But among them a special and distinguished position is accorded throughout to the 'Sramans'. We have no hesitation in taking them as a 'class', as a body of people who lie somewhat apart from the rest of the Paribrajakas, Saunyasis and Bhikkhus, for they are alluded to throughout not merely as the highest of the Paribrajakas but as a 'class' of them, holding a place of special pre-eminence in Pali, but not referred to frequently in Brahmanical literature, and always contradistinguished with the Brahman. This contradistinction, the reader must be cautioned, does not lie as between Buddhism and Brahmanism, for even a casual reader of the Nikayas can see that a Sramana is not necessarily a Buddhist, but is often an opponent of the Buddhist tenets. Thus if we go into the matter deeply enough, we shall probably find that the 'Sasvatika Virodh' that Patanjali professed to find between the Sramanas and the Brahmans lay originally otherwhere than in the sphere of doctrinal or even religious differences. This contradistinction between Sramanas and Brahmans appears not only in Pali literature, but also in the inscriptions of Asoka and in the Greek accounts, so that we may be certain that the distinction was not a speculative or a theoretical one set up by the Buddhists, but existing in actual life. The inference from this is clear that the Sramanas were a class of religious wanderers or Paribrajakas, not necessarily Buddhists, who lay outside the pale of the system which Western Scholars for the sake of convenience have comprehensively called Brahmanism. But it is per haps looking at the whole thing from a wrong point of view to hold as Prof. Jacobi has done that these "non-Brahmanic ascetics," as he calls the "Sramanas," though the phrase is entirely misleading as a descriptive name, were a Separatist

party. We have on the other hand reasons to believe that the nucleus of the whole Paribrajaka institution is to be originally found among the Sramanas of pre-Buddhistic India.

Among the wanderers the *Sramanas* constitute the highest class ; others probably formed merely the fringes of Sramanism. From Sanskrit literature we know the place that the Brahmanas enjoyed in ancient Indian Society and though time and again their place was disputed by the Khatriyas, as passages in the Upanishads and some of the Pali *Suttas* tell us, yet even the adversaries bear ample testimony in their favour. Now it is a significant fact that while the name of the Bhikkhu or of any other class of Paribrajakas is never found in juxtaposition with Brahmana, instances of the juxtaposition of Brahmana and Sramana abound. In many Asokan inscriptions the Brahmanas and Sramanas are mentioned as being equally deserving of respect and alms and in this respect the edicts seemed to have confirmed the prevailing notion of the people as can easily be gathered from Pali literature certainly pre-Asokan. In the 'Nikayas' the 'Sramanas' are frequently mentioned in juxtaposition with the Brahmanas suggesting where such juxtaposition occurs a position of equality between them as regards their intellectual and moral worth as well as the respect tendered to them by outsiders. It should be remembered that this position given to the 'Sramans' in Pali literature cannot be due to any Buddhistic bias on the part of the writers and compilers of the Nikayas as Buddha himself is represented as refuting the views of many a Sramana. It is a problem of absorbing interest how a class of people living outside the pale of Brahmanism, sharply divided from the Brahmanas, came to attain a level of equality with the highest grade of Aryan Society in ancient India. Certainly this could not happen through the working of the inner forces of the Aryan Society itself in which so far as we can trace the Brahmanas are atop. We shall try to throw some light on this problem later on. Meantime let us remember that it is in the activities of the Sramanas that the whole interest for us of the Paribrajaka community is centred, for to that overgrown and miscellaneous throng, people of varied aims had free admittance ; the tyranny of kings, fear of robbers, the pressure of debts and the struggle for existence, as Nagasena tells us, all went to swell their number and this was probably true generations before Nagasena. I have already alluded to the difficulty of trying to generalise on the ancient community of Paribrajakas whose miscellaneous character is very vividly sketched in a passage in the 'Udana'— "A large number of Sramans, Brahmans and wandering monks of various heretical sects, holding a variety of views, doubtless on many points, having diverse aspirations, and recourse to

that which relates to various heresies entered 'Savatthi' for alms." They put forth contradictory philosophic views and wounded one another with 'mouth javelins.' The picture is certainly realistic, bearing reminiscences of pre-Buddistic times. Of this varied community the 'Udana' describes, a classification would have been impossible for us had not such a classification been attempted in the Kassapa-Sihanada Sutta of Digha Nikaya. The classification is an exceedingly interesting one in as much as it is borne out by facts which appear from other parts of Pali literature. But the difficulty is that we cannot be certain that it is meant to be exhaustive. The Samana-Brahmanas are divided into four classes— Sila-Vada, Tapa-jinguchcha-Vada, Panna-Vada and Vimutti-Vada. As regards each of these classes, it is said that Buddha has gone furthest in their way. Now it is just possible though not very probable that this classification is based only on those points in which Buddhism touched the other schools of opinion, viz. Sila, Joga-jinguchcha, Panna and Vimutti. But such a view is not quite exact as we know for a matter of fact that with the Sacred class the Buddhists were widely at variance. Apart from the general trend of early Buddhistic teaching, it is distinctly stated in Anguttara that those who follow 'Tapa-jiguchcha' can not attain Arhatship. We shall therefore be justified in taking the classification in the Kassapan-Sihanada as a substantially correct and probably exhaustive one based on actual, existing conditions. The meanings however of these different descriptive names have to be carefully enquired into, and we shall take them out of the order in which they appear.

Let us first take the class of *Samanas* who were Panna-Vada. As Panna-Vada does not refer to the Buddhists specially, it is clear that the word Panna is used in a wide, non-technical sense and it is important for us to extricate its real meaning from the Buddistic suggestions which have been read into it. Throughout early Pali literature, it is remarkable how words are often read in the light of Buddhistic doctrines and in the same *Sutta* in which the name Panna-Vadda occurs, a Buddhistic version of Panna is given. It covers four kinds of mental effort of which the first is the application of the mind to *nana-darsana.* A particular form of nana-dassana is mentioned, but if it has any meaning in the connection in which it appears, it must certainly mean and connote philosophic speculation of the kind specially indicated. Hence by Panna-Vada is surely meant primarily all those who concerned them selves with philosophic speculation and secondarily those who underwent a system of mental culture leading to supernatural powers (Abhinna) or a high mental state, such as Buddhist Arhatship. Now the kind of *nana-darsana* that is of the essence of *Panna* is, as indicated by the specimen given of it, far from a

philosophic system—just floating thoughts, ideas and speculations of philosophy agitated among the intellectual part of the community out of which in all probability the later *darsans* were evolved. They are often called *Ditthis* as 62 of such *Ditthis* are refuted by the Buddha in the Brahma-jala Sutta. Rhys Davids is evidently wrong in holding that *Panna* is contradistinguished essentially from *Ditthi*. No such essential contradiction is anywhere indicated, and, though it is true, that in the *Brahman-jala*, the *ditthitthana* are distinguished from a knowledge which lies beyond them, Panna is not mentioned. Besides it is to be observed that the speculation which redounds to Panna is not different in form or kind from a *dithi* and the real difference is that the former is in accordance with Buddhistic doctrines while the latter is not. Hence Ditthi in the Buddhistic sense is righly rendered by Childers as a heresy. By the Panna-Vadas therefore is indicated that very numerous class of religious wanderers who went about from place to place weaving their fragile gossamers of philosophic speculations—what Oldenberg has felicitously characterised as "a species of Indian sophistic."

It is scarcely within the purpose of our present enquiry to enter into the merits of those philosophic speculations agitated among the Brahmanas and Sramanas before the rise of Buddhism, though, to the historian of Indian philosophy they are of absorbing interest. Certain outstanding features of the philosophic discussions of those times are briefly disposed of in the Brahmajala Sutta, viz., the views of the Sassata-Vada, the Ekacca-Sassatika, the Antamantika, the Amara-Vikkhepika, the Addicca-Samuppannika, the Uddhama-Aghatanika, the Uccheda-Vada, the Dittha-Dharmma-Nibbana Vada. There were certainly other philosophical views of which we get indications from various other sources, and Dr. Rhys Davids has tried to group the whole body under the broad heads of Animism, Polytheism, One First Cause, Pantheism and Dualism. The time has probably not yet come for an attempt to induce order on this veritable "maze of interacting ideas." But it cannot be denied that they were eagerly discussed, debated, systematised and carried forwards by the homeless *sramanas* who met together from time to time at such common meeting-places as the Debating (*Samayappa Vadaka*) Hall built by Queen Mallika, the Kutagara-Sata of the Licchavis in Mahavana or the bank of Lake Gaggara in Champa.

We next come to the Tapo-jiguccha Vada the combination of the two ideas of *Tapo* and *jigucch* is found in the philosophy of *Yoga* which must have originally included a variety of ideas, practices and belief systematised later on by Patanjali. This variety of elements which Joga must have

originally embraced is recognised in the well-known classification of the eight *Angas* in which, it will be observed, a continuous process is set out shading off by subtle gradations purely physical conditions into a subtle psychological state, e. g., Yama, Niyama, ásanam, pránayáma, Pratyáhára, Jharana, dhyánam, Samádhi. This is nothing but a system induced on existing practices, ideas and beliefs as found partly in real life and partly in the theories of the Upanishads. The germs of the theoretical part of Yoga have been traced in *Upanishada* by Paul Deussen, but as regards the purely physical conditions, especially the the first two of the Jogo which the Upanishad theories, as may naturally be expected, do not develop, we have indications of their existence as current practices among the religious wanderers in Pali literature. *Jama* and *Niyama* are characterised by Deussen as objective and subjective duties, but in reality they were merely practices observed by any of the *Paribrajaka* and often carried to extravagant and ludicrous lengths which incurred the satirical condemnation of the early Buddhists. It is often difficult to distinguish their extreme forms from certain similar practices which were later on affiliated to a different range of ideas and included under the name of *tapos*. It is probable that the distinction between there preliminary stages of *Jogo* and the ascetic practice of *tapos* is matter of later theoretical reconstruction. As a matter of fact Patanjali includes *tapas* in *Niyama*. And under the description of *Jogo-juguccha Vada* was included the numerous class of *Sramanas* who, like Tennyson's St. Simeon Stylites, we practise asceticism (tapopakkama)

'In hungers and in thirsts, fever and cold,
In coughs, aches, stitches, ulcerous throes and cramps'

A fairly comprehensive, though ill-digested, enumeration of such practices —of *Yama*, of *Juguccha* of *Niyama*, of *Tapos*, (though not under these names) occurs in three lists in the Kassapa Sihanada sutta of Digha Nikoya. The lists are exceedingly curious, though it is often difficult to understand the Pali names without the commentary of Buddha Ghosha which again cannot be taken as a thoroughly reliable interpretation of terms in use centuries before Buddhaghosha's time. The etymologies however of many of these names afford readily clues to their real meaning. The first and most essential part of *Yama* is conceived in the philosophy of *Yoga* to be *Ahimsa* or abstinence from injury to all sentient beings, and the high esteem in which this duty was held is indicated by the fact that apart from its place in the Jaina and Buddhistic systems, a whole structure of philosophic speculation was raised on the doctrine of *Ahimsa* even in the Hindu Sastras. The practices of *Jiguccha* or *Ahimsa* were stringently observed by a

numerous class of *Sramanas*. Some for instance, would not accept food where a dog was standing or flies were swarming lest, as Buddhaghosha explains, the dog or the fly should lose his share. Some will abstain from the eating of fish or meat; some again will live on grasses, on cow-dung, on fruits and roots available in the wood or on fruits that have fallen already. Others again would never drink, lest, as the commentator explains with charming *naivete* he should injure the souls that live in the liquid; others again would not accept food from a pregnant woman or a woman giving suck lest the child *in uterus* or the suckling should suffer. Austerity and asceticism also had numerous adherents. The practice of *Chandrayana* is referred to; going naked or wearing of coarse hempen cloth, cloth taken from corpses, the bark of Tirka tree, a blanket of human hair, etc. etc. are instances of austere practices. Some would sleep in the open air or on the ground or on a plank bed; others again are "one-housers" there or "two-housers or "Seven-housers," these being eleemosynary rules. In these extreme forms these practices would be *tapo-pakkama*, such as were practised by the Sramanas who are described by such picturesque names as the 'plucker-out-of hair and beard,' 'stander-up,' 'croucher-down-on-the heels.' 'bed-of-thorns man" (seen even to-day in the streets of Calcutta), 'dust-and-dirt-wearer' and filth-eater?

Next we pass on to the Sila-Veda. This descriptive name is involved in greater doubt and uncertainty and the data are somewhat insufficient to come to a positive conclusion as regards its meaning and connotation. We find a brief treatise inset in the Brahmajala Sutta and Samañña-Jhala-Sutta in which certain prohibitions are mentioned and classified as *Culasila*, *Majjhima-Sila* and *Maha-Sila*, though it is somewhat difficult to assign the classification to any intelligible or rational principle. The whole is in substance nothing but a series of "thou shalt nots." Now, is it possible, as it may at first sight, appear, that the treatise was a reduction of rules by which a certain class of Sramanas and Brahmanas, called Sila-Vādā, were governed? But this seems to be an impossible conjecture on second consideration, as the rules set out in the treatise lack any distinctive character. The *Cula-silas* are rules which, as Kern points out, are already implied in the acceptance of religious life and are mostly found in the rules given in the Brahmanical books governing the life of the *Dwija* in the fourth *Asrama*. The *Majjhima Silas* refer generally to rules of abstinence from idle pleasures and amusements, luxuries and logomachy. The *Maha Silas* again refer to abstinence from certain superstitions and animistic rites and practices, either idle or harmful. Surely the observance of such purely negative rules of such a widely accepted character

could not constitute a distinct description of *Paribrajakas* or *Sramanas*. But there are certain indications though of a rather vague character that the word 'Sila' had sometimes a more positive sense than is implied in the Brahmajala and the Samanna-phala—the use of the word for instance in such compounds as 'Silabhatam' and 'Silabhata-Parameso. The commentaries on these words are curiously significant and it certainly appears that some 'Sramanas' were not content with the passive observance of mere rules of abstinence but went further ; "Silabhatam," says Buddha Ghosa, "is synonymous with such practices as 'Dhutangas' and 'Parisuddhi-Silas'. Childers quotes a curious gloss on Silabhata-Parameso in which the commentator says that Silabhatam refers to such practices as 'Govata' and 'Kukkurvata' which are based on such texts as 'Silana Suddhivatam Suddhiti'. These practices are said to be non-Buddhistic and are deprecated. It would be injudicious to take these later commentators with the pronouncedly Buddhistic stand-point of their exegesis in an accurately literal sense. But they make it sufficiently clear that certain observances which were supposed to bring about purification were associated with 'Sila' two extreme forms of which, viz, Govata and Kukkuravata are mentioned by one of the commentators. It thus appears possible that the name 'Silavada' has reference to such purificatory observances the efficacy whereof is recognised even in the rules laid down for the regulation of the conduct of the *Sannyasins*, e g. bathing, purification by sacred waters, washings at intervals of three days, etc. The idea of purification however would not always be explicitly connected with such observances, but still their origin in such an idea can in most cases be easily traced. The-Kassapa-Sihnadi Sutta mentions a number of such practices which may be taken to be characteristic of the Silavada, e. g. he will not accept food from the mouth of the pot or pan,' 'He will not accept food placed within the threshold' 'He will not accept food placed among the sticks' 'He will not accept food placed among the pestles,' 'He will not accept fish nor meat, nor strong drink nor intoxicants, nor gruel' etc. In many cases however it is difficult to find the motive of a particular practice, whether it is a rule of *Jama* or *Niyama* or *Sila* —one rule being easily apt to shade off into another, and the motive assigned by the commentator being often a matter of mere haphazard conjecture.

The last class of Sramana. Brahmanans are called *Vimutti-Vada*, and in interpreting this name we have to proceed on pure conjecture. The most probable interpretation of the term is that it refers to those who regulated their life in accordance with the theories of Emancipation which bulk so largely among the religious discussions of this time. The *Jogis* and *Sannyasis* included in the Brahmanical system might

have been specially meant, for the whole activities of these two classes of Brahmanical *religieux* were explicitly grounded of the theory of *Vimukti*. The connection between the Emancipation theory and the practices of the *Jogis* and *Sannyasis* is clearly set out by Paul Deussen. "The clothing of the doctrine of emancipation in empirical forms; says Deussen, involved as a consequence the conceiving of emancipation, as though it were an event in an empirical sense, from the point of view of causality, as an effect that might be brought about or accelerated by appropriate means. Now emancipation consisted in its external phenomenal side :—

(i) In the removal of the consciousness of plurality.

(ii) In the removal of all desire, the necessary consequence and accompaniment of that consciousness.

"To produce these two states artificially was the aim of two characteristic manifestations of Indian culture :

(i) Of the 'Joga', which by withdrawing the organs from the objects of sense and concentrating them on the inner Self endeavoured to shake itself free from the world of plurality and to secure union with the 'Atma'.

(ii) Of the 'Sannyasa', which by casting off from oneself, of home, possessions, family, and all that stimulates desire seeks laboriously to realise that freedom from all the ties of the earth, in which a deeper conception of life in other ages and countries also has recognised the supreme task of earthly existence, and will probably continue to recognise throughout all future time." If the interpretation I have given of Vimutti-vada be the true one, it is clear that the Brahmanical theories cover only one class of religious wanderers, those namely who are elsewhere styled the 'Vedantika' while no other class can be said to owe its origin to the Aryan priestly system, though various points of contact with it are to be found in the ideas and practices of the other classes of Paribrajakas.

About the division of the Sramana-Brahmanas in the Kassapa-Sihanada Sutta into the four classes of Sila-Vada, Tapa-Jinguchcha Vada, Panna-Vada Vimutti-Vada, a few more words need be said. A classification is after all nothing more than a theoretical reconstruction and to accept the distinctions involved in a classification as corresponding to the differences in nature is, as Mill has pointed out, to perpetrate a fallacy. We must therefore be on our guard against the idea that the religious wanderers were divided into classes rigidly defined and mutually exclusive. In point of fact there was a good deal of interchange of ideas and community of belief and practices among all the different classes of religious wanderers. The true significance of the classification is that one class would lay emphasis on one set of ideas, practices and beliefs and another class on another set and so on. "The Sila-Vada" says the Sutta,

"extol Sila in various ways (aneka-pariyayana silassa vannam bhasanti); the 'Tapa-jlnguchcha-vada' similarly lay stress on Tapa-jinguchcha" and so on; —and there is no question of mutual exclusiveness. Buddhism for example has taken into itself all the varied elements. We have a great accumulation in this system of rules which clearly refer to the idea of purity and purification, physical, mental, and moral; Panna or Spiritual knowledge based on philosophic speculation of a certain type is the nidus out of which the whole Dhamma of Buddhism (as contradistinguished from Vinaya) has sprung. Buddhism also had its own version of emancipation or Vimukti. Even the practice of 'Tapo' so earnestly and persistently deprecated by the early Buddhists, found a niche in the system under the disguise of the thirteen Dhutangas. But it still remains a moot-point among scholars as to the exact point on which the distinctive emphasis of Buddhism originally lay.

It is now worth our while as historians to enquire into the origin of this primitive institution of 'Paribrajakas', the embodiment of this one idea, 'far-reaching, grown great and beyond measure' the leaving of hearth and home for the sake of the religious life. It is a problem however wrapt in the greatest obscurity, and, so far as I am aware, has not been squarely faced by any scholar Western or Indian, up to this time. Vague and 'a priori' theories however have been put forward from time to time to account for the origin of the religious wanderers before the rise of Buddhism. Dr. Rhys Davids with his characteristic bias says, "the intellectual movement before the rise of Buddhism was in large measure a lay movement, not a priestly one." The result of this lay movement, he seems to think, was the growth of the wandering religieux. This is a vague, wide, 'a priori' theory which is open to serious question. Is there anything to show, besides the fact that we find accounts in the Pali books of the intellectual activities of Sramanas before the birth of Buddhism, that there was any intellectual movement properly so-called in the immediate pre-Buddhistic age? Thoughts, ideas and philosophic speculations no doubt multiplied and broadened down from century to century, but was there an acceleration of intellectual life such as might give birth to this wandering body of people among whom religious and philosophical questions were so earnestly and restlessly agitated? To infer an intellectual movement from the abundance of religious wanderers and philosophic spectators in this age and then to account for their growth by the intellectual movement involves a 'petitio principii'. Then again to speak of an intellectual movement before Buddhism is one of the many misleading commonplaces of ancient Indian history. To point to a general intellectual movement in any age necessarily implies a comparison with the preceding ages and such comparisons are

hazardous in the extreme where we have no continuous records to build upon as is the case in ancient Indian history. If the same amount of materials which we have in Pali for the reconstruction of the history of the immediate pre-Buddhistic age were available for the age preceding it, we might possibly have come to a different conclusion. It is therefore hazardous to propound such facile theories as that of a pre-Buddhistic intellectual movement. It is, to adopt Rhys Davids's own metaphor, like playing chess 'Sans Voir', without seeing the pieces. Paul Deussen again sets great store by the practical results of the Upanishad theories of Tapas and Nyasa. But, as we have already pointed out, the 'Upanishad' theories might account for a section of the 'Paribrajakas', but not for the whole body of them, for many of them we know did not recognise at all the very fundamentals of such theories and were admitted on all hands to be openly anti-Brahmanical. Dr. Oldenberg again seems to find the origin of the wandering philosophers in the popularising of philosophic speculations in the process of spreading from the Western schools among the simple and earnest people of the Eastern tracts. This explanation to my mind, though not exact, is nearer the truth. In fact, before we proceed to theorise on the origin of the 'Paribrajakas', we should carefully consider all the salient features we know of this miscellaneous and complex community of the Sramanas, who, as we have seen, constituted the highest grade, and the question on which the whole interest of the problem is centred is—how did Sramanism arise?

The germ of this institution is not to be found in the primitive Aryan society of Northern India whose simple old-world life and activities are so fully mirrored to us in the Vedas. The earliest reference to it is found in the mention of the *Sramana* in the *Brihadaranyka*. Even if the so-called *Vratya* book of Atharvaveda is held to apply to the Paribrajaka, it should be noted that the Paribrajaka there is a *Vratya*, not an Aryan true-born and true-bred. This makes the supposition highly probable that this institution originated on the Indian soil after the Aryan occupation. It originated also outside the pale of the truly Aryan-Brahminical Society. A general comparison between Sanskrit literature earlier than the later Upanishads in which the Asrama theory is elaborately developed and Pali literature, bearing on this point, will make it evident that the place occupied by the religious wanderer in the former is neither so preeminent nor so important as in the latter. In the former the wanderer makes a somewhat abrupt and a none too frequent appearance till he is caught up in the meshes of a system or theory which in itself was of slow and gradual growth; while in Pali literature he represents a regular feature of life and society, a presence, so to speak, not to

be put by. The gradation of Aryan society made in the famous Purushasukta of the 10th Mandala of the Rigveda is familiar to us, but there is a similar account of its genesis in the Agganna sutta of Digha Nikaya in which Human kind is divided into Khsatriyas, Brahmanas, Vaisyas and Sramanas. The mention of the *Sramana* and the omission of the *Sudra* are two points which are full of significance. We know it for certain that the tribes and communities among whom the Pali suttras originated and from whose life and activities they take their tone and colour knew not the enslaved aboriginal *Sudra* whom the Aryan in the pride of conquest had thrust to the lowest rung of the Social ladder. They were not true-born Aryans but merely Aryanised tribes. They lived beyond the utmost limits of the progress of Agni Vaiswanara, beyond the sundering stream of *Sadanira* as the antique legend of the Satapatha Brahmana symbolically relates. They were races contemptuously referred to in the Aitereya Upanishad as species of birds and their probable descendants still betray to the ethnologist physical peculiarities due to non-Aryan origin. And it is among these tribes and communities lying on the very outskirts of Aryan—Brahmanical civilization among whom there were no *Sudras* as a class that we find true Sramanas recognised as a part and parcel of society. There is no need among them of a theory to explain their existence or to affiliate them to a system; they are a regular feature of life and society. The conclusion is thus forced in upon us that the institution of the religious wanderer outside the pale of Aryan society, among the non-Aryan tribes and communities who had only come under the Aryan influence. The conclusion is strengthened by the fact, highly significant in itself that the Sramanas living outside the pale of Brahmanism and sharply divided from the Brahmanas, reached a position of equality with the latter—a result which the inner forces of Aryan society could not possibly bring about. The theory of the origin of the religious wanderers which all this points to may throw light on the question—why the Paribrajakas (if such indeed be the character of the roving spirit as described in the 15th book of the Atharvaveda) is only a Vratya and not an Aryan, and also on the natural antipathy between the Sramanas and Brahmana as fixed and constitutional as that between *Ahi* and *Nakula*, which is indicated by Patanjali and borne out by the Greeks. The Sramanas were not necessarily Buddhist—even the imperfect Greek accounts indicate as much. They were propounders of certain heretical doctrines it is true, but such doctrinal differences never gave rise in ancient India to such fixed and inveterate class enmities as existed between the Brahmanas and the Sramanas, and the only resonable explanation seems to be that the one

was a product of Aryan Society, the other of the despised Aryanised non-Aryan. Marvellous indeed is the elasticity of the Aryan-Brahmanical system! Just as it extended its recognitions to and brought within its fold many other customs and institutions non-Aryan in their origin, so it affiliated and took unto itself the institution of the Paribrajaka Sramana by the convenient theory of the *Four Asramas.*

Let us consider also the possibilities of such an origin of *Sramanism*, as all this evidence and argument must necessarily point to. The theory is no longer questioned that when the Aryan settled in Northern India and gradually made progress eastwards along the course of the Ganges, they found themselves face to face with vast communities and tribes of a different colours and origin. That they were not mere inert human matter seems to be probable enough. Of the other non-Aryans, the Dravidians of the south for instance, we know that they had genius to evolve among them a distinct type of primitive civilization. That the northern non-Aryans were not exterminated seems also to be beyond all resonable doubt. Dr. Collignon says, "when a race is well seated in a region, fixed to the soil by agriculture, acclimatized by natural selection and sufficiently dense, it opposes, for the most precise observations confirm it, an enormous resistance to absorption by the new-comers, whoever they may be." We do not know accurately the stages of progress reached by the Aryans at different ages, but the legend of Agni Vaiswanara in the Satapatha Brahmana clearly indicates that beyond the *Sadanira* among the *Vacchas*, the *Cetis*, the *Mallas*, the *Vijjis*, the *Licchavis*, the *Videhas*, the *Kosalas*, the *Kasis*, the *Sakyas*, the *Magadhas*, the *Angas* and other tribes and clans, their power and influence in the early times extended but little. But the process of Aryanisation was not commensurate with the extension of material power and influence and the great culture-breeding race certainly overshadowed the tribes, clans and communities who still retained a good deal of the old ways of social and political life.

If then we make the perfectly legitimate supposition that from age to age in the northern India a process of Aryanisation was going on and profoundly influencing tribe after tribe and clan after clan, we must observe that the Aryan leaven must have worked in two converging lines—in the spread of Aryan thoughts, ideas and beliefs and in the much slower process of modification and replacement of non-Aryan institutions by the Aryan. We know how rapidly mind influences mind and how slowly the settled habits of life are changed and modified. Historical instances of this will occur to many less learned than Macaulay's School boys and it is needless to labour this point. Ancient India under early Aryan

influence was no exception to the rule. The process of Aryanisation on the mere intellectual side went on at a far more rapid rate than that in social customs and institutions, and from this fact most interesting results emerge. The divergence between the two-fold processes of Aryanisation, on the intellectual side and on the social, would tend to increase more and more as we receded further and further east from the homeland of Aryan culture, the *Aryavārta*, and the results of such difference would naturally be more palpable and pronounced at the border-line of Aryan civilization, exactly where in the 6th century B.C. Buddhism arose.

The distinctive mental culture of the Aryans had various organs of expression, various means of conservation. First, there were the Brahmins, the repositories of traditional learning; secondly, there were the clannish academies like the *Parishada* of the *Panchalas* to which *Svetaketu* went for instruction. There might also have existed more than one cosmopolitan university like the one of Asiatic fame at Takkasila. Thirdly, there were the domestic centres of learning, the residences of the Upadhyayas and Acharyas. Opportunities were therefore by no means wanting for the transmission, consolidation and systematisation among the Aryan communities of the elements of Aryan culture, the thoughts ideas, beliefs, theories and practices which are all summed up in the name, Brahmanism. In course of time this Aryan Brahmanical culture slowly and surely permeated those populous communities which had not yet acquired the characteristic institutions of the Aryans. The result was a dispersion and diffusion of intellectual culture and speculative thought leading to that hopeless tangle of theories and practices for a parallel to which we must go to the heresies of the early Christian Church so well described by Kingsley as "a strange brood of theoretic monsters begotten by effete Greek philosophy on Egyptian symbolism, Chaldean astrology, Parsee dualism and Brahmanic spiritualism."

It is necessary to consider a little more closely the practical significance of this point. When the Aryan thoughts and ideas permeated the imperfectly Aryanised non-Aryan communities, who would be professors among them of the new learning? They had no Brahmins among them, no class of men who were repositories of traditional learning. How could there be evolved among them complete systems of philosophy? They had probably no conservative and corporate centres of learning, academies or or Universities. Thus with the spread of Aryan culture among non-Aryan tribes and people, the growth of a class of men answering to the class of Brahmins among the Aryans becomes a matter of course, and the philosophic professions of these men were as fragmentary and unsystematic as, in the absence of academies and universities, we may naturally expect them to be.

It is worthy of note that of all the philosophic speculations agitated among the 'Sramanas' in the pre-Buddhistic age, only the doctrines of the Buddhists and of the Jainas and probably of the Ajivakas were developed into systems and of the subsequent history of the Ajivakas all trace is lost beyond a solitary mention of them in an inscription of Asoka.

In what condition of life shall we expect to find these professors of learning among the imperfectly Aryanised communities? The institution of the residential teacher was probably unknown among them. What other factors there were is denied to our knowledge. But historical analogies would tell us that under such peculiar circumstances as we have detailed above, the growth of the missionary spirit is inevitable. The teacher must leave hearth and home, must go forth from the household into the houseless state if his message is to be taught and explained. Herein then we must seek for the origin of 'Sramanism— the spread of Aryan culture among other communities, the absence among them of means for the consolidation of this new culture and learning, the growth of a class of philosophers and teachers, the development of a missionary spirit and the consequent state of religious wandering. Thus the true explanation of the abundance of religious wanderers in Pali and their comparative scarcity in early Upanishad literature is to be sought not in the 'times', as Rhys Davids has supposed but in the 'place' of origin of Pali literature—the borderline of Aryan culture. The institution of Sramanism thus grew among the non-Aryan communities of the east, spread, flourished and became highly popular. Along the upper reaches of the Ganges where there were residential teachers, clannish academies and the Brahmin class, the place and function of the wandering philosophers was neither noteworthy nor important, but lower down they grew in numbers and importance and their religious and intellectual activities affect more deeply and widely the life of the laity. Hence their abundance and pre-eminence in Pali literature.

SUKUMAR DUTT.

THE NEED OF AGRICULTURAL EDUCATION IN THE SCHOOLS.

The movement for the imparting of instruction in agriculture in primary and secondary schools has passed from the stage of agitation to that of action and realization in America, while, it is within the last decade that our educated community have come to realise that it is a science and an important and permanent part of the educational curriculum. Students coming abroad to study agriculture find themselves in an atmosphere

where a systematic practical training is of greater importance than mere theory. Had they been taught a little bit in that line at home, they would have actually known what we need and what we ought to have for the advancement of agriculture in India.

When we inquire why the spread of agricultural education is essentially necessary we find many reasons for it, but they may be grouped into two or three main heads. In general the claims of agriculture to a place in our school system are based on the economic, social and educational needs of agricultural people in reference to our present course of civilization and the state in which we are placed at the crisis of a national evolution and for an equal standing with the other rising nations of the world. The pedagogic requirement of a school system should be adapted to the masses of people in a country which has so long been dead to the scientific and industrial education which is necessary to the symmetrical culture of mind and body. In a word we need intelligent farmers and learned pedagogues approaching the subject from their respective standpoints to meet on a common platform and each one to help the other in the way of improvement as they do in America and other Western countries. Hence, there is sufficient reason to believe that agriculture should be generally taught in our schools and should form an important and permanent part of the school curriculum.

It is very interesting to note here how the American farmers and teachers meet together for conference on educational matters and how they carry out their work and plan which will give some suggestions for our educated people to think over and try their best to work out their own salvation for themselves on the new ideals put forward by the Western scientific world.

It should be understood at the outset that the term agriculture is used in America in a broad sense to include farming, horticulture, floriculture and forestry—the village garden or city park as well as the ranch or the orchard. It will not be out of place to mention here higher courses in agriculture given at the more important Universities as the following :—

1. Agriculture.
2. Agricultural education.
3. Horticulture.
4. Soils and fertilizers.
5. Agricultural chemistry and nutrition.
6. Agricultural technology.
7. Animal industry and Veterinary science.
8. Dairy Industry.
9. Entomology.
10. Parasitology.
11. Plant Pathology,
12. Botany.
13 Irrigation etc. etc.

Now the question arises who are the farmers. An old argument, which has not lost its force yet, is that agriculture

is a great and fundamental industry. On the successful prosecution of agriculture depends the continued existence and prosperity of the whole human race. It is by agriculture we are all fed and clothed and in a large measure are provided with dwellings and the material comforts of civilization. Whether we consider the extent of the surface of our globe used for agriculture, the number of men who work on the farms and in the gardens or forests or the variety, amount and value of the products, agriculture is a great subject. In the United States alone, leaving out the forests, about 860,000,000 acres are devoted to agriculture ; there are nearly 6500000 farms on which 10,500,000 men work for the direct support of a rural population of 45,000,000 souls. The value of these farms and their equipment is over 20,000,000,000 and the value of their products in 1905 is was 6,415,000,000 and in 1911 nearly, 10,000,000,000. The manufacturing industries that depend upon farm products for raw materials employed 2,145,000 persons in 1910 and used a capital of 4,132,000,000 and is now nearly fifty per cent more.

But the bigness and fundamental character of agriculture may be used chiefly to draw attention to the Economic, Social and educational needs of the agricultural people who are the masses labouring under unceasing hardship day and night with inadequate remuneration for their plain and honest work.

Economically speaking, the farmer or the horticulturist of to-day and of the future must be more intelligent and better informed than his predecessors, in order to compete on advantageous terms with men in other callings and to secure a sure and adequate return for his labor and capital. He must know how to permanently maintain the fertility of the soil, what crops are best adapted to his locality, how to select and improve varieties, what methods of cultivation, irrigation and drainage will enable him to make the most productive and beneficial use of the available water supply, which machines are best adapted to particular uses and how they can most economically be maintained, what kinds of animals are most profitable to keep and how they can be improved, what methods of storage, packing and marketing will yield the best results, what remedies to apply in plant and animal diseases, how to prevent ravages by insects, birds and animals. Merely as a money maker the farmer cannot afford to limit his knowledge to his own experience and the observation of his family and neighbors. He must have some general experience in such matters and know how to utilise information either gathered or printed. This requires preliminary technical training in schools at an early age as the surest and the best preparation for a successful farm practice.

Moreover, our educated community,

which has every reason to take special interest in agriculture, needs to learn that we are in an age in which a co-operative spirit is as essentially necessary as in western countries. The farmers of our country must come in touch with an *organisation* which should have its centre in the District town and its branches in various localities throughout the whole Jurisdiction of the District. They need also to be in touch with the organization of industry and society in general, the lack of which is a great cause of retardation of their development. The farmer boy, when sent to school studying agriculture with his comrades, will readily grasp the idea that community interests are advantageous in agriculture, and we shall then produce generations of farmers who will work together for the right advancement of their industry.

The illiterate and unintelligent farmer in every age and land has sunk to the level of a stolid and unprogressive peasantry and in this way inspite of the efforts of the great philanthropists, the general level of prosperity among farmers has been kept very low. An American tourist who has recently come back from Asia the Old World says "The most discouraging effect of my visit to the Old World is the observation of a general poverty of the masses after all the centuries of civilization—the ruin of the lands in such countries as Palestine and India, once the lands flowing with milk and honey, has caused a great panic all round and a general want too, which has compelled the labourers to work in foreign lands. I am heartily sorry to find the extreme want often seen in rural communities in Spain, Italy, Ireland and India. Surely, we don't want such an outcome for American farmers."

Many of us who are not acquainted with the conditions of the farmers of America and other European countries say that our farmers are doing their best, as much as possible for us having regard to climatic and other favorable conditions in nature. But are we to depend on nature or *Kismet* all the time? Had our agriculture been in touch with a bit of scientific education and practice they would not have been in such a degenerate and degraded condition in which we find them to-day. Many do not know that by ignorance or a blind disregard of universal experience we are wiping out our forests North and South, East and West, thus causing not only a dearth of timber, but also conditions of rainfall and soil-washing which, unless prevented, will ruin absolutely great agricultural regions. Ask Spain, for example, if this is not the result of cutting off forests from hill sides and mountains.

Even in California, which is considered as one of the most fertile states in U. S. A, the fertility of the soil and favorable climate have not prevented the coming in of great hindrances to successful agriculture due to the ignorance

and heedlessness of farm owners. Now, in such a case what shall we speak of India where everything is carried on in such lines by those who have little or no knowledge about what they are doing except a mere blind experience. A one crop system of agriculture has produced a great ruinous result that has been pursuing us from time immemorial. The want of irrigation on the one hand and want of successful drainage on the other have been a great menace to the prosperity of the producers.

A farmer must have some mechanical skill as well as intelligence in the selection and management of crops. He must know how to lay out ditches and drains as well as to cultivate and harvest grains and fruits. Our unfortunate farmer depending on nature or 'kismet', often meets with some such troubles of which he does not know any remedy whatever. He must use some machinery in which case he ought to be helped by the Zeminders or rather capitalists who will get their money back with interest, if possible, by successful crops. The question of freight rates and the manner of preparing products for shipment are live issues in a sense unknown to the farmers in general. It needs a large 'Organization', as already stated, to work on a co-operative basis which will merely turn the tide in a favourable direction. It won't be needless to say here that such Associations as the Landlords' Association of Calcutta, should take these matters not only into consideration but put them into practice, for, they are the men who are solely depending on this particular class of people and it is not only their interest but rather duty to better the condition of their hosts.

But in addition to the economic needs there are the social needs of agricultural people. "In obedience to the general influences of a developing civilization and the particular tendencies of farming under irrigation, they are inevitably drawn into closer social ties and the current of their lives are intermingling with those of the communities in which they live. Unless the farmers can be so educated that as a mass they will have the co-operative spirit, have some real and vital understanding of community interests and know how to mingle to their own advantage with men of other vocations, their lives will for ever run in a narrow monotonous channel and the control of their own affairs will pass into the hands of other men. Isolation, narrowmindedness and lack of appreciation of the broader and finer aspects of human life have ever been millstones about the necks of agricultural people", even though they may have been possessed of much rugged honesty, diligence and patience.

If our agricultural people have great economic and social needs they also have what may be called the educational needs which are even more important and fundamental. For after all it is the untrained mind of

the farmer which holds him down to a dull routine, keeps him in isolation and condemns him to comparative poverty. And by education I do not mean the mere imparting of education, but, it is rather the developing of the mind, the broadening and "clarifying of the mental out-look, the giving of the right turn to the mental processess", the strengthening of the will and of the power to use the appropriate means to accomplish useful ends. The education which the farmer needs is that which will give him some real appreciation of the progressive and the scientific spirit of the age in which he lives, will arouse a keen interest in the facts and principles of science as related to his own vocation, will show him in agriculture an ample opportunity for life-long studies which may refresh and delight the mind, as well as minister to material success and in general will lift agricultural practice out of drudgery into the domain of intelligent and hopeful labor.

Is there any good reason why the farmer, who uses the elements and principles of the natural world to supply mankind with food and clothing and whose labor makes it possible for human life to exist and develop, should not be so educated that he will find in his business mental stimulus and delight ? So from the simple humanitarian point of view, the educated community ought to take the matter in hand and consider carefully the economical, social and educational needs which are the essential factors of national aggrandisement.

The educator who receives the farmer in the enthusiastic spirit of 'human equation, can I believe give an encouraging reply. The first step is to overcome the prejudice against giving the most elementary education freely to all children. Then it is necessary to keep pace with the mighty march of civilization which sweeps across the continents of Europe and America. The chief effort of our educational authorities should be to establish a school house, as need be, in every part of a village, so that no country child may be deprived of the chance to get at least the rudiments of an education. But, though, there are some such instances where active efforts have begun in consolidating the rural schools, bringing the child to the school instead of the school to the child, yet, such attempts of philanthropic and generous views are so limited that it is practically far below the requisite quantum of work which is needed to keep up the balance of such a big country. Our effort should always be to extend the propagation of agricultural education beyond the primary and secondary schools to the colleges such as we find in the Western Universities where it has been taken as an important part in the Curriculum.

The old literary curricula and the general atmosphere of school life on the old basis have created a distaste

for the manual occupations in which the vast majority of the students must or should engage during their adult life. Besides, this practical training in schools in such scientific subjects will not only create a new interest on a new line, but will make a change in the monotonous phase of life led by the majority. And thus the problem has presented to our educators of so changing the schools as to bring this work into vital relation with the real life and activities of the masses of our people. This is the stage of educational development in the midst of which we are to-day.

Naturally, the movement for the remodelling of our school system to meet the requirements of industrial life has turned on a new leaf for the last two or three years. But, though the ideas are promising, they are of very little use unless we are able to consolidate our primary school functions and thereby put in a solid foundation. Not long ago, a new movement was brought forward by the Bengal National council of education to assimilate the western science to our own line which is now a failure owing to the lack of real enthusiasm and general *co-operation* of our educated people. There is no doubt that the Council adopted a substantial and active organised system when the very rapid increase in the extent and variety of machines, arts and manufactures created a demand for youthful workers whose minds have been prepared to deal with the problems presented in such pursuits.

But much more important than the actual changes in school Curricula already made under the impulse of the industrial needs of the country is the result which has attended the study of the fundamental problems of Education by our leading educational authorities in recent years. After all, it is the right ideals of education which we need to have. The training of the man which will best fit him to use his powers for good ends and to live the highest and best kind of life is after all the business of the school. We do not want the children of our country to be trained to run in grooves madefor them by their environment whether in the home or in the schools. The elementary and secondary schools are not to make farmers, carpenters or lawyers but good and useful men likely to become capable and willing workers in any line to which in more mature years they may devote themselves.

Prof. H. Hanus of Harvard University says, in his "Modern school." "The education we demand in our country ought to be an education that prepares a youth to overcome the inevitable difficulties that stand in the way of his *material and spiritual* advancement; an education that, from the very beginning promotes his normal physical development through the most salutary environment and appropriate physical training; that opens his mind and lets

the world in through every natural power of observation and assimilation; that cultivates hand power as well as head power; that inculcates the appreciation of beauty in nature and in art, and insists on the performance of duty to self and to others; an education that in youth and early manhood, while continuing the work already done, enables the youth to discover his own powers and limitations, and that impels him through oft-repeated intellectual conquest or other forms of productive effort to look forward to a life of habitual achievement with his head or hands or both; that enables him to analyse for himself the intellectual, economic and political problems of his time and that gives the insight, the interest and the power to deal with them as successfully as possible for his own advancement and for the service of society and country; and finally, that carries him to realise that the only way to win or to retain the prizes of life, viz., wealth, culture, leisure, honor, is an ever-increasing usefulness and this makes him feel that a life without growth and without serving is not worth living.

"That is to say, the education demanded by us in modern times must be a preparation for an active life. Now the only real preparation for life's duties, opportunities and privileges is participation in them so far as they can be rendered intelligible, interesting and accessible to children and youth of school age; and hence the first duty of all education is to provide this participation as fully and as freely as possible. From the beginning such an education can not be limited to the school arts—reading, writing and ciphering. It must acquaint the pupil with his material and social environment in order that every avenue to knowledge may be opened to him, and every incipient power to receive appropriate cultivation. Any other course is the postponment of education and not education. Such a postponement is a permanent loss to the individual and to society. It is a perversion of opportunity and an economic waste."

We have learned that reading, writing, arithmetic and English grammar—the school arts—constitute only the instruments of an elementary education and not education itself. To concentrate a child's attention on the school arts during eight or nine years is to exaggerate their importance, is to regard them as an end in themselves, instead of as a means to an end. It is true the school arts are to be learnt, the pupils' later progress will depend largely on his command over oral, written and printed speeches, but it does not require eight or nine years of almost exclusive devotion to the school arts to acquire that command. Such exclusive devotion to the school arts cuts the pupil off from the very education we are aiming at, namely, preparation for life interests through participation in them. Eight or nine years spent on school arts

together with book geography and a little history have usually left the pupil at about fourteen years of age without any permanent interest in nature or in human institutions and human achievements whether in the field of literature, science and art or in the industrial commercial and political life of his time; and what is worse, without much inclination to acquire such interest by farther study.

"This is the natural result of an attempt to prepare for life without using life's opportunities as the source and means of such preparations. Through the elementary natural science we have to bring nature into the school room and also have to go out to meet it. We should bring literature, history, civics, art, manual training and an elementaty study of industry and commerce into the school as a means of preparation for life, instead of preparing our pupils for contact with these sources of inspiration, guidance and training in an indefinite future. * * * * *

How encouraging such sentiments are. They show that the movement for industrial and scientific education has a substantial pedagogic basis. Our educated community who think this education to be of the utmost importance for our national regeneration, should never lose sight of this fact. We should not took upon agriculture as a particular art, but rather should consider agriculture and mechanic arts (including domestic arts) as universal factors of human life that ought to have recognition in our primary and secondary schools.

Under the terms agriculture and mechanic arts in their broadest application may fairly be included all the dealings of man with the natural world (i. e., with the mineral kingdom and with plants and animals), for his own advantage; and in a sense agriculture and mechanic arts should be constituent elements of the entire educational system. In the lower schools we should not seek to introduce the teachings of particular industries and trades in agriculture and mechanic arts but those operations which form a natural introduction to all agricultural industries and mechanical pursuits.

The training of the hand and of the practical sense which may be given through instruction directly related to industries is an essential and valuable feature of a well-grounded education and should be given to all children whether they are destined to make manual arts their life work or not. It is to be an education truly "industrial and cultural" which we want at present and our insistence is to be such that no education can be complete which does not contain the manual or industrial element.

Our object is not to cut out the old system of study which educators say should be included in all elementary and secondary courses but rather by a more judicious selection of the topics to be taught in the various branches, and make room for the enrichment of

the school course by the introduction of instruction in agriculture, mechanic arts and domestic science. The elimination of useless topics and the judicious employment of new systems in schools as those of America will show that agriculture is to be taught in an effective way and also will make the atmosphere of the school room favourable to the cultivation of a real love for country.

For those who are especially interested in the subject some elementary text books are mentioned as follows :—

Burkett and Hill's Agriculture for Beginners ; Goff and Mayne's First Principles of Agriculture ; Goodrich's First Book of Farming ; Bailey's Principles of Agriculture ; Brook's Agriculture ; Jordan's Feeding of Animals ; King's Soil, Irrigation and Drainage, and Physics of Agriculture ; Decher's Dairying ; Snyder's Chemistry of Plant and Animal Life ; Mead's Irrigation Institutions ; Taylor's Agricultural Economics etc., etc.

For general reference books as the new international Encyclopedia ; Bailey's Encyclopedia of Horticulture ; Wilcox and Smith's Encyclopedia for Farmers ; Bailey's Garden Craft and Rural Science series ; the Year Books and the Farmer Bulletins of the U. S. Department of Agriculture and the Bulletins of the State Experiment Stations etc., etc.

In conclusion, this much may be said that we should be up and doing in solving our own problem instead of always depending on others. If we want to educate our children the Education should not only be compulsory but should be an essential necessity for the existence of life. Our schools ought to be *public schools* in every sense of the term and we should *pay* for it. Unless we pay for ourselves, I don't think, we can get what we want. We must have better school houses, better trained teachers and more apparatus and illustrative materials and we must pay the bills for these things. It has been proved over and over again that education of the right kind promotes industrial wealth, as well as, the general well-being of mankind. If literary education has tended towards a great development of the country in the way of civilisation, I think, industrial education is likely to prove a *bonanza.*

S. K MITRA,
University of California.

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF ARCHAEOLOGY.

ii.

An identification of the finds is the first duty of an archaeologist ; he must test them by all the known methods. The very sight of archaic forms of letters should not lead him to hasty

conclusions; he should consider carefully if the forms are actually archaic or pseudo-morphs. The archaic form of the letters incised on the iron pillar at Delhi when carefully examined will cease to be so; it is known that the old form of the letters is due to their being punched with cold chisel instead of being engraved as on stone. This error often happens in our architectural investigations. An existence of the plinth of the Pallva School, or the frieze of the Hoysala period, or the pierced window of the Châlukyans is not the only test for fixing the chronology of a particular temple. We are to consider the structure as a whole. I have noticed a Pallva plinth existing in a Gopurâm of the Vijaynagarian style at Chidambaram, and hence to assign this structure to the Pallva period would be to make it at least 800 years older than what is actually the case. The Jaina temple of Châmunda Râya Basti at Shravan Belgolâ in Mysore is a storeyed structure strikingly similar to the Vishnuvite temple of Vaikuntha Perumal at Conjeeveram belonging to the 7th Century A. D. at the latest; but the latter is older than the former by at least 400 years.

The cataloguing with numbering of finds is an important part of an archaeologist's duty. It may be based upon the subject, date or place of publication, the nature of the characters, the names of the authors or the kings or chiefs during whose time they were published. The coins, for instances, are usually arranged in strict chronological order; but Mr. Nelson Wright instead of following this method in his Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, has adopted the principle of arranging them according to the mints where they were struck, the mints being arranged alphabetically. Thus Mr. Wright has arranged the coins of Mohomed III Bin Tugluck, Emperor of Delhi, as per the following mints.—Daulatabad town, Delhi Hazrut, Daru-I-Islam, Sultanpur, &c.

Among the many impediments to our archaeological study and researches an imperfect or incorrect restoration of old structures is responsible for many wrong inferences; for, a temple or structure which has not been faithfully restored is liable to leave a wrong impression on the minds of an observer about its constructive and decorative peculiarities.

While travelling in the province of Mysore I noticed that the P. W. D. there had restored the friezes depicting scenes from the Ramayana and the Mahabharata of the magnificent temple at Halebid by collecting the friezes from the ruins of different temples and putting them together; the friezes when studied "in situ" do not present a homogeneity but look like the piecing together of the dry bones of various species of animals to form a rough skeleton. It would have been *infinitely* better to keep the friezes blank. The characteristic inclined Hoysala parapet

of the Ardhamandapa of the Halebid temple has been restored and carved with the modern raised panels having curved corners.

To engraft one style upon another after such a length of time is not consistent with good taste, if not anything else.

All over Southern India I notice a noble attempt at the restoration of the old Saivite temples by the Natu Kotti Chettis, the rich bankers and merchants carrying on maritime trade with Java, Singapore, etc.; but unfortunately their noble attempt inspired by religious fervour seems to be a veritable curse when we consider that the work of restoration amounts to thorough reconstruction without having any regard to the original relative positions and constructive peculiarities of the temples; I admit, of course, that in some portions of some of the temples faithful restoration is impossible.

All these restored temples look like structures built yesterday with a curious medley of various types of architecture and sculpture meeting the expectant eyes of an observer who, if he has any taste at all, turns from them in disgust. The corrugated iron shed raised to protect the "subha stambha" which again does not require any covering at all, or the roof covering made of zinc sheet at Chidambaram is an eye-sore. The vertical iron gratings of the sky light at Rameswaram are a veritable nuisance. The relative positions of the different "prakara-mandapas" at Rameswaram are being tampered with and nobody seems to be responsible. The restoration of the temple of Jambukesvara at Srirangam near Trichinopoly is most unsatisfactory. At Conjeeveram and other places I have found some stones bearing inscriptions reversed in position due to careless setting by the masons.

This is not the case in India alone but in Europe as well. The restoration of the early Byzantine Church of St. Sophia at Constantinople has wholly spoiled the beauty of the interior; similar is the case with many examples of Romanesque and Gothic styles, e. g. the Rouen Cathedral. I cannot resist the temptation of quoting from a description by Victor Hugo of Notre Dame de Paris where he has placed restoration on the same footing with vandalism as an agency for spoiling Gothic architecture. He says "Three sorts of ravages today disfigure Gothic architecture: wrinkles and warts on the epidermis—this is the work of time; deeds of violence, brutalities, contusions, fractures—this is the work of revolution from Luther to Mirabeau; mutilations, amputations, dislocation of the joints, restorations—this is the Greek, Roman and barbarous work of professors, according to Vitruvius and Vignole."

Want of sufficient data and a predisposition towards certain theories are responsible for wrong inferences in most of the cases which are accepted as truisms and clung to with tenacity till

they are exploded. The angle of slope of the passages in the pyramids of Gizeh, or the Necropolis of Memphis was found to range between 25-30′ and 26-30′; from this the archaeologists concluded that this angle was chosen for the observation of the Pole Star; this theory was subsequently exploded by the discovery of passages of different angles of slope.

We should not infer from a similarity in form or character that similar arts are derived from the same source, or allied to one another; both in the primitive and the highly evolved state similarity should not be the only criterion to trace an art to its parent stock. As is usually noticed in the domain of Psychology that dissimilar minds often think, feel or perceive similarly, we should always bear in mind that similar arts practised in different countries may not have a common origin.

We must be very careful in our comparisons. A detection of mere resemblance must not lead us to establish a kinship which on scrutiny would be found of an evanescent character. Professor Max Muller warned all students of Comparative Philology against this danger, as he called it, and by way of illustration cited the case of Professor Bopp attempting to establish kinship between the Aryan and Malayo Polynesian languages (vide Chips from a German Workshop Vol. IV. p. 115).

We should always bear in mind what the nature and circumstances of the case admit of; our reasearches should be conducted with sobriety and not with vengeance and should not always aim at a common origin; by the wrong application of the Platonic principle of the detection of the one in many, we must consider the natural restrictions that can be imposed by the possibility of the cases. We must not consider the mere accidents as the necessary links and attach greater importance to them than to the certain chain lying stretched before us. We must not "confound exceptions with rules and accidents with essential properties."

Before we try to detect a resemblance between the old Indian style and any style, say Greek or Roman, we should trace both the styles back to their primitive forms. The extant Indian style should first be compared with its nearest old relatives. This method has been recommended by Prof. Edkins in his study of the Chinese dialects and has led to interesting results recorded by him. What is true in case of the science of human speech is equally true in architecture which manifests a particular phase of the human mind.

During my recent researches in Mysore I have seen some broken roofing tiles exactly similar to the ordinary Mangalore tiles having characteristic ridges and nail-holes exhumed from some trial pits dug at Chandravalli in Chitaldroog. These tiles are associated with a few coins of an Andhra king flourishing in the 1st or 2nd century A.D.

I need hardly add that the patentees at Mangalore would not certainly admit that the design of the tiles was derived from those of the Andhra period flourishing from the 3rd century before Christ to 3rd century A. D.

The clasp pins found among the prehistoric Mexican ruins under the rule of the war-like Aztecs are exactly similar to the modern safety pins, but none, I believe, trace the design of the latter to the former found among the ruins of the Bronze epoch.

The monolithic structure called Draupadi's ratha at Mahavallipuram is similar in some respects to the temple of the Bengali style which is really a non-descript; but to call the Bengali style a derivative of the early Pallava style prevailing in the 6th or the 7th century A. D. would be too bold a statement not supported by any known fact.

Similarity of form is also responsible for an incorrect identification of some of the Bhârhut Jâtakas of General Cunningham. The Dasaratha Jâtaka of Cunningham is actually the Mahâbodhi Jâtaka as described in Aryasuras Jâtakamâlâ edited by Prof. Kern; the sculptor has, of course, made some deviations from the text.

We need not go to remote antiquity to prove it. Those who have studied the mouldings of Indo-Aryan type prevailing in Orissa cannot but he struck by the similarity between the Knmbha portion of the Janghâ and that found at the north-west corner of the Grand Hotel at Chowringhee just below the cornice of the 2nd storey; but none will doubt for a moment that the architect whose services were requisitioned by Mrs. Monk copied the moulding from a structure of the mediaeval times prevailing in Orissa.

The super-imposition of one structure over the relics of another is sometimes the cause of wrong inferences, for it may lead us to suppose that a very great length of time must necessarily have elapsed since the one in ruins was constructed. The explorations of the Archaeological Department in 1910-11 at Kâsia have revealed an example of this sort of super-imposition, both the structures being dated in the time of the Guptas as the bricks of this period are found in both of them. Similar wrong inference is also caused by a proximity of a structure to an old one. A structure which is full of additions in different ages is a very difficult study naturally giving rise to incorrect conclusions. The temple of Varadarâja at Conjeeveram like Burgos Cathedral in Spain is "now a vast congeries of mandapas and excrescences of every shape and style which have grown round it at various dates concealing thereby the original structure and plan."

Let me illustrate the principles I have enunciated above by reference to examples of Architecture, Sculpture and Iconography.

Strict logical accuracy has not been observed in the classification of structural

examples of Indian Architecture, the error of overlapping has crept in many cases. There is no such thing as Buddhist or Jaina architecture when we consider the structural examples. A Jaina temple is not different *per se* from a Brahmanical one from the standpoint of constructive peculiarities as opposed to the decorative and sculptural ones. If we study the main features of the Saivite, or the Vishnuvite temples at Conjeeveram and those of the Jaina ones at Tiruparutikundram on the south side of the Vegavati near Conjeeverum, we do not notice any difference in the ensemble. There are the same GopurÂms with an odd number of finials over them, the same Dvajastambha called Manstambha by the Jainas, the same Garbha-griha, or sanctum the same Antarala or antechamber, Arbhamandapa and Mahamandapa surrounded by the same type of PrÂkÂramandapas. The reason is not far to seek, for both the Jaina and Hindu temples had usually the same patrons in the local kings or chiefs. We find the names Külatünga Chola and Krishnadeva MahÂrÂya the great king of Vijaynagar incised on both the Jaina and BrÂhmanical temples of VardhamÂna SwÂmi and VaradarÂja respectively. I noticed scenes from the SrimatbhÂgabatam painted on the ceiling of the MahÂmandapa of the Jaina temple referred to above.

The Temple of Kandarya Mahadeva at Khajuraho in Bundelkhand is nearly similar in ensemble to the Jaina temple of Nemi Nath in Mount Girnav in Guzrat. Again, the temple of Parsvanath Swami at Khajuraho bears à striking resemblance to the "rekha" or curvilinear temple of the Orissan sub-group of the Indo-Aryan style.

The terms "Dravidian" introduced by Fergusson and Tamulian by Rajendra Lal Mitra are equally meaningless. The term "Dravidian" is too vague and does not possess the same meaning as Dr. Fergusson wanted to convey it. Tamilian was taken by Dr. Mitra to meān South Indian ; but Tamil is one of the four principal dialects in South India and the use of the one in preference to others is not fair and would certainly be resented by the people of Mysore,' or Målabar. The term Indo-Aryan has no special charm and is incorrect as it is not distinctive. I would therefore propose to divide the Indian structural style prevailing before the invasion of the Mahomedans into the following divisions each admitting of divisions into several sub-groups.

Indian :—(1) The North Indian and (2) the South Indian

The North Indian :—(a) The Pyramidal, (b) the curvilinear·(c) the cubical (d) a conglomeration of the above three forms.

I do not introduce the Orissan style as proposed by Dr. Mitra as it contains both the curvilinear and the Pyramidal varieties called the "Rekha" and "Pida' dewls" respectively.

The South Indian style is divided into (a) the Pallava (b) the Chola (c) the Chalukya (d) the Hoysala and (e) the Vijaynagarian. It is impossible to classify this style on the basis of the North Indian style. Each of the above groups and their sub-groups can be divided into several sub-classes. Let me illustrate it by taking up the Orissan sub-group of the curvilinear class of the North Indian style.

Both the curvilinear and pyramidal forms of the Orissan type called 'Rekha and 'Pida dewls' are divided into five classes according to the "pagas" or pilasters used, the number of pilasters being always odd ; thus we have the Ekaratha, Triratha, Pancharatha, Saptaratha and Navaratha. The Pyramidal class called the Pida dewl is also divided into three classes, the Ghanta Sri Dewl, the Nadu Dewl and Pida Dewl proper, the number of sub-classes of the pyramidal variety being thus 15, the product of 5 and 3.

I may mention in this connection that there are some types met with which are non-descripts properly speaking ; but these non-descripts have something in common with the parent style which might lead us to consider them as belonging to one other of the styles like the pseudo-alums in Chemistry, or pseudo-morphus in Crystallography. I may cite the Vaital and the Gauri Chara types found in Orissa by way of illustration ; though these are non-descripts they are Ekaratha and Pancharatha respectively.

I have found that invariably all Triratha temples in Orissa, e. g. Parasuramesvara contain palpable traces of Buddhist influence as far as sculptural and decorative devices are concerned. This generalisation would be impossible if the classification of Fergusson or Mitra be accepted.

Instead of attempting to define a style it will be better to describe its characteristic features all of which may or may not exist in one particular specimen. The definition of the Chalukyan style as having a star-shaped ground plan conveys not only an incomplete idea but is also faulty in character, and for this Fergusson is responsible. The star-shaped ground plan is not a sine qua non, a necessary or a sufficient condition of the Chalukyan style ; both in Mysore and in the Nizam's dominions I have come across many examples whose ground plans are rectangular. I may in this connection mention below some of the characteristic features :—(a) the absence of an isolated sanctum ; it must be attended by an Antarala or Ardhamandapa, (b) the raised terrace or platform parallel to the temple, (c) the railed and inclined parapet, (d) the pierced slabs (e) stepped tower, (f) Car-like niches, (g) the pillars of peculiar type of moulding, (h) the pendants hanging from the ceiling of the mandapa (i) deeply undercut ornaments.

It is very interesting to study the architecture of outlying provinces similar to the metalloids in Chemistry. If we

examine the Chalukyan architecture found in the western part of the district of Bellary near the Tingubhadra such as the temple of Kallesvara at Hala-vagalu we find a curious mixture of Dravidian and Chalukian forms. This blending together of the two styles without assimilation is calculated to lead a student of architecture into a pitfall of incorrect conclusions.

A student of Indian architecture is usually perplexed at not coming across examples of the different classes into which architecture has been divided by Ruskin, e. g, Devotional, Memorial, Civil, Military and Domestic. An illustration of the domestic type even a few hundred years old is very rarely to be met with. Fortunately we have some examples of a civil type still extant; I might in this connection mention the irrigation works with head sluices noticed in Southern India as illustrative of civil engineering. The system of irrigation reached an advanced state in Southern India as early as the time of Kakutshta Varman, the Kadamba king, in the 1st half of the 6th century. We come across the reference of a tank with a sluice in the inscription of the Ganga-Pallava king Dantivikrama Vardhana. Mr. Sewell in his Lists of Antiquities refers to an old irrigation channel pointed with head sluice which flowing through several miles, falls into a tank 10 miles to the east of Trichinopoly.

MONMOHAN GANGULY.

THE CHRISTMAS.

In Bethlehem, one gloomy night
In bleak December, shone a light
Illuminating Heaven and Earth;
That was the night of Jesus' Birth!
The firmament, with stars ablaze,
Look'd down on Earth with wondering gaze
And Nature, in the attitude
Of one in prayer, in silence stood,
While angels sang a Hymn above,
And Earth was fill'd with Peace and Love;
But hark! how sweet the organs blow,
And merrily the church-bells go.
This is the month and this the morn
Wherein the Prince of Light was born,
With Love this world to overflood
And save the sinners with His blood!
We know of Conquests, great and small,
But His exceeded one and all:
Where Alexander's Army fail'd
A single word of His prevail'd!
A miracle indeed was done:
With Love alone the world was won!

BAHAR-UD-DIN AHMAD.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড ঢাকা—মাঘ, ১৩২৩। ১০ম সংখ্যা

বসন্ত-ভারতী।

শীতের মাঝে ঋতুর রাজে জাগায়ে তুলি বনে বনে,
শঙ্কা শোক সঙ্কোচেরে ঘুচায়ে এস মনে মনে।
দাও—আলোকজ্ঞানশলাকা দিয়া
নিখিল আঁখি উন্মীলিয়া!
গুল্মেরা বল্মীকেরা শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
আজি—এসমা সামপ্রণবঝঙ্কৃনাদিনি!

পাখীহারাণো শাখীরো হেরি ফুটালে আঁখি শত শত,
অসাড়দেহ শিহরি, শিশুপ্রবাল কাঁপে পতপত;
মাগো—মূকেরে মুহু মুখর করি,
কণ্ঠে এস কুণ্ঠা হরি,
বধিরে আজ অধীর করি শুনালে সুর কতমত!
মোর—জ্ঞানজীবনে জাগাও বাগ্‌বাদিনি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

মগধের রাজবংশ।

(মৌর্য্য, শুঙ্গ এবং কাণ্ব।)

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ।

ভারতরবি অশোক অস্তমিত হইলে তদীয় পুত্র সুপার্শ্বভ মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সুপার্শ্বভ।

মতান্তরে পুত্র কুণাল সাম্রাজ্যাধিকারী হন। কুণাল সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার পাপলালসা পরিতৃপ্ত করিতে অসম্মত হন, ইহাতে বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার দারুণ ক্রোধ উপস্থিত হয়, তদীয় হৃদয় প্রতিহিংসায় আকুল হইয়া উঠে, অতঃপর তাহারই কুহকপূর্ণ ষড়যন্ত্রে কুণালের চক্ষু দুইটি উৎপাটিত হয়। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে এই ঘটনা বিভিন্ন নামে ও আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

কুণাল।

জলৌকা।

জলৌকা নামে অশোকের আর এক পুত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুত্র কাশ্মীরের শাসনপতি, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, শৈব ধর্ম্মের অনুরাগী এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

কুস্থান।

মহারাজ অশোকের চতুর্থ পুত্রের কার্য্যাবলীও ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার কুস্থান নামে এক পুত্র লাভ হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তৃগণ গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, এই পুত্র পিতার জীবদ্দশায় রাজ্য অধিকার করিবেন। মহারাজ অশোক ইহাতে ভীত হইয়া কুস্থানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঘটনা-চক্রে পতিত হইয়া রাজকুমার চীনদেশে নীত হন। তত্রত্য অন্যতম অধিপতি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। কুস্থান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মধ্য এসিয়ায় গমন করেন এবং সে দেশে ভারতীয়গণের উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়।

তিবর।

মহারাজ অশোকের পঞ্চম পুত্রের নাম তিবর। তিবর এবং তদীয় মাতার নামযুক্ত একখানি অনুশাসন-লিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি:—

"মহিমান্বিত রাজার আদেশে প্রত্যেক স্থানের রাজপুরুষদিগকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে যে, দ্বিতীয় মহিষী কর্ত্তৃক যে কোন দান প্রদত্ত হইয়াছে, প্রমোদ উদ্যানই হউক, কি দাতব্য চিকিৎসালয়ই হউক, কি আম্র কাননই হউক, কি অন্য কোনপ্রকার দানই হউক, সমস্তই মহিষীর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিবরের মাতা দ্বিতীয়া মহিষী কারুবকীর পুণ্যার্থ এই সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে।" তিবরের বিবরণ কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। তাহা না থাকিলেও এই অনুশাসন-লিপিই তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অশোকের মহিষী।

ফলতঃ আমরা অশোকের পঞ্চ পুত্রের নাম জানিতে পারি।* উক্ত অনুশাসন-লিপি অবলম্বনে আমরা অশোকের অন্যূন দুই মহিষী ছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি। দ্বিতীয়ার নাম ঐ অনুশাসন-লিপিতেই লিখিত হইয়াছে। প্রথমার নাম জ্ঞাত হইবার জন্য আমাদিগকে বৌদ্ধ গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতে হয়। ইঁহার নাম অসন্ধি-মিত্রা। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে আর দুইজন মহিষীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। একজনের নাম দেবী, অপর জনের নাম তিষ্যরক্ষিতা। যে সময় অশোক উজ্জয়িনীর শাসনপতি ছিলেন, তৎকালে দেবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। দেবী অশোকের প্রথমা মহিষী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা ইঁহার পুত্রকন্যারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিষ্যরক্ষিতার নাম বৌদ্ধগ্রন্থে ঘোর কলঙ্কগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সে কলঙ্কের বিবরণ সংক্ষেপে পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহা প্রধান কলঙ্ক হইলেও এক মাত্র কলঙ্ক নহে। তিষ্য-রক্ষিতার আর একটি কলঙ্ক এই যে, তদীয় হৃদয় ঈর্ষ্যা-পূর্ণ ছিল বলিয়া তৎকর্ত্তৃক অশোকের পূজার্হ বোধি-দ্রুমের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল।

পৌত্র দশরথ, সম্প্রতি।

মহারাজ অশোকের অধস্তন প্রথম পুরুষের নাম সম্বন্ধে পুরাণশাস্ত্রে দ্বিমত থাকিলেও দ্বিতীয় পুরুষের নাম সম্বন্ধে তাহাতে মতান্তর নাই। ইঁহার নাম দশরথ। ইনি অশোকের পৌত্র ছিলেন। দশরথের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলা-লিপি [illegible]ন পর্ব্বতস্থ গুহা-মন্দিরের উৎসর্গপত্র। দশরথ রাজা আট বৎসর কাল রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। অতঃপর অশোকের আর একজন পৌত্র সম্প্রতি রাজপদ লাভ করেন। অশোক-অবদানে লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্রিগণ অশোক রাজার অপরিমেয় বদান্যতা দেখিয়া শঙ্কিত হন এবং সাম্রাজ্য রক্ষার্থে তাঁহাকে

* মহেন্দ্র নামে অশোকের এক পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মতান্তরে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা ছিলেন এবং প্রথম যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম গণনা করিলাম না।

পদচ্যুত করিয়া কুণালের পুত্র সম্প্রতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। * জৈন গ্রন্থানুসারেও অশোকের অব্যবহিত পরেই সম্প্রতি মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থে সম্প্রতি জৈনধর্ম্মের অনুরাগীরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে জৈনধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অনার্য্য দেশেও জৈন মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অতঃপর মৌর্য্যবংশীয় যে সকল নরপতি মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহাদের কেবল নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌর্য্য বংশের শাসন কাল, নরপতির সংখ্যা।

পুরাণ-শাস্ত্রানুসারে অশোকের উত্তরাধিকারিগণ ১৩৭ বৎসরকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে পুরাণ-শাস্ত্রসমূহে অনৈক্য আছে। মৎস্যপুরাণের মতে অশোকের অধস্তন নরপতির সংখ্যা ৯; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে ৬। যাহা হউক, মৌর্য্যবংশের শেষ নরপতির নাম সম্বন্ধে অনৈক্য নাই। তাঁহার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

অশোকের তিরোভাবের পর হইতে মৌর্য্য রাজশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। দুই কারণে এই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়।

মৌর্য্য নরপতিগণের দুর্ব্বলতা।

মহারাজ অশোকের অসাধারণ তেজস্বিতা এবং শাসনপটুতা ছিল, তিনি অকুণ্ঠিত প্রতিভা-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এই কারণ চন্দ্রগুপ্ত লোকাতীত সাধনা বলে যে বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন, অশোকের সময় তাহার গৌরব এবং বৈভব সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদীয় উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল-চিত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারা রাজপুরুষদিগকে শক্তিসহকারে পরিচালন করিতে অসমর্থ হন, ইহার ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের গৌরব এবং বৈভব হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

আবার এক কারণে মৌর্য্য রাজশক্তির অবনতি সাধিত হইয়াছিল, আমরা সে কারণ বিবৃত করিতেছি। বিভিন্ন প্রকৃতির নানাজাতি লইয়া সুবিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া ছিল। এই সকল জাতির অস্থি-মজ্জা এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপন পূর্ব্বক সর্ব্বস্থানে মৌর্য্য সম্রাটের জাতীয় অধিনেতৃরূপে প্রতীয়মান হওয়া স্ববংশের স্থায়িত্ব-কল্পে আবশ্যক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করাতে এই একীকরণ আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

প্রজাপুঞ্জের অনৈক্য।

অশোকের প্রাণগত সাধনাবলে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও আর্য্যধর্ম্মও প্রবল ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন।

ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধাচরণ।

এজন্য আর্য্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় ব্রাহ্মণ-কুল স্বভাবতঃই অশোকের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তারপর তাঁহাদের এই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ কারণও ছিল। তৎকালে যজ্ঞ এবং যজ্ঞার্থ পশুবলি আর্য্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। মহারাজ অশোক পশু-হত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন।

অশোকের পশু-হত্যা নিবারণ।

এতৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রথম গিরিলিপিতে লিখিত হইয়াছে,—"এখানে বলিদান জন্য জীবহত্যা যেন হইতে না পারে; জাতীয় ভোজও যেন হইতে না পারে, কারণ মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী জাতীয় ভোজে অনেক অসৎ-কর্ম্ম দেখিতে পান। তাহা হইলেও কোন কোন জাতীয় ভোজ মহামান্বিত রাজা প্রিয়দর্শীর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে মহিমান্বিত

* এরূপ ইতিহাসিক নির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ অশোক জীবনের শেষভাগে স্বেচ্ছায় রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনার্থ নির্জ্জন বাস আশ্রয় করেন। এই সময় যে রাজকুমার শাসনভার লাভ করেন, একখানি অনুশাসন-লিপিতে তাঁহার উপাধিমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত নাম কি এবং ইনি মহারাজ অশোকের পরলোকগমনের পর রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

রাজা প্রিয়দর্শীর রন্ধনশালায় সহস্র সহস্র প্রাণীর হত্যা-সাধন করিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই ধর্ম্মানুমোদিত অনুশাসন লিখিত হইবার কালে প্রত্যহ দুইটি ময়ূর এবং একটি হরিণ মাত্র হত হইতেছে এবং হরিণ-হত্যা অপরিহার্য্য নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণীর হত্যাও বন্ধ হইবে।” এই অনুশাসন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পশুহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যজ্ঞে বলিদান জন্য পশুহত্যা নিবারিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মহারাজ অশোকের অনুশাসন-লিপিতে প্রকাশ যে, যাঁহারা (ব্রাহ্মণকুল) সমাজে যথার্থ মনুষ্যরূপে সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা তদীয় কৃতকার্য্য আপনাদের দেবতাসহ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তারপর একটি প্রবল ক্ষমতা ব্রাহ্মণকুলের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সমাজে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা ব্রাহ্মণদের কার্য্য ছিল। কিন্তু মহারাজ অশোক প্রজাদিগকে ধর্ম্মের পথে রাখিবার জন্য ধর্ম্মমাত্রা নাম দিয়া বহুসংখ্যক নৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর আচারব্যবহার রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দুরাচার দেখিলেই মহারাজকে তদ্বিষয়ে অবগত করাইতেন। * মহারাজ অশোক তাদৃশ দুরাচার নিবারণ উদ্দেশ্যে যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তাহা (পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের জন্য লঘুদণ্ডের বিধান থাকা সত্বেও) জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সমদর্শিতামূলক এবং অপরাধ অনুযায়ী হইত। এই সমস্ত নানাকারণে ব্রাহ্মণকুল সাতিশয় অসন্তুষ্ট হন।

অশোকের দণ্ডবিধির সমতা।

মহারাজ অশোক প্রবল প্রতাপান্বিত এবং উদার ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি কলিঙ্গযুদ্ধকালে ব্রাহ্মণের হত্যা এবং দুর্দ্দশা দেখিয়া ত্রয়োদশ অনুশাসন-লিপিতে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এবং আর একটি (তৃতীয় গিরি)

মহারাজ অশোকের

উদারতা।

অনুশাসন-লিপিতে ব্রাহ্মণকুলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে প্রকৃতিপুঞ্জকে উপদেশ দেন। দ্বাদশ গিরিলিপি তাঁহার উদারতা এবং সমদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি।—“মহিমান্বিত রাজা প্রিয়দর্শী দান এবং নানাপ্রকার সম্মান প্রদর্শনের উপায় অবলম্বন করিয়া গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু দান অথবা বাহ্যিক সম্মান সম্বন্ধে তিনি তাদৃশ মনোযোগী নন, সকল শ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ের সার বিস্তারের জন্যই অবহিত। এই বিষয়ক সারের বিস্তার নানা আকার ধারণ করে। কিন্তু বাক্-সংযমই উহার মূলতত্ব, অর্থাৎ মনুষ্য সামান্য কারণে অন্য দলভুক্ত লোকের নিন্দা করিয়া নিজদলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না। কেবল উপযুক্ত কারণেই লোকের নিন্দা করা যাইতে পারে। কারণ অন্য দলের লোকও কোন না কোন কারণে সম্মানের যোগ্য। এই ভাবে কার্য্য করিয়া মনুষ্য নিজের দলকে উন্নত করে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্য দলের লোকের উপকার সাধন করিতে পারে। অন্যভাবে কার্য্য করিলে মনুষ্য নিজের দলকে আঘাত করে এবং অন্য দলের অপকার সাধন করে। কারণ যদি কোন ব্যক্তি পরনিন্দা দ্বারা নিজের দলের গৌরব বর্দ্ধন হইবে বিশ্বাসে নিজের দলের প্রতি প্রীতিবশতঃ নিজের দলের সম্মান করিয়া অন্য সমস্ত দলের নিন্দা করে, তবে সেই ব্যবহার নিজের দলেরই অত্যন্ত ক্ষতি করে। অতএব আত্ম-সংযম প্রশংসনীয়, অন্য লোকের শাস্ত্র শ্রবণ করা এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রবণ করা প্রশংসনীয়। অতএব মহিমান্বিতের ইচ্ছা এই যে, সকল মতাবলম্বীগণ এই বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবে এবং এই মতে আস্থাবান হইবে। সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকে অবগত করাইতে হইবে যে, তিনি দান অথবা বাহ্যিক সম্মান সম্বন্ধে তাদৃশ মনোযোগী নন, সকল শ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ের সার বিস্তারের, সুপ্রশস্ত বিস্তারের জন্যই অবহিত। এই জন্য ধর্ম্মমহামাত্রা, বচভূমিক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর রাজ-

* অশোক চরিত।—কৃষ্ণবিহারী সেন।

পুরুষগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং ইহার ফল নিজ দলের উন্নতি এবং ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন। *"

মহারাজ অশোক কিরূপ উদার এবং সমদর্শী ছিলেন, আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। তাঁহার প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে লিপি নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-কুল অশোকের কৃতকার্য্যে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার প্রবল প্রতাপ এবং অসামান্য উদারতা ও সমদর্শিতার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। অশোকের তিরোধানের পর ঐ প্রবল প্রতাপ, উদারতা এবং সমদর্শিতা যুগপৎ অন্তর্হিত হয়।

ব্রাহ্মণ জাতির অসন্তোষ।

তখন ব্রাহ্মণগণ মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-গতি প্রতিহত হইয়া পড়ে। আর এক কারণেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার-গতি প্রতিহত হইয়াছিল। সে কারণ এই যে, অশোকের পৌত্র সম্প্রতি রাজা জৈনধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহার উন্নতি সাধন জন্য অবহিত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতির জৈন-ধর্ম্মানুরাগ।

ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানাজাতির অস্থিমজ্জার মিশ্রণ দ্বারা যে একীকরণ আরব্ধ হইয়াছিল, মহারাজ অশোকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা রুদ্ধ হইয়াছিল।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবস্থা।

মহারাজ অশোকের পরবর্ত্তীকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল,—রাজা দুর্ব্বল, অধিকাংশ প্রজা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন, মহাশক্তিশালী ব্রাহ্মণকুল মৌর্য্য রাজবংশের বিদ্বেষী। ইহার ফলে আত্মপরায়ণ রাজপুরুষগণের সুযোগ উপস্থিত হয়; শাসন-যন্ত্র শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে এবং দূরবর্ত্তী অংশসমূহ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে ভূপ্রথিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন সাধিত হইতে থাকে। এরূপ সময়ে বৈদেশিক গ্রীক রাজা মেনান্দর দেশ জয় করিতে করিতে মৌর্য্য সাম্রাজ্য-ভুক্ত অযোধ্যা প্রদেশে উপনীত হন। মগধের অধিপতি বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহার গতিরোধ করেন; গ্রীক-অধিপতি পরাক্রমশালী শত্রুসৈন্যের ব্যূহভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নচিত্তে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। পুষ্পমিত্র বিজয়শ্রীশোভিত হইয়া লোকপ্রিয় হন এবং সে লোকপ্রীতির সুযোগে স্বীয় প্রভু বৃহদ্রথের হত্যা-সাধন পূর্ব্বক মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

যে সকল কারণের সমবায়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইহার ধ্বংসের নিমিত্ত শেষ আঘাত সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ জাতির অনুগত ছিলেন। এজন্য কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকুলের প্রতিকূলাচরণই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ ছিল।

ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুদয়।

মৌর্য্য-আধিপত্যের বিলোপ সম্বন্ধীয় কারণ যাহাই হউক, মগধে নূতন রাজবংশের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল।

---

* এই প্রসঙ্গে একজন প্রবীণ ইংরেজ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"All governments have been obliged to recognize an infinite variety among the governed of social customs and of religious beliefs, too firmly grounded to admit of interference. Thus the idea of religious toleration which was of slow growth in Europe was accepted in India generously from the earliest times. All religious communities were alike under the protection of the sovereign; and inscriptions plainly show that, when the goverment changed hands the privilege granted to religious communities were ratified by the new sovereign as a matter of course. In a special edict devoted to the subject of religious toleration Asoke definitely says that his own practice was to reverence all sects. In this edict he deprecates the habit of exalting one's own views at the expense of others, and admits that different people have different ideas as to what constitutes 'duty' (dharma). Such has been the attitude of enlightened rulers of India in all ages".—Ancient India. E. J. Rapson.

শুঙ্গবংশ।

ব্রাহ্মণ জাতির অনুগত পুষ্পমিত্র (কোন কোন মতে পুষ্পমিত্র নিজেই ব্রাহ্মণ ছিলেন) একসঙ্গে রাজ্যলালসা চরিতার্থ এবং ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্ত সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজক্ষমতা লাভ করিতে উদ্যোগী হন। পুষ্পমিত্র গ্রীকযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগত হইলে মগধাধিপতি দুর্ব্বল-চিত্ত বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত বিপুল আয়োজন করেন। পাটলিপুত্রের বহির্ভাগে বিজয়ী সৈন্তের রণক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবকালে একটি শর রাজার ললাটদেশ আঘাত করে এবং তাহাতেই তিনি গতাসু হন। অতঃপর পুষ্পমিত্র রাজপুরী অধিকার পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে মগধের শাসনাধীন বিদিশার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন; নিজে সেনাপতি উপাধি লইয়াই মগধের শাসন-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন।

বৃহদ্রথের হত্যা।

পুষ্পমিত্র।

পুষ্পমিত্র রাজ্যাধিকারী হইয়া বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উৎপীড়নে অনেক সঙ্ঘারাম দগ্ধীভূত এবং বহুসংখ্যক সৌগতের জীবনান্ত হইয়াছিল। এই সকল উৎপীড়নের বিবরণ তারানাথের গ্রন্থে এবং দিব্যাবধানে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধনামা ভিন্সেন্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেন, বৌদ্ধগ্রন্থকারদের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও পুষ্পমিত্র যে বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপন হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, ইহা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। যাহা হউক, এই উৎপীড়নের বিবরণ অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব বৃদ্ধির জন্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের অন্তবিধ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

পুষ্পমিত্রের বৌদ্ধ পীড়ন।

কলিঙ্গ রাজ্যের অধিপতি খারবেল মগধ রাজ্য আক্রমণ করেন। খারবেলের অনুশাসন-লিপি তাঁহার নিজের জয় ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তাঁহার আক্রমণের ফলে মগধের পূর্ব্বসীমান্ত মাত্র অধিকৃত হইয়াছিল। এই অধিকারও অল্পকাল মধ্যেই পুষ্পমিত্রের বাহুবলে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কলিঙ্গ রাজ খারবেল।

কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের দমনের পরে বিদর্ভ রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র প্রেরিত হন। প্রবল যুদ্ধের পর অগ্নিমিত্র জয়শ্রী লাভ করেন। পরাজিত বিদর্ভাধিপতি আপন রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

বিদর্ভ জয়।

পুষ্পমিত্র তাদৃশ বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে উত্তর ভারতের চক্রবর্ত্তী নরপতিরূপে ঘোষণা করিতে সংকল্প করেন এবং তদর্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হন।

অতঃপর পুষ্পমিত্র স্বীয় পৌত্র বসুমিত্রের সৈনাপত্যে যজ্ঞাশ্ব প্রেরণ করেন, যজ্ঞাশ্ব প্রত্যাগত হইলে মহামহোপাধ্যায় পতঞ্জলিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া মহাসমারোহে যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

ব্রাহ্মণ জাতির বিনষ্ট প্রাধান্যের পুনরুদ্ধার সাধন এবং উত্তর ভারতের চক্রবর্ত্তী রাজপদ লাভ অন্তে মহারাজ পুষ্পমিত্রের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়; তিনি সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর কাল সগৌরবে রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র বিদিশার অধিপতি অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অগ্নিমিত্রের পরবর্ত্তী কালে প্রথমতঃ ভ্রাতা বসুজ্যেষ্ঠ এবং তারপর পুত্র বসুমিত্র রাজ্যাধিকার লাভ করেন। বসুজ্যেষ্ঠের রাজত্ব ৭ বৎসর ব্যাপী ছিল। বসুমিত্রের রাজত্বের পর শুঙ্গ বংশের গৌরব অন্তর্হিত হয়। বসুমিত্রের পুত্র অন্ধ্রক দুইবৎসর, তৎপুত্র পুলিন্দক ৩ বৎসর, তৎপুত্র ঘোষবসু ৩ বৎসর, তৎপুত্র বজ্রমিত্র বা সুমিত্র ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। বজ্রমিত্র সর্ব্বক্ষণ নাট্যামোদে আসক্ত থাকিতেন; তৎকালে সর্ব্বত্র অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। হর্ষচরিতের বিবরণে বিশ্বাস করিলে এই অরাজকতার সুযোগে মিত্রদেব নামক একজন দুরাকাঙ্ক্ষ

পুষ্পমিত্রের উত্তরাধিকারীগণ।

মৃণাল হইতে পদ্মোত্তোলনের মত অনায়াসে পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত বজ্রমিত্রের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়াছিল। বজ্রমিত্র কালগ্রাসে পতিত হইলে ভাগবত রাজ্যাধিকারী হন। অতঃপর দেবভূতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ঘোর ব্যসনাসক্ত ছিলেন। একদা রাজা ইন্দ্রিয়লালসাহত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, এরূপ সময়ে একজন ক্রীতদাসী-কন্যা অমাত্য বাসুদেবের প্ররোচনায় রাণীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করে।

ব্রাহ্মণগণ রাজ-সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রবলোৎসাহে আর্য্যশাস্ত্রের অনুশীলন ও প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহারা আর্য্যধর্ম্মে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অভিনব শক্তির সঞ্চার করেন, সে শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সময় অনেক শাস্ত্র সঙ্কলিত অথবা পুনঃলিখিত হয়, অগাধ ধীসম্পন্ন পতঞ্জলি পাণিনীর মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন, মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের অনেক ভাষ্য প্রণীত হয়। নাট্যশাস্ত্র নূতন আকারে লিখিত হয়, রামায়ণ এবং মহাভারত পুনঃসঙ্কলিত হইয়া বর্ত্তমান আকার লাভ করে। আর্য্যশাস্ত্রের অনুশীলন এবং প্রচার জন্য রাজকোষের অর্থ অজস্রধারে বর্ষিত হইত। অগ্নিমিত্রের মহিষী বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রতি মাসে আটশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেন। রাজকোষের কিরূপ বিপুল অর্থ ব্রাহ্মণ জাতির জন্য প্রদত্ত হইত, তাহা অগ্নিমিত্রের মহিষীর এই দানের পরিমাণ হইতেই অনুমিত হইতে পারে।

আর্য্যবিদ্যা এবং শাস্ত্রের উন্নতি।

মহারাজ পুষ্পমিত্রের কৃতকার্য্যে অশোক-প্রবর্ত্তিত দুইটি বিধানের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় সাধিত এবং ব্রাহ্মণের পূর্ণাঙ্গ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম, মনুসংহিতানুমোদিত দণ্ডবিধির প্রবর্ত্তন এবং দ্বিতীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পাদন।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপন, অশ্বমেধ যজ্ঞ।

অশোক জাতিনির্ব্বিশেষে দণ্ড এবং ব্যবস্থার সমতা প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু মনুসংহিতার দণ্ড ও ব্যবস্থায় ইহার বিপরীত নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে; তাদৃশ বিধি প্রচলিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ জাতি ভূদেবরূপে সম্মানিত হন, তাঁহাদের দণ্ডবিধান পঙ্গু হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে ধনসম্পত্তি সহ নির্ব্বাসনই সর্ব্বোচ্চ দণ্ড ছিল।

অশোক পশুহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে যজ্ঞক্রিয়ার বিঘ্ন হওয়াতে ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মচর্য্যা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পশুহত্যার পুনঃপ্রচলন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ জাতির ধর্ম্মচর্য্যার সমস্ত কণ্টক দূরীভূত করেন।

পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্যবিধ উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি আপন বিজয়শ্রী উজ্জ্বল এবং রাজগৌরব চরিতার্থ করিবার জন্যও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জয়শ্রী এবং রাজগৌরব নানা যুদ্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পুষ্পমিত্র রাজ্যাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রীক অধিপতি মেলান্দরকে প্রবল যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বীরেন্দ্র সমাজের বরেণ্য হন, তারপর আর দুইটি যুদ্ধে তাঁহার যশোরাশি বৃদ্ধিলাভ করে।

গ্রীক অধিপতি মেলান্দরের পরাজয়।

কাণ্ববংশ।

বাসুদেব রাজহত্যার পর মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, দেবভূতি তাঁহার হস্তে ক্রীড়ক মাত্র ছিলেন। বাসুদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কাণ্ববংশ নামে পরিচিত হয়। কাণ্বগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহারা ৩।৪ পুরুষ রাজত্ব করেন। তারপর অন্ধ্র বংশীয়েরা কাণ্ববংশের ধ্বংস করিয়া মগধ দেশের অধিকারী হন।

শেষ নরপতি বাসুদেবের হত্যা।

মহারাজ অশোকের পরবর্ত্তী কালের অধিকাংশ নরপতির রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; পুনঃ পুনঃ রাজবংশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের মূলেই সেনাপতি অথবা মন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজহত্যা সাধিত হইয়াছিল। তাদৃশ অবস্থা

মগধ-রাজশক্তির অধঃপতন।

ইহাই সপ্রমাণ করে যে, অশোকের সময় যে রাজগৌরবে মগধের মুখশ্রী উজ্জল হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে মলিন হইয়া পড়ে; দুর্ব্বলতা এবং জড়তা উপস্থিত হইয়া মগধের রাজশক্তিকে পতনোন্মুখ করে। যে রাজশক্তির অধিকারী হইয়া মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকবর্দ্ধন সমগ্র ভারতে আপনাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, মগধের রাজলক্ষ্মী অভিনব বিজেতৃ বীরবংশের আশ্রয় লাভ করিয়া পূর্ব্বশক্তি লাভ জন্ম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ সময়ে অন্ধ্রবংশের আবির্ভাব হইলে রাজলক্ষ্মী বাহু প্রসারণ করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করেন।*

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

* 1. Journals of the Asiatic Society of Bengal, 1910. 2. Asoka (Vincent A. Smith). 3. History of India (Sastri). 4. Ancient India (R. C. Dutt). 5. Buddhist India (Rhys Davids). 6. Ancient India (Vincent A. Smith) 7. Ancient India (Rapson). 8. অশোক (শ্রীচারুচন্দ্র বসু)। 9. Antiquities of India (L. D. Barnett).

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়-কৌশল।

কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে এমন একদিন ছিল যখন নাট্যলীলা অতি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইত। শুনিতে পাওয়া যায় রোমে নটগণ সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত হইতেন। স্থবির চীনে নটের তো কথাই ছিল না, তাহার বংশধরগণও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কোন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইত না। ইউরোপে তখন ইহাই ধারণা ছিল যে নাট্যলীলা সয়তানের রঙ্গ। ইউরোপ তখন মনে করিত যে পৃথিবীতে আসিয়া মানুষ হাসিবে কেন—আনন্দ উপভোগ করিবে কেন? মনুষ্যকে ভুলাইবার জন্ম হাসি তো সয়তানের কৌশল মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে কোন দিনই এরূপ ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।*

এখন পৃথিবীর সুধীসমাজ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সুমার্জ্জিত রঙ্গালয় সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ—নাটক প্রহসনাদি যুগবিশেষের ধ্যানধারণার কর্ম্ম ও চিন্তার প্রতিচ্ছবি। কোন কোন পণ্ডিত এই মানদণ্ডে তুলিয়াই বৃদ্ধ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিমাপ করিয়া কহিয়াছেন—It is only to nations considerably advanced in refinement that the drama is a favourite entertainment. †

জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত যাত্রাপথে যে জাতি যত অধিক অগ্রসর হয় ততই তাহার রুচি পরিমার্জ্জিত হইবার অবকাশ পায়। তাহারই হৃদয়ে শিল্পসৌন্দর্য্যবোধ, ললিতকলার প্রতি অনুরাগ নবোদ্ভিন্ন স্থলকমলবৎ প্রস্ফুটিত হয়। সেই জাতিই তখন বাণীর পূজায় আপন শক্তিসম্পদ সাধনা অকাতরে নিয়োগ করিয়া ধন্য হয়। এই মহাপূজার যজ্ঞবেদীর উপর অজন্তা বা ইলোরা, তপনায়তন বা দেবীমন্দির, তাজমহল বা মসুলিয়ম, শোভায় সম্পদে চিত্রে তক্ষণে, চূড়ায় গম্বুজে মিনারে চক্রে সজ্জিত হইয়া যুগধর্ম্মের প্রাণস্পন্দনের অলোকসামান্য সাক্ষীরূপে জগতের সম্মুখে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান থাকে। পৃথিবীর নরনারী তখন মস্তকে বহিয়া অর্ঘ্য আনিয়া ভক্তের ন্যায় তাহাদেরই চরণতলে নিবেদন করিয়া ধন্য হয়। এ পূজা সৌন্দর্য্যের পূজা—ইহা বিশ্বদেবতার চরণারবিন্দে বিমুগ্ধ মানবের আত্মনিবেদন।

প্রকৃতির কুঞ্জকানন হইতে মানুষ যেমন প্রস্ফুটিত স্থলকমল চয়ন করিয়া পাষাণের কঠিন বক্ষে স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হয়, আকাশের তারার হার তুলিয়া চিত্রপটে গ্রথিত করিয়া তুলিকা সার্থক করে,—অপার জলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে বর্ণে ভাবে গাম্ভীর্য্যে লিখিয়া সাধন-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে স্থাপন করিয়া অসীমকে

* Robertson's India.—Appendix, p. 235.

† The Hindu Actors were never apparently classed with vagabonds or menials and were never reduced to contemplate a badge of servitude as a mark of distinction.—The Hindu Theatre; H. H. Wilson.

বুঝিতে জানিতে চিনিতে চেষ্টা করে—তেমনি রঙ্গালয়েও সে আপনারই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মপরিচয় লাভ করে। রঙ্গপীঠ তাই আত্মজিজ্ঞাসার অন্যতম পাদপীঠ। আত্মপরিচয় লাভের যোগ্য মন্দির আর এমন নাই। ইহাকে কেহ আর অস্বীকার করিতে পারে না—ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কেহ আর বলিতে পারে না যে আমি আমাকে তো দেখিলাম না।

ভারতের কাব্যনিকুঞ্জে কোকিল পাপিয়ার কলতান যখন ক্রমে ক্রমে মৃদু হইতেছিল, ভারত-রঙ্গগৃহে যখন রবাব, মুরজবীণা একে একে স্তব্ধ হইতেছিল—প্রতীচ্য রঙ্গলীলার তখন উষা মাত্র। পণ্ডিত H. H. Wilson তাই বলিয়াছেন—The nations of Europe possessed no dramatic literature before the 14th or 15th century, at which period the Hindu drama had passed into its decline. * তবুও Weber সাহেবের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি আমাদের রঙ্গমঞ্চ ধারের জিনিষ—আমাদের নহে।

যে দেশের বাণী বীণাবাদিনীরূপে পরিকীর্ত্তিতা, যে দেশের নৃত্যকলা নটনারায়ণের লাস্যলীলা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে সে দেশের রঙ্গসজ্জার জন্য শুধু পরের হাটের পসরার উপর নির্ভর করিলে, কেবল যে লজ্জাকেই বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা নহে! পিতৃপিতামহের অধুনা উপেক্ষিত রত্নাধার সন্ধান না করিয়াই তনুরক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র করে পরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভের জন্য দীননেত্রে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে বংশগৌরবকে একান্ত ক্ষুণ্ণ ও লাঞ্ছিত করা হয়।

আর্য্য মনীষিগণ ধর্ম্ম দিয়া জীবনযাত্রাকে বাঁধিয়াছিলেন, কর্ম্ম দিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কি গৃহে, কি সমাজে—কি তপস্যায়, কি প্রিয়-পরিচর্য্যায়—আর্য্য ভারতে কোন স্থানেই কোন কার্য্যেই উচ্ছৃঙ্খল হইবার উপায় ছিল না। কোন্ স্রোতঃ কোন্ খাতে বহিবে, তাহা শুধু তত্ত্বদর্শীর মানসচক্ষু দর্শন করিয়াছিল। সমাজের সকলের সে সৌভাগ্য ছিলনা—কোন দিনই থাকে না। তাই প্রতি কার্য্যের জন্যই বিধিনিয়মের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। নিরঙ্কুশ কবি পর্য্যন্ত সেই বিধির বিধানে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে রচনাশ্রী খর্ব্বতা লাভ করে নাই বরং উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিয়াছিল—সার্থকতা লাভ করিয়া সমাজের শক্তি ও কল্যাণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। নাট্যকলা ভাবতরঙ্গের নৃত্যলীলা। ভাগীরথী-তরঙ্গে একটী মাত্র ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল—ভাবতরঙ্গে সহস্র ঐরাবত ভাসিতে পারে। সেই ভাবের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, সেই ভাবই যাহার প্রাণ, সেই নাট্যকলাকে শোভনা ও সফলা করিবার নিমিত্ত নটদিগকেও সংযত করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া ভারতে নাট্যশাস্ত্রের এরূপ প্রচার হইয়াছিল যে উহা 'পঞ্চমবেদ' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

সঙ্গীত দামোদরে লিখিত আছে—

ইহানুশ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেণাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্যবেদন্তু পঞ্চমম্॥

নাট্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমে ভারতবর্ষে সুরসংযোগে কথোপকথনের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের চতুর্দ্দশটী সূক্ত এই ভাবে বিরচিত বা "এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের আকারে গ্রথিত।" [প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ম, ১৭০ম, ১৭৯ম; তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩শ, চতুর্থ মণ্ডলের ১৮শ, সপ্তম মণ্ডলের ৩৩ শ, অষ্টম মণ্ডলের ১০০ম এবং দশম মণ্ডলের ১০ম, ২৮শ, ৫১শ, ৫৩শ, ৮৬শ, ৯৫শ ও ১০৮ম সূক্ত।] প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ ম সূক্ত পাঠ করিলে দেখা যায় ইন্দ্র, অগস্ত্য ও মরুদ্গণের কথোপকথন হইতেছে। ম্যাক্সমূলার অনুমান করিয়াছেন যে ভারতের দৃশ্যকাব্যের ইতিহাস বীজরূপে এই সূক্তেই নিহিত রহিয়াছে।

পাণিনির সূত্রে কয়েকজন নটের পরিচয় আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"পারাশর্য্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ। কর্ম্মন্দ কৃশাশ্বাদিভিঃ॥" (৪.৩।১১০-১১১)। শিলালির উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে ও অনুপদসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে শিলালি হইতে

* Theatre of Hindus, Vol. I.

সমুৎপন্ন শৈলাল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বাজসনের সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়—

নৃত্যায় সুতং গীতায়শৈলুষং ধর্ম্মায় সভাচরং"।

শৈলুষ শব্দে নটকেই সূচিত করে। মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে নটজাতিরই স্বতন্ত্র উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কাহারো অবিদিত নাই যে রামায়ণে ও মহাভারতে নাটকের উল্লেখ আছে। হরিবংশেও নাটকের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। "হরিবংশে রোমক মুদ্রা ডিনারিয়াসের অপভ্রংশ দিনার শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টাব্দের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে উহা মূল মহাভারতের সহিত সংযোজিত হয়।" * পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে নাট্য প্রয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকর বলেন, "বাহ্লিক প্রদেশের যবনরাজ মিনান্ডার এবং মৌর্য্যরাজ্যের উচ্ছেদকারী ও বৌদ্ধগণের উৎপীড়নকারী পুষ্পমিত্র, পতঞ্জলীর সমসাময়িক। এই যবন বাহ্লিক-রাজ্য খৃঃ পূঃ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক সাতান্ন বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতএব পতঞ্জলী ঐ কালের কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থে যখন নাট্য প্রয়োগের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বেও উহা প্রসিদ্ধ ছিল।" † শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুমান করেন "রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে যদিও রঙ্গভূমি, রঙ্গস্ত্রী, নাট্যাগার, নাট্যালয় প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সমস্ত নৃত্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত……কেননা, রামায়ণ ও মহাভারতে সূত্রধার, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পারিভাষিক নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—কেবল পাওয়া যায় এক হরিবংশে।" ‡

এই মত বিচারসহ কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গে একসঙ্গে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামানুজ ভরতের শান্তি বিধানের জন্য কেহবা—

বাদয়ন্তি তদাশান্তিং লাসয়ন্ত্যপিচাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানিচ॥

অধ্যাপক ওয়েবার অনায়াসে বলিয়াছিলেন রামায়ণের কাহিনী গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত। তিনি সীতাহরণ ও রামরাবণের যুদ্ধ হেলেন সুন্দরীর অভিসার ও ট্রোজন যুদ্ধের ছায়া বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই, সীতালাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ ইউলিসিসের শৌর্য্যবর্ণনা হইতে গৃহীত বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অধুনা শিক্ষিত সমাজে এই অভিমত বোধ হয় আর প্রচলিত নাই। থাকিলে তাঁহাদিগের জন্য অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একজন ফরাসীর লিখিত The Bible in India নামক গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"The Olympus of the Greeks is but a reproduction of the Hindu Olympus. The legend of Jason and the Golden Fleece is still in every mouth on the soil of India; and the Iliad of Homer is nothing but an echo, an enfeebled souvenir of the Ramayan, a Hindoo poem in which Rama goes at the head of his allies to recover his wife, Sita, who had been carried off by the king of Ceylon." *

রামায়ণে দুইবার "যবন" শব্দ পাওয়া যায়। যবন অর্থে সেকালে গ্রীকদিগকে বুঝাইত। অধ্যাপক জ্যাকবি (Jacobi) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এই বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক ম্যাকডোনেল তাঁহার 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের একস্থানে কহিয়াছেন—An examination of the poem shows that the Javans (Greeks)

* প্রবন্ধ-মঞ্জরী—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
† ঐ
‡ ঐ

* The Bible in India.—M. Louis Jacolliot, p. 32.
—Panini Office Edition, 1916.

are only mentioned twice, once in Book I and once in a canto of Book IV, which Professor Jacobi shows to be an interpolation. The only conclusion to be drawn from this is that the additions to the original poem was made sometime after 300 B. C."*

অধ্যাপক ল্যাসেন 'এসিয়াটিক রিসার্চ' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে গৌতম বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় নাট্যাভিনয় সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "প্রবন্ধমঞ্জরী"তে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মগ্রন্থে সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা, বরং ব্রাহ্মণেরা লোকশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছিল; নানাপ্রকার লোকচিত্তহারী আখ্যানাদি বিবৃত করিয়া বৌদ্ধেরা বর্ণনিরপেক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে নীতিধর্ম্ম প্রচার করিতেন; পরে সময়ে সময়ে যখন হিন্দুরাজার আধিপত্য হয় সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধদিগেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুগত লোকশিক্ষার নানা প্রকার ব্যবস্থা করেন। সেই সময়েই বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান মূল-মহাভারতে রামায়ণের মধ্যে সংযোজিত হয় এবং দেবদেবী, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া সেই সময়েই নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভ হয়।" এই স্থানে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "প্রবন্ধ-মঞ্জরী" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন :—

"সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই যে ভারতে নাট্যবিদ্যার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে আছে :—কোন সময়ে অনধ্যায়কালে আত্রেয়প্রমুখ মুনিগণ নাট্য-কোবিদ ভরত মুনিকে নাট্যবেদ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন,—'সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড যখন গ্রাম্যধর্ম্ম-প্রবৃত্ত কামলোভের বশীভূত হইল, ত্রিলোক যখন ঈর্ষা-ক্রোধ-বিমূঢ় ও সুখদুঃখে বিচলিত হইল, দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষাদির দ্বারা যখন লোকপাল-প্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ সমাক্রান্ত হইল, তখন ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমরা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক পাইতে ইচ্ছা করি যাহা দৃশ্য ও শ্রাব্য উভয়ই হইবে। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া যোগস্থ হইলেন এবং যাহাতে শূদ্রজাতিরও শ্রাব্য হয় এই অভিপ্রায়ে এই নূতন পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন।' বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা বর্ণ-নিরপেক্ষ লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ নাটক ও নাট্য-প্রয়োগের সৃষ্টি করেন। নাট্য-প্রয়োগ লোকশিক্ষার কিরূপ উপযোগী এবং তাহার দ্বারা কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, তাহাও নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—'এই নাট্যে কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য ও কোথাও বা যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তের ধর্ম্ম, কামীর কাম, দুর্বিনীতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবোধের বিরোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, রাজার বিলাস ও দুঃখার্ত্তের স্থৈর্য্য, নানাবস্থার নানা ভাব এই নাট্যে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা লোক-চরিত্রের অনুসরণ। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকেরই কার্য্য ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হিতোপদেশপূর্ণ। ইহা দুঃখার্ত্তের ধৈর্য্যসম্পাদক ও শোকার্ত্তের সুখজনক। বলিতে কি, ইহা সকলেরই চিত্তবিনোদন করিবে। এই নাট্যে যাহা না দৃষ্ট হইবে এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই; এমন কার্য্যই নাই।"

য়ুরোপের প্রধান নাট্য-সমালোচক শ্লেগেল একস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি নহে কি? তিনি বলিয়াছেন—'নাট্যালয়ে অনেক কলাবিদ্যা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ফলোৎপাদন করে;

* A History of Sanskrit Literature.
—Arthur A. Macdonell.

উচ্চতম ও গভীরতম কবিত্ব, সম্পূর্ণ সমাপ্ত কার্য্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। বাস্তুবিদ্যা নানা প্রকার সমুজ্জ্বল ভূষণে উহাকে ভূষিত করে, চিত্রবিদ্যা দূর-নৈকট্যের বিভ্রম উৎপাদন করে, চিত্ততন্ত্রীতে সুর বাঁধিয়া চিত্তের আবেগ আন্দোলন বর্দ্ধিত করে। সকল বিদ্যাই উহাতে কিছু-না-কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকে। কোন জাতির মধ্যে শত শত বর্ষ হইতে যাহা-কিছু সামাজিক উন্নতি, কলাসম্বন্ধীয় যাহা-কিছু বিদ্যাসম্পদ বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্তই দুই চারিঘণ্টার মধ্যে নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হয়। তাই, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি উচ্চ, কি নীচ—সকল ব্যক্তির পক্ষেই নাট্য-প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক এবং ইহাই সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতি-মাত্রেরই চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়। নাট্যালয়েই কি রাজা, কি সেনাপতি, অতীত ঘটনাসকল তাঁহাদের নিজ কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন এবং সেই সকল কার্য্যের অন্তরতম সূত্রস্থান ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। এমন কি, তত্ত্ব জানিয়াও এই নাট্য-প্রয়োগে মানব প্রকৃতি-সম্বন্ধে গভীরতম চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হন।' শ্লেগেলের উক্তি এবং আমাদের নাট্যশাস্ত্রের উক্তি পাঠ করিলে কি ইহাই মনে হয় না যে একটী যেন অপরটীর প্রতিধ্বনি? তবুও য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে "এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ-গঠিত নাট্য-সাহিত্য" কোন "স্বাভাবিক নিয়মে ভারত-ভূমিতে" উৎপন্ন হয় নাই।

যে যুগে রঙ্গালয় ভারতের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল, সে যুগে নাটকাদির সংখ্যা যে অনেক অধিক ছিল ইহা এখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। Sir Wiliams Jones তাই কহিয়াছেন—"The tragedies, comedies, farces and musical pieces of the Indian theatre, would fill as many volumes as that of any nation in ancient or modern Europe."

সেকাল এমন ছিল যখন দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাজকবিগণ নাটক রচনা করিয়া জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করিতেন। বরেন্দ্র মণ্ডলের বিপুল পরাক্রান্ত নরপতি মহীপাল দেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে চণ্ডকৌশিক নাটক রচিত হইয়াছিল, মাতৃগুপ্তের রাজসভায় অভিনীত হইবার জন্য হয়গ্রীব-বধ নাটক বিরচিত, নটদিগের অনুরোধে উত্তর-চরিতের রচনা। সুবিখ্যাত পর্য্যটক ইৎ-সিংএর অভিনন্দন ভারতের বহু রঙ্গালয়ে পরম সমাদরে সংঘটিত হইয়াছিল, বিজয়োন্মত্ত জয়াপীড় বরেন্দ্রের রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

নাট্যকলা যে যুগে ভারতে এতাদৃশ সমাদর লাভ করিয়াছিল সে যুগে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের বিধিনিয়ম গঠন করিবার আবশ্যকতা যে অনুভূত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপ নিয়ম-নিগড় রচনা না করিলে নট ও নাটকের উচ্ছৃঙ্খল পথে ধাবিত হইয়া সমাজের অকল্যাণকর হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত-দামোদর, দশরূপক, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, শিলালীর নাট্যসূত্র প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যেত ভরতের নাট্যশাস্ত্রই প্রধান আসন লাভ করিয়াছে।

শুনিতে পাওয়া যায় দেবতাদিগের রঙ্গালয়ে ভরত নাট্যশিক্ষক ছিলেন। সৌষ্টবসম্পন্ন অভিনয়ের জন্য তিনি সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। অধুনা প্রমাণের যুগ। এ যুগে প্রমাণহীন উক্তি কাহিনীরূপে অনাদৃত। সুতরাং এ কাহিনী কাহাকেও বিশ্বাস করিতে বলি না।

অধ্যাপক Arthur A. Macdonell তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন, ভরতের নাট্যশাস্ত্রই নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বটে কিন্তু উহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত। [The oldest and most important word on poetics is the Natya Castra of Bharat, which probably goes back to the sixth century A.D.] সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার "ঐতিহাসিক প্রবন্ধে" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভরত মুনি মহর্ষি বাল্মীকির সমকাল-জন্মা। বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ের

মীমাংসা করিতে পারিবেন। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে ভরতের যুগে দেশে নাটকাদির বহুল প্রচলন না থাকিলে রঙ্গালয়গুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, সৌষ্টবসম্পন্ন অভিনয়-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনার আবশ্যকতা অনুভূত হইত না।

এ দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, যাহাই ভারতবর্ষের—যাহাই সেই কাননবিহারী ফলমূলাহারী জটাবল্কলধারী ঋষিদিগের রচিত—তাহা আর এই সুসভ্য যুগে চলিতে পারে না; তাহা একান্ত জীর্ণ, নিতান্তই অসমীচীন এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধ-শূন্য যুক্তিহীন ভিত্তিহীন কতকগুলি অত্যুক্তি মাত্র। আমরা আর এক শ্রেণীর এরূপ আছি যাহারা মনে করি ঋষি-সূত্রে কোন তত্ত্ব নিহিত থাকা অসম্ভব নহে—কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতে যদি সে তত্ত্ব গ্রহণ বা অনুমোদন না করিয়া থাকেন তবে আমরা উহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। বহুশত বৎসর পূর্ব্বেই প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বাণিজ্যের পথে বিজয়ী সৈন্যের রণদুন্দুভির পশ্চাতে পশ্চাতে সে মিলন-ধারা প্রবাহিত হইয়া উত্তর ভারতকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। পশ্চিম ভারতে দুই শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক রাজদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত পাটলীপুত্রের রাজসভায় গ্রীক রাজদূতগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের একটী ধারা পুণ্যশ্লোকা নর্ম্মদার মুখ হইতে বাহির হইয়া আলেকজেন্দ্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান ব্রোচনগরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিল বটে, সেই বাণিজ্যের জন্যই রোমের সহিত উজ্জয়িনীরও সম্মিলন ঘটিয়াছিল। ইহাও সত্য যে গ্রীক রমণীগণ ভারতবর্ষের রাজান্তঃপুরে মহিলাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত। এসকলই সত্য। এইসকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক Weber বলিয়াছেন যে পঞ্চনদে এবং গুর্জ্জরে গ্রীক রাজন্যদিগের সভায় নিশ্চয়ই গ্রীক নাটকের অভিনয় হইত, ভারতবর্ষীয়গণ তাহারই অনুকরণ করিয়াছে। তিনি আরও কহিলেন, "যবনিকা" শব্দ হইতেই সূচিত হইতেছে যে উহার অর্থ "Greek Partition", সুতরাং ভারতের নাট্যকলা নিশ্চয়ই গ্রীক নাট্যকলার অনুকরণ। তবে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে গ্রীসের ও ভারতের কাব্যনাটকাদিতে অন্তর্নিহিত কোনো সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। *

অধ্যাপক Weber যখন একথা বলিয়াছেন তখন উহা আমাদের না মানিয়া উপায় কি! অধ্যাপক Weber এর সঙ্গে সঙ্গে যখন অধ্যাপক Windirch কহিলেন যে তিনি চেষ্টা করিলে মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে এমন প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন যে ভারতের নাট্যকলা গ্রীসের অনুকরণ মাত্র, তখন তো উহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই অনুকরণের বোঝাটাকে শিরোধার্য্য করিবার পূর্ব্বে একথা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে যে অধুনা প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাচীন হিন্দুনাট্যের রচনাকাল হইতে গ্রীকনাট্যের রচনাকাল অন্ততঃ সুদীর্ঘ চারিশতাব্দী ব্যবধান? [The earliest Sanskrit plays extant are, moreover, separated from the Greek periods by at least four hundred years. —Sanskrit Literature : Macdonell, p. 416.]—ইহাও কি চিন্তার বিষয় নহে যে গ্রীক রঙ্গালয়ের শৈশবে কোন যবনিকার ব্যবস্থা ছিল কিনা তাহা এখনো নিশ্চিত রূপে জানা যায় নাই? [The name of the curtain, yavanika, may, indeed, be a reminiscence of Greek plays actually seen in India ; but it is uncertain whether the Greek theatre had a curtain at all ; in any case, it did not form the background of the stage.—Sanskrit Li-

* The existence of such conditions has induced Professor Weber to believe that the representatives of Greek plays, which must have taken place at the courts of Greek princes in Bactria, in the Panjab, and in Gujarat, suggested the drama to the Indians as a subject for imitation. Their theory is supported by the fact that the curtain of the Indian stage is called Javanika or the "Greek partition." Weber at the same time admits that there is no internal connection between the Indian and the Greek drama.
—Sanskrit Literature ; Macdonell, p. 415.

terature : Macdonell, p. 416.]. আমরা একান্ত অনুসন্ধান-স্বাতন্ত্র ও পরমুখাপেক্ষী না হইলে এরূপ বলিব কেন ?

অধ্যাপক Macdonell বলিয়াছেন যে ভারতের নাটক সম্পূর্ণরূপেই ভারতের নিজস্ব। [The Indian drama has had a thoroughly national development, and even its origin, though obscure, easily admits of an indigenous explanation.—Sanskrit Literature : Macdonell, p. 416.].—তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদের আজ আলোচ্য নহে। পণ্ডিত Wilson বলিয়াছেন—The attribution of dramatic performances to Bharat is no doubt founded upon his having been one of the earliest writers by whom the art was reduced to a system. His sutras or aphorisms are constantly cited by commentators on different plays and suggest the doctrines which are taught by later authors.

উইলসন সাহেব বহু আয়াস স্বীকার করিয়া কতকগুলি সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে কাশী কাঞ্চি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তিনি একখানিও সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র দেখিতে পান নাই বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন—হয়ত বা ভরত নামে কোন সূত্রকারই ছিলেন না। তাঁহার নাম দিয়া সময়ে সময়ে নানা পণ্ডিত নানাসূত্র রচনা করিয়া থাকিবেন। উইলসনের এ উক্তি সমর্থিত হয় না। যে গ্রন্থ একদিন সমগ্র ভারতের রঙ্গালয়গুলিকে একনিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিল, লজ্জার সহিত বলিতে হয় যে সে গ্রন্থের অংশবিশেষ, এ দেশের অনেক সৌভাগ্যের ন্যায় আপন জন্মক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া প্যারিস্ নগরীর কোন রঙ্গমঞ্চের আচার্য্যের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের সুধীসমাজের চেষ্টায় La Musique Hindoo নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধরিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

ভরত মুনির যুগ নির্ণয় করিবার কালে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভরত মুনির নাট্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া যে নাট্য-শাস্ত্রগ্রন্থ কোন এক সময়ে প্রণীত হয়, তাহাই অধুনা ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র নামে খ্যাত। ভরতের নাট্য-সূত্র বলিয়া আর কোন পৃথক গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ... ... প্রথমে দেখা যাউক এই গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত। ইহার একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

উৎসার্য্যানি ত্বনিষ্টানি পাষণ্ডাশ্রমিনস্তথা।
কাষায় বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব নরাঃ॥

অর্থাৎ "অনিষ্টসমূহ এবং কাষায় বসন, পাষণ্ডাশ্রমী ও বিকল মনুষ্যদিগকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিবে।" এখানে কাষায় বসন, পাষণ্ডাশ্রমী বলিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকেই বুঝান হইয়াছে।

আর একস্থলে আছে—

যাবত্তং পূরয়েদ্দেশং ধ্বনি-র্নাট্য সমাশ্রয়ঃ।
ন স্বাস্তি হি রক্ষাংসি তং দেশং ন বিনায়কাঃ॥

অর্থাৎ, "যাবত কোন দেশ নাট্য-সমাশ্রিত ধ্বনির দ্বারা পূরিত হইবে, তাবৎ সে দেশে রাক্ষসেরাও থাকিবেনা, বিনায়কেরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরাও থাকিবেনা।"—এইসকল হইতে সূচিত হয় যে এই নাট্যশাস্ত্র বৌদ্ধযুগে বিরচিত। মৃচ্ছকটিক নাটক খৃষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। H. H. Wilson মৃচ্ছকটিক নাটকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Mrichhakatic is as yet the only work where the Bauddhas appear undisguised. Now we know from the Christian writers of the second century, that in their days the worship of 'Butta' or 'Buddha' was very prevalent in India. We have every reason to believe, that shortly after that time the religion began to decline, more in consequence of the rise and growth of the Jains, probably, than

any persecution of the Bauddhas ; and as it is clear that the drama was written in the days of their prosperity, it follows that we cannot fairly assign it a later date than the first centuries of the Christian Era.

From the considerations thus stated, we cannot but regard the Mrichhakati as a work of considerable antiquity, and from internal evidence may very safely attribute it to the period when 'Sudrak', the sovereign, reigned, whether that be reduced to the end of the second century after Christ, or whether we admit the traditional chronology, and place him about a century before our era."

ঐ মুখবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—

"The most unquestionable proof, however, of high antiquity, is the accuracy with which Bauddha observances are adverted to, and the flourishing condition in which the members of that sect are represented to exist. There is not only absolute toleration, but a kind of public recognition ; the ascetic who renders such essential service to the heroine being recommended or nominated by authority, chief of all the 'Vihars' or Bauddha establishments of Ujayin."

দশম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ইহার উল্লেখ আছে। আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রিয়ামুখ-দর্শনে পুলকিত চারুদত্তকে সর্ব্বিলক জিজ্ঞাসা করিল —What shall we do for this good mendicant ?

চারুদত্ত কহিলেন—Speak, Sramanak your wishes.

সংসারত্যাগী শ্রমণক. উত্তর করিলেন—

To follow still the path I have selected,
For all I see is full of care and change.

চারুদত্ত বলিলেন—Since such is his resolve, let him be made chief of the monasteries of Bauddhas. *

শ্রমণক সম্বাহক তদবধি উজ্জয়িনীর বিহারগুলির কুলপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সকল অবস্থা হইতে ইহাই অনুমান করিতে পারা যায় যে, যে সময় মৃচ্ছকটিক নাটক রচিত হইয়াছিল, সেই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। জনসাধারণ হিন্দুধর্ম্মের অনুগমন করিয়াও বৌদ্ধ রীতিনীতিকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দর্শন করিত। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমান করেন যে ভরতের নাট্য-শাস্ত্র মৃচ্ছকটিকের কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

দর্দ্দুর নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল। নাট্যশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ বিশেষরূপে দেখা যায়। "এই দর্দ্দুর বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না, এমন কি হরিবংশেও পাওয়া যায় না।" † মৃচ্ছ-কটিকে দর্দ্দুরের উল্লেখ আছে।

নাট্যশাস্ত্রের আহার্য্যাভিনয় অধ্যায়ে দেখা যায়—

উত্তর পশ্চিম দিক্‌বাসী শক, পহ্লব ও বাহ্লিকাশ্রিত যবনদিগের অভিনয়কালে অভিনেতাকে গৌরবর্ণ হইতে হইবে।—

শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাশ্রয়া।
প্রায়েন গৌরাঃ কর্ত্তব্যা উত্তরাং পশ্চিমাং দিশাম্॥

গ্রীকদিগের এই বাহ্লিক রাজ্য খৃঃ পূঃ সার্দ্ধ দুইশত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ সাতায় বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা নির্দ্ধারণ করেন। সুতরাং শক ও যবনের উল্লেখ দেখিয়া ইহাই অনুমান হয় যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন মৃচ্ছকটিক নাটকের জন্মসূচনাও হয় নাই। য়ুরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের নাট্যকলার জন্ম ইহার কতকাল পরে ঘটিয়াছে! সুতরাং মহারাণী এলিজাবেথের যুগের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কোন প্রতিষ্ঠিত

* The Toy Cart.—H. H. Wilson.

† প্রবন্ধমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাট্যশালা ছিল না বলিয়া যে মধ্যযুগে ভারতবর্ষেও তাহা ছিল না এরূপ অনুমান আদৌ বিচার-সঙ্গত নহে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিবার নিয়মাবলী বিস্তারিত লিখিত রহিয়াছে।

কিন্তু H. H. Wilson বলিয়াছেন—

"The Hindus never had any building appropriated to public entertainments; they could not, therefore, have had any complicated system of scenery or properties......there is no reference to any separate edifice for such purposes, open to the public, either gratuitously or at a charge, and such an institution would be foreign to the state of society in the East, which in many respects certainly was not advanced beyond that of the middle ages in Europe, when minstrels and mimes were universally strollers, and performed in the halls of baronial castles, or in booths at fairs. In England, *even*, (এই স্থলে এই "even" শব্দটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন) there appears to have been no resident company of players, or permanent theatre, earlier than the reign of Elizabeth."

নাট্যশাস্ত্র হইতেই ইতিপূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি—

উৎসার্য্যানি ত্বনিষ্টানি পাষণ্ডাশ্রমিনস্তথা।
কাষায় বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব নরাঃ॥

"অনিষ্টসমূহ এবং কাষায়বসন পাষণ্ডাশ্রমী ও বিকল মনুষ্যদিগকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিবে।"

নাট্যাভিনয় সেকালে শুধু রাজার সঙ্গীতশালাতেই ঘটিত, সে স্থানে যাহার তাহার প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং অনিষ্টসমূহ ও বিকলাঙ্গ প্রভৃতির তো আদৌ ছিল না। তাহা হইলে এরূপ নির্দ্দেশের কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে এই গ্রন্থে অভিনয়-কৌশল সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা আছে তাহা হইতে ইহাই মনে হয় যে দেশে নাট্যের বহু প্রচলন না থাকিলে এরূপ আলোচনার অবকাশ ঘটে না। সুতরাং H. H. Wilsonএর নিম্নলিখিত উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না—

"We should never forget, in speaking of the Hindu Drama, that its exhibition...was not an ordinary occurrence, or an amusement of the people, but that it was part of an occasional celebration of some solemn or religious festival."

নাট্যশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, নাটক কাহাকে বলে তাহাই বুঝা প্রয়োজন। দার্শনিক শ্লেগেল বলিয়াছেন—আনন্দ উপভোগ করিবার যতগুলি উপায় আছে, অভিনয় দর্শনই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা নিজেরা জীবনে যাহা করিতে পারি না, রঙ্গালয়ে তাহাই ঘটিতেছে দেখিয়া বিমুগ্ধ হই। রঙ্গপীঠে আমরা সাধুকে দেখি, তস্করকে দেখি, হিংসা, দ্বেষ, রোষ, প্রেমপ্রীতি, ভক্তি, সমস্তই রঙ্গালয়ে জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয়। তাই অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা নরজীবনের সার্থকতা অনুভব করিতে পারি। নরচরিত্রে যাহা কিছু দেখিবার আছে, রঙ্গালয় সে সমস্তই আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়।

Schlegel এর বহুশতবৎসর পূর্ব্বেই হিন্দু নাট্যশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

ন তৎ শ্রুতং ন তৎ শিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগঃ ন তৎ কর্ম্ম যন্নাট্যেস্মিন ন দৃশ্যতে॥

—এমন শ্রুতি নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম্ম নাই, যাহা নাট্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। রঙ্গালয় তাই শুধু রঙ্গের নিলয় নহে, বিদ্যার আলয়—শিক্ষার মন্দির। লোকশিক্ষার পুণ্যব্রত সেকালে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই যজ্ঞভূমিকে সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কাব্যই সেই বিরাট যজ্ঞের বেদ, কবি তাহার ঋক্-প্রণেতা, নাট্যাচার্য্য পুরোহিত এবং কুশীলবগণ তন্ত্রধারক। শিক্ষার সে

বীজমন্ত্রকে প্রাণ দিয়া, মূর্ত্তি দিয়া, তাহাকে সুবেশ-সজ্জিত করিয়া প্রিয়পরিজনের ন্যায় রঙ্গপীঠে উপস্থিত না করিয়া সকলে মন্ত্রধারণ করিতে সক্ষম হয় না—কারণ সমাজ বিবুধমণ্ডলীর সভা নহে, পণ্ডিতের সভা নহে, যোগীর কাননাশ্রম নহে। নাট্য তাই সংস্কৃত সাহিত্যে "চতুর্ব্বর্গদ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনুষ্যের জীবন-যাত্রার সহিত যাহার এত নিকট সম্বন্ধ তাহার পাদপীঠ শ্লথ-বিন্যস্ত হইলে সে মন্দির কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? তাই হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের প্রধান ও প্রথম নির্দ্দেশ—"হিতোপদেশজননং"। সংস্কৃত নাটক যে বিয়োগান্ত দেখিতে পাই না ইহা তাহার অন্যতম কারণ। অনেকেই হয়ত "বলিদান" নামক নাটকের অভিনয় দেখিয়া থাকিবেন। নায়ক করুণাময় কন্যাগুলির বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন—শেষে জামাতার দুর্ব্ব্যবহার তাঁহাকে এমন আঘাত করিয়াছে যে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আত্মসংযমের অভাবে যে মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহার চিত্র প্রদর্শন করিলে পাছে যদি একজনও সেই পথকে শুদ্ধ বিবেচনায় গ্রহণ করে, তাই হিন্দু নাট্যশাস্ত্র বিয়োগান্ত নাটকের অনুমোদন করে নাই। Rev. I. E. Smith এর কথা এই স্থানে মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

The task of an actor is a peculiarly hard one, he bears not only his own faults but the very fault of his judges.

ইংরাজ নট বলিয়াছেন—প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে সুদক্ষ অভিনেতা হইবার উপায় নাই। এমন কি সংসারে কদাচিৎ যাহা ঘটে নটকে তাহাও দেখিয়া অভিজ্ঞ হইতে হইবে। [The actor ought to seize all occasions of observing nature, even in those effects which are unfrequent in their occurrence; and he should never lose sight of the main end and grand design of his art, by shocking the spectator with too coarse or too servile an imitation.]

এ কথা যে আমরা আজ য়ুরোপীর নাট্যশালা হইতে শিখিতেছি তাহা নহে। ভরত মুনি বাল্মীকির যুগে বলিয়া গিয়াছেন—'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতৎ ভবিষ্যতি'—লোকস্বভাবের অনুকরণই সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশুদ্ধ অভিনয় বলিয়াই নটগুরু ভরত অভিনেতাকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন—

"তথা লজ্জাকরং তু যৎ, এবংবিধং ভবেৎ যৎ যৎ তত্তৎ রঙ্গে ন কারয়েৎ। কেন? না—

পিতৃ পুত্র স্নুষা শ্বশ্রু দৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকম্।
তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ॥

তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে হিতোপদেশ জননের জন্য যে নাট্যমন্দির গঠিত হইবে, সে মন্দিরের রত্নবেদীর উপর অধিষ্ঠিত হইয়া যাঁহারা মন্ত্র পাঠ করিবেন তাঁহারা পিতাপুত্র, ভ্রাতভগ্নী, পতিপত্নীর শিরেই শান্তিবারি বর্ষণ করিবেন। তাই লোকস্বভাবের অনুকরণ হইলেও অভিনয় ব্যাপার নাট্যধর্ম্মী—লোকধর্ম্ম নহে। নাট্যমন্দিরের রত্নবেদী হইতে যে মন্ত্রের ধ্বনি উঠিয়া সমাজের হৃদয়ে আঘাত করিবে সে মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতি ও রুচির হোমবারি-স্পর্শে পবিত্র না হয় তাহা হইলে উহা সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। আমরা আমাদের সনাতন আদর্শ ত্যাগ করিয়া সবলে পরের আদর্শকেই আপন করিবার চেষ্টা করিতেছি তাই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া মধ্যে মধ্যে আন্দোলন ও আলোচনা দেখা যাইতেছে। যে ভূখণ্ডের Turkey Trot নামক নৃত্য-লীলাকে আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে—নতুবা সমাজের শীলতা রক্ষা ঘটে না—তাহার নিকট হইতে নৃত্য শিক্ষা করা কি বিড়ম্বনা নহে?

হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের বন্ধন যে কেবল নটদিগকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, কবিকেও নিরঙ্কুশ হইতে দেয় নাই। নাট্যাচার্য্যের আসন কবিরও উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাব্য হীনাঙ্গ হইলে নাট্যাচার্য্য তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতেন। কারণ, অঙ্গহীন মানব যেমন

কার্য্যক্ষম নহে, অঙ্গহীন কাব্যও তেমনি শোভান্বিত হইতে পারে না।

অঙ্গহীনো নরো যদ্বৎ নৈবারম্ভক্ষমোভবেৎ।
অঙ্গহীনং যদা কাব্যং ন প্রয়োগক্ষমং ভবেৎ॥
কাব্যং যদপি হীনার্থং সম্যগঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
দীপ্তত্বাত্ প্রয়োগস্য শোভামেতি ন সংশয়ঃ॥

সুতরাং ইংলণ্ডের John Lawrence Toole প্রবর্ত্তিত দর্শক-মনোমোহন অভিনয় সেকালে করিবার পথ রুদ্ধ ছিল। সেই রুদ্ধ তোরণ মুক্ত হইয়া এখন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ এবং তাহাদের অনুকরণে পল্লীগ্রামের রঙ্গালয়গুলিও উৎকট অভিনয়লভ্য বিকট করতালির রবে নিত্য মুখরিত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।" সেই কাব্যের গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারিলেই অভিনয় সফল হয়।

অভিনয় ব্যাপারকে ভরতমুনি ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) বাচিক অভিনয় অর্থাৎ আবৃত্তি, (২) আঙ্গিক অভিনয় অর্থাৎ বাক্যের সহিত অঙ্গসঞ্চালন, (৩) আহার্য্য অভিনয় অর্থাৎ দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদি, এবং (৪) সাত্ত্বিক অভিনয় অর্থাৎ আবৃত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা Emotion.

Aristotle এর Rhetoric একখানি বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড আবৃত্তি-বিজ্ঞান। স্বর-ভঙ্গীকেই আবৃত্তির কৌশল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া Aristotle বলিয়াছেন—"It (art of delivery) is the art of knowing how to use the voice for the expression of each feeling, of knowing when it should be loud, low or moderate, of managing its pitch—shrill, deep or middle—and of adopting the cadence to the theme." বৃদ্ধ Aristotle এর বহুপূর্ব্বে ভরতমুনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'অলঙ্কার বিরামাভ্যাং সাধ্যতে হর্ষ নিশ্চয়ঃ'। তাঁহার স্বরাধ্যায় এই বিষয়ের অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনায় পরিপূর্ণ। ভরত কল্পনা করিয়াছেন অভিনয় কালে বক্ষ হইতে, কণ্ঠ হইতে এবং শির হইতে স্বর উদ্ভূত হয়। Yule কলেজের অধ্যাপক Day এতকাল পর এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কহিয়াছেন—

There are 3 varieties of quality of voice which affect the character of vocal expression —they are the orotund, the guttural and the aspirate ... ... This quality (orotund) appears to be imparted to the voice by reverberating it against the walls of the throat when expanded to its utmost degree. The guttural quality is imparted to the voice by contracting the passage of the throat above the larynx. ... .. The aspirated voice is simply the emission of vocalised with unvocalised breath.

কণ্ঠস্বরের সাহায্যেই আমরা রঙ্গপীঠে দেবীকে স্থাপিত করি, পিশাচীকে আনি, রোষকে প্রজ্বলিত করি, গর্ব্বকে ফুটাইয়া তুলি, অশ্রুর বন্যায় চারিদিক ভাসাইয়া দিই—এই কণ্ঠের পরিবর্ত্তন করিয়াই আবার মূর্ত্তিমতী প্রেমের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গাহি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

হর্ষ একটী চিত্তবৃত্তি। তাই বলিয়াই কি হর্ষমাত্রেরই একইরূপ মূর্ত্তি? যোগীর ভগচ্চরণ দর্শনে হর্ষ, ভোগীর বিলাস-সামগ্রী দর্শনে হর্ষ, সেনাপতির বিজয়লাভে হর্ষ, বিনাবাধায় পরস্বাপহরণে কৃতকার্য্য হইয়া তস্করের হর্ষ,—জননীর প্রিয়পুত্র দর্শনে, বিরহিনীর প্রিয়সম্মিলনে—এসকলই হর্ষ, কিন্তু অবস্থাভেদে পাত্রভেদে কত বিভিন্ন—অভিব্যক্তি-কৌশলও তাই একরূপ নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

বন্দনা।

(বাঁকীপুরে অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে" পঠিত।)

১

এস পূজার্হ সজ্জনগণ! প্রাণভরা লয়ে পূজার অর্ঘ্য,
চির-সাধনার বাঞ্ছিত-ধন পূজিতে মায়ের চরণ-স্বর্গ!
কে এনেছ তুলি অতসী করবী কৃষ্ণচূড়ার মোহন গুচ্ছ,
দীন শিশিরের সুকুমার দান যার কাছে শত মুকুতা তুচ্ছ!
সপ্তস্বরীর সাতখানি তার কে করিবে আজ পুলকে স্পর্শ,
মধুর সুরবে কে বাজাবে বেণু জাগায়ে চৌদিকে আকুল হর্ষ!
ফুৎকারে পূরি পূত প্রাণ-বায়ু কে বাজাবে শাঁখ গভীর মন্দ্রে,
মঙ্গল-গীতি উঠিবে জাগিয়া পরশি গগন-তপন-চন্দ্রে।
এস সবে এস দূরে ফেলে আজ সকল কুণ্ঠা সকল শঙ্কা,
মার পদতলে নাহি ছোট-বড় বাজে হেথা শুধু মিলন-ডঙ্কা।

২

সন্ধান হেথা পাইলা বুদ্ধ সাম্য-নীতির নির্ব্বাণ-মন্ত্র,
কঠোর তপের সিদ্ধি অমল পালিতে তারিতে জগতী-যন্ত্র!
ভিক্ষু নৃপতি অশোকের সেই "ত্রিরত্নে" গড়া শাসন-ছত্র,
রাজিত হেথায় প্রচারি বিশ্বে চির-কল্যাণ অভয়-পত্র!
যুগে যুগে কত ভক্ত-সাধক রচিলা হেথায় সাধন-তীর্থ,
চরণ-ধূলির পুণ্য-সুরভি আকাশে এখনো উছাসে নিত্য!
বঙ্গ-বাণীর পূজা-মন্দির রচিত আজিকে সে মহা ক্ষেত্রে,
ভক্তি-গৌরবে শিহরে চিত্ত পুলক-অশ্রু উথলে নেত্রে!
এস উদ্গাতা! এস প্রস্তোতা! এস প্রতিহারকারীবৃন্দ!
মুক্ত-প্রাণের স্পন্দন-পূত অঞ্জলি রচি ভুবনানিন্দ্য!

৩

মাতৃ-পূজার হোতৃ-প্রধান! বন্দি তোমারে ভারত-নম্য!
নাহি জানি কোন্ বোধন-মন্ত্রে বিলাইবে আজ চেতনা রম্য!
সুধার উৎস উঠিবে উথলি ঘোষিবে মধুর মিলন-তূর্য্য,
জননীর মোর রাতুল চরণে মুরছিবে কোটি গৌরব-সূর্য্য!
কল্যাণ-করে প্রাণের প্রদীপ জ্বাল আজি মার দেউল-কক্ষে,
আশা-উজ্জ্বল শান্তি-কিরণ ভাতিয়া উঠুক সকল বক্ষে!
নিঃশেষে করি আপনারে দান তটিনী কেমনে বরিছে সিন্ধু,
বিলায় সুরভি কেমনে সে ধূপ দাহিয়া আপন মরম-বিন্দু!

সে মহা ত্যাগের নিগূঢ় মন্ত্র, মহতী সাধনা বিজয়-পূর্ণ,
আজি জনে জনে শিখাও সৌম্য! সব অভিমান করিয়া চূর্ণ!

৪

জননী আমার! জননী আমার! ডাকি বার বার না হই তৃপ্ত!
একি মায়া-ডোরে বাঁধিনি মা মোরে বুকভরা একি আবেগ দৃপ্ত!
মায়ের শ্রীমুখে হেরি হাসি তোর শৈশবে কখন ভুলিনু বিশ্ব!
বন্দি করিলি মন্দির-দ্বারে সংসার-পথে করিয়া নিঃস্ব!
দীর্ঘ বরষ অপেখি জিয়েছে উঠেছে আকুলি তৃষিত চিত্ত,
কবে মাগো তোর চরণসরোজে সারা হৃদি দিব করিয়া রিক্ত!
সার্থক আজ সকল বাঞ্ছা—সফল জীবন, ভুবন-ধাত্রি!
সুগত-তীর্থে পূজিতে মা তোঁরে মিলেছে হাজার ভকত-যাত্রী!
সবার পরাণে উঠুক্ বিভাসি মাগো, তোর ওই বরদা-মূর্ত্তি,
অযুত ছন্দে একটী সুরের বন্দনা-গীতি হউক্ স্ফূর্ত্তি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পরেশনাথ পাহাড়।

গিরিডি হইতে মধুবন ১৯ মাইল, তারপরই পরেশ-নাথ পাহাড়ের চড়াই সুরু। মধুবনে কয়েকটী সুন্দর যাত্রী-নিবাস আছে। বছর বছর বোম্বাই, মালব, রাজপুতনার লাখ লাখ যাত্রী সেখানে সমাগত হয়। পরেশনাথ সাড়ে চার হাজার ফিট উঁচু, ঠিক কার্সিয়াঙের সমান। জৈন তীর্থঙ্কর পরেশনাথের সাধন-ভূমি এই পবিত্র পাহাড় এক সময় বাংলার একটী গৌরবের জিনিষ ছিল। বিহারের ইহাই সব চেয়ে বড় পাহাড়।

পূর্ব্বে সকলেই এই মধুবন হইয়া পরেশনাথে আসিত। আজকাল গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট ষ্টেসন হইতে পরেশনাথে যাওয়া সুবিধা। সেখান হইতে পাহাড় মাত্র ৩ মাইল, আর চড়াই ৬ মাইল।

গিরিডি হইতে মধুবন যাইতে হইলে গোযানই একমাত্র উপায়। পুসপুসও সময় সময় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উটের গাড়ী ছিল, এখন তাহাও নাই। মোটর যোগার করিতে পারিলে সব চেয়ে ভাল।

অনেকদিনের ইচ্ছা হাটিয়া পরেশনাথ যাওয়া চাই। গিরিডি হইতে হাজারীবাগ রোড পরেশনাথের পাশ দিয়াই গিয়াছে।

গিরিডি হহতে আকাশ-পটে আঁকা পরেশনাথ মন্দিরের চূড়া রোজই দেখি। কখনো কখনো মেঘে সমস্ত পাহাড় ঢাকিয়া রাখে, দুপুর রৌদ্রে ঝাপসা দেখায়, কিন্তু ভোরের অরুণরাগে আর সন্ধ্যার অস্তমিত কিরণে পরেশনাথের কি সৌন্দর্য্যই ফুটিয়া উঠে! আর মনে হয়;—

ভূধর দুরধিগম্য
দূর হতে অতি রম্য।

কিন্তু যাঁরা পাহাড়ে চড়ে দেখেছেন, তাঁ'রা জানেন পাহাড়ের উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যে কত আনন্দ! পাখীর কল-নিনাদ আর বুকচেরা পাহাড়ের ঝরণার ঝরঝরানি

গানে কত আবেশ সঞ্চারিত হয়! রাজপুতনার নগ্ন পাহাড়গুলিতেও গাম্ভীর্য্যের অভাব নাই। বড় বড় পাথরের খণ্ড যেন কালের কটাক্ষ অগ্রাহ্য করে ধ্যান-স্তিমিতলোচন শিবের মত যোগাসীন।

একদিন ভোরবেলা তিনজনে পরেশনাথ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভোরের কনকনে বাতাস শীতের আগমনী জানাইতেছিল

ভাদুয়া পাহাড়ের কাছে আসিলে চারিদিক বেশ ফর্সা হইয়া আসিল। চারিদিকের কয়লার খাদের চিমনীর ধূয়া বাহির হইতেছে; আর চলন্ত ঘরের (Lift) ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছে। কিছুদূর গিয়া স্লেট নদীর পোল পার হইলাম। উপল-মুখরিত নদীর স্রোত তরতর বেগে চলিয়াছে। নদীর দৃশ্যটী বেশ সুন্দর। কিছু দূরে বিচ্ছিন্ন দুইটী পাহাড়ের মাঝ দিয়া আমাদের পথ,—কালিদাসের উপমায়, পাহাড় দুটী ঠিক যেন পার্ব্বতীর স্তনের মত দেখাইতেছে।

৮ মাইল আসিয়া আমরা বরাকর নদীতে পৌঁছিলাম। স্বচ্ছ জল কলকল বেগে চলিয়াছে। নদীর এপারে দু' এক ঘর দোকানপাট আছে।

আমরা নদী পার হইয়া স্নান করিয়া জলযোগ শেষ করিলাম

২ টার সময় চিরকীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। চিরকীতে থানা ও পোষ্টআফিস আছে। দোকানপাট যে দু' একখানি ছিল, তাহা যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মধুবন উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই আমরা নিরাশ হইয়া মধুবনের দিকে রওনা হইলাম। মধুবন আর তিন মাইল। কিছুদূর গিয়াই হাজারীবাগ রোড হইতে পরেশনাথে যাওয়ার একটী স্বতন্ত্র রাস্তা পাইলাম।

প্রায় ৪ টার সময় আমরা মধুবনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পাহাড়তলির দৃশ্যটী বড়ই মনোরম। প্রকাণ্ড সুরম্য যাত্রীনিবাস ও সংলগ্ন সমুচ্চ মন্দিরের চূড়াগুলি দেখিলে বিশাল রাজহর্ম্ম্য বলিয়া বোধ হয়। বিশাল তোরণ-পথে প্রবেশ করিয়া দুইদিকে সারি সারি যাত্রীর কোঠা, ভিতরে প্রকাণ্ড অঙ্গন। প্রথমটী পার হইয়া আমরা দ্বিতীয় ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেটী আরো বড়। অঙ্গনের ভিতর সুন্দর ফুলের বাগান—চারিদিকে যাত্রীনিবাসের কক্ষশ্রেণী। সামনের অঙ্গনের ভিতর সারি সারি সুন্দর অনেকগুলি মন্দির। ফুল-বাগানের পাশেই একটী সুন্দর কোঠায় আমরা আশ্রয় লইলাম। ভাণ্ডার-রক্ষক রামসিং গিরিডির লোক। কাজেই আমাদের আদর যত্নের কিছু ত্রুটী হইল না। তাহারি ঘরে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত হইল।

মধুবনে তড়াইপন্থী ধর্ম্মশালা তিনটী আর বিশ্বপন্থী ধর্ম্মশালা একটী। জৈন সম্প্রদায়ের দুই ভাগ, শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী। শ্বেতাম্বরী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে এবং দিগম্বরী সম্প্রদায়ের ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা উলঙ্গ থাকে। কার্য্যতঃ অবশ্য তাহাদিগকে নেংটি পরিতে হয়।

আমরা তড়াইপন্থী শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালায়ই স্থান লইয়াছিলাম।

পরদিন ভোরবেলা আমরা পাহাড় চড়াই সুরু করিলাম। শুনিলাম খুব ভোরেই গুজরাতী ও মালবী যাত্রীগণ সদলবলে পাহাড়ে গিয়াছে। পাহাড়ে উঠিবার সুন্দর রাস্তা—পথের দুইধারে নানারকম সুন্দর ফার্ণের গাছ। ইহারি কতগুলি টবে করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রি হয়—তখন তাহার নাম হয় চাইনিজ ফার্ণ, সুসজ্জিত বিলাসী ধনীগৃহে তাহার কতই না আদর।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটী অধিত্যকায় আসিলাম—একদিকে চায়ের বাগান, অন্যদিকে লম্বা সারি সারি গাছগুলি ছবির মত দেখাইতেছে। তাহার একদিকে কতগুলি বালক মহিষ চড়াইতেছিল—চারিদিকের উচ্চ পাহাড়ের ছায়ায় সেই স্থানটী শান্ত মনোরম তপোবনের পরিকল্পনার যোগ্য।

আরো কিছুদূর গিয়া সীতানালার পথে আসিলাম। সেখান হইতে ঝরণার ঝরঝরানী গান শোনা যাইতেছে।

তিন মাইল রাস্তায় যাত্রী বিশ্রামের একট আড্ডা—পাকা ঘর, পাশেই তর তর জলের ঝরণা। পাহাড় হইতে ফিরিবার সময় এখানে যাত্রীদের বৈকালীর বন্দোবস্ত থাকে। জৈন আতিথেয়তার চূড়ান্ত!

৬ মাইলের কিছু বাকি থাকিতে রাস্তায় একটী

সুবৃহৎ ডাকবাংলা আছে। সেখানে রজতমুদ্রা সহকৃত আতিথ্যের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক করিতে হইলে পূর্ব্বেই হাজারীবাগ বিভাগের কমিসনারের নিকট খবর পাঠাইতে হয়। এখানের সমস্ত জিনিষপত্র নীচ হইতে আনিতে হয়। এমন কি সামান্য একঘটি জলের আবশ্যক হইলে ২ মাইল নীচের ঝরণা ছাড়া উপায় নাই।

এই ডাকবাংলা ছাড়াইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া আর কেহই উপরে উঠিতে পারে না। ডাকবাংলা ছাড়াইলে রাস্তার মোড়েই জৈন বা উচ্চ হিন্দুব্যতীত অন্যের আরোহণের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক একখানি মার্ব্বেল ফলক গ্রথিত আছে। আব্রহ্মকীটপতঙ্গে করুণা যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, উচ্চনীচবর্ণের ভেদ-বিচার সেই ধর্ম্ম-বাদীদের মনে কিরূপে স্থান পাইল তাহা রহস্যজনক।

৬ মাইল উঠিয়া সুদৃশ্য বিশাল মন্দিরের ধাপে আসিয়া যখন পা দিলাম চারিদিকের উন্মুক্ত বিরাট দৃশ্যে মনে এক অভাবনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল। মাথার উপর উন্মুক্ত অনন্ত বিশাল আকাশের চাঁদোয়া—চতুর্দ্দিকের যোজন যোজনব্যাপী বন গিরি নদী প্রান্তরের শোভায় মন যেন তন্ময় হইয়া গেল।

ভাবিলাম প্রকৃতির এই উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের স্পর্শ বুকে করিয়া যে যোগী তপস্যা করিয়াছিল, সমগ্র বিশ্বের করুণার ধারা যে তাহাকে প্লাবিত করিবে—তাহাতে সন্দেহ কি।

মন্দিরে প্রবেশ করিলাম—এই সুন্দর বিশাল মন্দির নির্ম্মাণেও মানুষের কত ভক্তি ও সহিষ্ণুতার দরকার। সমস্ত মালমসলা ও জিনিষপত্র ৬ মাইল চড়াইএ আনিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণেও কম খরচ হয় নাই।

মন্দিরে তুষার-ধবল মর্ম্মর পাথরে যোগীবীর পরেশ নাথের পদচিহ্ন খোদিত। কিছুক্ষণ পরেই দলে দলে যাত্রী আসিতে লাগিল; তাহারা তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সুমিষ্ট ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিল। অনেক জৈন মহিলা সুদূর বোম্বাই, মালব, রাজপুতনা হইতে তীর্থ করিতে এখানে আসিয়াছেন।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘেরা বারেন্দা। স্বল্পপরিসর পাহাড়ের চূড়ায় কেবল মাত্র মন্দিরটার স্থান সঙ্কুলন হইয়াছে,—তা' ছাড়া আর একটুও জায়গা নাই—চারি দিকেই ঢালু পাহাড়ের গা;—পাশে পাশে গভীর শ্যামলশোভা পরিবেষ্টিত পাহাড়শ্রেণী—স্তর-বিন্যস্ত,—পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকা বাঁকা পথগুলি বনের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ অজগরের মত দেখা যাইতেছে। বনের সুদীর্ঘ ছায়া সমস্ত পাহাড়টীকে ছায়াস্নিগ্ধ উপবনের মত সুরম্য করিয়া রাখিয়াছে। দূরে বরাকর ও দামোদরের স্বচ্ছ স্ফটিকধারা প্রান্তরের বুকে হীরার ছবির ঝিলিক হানিতেছিল। আহত সাপের মত নদীর গতি দু'শবার মোচড়াইয়া গিয়াছে। পাশেই গ্রাণ্ডকর্ড লাইন, কিছুদূরে বৃক্ষসারির ভিতর দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। পরেশনাথের চূড়াই সকলের চেয়ে উঁচু—তার নীচে পাহাড়ের শ্রেণীর চূড়ায় চূড়ায় জৈন তীর্থঙ্করদের আরো ছোট ছোট মন্দির আছে।

অন্য এক পাহাড়ের চূড়ায় জলমন্দির। সীতানালার পথ দিয়া যাত্রীরা প্রথম ঐ জলমন্দিরে আসে। সেখানে বিশ্রাম ও খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় যে সব তীর্থঙ্করের মন্দির আছে তাহা পরিভ্রমণ করে, সর্ব্বশেষ এই পরেশনাথে আসে।

মেয়েদের এই শ্রম-সহিষ্ণুতা এবং এই দুর্গম চূড়ায় চূড়ায় পরিভ্রমণ দেখিলে তাহাদের ভক্তির প্রগাঢ়তা বেশ উপলব্ধি হয়।

এই উন্মুক্ত পাহাড়ে, প্রকৃতির এই সুরম্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিলে মন যে কত ভক্তি-বিনম্র হয় ও মনের সতেজ ভাব প্রস্ফুটিত হয় তাহা সহজেই বোঝা যায়।

এক এক দল যাত্রী পাহাড় অতিক্রম করিয়া যখন এই মন্দির-দ্বারে পৌঁছিয়া "জয় পরেশনাথজী কি জয়" শব্দে প্রাণের ভক্তি-উৎস-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় ও ভক্তি-বিনম্র ভাবে মন্দির-দরজায় লুটাইয়া পড়ে তখন কি অনির্ব্বচনীয় ভাবই মনে উদয় হয়।

আমরা সেখানে কতক্ষণ কি অনির্ব্বচনীয় শান্তিই অনুভব করিলাম। অনন্ত বিরাট আকাশের পুলকস্পর্শ যেন আমাদের ঘিরিয়াছিল। চতুর্দ্দিকের বনগিরি-প্রান্তর যেন এই অত্যুচ্চ বেদীর মুখপানে কি শান্তির

কথাই শুনিতে তন্ময় হইয়া আছে। অনন্ত আকাশের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভাব, অব্যক্ত সুরের করুণ উচ্ছ্বাসের ধারা বুঝি পরেশনাথ এই খানেই বুক ভরিয়া পাইয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে ধীরে ধীরে একটী স্বপ্নময় স্মৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম বার বার পিছনে ফিরিয়া সেই শান্তির স্বর্গের দিকে তাকাইতেছিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।
গিরিডি।

অশোক।

ধন্যরে অশোক তোর জনম ভূতলে,
চিরমুগ্ধ কবি-আঁখি ও রাঙা বরণে!
ছিলি বাঁধা বুঝি কোন্ অপ্সরা-অঞ্চলে,
দেখাতে সৌন্দর্য্য তোর ছড়ান ভুবনে।
কোন্ দূর অতীতের কোন্ শুভক্ষণে,
হ'ল এ ধরায় তোর জনম-উৎসব,
কোন্ রম্যালোকে কোন্ রৌদ্রদীপ্ত বনে
ফুটাইলি স্বরগের এ শোভা-সম্পদ?
হেরি তোর রক্তাধর এ মর্ত্ত্যসুন্দরী
রঞ্জে অলক্তকরসে সুচারু অধর;
তোর ও রক্তিম রাগে ত্রিদিব-অপ্সরী
ফুটায় অরুণদীপ্তি কপোলে সুন্দর!
কি বরবরণ ওই! কি বরণ মরি,
বিকশে বসন্ত বিশ্বে চির-মনোহর!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

চীনা ও জাপানী সমাজদ্বয়ের আব্ হাওয়া।

জাপানে প্রথম সাতদিনের মধ্যেই যতগুলি জাপানী "আটপোরে" শব্দ দখল করিতে পারিয়াছিলাম চীনে আটমাস থাকিয়াও তাহার অষ্টমাংশ চীনা শব্দ আয়ত্ত হইল না! সত্য কথা, এখন পর্য্যন্ত একটিও চীনা শব্দ জানিনা। এমন কি জল বা ভাত ইত্যাদির প্রতিশব্দও দুরস্ত হয় নাই। বড়ই বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণও নাই।

মৃতপ্রায় জাতির আব্ হাওয়া হইতে দুনিয়ায় কোন প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে না, পড়িতে পারে না। অবনত জাতিকে লোকে স্বভাবতঃই কুকুর বিড়ালের মত দেখিয়া থাকে, এই সকল জাতির নরনারী গোটা মানুষ নয়, আধখানা মানুষ। কাজেই ইহাদের হাসিকান্না কিরূপ, ইহাদের নাচগান কিরূপ, ইহাদের লেন দেন কিরূপ, ইহাদের সৌজন্য শিষ্টাচার কিরূপ, তাহা শীঘ্র শীঘ্র বিদেশীয়ের নজরে পড়ে না।

জাপানের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম, আর চীনাদিগকে প্রথম হইতেই কুনজরে দেখিয়া আসিতেছি, একথা বলিতে পারি না। বরং পক্ষপাত যদি থাকে তাহা চীনাদিগের দিকেই আছে। চীনা লোকজনকে যতটা আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারি জাপানীদিগকে ততটা আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারি নাই। তথাপি চীন আমাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিল না। কিন্তু আজ যদি চীনারা ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের সমান একটা শক্তিশালী অগ্রগামী জাতি হইত তাহা হইলে চীনা হাঁচি, চীনা কাসি, চীনা বদমায়েসি হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা শিল্প, চীনা আদবকায়দা, "চীনা খৃষ্টধর্ম্ম," "চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম," চীনা শাসনপ্রণালী পর্য্যন্ত সবই দুনিয়ার অলিতে গলিতে প্রসিদ্ধ হইত। তখন তিনদিন মাত্র পিকিঙে বাস করিতে না করিতেই খাঁটি চীনা হইয়া পড়িতাম। বিলাতে পদার্পণ করিতে না করিতেই ভারত-সন্তানের গলায় আওয়াজ ইংরেজের অনুরূপ

হইয়া পড়ে না কি? ইয়াঙ্কিস্থানের নিউইয়র্ক বন্দরে জাহাজ লাগিবার পূর্ব্বেই নাকি সুরে আমরা কথা বলিতে অভ্যস্ত হই না কি? বিজিত জাতির আবহাওয়া এবং বিজেতা জাতির আবহাওয়া দুই ভিন্ন পদার্থ। এই প্রভেদ না বুঝিয়া মানবচরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে।

বিগত নবেম্বর মাসে এক দিন দেখি বাঁধের উপরকার বড় বড় ব্যাঙ্ক, হোটেল ও আফিসগুলি সাজাইবার ধুম পড়িয়াছে। ভাবিলাম বোধহয় যুদ্ধে ইংরাজপক্ষীয়গণের একটা বড় রকম জয়লাভ হইয়া থাকিবে। তার পরদিন দেখিলাম শাংহাইয়ের জাপানীরা মহা-উল্লাসে চলাফেরা করিতেছে। সকলের বেশভূষা অতি জমকালো। কাগজে পত্রে দেখা গেল আজ নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কিয়োটো নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অভিষেক-যজ্ঞ দেখিয়া পাশ্চাত্যেরা কিছু থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, জাপান আজকাল সকলবিষয়ে ইয়োরামেরিকার অনুকরণ করিতেছে—"করনেশন"-কাণ্ডও পাশ্চাত্য রীতিতেই অনুষ্ঠিত হইবে। অথচ অভিষেক-ভূমির প্রথম খুঁটিগাড়া হইতে আমীরওমরাওগণের চপ্‌ষ্টিকের সাহায্যে বিদায়-ভোজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য খাঁটি প্রাচ্যরীতিতে সম্পন্ন করা হইল। জাপানী অভিষেকপ্রথাও অন্যান্য দেশীয় মুকুট-গ্রহণ হইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ জাপানী অভিষেককে করনেশন বা মুকুটধারণ উৎসব বলা উচিত নয়। সম্রাট্ কোন শুভদিনে তাঁহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে জানাইয়া দেন যে তিনি তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক রাষ্ট্রকর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। এইরূপ জানান বা পরলোকে সংবাদপ্রেরণের নাম জাপানী অভিষেক। বর্ত্তমান অভিষেকও মান্ধাতার আমলের এই নিয়মানুসারে পরিচালিত হইল।

জাপানী অভিষেক-যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে চাউল ব্যবহারের বিধি আছে। এই চাউল অতি পবিত্র—নাম "ধর্ম্ম-তণ্ডুল" দিতে পারি। যে-সে জমি হইতে যে-সে প্রণালীতে উৎপন্ন চাউলের দ্বারা ধর্ম্ম-তণ্ডুলের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। শুনিলাম প্রথমতঃ জাপানের দুইটা জেলা এই চাউল উৎপন্ন করিবার জন্য মহাসমারোহের সহিত উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেই দুই ধর্ম্মজেলার মধ্যে স্থানে স্থানে খানিকটা জমিও যথারীতি উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছিল। এই সকল ধর্ম্মক্ষেত্রের উপরে মন্দিরজাতীয় ধর্ম্মগৃহ (shrine) নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সকল কৃষক এই ধর্ম্মক্ষেত্র চষিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের চড়ক, গাজন, গম্ভীরা এবং অন্যান্য উৎসবের "সন্ন্যাস"-কারী "ভক্ত" বা "সন্ন্যাসীর" মত দীক্ষিত করা হইয়াছিল। ভূমিতে যে সার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও যে-সে সার নয়। উহা একপ্রকার "নৈবেদ্যের" অঙ্গবিশেষ। তাহার পর ধান্যরোপণ—সেও এক বিরাট বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার অভিনয়। তাহাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে চর্ব্ব্যচোষ্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জাপানী নৃত্যগীতবাদ্যেরও যথোচিত আয়োজন ছিল। চাষীরা আবাদের সময়ে এবং ধান্য কর্ত্তনের সময়ে ধর্ম্মস্নান দ্বারা চিত্তকলেবর পবিত্র করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে ধর্ম্মভূমিতে পদার্পণ করিত। এমন কি, খন্তা, কোদাল, খুরপি, ধামা, বস্তা, চট, বাসনকোসন সবই পবিত্র উৎসবের নিয়মানুসারে যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে ভুল হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের জন্য বসিয়া না থাকিলেও "ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার" হওয়া যায়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সাঁঝে।

তুমি,

ভোরের বেলার খেলার সাথী—
ধূলির পরাগ মাখা,
দুপুর রোদে পুকুর-পারে
ঘন পাতার শাখা।
বিকাল বেলা ছিটাও পানি
প্রাণের পোড়া বাটে,
দেখা দিও সোনার সাঁঝে—
বস্‌বো যখন পাটে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

বাঁশীরাজ।

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।)

এবার পূজার ছুটীতে বাঁশীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। B. N. W. রেল্‌লাইনের বস্তিনামক ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে তারাই জঙ্গলের প্রায় কাছাকাছি তাপ্তী নদীর তীরে বাঁশী অবস্থিত। ইহা যুক্তপ্রদেশের একটী দেশীয় রাজ্য। রাজ্যটী আয়তনে আমাদের দেশের ভাওয়াল রাজ অপেক্ষা বড় হইবেনা, কিন্তু রাজার চালচলন ও ঠাট একটু স্বাধীনভাবাপন্ন, একটু বনিয়াদি রকমের।

প্রায় ১০ বিঘা জমি লইয়া রাজপ্রাসাদটী তৈরী এবং ইহার চারিদিক প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রাসাদে প্রবেশের জন্য উত্তর দক্ষিণে দু'টী সিংহদ্বার আছে। প্রবেশ করিয়াই এক বৃহৎ চত্বর দেখা যাইবে। এই চত্বরের পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ, আর তিনদিক ভরিয়া হাতীশালা, ঘোড়াশালা, বাঘভালুক ইত্যাদি জানোয়ারের আড্ডা ও চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় কত রং বেরঙের দেশী বিলাতী পাখী, ও বাঁদর দেখিলাম। রাজার কুকুর পুষিবার খুব সখ। Greyhound, Fox Terrier, Bull-dog, ইত্যাদি নানাজাতীয় প্রায় ৫০টী কুকুর রাজা পোষেন। একটু তফাতে তাদের জন্য আলাহিদা ঘর ও খানসামার বন্দোবস্ত আছে। রাজপ্রাসাদটী দ্বিতল ও দ্বিমহল। সদর মহলের নীচে একদিকে রাজার ড্রয়িংরুম, নায়েবখানা, খাজাঞ্চিখানা, কাচারী ও দরবার-গৃহ, অন্যদিকে খানসামা, লোকলস্কর, আমলাগোমস্তা ও সিপাহী পিয়াদাদের থাকিবার ঘর। উপরে রাজার বসিবার ঘর, বিশ্রামাগার ও মন্ত্রণাগার। তা' ছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য গুটিকয়েক সুসজ্জিত শয়নাগারের বন্দোবস্ত আছে। সদরের পশ্চাতে অন্দর-মহল।

'বাঁশী-রাজেরা অযোধ্যার সূর্য্যবংশের সন্তান। কিন্তু ইঁহাদের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ওদিকে আর মিলে না। ঐসময় ইঁহাদের এক পূর্ব্ব-পুরুষ দিল্লীর মোগল বাদশাহের রোষে পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থদ্বারা বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী ওমরাহগণকে বশীভূত করিয়া মুক্তি লাভ করেন এবং তারপর মোগলরাজের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের বিদ্রোহ দমন করিয়া বিস্তর জাইগীর ইনাম প্রাপ্ত হন। ইনিই পরে গোরখপুরের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া স্থানীয় ভূস্বামীগণকে পরাভূত করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন এবং তারপর আরো উত্তর-পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া জেলাবস্তিতে আসিয়া 'গড়' করেন। ইঁহারই বংশধরগণ এখন বস্তি ও বাঁশীতে রাজত্ব করিতেছেন।* বস্তির রাজারা বাঁশীরাজারই জ্ঞাতি। বাঁশীর নামোৎপত্তি লইয়া দু'টী প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম প্রবাদ এই যে, বাঁশীরাজের এক পূর্ব্বপুরুষের নাম ছিল বাঁশীদেও (Bans Deo)। তিনি অতীব বীর্য্যশালী ও স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামে রাজ্য বাঁশী আখ্যা পাইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে বাঁশীতে বাঁশের আধিক্য হেতু বাঁশী নাম হইয়াছে। কোনকালে এই স্থানে বাঁশঝাড়ের প্রাচুর্য্য ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম তাহা প্রবাদ সমর্থন করিবার মত কিছুই নহে। কাজেই প্রথম প্রবাদই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল।

* নামটা ভুলিয়া গিয়াছি। Atkinson's Gazetteer দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান বাঁশীরাজ রতন সেন সিংহ বাহাদুর অতি বদান্য ও উচ্চ অন্তঃকরণের লোক। স্বরাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের হাতে দেড়লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ঐ স্থানের প্রধান শিক্ষক ডাঃ জে, এম, কর বি-এ, পি এইচ্, ডির অতিথি হইয়াছিলাম। রাজা রতন সিংহের পিতামহ মহেন্দ্র সিংহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিশ্বস্ততা ও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করিয়া C. S. I. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঐ রাজ্যে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান বাঁশীরাজ পিতামহের সকল গুণের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি একান্ত রাজভক্ত, স্বরাজ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতিকামী, সরল প্রকৃতি, ধীর, সদ্বিবেচক, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ। আবার তিনি শারীরিক সামর্থ্য ও বহু বীরোচিত গুণের অধিকারী। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুনিয়া ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমরা তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সকালে বিকালে ঘোড়ায় চড়া তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যায়াম। তিনি একজন অতি দক্ষ শিকারী ও ওস্তাদ পলো-খেলোয়াড়। তাঁহার মত দক্ষ শিকারী গোরখপুর অঞ্চলে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। পলো খেলার জন্য এক বিস্তীর্ণ মাঠ তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

রাজা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে বসাইলেন। বসিবার ঘরটী বেশ সাজান গোছান, ছোটখাট ড্রয়িংরুম বলিলেও চলে। আমরা বসিলে রাজা খানসামাকে আতর পান আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাহা আনিলে রাজা নিজ হাতে আমাদিগকে পান দিলেন এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের জামার আস্তিনে ও কলারে আতর মাখিয়া দিলেন। বিশিষ্ট অতিথিকে রাজা এই প্রকার আতর পান দিয়া খাতির করিয়া থাকেন।

রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হিন্দীতেই হইল। সময়টী রাজার বিনয়বচনেই প্রায় কাটিয়া গেল। রাজা যে সকল কথা বলিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিলেন, সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম এই :—কলিকাতার বাবু আপনারা, কলকাত্তা বহুত ভারি সহর হ্যায়। আমি একবার কলিকাতা গিয়াছিলাম, আপনারা ঐ ভারি সহরের লোক, আপনারা মেহেরবানি করিয়া এই গরিবখানায় আসিয়া আমাকে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য আমরাও পূর্ব্ব-শিক্ষা মতে কথায় কথায় 'আপকী মেহেরবানি' কহিয়া যথাবিধি ভদ্রতা রক্ষা করিতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু কলিকাতা যে সমগ্র বাংলা দেশ নহে, এবং বাঙ্গালী হইলেই যে সে কলিকাতার বাবু নহে এই কথাটি রাজাকে বুঝাইয়া রাজার উৎসাহের লাঘব করি নাই। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা আসন পরিত্যাগ করিয়া আদাব জানাইলাম, রাজাও অমনি হস্ত প্রসারণ করিয়া করকম্পন করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। রাজা শিষ্টতায় ও ভদ্রতায় আমরা বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। ইংরাজিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও রাজা রতনসিং অতি দক্ষতার সহিত রাজ-কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালন করেন এবং ভদ্রোচিত অতি উচ্চাঙ্গের আদবকায়দার অধিকারী। নীচে নামিয়া রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে রাজার ড্রইংরুমটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। ড্রইংরুমটা বেশ বড় ও অতি সুরুচির সহিত সাজান। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে এলাহাবাদ হইতে জনৈক পার্শী আসিয়া তাহা সাজাইয়া দিয়াছে। ড্রইংরুমের সম্মুখেই লম্বা প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দার দেওয়ালের চারিদিকটা বাঘের মাথায়, বড় বড় শৃঙ্গযুক্ত হরিণের মাথায়, মহিষের মাথায় ও কতপ্রকার মৃত সামুদ্রিক জীবে ভরা। এ সকলই রাজার নিজ হাতে শিকার করা। দেখিয়া কেতাবে পড়া বিলাতের সেকেলে ব্যারণদের কথা মনে পড়িয়াছিল। লাট-বেলাট কিংবা গণ্যমান্য রাজা মহারাজা অতিথি হইলে ড্রইংরুমে নাচভোজের ধুম পড়িয়া যায়। ড্রইংরুমের তামাসা দেখিবার নিমিত্ত জেনানাদের জন্য উপরে পরদাঘেরা রেলিং দেওয়া গেলারি আছে।

বাঁশীতে এখনও বেশী বাঙ্গালীর শুভাগমন হয় নাই। মাত্র তিনটী বাঙ্গালী এরাজ্যে আছেন। ডাঃ কর,

আর একজন স্কুলের শিক্ষক ও রাজার বাড়ীর জনৈক এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার। ইঁহারা আমাদের খুব খাতির যত্ন করিলেন ও একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। প্রবাসে বাঙ্গালীর এই বন্ধুত্বটুকু অতি মধুর লাগিল। পূর্ব্বে বাঁশীতে আসিতে হইলে ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল 'শিক্রাম' বা ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতে হইত। কিন্তু কিছুদিন হইল ডাঃ করের পরামর্শে কলিকাতা হইতে একটা মোটর কোম্পানী রাজার কাছে রাজ্যে মোটর চালাইবার অনুমতি পাইয়াছে। রাজা প্রজাদের চলাচলের সুবিধা হইবে ভাবিয়া কোম্পানী হইতে কোন শুল্ক দাবী করেন নাই। রাজার এই মহানুভবতা অনুকরণীয়।

বাঁশীরাজ্যের জমি বেশ উর্ব্বরা, এবং প্রজারা বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। রাজার হাতি লইয়া আমরা একদিন আশেপাশের গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম। হাতির উপর হ্যাটকোট পরা জীব দেখিয়া গ্রামবাসীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধভাবে আমাদের পানে তাকাইয়া রহিল। গ্রামের জমিদার যিনি তিনি দূর হইতে রাজার হাতি দেখিয়াই খাটিয়া বিছাইয়া হাতি 'হেট' করিবার জন্য মাহুতকে অনুরোধ করিলেন এবং আমরা তাঁর অভ্যর্থনা না লইয়া যাইতে পারিবনা একথা যতদূর সম্ভব বিনয়-নম্রতার সহিত জানাইলেন। আমরা হাতি হইতে আর নামিলাম না, কারণ নামিলে ওঠা এক কঠিন ব্যাপার। জমিদার সাহেব নিজ হস্তে আমাদিগকে পান দিলেন আমরা আদাব করিয়া তাহা গ্রহণ করিলাম। এপ্রকার আদর অভ্যর্থনার অভিনয় প্রতি গ্রামেই হইয়াছিল।

বাঁশী সহরে ভাল Stationery দোকানের একান্ত অভাব। একজোড়া ভাল মোজা কিংবা একবাক্স ভাল সাবান হয় বস্তি কিংবা গোরক্ষপুর হইতে আনাইতে হয়। আমার খুব বিশ্বাস যে আমাদের দেশের কোন উৎসাহশীল যুবক যদি ঐ স্থানে গিয়া একটী ভাল মনোহারী দোকান খোলেন এবং স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রাখেন তবে বিস্তর লাভ করিতে পারেন। বাঁশী ভাল চাউলের জন্য বিখ্যাত। তাপ্তী নদীর তীরে তীরে বিস্তর চূণো ও ফাগি মাটি দেখিলাম। এখানে অনায়াসে একটা চূণের কারখানা খোলা যায়। তাপ্তী নদীতে বারমাসই নৌকা চলে এবং বর্ষাকালে ছোট ছোট Steam Launch ও মোটর বোটও চলিতে পারে। তাপ্তী খরস্রোতা হইলেও ইহাতে নৌকার চলাচল অসম্ভব নহে। জলপথে গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত মাল সহজেই পৌঁছাইতে পারা যায়। আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া যদি কোন খনিবিজ্ঞাবিৎ (Mineralogist) যাইয়া স্থানটী পরীক্ষা করেন তবে আমার এই লিখন-শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বাঁশীতে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। বাঁশীর দক্ষিণে, খরস্রোতা তাপ্তী আর উত্তরে তীরাই জঙ্গল, তাহার পশ্চাতে নেপাল পাহাড় এবং তাহার পশ্চাতে তুষার-ধবল হিমালয় যেন ইহার গা ঘেঁসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেপাল পাহাড় বাঁশীর মাত্র ৩০ মাইল দূরে। নেপাল পাহাড়ের গাঢ় নীলিমা আর তাহার উপরই তুষার-শৃঙ্গ হিমালয়ের শুভ্রতা—পাশাপাশি নীল ও শাদায় মিশিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয়। একদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সূর্য্যোদয়ে হিমালয়ের দৃশ্য দেখিবার আশায় দাঁয়ড়াইয়াছি। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হওয়া মাত্রই হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গগুলি লাল হইতে আরম্ভ করিল, মনে হইল যেন ওগুলি কে তুলি দিয়া রঙ্গাইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে অস্পষ্ট নেপাল পাহাড়-শ্রেণীর ও তারাই জঙ্গলের নীলিমা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মনে হইল যেন প্রকৃতি সহসা আপন অঞ্চল খানা টানিয়া লইয়া বিশ্বরাজের এই অপূর্ব্ব ছবিখানি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। সে দৃশ্যের স্মৃতি আর এ জনমে ভুলিবনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আকাঙ্ক্ষা।

ঊষায় মেলিয়া আঁখি তোমারি চরণতলে
করিয়াছি খেলা,
দিবসের অবসরে তোমারি আঁচল-ছায়
কেটে যায় বেলা ;—
সাঁঝের আঁধার যবে ঘনায়ে আসিবে ধীরে
ঘিরি চারিধার
আমার বিফল সাধ স্বপনে সফল করো,
জননী আমার!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

হরিশ্চন্দ্রের "কীচকবধ কাব্য"।

["গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য" ও "বিজ্ঞাপন"।]

মহাকবি মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বা ১২৬৬ সনে এবং "মেঘনাদ বধ" কাব্য ১৮৬১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই দুইখানি ("তিলোত্তমাসম্ভব" ও "মেঘনাদ বধ") কাব্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ইহার প্রায় ৫।৬ বৎসর পরে, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের "কীচকবধ" কাব্য প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সকল কাব্যগ্রন্থের কাব্য-সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। "কীচকবধের" প্রারম্ভে কবি "গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য" ও "বিজ্ঞাপন" প্রকাশ করিয়াছেন; এস্থলে তাহার সাহিত্যিক মূল্য কি, তাহা প্রদর্শনই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল।

আধুনিক সাহিত্যে যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থের 'ভূমিকা' বা 'অবতরণিকা' লিখিত হয়, হরিশ্চন্দ্রের "বিজ্ঞাপন"ও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। এই বিজ্ঞাপনে কবির প্রধান আলোচ্য বিষয়—(১) আত্ম-নিবেদন ও (২) ছন্দ-বিচার বা অমিত্রাক্ষরছন্দে মিত্রাক্ষরতা বা প্রবর্ত্তন। প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর পঞ্চম দিবসেই হরিশ্চন্দ্রের "কীচকবধ" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এক হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে,আর এক হাতে, প্রেসে বসিয়াই, পিতৃশোকাতুর দরিদ্র কবি "কীচকবধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছেন—প্রেসে বসিয়াই ইহার প্রুফ-সংশোধনও করিয়াছেন। কবি স্বহস্তে এ সময়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। ইহাতে পাঠক কবির গভীর সাহিত্যানুরাগ বা কাব্যসাধনার একটা উৎকট তন্ময়তা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে ইহার তুলনা মিলে না। একদিকে মর্ম্মচ্ছেদী পিতৃশোকের তীব্র প্রদাহ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাত—তথাপি কবি বাণীসাধনায় ধ্যানমগ্ন! ইহাই কবির প্রকৃত পিতৃতর্পণ।

"কীচকবধ" কাব্যে কবির যে কাব্যপ্রাণতা রহিয়াছে, 'নির্ব্বাসিতা-সীতায়' তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। শোথ-রোগে শয্যাশায়ী, চলচ্ছক্তিহীন, হরিশ্চন্দ্র তাঁহার একজন ভক্তশিষ্যকে দিয়া 'নির্ব্বাসিতা' সীতার পাণ্ডুলিপি লিখাইয়া লইয়াছিলেন'।(১)দ্বিতীয়তঃ, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে তখন "সাহিত্য-সংসারে বিলক্ষণ কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল(২)"। হরিশ্চন্দ্র মধুসূদনের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে তখন লেখনী না ধরিয়া, অমিত্রাক্ষর ছন্দেই "কীচকবধ" কাব্য লিখিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও মধুসূদনের ছন্দঃ অবশ্য সর্ব্বাংশে এক নহে। "বিজ্ঞাপনে" হরিশ্চন্দ্র তাহাই আলোচনা করিয়াছেন।

---

(১) ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন, নবেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯১৭,২১৯পৃঃ।

(২) বাঙ্গালা পয়ার লিখিতে মোটেই তাঁহার (মধুসূদনের) কলম চলিত না, এজন্য তিনি বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দঃ পরিবর্ত্তনে প্রয়াসী হইলেন। তিনি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য প্রণয়ন করেন। তদানীন্তন কালের সকল শিক্ষিত লোকেই এই নূতন ছন্দে লিখিত কাব্যখানা উপহাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, চারিদিকে বিদ্রূপের তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঈশ্বরগুপ্তের অনুবর্ত্তী লেখকেরা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্র দত্তের অনুসরণকারী সকলেই মধুসূদনের লেখার উপহাস করিতে লাগিলেন। যিনি মধুসূদনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, মধুসূদনের গুণাবলী ও কবিতাবলী দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতনা এবং মধুসূদনের দুরবস্থা মোচনের জন্য যাঁহার 'হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুক্ত' থাকিত, সেই

হরিশ্চন্দ্র চিরদিনই মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার পক্ষপাতী ছিলেন।* হরিশ্চন্দ্র মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিত্রাক্ষরতা বিধানে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রথম ও তৃতীয় চরণে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিত্রাক্ষর বা মিল রাখিয়া "কীচকবধ" কাব্যে নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। পূর্ব্বোক্ত "বিজ্ঞাপনে" এবিষয়ের সবিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

এই ছন্দের গতি ও রচনার ধারা বুঝাইবার জন্য আমরা "কীচকবধ"-কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম দ্বাদশ পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"ম্লানা কৃষ্ণা পাণ্ডব পারীন্দ্র-প্রণয়িনী—
কোমলাঙ্গী, কীচকজম্বুক-পদাঘাতে,
করীপদ-বিদলিত যথা কোমলিনী
কমলিনী, ছিন্নবেশা লুণ্ঠিত ধুলাতে।
হায়রে! চন্দনলিপ্ত আছিল যে কায়
পাঞ্চালীর, রজোরাশি তাহা আবরিল,
মেঘমালা আবরয় যেমন ঊষায়,
কীচক বিরাট অগ্রে যবে আক্রমিল।
উলি কৃষ্ণা সরসীর নিরমল নীরে,
—অশ্রুনীরে আরো তাহা করিয়া বর্দ্ধিত—
বিদূরিলা অবগাহি সে রজোরাশিরে;
কিন্তু তাহে মনোগ্লানি নহে বিদূরিত।"

"গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্যে" হরিশ্চন্দ্র ইংরেজ-লেখক জন্‌সনের রাসেলাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "কীচকবধ" কাব্যের প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বা ১২৬৬ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্নের রাসেলাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে, বাঙ্গালী পাঠক মাতৃভাষাতেই ইংরেজলেখক জন্‌সনের রাসেলাসের নাম জানিতে পারেন এবং এই অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠের সুযোগ সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন।*

হরিশ্চন্দ্রের "কীচকবধ" কাব্য ও জনসনের রাসেলাস—উভয় গ্রন্থই পিতৃবিয়োগের তরুণ মর্ম্মন্তুদ শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে লিখিত। "গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্যে" হরিশ্চন্দ্রও এই ঘটনা-সামঞ্জস্যের কথা লিখিয়াছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে' "কীচক বধ" কবির অসাধারণ পিতৃভক্তির কাব্যমন্দির—এই মন্দিরের কবি বীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন।

এ স্থলে আরও একটী কথা উল্লেখযোগ্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ঢাকা—পানকুণ্ড নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যঙ্গকাব্য 'ছুছুন্দরী বধ'ও "অমৃত বাজার" পত্রে প্রকাশ করেন।†

কাব্য-রচনায় জগদ্বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে, গুরুশিষ্যে দুইখানা অতুলনীয় কাব্য রচনা করেন—শিষ্য ব্যঙ্গকাব্য লিখিয়াছেন, গুরু মাইকেলী ছন্দের 'অভিনবত্ব' ঘটাইয়াছেন।

"কীচকবধ" ঢাকার অমিত্রাক্ষরে রচিত সর্ব্বপ্রথম কাব্য। তৎপর হরিশ্চন্দ্রের শিষ্য—ভারতচন্দ্র সরকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে "মদনভস্ম" কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরও তিলোত্তমার ছন্দের প্রশংসা করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা পয়ার লিখিতে মধুসূদনের মোটেই কলম চলিতনা, এজন্য তিনি বাঙ্গালা ১৮৬০ খৃঃ অব্দে "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য প্রণয়ন করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য পড়িয়া "তিলোত্তমা"র সমালোচকগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন।

* হরিশ্চন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন"—

উপমায়, কল্পনায় শ্রীমধুসূদনে
জিনে, হেন কবিদর্পী আছে যত জন,
মস্তকেতে ধরি আমি তাদের চরণ।

* বাঙ্গালা রাসেলাসের ভূমিকায় তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"যিনি অত অল্পসময়ে (এক সপ্তাহে) এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে।" হরিশ্চন্দ্রের সম্পর্কেও একথা সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য।

† এই সময়ে "অমৃতবাজার" বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে "অমৃতবাজার" মাগুরা হইতে প্রকাশিত হয়।

"কীচক বধ" ও "মদনভস্ম" এক্ষণ দুষ্প্রাপ্য। ইহাদের পুনঃপ্রচার না ঘটিলে ঢাকার সাহিত্যের এই দুইটী অমূল্যরত্ন অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমরা নিম্নে "কীচক বধের" "গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য" ও "বিজ্ঞাপন" উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি ইহা পাঠকবর্গের কৌতুহল-পরিতৃপ্তির সহায় হইবে।

গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য।

কথিত আছে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সামুয়েল জনসন পিতৃবিয়োগ হইলে তদীয় প্রেতকৃত্য-ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত এক সপ্তাহ মধ্যে "রাসেলাস" নামক এক গদ্যময় কাব্য প্রণয়ন করিয়া মুদ্রাকর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। যে মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা 'তাহার' অভীষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছিল। যদিচ জনসনের রাসেলাসের ন্যায় এই কীচকবধ কাব্য-সাহিত্য সংসারে গণনীয় পদার্থ নয়—যদিচ জনসনের ন্যায় কীচকবধ-কাব্যকারের লিপিশক্তি নাই—যদিচ এই বঙ্গপ্রদেশে 'বাঙ্গালা' সাহিত্যের ক্রেতৃসংখ্যা সেই ইউরোপ খণ্ডের সাহিত্যপ্রিয় ক্রেতৃবর্গ হইতে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে ন্যূন, তথাপি জনসনের রাসেলাসের সহিত কীচক বধের একটী উদ্দেশ্যের সাম্য দেখা যাইতেছে। জনসন পিতৃ প্রেত-কৃত্যের ব্যয়ানুকূল্যার্থ রাসেলাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কীচকবধ-কাব্যকারও সেই উদ্দেশ্যে এই কাব্যখানিকে প্রচারিত করিতেছে। আজি ৫ দিবস অতীত হইল এই কাব্যকারের পূজ্যপাদ পিতা ৺ অভয়াচরণ মিত্র মানবদেহ পরিহার করিয়া যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পুরোবর্ত্তিনী, এ সময় যদি এই কাব্য বিক্রীত হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগৃহীত হয়, বিশেষ উপকার সম্ভাবনা। যদি না হয়, তাহাতেও বিশেষ দুঃখ নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্যকারের পিতৃভক্তির চিহ্নস্বরূপ এই কীচক বধ কিছুকাল অবস্থিত থাকিলেও কাব্যকার আপনাকে সফল-চেষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠিত হইবে না।

ঢাকা বাবুরবাজার, }
১২৭২। ১১ই পৌষ। } গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিন পরে এই কীচক বধ কাব্য প্রচারিত হইল। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সর্গের কিয়দংশ সাময়িক পত্রিকাবিশেষে প্রচারিত হইয়াছিল, এক্ষণে চারি সর্গে পরিসমাপ্ত হইল। প্রথমে সর্গে—কীচক প্রহারিতা দ্রৌপদীর বিলাপ, দ্বিতীয় সর্গে বৃকোদরের আশ্বাস ও কীচক বধোপায়াবধারণ, তৃতীয় সর্গে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক কীচককে সঙ্কেত স্থলে আহ্বান এবং চতুর্থ সর্গে কীচকবধ ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গত বিরাট পর্ব্বের বর্ণিত কীচক বধ আখ্যান অবলম্বন করিয়া এই কীচক বধ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এক্ষণে ছন্দোবিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে বিলক্ষণ কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচারের পর অবধি একদল পাঠক বাঙ্গালা মিত্রাক্ষর পদ্যের প্রতি বিলক্ষণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। একদল পাঠকের মিত্রাক্ষরের প্রতি এত অনুরাগ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু কীচক বধ কাব্য যে ছন্দে গ্রথিত হইল ইহাকে মিত্রাক্ষর-বদ্ধ বা অমিত্রাক্ষর-বদ্ধ যাহা বলা হউক না কেন, দুয়ের ধর্ম্মই দেখান যাইতে পারে। এই ছন্দের প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের মিত্রাক্ষরতা নাই, কেবল প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করা গিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় এই ছন্দ প্রচুররূপ ব্যবহৃত ও সমাদৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে, সহৃদয় কবিতা-রসজ্ঞ ব্যক্তিব্যূহের প্রতি তদ্বিচার ভার অর্পিত রহিল।

এই রচনা-প্রণালী এক প্রকার নূতন বলিলেও বোধ করি সত্যের অপলাপ হয় না। যদিও কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এই ছন্দে কোন কোন বিষয় লিখিয়া থাকুন, তথাপি ইহা সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, এই ছন্দের কোন কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে সুলভ নহে। যাহা হউক, এই কাব্যের ছন্দোবন্ধের অভিনবত্ব প্রদর্শাইয়া নূতন ছন্দাবিষ্কারের শ্লাঘা করা আমার

অভিপ্রেত নহে। যদি এই ছন্দর্দ্ময় কাব্যদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার একটুও মূল সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

এক্ষণে এই কাব্যকারের রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে, স্থিরচিত্তে একদাও ইহার পদবিন্যাস করিয়া ভাবিতে পারি নাই। অন্যান্য স্থানবাসীরা আমার এতদ্বাক্যে গর্ব্ব বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তবিক স্বরূপ কথাই বলা যাইতেছে। এমন কি, একদিক হইতে "কম্পোজ" আরম্ভ হইয়াছে, আর এক দিক হইতে "কাপী" প্রস্তুত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারীগণ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।* ফলতঃ দৈন্যই আমার চিত্তাস্থৈর্য্যের প্রধান কারণ। আমি একদা আপনার গৃহে উপবিষ্ট হইয়া রচনা কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, এমন সময় জননী সাংসারিক চিন্তা উপস্থিত করিয়া দিলেন, আমি কাব্যরচনা কার্য্য স্থগিত রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিলাম—

প্রভাত হইল রাত লিখিবারে একপাত
পদ্য, মন্তপায়ীমত ভাবভরে বসিলাম।
কল্পনা কুহকে পড়ি, কতভাবে ভাব ধরি,
জুটায়ে পুটায়ে যেনে কতটুকু লিখিলাম।
কিছুকাল পরে তার আগমন হল মার
কহিল জননী "বাছা কি কররে বসিয়া।
ঘরে নাই চাল খড়ী বল কি দিয়া কি করি?
বউটী রয়েছে কোণে চুপ মেরে বসিয়া।
নাতিটী করেছে খেলা, খানিক হইলে বেলা,
খেতেদে ঠাকুমা বলে আসিবে যে ধাইয়া।*
ঘরে মুড়ী চিড়া নাই, কি দিব না ভেবে পাই,
যাও বাছা দাও সব কিনে কেটে আনিয়া।"
শুনিয়া মায়ের বোল ভাবেতে বাধিল গোল
উড়ে গেল বুদ্ধিশুদ্ধি অন্নচিন্তা ঘেরিল।
কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে অর্থ পাই,
এই ভাবনার জালে কবিত্বও বেড়িল।

* এই অংশ আরোপিত।

পাঠকবর্গ এই কবিতাটী পাঠ করিয়াই আমার রচনা সময়ের মানসিক উৎকণ্ঠা অবগত হইতে পারিবেন। ফলতঃ যে দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশি নাশ করে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে দোষটীও আমায় পরিত্যাগ করে নাই, না করুক আমি তজ্জন্য দুঃখিত নই।

এই দীনতা শমনার্থই আমাকে রচনাক্ষেত্রে নানারূপে বিচরণ করিতে হইতেছে। কোন দরিদ্র কবি আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং নহি কৃতং ময়া।
বানরীমিব বাগ্দেবী নর্ত্তয়ামি গৃহে গৃহে॥"

প্রায় আমাকেও এইরূপ আক্ষেপ করিতে হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই, এই শ্লোককর্ত্তার যেরূপ কবিত্বের আভাষ পাওয়া যাইতেছে, আমার রচনাবলিতে তেমন কবিত্ব সৌরভ নাই।

পরিশেষে প্রার্থনীয় এই, সহৃদয় সমাজ স্ব স্ব ঔদার্য্য-গুণে এই কাব্যখানীর প্রতি একবার নেত্রপাত করুন।

ঢাকা বাবুরবাজার,
১২৭২ সন। ১০ই পৌষ। } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

এস্থলে, মূল গ্রন্থ "কীচক বধ" কাব্যের কাব্য-সৌন্দর্য্যের কোন আলোচনা করা হয় নাই; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইহার বিজ্ঞাপন-ভাগের সাহিত্যিক মূল্য প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তি প্রবন্ধে, "কীচক বধ" কাব্যের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

* এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন ঢাকায় এমন লোকের অভাব এখনও হয় নাই। এবিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় আমাদের একজন প্রধান সাক্ষী। তিনি একান্ত গদগদ কণ্ঠে হরিশ্চন্দ্রের গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ।—মুখপত্র শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন অঙ্কিত প্রাচ্যকলানুযায়ী ত্রিবর্ণ চিত্র—সুন্দর। প্রথমেই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের "মিনতি" শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি মহারাজ স্বয়ং যে কাগজের কর্ণধার তাহাতে তাঁহার রচনার অনুবাদ প্রকাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকের নিকট ইহা অশোভন বলিয়াও মনে হইতে পারে। "সভ্যতার সংঘর্ষ" শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা কি হারাইয়াছি ও কি লাভ করিয়াছি সংক্ষেপে তাহার একটা হিসাব নিকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য মোটামুটিভাবে এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আসিয়া আমরা জাতীয় সভ্যতার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, সমাজবন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে, ভোগসর্ব্বস্ব বহির্মুখী সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়া আমরা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিয়াছি, আত্মসম্মানের কাল্পনিক গণ্ডী আঁকিয়া উচ্চে নীচে ব্যবধান ক্রমশঃ দুরতিক্রম্য করিয়া তুলিতেছি এবং আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল পল্লীগ্রামকে উপেক্ষায় পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছি। লেখকের মতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী প্রভাবের আব্‌হাওয়ায় পরিপুষ্ট এবং ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা আমরা যে কতকপরিমাণে উপকৃত হইয়াছি তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। "পয়সার প্রতাপ"—ছোটগল্প, আখ্যান-বস্তু মর্ম্মস্পর্শী। "শ্মশান পারের সন্ন্যাসী"—কবিতা, বাগচী-কবির রচনা; কবির "কেয়াফুল" বা "মথুরার রাজার" মত সুমধুর কাকলী আর শুনিতে পাইনা কেন? "গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের "নারায়ণ" পত্রিকায় প্রকাশিত "ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। প্রবন্ধ শেষ না হইলে লেখক বিপিন বাবুর "উক্তিগুলির অসারতা ও ভিত্তিহীনতা" প্রদর্শন করিতে পারিলেন কিনা তাহার বিচার করা সমীচীন হইবে না। "পল্লী-নদী"—কবিতা, কাঁচা হাতের রচনা। "আফ্রিকার পরিণয়প্রথা"—কৌতুহলপ্রদ; লেখক নিশ্চয়ই আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া বিবরণ ও ছবিগুলি সংগ্রহ করেন নাই, সুতরাং এই সঙ্কলন-প্রবন্ধে ঋণস্বীকার না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। "চিরবাঞ্ছিত"—শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবীর চলনসই কবিতা, ছন্দে ঝঙ্কার আছে। "স্পর্শমণি"—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস, এখনও চলিতেছে। "দুটি পাখী"—সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা, এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"প্রবাস হইতে বহুদিন পরে গৃহে আসিলাম ফিরে,
লাজে বধূ মোর ঘোমটা টানিয়া পলাইয়া গেল ধীরে;
দেখা হতে দেরী,—বাসনা বড়ই কণ্ঠ শুনিতে তার,
সহকার-শাখে 'বউ কথা কও' করে ওঠে ঝঙ্কার।

প্রবাসে ফিরিতে, প্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে গিয়া,
কঠিন প্রয়াসে পারিনা রাখিতে আঁখিজল নিবারিয়া,
'চোখে কি পড়িল' বলি, ছল করি, আঙিনায় আসিলাম,
নিম্বের শাখে 'চোখ গেল' করে পরিহাস অবিরাম।"

"কুতব মিনার"—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখক কুতব মিনারের প্রতিষ্ঠাকাল ও নির্ম্মাণকর্ত্তা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই অনুমান মাত্র। "পরলোকগত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র"—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত। এই উন্নত-চরিত্র, মহানুভব প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনী-প্রসঙ্গ উপহার দিয়া লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "বৈদেশিকী" অংশে শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন ইংরেজী মাসিক পত্র হইতে বুদ্ধ বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়াছেন। "কবি ভগিনী শ্রীমতী কামিনী রায়ের প্রতি"—কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথের সুমিষ্ট কবিতা, অপরূপ বিশেষত্বে মধুর। "যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ"—কৌতুহলপূর্ণ চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক

প্রবন্ধ, গবেষণার পরিচায়ক। নুরউল্লা খাঁ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সংস্কৃত নিমন্ত্রণপত্র দ্বারা হিন্দু অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ কহিতে পারিলাম না :—

"খোদা-পাদারবিন্দদ্বয়-ভজনপরঃ পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে শ্রুত্বা আল্লাল্লেতি বাণীং-মুর্শিদনিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ। খাসীমুর্গীরহিতা কুদুকচুভবিতা ঃমৎপিতুশ্চালশে খানা শ্রীশেখো নুরনাম্না গলধৃতবসনা শুদ্ধি সম্পাদনীয়া॥"

"তৃপ্তিলাভ"—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সীর রোমান্টিক গল্প, মন্দ হয় নাই। "প্রবাসীর সুখ"—শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের সনেট্, আলেখ্যটি মধুর। "চা"—শ্রীযুক্ত অনন্তনারায়ণ সেনের আগামী-সংখ্যায়-সমাপ্য চা-র জীবন-কাহিনী। চা-পায়ীগণ অবহিতচিত্তে পাঠ করিবে। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের গান দুইটির প্রথমটি ভাল হইয়াছে। প্রভাত বাবুর চিত্তাকর্ষক ধারাবাহিক উপন্যাস "জীবনের মূল্য" ও মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ "শ্রুতি-স্মৃতি" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। উপযুক্ত সম্পাদকযুগলের হস্তে "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শন করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ, মাঘ।—প্রচ্ছদপটের উপর প্রফুল্লকমলাসনা বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনীর সুদৃশ্য চিত্র মাঘ-সংখ্যার "ভারতবর্ষের" বাহ্যাবয়ব চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। ভিতরে মুখপত্রের ত্রিবর্ণ চিত্রে "জননী"র মুখমণ্ডলে স্নেহ অপেক্ষা ভ্রুকুটির ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রীর "বাণী-বন্দনা" প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। উহা সংস্কৃত না হইয়া বাংলা হইলে ভাল ছিল। "বেদে কালের বিভাগ"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচুর গবেষণাপূর্ণ 'কোটেশন'-বহুল প্রবন্ধ, বিশেষজ্ঞের নিকট সমাদৃত হইবে। "মহানিশা"—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাস, 'পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর' প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। "শিল্প সংবাদ"—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষের সময়োপযোগী তথ্যবহুল সুচিন্তিত প্রবন্ধ, পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাঁহারা দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়াসী এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহারা উপকৃত হইবেন। লেখক অনেক স্থলেই ব্রাকেটে ইংরাজী শব্দার্থ না দিয়া পারিতেন। বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" এখনও শেষ হয় নাই। এই সংখ্যায় প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। "মাল্য-গ্রথন-কলা"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ। পূর্ব্বকালে মাল্যগ্রথন কলা গীতবাদ্যাদি চৌষট্টি কলার একটি বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমানে উহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক জাপানে মেয়েদের মধ্যে পুষ্প-সজ্জা একটি আয়াসসাধ্য সুন্দর কলারূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। "অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ"—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি তথাকথিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, টাইম্-টেবলের বিবরণের মত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও নীরস। "জমিদার"—শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গ-চিত্র, আমরা উপভোগ করিয়াছি। নমুনাস্বরূপ কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :—

'কোথা জল ? কোথা জল ?'—অভ্রভেদী শব্দ হাহাকার—
অকৃতজ্ঞ কৃষকের দুর্বিনীত দারুণ চীৎকার।

* * * *

অন্নকষ্ট ? মিথ্যা কথা। শস্যভারে নম্র বঙ্গভূমি,
বিরাজে শ্যামলক্ষেত্র দিক্ হতে দিগন্তর চুমি।—

* * * *

——শীর্ণকায় প্রজাগণ ? সে ভাই বরাত!
আমিও ত জন্মিয়াছি বঙ্গদেশে, খাই ডাল ভাত।
তবু দেখ ফুলি রোজ ; পাঞ্জাবী সে গেঞ্জি সম আঁটে,
পদভরে প্রতিদিন আন্‌কোড়া Pump shoe জোড়া
ফাটে।"

"কল্পতরু" অংশে মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রকলার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুময় "মধু-স্মৃতি" চলিতেছে। এই সংখ্যায় কবিবরের হাইকোর্ট্ প্রবেশের অনেক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "আকালের মা"—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চলনসই ছোটগল্প। আখ্যানবস্তু পুরাতন হইলেও গল্প লিখিবার 'আর্ট' লেখকের

অনায়ত্ত নহে। "বঙ্কিম-প্রতিভা"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের খিচুড়ী চর্চ্চড়ি তো অনেক হইয়া গিয়াছে; ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর নূতন কিছু বলিতে পারিলেন কি? "ভারতবর্ষের" কতক গুলি 'চ-বৈ-তু-হি'র আলোচনার আমাদের স্থানাভাব, প্রয়োজনও নাই। "গৃহদাহ"—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আর একখানি উপন্যাস, এই সংখ্যায় আরম্ভ হইল। আমরা আগ্রহের সহিত ইহার ক্রমপ্রকাশ প্রতীক্ষা করিব। সার আশুতোষের সুলিখিত শিক্ষাপ্রদ সুন্দর অভিভাষণ বঙ্গের প্রায় সমস্ত মাসিক-পত্রেই স্থান পাইয়াছে, সুতরাং "ভারতবর্ষ"ও বাদ যায় নাই। "লাবণ্য"—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'নিতান্ত-গল্প-নয়',—তবে কি? ধর্ম্মতত্ত্ব সোজাসুজি লিখিলেই ভাল হইত, "নারায়ণ"-মন্দিরের আবর্জ্জনার মধ্যে নির্ম্মাল্যের খোঁজ করিয়া লাভ কি? "বঙ্কিম-চর্চ্চরীর" সুপকার আমোদর শর্ম্মা হঠাৎ ছোটগল্প লিখিতে যাইয়া প্রথমেই তরুণী নাতিনীর গাল খাইয়াছেন। "ভারতবর্ষের" "সাহিত্য-প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। কিছুকাল যাবত "ভারতবর্ষের" "জলধর"-বর্ষণ-স্নিগ্ধ শ্যামল বক্ষে এই "সাহিত্য-প্রসঙ্গ" কণ্টকগুল্মের মত গজাইয়া উঠিয়াছে। মুরুব্বিয়ানার ধাঁচ দেখিয়া বোধ হয় সমালোচক বর অমরেন্দ্রনাথ বয়সে তরুণ। যদি তাহাই হয় তবে অন্যের লেখার আলোচনা কালে তাঁহার একটু শ্রদ্ধার ভাব মনে রাখা উচিত। অতিরিক্ত মুন্সীয়ানা অনেক সময় ধৃষ্টতার নামান্তর হইয়া পড়ে। পরের লেখার উপর মুরুব্বীয়ানা ফলানো খুব সোজা, এই জন্যই সমালোচকের এত ছড়াছড়ি! সমালোচকের কর্ত্তব্য মহৎ—কিন্তু গালাগালির 'উতোড়' দ্বারা তাহা সাধিত হয় না। প্রবীণোচিত সংযম সমালোচনার পক্ষে অপরিহার্য্য। আজকাল একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিলেই আঁতকিয়া উঠে। "ভারতবর্ষের" "সাহিত্য-প্রসঙ্গ"-লেখকও বোধ হয় সেই শ্রেণীয়। জানিনা কেন, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠিলেই এই সমালোচকের "চক্ষুস্থির" হয়। দুর্ভাগ্য কাহার?—রবীন্দ্রনাথের কি? বিগত পৌষ-সংখ্যায় "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "কবি ও ঋষি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমালোচক অমরেন্দ্রনাথ ধৈর্য্য হারাইলেন কেন বুঝিলামনা। এই সুবুদ্ধি সমালোচকের মতে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 'চা' এবং 'ক্যাশবাক্সের' মতই সাধারণ এবং যে বিদেশী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করে সে আনাড়ি! বড়কে গাল দিলেই যে বড় হওয়া যায় না ইহা আমাদের উদীয়মান সমালোচকগণ কবে বুঝিবে! নবপ্রকাশিত "পরিচারিকা" পত্রিকার সমালোচনা করিতে যাইয়া লেখক বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নব্য-কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়কে লইয়া পড়িয়াছেন। যেভাবে সমালোচক মহাশয় কালিদাস বাবুর 'হেমন্তোৎসব' কবিতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার রসজ্ঞতার বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। কবিতার বিশ্লেষণ মানে উহার dissection নহে; ফুলের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে হইলে উহার দলগুলি ছিঁড়িয়া দেখাইতে হয় না। এই বিশ্লেষণ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে নিতান্তই গালাগালি করিতে হইবে তাই এই অদ্ভুত প্রয়াস। সুতরাং ইহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। পরিশেষে বক্তব্য এই যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের সম্পাদকতায় "ভারতবর্ষে" যে বিশিষ্টতার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম মাসিক সমালোচনায় এইরূপ অসংযমের প্রশ্রয় দিয়া তিনি তাহা বিনষ্ট করিতেছেন।

শ্রীসমালোচক

গ্রন্থ-পরিচয়।

খুকুর কথা।—স্বর্গীয় চারুবালা দেবী ও দিদিমা লিখিত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

প্রথম শিশুর আগমনে মায়ের মনে যে অপরিসীম আনন্দের খরস্রোত প্রবাহিত হয়, এই পুস্তক তাহার একটী ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত। মায়ের সীমাহীন সুখ খুকুর জীবনী লেখায় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু মা খুকুর কথা দুই বৎসর দশ মাসের বেশী আর লিখিতে পারেন নাই। দারুণ কাল তাঁহাকে এ পৃথিবীতে থাকিতে দেয় নাই। তারপর দিদিমা খুকুর জীবনী আরও কিছুদূর অগ্রসর করিয়াছেন।

একটী শোকসন্তপ্ত পরিবারের আনন্দের দুলাল 'খুকুমণির' এই ক্ষুদ্র জীবনীটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তা' ছাড়া ইহাতে শিক্ষনীয় বিষয়ও অনেক রহিয়াছে।

ইউরোপে বিশেষতঃ জার্ম্মেনীতে শিশুর মনস্তত্বের দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট। মানুষ যে একটী ক্ষুদ্র মন লইয়া সংসারে আসে তাহাতে কি কি উপাদান থাকে এবং কিরূপে ক্রমে তাহার পরিণতি হয়, পণ্ডিতদের তাহা একটী আলোচ্য বিষয়। এই জন্য শিশু কত বয়সে বস্তুর অবয়ব, বর্ণ বা দূরত্বের ধারণা করিতে পারে, কত বয়সে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচিত হয়। কিন্তু এ সকলের উত্তর শিশুর দৈনন্দিন জীবন হইতে সংগ্রহ করা ভিন্ন উপায় নাই। এই উদ্দেশ্যে অনেকে শিশুর জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে বয়োবৃদ্ধি পর্য্যন্ত তাহার দিনের পর দিনের ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলার পরিবারে একজন মা এইরূপ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? কত বয়সে, কি অবস্থায়, শিশু কি ভাবে কি করিল, মা তাহা সমস্ত লিখিয়াছেন। অথচ ইহাতে বিজ্ঞানের কার্কশ্য কিছুই নাই। সর্ব্বত্রই মায়ের অপরিসীম আহ্লাদ আমাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া দেয়।

আমরা এই পরলোকগতা জননীর তৃপ্তিকামনা করি এবং যাঁহারা তাঁহার 'খুকুর' কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

কর্ম্মখালি।

বাঙ্গালী পল্টন।

পেন্সন ও অন্যান্য পুরস্কার আছে, উন্নতি যথেষ্ট। মাসিক বেতন মায় খোরাক পোষাক প্রায় ২৭৲ টাকা, তন্মধ্যে নগদ ১১৲ দেওয়া হয়। ন্যূনপক্ষে যাঁহাদের উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, বয়স ১৬—২৫ বৎসর তাঁহারা সত্বর স্থানীয় সবডিভিস্যানাল অফিসার, রেজিষ্ট্রার, অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারিলে ১৭৲ বেতনে নায়েক বা লান্স নায়েক, ২০৲ বেতনে হাবিলদার, ৬০৲ টাকা বেতনে জমাদার এবং ১৩৭৲ টাকা বেতনে সুবেদার পর্য্যন্ত হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত স্বদেশ-রক্ষার্থে আর এক নূতন সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষেই থাকিতে হইবে। বেতনাদি একই প্রকার।

ঠিকানা—ডাঃ এস্, কে, মল্লিক, ৪৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Register No. C. 740.

VOL. 6. No. 11 & 12.

FEB. & MARCH, 1917.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy 0-8-0

EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

ORIENTAL SOAPS.

FOR

They are the best for economy and complexion

THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

GOABAGAN, CALCUTTA.

Tel: "Kowstove," Calcutta.

REGINUS

To sufferers from bodily fatigue, nervous prostration, loss of memory, energy and manly spirit, constipation, loss of appetite sleeplessness, and other troubles, Reginus acts like magic. Bot. Re. 1 each.

DIABETES—the troublesome symptoms are quickly relieved. Excessive urination with discharges of Saccharine matter, high specific gravity, and all other troubles, are successfully combated. Bot Rs. 3 each.

ASTHMA—with dry cough, hard breathing, with sticky phlegm, tightness of chest, heavy perspiration, sleepless night, periodical fits, etc. Cured completely with our specific remedy. Bot. Rs. 5 each.

Ranaghat Chemical Works,
Ranaghat, Bengal.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
J. G. Cumming, C. S. I.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
B. C. Allen Esq., B.A., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan.
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Pramotha Nath Rai Chaydhuri of Santosh.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra.
Jaladhar Sen.
Jagadananda Roy.
Binoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College.

CONTENTS.

Lord Carmichael		
Law and Human Progress	Dr. Naresh Ch. Sen Gupta, M. A., D. L.	295
Jessore Antiquities	Abani Chandra Chatterjea (Dy. Magistrate)	305
The Pseudo-Callisthenes	Prof. J. N. Das Gupta, M. A. (Oxon)	307
An Introduction to the Study of Archæology	Monomohan Ganguly, B. E. ...	309
The Coming of Summer, England ...	D. G. D.	322
East Bengal Notes and Queries (Notes on Antiquarian remains on the Lakshya and the Brahmaputra) ...	Nalini Kanta Bhattasali, M. A., Curator, Dacca Museum	323
The Vilayatnamah—an unpublished manuscript containing impressions of a journey to England and back in 1795 A. D., with a Foreword by	Khan Bahadur Syed Aulad Hasan, M. R. A. S., ...	327

সূচী।

	বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
১।	বঙ্গীয় গৃহশিল্প সমিতি ...	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	২৮৯
২।	লক্ষ্মী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ ...	২৯৫
৩।	ঋগ্বেদে লিখন-প্রণালীর আভাষ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ	২৯৬
৪।	বসন্ত লক্ষ্মী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ ...	৩০৪
৫।	জাপানের যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে ...	৩০৪
৬।	বৃন্দাবন অন্ধকার (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত ...	৩০৬
৭।	প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়-কৌশল	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ	৩০৬
৮।	বসন্ত (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ...	৩১২
৯।	চীন ও ভারত সন্তান ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ	৩১৩
১০।	সখী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে	৩১৫
১১।	কণ্ঠহার (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশ গুপ্ত ...	৩১৬
১২।	বঙ্কিম প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস ...	৩২১
১৩।	বর্ষ-বিদায় ...	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩২৭
১৪।	মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ...	শ্রীযুক্ত সমালোচক ...	৩০২

LORD CARMICHAEL.

The farewell notices which have recently appeared would seem to have done the late Governor of Bengal something less than justice. The fact that he was not only a Governor but a Governor-in-Council appears to have been largely overlooked; though *suavis in modo*, it is hinted that he was anything but *fortis in re*. Time alone will enable his stewardship to be viewed in the proper perspective, though memories are short. In the meantime it is conceivable that he will himself not quarrel greatly with the immediate verdict, short-sighted as it may be. But it is of his late Excellency as a man and not as an ex-Governor, that we would write to-day.

He came to Bengal in troublous times. The appointment was none of his seeking and involved heavy personal sacrifices which he was in no position to bear. Yet he cheerfully accepted office as a public and a patriotic duty and few know how great were the burdens he faced with an uncomplaining philosophy.

A quixotic philosophy was indeed one of the keynotes of his character. Simplicity was another, but a genuine human kindness was his most characteristic trait. He was genuinely interested in his fellow human beings and his accessibility to all was no mere affectation. He was probably no great reader. The world of men—and—women—were his books. In this respect he closely resembled His late Majesty the King-Emperor Edward VII with whom he had many characteristics in common.

What probably gave him the greatest pleasure in holding high office, was the extended opportunity it afforded him of doing still more of his fellow beings a good turn. No act was too small if it gave pleasure to another, no trouble was too great if he could help somebody; he was sufficiently repaid by the genuine pleasure that the doing of a kindly act afforded him. A rare gift, my masters; "so shines a good deed in a naughty world."

He was also transparently simple in his tastes. If high office afforded him pleasure in one direction, it is certain that it gave little in another. "I hate to be your excellencied," he wrote to a friend, "I am not at all excellent and I don't know why I should be called so."

His attitude to life was one of a genial and whimsical humour. He was the embodied antithesis of the Prussian junker. In a scale of psychology one would be safe in putting the Kaiser at one end—it is unnecessary to specify which—and Thomas, Baron Carmichael of Skirling at the other.

Yet with all his innate simplicity, he was a shrewd judge of men. He had not studied his fellow human beings for nothing, and was far too interested in them not to recognize their little foibles and their good points. Whatever else our late Governor was, he was certainly no fool. A man of the world, he took the world as he found it and avoided the mistake of tilting at windmills. The lines of his governorship were laid in difficult places and coincided with difficult times,—too difficult perhaps to admit of any great public advances during his tenure of office,—but he escaped the shoals which reputedly cleverer men before him foundered on, and the credit is equally attributable to his qualities of heart and head.

Though of Scotch descent and proud of his nationality, he was a most typical Scot. His open-handed hospitality and his boundless generosity will long be green in the memory of Bengal.

He was full of the joy of life, though life had in many ways dealt harshly with him. It was a pleasure to witness the zest with which he recounted memories of his 'varsity days and how naturally he slipped into 'varsity slang. The "stinks" tripos was his early ambition, resigned for history in his third year, in which in spite of his tutor's melancholy prognostications he did well.

A liberal in his political creed, he practised though he did not preach, and the tradition he has left behind him in this respect is the happiest augury for the future of the line of Governorships it was his lot to inaugurate in Bengal. His gift of public speech is too well known to dwell on here. With innate modesty he recognised and took a

sincere pleasure in his power to sway his audience to mirth, While no orator in the accepted sense the happy turn he would give to an expression or to an idea is familiar, and particularly the curiously effective repetition of a phrase. It may come as a surprise to know that he admitted to a natural shyness of disposition, which he never quite overcame in spite of his public training. He was full of a whimsical humour which never displayed itself maliciously or unkindly, and a good story is extant of how he gently but unmistakeably scored off a clerical gentleman who allowed his zeal to outrun his discretion.

Though at times in indifferent health, he cheerfully and unflaggingly stuck to his duties in the face of indisposition which might fairly have discouraged a less conscientious or a less courageous man, and the physical exertion he was capable of under the circumstances was astonishing. To say that he had the defects of his virtues is merely to say that he was human, and it is for this, that he would probably wish to be remembered.

In short His Lordship is a fine example of his race and of his caste. The British Empire is rich in this asset, and though in these more democratic days less store may be placed on the character of her pro-consuls, her consolidation and growth will long be due to the unconscious influence of many such—an English gentleman. Salve et vale.

THE DACCA REVIEW

Vol. VI.	FEB. & MAR., 1917.	Nos. 11 & 12.

[library stamp]

LAW AND HUMAN PROGRESS.

"Law is the king of kings, both human and divine, it ought to be the controller, ruler, commander of both the good and the bad and thus to be a standard as to things just and unjust and director of beings, political by nature, enjoining what ought to be done and what ought not to be done." Thus Chrysippus the Stoic is quoted to have said. In the literature of law and outside it, it would be easy to find passages in abundance to cap this in the high terms in which law is spoken of. Law has certainly not suffered from under-estimation. Nor are the panegyrics confined to a highly metaphysical notion of law which the Stoics and from them the Roman jurists had. The language if less picturesque is equally emphatic with reference to law in the sense of concrete state-enforced rules. Thus Hobbes, after drawing a fearful picture of the "Condition of Warre" which men would be in, says that State was brought into existence by men with the object "of getting themselves out from that miserable condition of Warre, which is necessarily consequent (as hath been shewn) to the natural Passions of men, when there is no visible power to keep them in awe and tye them by fear of punishment to the performance of their covenants, and observation of the Lawes of Nature."

And so too Austin and Bentham, Thering and a whole host of those who have followed them.

Whatever we may think of the exact opinion of these authors there is no question of the great importance of Law in the life of society. I mean the law which is enforced by Courts. It is undoubtedly one of the most important aspects of human civilisation and a product of it which holds society together and helps very materially to

keep civilisation on the move. There can be no question that so long at any rate as there is the beast in man, the terrors of the law must be indispensable for human progress—nay even for the bare maintenance of society.

It is good to feel however that there is room for hope that this will not be for ever. There is plenty of material in the past history of law and in a study of the part it has played in the making of society to justify the notion that law like most things else is merely a passing phase of civilisation and that human society must pass out of the bondage to law. It would no doubt be absurd to hope to predict what the great future will be but we know this that as in most other lines of progress revolution here shall end where it began, the end of law would be very like its beginning.

Of course I am speaking of Law as state-enforced rules of justice. There is another sort of justice which is not enforced by the state and which, possibly, cannot be formulated in general rules and which it is impossible for us to think of away from human society, for it was not pure fancy on the part of Plato that justice is the principle which holds together all the diverse elements of society and finds the proper place for each.

I shall invite your attention to three streams of development in the history of law which lends justification to the hope that the progress of law is a steady march to its decline and the rise in its place of a more glorious humanity which will have no need for laws laid down and enforced by states.

The first of these lines of progress is the one which shows the steady decline of brute force and its increasing subordination to Reason in the domain of law. Eminent scholars who are likewise great jurists have pointed out that all law originates in the instinct of revenge. When you are hurt you start. You get your revenge by your own efforts, and by the aid of members of your family or your class. It is out of this that bloodfeuds grow.

At a certain stage of progress this tends to get somewhat organised instead of being left to the sweet choice and to the powers of the party aggrieved. There grows up a rough and ready rule —the lex talionis—the law of an eye for an eye, a tooth for a tooth. Retaliation which was equal to the original wrong was approved by people—what succeeded it was condemned. The people's voice had something to say—to determine what amount of revenge would be justified. Out of some such feeling must have arisen arbitration or reference of a dispute to a disinterested party for adjudication.

We have no evidence of what this primary arbitration was like—its existence is a matter of inference, an inference suggested by the formalities of the Legis Actio sacramento of which I shall presently speak. We may

presume however that all that the arbitration could do at first was to adjudicate whether one had the right to retaliate and to what extent. Side by side with this there grows up the possibility of retaliation being replaced by pecuniary compensation. People there were now who would be content to take some wealth rather than kill or maim the enemy. The edge of the sense of revenge, its most savage features had thus been to a certain extent taken off before we come to the judicial regulation of self-help.

How did the state come in as an arbiter of these disputes? We can say with some assurance that we get a hint and more than a hint of the answer in the oldest Roman form of action, the procedure by which *actions are initiated before the Legis* Actio sacrament. I shall not describe in detail the ceremonies which had to be gone through before you could invoke the aid of the prætor in the settlement of the dispute. I shall only state that the Plaintiff and the defendant practically went through a pretence of preparing to fight with what represented lances over something which represented the subject of the dispute in the presence of the Prætor. The Prætor then intervenes by asking them to desist and proceeds to appoint a judge or arbitrator to decide the dispute between them. The parties agree and a judge is appointed with the consent of the parties. This iudge then decides the dispute.

It is permissible to conclude from the description of this action that the king intervened at first as a disinterested third party in the interests of peace and tried to induce parties to refer the matter to arbitration rather than decide things by self-help. With the development of kingly power the inducement gradually changes to compulsion, and starting from regulating self-help the king gradually begins to compel the injured party to receive compensation in money and to restrain reprisals with a high hand. The law as we now have it can hardly be recognised as the daughter of Revenge—It has become largely humanised and rationalised. Men are now better disciplined than to require the drastic punishment of unregulated or regulated retaliation—*they obey the law with sanctions far* less brutal.

This process goes on everywhere and as it goes on we trace its further history The whole tendency of law is towards its greater humanisation and rationalisation. This proceeds side by side with the increasing discipline of men. A discipline which, as it grows, often makes the old drastic rules archaic; a remarkable instance is furnished by a rule of the Roman law. You find in the Twelve Tables a rule that where a man sells his son thrice into slavery, the son shall thereby be emancipated, that is, freed from the authority of the father. To make this rule intelligible I ought to tell you that in Roman Law,

as in most other systems of archaic law the father had the *jus vitae et nescis*—the right of life and death over his child and could sell him to slavery or do anything else with him. This piece of archaic law tried to put a stop to the unnatural cruelty of fathers in selling their sons into slavery, yet such was the strength of public feeling in favour of this valued right and so weak the sense of the outrageous cruelty of of the transaction that the law did not venture to put an end to this right altogether or even to declare that the son would be freed from the unnatural father's yoke the moment he had thus abused his powers. No, if the son chanced to get back his liberty his father's power would revive and he would be able to sell him again into slavery—and once more again. This reforming law went only so far as to say that after the third sale the father's power would terminate.

This rule must have been very old and in the Twelve Tables it was a relic of the forgotten past retained in a far different shape from what it originally was. After the Twelve Tables we find this provision' of the law largely put into action but not for its original purpose. For that it was no longer needed. Society had so far improved, men had been so much better drilled that no such rule was necessary to check the unnatural father—he had died out. The rule was retained because it served as practically the only means at that date of emancipating children. If you wanted to give full legal status to your son out of affection or to deprive him of his inheritance, in either case you could do it by putting him out of your power. You could not do this by simply telling your son "go, I dont want you"—To do this you had to get hold of a friend and go through a sham operation of selling your son to him. Then your friend manumits or frees your son. You go through the ceremony again, the son is again manumitted. You do it once again. The son is manumitted again. Well your power over the son is altogether at an end by the penal law albeit that the sale was only a make-believe.

You have a somewhat similar case in Hindu Law. There is no doubt that the ancient Indian Aryan had the power of life and death over his son just as well as the ancient Athenian or the Roman. The stories of Sunahsepha and of Nachiketa in the Vedic literature are founded upon the assumption that such right exists, though in the story of Sunahsepha we find the father severely condemned for his extreme unnatural cruelty and ultimately we see him losing his paternal right over his son who becomes a son to Visvamitra. A later and a more humane stage of law is reached when we find the Vedic rule that though you must give away everything that is your own in Visvajit sacrifice, you must not give away your wife or son. The notion that the son was

property just like your cattle or your slave was slowly decaying. The rule that a father can give, sell or pledge a son is retained in the much later work of Gautama. But obviously like the rule of the Twelve Tables it is retained to serve quite another purpose—it is the rule upon which is founded the authority to give and take a son not as a slave but as an adopted son, who might of course be either given or sold. The rule is however soon placed under limitations which make the exercise of this power justifiable only in case of distress. So you see here also the same progress towards the humanisation and rationalisation of law and its becoming less and less drastic as men grow more and more disciplined.

This is notably illustrated further in criminal law, remarkably in ancient India. You start in criminal law with very drastic penalties, death, amputation of the offending limb and branding being the greatest favourites and these penalties are attached to various offences according to their definitions, without any attempt to differentiate between the criminal qualities of the same offence done by different persons under different circumstances. There was a fixed penalty for each wrong. At a later stage of development you find money compensation and fine taking the place of more drastic penalties and detention in prison and whipping devised as alternative modes of punishment. Even now the penalty for each offence is fixed and unalterable. In course of time you find distinctions drawn between different varieties of the same crime in great detail and the rigour of the uniformity of penalties thus greatly relieved. In the stage of development of the law which you find in Manusamhita you find however the wholesome and rational rule laid down that the king in awarding sentences must have regard to the time and place of the occurrence, the power of the culprit, his mental equipment and other circumstances and to make the sentence correspond with the real turpitude of the offence. In other words this is the rule now generally recognised that sentences can never be generalised but must be awarded with reference to the particular facts of each particular case.

It is hardly necessary to multiply instances of the increasing humanisation and rationalisation of law which at the same time proves the improving discipline of men. Things which had to be enjoined in ancient times by most drastic penalties are now done as a matter of course and no lawgiver now troubles to legislate about them. This is a fact which is full of hope to the human race. Despite occasional lapses great and small—great as in the case of the present war—and small as in the case of individual wrong-doers—we have made enormous progress in moral discipline. This we can see at once if we compare the laws of the present day with laws of the distant past.

Can it not be said then that human society will some day reach a stage when co-ercive law will no longer be necessary? That end is not yet nearly in view—but we can hope that it will come.

To this there are those who object that in point of fact the restrictive laws of to-day are far more numerous than they were in bygone days. Lord Rosebery once observed in a speech that a survey of the legislation of the world in any recent year shows an enormous and increasing number of laws which restrict liberty and compel people to do things under penalties which heretofore they were free to abstain from doing. This no doubt is a fact—but it does not go against the argument that the need for restraint is much less now than in the past. The restrictive laws of to-day are the result of a widening of the out-look of social life and of the state undertaking liabilities which it never thought of before. That you cannot build your house in what way you choose nor throw your sewage into your own pit nor have windows to your house of less than the regulation number and size—nor sleep in a garret with less than the regulation air space—rules like these do not negative the idea of increasing discipline of men —they simply show that there is a vast deal more of ground to cover yet before the goal is reached, that the discipline has got to be extended to all spheres of life and nothing more. The end may be far distant, but we are coming to it.

The next feature of legal history to which I shall draw your attention is with reference to the nature of law itself. We start with the conception of Law as a supernatural thing—a voice of the Gods which does not exist as general rules but has to be found out for each particular case by divine grace. This law, in Aryan societies at any rate is administered, not by the king but partly by a body of persons of special sanctity or learning and partly by the learned and aged men of the village. The next step leads us to laws which are embodied in fixed general rules and which have lost a great deal of their supernatural sanctity. Yet a sort of sanctity attaches to them as the embodiment of what has always been done. Then slowly, in communities where the religious community has not made a monopoly of statecraft and where the history had the opportunity of being played out without interruptions such as fell to the lot of Hindu India—slowly we find the truth being realised that legal rules are dictated by the needs of society and must change with changing needs. The recognition of this truth leads to the adoption of subterfuges, for the amendment of laws can be changed to suit the circumstances of society in order, to speak in the language of evolution, to adapt it better to its environments. This is the stage to which we have now come but

it is clear that this is a very unstable condition. A sacred law can conceivably remain the same for ever but not a law which is committed to change like this. Once you recognise that law should be changed and adapted to the requirements of justice in the society in which it is free, you have got inevitably to recognise the further fact that even this does not enable you to realise perfect justice. For it is impossible to formulate any general rule which if enforced literally will not cause hardship in particular cases, no matter how obviously just the general rule may be. The trend of recent law-making has therefore been to give an increasingly large discretion to judges in the administration of laws.

It is well to recognise that no one will be able to formulate all that justice means in any body of general rules. The concept changes and expands from day to day and in its application to the facts of particular cases. You cannot have ideal justice by any rule of the thumb. Justice is in fact an ideal which guides you in determining what is just in a particular set of facts but does not yield to a perfect definition by any body of set rules. This is not a matter of mere metaphysic—it is common experience. Every lawyer knows what a great deal has been achieved by modern law in the way of making it flexible so as to enable Judges to adjust reliefs according to the facts of each case. Every lawyer knows likewise that in many cases, with the utmost straining of the law the judges cannot help doing injustice, in administering justice according to the law. A hard case makes bad law is a trite saying and it stands as true to-day as two centuries ago. There can be no question that perfect justice cannot be achieved so long as a hard case continues to make bad law.

Already there are signs of impatience all the world over with these limitations of law. The "slavish adherence to precedent" which was the pride of the old Common Law Jurist and which was consider so good that Lord Eldon in his famous justification of Equity could say nothing better than that it was absolutely tied down to precedent—this is now being felt as an irksome burden and in England and America, more notably in the latter country there seems to be a tendency to look to principles rather than to precedent and to adapt rules of laws to the facts of each case.

Is this not a slight forestate of coming days when law will cease to exist—law in the sense of settled rules and justice be administered with regard to the merits of each particular case just as it was done very largely—in spite of laws—in Ancient Athens—the city which in this as in most things else was very much ahead of her times. And when it comes to that, who should be best fitted to do complete justice—the distant judge who looks to what

is sworn to by unknown witness, or neighbours who know exactly how the words of each man have to be weighed. If then we are coming back to the village tribunal judging each case with regard to its merits—law should have come very near the end of the cycle which is so often found completed in the revolution of the world.

There is yet another feature of the history of law with reference to which it is far less rash to make predictions. It is its increasing unification. The laws of ancient times embraced small communities and there was a different set of laws for each hundred miles or less. The law of Rome was not the law of Latium and far less of Etruria. The modern systems of law which have largely arisen by the fusion of the laws of great bodies of people cover extensive areas. Not only so, of recent years there has been a real though tardy progress towards what I venture to call unification of laws in Europe and America—which would apparently mean, in the long run, unification all over the world. Comparative jurisprudence and comparative Legislation have become absorbing studies in recent years and a Legislature seldom sets about legislating now without first getting to know how other countries deal with the same matter. Besides, the vast developments of Private International law in recent times and the Conventions held for the discussion of matters arising out of it have led to a much closer approximation between the laws of different countries than existed before. The hope can indeed be entertained that this process of approximation will go on till we come to the time when it will be possible to say that there is the same law all over the civilised world.

If that stage ever comes when the laws or the fundamental principles of the laws and the great body of its concrete rules must be the same all over the world the law will at last cease to have much of its present day characteristics. The dependence of law on the will of the sovereign of any particular country would grow much less and its international character would secure it against being overwhelmed by the caprice of individual sovereigns or legislatures. And it may be that we shall come back to the old distinction between the particular and the Universal which is made familiar to all students of law by Roman Jurisprudence in the distinction between Jus Naturale and Jus Civile, a distinction which finds its parallel in Hindu Law in that between the Universal sacred law and the particular customs and the kingmade laws of a country. There are some matters—of comparatively little moment beside the greater interests of men—in which the state laws must be different, as within the same state local customs within a still narrowing range would differ. But all the more important interests of men which form

the domain of Private Law are bound ultimately to be absorbed by one Universal law if such a law is developed. Where a Universal law has existed side by side with local law, there has never yet been a single case in history in which the Universal has not swamped the local. This happened in Rome. This happened in India. This also happened on the continent of Europe where the Roman law established itself as the common law and pushed the customary law to a corner.

The modern history of European law is hardly an exception to the rule. It is no doubt true that recent legislation has tended to diversify the law in the different countries in Europe where before this the Roman law was supreme. But this diversification has been called forth by the inadequacy of the Roman law to cope with the changed conditions of life even with all the emendations of the post-glossators. Through this diversification law will come to a still greater unity in which a truer universality and synthesis will be achieved. This is what happened in ancient India, where starting with a common root the laws tended to diversify as they were called upon to meet new conditions of life in the different countries to which they were carried. This diversification was however the stepping stone to a much fuller unity which was stopped in its development by the unfortunate history of the later days of Hindu India.

These are the three features of the progress of law which I believe give us a great deal to hope about the future of humanity. I am far from saying that these are arguments from which you can logically conclude that law will die out and the present day social organisation founded on punishment will yield. But these are some of the reasons which justify a hope—a hope which means the decline of an institution and a science which has with a large amount of justification been looked upon as one of the noblest and finest products of the human mind. That it undoubtedly is and it is moreover certainly a great and generally very reliable index of the state of progress of a community through not an unfailing one. Thus, for instance, it would take a lot of sophistry to convince one that the palmiest days of Roman jurispudence were those in which law reached the climax of its development or that the great commentaries and Nibandhas which are the proudest monuments of Hindu jurispudence were compiled in the days when Hindus were at the topmost rung of civilisation and progress. The truth in fact lies the other way about. The highest flights of jurispudence are generally found to have been taken when society is on the decline.

This is perfectly consistent with what I have stated to be the natural progress of laws. Laws have a very important influence on the development of society and in moulding human

minds according to the ideal of justice. But as society advances in discipline the laws have gradually got to be relaxed. If on the contrary a fancy for artistic finish of the law leads to their greater systematisation, and exhaustiveness they clog the further-development of the race by imposing unsuitable restraints. The temptation to give too much importance to their science and too little to the growth of society is a general failing of the lawyer class.

If society is to progress therefore law must cease to be at least what it now is; it must represent the ideal of justice much more fully and must therefore be largely individualised. On the other hand the fundamental principles implied in the ideal of justice must become more and more purely rational and universal. That means the end of law with all those refinements and subtleties which is the pride and the stock in trade of the lawyer. It will cease to be law as it is now understood. The vast mass of learning and enormous libraries of law which made Dean Swift despair when they were much less than what they now are must take a place, if not in the lumber room of human thought, in the same shelf with ancient curios as the library of AssurBanipal—as interesting perhaps to the historical student and as useless for work-a-day life. The subtleties of law will rouse interest for long ages to come and will perhaps take rank beside the elaborate moral catechisms and casuistical subtilities which were the delight of the clergy in the middle ages and which perhaps had their own day of usefulness when moral ideas of men were yet in the making.

This end is surely not yet in sight, but the prospect, if it is true would appear to be disheartening to those votaries of law who work in the faith that progress of society would mean the approach of law to greater perfection in the sense in which they understand it. But properly appreciated there is nothing disheartening in the end of law that I have sketched out. The world is one perpetual creation and the pride and glory of each life and each institution lies in exhausting itself in giving birth to a fuller and more developed future. That law has performed and will still perform for ages to come a most important function in moulding and disciplining human mind cannot be questioned. If its future should mean the completeness of its work and that it should die out in the perfection of that discipline it would be enough to satisfy the ambitions of a jurist. His ambition would have been satisfied in the highest measure in which human ambition can possibly be satisfied. To ask for more may be natural, but to be denied more is as inevitable.

NARES CHANDRA SEN GUPTA.

JESSORE ANTIQUITIES.

In olden times, the building of roads was considered to be a very pious act by the people of our country. The metalled road to Puri perpetuates the memory of Maharaja Sukhamay Ray of Calcutta. In the Jessore District the late Babu Kali Podder of Bagchar got a metalled road built from Jessore to Chagda where the Bhagirathi used to flow in old days, to enable Hindus to take their corpses to the sacred river for cremation. Chagda is in the Nadia District and stands on the E. B. Ry. This road is bordered with rows of big trees on either side and looks very picturesque. A traveller on the road does not require an umbrella even when the sun is at its meridian. Quite close to the above road, a short distance from Benapole Ry. station on the E. B. Ry. (formerly B. C. Ry.), stand the ruins of the palace of Raja Ram Chandra Khan, which is marked in the Government Survey Map. The palace is surrounded by a silted up moat and contains heaps of bricks here and there and several tanks. A Brahmin has built his house in a portion of the compound and erected gardens near it. Out-side the compound but close to it there are several very old big tanks such as could have been constructed by a Raja. The name of Raja Ram Chandra Khan, who flourished about 400 years ago, is closely associated with the spread of Vaishnavism. He tried his best to dissuade people from conversion to that religion and persecuted the apostle of Vaishnavism, Haridas Sadhu, who lived in a cottage in the jungles not far from the Raja's palace and used to utter the name of Hari (Hindu god) 3 lakh times every day. The Raja's attempts to divert Haridas Sadhu's mind by sending a beautiful prostitute (Hasina Gazlia of Gaurta) to tempt him utterly failed as she herself became a convert to Vaishnavism. There are various traditions about the death of the Raja. While all agree that he was attacked by the Muhammadans, some say that he lies buried with his whole family and the precious jewellery he possessed beneath the debris of his palace. Men shun the debris as something unholy. A *mela* is however held annually at the spot where Haridas Sadhu's insignificant cottage stood within the jungles. The *mela* sits on the *Askhayatritia* day in Baisakh and lasts for 3 days. *Baishnabs* come from remote places and sing the name of *Hari* (God) at the *mela*, continuously for 3 days and nights. The *mela* ends with *Dhulat i.e.* song sung by *Baishnabs* after removal of dust from their bodies, followed by *Annakhettra i.e.*, public feast. It is said by the local people for that Raja Ram Chandra Khan was a Barendra Brahmin and the prostitute whom he sent to Haridas Sadhu was

generally known as Hira Nati. Local people also say that when the Muhammadans attacked his palace, the Raja took shelter with his family in an underground cell, the door of which was padlocked by his servant Kelo (a Muhammadan) from above. Kelo was however killed by the Muhammadan enemies and the Raja lies buried in the cell. Haridas Sadhu was a contemporary of the apostle Sri Chaitanya who died 382 years ago, at the age of 48 years. Haridas's remains lie buried on the sea-beach in Puri. Haridas preached one God and asked men not to differentiate between the *Koran* (Muhammadan Book of Religion) and the *Puran* (Hindu Book of Religion).' It is said that Haridas—though the son of a Brahmin—was brought up in a Muhammadan family. The more accepted belief is that he was not the son of a Brahmin but a Muhammadan's son. He was no other than Mahammad Ali, son of Ibrahim of Buranba. Any now Haridas Sadhu is known as *Jaban* Haridas (Muhammadan) and the aim of his life was to preach the unity of Hinduism and Muhammadanism. Haridas was persecuted by the Muhammadan rulers in various ways but he did not waver in his faith in the unity of Hinduism and Muhammadanism. There are 2 famous books on the life and teachings of the apostle Srichaitanya, viz, the Srichaitanya Bhagabat written by Sri Brindaban Das about 367 years ago and the Srichaitanya Charitamritam written by Sri Krishna Das Kabiraj Goswami 300 years ago. In both these books we read accounts of Haridas Sadhu and his persecution by the Kazi. Haridas was a man of beautiful appearance. His hands reached down to his knees, his eyes were like lotus and his face was like the moon. We read that Haridas was mercilessly beaten in 22 markets under the Kazi's order and then thrown into the Ganges, as dead. The Lord God protected Haridas and he survived all persecutions. He was the favourite disciple of Srichaitanya, who after Haridas's demise danced with Haridas's dead body on his arm. In the Jessore District, Jatra performances are held even now about the romantic life and wonderful teachings of Haridas Sadhu. The Lord has kept his memory green. His life is a vivid example of the cosmopolitan nature of Vaishnavism which gladly embraces within its folds men of all classes of society. A controversy has been started of late about the location of Haridas's brith-place. A new book called *Chaitanya Mangal* by Joyananda has been discovered and it says that Haridas was born in village *Bhatkalagachhi* on the bank of the Sarna river, which place is said to be identical which Hakimpur on the bank of the Sonai river, a few miles south of Chanduria (in Satkhira subdivision, Khulna District). In the Chaitanya Bhagabat we read that Haridas was born in village Buran. Probably the reference here is to

Pargana Buran which has got lands in the Satkhira and Basirhat subdivisions. The Sonai river is the boundary between the two subdivisions and Hakimpur is within the latter subdivision.

ABANI CHANDRA CHATTERJEA.

THE PSEUDO-CALLISTHENES.

INTRODUCTORY.

In 1844 came into the hands of the English reading public a remarkable little volume of absorbing interest, entitled "Note on the historical results deducible from recent discoveries in Afghanistan." The volume is interesting from various points of view. In the first place, it is evidence of the real and living interest felt by many a large-hearted, broad-minded Englishman of culture—how different from the present-day murderous German *kultur*—in the study of India's past and of her relations with her neighbouring countries, even before the assumption of the direct government of this ancient land by the British Crown and even before India came to be an integral part of the present British Empire. The volume is further interesting as presenting a birds's eye view of a romantic chapter in the story historical research—an attempt to reconstruct a country's past with the help of materials largely supplied by numismatic studies and the examination and interpretation of long-lost inscriptions. But to many of us connected with this University, who are interested in the promotion of antiquarian research and historical studies, the volume is valuable as a memorial of the loving labours of James Prinsep, Secretary of the Asiatic Society of Calcutta and founder and editor of the Society's Journal published monthly in this city. The writer of the note—Henry Prinsep, brother of James Prinsep—while presenting his succinct account of the investigations into the past of Ariana and Bactria, regions in the neighbourhood of the North-western frontier land of India, takes us back to 1738 and to Bayer and his celebrated Latin Treatise. Coming down to 1838 and partially accounting for the comparative indifference of latter-day historical students towards these investigations he observes :—

"In 1838, while the British army was on its march to Afghanistan, the individual in India, who had done most to instigate enquiry, and to make public the results obtained, who brought to bear on each discovery a power of ingenious reasoning, acute comparison, and deep study, that made it tell as a step in advance, rewarding those who had contributed to bring it to light, and attracting new interest to the pursuit, was suddenly withdrawn from these favourite studies by an illness, which terminated in death. The journal of

the Asiatic Society, established and conducted by Mr. James Prinsep at Calcutta, ceased after the year mentioned to be the inspiring organ to encourage and direct researches in this particular field. There wanted, when he was gone the Promethean spark to kindle into light and life the dust and ashes dug out of these interesting ruins, and to extract language and sense from the rude characters, found traced on the venerable remains and relics obtained from them." It may be noted in passing that the expedition here spoken of is of more than ordinary interest even from the purely antiquarian point of view, as it recalls to our mind the earlier commercial mission of Sir Alexander Burnes and the celebrated interview between British representatives and Runjeet Singh, as also the investigations of the European officers in the service of the ruler of the Punjab and Peshwar, among whom Generals Ventura, Alard and Court are pre-eminent for the zeal with which they had carried on their researches, and who unreservedly placed the results of their labours at the disposal of interested scholars.

I have ventured to trouble you with this somewhat lengthy preface, because I am anxious to place before you a spirited protest which Henry Prinsep indites—protest by the way implying a *reproach which I feel the rising spirit of* historical research in India will not long suffer to hold good. Says Henry Prinsep—

"The information left us of the acts and expeditions of western kings in this quarter (central and Western Asia), and even of Alexander himself, is exceedingly scanty and imperfect, and we seek in vain for any reason why it should be so. The reading public of the nineteenth century, who wade through volumes of controversy upon single events of local history, and who study accuracy, and the minutiae of of great men's proceedings and motives, with a mawkish and tedious interest, may well wonder to find so little curiosity displayed by the ancients, not only as to what was passing in Aria and Bactria, but even regarding the expeditions of Alexander, Seleucus, and Antiochus; and it is the more surprising that we have no consistent account in detail of the actions and enterprises of these kings, and especially of the first of them, who so widely extended Greek dominion and Greek civilization, when such an example of correct and reasoning history had been set by Thucidydes, and when we know the pains taken by Alexander himself to cultivate the opinion of the learned of Greece, and to promote and encourage literature for the advancement of his own fame.

If, however, any man has a right to complain of the treatment he receives from history, and to lament the want of the *vatis sacri* to represent his actions and character in a true light to posterity, it is Alexander. The only justice done to him is in the affixing of the title

Great, which his name will carry with it to all time: we have little else regarding him but shallow superficial gossip, and libellous anecdotes, circulated with a view to detraction by the party which his genius and ascendancy excluded from power. It is from such materials that mankind is left to form its judgment upon the man, who holds amongst Greeks even a higher place than Julius Caesar amongst Romans, and whose fame even Caesar envied.

We do not refer here to the mere school impressions formed from Plutarch and others, of Alexander's rashness and violence, of his passion and drunkenness, his ambition for false glory, and his vain desire for deification, but to the means we possess of following this conqueror in the great enterprises he successfully carried through, and of marking the changes he effected or contemplated in the institutions and social condition of the world. There is nothing like a philosophical history, or even a true account in detail of Alexander's exploits and proceedings, in all the literature of Greece and Rome, for assuredly the works of Arrian and Quintus Curtius do not deserve that character."

It is this protest with its implied reproach which made me first think of the legendary history of Alexander in its Syriac version.

And after all, legends and popular traditions, handed down from generation to generation, are not without their value to the historical student, for, as the poet feelingly pleads—

> Deeper meaning
> Lies in the fables of my childhood's years,
> Than in life's grain of truth.

J. N. DAS GUPTA.

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF ARCHAEOLOGY.

III.

On studying Indian architecture carefully it will be seen that the architects were not arbitrary in their designs. They followed definite rules in the lay out, direction, foundation, plinth, superstructure of buildings, etc. On surveying the temple of Konârka in Orissa with theodilite and prismatic compass I found the magnetic bearing of the eastern doorway of the Jagamohan to range between 359°45′ and 360. Inspite of accurate mathematical instruments to work with an ordinary practical surveyor commits greater errors. They followed a definite rule in designing their walls. I have determined an equation with a co-efficient ranging between certain limits for the thickness of walls of *Pida* Dewls in Orissa.

Among the following seven elements of beauty in Architecture, viz: situation, proportion, harmony, form, material,

ornamentation and colour I would illustrate the element of proportion only from the archæological standpoint. The sense of proportion appealed to the Hindus of old so much that it made them lay down definite rules for it, from which the later architects are not found to deviate. On measuring the height of many temples in Orissa with theodilite I have found that the height of the Vimâna, or the towered sanctuary bears on an average the ratio of 2.5 to the length of the base thus corresponding to the text of the Agni Puran, Chapter 225, where the ratio is made to range between 2 and 3. Similarly we find a definite proportion between the five elements of which the *badá* or the cube or the rectangular parallelopiped of a temple of the Orissan type belonging to the Indo-Aryan style is composed. Mention may also be made of the definite proportion existing between the different elements of the column of the Hoysala period in Mysore.

The three conditions that a building is to satisfy are (1) the enclosing of space (2) the passage of light and air, etc. and (3) the affording of protection against the rays of the sun, the rains, etc. The Hindus like the Greeks are seen from very ancient times to comply with the above conditions by designing their structures in such a way as to necessitate the elimination of the inclined thrusts. Usually the forces called into play are vertical though the cross strain to which the architraves are subjected gives rise to horizontal tension and compression; so we see that the statical equilibrium of a Hindu structure was an easy matter leaving no room for architectural deceits or juggling as in Gothic style so strongly objected to by Ruskin, the great critic of art.

We find that the early Indians, studiously avoided the introduction of a radiating arch though they were acquainted with its very principle and use; and in our attempt to trace out its cause we find that the desire to render their buildings permanently stable led them to abandon this principle of a radiating arch and to accept the trabeate style; even where they attempted at constructing an arch as a constructive element they resorted to horizontal courses of stone as corbelling instead of radiating voussoirs. The reason is not far to seek. We all know that in a radiating arch an inclined thrust is called into play which however careful we may be in the adjustment of forces renders the structure liable to an inherent instability. There is no such difficulty in a horizontal or the tensio-compressile system.

The Indian method of construction and the use of constructive elements were indigenous in character having very little extraneous influence. For a correct understanding of this principle I would request a student of Hindu Architecture to make a comparative study of the examples he comes across with our Indian texts. Let me take

up the column as an important type of the constructive element. Those who have studied the classical orders will never find the least resemblance to them in any Hindu specimen and if they care to study the Indian texts they will find a treatment of them with their details in a different way altogether. The columns of the Greek or Roman orders without considering the flutings have a circular cross section whereas those of the Indo-Aryan type may be circular, square, pentagonal, hexagonal, octagonal, or 16-sided in cross section and they have been termed differently as per their cross section.

Circular	...	Chandra Kânda.
Square	...	Brahma Kânda.
Pentagonal	...	Siva Kânda.
Hexagonal	...	Skanda Kânda.
Octagonal	...	Vishnu Kânda.
16-sided	...	Rudra Kânda.

The monolithic column standing in front of the temple of Jagannâth at Puri is a type of Rudra Kânda.

Regarding the component parts with details of a column also the classical and the Indian orders show a great difference. The classical order consists of three parts, the pedestal, the shaft and the entablature; whereas the Indian order consists of the pedestal or *upa-pitha*, the base or *Adhisthâna*, the shaft or *stambha*, the entablature or *prastára* or *uttirá*.

I need not dilate on the other points such as relative proportions, arrangement of details, etc. which do not bear any relation to those of the classical order.

I have seen such a large variety of forms with details of columns in Southern India that it would take me several hours to explain to you their important features, which fortunately help us in distinguishing one main class of architecture to which they belong from another. The Pallava pillar, for instance, has its characteristic features quite distinct from the Chola or the Vijaynagarian type showing an elaborately carved conglomeration of slender columns separated by pierced slabs from the main central one.

I would therefore insist on a most careful study of the general technics with the Indian terms or Paribhâsâ without which the study of Indian Architecture would be a miserable failure.

That a study of the technics of architecture may help us in our archaeological investigations will be evident from the consideration of the peculiarities of the Gandhara Art. From my study of the technics of the Gandhara School of Art as noticed in the Calcutta and Lahore Museums, I am led to believe that the Gandhara School of Art, whatever Hellenistic treatment it might reveal in some of the details is purely Asiatic in character and was evidently the work of Indian carftsmen who had their ideals of art tinged with Hellenistic ideas through the medium of the Persians.

We all know that in a Corinthian capital the four corners of the abacus presenting concave sides are never pointed, and shall be glad if a single such instance is brought to my notice. The angles or corners of the abacus are invariably bevelled off; but in the above collections of Gandhara sculpture the corners are found pointed; even the illiterate masons and the so-called practical architects of to-day do not dare make such a bold deviation from this technique. This cannot be the result of direct communication with the Greek or Roman artists who drew their inspiration from the master builders of the Parthenon or the Acropolis. Again, is the representation of Acanthus in the capital of a column the only condition of the Corinthian order? Where is the graduated stylobate composed of receding courses of torus, fillet, scotia, fillet and reversed evolo? Where are the flutings and fillets, of the shaft? Where is the fixed proportion of the height to its diameter? Where is the entablature I admit, of course, that the representation of Acanthus is not Indian in origin, but it is not Greek as well. Whatever might be said by Vitruvius about Callimachus and the basket on the grave of the Corinthian virgin in relation to the origin of the Corinthian form we find it in some of the Pharaonic monuments of Egypt and in ancient Assyrian sculptures. The Acanthus was taken as a decorative motif not from the Greeks but from the Persian or the Assyrians; that it was clearly a decorative device will be evident from its existence on the architrave as well. I have found representations of Persepolitan capitals and Persian gateways in Gandhara sculptures belonging to to the Swat valley; from the excavations at Sahribalol a figure of a queen having a Persian head with a flowering scarf behind and a few Sassanian coins have been discovered; so the immediate influence of Persia is apparent. Again, the absence of Doric or Ionic capitals, the other two important classical orders is an indirect proof of the absence of Greek influence which is so much exaggerated.

Let us consider the above remarks from the following standpoint. The Hapta-Hindu of the Vendidad in the Avesta including this tract of Gandhara is the sapta Sindhu of the Vedas and as the 15th country known to the ancient Iranians before even Ecbatana was founded according to Herodotus in 708 B. C. The Manu Samhita or the Institutes of Manu refers to the Iranians as having degenerated into the state of the Sudra fram the exalted position of the Kshatriyas. In the Junagadh inscription of Rudradamana belonging to the middle of the 2nd century A. D. we come across the name of an Iranian king who governed Kathiwad under the emperor Asoka. We thus find the Persians and the Indians known to one another from the earliest dawn of history to at least the period when the Gandhara school of art sprang into existence.

It is a great mistake to expect to find results in our researches of Indian arts or architecture exactly similar to what we come across in our study of the European ones. There is no such thing as Renaissance in the history of Hindu Architecture for we do not notice in any period of its growth a conscious mitaition, or a reversion to any old style, as an attempt is noticeable in all ages to to maintain a steady continuity of the same ideas. This is best understood by a study of the genius and civilization of ancient and mediaeval India which was rather self-contained in character, and so we find a homogeneity in Indian life amidst an apparent diversity. Whatever might be the difference in the different types of architecture and sculpture obtaining in different parts of the country an Indian finds sameness in the method of execution, the same spirit prevailing everywhere. The Hindus differ in this respect from the Romans who even "transplanted the dramas and the epics of Hellas to the soil of Latium." However debased we might be in the present age in our architectural ideals and methods of architectural adaptations, Indian architecture in the old centres of craft could not up till now emancipate itself from its old trammels; the same method of corbelling is being followed even now though an infinite variety of actual models meets the eyes of the craftsmen.

The forces in operation for the genesis and growth of architecture are as complex as those in an organism instinct with life. The dynastic, traditional, provincial and even local circumstances and demands combine to give architectural possibilities by means of variety of forms and purposes to buildings which thus betray the ethnic peculiarities of the people who erected them. Different dynasties of rulers gave different incentives to the revival of architecture and every such revival is stamped with the impress of the respective dynasties introducing it. The fourth and the twelfth dynasties of Manetho have their characteristic features. The rude pillar of the former is found to be converted into a definite geometric figure during the time of Osirtasen; we find specimens of a finished colonnade for the first time when the 12th dynasty flourished. We all know what a great stimulus was imparted to the development of architecture from the 18th to the 20th dynasty. We find similar revivals everywhere both in the ancient, mediaeval and modern times. The architecture of the Hoysalas has its peculiarities quite distinct from these of the Gangas, or the Pallavas. The edifices of Akbar Jehangir or Shah Jehan are stamped with an originality distinguishing one from the other.

We notice an aversion to the arch that never sleeps as a constructive element in the buildings erected in Akbar's time which differ greatly from those of Humayon, Jehangir or Shah Jehan. Again, the architecture of the

Moghul period is distinct from what we notice during the Pathan revival in Sher Shah's time as illustrated in Sher Shah's tomb at Sasseram, or Mukdum Shah's tomb near Vikram in the district of Arrah. We know what a great difference exists in the proportion of the different parts of a column such as the stylobate, base, &c. of Corinthian order as practised by the Greeks, or the Romans respectively. Again, the capital of the early Greek Corinthian or the Roman composite underwent a great change during the time of the Italian Renaissance, as illustrated in Palazzo Zorzi in Venice where we find the flower motifs in the volutes instead of simple scrolls.

The constructive idea, no doubt, plays an important part in the evolution of a style, but it is not always correct to trace the derivation of an architectural style entirely from the constructive or technical processes.

The symbolic idea ingrained in a nation goes a great way to account for the adaptation of a religious symbol for structural purposes. That constructive necessity does not always inspire our architectural efforts is proved by a study of the trefoil arches incorrectly termed Saracenic, or of the Moghul dome, having a swelling outline and superimposed over an inner shell of nearly elliptical section ; some expedients had to be resorted to in ensuring stability for the structure by counteracting the inclined thrust called into play having a tendency to leave the base of the drum. The symbolic idea in this case got the better of necessity.

There is another point which is usually ignored, or lost sight of by the authorities of Indian Architecture. The Hindu traditions cherished by the Indian Craftsmen employed by the Mahomedan rulers for constructing a mosque or a mausoleum had a great influence in the developement of a particular style such as the Bijapur, or the Moghul style erroneously taken as purely Saracenic. The Mohomedan rulers of Bijapur drew their architectural inspiration from the ruins of Vijaynagar the "Forgotten Empire" of Robert Sewell.—the great craft centre of Southern India.

I would request the students of Indian Architecture to study the arcade of the treasury built by Ram Raja, the last Hindu king of Vijaynagar showing a row of foliated arches. This would surely lead them to detect a striking resemblance to the well known mosque at Bijapur, the Ali-Shahi-Pir-Ki-Musjid, as pointed out by Prof. Havell.

This statement of Prof. Havell finds support in the opinion expressed by Choisy in his Histoire de l'Architecture tracing an Indian origin of the bulbous domes in Persia introduced by Tamerlane, which, according to some, supplied architectural models to their counterparts in India.

There is another point which is perplexing to a student of archaeology

about the genesis of Indian art or architecture of stone whose advent is traced to the invasion of India by Alexander. We, however, find the Indian art in an advanced state a few years after Alexander's invasion. Prof. Percy Gardner has declared this art "more mature in some respects than the Greek art." Does Indian art then resemble Minerva, the goddess of wisdom and war who issued forth from the head of Jupiter all armed and fully grown and immediately admitted into the assembly of the gods?

This negative conclusion from a non-observation of facts according to the strict logical canons of reasoning is of no force and value; before it is accepted it is to be shown that all the probable methods of discovery have been exhausted.

The representations of wooden ribs in the roof of the Mauryan Chaitya caves of Western India such as Bhaja are spoken of as reminiscent of wooden forms; but do they prove that the lithic representation in the Mauryan era was the immediate successor of the wooden forms? I do not agree with Fergusson in his remarks that "such wooded features could not or would not be used by anyone familiar with construction in stone." I have found within the massive fort at Warangal in the Nizam's dominlon some Kirthi stambhas, or Pillars of glory of the 12th century A. D. which are similar to the stone gate-ways at Sanchi belonging to the 2nd century A. D. and branded as typical of wooden origin. We thus see the persistence of a form in its integrity for 1000 years; none, however, will call the gate-ways at Warangal the immediate successor of a wooden prototype; so the existence of the wooded forms in the Mauryan Chaitya Caves should not lead us to date the introduction of stone architecture in India from a period commencing from a few years before the reign of Asoka. If we study the excellent drawings of Toxier and Benndorf depicting the pre-historic tombs at Myra, Antihellus, or Pinara in Lycia, the people of which figured so prominently in the Iliad as allies of Troy, we cannot but be struck by a similarity existing between these and the Buddhist remains of pre-Christian era.

Again, no great attempt has been made till now to explore and unearth the relics of the past; most of the places of historic importance have not as yet been tested by the explorer's pick and shovel. We have just started the excavation of Sarnath, Taxilla, and Pataliputra.

Fergusson did not find the traces of any Hindu structure anterior to 5th century A. D. We also had all along been labouring under an impression that no example of a structural type before the era of the Guptas, *i. e.* the 1st Quarter of the 4th century A. D. could be found till a temple in ruins belonging to the 2nd century A. D. and

frequented by Satkarni, the great Andhra king in the Shikarpur Taluq in the district of Shimoga in Mysore was discovered and it can be inferred easily how many centuries must have elapsed during which, the type of which the above is not certainly the earliest example, had to be practised, elaborated and perfected.

Before we attempt at understanding the significance of Indian sculpture we must study the genius of the nation which though passing through vicissitudes of fortune, remains the same since the early dawn of history. This fact accounts for an absence of the ambitious striving of the artist after artistic individualization. This innate idea controls the artist's chisel in giving living expression as we understand the term. In the Egyptian figures even there is an unconscious attempt at individual expression, and in support of it I might draw the reader's attention to the figure of the scribe preserved in the Louvre in Paris, or the wooden statue found by Mariette at Sakkarah and preseved in the Museum at Boulaq.

I have, however, noticed a departure from this innate spirit in the sculpture of the Hoysala period in the province of Mysore; but still Jakanacharya, the great artist of the Hoysala period of Vishnuvardhan's time could not entirely emancipate himself from the trammels of this natural spirit however strenuous his efforts might have been in the contrary direction.

This idea so ingrained in the minds of Indian artists will be best understood from the following lines of Sukracharya who has definitely laid down that human figures of perfect form or proportion are not auspicious :—

অপি শ্রেয়স্করং নৃণাং বেদবিম্বমলক্ষণম্ ।
সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা ॥

Again, there is a great difference noticed in the sculpture of Northern and Southern India about its technics. So far as I have seen the Hindu images of Northern India as opposed to the Buddhistic ones are generally noticed in relief technically called Ardha-chitra either, basso-relievo, or alto-relievo but never in the round called Chitra or Purna Chitra. In South India the images in the cella including the Parivara Devatas which are worshipped are invariably in the round but not so in Northern India.

Sculpture like architecture may help us in the standardisation of the chronometric scale which should be the aim of the archaeologist. The sculpture of a Pallava pillar having the lion support is so definite in form with its chamfered bracket shewing foliations that we can at once determine if any pillar meant for identification belongs to the Pallava, the Chalukyan or the Hoysala School. The decorative devices in case of a temple of Northern India will not usually be found in any temple of Southern India; the *Phāndgranthi* devices so profusely resorted to in decorating the outer faces of the temples

of Muktesvara and Lingaraja, Bhubaneswara have not been found in any temple of Southern India ; but a difference is noticed in the peculiarities of this device in the above two temples.

The study of the gods and their images is a very important branch of Archaeology which greatly helps in understanding the significance of the religion of the present day. I may refer to what Prof. Jebb spoke about it before the Philosophical Institution of Edinburgh while lecturing on Modern Greece. Whatever might be said by the early fathers of the Christian Church, it has been inferred from a study of the gods of the Greek Pantheon that Christianity is not an exclusive gift from Israel. The old gods both Greek or Hindu live to-day not "mirrored by the motley throng of Orpheus tales," or Pauranic legends of overpowering inspiration. "They still live" according to Prof. Dyer, "in their charmed life and even to-day each one in some sense is the centre of a scheme of things, a universe all his own."

There is a vast literature of the canonical texts or Agamas regulating the details of the images which are not the same in all parts of India ; to this is due the difference in the conception of images. On studying the figures of the Sapta Mâtrikâs in the cave temple at Bangalore, Bâswângudi as compared with those noticed at Jâjpur, I have found a considerable difference in the expression, details, serial arrangement and even in the vehicles. The mannerism and sculptural peculiarities of images met with in Southern India differ considerably from what we notice in Northern India. Though several figures of Natarâja, a form of Siva have been found in Northern India their comparative scarcity is an index to the derivation of this form from Southern India where it is noticed in the earliest structures of the Pallavas at Mamallapuram, Conjeveram and Trichinopoly.

Kârtikeya or Subramaniya even though a god of the Hindu pantheon leading the celestial hosts is not usually found enshrined as a principal deity in a temple in Northern India though we find reference to the images of Skanda in Bhabisya Puranam and Lalita Vistara ; but we have a large variety of forms for Subramaniya in Southern India. In the single temple of Kumarkoshtha at Conjeeveram, nine different forms of Kartikeya are noticed.

The difference in the treatment of images in Northern and Southern India can be best illustrated by an ordinary figure of Vishnu. The female figures flanking an image of Vishnu in Northern India are invariably Sri and Sarasvati according to the text of the Kâlikâ Purânam as contained in Chapter 82 whereas those in regions to the south of the Vindhyas are invariably Bhu Devi of Sri Devi.

At Jajpur in Orissa I have come across some representations of Siva and Bhairava, particularly, which are

reminiscent of the South-Indian School.

This inter-action between the North and South Indian Schools can be best illustrated by the image of Vishnu depicted in figure 16 of the Maurbhanj Archaeological Survey though not pointed out by the author himself. Here we find the female figures of Bhu Devi and Sri Devi flanking the image, but as it often happens in cases of adaptations their positions have been curiously reversed by the Sculptor, here the figure of Lakshmi holding lotus in her left hand is found on the left of the image of Vishnu; this is invariably seen on the right side in Southern India.

It must have struck every student of Iconography that the South Indian School is bolder than the northern one, for we find greater deviations from the Shastrics texts. The representations of the Ashta Dikpati or the regents of the eight cardinal points as noticed in in Northern India are true to the text of the Agni Puranam; I have not noticed any deviation in any temple of Orissa though I claim to have examined carefully not less than a hundred temples; these have been represented differently in different temples of Southern India. The figure of Kuvera, the regent of the north, for instance, has a horse and a goat for its vehicle in the temples of Harihareswara and Kalleswara respectively though I have found the chariot to be the vehicle of the god of riches in a few minor South Indian temples as described by Ziegenbalg in his South Indian Gods.

I have already spoken of the difference in the treatment of images in Northern and Southern India; in these two parts, again, there are differences in detail which can at once lead us to differentiate one sub-school from the other. In Southern India, for instance, different schools sprang up laying down different rules for the designing and arrangement of images. Taking up the the Vishnuvite cult by way of illustration we find two schools of Agamas called the Pancha ratra comprising 108 Samhitas and the Baighanas composed of 20 Patalas. In the temples of Sriranganath at Srirangam, Varadaraja Swami at Conjeeveram, Vasudeva at Melkote, the Pancharatra school has been followed, whereas in the temple of Balaji at Tirupati, that of Devanayaka at Totadri in the district of Tinevelly, in the temple of Partha Sarathi at Triplicane in Madras and some other minor temples of Conjeeveram the rules of Baighanasa school have been observed.

I have conveyed a rough idea as to the rich literature on images and their worship in Southern India; I still remember my feeling of perplexity when I saw heaps of moth-eaten manuscripts brought from an old wooden chest in the city of Conjeeveram appearing to me in the language of Dr. Oldenberg "a terrifying host of unknown and uncanny beings."

The subject of Iconography is accordingly so vast that unless a student be very careful he is sure to be led astray by incomplete and incorrect observations. The assertion, for instance, by the author of the South Indian Bronzes that the "Tribhanga" form has no place in the South Indian Manuscripts is negatived by a reference to Chap. 17 of the Kriyapada of the Padma Samhita of the Pancharatra Agamas with reference to the image of Sri Rama where the Tribhanga form has been so clearly defined.

The figure taken from Van Kinsbergen's plates of Jave and identified by V. Smith in his History of Fine Art in India and Ceylon at page 264 as Sarasvati enthroned, the consort of Brahmâ, is no other than that of Kuvera or the god of riches with the *nidhikumbhas* under his feet. The figure of Krishna which the author of the South-Indian Bronzes has proposed to identify with Venkatâchalapati on plate No. 68 is not so, but is that of Râjagopâla worshipped at Mânnârgudi in the district of Tanjore ; the image of Venkatâchalapati is always provided with four hands and never two, and is usually found in the well-known pose of *varada-kanti-hasta* as represented at Tirupati otherwise called Venkatachala in the district of North Arcot.

The difficulty involved in the study of Iconography can also be illustrated by an incorrect identificarion of the attendant figures of the brass image of Trivikrama numbered 21 in the descriptive list of the Archaeological Collections of the Bangiya Sahitya Parishad where they have been described as female figures ; this is not so in reality. They are veritable male figures of Sankha and Chakra, the weapons of Vishnu technically called আয়ুধ দেবতা whose human representations are also met with in the temples of the South Indian School.

I may refer in this connection to the curious identification and nomenclature of a figure of the Sapta Matrika in the gallery of the Indian Museum, Calcutta, described as কার্ত্তিকেয়ানী, a term, which is, I am afraid, grossly ungrammatical, not to speak of its being not found in any Sanskrit text at all. The figure is that of Kaumari described in Markandaya Puraman as কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা ।

I give below the points to be attended to by a student of Iconography in the identifieation of images.

(a) The standard of measurement, or *tala* based on different units such as *Dehalabdhangula*, *Mushtyangula*, etc.

(b) The Lakshanas or signs belonging to different cults and other considerations.

(c) *Bhava* or expression.

(d) The *Dhyanam.*

Let me explain and illustrate the above four points. The standard of measurement is based on a unit called Dehalabdhangula, or one hundred and twentieth part of the height of the

image without *ushnisha*, etc, and not at all based on the finger of the image-maker himself as explained by the author of the South Indian Bronzes; in support of my interpretation I would refer to Chapter 12 of the Kriyapada of the Padma Samhita of the Pancharatra Agamas. The standard of measurement according to Sukracharya as explained in Sukranitisara, Chapter IV corresponds to the Mushtyangula of the Padma Samhita of the Southern School.

The second point of the Lakshanas or signs which vary as the cults. The *Sankha*, *Chakra*, etc. are signs of a Vishnuvite image; the *Parashu* or axe, deer, trident, flame, *damaru*, *kapala*, or human skull *jatamukuta*, *akshamala* or rosary etc are signs of a Saiva image. The *sankha* or conch-shells, *chakra* or discus, the *Pasha* (the noose), *ankusa* or goad, the *sakti* or spear, the trident, the bow, etc. are the signs of a *Sakta* image, and so on. It is sometimes extremely difficult to differentiate from each other the images of the Saiva and Sakta cults. The head gear of the image often helps us in its identification. In Southern India the Swatantra or independent images have mukutas on invariably, whereas the Paratantra or subsidiary ones are seen with karanda-mukuta. The head dress is of various kinds such as *mukuta*, *karandamukuta*, *jatamukuta*, *keshapasha*, *keshakachha*, *muktakesha*, *alaka*, etc.

While speaking of the Lakshanas I should in propriety refer to the different *mudras* or poses of the figures of hands which should be studied carefully.

I mention the *mudras* incidentally:—*Varada*, *Abhaya Swagata*, *Chinmudra*, *Kataka*, *Katyabalamba*, *Suchihasta*, *Tarjani mudra*, *Dandahasta*, *Gajahasta*, *Lolahasta*, *Lambahasta*, *Anjalihasta*, *Tripatakahasta*, *Kartarihasta*, *Ardhachandrahasta Damaruhasta*, *Sinhakarnahasta*, *Nidritahasta*.

The next point we are to study is the *Bhanga* or the deflexion of the body. The Bhangas are four in number, the *Abhanga*, the *Tribhanga*, the *Samabhanga* and the *Atibhanga*.

For a correct identification of the images their vehicles should be carefully studied; in some cases, however, the difficulty in identification is aggravated by different texts laying down different vehicles for one and the same deity. Varahi according to Visvakarma Silpa has a buffalo for her vehicle and this text has been strictly followed in the representation of the figure at Jajpur where we find the deity:—

Mr. Gopi Nath Rao, the author of the Elements of Hindu Iconography has, however, assigned the elephant to this deity. I am not acquainted with any text prevalent in Northern, or Southern India in support of the above though the author has referred to the Angsumat-vedagama. The figure of Varahi belonging to the Matrika group noticed by me in the above cave temple of Bangalore has a swan, or a peacock of rich plumage for its vehicle, as I

had to crawl in that narrow cave lined with cockroaches and infested by rats coupled with the inconvenience of inhaling damp and mephitic air I could not spend more than an hour there to study all the images carefully. I cannot accordingly say if it was a swan or a peacock ; at any rate I have not come across a similar figure in any other part of India. The details of this figure as laid down in Visvakarma Silpa, Markandyeya Chandi, Mantramahodadhi, do not tally with one another, nor do they agree with those found on the images themselves discovered up till now.

The postures of the images which vary as the cults they belong to should be carefully studied ; these are numerous ; let me illustrate them by taking up the image of Vishnu of the South Indian School which has five different poses according to the Pancharatra Agamas, and three according to the Baighanasas, as far as the principal image or Dhruvabera is concerned. According to the Pancharatra, the poses are the following :—

Sthiti (standing), *Asana* (sitting), *Shayana* (reclining), *Yanarudha* (riding), or *Visvarupa* (the universal form). The *Baighanasas* have omitted the last two and divided the first three into four sub classes .—*Yoga*, *Bhoga*, *Veera*, and *Abhicharika*, the last form being used in the destruction of enemies ; the Pancharatras again recognise only the first two sub-classes, namely the *Yoga* and *Bhoga*.

The Pancharatras divide the Shayana pose into the following forms :—

Sristi Shayana and *Samhara Shayana*. Again, all the above sub-divisions of both the schools are divided into three varieties each, viz : *Uttama*, *madhyaam* and *adhama*.

The image of Vishnu at Srirangam is an example of Uttama Yoga Shayana, the images of Varadaraja at Conjeeveram and Balaji at Tirupati are examples of *Adhama Yoga Sthiti*.

MONMOHON GANGULY, B. E.

THE COMING OF SUMMER, ENGLAND.

Lo! summer cometh, let me sing it out:
I saw her yesterday, a tangled rout
Of blossom in her hair, stars in her eyes
Faring along a mead where waters rise
Full with the green: king-cups and meadow-sweet
Brake in a trail of glory at her feet.
I saw her by a hedge-row lean her face;
Straight in a purple pool about the place
Low violets burst; thereto I laid my head
And drank from the rich fragrance she had shed
The sense of things to be—mown meadows wide
Spraying sweet incense at the eventide,
Shy-dropping dew, and gently-falling rain,
The reaper's song flung to the fields of grain,
And all things else that haunt high summer-time
Sang through my soul, as far bells faintly chime.
There as I bent I felt her floating hair,
And then she kissed my lips. Her face was fair.

D. G. D.

EAST BENGAL NOTES AND QUERIES.

NOTES ON ANTIQUARIAN REMAINS ON THE LAKSHYA AND THE BRAHMAPUTRA.

The Tribeni or the Sonakanda Fort.

The Sonakanda fort is in a splendid state of preservation. The surrounding walls and the citadel, though overgrown with trees and damaged in places are all standing in their original state and no fort in this district shows better at a glance the plan and the purpose for which they were constructed. It is a rectangular enclosure with the gate on the northern side and the citadel on the west facing the river. Of the three forts close to each other, the Hajigonj fort and the Idrakpur (Munshiganj) fort are now under the Act and it is unadvisable to allow the best preserved of the three, the Sonakanda fort to moulder in neglect.

The mosque of Haji Baba Saleh at Bandar.

It is an old one-domed small mosque with five doors. The Tograh inscription of which an impression was taken by Dr. Wise and the reading published in the J. A. S. B. for 1873 P. P. 283 by Mr. Blochmann, states that the mosque was built in 911 H. in the reign of Fath Shah by one Hazi Baba Saleh. The shape of the mosque is curious, the excessive length of the dome in comparison with the base, making it look more like a Buddhist Stupa than a mosque. It is a solidly built structure and still stands intact. It can be repaired at a small cost.

Tomb of Baba Saleh.

Adjacent to the mosque is the stone-built tomb of Haji Baba Saleh, over which another inscription along with that of the mosque was lying in a detached condition. The date is doubtful in Blochman's reading but it may be 912 A. H. Except for some loose pieces of stone, the tomb is almost entire, and is a good specimen of stone-built tombs of East Bengal, though in point of artistic workmanship it does not bear comparison with the five tombs of Azam Shah in Sonargaon. It is desirable that the tomb be kept in proper repair. Both the tomb and the mosque are forsaken and overgrown with jungle and they will soon fall to pieces, if long left uncared for.

I have removed both the inscriptions to the Dacca Museum.

Khandakar's mosque at Bandar.

It is another mosque built by Hazi Baba Saleh in 886 A. H. (1482 A. D.) The Muhammadans of the locality raised subscriptions sometime ago and brought the mosque in a good state of repair. The land belonging to the mosque has mostly been appropriated by greedy landlords and only a small

patch of land remains to it. Another old mosque in the vicinity, presumably built by the same pious man was lately demolished and the foundation dug up.

Ekdala.

I inspected the Tillah and took a photograph of it from the neighbouring Tillah. It is a natural Tillah of deep red soil with a projection towards the north-west, which might have given it its name. There are three other Tillahs close to it on the west and south-west, almost of equal height.

The reputed fort of Ekdala has been sought to be located on this small Tillah. A close observation of its Topography is disappointing. No brick, not a single one, nor anything of antiquarian nature has ever been found from it or the neighbouring Tillahs and the Baid on the north-west, like all other Baids between two or more Tillahs of Bhawal, has nothing of an artificial look in it. A very shallow and narrow ditch on the north side of the Tillah leading from the Baid to the Lakhya looks artificial but it seems to be a recent one. There is no sign of any other defence on any other side. There are no old ruins, nor any sign of old settlement in or about Ekdala. There is a mauza of the same name to the south of the Tillah on the river side, but that is also reported to be barren of any antiquities. The local people are completely ignorant of any old glory of Ekdala and all tell the same story that the place was a nest of Dacoits who got on the top of the highest tree on the Tillah, which still stands to reconnoitre the course of boats at a distance and fell on the selected victims. Mr. Stapleton collected some dacoit's missiles in the shape of burnt clay balls from Ekdala and presented them to the Museum.

Mr. Taylor in his Topography of Dacca saw the difficulty of identifying the site with the reputed Ekdala and maintained that the fort variously called, 'The Ranir Kots. 'The Shah Bidyer Kot,' or the Duduria fort 8 miles north of the Ekdala Tillah was the real site of the reputed Ekdala, where traces of a mud fort are still to be seen and which I shall presently describe. Thus writes Dr. Taylor 'The fort of Ekdala or Yekdal is frequently mentioned in the History of the independent kings of Bengal but of its site or of the remains of any place of military defence here, there are no traces existing at present, and it is likely therefore that the fort mentioned by this name is one that is situated about eight miles above Ekdala on the eastern bank of the Banar at a place called Durduria, Capasia.' (Topo. 112)

This identification seems open to doubt.

The Ranir Kot or the Shah Vidyar Kot.

The building of the fort is ascribed to Rani Bhabani, but there is no means

of ascertaining how old the tradition is. It is also known as the Shah Vidyar Kot, which name certainly looks like one of Muhammadan origin. The local tradition is that the fort was never completed, and though the builders contemplated founding a town, that was also never founded, owing to the difficulty of getting sufficient supply of provisions in this wild locality.

The fort has an inner and an outer moat, which must have been dug very shallow as they have almost disappeared. Whereas, if they had been dug deep enough and made to communicate with the river, they would have very likely been existing even up to the present day. The moat round Ballal Bari in Rampal, which must have been several centuries earlier is still-full of water in places. With the exception of two or three very low mounds and a small number of stray bricks here and there, there is very little sign of antiquity about the site. Dr. Taylor say, "The fort is apparently laid out in the figure of a crescent bounded by the river." (Topo—P. 113) But I remember to have noticed sharp angles in places in the ditch.

The defences of this fort do not look any way very strong and Ekdala, which twice resisted Firoz Shah's fury is ill-identified with this site.

At the same time it must be noted that the position of the fort is a strong one. The Banar makes a sharp curve, and the fort is situated within the angle of the curve. With the moats dug deeper, the fort might have been made a very strong position.

The place opposite is called Gosinga, meaning the cow's horns and the name certainly has been given to it as the two sides of the curve of which Gosinga commands a fine view looks beautifully like the two horns of a cow. The name which is old implies that the curve is not a new one and no erosion of the river has taken place from time out of mind.

The Darga of Shah Ala Saheb at Gosinga.

It is an ordinary tomb, built of some pieces of loose stone and had at one time been surrounded by a wall. There are several other tombs close by, over which have grown huge Aswata trees and the supposition that there was a mosque near them seems probable, though no trace exists. Dr. Taylor says that he saw vestiges of a city, but I found none. The two deep tanks alluded to by Dr. Taylor and which he says, he was told, to have been dug by the Booneah Rajahs, proved on enquiry to have been dug by the Rajahs of Bhowal.

The Dargapara mosque near Toke.

It is a small one-domed mosque. The inscription fell off some time ago and got broken into pieces, fragments of it were brought to the Dacca Museum, but nothing could be made out as the writing on them was very scanty.

Local enquiry elicited the fact that it was five generations i. e. nearly 165 years old. The local Mahammadans, with one Ismail at their head are taking great interest in the restoration of the mosque but they are too poor to do so. They have cleared the jungle around it and cut down the overgrowth on the mosque. It is the only monument standing for miles around on the south of the Brahmaputra. A mosque of the same age on the north side of the Brahmaputra in the Mymensing district at Egarasindur has lately been conserved by the Government and hence Dargapara mosque also deserves to conserved.

Egara Sindur.

I visited two Hindu temples, two mosques, and two forts at Egarasindur and its vicinity. The temple called Ramkrishna Gossain's Akra is in a fair state of preservation and is of interest being good specimens of brick houses built in Bangla fashion. The Bairagi in whose care these buildings are is too poor to keep them in proper repair and they are fast crumbling away. The other temple which is totally forsaken is a sumptuous structure having three rooms also built in Bangla fashion. Big Bat trees have overgrown the structure but it still stands firm. It is worth while attempting to save this fine specimen of Bangla Building from ruin.

The two mosques visited are a mosque which bears no inscription but which on inquiry proved to be 6 generations i. e. about 200 years old; and one which bears an inscription said to contain Shah Jahan's name. The latter was conserved some years ago and is repaired annually; the first one has been lately conserved and notice has been served on the proprietors.

The two forts visited are the Bebuidha Raja's Garh and the killah of Egarasindur. The former one is a small enclosure with low earthen ramparts with a fine clear Dighi on the east. Tradition is silent as to who this Bebuidha Raja or the foolish king was, but he seems to have been one of the aboriginal chiefs deposed by Isa Khan, when he rose to power and founded the fort of Egarasindur.

The fort of Egarasindur must have commanded a very strong position when the Brahmaputra flowed beneath it. The Brahmaputra has now dried up to the narrowness of a canal and the whole of the old river bed, which is more than a mile broad, is now under cultivation. But the grandeur of the position of Egarasindur can still be seen at a glance, if one stands on the citadel of the fort. Occupying the apex of the angular piece of land formed by the sharp bend of the Brahmaputra, it was almost unassailable when the river was full. The now-dried up channel called the Snakha river, whose old bed can still be seen near Shah Jahan's mosque also afforded protection. The earthen rampart of the fort still stands

about 8 ft. high in places and the Buruz and the gateway still show traces of masonry construction. The Buruz or the Citadel, seems to have been an underground one, and the elevated place which marks its site deserves excavation to ascertain its nature. The excavation will cost a trifling sum. The town of Egarasindur must have been a very considerable one at the time of its highest prosperity. Toke on the opposite side was a big mart and seems to have been to Egarasindur in old times, what Howrah now is to Calcutta.

NALINIKANTA BHATTASALI.

THE VILAYATNAMA.

A very interesting manuscript, belonging to my friend Hakim Habibur Rahman, has lately come into my possession. So far as I know, no other library possesses a copy of it. It is named Vilayatnama, written by Itisamuddin of Bajnour in Nuddea,—an actor in the drama which is unfolded in its pages.

I think he was the first native of India to visit England in an official capacity. The narrative of events that led to his being sent to England and the record of his impressions of what he saw and heard there will, I venture to hope be found interesting by the readers of "DACCA REVIEW."

The following is a free translation of of the first three chapters of the work by my young friend Moulvi Abdul Aziz Talukdar.

AULAD HASAN.

Vilayatnama or an account of a Voyage to England and back.

It may not be unknown to the travellers of the time and men of experience of this age that I happened to travel towards England in B. S. 1199 (1795. A. D.) Rare events and unique experiences which I saw and heard on land and sea would indeed form a wonderful narrative and a moving tale.

On account of my being idle at home and without employment, my mind was not at peace and in a settled state; consequently I had no power to hold the pen for writing the accounts of my journey. But my friends and acquaintances compelled me to put the accounts into black and white.

My name is Itisamuddin—the son of Sheikh Tajuddin, deceased, an inhabitant of Kasba, Pergunnah Bajnor in the district of Nuddea. At last, willy nilly I had to comply with the requests of my friends and acquaintances. As my object is to narrate the incidents of my travel in simple language, I have avoided the use of high-sounding words and the involved style which characterise the modern Persian writers.

The book commences with my own

experiences and the records of correspondence which passed between Shah Alam Badshah Gazi the Emperor and the king of England; and also the accounts of my travels in the company of Captain Archbold Swinton (the gentleman who took charge of the Diwani from Nawab Jasarat Khan at Dacca in 1765).

During the reign of Nawab Jafarali Khan I was in the company of Munshi Sheikh Salimullah and Mirza Mahomed Kashem, *Mir Munshi* to the said Nawab's court. It was under the happy auspices of their company that I spent a portion of my life happily and learnt a great deal from them. I was a servant in the court of Major Parker during the reign of Nawab Kashem Ali Khan. After the battle between Asadazzaman and the Raja of Birbhoom and after the victory I went to Azimabad. And having had the honour of rendering obeisance to His Majesty Shah Alam Badshah Gazi I accompanied the said Major Shahib to Calcutta.

At that time there were eight Munshis in the Munshikhana of the company namely (1) Munshi Asadullah (2) Munshi Fakhruddin—son of Tajeddin (3) Munshi Mahammad Aslub (4) Munshi Abdul Bari (5) Munshi Md. Moyez a servant of Major Carnac Bahadur (6) Munshi Mir Sadruddin—in the Sarcar of Colonel Coote Bahadur (7) Munshi Salimullah—in the Sarcar of Henry Vansittart, the Governor of Calcutta and (8) myself.

When Major Parker went to England, he sent me to Major Adam with a recommendation latter and with a map of the way from Beerbhoom to Azimabad and a Persian greyhound. As ill-luck would have it, I could not secure any post. At last I obtained service of the Sarcar of Mr. Ashbursan—who was *Bakshi* of the district of Jaleswar under Captain Knox. I served there for two years. I was in the Army when Nawab Kashem Ali Khan fought the battle of Gariah and Uduanala. I came from Rajmehal to Midnapur with Captain Knox. Under Mr. Burdett I served for a year as Tehsildar of Pergunnah Kutubpore. Mr. Ashubursan was very kind and noble-hearted. After his death, for a month tears ran down my eyes and for a whole year my heart bled for him and whenever his name rose to my remembrance the wound in my heart bled afresh. I never in my life met another such generous master.

I served in the Sarcar of Mr. Carnac Bahadur in 1179 A. H. at the time of the battle of Buxar in which Nawab Shujauddowlah was defeated by the army under Major Munster. I then proceeded towards Rohilkhand and Chunargarh where I had the good fortune to obtain an audience of the Badshah; thence went to Allahabad and back to Lucknow again.

When Nawab Shujauddowla through the assistance of fifty thousand Mahratta soldiers with Malhar Rao as their leader, came to Jahanabad, General

Carnac Bahadur returned from Faizabad to Oudh, crossed the Ganges at the ghat of Shivarajpur and there he encountered Shujauddowla and Malhar Rao with a retinue of 50000 soldiers and finally defeated Shajauddowla and the Marhattas. Malhar Rao proceeded to Calpe and Shujauddowla to Kanouj. Overtures of peace came from both sides.

From there a start was made towards Kara Manickpur, where an audience of the Badshah was obtained who presented a *Khillut.* He then went to the Fort of Allahabad.

At that time Lord Clive Sabet Jung Bahadur (the steady in war) being once more appointed the Head of affairs in Bengal, came from England and having arrived at Allahabad formulated the terms of peace: The Subah of Allahabad, yielding 24 lacs of rupees and the Subah of Kar Jahane bad yielding another 24 lacs, total 48 lacs, were to be assigned for the expenses of the Badshah. He set apart a sum of one Crore and fifty lacs of rupees and the place Ghazipur along with an allowance of fifteen lacs of rupees for the expenses of the said Nawab, taking from the Nawab Shujauddowlah Bahadur the sum of 50 lacs in cash for the expenses of the army.

The seal and signatures of the Company and the said Nawab Bahadur were affixed to the two copies of the deed of peace. Lord Clive handed the Holy Bible to the Nawab and the Nawab in turn offered it to Lord Clive and shook hands with him. After seven days Nawab Shujauddowlah Bahadur, being invested with the imperial robe of honour took his leave and marched towards Oudh. Lord Clive then fixed 24 lacs of rupees as the annual revenue of the Subah of Bengal and got the sanad of Nizamat (governorship) in the name of Nawab Najmuddowlah, the son of the deceased Nawab Jafar Ali Khan and the sanad of Dewani in the name of the company Bahadur with a promise to pay an annual revenue of 24 lacs of rupees to the Imperial Treasury and confiscating all the Jagirs of the former Ameers and Mansabdars. He also caused the insertion in the imperial sanad of the balance of the income of Bengal as Altamgha to the East India Company. He settled that Nawab Najmuddowlah Bahadur was to get an allowance of 60 lacs of rupees for personal expenses and all the affairs of state regarding revenue, Government and the army were to be supervised by the Company. In all the entries in the treaties of peace of Nawab Shujauddowla and all the drafts and copies of the imperial sanads, Munshi Mahomed Moyez and myself, in concurrence with Mr. George Vansittart, were the translators.

In 1189 A.H. (1775 A.D.) I was in the service of the company under Colonel John Upton Bahadur who went to Poona Sattara to conclude peace and

establish friendship with the Marhatta Sardars. From the side of the Colonel Bahadur I used to go to the durbar of the Peshwa and Pandit Pradhan and Sakharam Babu and Balaji Rao alias Nana Farnavis to communicate about the writing, of the treaty of peace, the copy of which is still with me and of which Captain Macpherson and I were the translators. In brief, my young days were spent happily in the service of the Company Bahadur and that now in old age I suffer a great deal is on account of my misfortune and evil days.

A short account of a journey to England in connection with the dispatch of a letter from Shah Alam Bahadur The Emperor to the King of England and of the return therefrom without having gained his object.

In 1180 A.H. corresponding to 1173 of the Bengali era. Nawab Shujanddowlla and Lord Clive, Sabetjung Bahadur settled the terms of peace between the former and the company Bahadur at Allahabad. Having settled the terms of peace took their leave from the camp of the Badshah. Lord Clive obtained the Sanad of the Dewani of the subas of Bengal, Behar and Orissa in the name of English Company and the Sanad of the Nizamat in the name of Najmdowlla the son of the late Nawab Jafarali Khan and took leave of the Emperor. His Majesty, the Emperor, the shadow of God on earth shed tears while parting from Lord Clive and said, "you have accomplished the works of the company to your satisfaction but have left me without the services of the English troops till my installation on the throne of Delhi and the settlement of the affairs of the Kingdom. Now you are going leaving me hemmed in by enemies on all the four sides and by people unfaithful to the salt."

Lord Clive and General Carnac Bahadur were much affected and grieved by these words and said that they could not give the services of the British soldiers without the order of the King of England and the permission of the Company Bahadur. They also begged to say that troops would be placed at his service as soon as they received the orders from England and that it was the best policy for him to live at Allahabad. General Smith Bahadur, the then commander of the British troops was ordered to attend to the service of the Emperor with one division (platoon) of soldiers and the camp of the whole army was pitched in the neighbouring place Jaunpur so that at the time of necessity they might come to the help of His Majesty—that His Majesty may feel secure Lord Clive and General Carnel Bahadur assured the Emperor that they were ever ready in his service whether present or absent. Then Nawab Manirdowlla and Raja Shetab Roy Bahadur were ordered to write the letter of the Emperor to the King of England according to the wish of His Majesty. The contents of the

letter comprised subjects regarding the help of the English army, the commander of the British troops, the organization of the empire of Hindustan, the granting of the dewani of the Suba of Bengal and the friendship for that monarch. The letter was to be accompanied, with presents worth a lac of rupees, as a token of sincere affection for that monarch. Nawab Manirdowalla and Raja Shetab Roy accompanied Lord Clive to Calcutta. Lord Clive, General Carnac Captain Swinton and George Vansittart went to the garden of Damdama and without the knowledge of the other members of the Council wrote the letter of the Emperor and adorned it with the imperial seal.

This auspicious kharita containing the royal letter was made over to Captain Swinton who was deputed as an ambassador from the Emperor of India to the king of England with a present of one lac of rupees so that he might return after the accomplishment of the object in view. When the Emperor required a munshi to accompany the said Captain I was selected and given four thousand rupees as expenses of of my Journey to England and back from the Imperial exchequer out of a consideration of my past services and allegiance to His Majesty. I, too, owing to my youth and the attraction of food and water of that country conceived the ambition of sojourning there.

I went on board the ship with the said Captain. When we had spent one week on the way the Captain took the Imperial letter and the other papers from me and said that since the Imperial presents had not been received the mere carrying of the letter alone (without the presents) would not be advisable. He also said that he expected presents next year and that the submission of the letter and presents would then be entrusted to me. Hearing I was confounded extremely and I knew for certain that this excuse was not without some motive and so much trouble of travelling would be of no avail. Had I known this beforehand I would not have started on such a business but when matters had advanced beyond control and the arrow had escaped from the bow there was no remedy. Helpless as I was, I resigned myself to destiny. Experiencing every possible trouble of journey I reached England after six months. In spite of my seeing wonderful things I had no pleasure or peace of mind. The said Captain strictly enjoined on me the desirability of keeping the matter secret. I had neither the power of expressing nor the power of maintaining my peace of mind. I whiled away my time in reading histories and other things in order to avoid the anguish of my mind. I had then no inclination whatsoever for learning the English language and the beautiful scenery of England afforded me very little scope for enjoyment. After my return to Bengal people

found fault with me by saying that inspite of my living in England I could not acquire a thorough knowledge of the English tongue. My explanation of this would be the revealing of a secret: what should I say and what explanation should I give except that I put the seal of taciturnity on my lips and admit my want of intelligence? I have no other remedy.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৬ষ্ঠ খণ্ড। } ঢাকা—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৩। { ১১শ; ১২শ সংখ্যা।

বঙ্গীয় গৃহশিল্প-সমিতি।

সম্প্রতি আমাদের দেশের বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এ আন্দোলন নূতন নহে, কিন্তু পূর্ব্বে নানা ভাবে আন্দোলন চলিলেও অধিকাংশস্থলেই আমরা কৃতকার্য্য হই নাই, তাহার মূলে আমাদের দোষই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সে সব আলোচনার স্থান ইহা নহে, আর নিজেদের ক্রটী-বিচ্যুতির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে গেলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই নাই। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিতে গেলে দুই একবার ব্যর্থকাম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; তাহাতে নিরাশ না হওয়াই ভাল। সাধারণের এখন একটা বিশ্বাস এই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদের দেশের ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, যৌথকার্য্য বল গভর্মেণ্টের সে সকলের সহিত কোনও সংযোগ না থাকিলে তাহা কোন রূপেই টিকিয়া থাকিতে পারে না; এ বিশ্বাস দিন দিন নানা কারণে দৃঢ়ীভূত হইতেছে, বিস্তারিত কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় বঙ্গের গৃহজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-দ্রব্যাদির পুনরুত্থানের জন্য আমাদের সদয়-হৃদয়া লাট-পত্নী লেডি কারমাইকেল মহোদয়া ব্রতিনী হইয়াছেন। তদুদ্দেশে বিগত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬, কলিকাতা ডেলহৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটে একটা সভারও অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় আমাদের দেশের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই অনুষ্ঠানটিকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ ও অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। দেশের বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সকলেই যে একমতাবলম্বী হইয়াছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গদেশে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী শান্তিপুর, বিক্রমপুর, টাঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত। ঢাকা মুসলমানী আমলে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল, কাজেই নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে ঢাকা সহরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী

পল্লীসমূহের বিবিধ শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে। কোন দেশের কোন প্রাচীন শিল্পই একেবারে মরিয়া যায় না, যাইতে পারে না, তবে সে সব রাজানুগ্রহ ও দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত ভালরূপে বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় গৃহ শিল্পোন্নতি-সভার পক্ষ হইতে প্রখ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার ও কো-ওপারেটিভ ব্যাঙ্কের রেজিষ্ট্রার রায় শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র বাহাদুর ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় ঢাকার প্রায় সর্ব্বত্রই নানা শিল্পজাত দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়াছেন, তবু আমাদের জেলার প্রাচীন শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ ঢাকা সহরের কথা বলিতেছি। ঢাকার বস্ত্র-শিল্পের বিষয় সকলেই জানেন; ঢাকাতে যে কিরূপ নানা শ্রেণীর সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও মস্‌লিন প্রস্তুত হইত, এবং এখনও হয় তাহা জনসাধারণ সকলেরই বিশেষরূপে জানা আছে। কিন্তু বস্ত্র-শিল্পও আর পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নাই, তাহার মূল কারণ বস্ত্রবয়নকারিগণের অর্থাভাব,—মহাজন এবং বড় বড় খরিদ্দারগণের দাদনের টাকা পরিশোধ হইয়া তাহাদের লাভের কিছুই থাকে না, তাঁতীদের দুর্দ্দশা ঘোচেনা; কাজেই পেটের দায়ে যে যতটুকু পারে কাজ করে, শিল্পের উন্নতিকল্পে কাহারও তাদৃশ মনোযোগ নাই—কোনরূপে কাজ চলিলেই হইল, এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে ক্রেতার অভাব। মস্‌লিন প্রভৃতি কয়জনে ক্রয় করে? এমতাবস্থায় তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ঢাকার অন্যতম প্রধান শিল্প—শঙ্খের কাজ। বঙ্গদেশের কেন পৃথিবীর আর কোথাও ঢাকার ন্যায় শঙ্খের কাজ হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নানাকারণে শঙ্খের কার্য্যেরও অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ একটী কারণই মূল বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যক্তি-বিশেষকে শঙ্খের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে দিয়া মাস্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ ঘটাইয়াছেন, তাহারি ফলে দীন দরিদ্র শঙ্খব্যবসায়িগণ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্য দিয়া শঙ্খ ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেছে না। নতুবা আজ কাল শাঁখারীগণের মধ্যে এমন অনেক সুদক্ষ শিল্পী আছেন, যাঁহারা দিন দিন নব নব উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে, নূতন নূতন ফ্যাসনানুরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণের বিশেষতঃ শিল্পানুরাগী কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতে পারেন।

শঙ্খব্যবসায়ের অধঃপতনের অন্যতম কারণ—যন্ত্রপাতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র উন্নতির যে খরস্রোত প্রবহমান, কলকব্জার যেরূপ নিত্য নব প্রচলন তাহাতে যন্ত্রপাতির উন্নতি করিতে না পারিলে কোনরূপেই প্রতিযোগীতায় দীর্ঘদিন ইহারা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত বর্ষে "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে আমাদের মেয়েদের হাতের চুড়ি ত জাপান হইতে আসেই, শুনিতেছি তাহারা নাকি তামাক খাওয়ার কল্কে পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে। আমাদেরও তেমনি আশঙ্কা হয় যে যদি বর্ত্তমান যন্ত্রপাতির দিনে একঘেয়ে ভাবে শঙ্খ-দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা এই শিল্পটাকেও হারাইব। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে কোনও জাপানী বা অন্য কোনও বৈদেশিক শিল্পী ইহা শিক্ষা করিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে অচিরাৎই আমাদের এ গৌরবময় শিল্পটিও লোপ পাইতে পারে। কাজেই শঙ্খ-শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১) যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শঙ্খব্যবসায় একচেটিয়া করিতে না পারে।

(২) অভিনব যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণদ্বারা এই ব্যবসায়টীকে অধিকতর বিস্তৃত এবং কার্য্যকরী করিয়া তোলা।

অল্প সুদে শঙ্খ-ব্যবসায়ীগণকে ঋণদান পদ্ধতিও ইহাদিগকে রক্ষা করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। শাঁখারীরা প্রায় সকলেই খুব বেশী সুদে ঋণ করিয়া ব্যবসা চালায়। এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বস্ত্রশিল্প এবং শঙ্খশিল্প ছাড়া ঢাকাতে শৃঙ্গের কার্য্যাদিও একটী প্রধান শিল্প। শৃঙ্গের চিরুণী, চুড়ি ইত্যাদিও এখানে কম প্রস্তুত হয়না। যশোহরের চিরুণীর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এখন আর এসকল দ্রব্যের তেমন আদর নাই। ঢাকা সহরে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদি আছে সে সকলের অনুসন্ধান তেমন কষ্ট-সাধ্য নহে, কিন্তু মফঃস্বলে যে কত প্রকার শিল্প লুপ্ত হইতেছে কে সে সকলের সন্ধান লয়? সেগুলির অনুসন্ধান এবং বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। মফঃস্বলের শিল্পগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে আরও দুই একটী বিষয়ের আলোচনা করিব। এক সময়ে ঢাকা জেলা রঞ্জন-শিল্পের জন্যও বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এ জেলার অনেকস্থানে কুসুম-ফুলের চাষ এবং নীলের চাষ হইত, এখন এই উভয়বিধ চাষই বিলুপ্ত হইয়াছে। সে সময়ে লাল, নীল, বাসন্তী, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল প্রভৃতি রং দ্বারা বস্ত্র প্রভৃতি রঞ্জিত হইত। যাহারা বস্ত্র রঞ্জনের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের নাম ছিল 'চিপিগার'। কাঠের উপর বিবিধ নক্সা খোদাই করিয়া সে সকল চিত্রদ্বারা ছাপ দিয়া বস্ত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইত। "নামাবলী," কুফন ইত্যাদি এইরূপে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইত। আজকাল শেখরনগর, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সাভার থানায় এখনও সামান্যপরিমাণে কুসুমফুলের চাষ হয়। ডাঃ টেইলার সাহেব তৎপ্রণীত "Topography of Dacca" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "চীনদেশীয় কুসুম-ফুলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহার পরেই ঢাকা-জেলায় উৎপন্ন কুসুমফুল বিখ্যাত। লণ্ডনের বাজারে এক সময়ে চীনা কুসুমফুলের পরেই ঢাকার কুসুমফুল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। এখানে একটু বিবরণী দিলাম।

"১৭৮৭ খ্রীঃ অঃ এই জেলায় উৎপন্ন যাবতীয় কুসুম-ফুল ঢাকার বস্ত্র-রঞ্জন শিল্পে নিঃশেষিত হইয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চাষ এতদূর প্রসার লাভ করে যে স্বীয় জেলার বস্ত্ররঞ্জনকারীগণের অভাবমোচন করিয়াও প্রায় ২০০৲ দুইশত মণ কুসুমফুল ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি-বর্ষে ৫০০০৲ মণ কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত।" *

"১৮১০ খ্রীঃ অঃ ২০০০৲ মণ উৎপন্ন হয়। ১৮২৪।২৫ খ্রীঃ অঃ কলিকাতায় ৮৪৪৮৲ মণ আমদানী হয়, ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় ২৯০৭৫৫।৬ টাকা। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হয়। কুসুমফুল সাধারণতঃ ১৬৲ ষোল টাকা হইতে ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। কুসুম ফুল হইতে অতি সুন্দর লাল ও পীত দ্বিবিধ রং প্রস্তুত হইত।" †

নীলের কুঠি—এখন দেশে নীলের চাষ নাই। পূর্ব্বে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ২৫০০৲ মণ নীল উৎপন্ন হইত। এখন আর তাহা হয় না। এখন এ সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশজাত রঞ্জন দ্রব্যের মধ্যে মঞ্জিষ্ঠা, সাপাং কাষ্ঠ ও লাক্ষা লাল রংয়ের জন্য, তেসুফুল নামক ফুল হরিদ্রা রংয়ের জন্য এবং খদির ও দানোয়ামা বাদামী রংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বাগ্রে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার শিল্প-সম্ভার সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম কথা এই যে বঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বিক্রমপুরেরও সর্ব্বশ্রেণীর শিল্পীগণ আর নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত নহে। জীবিকানির্ব্বাহের অন্তরায়ই ইহার প্রধান কারণ। তবে কোন কোন জাতি এখনও নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই, যেমন জোলা, মালাকর, যুগিগণ, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতীয়েরা এখনও সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ ব্যবসায়েই লাগিয়া আছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি বিক্রমপুর এক সময় বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পাশ্চাত্য ভ্রমণ-

বস্ত্রশিল্প।

কারীগণ এ স্থানের বস্ত্র, রেশম, সূতা, কার্পাস ইত্যাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, অতীতের সেই গৌরবময় পুণ্যস্মৃতিতে হা হুতাশ করা ব্যতীত আমাদের আর কি

---

* See Taylor's Topography of Dacca. † "ঢাকার ইতিহাস।"

লাভ আছে? বর্ত্তমানে বিক্রমপুরের বহু গ্রামে জোলা এবং তাঁতীরা কাপড়, ছিট, লুঙ্গি, গামছা, থান, চাদর, জামদানী, চেক্‌সাড়ী, মলমল, লুই, ইত্যাদি প্রস্তুত করে। অধিকাংশ স্থলেই এ সকল কাপড় রঞ্জিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণগাঁও, সানিহাটী, খরিয়া শিমুলিয়া, রাণীগাঁও, কুমারভোগ, কাজিরপাগলা, সাত-ঘরিয়া, দক্ষিণপাইক্‌সা, নপাড়া, শ্রীনগর, ষোলঘর, হল্‌দিয়া, নাগেরহাট, কাজলপুর, রাণা, বিবন্দী, খোদাইবাড়ী, তন্তর প্রভৃতি স্থানের তন্তুবায়গণ এসকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। এখানে বিশেষ করিয়া একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব, সে লুঙ্গির কথা। আজকাল হিন্দু, মুসলমান, অনেকেই বাড়ীতে লুঙ্গি ব্যবহার করিয়া থাকেন; লুঙ্গি সাধারণ ব্যহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধা-জনক, উহা যেমনই টেঁকসই, তেমনি সুখপ্রদ, যাঁহারা ব্যবহার করেন তাহারা সকলেই একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এহেন লুঙ্গি বিক্রমপুরের তন্তুবায়গণ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে; হাটে বাজারে বিক্রয়ও মন্দ হয় না। এ দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। এ প্রসঙ্গে মাণিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ধামরাই, ডেম্‌রা, জাফরগঞ্জ তেওতা ও সহদেবপুর অঞ্চলের তাঁতীগণের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি। বিক্রমপুরের হিন্দু যুগীগণ অপেক্ষা মুসলমান জোলারাই বেশী পরিমাণে নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

কার্পাস-সূত্র।

আগে দেশের সর্ব্বত্রই চরকায় সূতা কাটিবার প্রথা ছিল। এখন উহা লুপ্ত হইয়াছে। আজকাল কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ মহিলাগণ নাটাই দ্বারা পৈতার সূতা কাটিয়া থাকেন। বাড়ীতে যে দু'চারিটা কার্পাস গাছ জন্মে তাহা দ্বারাই পৈতা প্রস্তুতের কাজ চলে। এই সকল পৈতা এত সূক্ষ্ম হইত যে একটী এলাচের মধ্যে ভরিয়া রাখা যাইত। সূতার কথাটাই বিশেষ করিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ম্যান্‌চেষ্টার হইতে সূতা না আসিলে আমাদের বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের কল ও বঙ্গদেশের কটনমিল কিরূপে চলিবে? সূতা প্রস্তুতের কথা কেহই বলেন না? সেদিকে বক্তাদেরও বাগাড়ম্বর নাই। সময় থাকিতে সূতা প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য করুন। নতুবা আর কিছু দিন পরে যে দিগম্বরের বেশ পরিতে হইবে।

মৃৎশিল্প।

মাটির কাজের জন্য কুম্ভকারগণ বিশেষ বিখ্যাত। একদিকে যেমন ইহারা দেবদেবীর প্রতিমাগঠনে সুনিপুণ, তদ্রূপ নিত্য ব্যবহার্য্য নানা প্রকারের দ্রব্য, খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেও ইহারা দক্ষ। এ সকল খেলনা মেলা ইত্যাদিতে বিশেষরূপ বিক্রীত হয়।

ডাকের সাজ।

এজেলার এক শ্রেণীর শিল্পী আছে, তাহাদিগকে মালাকর কহে। ইহারা রাঙ, তুলা, শোলা, বাদ্‌লা, সল্‌মা, চুম্‌কী প্রভৃতির দ্বারা নানা প্রকার ঝাড়, ফুল, ফল, লতা, পাতা, পুতুল, বৃক্ষলতাদি প্রস্তুত করে। কাগজের উপর বিবিধ প্রকারের শিল্প-বিন্যাসেও ইহারা দক্ষ।

পিত্তল ও কাংস্য শিল্প।

বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, দিয়াগাঁও, ব্রাহ্মণগাঁও, সানিহাটি প্রভৃতি গ্রামে পিত্তল ও কাংস্য-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ঐ সকল দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের নানাস্থানে রপ্তানি হয়। ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে ডেগ, গামলা, ঘটি, বউথালা, কলসী, মালসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে দুয়াল্লী গ্রামে ভরণের কার্য্য হইত, এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

লৌহশিল্প।

ঢাকা জেলার অনেক স্থানেই ভুঁইমালী এবং কর্ম্মকারগণ লৌহের কাজ করে। ইহারা দা, কুড়াল, খন্তা, কোদাল, কাস্তে, গজাল, পাতাম, ছিচ্‌কা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। তাল-তলা, শ্রীনগর, দেউলভোগ, কুকুটিয়া প্রভৃতি গ্রামে এবং জেলার নানাস্থানে ইহাদের কারখানা আছে।

ট্রাঙ্ক প্রস্তুত,—ইহা ঢাকা সহরে এবং বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানেও হয়। এগুলিকে ঠিক্ গৃহ-শিল্প বলা যায় না।

এখন আমাদের অঞ্চলের একটা প্রধান শিল্পের বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা বলিব। সে আমাদের কাগজের শিল্প। পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতেও কাগজ প্রস্তুত হইত; ঢাকার 'কাগজীটোলা' এখনও সেই প্রাচীন

কথা মনে করাইয়া দেয়। উত্তর বিক্রমপুরস্থ আরিয়ল গ্রাম এক সময়ে কাগজ প্রস্তুতের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

কাগজের কথা।

সে সময়ে জমিদারি সেরেস্তার ও মহাজনি খাতা ইত্যাদি সমুদয়ই উক্ত কাগজীদের নির্ম্মিত কাগজে লিখিত হইত। কাগজীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ছেঁড়া নেকড়া, কাঁথা, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে আরিয়ল্ গ্রামে প্রায় ৮০০ আটশতের উপর কাগজী ছিল, তাহারা কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন কাগজীরা আর পূর্ব্বের মত কাগজ প্রস্তুত করে না, কারণ তাহাদের কাগজের আর পূর্ব্বের মত আদর নাই। কলের প্রতিযোগীতায় মসৃণ সুন্দর নানা শ্রেণীর কাগজ পাইতে সাধারণে আর সে কাগজ ব্যবহার করিবে কেন? স্বদেশীর হুজুগে কাগজীরা তাহাদের পরিত্যক্ত ব্যবসা ধরিয়াছিল, কিন্তু কোনও উৎসাহ না পাইয়া উহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যে আরিয়ল গ্রামের কাগজীদের ঢেঁকীর শব্দে নৌকারোহী পথিকেরা রাত্রিতে বুঝিতে পারিত যে আরিয়ল গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, আজ সে আরিয়ল গ্রামের কাগজীরা নিরুপায় হইয়া নানা ব্যবসায়াবলম্বনে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। এখনও যে অল্প কয়েকঘর কাগজী কাগজ প্রস্তুত করে, তাহাদের সেই কাগজ দ্বারা মুদী পশারির "পোন্টা" বাঁধে এবং বাজি নির্ম্মাতারা "মাতাব" প্রভৃতি বাজির মোড়কমাত্র প্রস্তুত করে।

আজকাল ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুণ কাগজের একান্ত অভাব। এ সময়ে কাগজীদিগকে কি কোনরূপে উৎসাহিত করা যায় না? ইহাদের কাগজ নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে, যদি এখন গভর্মেণ্ট কিংবা দেশের কোনও ধনবান ব্যক্তি এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অভিনব বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুযায়ী ইহাদিগের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস দেশের একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে এবং তদ্বারা কাগজের এই দুর্মূল্যের দিনে দেশের কাগজের অভাবও আংশিক রূপে হ্রাস পায় এবং একটী শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের জীবিকার্জ্জনের পথ নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা আজ সাতমাস যাবত "বিক্রমপুর" পত্রের মলাট আরিয়লের প্রস্তুতি কাগজদ্বারা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। ইহারা ফুলস্কেপ, ডিমাই অর্দ্ধ পেজী, ডবলক্রাউন হাফ্ সাইজ কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে। মূল্য কাগজের গুণানুযায়ী ১৲ ১।০ ২৲ ২৸০ ৩৲ পর্য্যন্ত রিম বিক্রীত হয়। ইহারা রংয়ের মধ্যে হলুদ এবং কমলা রং ব্যতীত অন্য কোন রকমের রঙ্গের ব্যবহার জানে না।

এই কাগজীদের নির্ম্মিত কাগজ দ্বারা ঢাকার পুস্তক প্রকাশকগণ অনেকে বহির মলাট মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহারা যে কয়টী কারণে পুনর্ব্বার কাগজ প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ রূপে ব্রতী হয় না তাহার কারণ এখানে উল্লেখ করা গেল।

(১) লড়াই থামিয়া গেলে যখন বাজারে বিদেশজাত কাগজ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইবে, তখন কেহই আর তাহাদের কাগজ ক্রয় করিতে উৎসুক হইবেনা।

(২) তাহারা চিরকাল একইভাবে কাগজ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, কোনরূপ অভিনব প্রণালী জ্ঞাত নহে, কাজেই বর্ত্তমান যুগে কিরূপে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবে? সর্ব্বোপরি মূল্যের কথাও বিশেষরূপে বিবেচ্য। নবীন শিক্ষাদীক্ষা না পাইলে সময়ের সঙ্গে ছুটিতে পারিবে কেন? আর সুলভমূল্যে কাগজ পাইতে অধিক মূল্য দিয়া কে কাগজ ক্রয় করিবে?

এতদ্ব্যতীত(১) ঝিনুকের বুতাম (২) ঝিনুকের ফুল, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবসায়ও বেশ চলিতেছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কালি, পেন-হোল্ডার, নিব্ ইত্যাদি এবং সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ প্রকারের সুন্দর সুন্দর নিত্য ব্যবহার্য্য এজেলায় বিশেষ রূপে প্রস্তুত হয়। লৌহদ্রব্য প্রস্তুত আজ প্রায় ছয় সাত বৎসর যাবত ঢাকা নয়াবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন জাপান-প্রত্যাগত যুবক বিবিধ প্রকারের করিতেছেন, তাহার প্রস্তুতি কাঁচি ক্ষুর, ইত্যাদি নানা দ্রব্য উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক জেলায় বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে নানাজাতীয় গৃহ-শিল্পের সন্ধান মিলে। আমাদের বিশ্বাস

এ সকল শিল্পগুলিকে সমধিক প্রচলিত ও জীবিত রাখিতে হইলে তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। প্রথমতঃ মূলধন, দ্বিতীয়তঃ কাঁচামাল, তৃতীয়তঃ বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এই তিনটির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কোনরূপেই গৃহশিল্পগুলির আশা নাই। আর একটী কথাও বিবেচ্য, বর্ত্তমান সময়ে ভদ্র-সমাজের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। নানাপ্রকার সামাজিক দুর্দ্দৈবে, সর্ব্বোপরি একমাত্র চাকরী অবলম্বন থাকায় ইহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়, এমতস্থলে মধ্যবিত্ত বা ভদ্র-শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষের সমভাবে অর্থাগমের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। হুগলী জেলার চিকনের কাজ ভদ্রমহিলারাও করিয়া থাকেন, আমাদের ঢাকা সহরেও মুসলমান মহিলাগণ ও বহু ব্যবসায়ী হিন্দু পরিবারের রমণীগণ ঐরূপভাবে রুমালের কারুকার্য্য, চাদরের কন্থা, কসিদা কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবস্থা বঙ্গের সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতে পারিলে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। একজন বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়া ঢাকা জেলার গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া এ সকল শিল্প ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক। এবং তৎপর যথাবিহিত পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আর বিশেষ করিয়া এ সকলের একটা প্রদর্শনী করা আবশ্যক। আমরা এবার "বিক্রমপুর সম্মিলনী" সভার অধিবেশনের সহিত একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে চাহিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করায় বহু নূতন নূতন শ্রম-শিল্পের পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানাকারণে শিল্প-প্রদর্শনী হয় নাই। আগামী বর্ষে ঐরূপ একটি শিল্প-প্রদর্শনী করা হইবে। ঢাকার সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট সাহেবের সভাপতিত্বে ঢাকা নগরে বঙ্গীয় গৃহশিল্প-সমিতির একটী শাখা সভা স্থাপিত ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে। আশা করি এ সভা দ্বারা জেলার লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এখানে গভর্মেণ্টের শিল্প কমিশনের মন্তব্যও বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; আশা করি গভর্মেণ্টের নিম্নলিখিত মন্তব্য কয়টি বঙ্গীয়-গৃহ-শিল্প-সমিতির নেতৃবর্গ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। "ভারতবাসী মহাজনেরা মূলধন ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভরসা খুব কম, দক্ষ মজুর পাওয়া দুরূহ, এবং এদেশের কাঁচামাল কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। কাজেই এদেশের শিল্পোন্নতি করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (ক) শিল্পের উন্নতিকল্পে মূলধন বিনিয়োগ (খ) গভর্মেণ্টের সর্ব্ববিধ উৎসাহ প্রদান, আর্থিক ও বিক্রয় ব্যবস্থা (গ) দেশবাসী জনসাধারণকে বিনাব্যয়ে শিল্পশিক্ষাদান (ঘ) শিল্প-বিশেষের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপায় প্রদর্শন (ঙ) শিল্পিগণকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য দান।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

।

আমার কুটীরে এনেছ লক্ষ্মী তোমার অমরা অলকা-ভূমি,
সকল দৈন্য সকল দুঃখ যবনিকা দিয়া ঢেকেছ তুমি ;
আহারে বিহারে শয়নে ভোজনে বুঝিতে পারি না আমি যে দীন,
সব মালিন্য ধুইয়া পুছিয়া করেছ পাবন কলুষহীন।
ধপ ধপ করে বসন ভূষণ, তক তক করে শয়নখানি,
বাসন পাত্রে ঝক ঝক শোভা দিয়াছে তোমার পুণ্য পাণি।
উঠানে সিঁদুরবিন্দু পড়িলে প্রতিকণা তার যাররে তোলা,
তুলসীতলাটী রম্য শোভন নাহি তথা যেন বিন্দু ধূলা।
গৃহ-প্রাচীরের জীর্ণতাগুলি ঢাকিয়াছ তুমি চিত্র দিয়া,
চির অমলিন কাচের মাঝারে রহে আলো গৃহ উজ্জ্বলিয়া।
ছিন্ন বসন কোঁচায়ে ধরেছ খুঁজে নাহি পাই ছিদ্রগুলি,
গৃহখানি যেন আঁকিয়া রেখেছ হাতে লয়ে সুধা-যতন-তুলি।

কেমনে শোভাও বহু ব্যঞ্জনে কুন্দ-শুভ্র অন্নথালা ?
গোপন কক্ষে এনেছ কি সুধা ? কোথা হতে সব মাধুরী ঢালা ?
রাজ-আয়োজন রুচেনা আমার তব শাকান্ন যেমন রুচে,
এ যে দেবতার ভোগের মতন, চির রোগীদেরো অরুচি ঘুচে।
যখন যা চাই হাতে হাতে পাই, ওগো জঙ্গমা কল্পলতা !
কল্পতরু-ছায়া-সুশীতল সমীরে জুড়ালো সকল ব্যথা।
এ আলয়ে জড় লভেছে জীবন, জীর্ণ লভেছে তরুণ শোভা,
তুচ্ছ লভেছে কনক আসন, কুৎসিত হলো নয়ন-লোভা।
যথা ফেল পদ ফুটাও কমল, লীলা তব এই পদ্মাসনা,
চরণ-নখরে বুঝি গো ঠিকরে পরশমণির জ্যোতির কণা !
রিক্তেরে তুমি করেছ ঋদ্ধ, তিক্তে মধুর করিয়া আনো,
শূন্যেরে চিরপূর্ণ কি করিতে কি এমন তুমি মন্ত্র জানো ?
দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীর দুলাল আসিল সেদিন ভ্রমণ-ছলে,
হর্ম্ম্যের সাথে আমার এ দীন কুটীরে বদল করিতে বলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

———

ঋগ্বেদে লিখন-প্রণালীর আভাষ।

১।

ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন বাক্‌দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। ইঁহাদের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় ইঁহারা তিনজনেই বাক্যের দেবতা। (১) সায়নাচার্য্য ইড়াকে পৃথিবীর, সরস্বতীকে অন্তরিক্ষের, এবং ভারতীকে দ্যুলোকের বাক্‌দেবীরূপে ব্যাখ্যা করেন। একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, দেবগণ বাক্‌দেবীকে জন্মাইলে, সকল প্রকার পশু তাঁহাকে বলিয়া থাকে। (২) পশুগণ নানা প্রকার শব্দ উচ্চারণ করে। গো, অশ্ব, কুকুর, বিড়াল, সিংহ, সর্প, কাক, প্রভৃতির শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা প্রত্যেকে বর্ণমালার মধ্যে কোন না কোন বর্ণ কতক স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই প্রকারের উপলব্ধি হইতে পশুপক্ষী দ্বারা অক্ষর উৎপন্ন হইবার পথ সুগম হয়। তবে লিখন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের এতদুর চিন্তাশীলতা আবশ্যক যে সে নিজের উচ্চারিত বাক্য বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার মূল শব্দগুলিতে উপনীত হইতে পারে। যেমন বলবান্ শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া ব, ল, ব, আ, ও ন এই কয়টী মূল শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিশর ও ব্যাবিলনে চিত্র-লিখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম চিত্রদ্বারা ভাব প্রকাশিত হইত। যেমন মধুমক্ষিকার চিত্র দ্বারা মধু বুঝাইত; চক্ষুর চিত্র দ্বারা চক্ষু ও দর্শন-ক্রিয়া দুইই বুঝাইত। কিন্তু যখন উচ্চারিত বাক্যের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যেক পদ এবং প্রত্যেক পদ বিশ্লেষণ করিয়া মূল বর্ণের জ্ঞান আবিষ্কৃত হইল তখন প্রত্যেক মূল বর্ণের একটী একটী চিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তখন কোন শব্দ বা পদ লিখিতে হইতে উহার মূল বর্ণ-সকলের চিত্রগুলির সমাবেশ করা হইত। মিশর-বাসীগণ 'র' বর্ণের চিহ্ন সিংহের, 'ফ' বর্ণের চিহ্ন সর্পের, 'ম' বর্ণের চিহ্ন পেচকের, এবং 'উ' বর্ণের চিহ্ন একপ্রকার পক্ষীর আকৃতি দ্বারা প্রকাশ করিতেন। এতদ্ভিন্ন পক্ষীর পালক, করপুট, পূর্ণচন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, প্রভৃতি চিত্র দ্বারা অপর বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কেবল পশুদ্বারা উচ্চারিত শব্দের উপর নির্ভর করিয়া মিশরীয়দিগের বর্ণ-চিত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বৈদিক ঋষির মতে পশুগণ বাক্‌দেবীকে বলিয়া থাকে। যদ্যপি তিনি আপন বাক্য বিশ্লেষণে সক্ষম হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কাকের কণ্ঠে 'কা কা' শব্দ শুনিয়া মূল 'ক' বর্ণ যে কাক বলিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেইরূপ বিড়ালের কণ্ঠের 'মেও' 'মেও' ধ্বনিতে বিড়ালে 'ম' বর্ণের অবস্থিতি ধরিতে পারিতেন। এইরূপে ঐ সকল বর্ণের আকার দিতে গেলে ঐ সকল পশুর আকারই তাঁহার মনে হইত। মিশরবাসীগণ 'র' বর্ণের চিহ্ন সিংহের আকৃতি দ্বারা প্রকাশ করিতেন। ইংরেজীতে সিংহের গর্জ্জনকে 'রোর্' বলা হয়। বোধ-হয় মিশরীয়গণও সিংহের গর্জ্জনে 'র' বর্ণের অস্তিত্ব বোধ হয়। অতএব সিংহের গর্জ্জনে 'র' বর্ণ উচ্চারিত হয় বলিয়া মিশরীয়গণ 'র' বর্ণের চিহ্নকে সিংহের আকার প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ সর্পের গর্জ্জনে 'ফোঁস্' 'ফোঁস্' শব্দ উত্থিত হয় বলিয়া মিশরীয়গণ 'ফ' বর্ণের চিহ্নকে সর্পের আকার প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে মিশরীয়দিগের কতকগুলি বর্ণ, যে যে উচ্চারিত শব্দে ঐ সকল বর্ণ আছে, তাহাদের চিত্রই প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু অপর চিত্রগুলি এই নিয়ম-সিদ্ধ নহে। অতএব, ইহা হইতে মনে হয় মিশরীয়দিগের চিত্রবর্ণমালা একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্ভূত হয় নাই।

দেখা যায়, ফিনিসীয়ান্‌দিগের বর্ণগুলি তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দের প্রথম বর্ণ হইতে ঐ ঐ শব্দের অর্থবাচক দ্রব্যের চিত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যেমন অজগর শব্দের প্রথমে 'অ' বর্ণ আছে বলিয়া অজগর সর্পের চিত্র দ্বারা 'অ' বর্ণের চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইতে

---

(১) সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইড়াদেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তিঃ। ২।৩।৮।—আমাদের ধীসাধনকারিণী সরস্বতী, ইড়াদেবী, (ও) ভারতী সকল প্রকার বাক্যরূপিণী।

(২) দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবা তাং বিশ্বরূপা পশবো বদন্তি। ৮।৮৯।১১।—দেবগণ বাক্‌দেবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, সকল প্রকার পশু তাঁহাকে বলিয়া থাকে।

পারে। বোধ হয় মিশরীয় কতকগুলি বর্ণ এই নিয়মের অধীন। কিন্তু মিশরীয় ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিবন্ধন এ বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

যদ্যপি মনুষ্য শব্দ বিশ্লেষণ দ্বারা মূল বর্ণগুলি আবিষ্কার করিয়াছে করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে শব্দের আধার পশুই বর্ণের প্রথম চিত্র হইয়াছিল ইহা যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। পরে ঐ সকল চিত্রের পরিবর্ত্তন দ্বারা, বর্ত্তমান দ্রুত লিখিবার উপযুক্ত চিহ্নসকল উদ্ভাবিত হইয়াছে।

২।

ঋগ্বেদে পূষা নামে এক দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ইড়ার পতি; (১) ইঁহার হস্তে একটী আরা বা অষ্ট্রা নামক সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ড বর্ত্তমান.; এই আরা ব্রহ্ম (অর্থাৎ স্তোত্র) প্রেরণ করেন, এবং ইঁহার বিছানা গোচর্ম্ম ও ইঁহা পশুসাধিনী। (২) সায়ন বলেন যে পূষা আরার দ্বারা গোসকলকে আঘাত করিয়া চালনা করেন সেই জন্য আরার বিছানা গরুর পৃষ্ঠদেশ। সায়ন আরো বলেন পূষার আরা পশুদিগকে জন্ম দেন। কিন্তু আমরা ঋগ্বেদের সকল স্থলে দেখিতে পাই ত্বষ্টা দেবই গর্ভে সকল পশুর আকার প্রদান করেন। (৩) অতএব আমাদের মতে পূষা আরা (১) দ্বারা চর্ম্মের উপর পশুর চিত্র অঙ্কিত করিতেন এবং ইহা দ্বারা লোকের মনে স্তোত্রও অঙ্কিত করিতেন। পূষা ইড়ানাম্নী বাক্‌দেবীর পতি বলিয়া, লিখন বিদ্যার দেবতা হইয়াছেন। সরস্বতীকেও চিত্রায়ু আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। (২) ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে চিত্র-লিখন সে কালে বর্ত্তমান ছিল। ঋগ্বেদের এক স্থলে ঋষি ইন্দ্রকে বলিতেছেন যে মহৎ চিত্র অর্ক পূজা কর। (৩) অর্ক সায়ন বহুস্থলে মন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের এক স্থলে আছে যে অর্ক গায়ত্রী-ছন্দে রচিত হয়। (৪) অতএব অর্ক অর্থে মন্ত্র। চিত্র শব্দের 'বিচিত্র' অর্থ করিলে এ ঋকের অর্থ যুক্তিসঙ্গত হয় না। কিন্তু চিত্র অর্থে চিত্রিত করিলে অর্কের একটী বাহ্য আকার প্রদান করা হয় ও তাহাকে পূজা করা সম্ভবপর হয়।

ঋগ্বেদে পণিনামে এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সহিত আর্য্যদিগের চিরশত্রুতা। পণিগণ ধনবান; তাহারা বাণিজ্য-প্রধান এবং কুসীদজীবি জাতি বলিয়াই বোধ হয়। (৫) সংস্কৃতের পণ,

(১) পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা ইড়স্পতি র্মঘবা দস্মবর্চাঃ। ৬।৫৮।৪।—পূষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বন্ধু, ইড়ার পতি, ধনবান, দর্শনীয় রূপবান্।

(২) যাং পূষন্ ব্রহ্ম চোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে। ৬।৫৩।৮।—হে জ্যোতিষ্মান্ পূষা। (তুমি) যে ব্রহ্মপ্রেরণকারিণী আরা ধারণ কর।

যা তে অষ্ট্রা গো ওপশাঘৃণে পশুসাধিনী। ৬।৫৩।৯।—হে জ্যোতিষ্মান্ পূষা। তোমার যে অষ্ট্রা—গোশয্যা (যায়) ও (যে) পশুসাধিনী।

(৩) ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্বিশ্বান্ সমানজে। তেষাং নঃ স্ফাতিমাযজ। ১।১৮৮।৯।—

ত্বষ্টা রূপ সকলের প্রভু। সকল পশু ব্যক্ত করেন; আমাদিগের সেই সকলের বৃদ্ধিকারীকে পূজা কর।

(১) লাটিন ভাষার stilus শব্দের সহিত অষ্ট্রা শব্দের মিল দেখা যায়। Stilus অর্থে—An iron-pointed peg used for writing on wax tablets. Perhaps allied to L. S ti-mulus.—Skeat's Etymological Dictionary.

(২) পাবিরবী কন্যা চিত্রায়ু সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ। ৬।৪৯।৭।—পবিত্রকারিণী, কমনীয়া, বীরপত্নী, চিত্রায়ু সরস্বতী ধীকে ধারণ করুন।

সায়ন "চিত্রায়ু" অর্থে বিচিত্রগমনা বা বিচিত্র অন্নবিশিষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে বহু স্থলে 'আয়ু' অর্থে প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'প্রাণীয় আয়ুঃ'। ১০।১৮।২।—অর্থে দীর্ঘতরং আয়ুর্জীবনং ইতি সায়ন।

(৩) মহাং। অর্কং। মঘবন্। চিত্রং। অর্চ। ১০।১১২।৯।—হে মঘবন্! চিত্র অর্ককে পূজা কর।

(৪) গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্কং .... ।১।১৬৪।২৪।—গায়ত্র ছন্দ দ্বারা অর্ক রচিত হয়।

(৫) ন রেবতা পণিনা সখ্যং মিন্দ্রো সুন্বতা সুতপাঃ সংগৃণীতে। অভিষুত সোমপানকারী ইন্দ্র, সোমদ্বারা যে যজ্ঞ না করে এরূপ ধনবান পণির সহিত সখ্য উচ্চারণ করেন না। ইন্দ্রঃ। বিদ্বান্।

পণ্য প্রভৃতি শব্দ পণি শব্দ হইতে উদ্ভূত। পণিগণকে 'সম' আখ্যাও প্রদান করা হইয়াছে। (১) এক ঋষি বলিতেছেন যে, হে পূষা পণির মন ও দানার্থ মৃদু কর; তাহাদের হৃদয় আরা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আমাদিগের বশীভূত কর; তাহাদের হৃদয় লিখিয়া কিকিরা কর। (২) ঋষির প্রার্থনা হইতে দেখা যাইতেছে যে পণিগণ আর্য্য ঋষির প্রতি ভক্তিমান নহে। ঋষি পূষাদেবকে ইহাদের মন দান-মুখ করিতে প্রার্থনা করিতেছেন। অন্য কোন দেবতাকে এই কার্য্য সাধনে কোন ঋষি আহ্বান করিতেছেন ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কার্য্য যেন পূষারই বিশেষত্ব। ইহাতে বোধ হয় পণিগণ পূষাকে সম্মান করিত। সেই জন্য তাহাদের সংহার প্রার্থনা না করিয়া, পূষাদেব যাহাতে তাহাদের মনের গতি ফিরাইয়া দেন এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের আরো মনে হয় ঋষি যে দেশে অবস্থান করিতেছেন তথায় পণিদিগের আধিপত্য বেশি। ঋষি বলিতেছেন যে পণির হৃদয়ে তুমি আরা দ্বারা লিখিয়া কিকিরা কর ও আমাদের বশীভূত কর। আরা সূক্ষ্মাগ্র না হইলে হৃদয়-ক্ষেত্রে আঁক কাটিতে পারিত না। এইরূপ আঁক কাটিয়া পণির মন মৃদু করা যায়। সায়ন বলেন যে আঁক কাটিয়া মনটা নরম হইলে তাহারা দান করে। কিন্তু কোন দ্রব্য নরম করিতে হইলে সাধারণতঃ পেষণ করিয়া বা সিদ্ধ করিয়া করিতে হয়। অতএব লিখিয়া কিকিরা করার অর্থ অন্য প্রকার বলিয়া বোধ হয়। বণিকগণের বাণিজ্য করিতে দেনা পাওনা থাকিবে। ইহা মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য স্মরণার্থে কোন দ্রব্যে দাগ কাটিয়া চিহ্ন রাখা প্রথম বণিকদিগেরই আবশ্যক হইয়াছিল। হিসাবে দেনা ও পাওনা এই দুই ভাগ আছে। যদি তাহাদের হিসাবে দেনা লেখা বা চিহ্ন করা থাকে তবে তাহারা দিবে এবং পাওনা লেখা থাকিলে নিশ্চয় আদায় করিবে। এরূপ করা বণিকদিগের স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য ঋষি পূষাদেবকে বলিতেছেন যে পণিদিগের মনে লিখিয়া দাগ কাটিয়া দাও যে তাহারা আমাদের নিকট ঋণী আছে। তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় দান করিবে।

কোন বৈদিক ঋষি সরস্বতীকে যখন রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে পূষার মত লিখিয়া দিতে বলিয়াছেন। যথা—

ত্বং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পূষেব নঃ সনিম্॥ ৬।৬১।৬।—হে দেবি সরস্বতি! হে অন্নযুক্তে! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর; পূষার মত আমাদিগকে ভজনীয় ধন লিখিয়া দাও।

[রদ অর্থে সায়ন "বিলিখ প্রযচ্ছেতি যাবৎ" লিখিয়াছেন।]

পূষাদেবের আরো কি কি ক্ষমতা ছিল তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। পূষাকে পথপতি বলা হইত; তিনি পথের বাধকদিগকে জয় করেন। (১) পূষা ছাগ-বাহন,

---

বেকনাটান্। অহঃদৃশঃ। উত। ক্রত্বা। পণীন্। অভি। ৮।৫৪।১০ :— ইন্দ্র সকল কুসীদজীবি, দিবসগণনাকারী পণিদিগকে কার্য্য দ্বারা অভিভব কর।

(১) তয়া সমস্ত হৃদয় আরিখ কিকিরা কৃণু। ৬।৫৩।৮।—সেই (আরা) দ্বারা সম্রের হৃদয়ে লিখিয়া কিকিরা কর।

['সম' অর্থ সায়ন মতে লুব্ধ জন।]

(২) পণেশ্চিৎ বিম্রদা মনঃ। ৬।৫৩।৩—পণির মনও (দানার্থ) মৃদু কর। পরিতৃদ্ধি পণীনাং আরয়া হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ ৬।৫৩।৫।—হে জ্ঞানী (পূষা)। পণিদিগের হৃদয়সকল আরা দ্বারা বিদ্ধ কর। তৎপরে ইহাদিগকে (আমাদিগের) বশীভূত কর।

বি পূষন্নারয়া তুদ পণে রিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়। ঐ। ৬।—হে পূষা। আরা দ্বারা বিঁধিয়া পণির হৃদয়ে (আমাদের অনুকূল) শুভ ইচ্ছা উৎপাদন কর। অনন্তর ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত কর।

আরিখ কিকিরা কৃণু পণীনাং হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ হে জ্ঞানী (পূষা)। পণিদিগের হৃদয়ে লিখিয়া কিকিরা কর। অনন্তর ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত কর।

(১) বয়মুত্বা পথস্পতে রথং ন বাজ সাতয়ে।
ধিয়ে পূষন্ন যুজ্মহি॥ ৬। ৫৩। ১।—
হে পথপতি পূষা। আমরা অন্নোপার্জ্জনকারী, জ্ঞানের জন্য তোমাকে রথসদৃশ যোজন করিতেছি।

সূর্য্যের দূত, মৃতের আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যান। (১) পূষা গণকদিগের দেবতা ছিলেন। সেইজন্য একস্থলে ঋষি পূষার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহাকে নষ্ট পশু কোথায় যে বলিয়া দিতে পারেন পূষাদেব তাঁহার নিকট লইয়া যান। (২) এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে গ্রীকদিগের মধ্যে Hermes নামক দেবতার সহিত পূষার অসাধারণ মিল আছে। (১) হার্মিসদেব পশুপালক, পণ ও পণস্ত্রীদিগের বন্ধু, দেবতাদিগের দূত, মৃতাত্মাকে হেডিস নামক প্রেতলোকে লইয়া যান। পথের দেবতা ও পথিকদিগের রক্ষকরূপে হার্মিসদেবকে আমরা দেখিতে পাই। হার্মিসদেব গণকদিগেরও দেবতা ছিলেন। পূষাদেবের সহিত প্রায় সকল বিষয়েই হার্মিসদেবের মিল দেখা যায়। গ্রীক পণ ও ভারতীয় পণি শব্দে অসাধারণ মিল রহিয়াছে। পূষাই বর্ণের (letter) আবিষ্কারকর্ত্তা এবং অসিরিসের দিব্যলেখক।

৩।

ঋগ্বেদে আমরা বাক্যের বিশ্লেষণ দেখিতে পাই কি না, সেই বিষয় এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব।

বিপথো বাজসতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি।
সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ॥ ৬।৫৩।৪।—

হে উগ্র (পূষা)! অন্ন লাভের জন্য পথ সুগম কর। (তস্করাদি) বাধকদিগকে জয় কর। আমাদিগের জ্ঞান সফল কর।

(১) অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ংজিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎ সংচক্ষাণো ভুবনাদেব ঈয়তে॥ ৬।৫৮।২

—ছাগবাহন, পশুপালক, অন্নপূর্ণ গৃহযুক্ত, জ্ঞানীর প্রিয়, সমগ্র জগতে স্থাপিত, দেবপূষা শিথিলা অষ্ট্রাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সকল ভূতজাতকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।

যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃসমুদ্রে হিরণ্যয়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্য্যস্য কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ॥ ৬।৫৮।৩

—হে পূষা! তোমার যে সকল সুবর্ণনির্ম্মিত নৌকা অন্তরিক্ষের সমুদ্রের মধ্যে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের দ্বারা সূর্য্যের দৌত্যকার্য্যে গমন কর; (যজ্ঞের) হবি ইচ্ছা করিয়া কামনার বশীভূত হও।

পূষাত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্রবিদ্বান নষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
সত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যোগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ॥ ১০।১৭।৩

—তোমাকে (অর্থাৎ মৃতকে) পূষা এই লোক হইতে (উত্তম লোকে) লইয়া যান। (তিনি) বিদ্বান, অবিনশ্বর পশুযুক্ত, ভুবনের রক্ষক। তিনি তোমার এই সকল পিতৃদিগের নিকট প্রদান করুন; অগ্নি (তোমার) সুন্দর জ্ঞানবান্ দেবতাদিগের নিকট (প্রদান করুন)।

(২) সম্পূষ্‌ন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি। য এবেদমিতি ব্রবৎ॥ —

(২) সম্পূষ্ণা গমেমহি যো গৃহান্ অভিশাসতি।
ইম এবেতি চ ব্রবৎ॥ ৬।৫৪।২

—পূষাদ্বারা অনুগৃহীত আমরা (সেইরূপ লোকের) সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, যিনি (নষ্ট পশু) যে সকল গৃহে (আছে তাহাদিগের) অভিমুখে (যাইতে) উপদেশ করেন। এবং "ইহারাই" এইরূপ বলিতে পারেন।

(১) Hermes:—A Greek god identified by the Romans with Mercury. Both in literature and cult Hermes was constantly associated with the protection of cattle and sheep.......... As a pastoral god he was often closely connected with deities of vegetation, especially Pan and the nymphs...... In the Odyssey, however, he appears mainly as the messenger of the gods and the conductor of the dead to the Hades. Hence in later times he is often represented in art and mythology as a herald...... As a messenger he may also have become the god of roads and door-ways; he was the protector of travellers and his images were used for boundary marks...... Certain forms of popular divination were under his patronage, notably the world-wide process of divination by pebbles.

—Encyclopaedia Britannica.

This Hermes was the first (as they report) that taught how to speak distinctly and articulately, and gave name to many things that had none before. He found out letters and instituted the worship of the gods......... To conclude, he was Osiris's sacred scribe, to whom he communicated all his secrets and was chiefly steered by his advice in everything.

—Historians' History of the World. Vol. I, p. 281.
(A Greek view of the origin of Egyptian History.)

বৃহস্পতি দেব মনুষ্যের মনে বাক্যের বীজ প্রেরণ করেন, ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ কল্পনা করিতেন। তাহাই প্রথম নাম রূপ ধারণ করে। সেই শ্রেষ্ঠ বাক্য অপরাপর শব্দের মধ্যেই নিহিত থাকে; প্রেমের দ্বারা উহা ভক্তের নিকট আবির্ভূত হয়। (১) জ্ঞানীগণ সক্তুর মত মনরূপ চালুনির দ্বারা বাক্যকে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাক্যকে) খোসা হইতে বিভিন্ন করেন। (২) ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঋষিগণ শব্দের মূল প্রকৃতি (অর্থাৎ root) নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অপর এক স্থলে ঋষি বাক্যকে সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা জায়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঋষি বলিতেছেন, অনেকে বাক্য দেখিয়াও দেখে নাই, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করে না। ইহার অর্থ এইরূপ মনে হয়, শব্দগুলি উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। উহারা যেন বাক্যের বস্ত্র সকল। অতএব বাক্যের প্রকৃতরূপ জানিতে হইলে বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি সরাইয়া দেখিতে হইবে। ইহা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। বাক্য নিজ পতিকেই কেবল তাহা প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে ঋষিগণ প্রত্যেক শব্দের প্রকৃতি (অর্থাৎ root) বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাহা হইতে কিরূপে নাম সকল উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর্য্যদিগের ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূল আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতেছি।

বৈদিক যুগে ঋষিগণ কবিতায় কতকগুলি পদ রচনা করিয়া যজ্ঞে দেবতাদিগকে তাহা দ্বারা আহ্বান করিতেন। একটি সম্পূর্ণ রচনাকে সূক্ত বলা হইত। ইহার অর্থ সুন্দররূপে উচ্চারিত। প্রত্যেক সূক্তে কতকগুলি পদ বা stanza থাকিত। তাহাদিগকে ঋক্ বলা হইত। ঋক্‌গুলি নানাছন্দে রচিত হইত। গায়ত্রীছন্দে রচিত ঋক্‌কে অর্ক ও ত্রিষ্টুভ ছন্দে রচিত গুলিকে বাক্ বলা হইত। ঋক্ সকলে নানা পদ থাকিতে পারে। যেমন বাক্ নামক ঋক্ দ্বিপদী বা চতুষ্পদী হইতে পারে। (১)

ছন্দদিগেরও বিশ্লেষণ করা হইত। যেমন গায়ত্রী ছন্দের তিনটী সমিধ আছে বলা হইয়াছে। (২) এই-রূপে ৭টী ছন্দের উল্লেখ আছে। (৩) সাতটী ছন্দ

---

(১) বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরৎ নামধেয়ং দধানাঃ।
যৎ এষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ॥ ১০ | ৭১ | ১

—হে বৃহস্পতিদেব। বাক্যের প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) যাহাতে সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহা নাম রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের (অর্থাৎ নাম সকলের) মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা নির্দ্দোষ ছিল, ইহাদের মধ্যে নিহিত তাহা প্রেমের দ্বারা আবির্ভূত হয়।

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত। ঐ | ২

—যেমন চালুনি দ্বারা ছাতু (চালিয়া) পরিষ্কার করে, যেস্থলে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে) জ্ঞানীগণ মনের দ্বারা বাক্যকে (পরিষ্কার) করিয়াছেন।

(২) উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচং উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ঐ | ৪

—কেহ বাক্যকে দেখিয়াও দেখে নাই, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করে না। যেরূপ জায়া সুন্দর বসন পরিধান করিয়া প্রণয়ভরে পতিসন্নিধানে (নিজ দেহ প্রকাশ করেন), সেইরূপ কোন সৌভাগ্যবান্‌কে বাক্য নিজ দেহ প্রকাশ করেন।

(১) গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাক্যং।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ॥ ১।১৬৪।২৪

—অর্ক গায়ত্রী (ছন্দে) নির্ম্মিত হয়; অর্কের দ্বারা সাম (বা গান হয়); ত্রিষ্টুভ (ছন্দে) বাক্ নির্ম্মিত হয়। বাক্যের দ্বারা বাক্ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ; সপ্তবাণী অক্ষর দ্বারা নির্ম্মিত।

(২) গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা। ১ | ১৬৪ | ২৫

—গায়ত্রী (ছন্দের) তিনটী সমিধ বলিয়া থাকে। সেই জন্য বলে ও মহত্বে (অন্য সকল ছন্দকে) অতিক্রম করিয়াছে।

(৩) অগ্নেঃ। গায়ত্রী। অভবৎ। সযুগা। উষ্ণিহয়া। সবিতা। সম্। বভুব।
অনুষ্টুভা। সোমঃ। উক্‌থৈঃ। মহস্বান্। বৃহস্পতেঃ। বৃহতী। বাচং। আবৎ॥ ১০ | ১৩০ | ৪
বিরাট্। মিত্রাবরুণয়োঃ। অভিশ্রীঃ। ইন্দ্রস্য। ত্রিষ্টুপ্। ইহ। ভাগঃ। অহ্নঃ।
বিশ্বান্। দেবান্। জগতী। আ। বিবেশ। তেন। চাক্লৃপ্রে। ঋষয়ঃ। মনুষ্যাঃ॥ ঐ | ৫

ব্যতীত ৭টী বাণীর উল্লেখও দেখা যায়। সায়নাচার্য্য বাণীকে ছন্দ বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় ছন্দ ও বাণীতে বিভিন্নতা আছে। সেকালে সামগান হইত। গানে ছন্দ (অর্থাৎ তাল) ছাড়া সুর আবশ্যক হয়। আমার মনে হয় সুরকে বাণী বলা হইত। কারণ বাণীসকল অক্ষর দ্বারা নির্ম্মিত বলা হইয়াছে। এক স্থলে দেবীকে সহস্রাক্ষরা বলা হইয়াছে। (১) সরস্বতী যখন দিব্যলোক হইতে আগমন করিয়া জল বর্ষণ করেন তখন তিনি কখন একপদী, কখন বা দ্বিপদী, বা চতুষ্পদী, অষ্টাপদী বা নবপদী হন; কিন্তু পরমব্যোমে তিনি সহস্র অক্ষরযুক্তা হইয়া অবস্থান করেন। পরমব্যোম হইতে দিব্যলোকে আসিয়া সরস্বতী বাণীরূপে সপ্তসিন্ধু প্রবাহিত করিয়াছেন। (২) এই সকল বিবরণ হইতে মনে হয় ঋষিদিগের মতে অক্ষররূপিনী সরস্বতী দিব্যলোকে বাণী এবং মেঘলোকে ছন্দরূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন। পরে পশুপক্ষীদিগের মধ্যে বাক্‌রূপে উৎপন্ন হইতেছেন। মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার অক্ষর অংশ প্রথম প্রেরিত হয় ও উহাই প্রথম নামরূপ ধারণ করে।

যখন ঋষির অন্তরে ঋক্‌রূপে বাক্‌দেবী আগমন করেন, তাহা ছন্দে গঠিত ও সুরে গীত হইতে পারে। তাহাতে নাম ও পদ থাকে। পদগুলি পরিমিত, কারণ তাহারা ছন্দে আবদ্ধ। অক্ষর অংশে পরমব্যোম্ বাস করেন। প্রত্যেক ছন্দের একটী না একটী দেবতা আছেন বলিয়া ঋক্ সকলে দেবগণ অবস্থান করেন। (১) অতএব

—গায়ত্রী অগ্নির সহায় হইয়াছিলেন; উষ্ণিক্ সহ সবিতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; মহান্ সোম অনুষ্টুপ (ছন্দ) ও উক্থ সকলের সহিত (উৎপন্ন হইয়াছিলেন); বৃহতী (ছন্দ) বৃহস্পতির বাক্‌কে রক্ষা করিয়াছিল।

মিত্রবরুণের আশ্রিত বিরাট (ছন্দ), ইন্দ্রের (আশ্রিত) ত্রিষ্টুপ (ছন্দ) এই (যজ্ঞে) দিবসের বিভিন্ন অংশে (পড়িয়াছিল); অপর দেবতাদিগের মধ্যে জগতী (ছন্দ) প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা (অর্থাৎ জগতী ছন্দ দ্বারা) ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন।

সহস্তোমাঃ; সহছন্দসঃ। আবৃতঃ। সহপ্রমাঃ। ঋষয়ঃ। সপ্ত।
দৈব্যাঃ। ১০। ১৩০। ৭

সাতজন দিব্যলোকের ঋষি স্তোমসকলের সহিত, ছন্দসকলের সহিত, পরিমাণসকলের সহিত বর্ত্তমান।

(১) গৌরীঃ ; মিমায়। সলিলানি। তক্ষতী। একপদী। দ্বিপদী। সা। চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী। নবপদী। বভূবুষী। সহস্র অক্ষরা। পরমে। বি
ওমন্। ১। ১৬৪। ৪১

—শ্বেতবর্ণা (সরস্বতী) সলিল সম্পাদনকালে শব্দ করেন—তিনি তখন (কখন) একপদী, (কখন) দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী বা নবপদী হন; (তিনি) পরমব্যোমে সহস্র অক্ষরা (হন)।

(২) বব্রাজ। সীং। অনদতীঃ। অদব্ধাঃ। দিবঃ। যহ্বীঃ। অবসানাঃ। অনগ্নাঃ।
সনাঃ। অত্র। যুবতয়ঃ। সযোনীঃ। একং। গর্ভং। দধিরে।
সপ্ত। বাণীঃ॥ ৩। ১। ৬

অভক্ষণকারিণী, অহিংসিতা, দিব্যলোকের মহতীগণ আচ্ছাদন রহিতা, (ও) অনগ্না হইয়া ইহার (অগ্নির) দিকে গমন করিতেছেন; এই স্থানে (অর্থাৎ দিব্যলোকে) সনাতনী, যুবতী, একত্র অবস্থিতা সাতবাণী একই গর্ভ ধারণ করেন।

(১) ঋচঃ। অক্ষরে। পরমে। ব্যোমন্। যস্মিন্। দেবাঃ। অধি।
বিশ্বে। নিসেদুঃ। ১। ১৬৪। ৩৯

—ঋকের অক্ষরে পরমব্যোম (আছেন), যাঁহাতে বিশ্বদেবগণ আশ্রয় পাইয়া অবস্থান করেন।

চত্বারি। বাক্। পরিমিতা। পদানি। তানি। বিদুঃ। ব্রাহ্মণা। যে। মনীষিণঃ।
গুহা। ত্রীণি। নিহিতা। ন। ইঙ্গয়ন্তি। তুরীয়ং। বাচঃ।
মনুষ্যাঃ। বদন্তি॥ ১। ১৬৪। ৪৫

—বাক্ চারি প্রকার; যে সকল মনীষী ব্রাহ্মণ (আছেন, তাঁহারা) পরিমিত পদযুক্ত সকলকে জানেন; তিনটী গুহায় (অর্থাৎ মনে) লুক্কায়িত, (সকল সময়ে বা সকলের নিকট) প্রকাশ করেন না; মনুষ্যগণ চতুর্থ বাক্য সকলকে বলিয়া থাকে।

এই ঋকে ঋষি পরিমিত পদযুক্ত বাক্য (বা পদ্য) এবং গদ্যে প্রভেদ দেখাইতেছেন। পরিমিত বাক্য যে তিন প্রকার—তাহারা নিম্নলিখিত মনে হয়; যথা—নিবিদ্, গাথা ও উক্থ। ঋগ্বেদে যে সকল শব্দ দ্বারা এই তিন প্রকার বাক্যকে বুঝায় তাহা নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে। নিবিদ্, মন্ম, গী, গাথা ব্রহ্ম, স্তোম, উক্থ, অর্ক, বাক্।

বি। যৎ। বাচং। কীস্তাসঃ। ভরন্তে। শংসন্তি। কে।
চিৎ। নিবিদঃ। মনাঃ।
আৎ। বাং। ব্রবাম। সত্যানি। উক্‌থা। নকিঃ। দেবেভিঃ।
যতথঃ। মহিত্বা॥ ৬। ৬৭। ১০

ঋকের স্বুরে পরমব্যোম্ এবং ছন্দে দেবতাগণ আছেন, এইরূপ অর্থ মনে হয়।

এক স্থানে চারি প্রকার বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার পরিমিত পদযুক্ত। এই তিন প্রকার বাক্য মনীষী ব্রাহ্মণগণ জানিতেন। তাহারা মনোমধ্যে নিহিত থাকিত (অর্থাৎ তাহাদিগকে মুখস্ত করিয়া রাখা হইত) এবং সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না। চতুর্থ বাক্যকে মনুষ্যগণ বলিত। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের যুগে গদ্য রচনা আরম্ভ হয় নাই। উপরিলিখিত বর্ণনা হইতে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি যে ঋগ্বেদের যুগে ঋষিগণ গদ্য ও পদ্যের মধ্যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন; শব্দ ও স্বুর বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। শব্দের বিশ্লেষণে প্রকৃতি (or root) বাহির করিয়াছিলেন এবং স্বুর বিশ্লেষণ দ্বারা অক্ষর বা মূল স্বুর নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঋষিদিগের মতে স্বুর সকল অসংখ্য। কিন্তু কোন স্বুরকে আদি করিলে, তাহার সহিত আর ছয়টী আসিয়া ৭টী স্বুর উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্ত স্বুরের মধ্যে যে মিল আছে তাহা আর্য্য ঋষি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যায়, এই শব্দদ্বারা ঋষিগণ এমন একটীকে বুঝিতেন, যাহাকে আর বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে প্রত্যেক বর্ণকে সেই জন্য অক্ষর বলা হয়। অক্ষর শব্দ এস্থলে বেশ প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ অ, আ, ই, ক্, খ্ প্রভৃতি শব্দ যেন মৌলিক; তাহাদের ক্ষয় হইতে পারে না। ঋগ্বেদের যুগে বর্ণরূপ অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে মনে হয় অক্ষর শব্দ দ্বারা মূল স্বুর সকলকে বুঝাইত।

৪।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে চিত্র শব্দ এমন কতকগুলি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেখানে উহার অর্থ চিত্রলিপি বুঝাইতে পারে। নিম্নে আমরা আরো কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি। পর্জ্জন্যদেব দীপ্তিমতী চিত্রা বাক্যকে বলেন। (১) এস্থলে, মেঘে যে বিদ্যুৎ

—যখন মেধাবীগণ বাক্যকে (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হইয়া বলেন, কেহ কেহ মনে মনে শিবিয়্ বলিতেছেন; তৎপরে তোমাদিগের (অর্থাৎ মিত্রবরুণের) সত্য উক্থসকল বলিব। দেবতাসকলের সহিত মহত্ত্বদ্বারা (তোমরা) কোথাও যাইও না।

গন্তে। ইৎ। উপ। গায়ত। গন্তে। উক্থানি। শংসত।
ব্রহ্ম। কৃণোত। গন্তে। ইৎ। ৮। ৩২। ১৭

—(ইন্দ্রের) পূজায় গান কর, (ইন্দ্রের) পূজায় উক্থসকল বল. (ইন্দ্রের) পূজায় ব্রহ্ম কর।

উত। ত্যা। বাং। রুশতঃ। বপ্সসঃ। গীঃ। ত্রিবর্হিষি।
সদসি। পিন্বতে। নৃন্।

—(হে অশ্বিদ্বয়!) তোমাদিগের দীপ্তবপুর গানসকল যাগগৃহে কর্ম্মনেতাদিগকে আহ্লাদিত করে।

তং। বঃ। ধিয়া। পরময়া। পুরাজাং। অজরং। ইন্দ্রং।
অভি। অনুষি। অর্কৈঃ।
ব্রহ্ম। চ। গিরঃ। দধিরে। সং। অস্মিন্। মহান্। চ।
স্তোমঃ। অধি। বর্দ্ধৎ। ইন্দ্রে॥ ৬। ৩৮। ৩

—তোমাদিগের পরমা ধী দ্বারা সেই অগ্রজাত, অজর ইন্দ্রকে অর্কসকলের দ্বারা স্তুতি করি; ইহাঁতে ব্রহ্ম ও গী সকল প্রদান করে; এবং মহান্ স্তোম ইন্দ্রে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

বর্দ্ধাৎ। যং। যজ্ঞঃ। উত। সোমঃ। ইন্দ্রং। বর্ধাৎ। ব্রহ্ম।
গিরঃ। উক্থা। চ। মন্ম। ৫। ৩৮। ৪

যজ্ঞ ও সোম যে ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করেন, ব্রহ্ম, গান, উক্থ, ও মন্ম (অর্থাৎ মনে মনে যাহা বলা যায়) সকল (ইন্দ্রকে) বর্দ্ধিত করে।

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায়ত্রং উক্থ্যং॥ ১। ৩৮। ১৪

—মুখে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া (বা রচনা করিয়া) বৃষ্টির মত বিস্তার কর। গায়ত্র-উক্থ গান কর।

ইন্দ্রমিৎ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রংবাণী রনূষত॥ ১। ৭। ১

—গাথা গায়কগণ বৃহৎ (গাথা) দ্বারা ইন্দ্রকে, অর্চনাকারীগণ অর্ক দ্বারা ইন্দ্রকে, বাণী সকল ইন্দ্রকে স্তব করে।

(১) বাচং। সু। মিত্রাবরুণৌ। ইরাবতীং। পর্জন্যঃ। চিত্রাং।
বদতি। ত্বিষিমতীম্। ৫। ৬৩। ৬

—হে মিত্রবরুণ! অন্ন-সাধিকা, দীপ্তিমতী, চিত্রা বাক্যকে পর্জন্য সুন্দর বলিতেছেন।

খেলে ও গর্জ্জন হয় তাহাই চিত্রিতা বাক্য রূপে অভিহিত হইয়াছে, মনে করি। অতএব বাক্য যে চিত্রিতা হইতে পারে তাহার ঋষির উপলব্ধি হইয়াছে। আর এক স্থলে ঋষি বাক্যের তন্তু নির্ম্মাণ করিতেছেন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (১) বাক্যকে দর্শনীয় বলিয়া উল্লেখও দেখা যায়। (২) দক্ষের অদ্ভুত কাব্য সকলকে লোকদিগের পুরীসকল এবং কেতু দ্বারা পূতদক্ষ (মিত্রবরুণ) অবগত হন। (৩) এ ঋকের দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। মিত্রবরুণ লোকদিগের পতাকাযুক্ত পুরীসকল অবগত হইয়া তথায় আসিয়া দক্ষের অদ্ভুত বাক্যসকল অবগত হন। কিম্বা দক্ষের অদ্ভুত কাব্যসকল পুরীসকল দ্বারা নির্ম্মিত; লোকদিগের চিহ্ন দ্বারা পূতদক্ষ অবগত হন। দক্ষ কি কাব্যকে পুর বা দেহ প্রদান করিয়াছেন? ইন্দ্রকে চিত্রতম এবং তাঁহার আহ্বানরূপ স্তুতিকে দীপ্তিমতী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। (১) পূষা বাক্যের তন্তুতে নক্ষত্রের সদৃশ চিহ্নসকল বসাইয়া দেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। (২) একস্থলে স্বর্গের সমুদ্রকে 'চিত্রদৃশীক' বিশেষণ প্রদান করা হইয়াছে। (৩) ইহার অর্থ 'চিত্রের মত দেখিতে' করা যাইতে পারে। 'দেখিতে বিচিত্র' অর্থ করিলে মনে হয় উহা নানা বর্ণে রঞ্জিত। কিন্তু স্বর্গের সমুদ্র বলিতে ঋষিগণ আকাশের ছায়াপথকে বুঝিতেন। 'চিত্রের মত দেখিতে' অর্থই উহাতে বেশ খাটে। তবে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে 'চিত্রিত' শব্দ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) বাচং | অষ্টাপদীং | অহং | নবস্রক্তিং | ঋতঃ | স্পৃশম্ |
ইন্দ্রাৎ | পরি | তন্বং | মমে ॥ ৮ | ৬৫ | ১২

—অষ্টপদযুক্ত, নবস্রক্তিবিশিষ্ট, ঋতস্পৃশ. বাক্‌তন্তুকে ইন্দ্র হইতে নির্ম্মাণ করি।

(২) অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ।
ঘৃতাৎ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত ॥ ৮।২৪।২০

অগোরুধ, গো-ইচ্ছাকারী (ও) দীপ্যমান (ইন্দ্রকে) ঘৃত ও মধু হইতে সুস্বাদু, দর্শনীয় বাক্য বলা হইয়াছে।

(৩) অধ | হি | কাব্যা | যুবং | দক্ষস্য | পূঃভিঃ | অদ্ভুতা |
নি | কেতুনা | জনানাং | চিকেথে | পূতদক্ষসা ॥ ৫ | ৬৬ | ৪

—তোমাদিগের যজ্ঞকারীর অদ্ভুত কাব্যসকলকে, হে শুদ্ধ বলযুক্ত। লোকদিগের পুরীসকলদ্বারা (ও) কেতু (অর্থাৎ চিহ্ন) দ্বারা বিশেষরূপে অবগত হও।

---

(১) অপাৎ | ইতঃ | উৎ | উ | চিত্রতমঃ | মহীং | ভর্ষৎ |
দ্যুমতীং | ইন্দ্র হূতিং | ৬ | ৩৮ | ১

—চিত্রতম (ইন্দ্র) আমাদিগের এই (চমস হইতে) পান করুন। মহতী, দীপ্তিমতী, ইন্দ্রহূতিকে ধারণ করুন।

(২) সঃ | পিস্পৃশতি | তন্বি | শ্রুতস্য | স্তৃভিঃ | ন | নাকং |
বচনস্য | বিপঃ | ৬ | ৪৯ | ১২

—তিনি (পূষা) বিপ্রের বচনের তন্তুতে, স্বর্গে তারকাসকলের মত (চিহ্ন সকল দ্বারা) স্পর্শ করেন।

(৩) অয়ং। বিদৎ | চিত্রদৃশীকং | অর্ণঃ। শুক্রসদ্মনাং | উষসাং—
অনীকে | ৬ | ৪৭ | ৫

—জ্যোতিগৃহবতী উষাদিগের সমীপে চিত্রদৃশীক অর্ণকে (বা সমুদ্রকে) ইনি জানেন।

বসন্ত-লক্ষ্মী।

সেদিনো মাধবী রাতি, নিখিল উঠিল মাতি',
হৃদয় ফুটিল লুটি' হাস্যে,
সব রঙ অরুণিমা, সব হিয়া পূরণিমা,
সব গতি পরিণত লাস্যে।
চকোরী চেতনা পেয়ে মিলিল গো গান গেয়ে
ষোলকলা-ঢলঢল চান্দে,
সব রসধারা মিশি' ছুটিলরে দশদিশি—
টুটিলরে সব বালুবান্ধে।
পিকবধূ শিহরিল কুহুকুহু কুহরিল,
সীধু হরি' বিহরিল ভৃঙ্গ,
চখাচখী মোহে দুহুঁ মূরছিল মুহুমুহু,
রতিপতি ফুকরল শৃঙ্গ।
ফাগরেণু ফুলে ফুলে উড়াইল দুলে দুলে
হোলী-লীলা-লোল রসরঙ্গে,
কিসলয় কমরাগে পুলকাঞ্চন জাগে
রসাবেশে বনরাণী অঙ্গে।
তোমার বরণতরে বাজিল দেউল ঘরে
বেণুবীণা শাঁখ আর ঘণ্টা,
দূরাগত রুণুঝুন শুনি' মোর লাখগুণ
হৃদয়ে বাড়িল উৎকণ্ঠা।
তব আগমন বীথি- ভরা শন শন গীতি
সূচিল যে কোটি মধুমক্ষী,—
মম মনোমন্দিরে এলে তুমি ধীরে ধীরে
মানস বসন্তের লক্ষ্মী।
ছিলে বিধু-মল্লীতে, ছিলে মধু-বল্লীতে,
নখরুচি কিংশুক-কুঞ্জে,
ছিলে তুমি গুঞ্জনে, বনভরা শিঞ্জনে,
নিখিলের সব শোভাপুঞ্জে।
পাটলের ডালে ডালে পিকরুত-তালে তালে
পা-ফেলিয়া এলে হৃদিসদ্মে,
মধুঋতু-বৈভব ফুলরেণু-সৌরভ
হয়ে জাগে তব করপদ্মে।
তব দুকূলাঞ্চল- ভরা মৃদু চঞ্চল
মলয় আসিল ধীর মন্দ্রে,
মরমের বেণুবনে পশি' যে সে খনে খনে
বাজাইল শতকোটি রন্ধ্রে।
তব মধু-দিঠিপাতে সেদিনের মধুরাতে
নয়নের গেল জরালস্য,
তোমার চিকুর চুমে জীবনের মরুভূমে
শিহরিল নীলফুলে শস্য।
বাসনার শিখিনীরে নাচাইল ধীরে ধীরে
কঙ্কণ তব মণিবন্ধে,
বনভরা মরমর বিহগের কলস্বর
জাগিল যে কবিতার ছন্দে।
তোমার হরিণ-আঁখি প্রেমহেম রেণু মাখি'
মুদে এল মোর আঁখি চুম্বে,
সে রজনী কিবা শুভ, ভাষা মোর ডুব' ডুব'
আশাভরা সুধারস-কুম্ভে।
বাহিরের ঋতুরাজে আনিলে এ হৃদিমাঝে,
যথা তার চির সিতছত্র,
সেই হতে রাজ-রমা তুমি আছ প্রাণ-সখা
খুলি' সুষমার দানসত্র।

শ্রীকালিদাস রায়।

জাপানের যৎকিঞ্চিৎ।

গুরুদেবের সঙ্গে টোকিও থেকে ইয়োকোহামায় এসেছি—২।৩ দিন হলো। Pearson সাহেব ও Andrews সাহেবও এখানে এসেছেন। চারজনেই মিষ্টার হাঁরার বাড়ীতে আছি। অতি আদরের অতিথি।

মিষ্টার হাঁরা খুব বড় দরের একজন millionaire—আর্টের জহরি—চিত্রকলার চমৎকার একজন সমজ্‌দার। অতি সদাশয় লোক। ঠোঁটে হাসিটুকু লেগেই আছে—দয়ামায়া যেন তাঁর মুখে,আজীবন আঁকা রয়েছে।

দেশের শিল্পের জন্য ইনি দু'হাতে অকাতরে টাকা-কড়ি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। মিঃ টাইকান্, মিঃ সিমামুরা, মিঃ কান্জান্ প্রভৃতি নামজাদা আর্টিষ্টগুলি সকলেই এঁর হাতে। সকলকেই ইনি ছবির বিনিময়ে রাশি রাশি অর্থ ঢেলে দিচ্ছেন। ললিতকলার সখ এর বেজায়।

আমরা হাঁরা সাহেবের যে বাড়ীটীতে আছি সে একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদতুল্য। সাম্‌নেই প্রশান্ত মহাসাগর একেবারে প্রশান্ত—উদার! এই সমুদ্রের পাড় থেকে ঠিক্ খাড়া বড় বড় পাহাড় উঠেছে। পাহাড়ময় পাইন্ গাছ, এই পাইন্ গাছের সারের ভিতর দিয়ে বাড়ীখানি দূর থেকে হুবহু ছবির মত দেখায়। ঠিক যেন জয়দেবের একখানি ছোট্ট গীতিকাব্য।

এই বাড়ীটি জাপানী ধরণের—আগাগোড়া কাঠের তৈরী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্চর্য্য রকম সাজান গোছান। এই বাড়ীর এক ধারে ছাদের উপর বেড়াবার সুন্দর খানিকটা খোলা জায়গা আছে। ছাদের পাশ দিয়ে পাইনগুলি উঠেছে—চিরছায়াশীতল। এই ছাদে সকাল সন্ধ্যে বেড়াই।

আমাদের এখান থেকে "ফুজি" পাহাড় জাপানের একটা দেখবার জিনিস। যদি সময় পাই—তবে গিয়ে একবার দেখে আস্‌ব আশা আছে।

আজ কাল রোজ খুব সুন্দর সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। আকাশ একেবারে সোনায় রাঙা হয়ে যায়। আকাশ থেকে দলে দলে লাল পরীরা উড়ে এসে নীলের উপর ধীরে ধীরে সোনার আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে যায়। আর পূবদিক হতে সন্ধ্যারাণী নেমে এসে আব্‌ছায়ারঙের ঘোম্‌টাখানি টেনে নিয়ে আসর জম্‌কিয়ে বসেন। যেন প্রকৃতই রাজেন্দ্রাণী!

রাজার হালে গুরুদেবের সঙ্গে দিন কাটছে। দাসদাসী অনেক। সকলেই শশব্যস্ত। এই মিঃ হাঁরা তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড পদ্ম-পুকুরের পাড়ে একটা খড়ের ঘরে বাস কর্‌চেন, আর আমাদের আরামের জন্য এই মস্ত বড় বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছেন। আমার ছবি আঁকবার জন্য আলাহিদা একটা ঘর ঠিক্ করে দিয়েছেন। রং, তুলি, ব্রাস প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সমস্তই মজুদ্। বন্দোবস্ত দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

আমি গুরুদেবের (রবিবাবুর) সঙ্গে আমেরিকা যাব। আমার জন্য বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। এণ্ড্রুজ সাহেব এখান থেকে দেশে ফিরে যাবেন। যে ক'দিন টোকিও ছিলুম টাইকানের কাছে সে কয়দিন ছবি আঁকা শিখেছিলুম। হাঁরার বাড়ীর কাছেই সিমামুড়া আর্টিষ্টের বাড়ী; এখন তাঁর বাড়ী গিয়ে ছবি-আঁকা শিখ্‌চি। গুরুদেব খুব লিখ্‌চেন। আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি অনেক টাকা পাবেন।

জাপানীরা খুব লম্বা লম্বা কাগজে (গাজীর পটের মত) তুলি দিয়ে চিঠী লেখে। তুলিই তাদের কলমের কাজ করে। ছেলেবেলা থেকে এরা এই তুলি হাতে করেচে। কাজেই ভাল ছবি আঁক্‌চে। আর আমাদের এই তুলি-সাধনা কর্‌তেই কত যুগ কেটে যায়!

আমাদের বাড়ীর নীচে পাহাড়ের তলায় একটা বড় রকমের বাগান আছে। এই বাগানটা হাঁরা সাহেব সাধারণের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। Public যখন তখন এখানে বেড়াতে আসে, picnic কর্‌তে আসে। তাদের জন্য জ্বালানীকাঠ, ভাল ভাল চুলো, পানীয় জল—সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করা আছে। বসবার জায়গা, billiard room, মন্দির, Tea Houseকতকি চারদিকে ছড়ান আছে। এই সকল জিনিসের ভিতরে আর্টের নৈপুণ্য দেখ্‌লে চমৎকৃত হতে হয়। এ যেন একটা চিত্রকলার দেশ—খালি রংচং। জাপানটাকে দূরথেকে দেখ্‌লে একটা বড়রকম রংবেরঙের প্রজাপতি বলে ধারণা হয়। মনে হয় যেন সাগরতীরে কোন পরীর দেশে বেড়াতে এসেছি! এ যেন প্রকৃতই একটা সজাগ স্বপ্ন!

ইয়োকোহামা, (জাপান।)

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

"বৃন্দাবন অন্ধকার"।

"নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"—
গাহিলে কি গান কবি, শুনালে কি হাহাকার!
ছিলে বুঝি তুমি সেই গোকুলে রাখাল-সাথী,
উঠেছে বেদনা তাই তোমার হৃদয় মথি'।
শুনাইলে মর্ম্মবাণী যুগান্তের শোকগাথা,
যমুনার কলনাদে গোপ-গোপিকার ব্যথা;
অন্ধ বৃদ্ধ নন্দরাজ, শূন্য বক্ষ যশোদার,—
গুমরে সে কথা স্মরি' বক্ষে মহা হাহাকার।
বল্লরী-বিতান শূন্য, নীপ-মূল শূন্য বনে,
অবসাদ-অন্ধকার সুখের সে বৃন্দাবনে।
আজি সেই স্মৃতি বুঝি বাজিছে হৃদয়পুরে,
ভুল নাই কোন কথা এই জন্ম জন্মান্তরে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়-কৌশল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিন্তা একটী মনোবৃত্তি। অভিনয়কালে কখন কখনো ইহাকে বাক্যময় করিয়া শ্রোতাকে শুনাইতে হয়। যেখানে বাক্য সেইখানেই ধ্বনি, সেইখানেই তাহার বিরাম বিচ্ছেদ, উত্থান পতন, দীপন, অনুবন্ধ। পলাশী-প্রাঙ্গণে ক্লাইব ভাবিতেছেন—"কি হয়, কি হয়! রণে জয় পরাজয়।" শিবাজী ভাবিতেছেন—কিরূপে দিল্লী হইতে পলায়ন করিবেন। গোবিন্দলাল ভাবিতেছে—'স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?' ভ্রমর ভাবিতেছে—'কি অপরাধ আমি করিয়াছি, যে আমাকে ত্যাগ করিবে?' আবার আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তুত ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া পার্থ ভাবিতেছেন—এ বিজয় কাহার জন্য?—এ সকলই চিন্তা। কণ্ঠস্বর যতদূর পারে উহাদিগকে ফুটাইয়া দেয়। যেটুকু, অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিপূর্ণ করে আমাদের নয়ন, বদন, শির—আমাদের অঙ্গ উপাঙ্গ। ইহাদের অভিনয়-কৌশলই আঙ্গিক অভিনয় নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই ভরত বলিয়াছেন—

"এবং ভাব রসোপেতা কাকুঃ কার্য্যা প্রযোক্তৃভিঃ"।

নরচিত্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভরতমুনি তাহা দেখাইয়াছেন। চিত্তবৃত্তিগুলির পরিচয় বিবৃত করিয়াছেন—উৎপত্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রকাশোপযোগী কণ্ঠ ও অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সে বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার মধ্যে যে অনন্ত রত্নরাজি বর্ত্তমান আছে তাহা ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধে কিরূপে দেখাইব—কিরূপে বুঝাইব যে নাট্যকলার আদর্শের জন্য আমাদের কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই—আপনার গৃহচত্বরেই তাহার সন্ধান লাভ ঘটিতে পারে। চক্ষু একটী উপাঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রে সাধারণভাবে রস অনুসারী দৃষ্টি আট প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্থায়ীভাবের দৃষ্টিও আট প্রকার বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সাধারণভাবে মুখ্যতঃ অষ্টাদশ প্রকারের দৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী উদাহরণ দিলেই বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। কখনো ঊর্দ্ধ, কখনো নিম্ন, কখনো স্থির, কখনো বক্র গূঢ় চকিত চক্ষুতারা—ইহারই নাম শঙ্কিতা দৃষ্টি। শঙ্কার অভিনয়কালে এইরূপ দৃষ্টির প্রয়োজন। চক্ষু-তারকার অভিনয় নয় প্রকার, অক্ষিপত্রের অভিনয় নয় প্রকার, ভ্রূ-যুগের অভিনয় সাত প্রকার এইরূপ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভিনয়-কৌশল ও মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়া নাট্যশাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে অঙ্গরঞ্জন বা অঙ্গ-রচনার প্রথা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীককবি থেস্‌পিস্ যখন তাঁহার নটদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে অভিনয় করিয়া ভ্রমণ করিতেন তখন তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে অভিনয়কালে নটদিগের বদনমণ্ডল উপযুক্তরূপে রঞ্জিত হইলে দর্শকের অধিক প্রীতির কারণ হয়। য়ুরোপীয় নাট্য-জগতে অঙ্গরঞ্জন প্রথার ইহাই প্রথম প্রবর্ত্তন। ইহার

বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের রঙ্গালয়ে অঙ্গরচনার জন্য নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মাগধী, গৌরসেনী দ্রাবীড়ী, গৌড়ীয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসীর অভিনয়-কালে কিরূপ বর্ণ গ্রহণ করা প্রয়োজন—কোন্ কোন্ রং মিলাইলে সেই সেই বর্ণ হয়, এ সকলই নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। ইহাই পূর্ব্বকথিত আহার্য্য অভিনয়ের একাংশ। উহার অপরাংশ দৃশ্যপটাদি।

অধ্যাপক Macdonell তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—It is somewhat curious that while there are many minute stage-directions about dress and decorations no less than about the actions of the players, nothing is said in this way as to change of scene.

অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

There were no special theatres in the Indian Middle Ages, and plays seem to have been performed in the concert room (সঙ্গীত-শালা) of royal palaces. A curtain divided in the middle was a necessary part of the stage arrangement; it did not, however, separate the audience from the stage, as in the Roman theatre, but formed the background of the stage. Behind the curtain was the tiring room (নেপথ্য), whence the actors came on the stage. When they were intended to enter hurriedly, they were directed to do so "with a toss of the curtain." The stage scenery and decorations were of a very simple order, much being left to the imagination of the spectator, as in the Shakespearian drama. Weapons, seats, thrones and chariots appeared on the stage; but it is highly improbable that the latter were drawn by the living animals supposed to be attached to them. Owing to the very frequent intercourse between the inhabitants of heaven and earth, there may have been some kind of aerial contrivance to represent celestial chariots; but owing to the repeated occurrence of the stage direction "gesticulating" (নাট্যয়িত্বা) in this connection, it is to be supposed that the impression of motion and speed was produced on the audience simply by the gestures of the actors.

উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে অধ্যাপকের মতে সেকালে কোনো নাট্যশালা ছিল না। সঙ্গীত-শালাতেই কখন কখন নাটকাভিনয় হইত। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিচারের স্থান এ প্রবন্ধ নহে। অধ্যাপকের উক্তির উত্তরে ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছি এখনো তাহাই বলিতে চাই যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ডপ প্রস্তুত করিবার বিস্তৃত উপদেশ আছে—যথা,—

চতুঃষষ্টি করান্ কুর্য্যাৎ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাবিংশতং চ বিস্তারান্মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ॥
—ইত্যাদি।

অধ্যাপক Macdonellএর দ্বিতীয় উক্তি—প্রাচীন-কালে ভারতের রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটাদির সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সেক্ষপীয়রের যুগে যেমন দর্শককে দৃশ্যাদি কল্পনা করিয়া লইতে হইত এ যুগেও তদ্রূপই ছিল। ভরত এবং অন্যান্য নাট্যশাস্ত্রকার আহার্য্য অভিনয়ের বর্ণনকালে ইহার উত্তর দিয়াছেন। আহার্য্য অভিনয় নেপথ্যবিধি বলিয়া পরিচিত*। নেপথ্যবিধি কেন? না, লোক চক্ষুর অন্তরালেই পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতে হয়। এই নেপথ্যবিধি চার প্রকারের। তন্মধ্যে পুস্ত ও সংজীব দুই প্রকার। পুস্ত নেপথ্য কাহাকে বলে?

শৈল যান বিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যেব স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

পর্ব্বত, যান, বিমান অর্থাৎ ব্যোমচারি যান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্ত জাতীয় বলা হইয়াছে। রঙ্গপীঠে প্রদর্শিত না হইলে এ সকলের

উল্লেখ দেখিতে পাইতাম না। সংজীব নেপথ্য কাহাকে বলে?

যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ নেপথ্য হইতে রঙ্গপীঠে প্রাণী প্রবেশ করাইবার নাম সংজীব। সুতরাং একথা কিরূপে স্বীকার করিব যে "it is highly improbable that the latter (chariots) were drawn by the living animals supposed to be attached to them."

অধুনা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে পরিচ্ছদ গ্রহণে অনেক বিভ্রাট দেখিতে পাওয়া যায়। এমনো দেখা গিয়াছে যে রাজকুমার সেলিম হাইল্যাণ্ডার সৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন! কল্পিত ও বাস্তব উভয় প্রকার চরিত্র লইয়া নাট্যাভিনয়। কল্পিত চরিত্র অভিনয়-কালে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া পরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে এবং কবির উপরও নির্ভর করিবার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি শক্তিশালী হইলে আবশ্যক মত তিনিই পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—ইন্দ্রজিৎ ধ্যান নিমগ্ন। মাইকেল তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে। কৌষিক বস্ত্র কৌষিক উত্তরী
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ। পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষাকোষী, ভরা
········ পাশে হৈম ঘণ্টা, উপহার নানা
হেমপাত্রে, রুদ্ধদ্বার—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—

পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় আসিতেছেন—

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে
প্রবেশিলা················
আলু থালু ·····কবরীবন্ধন
আভরণ হীন দেহ·········
অশ্রুময় আঁখি··············
বিবশা রাজমহিষী·········

কপালকুণ্ডলায়, নবকুমার স্তূপ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন—"শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল·····তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে········কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দুল-চর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু জটা পরিবেষ্টিত·········জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন········ সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে·········যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।"

আর অধিক উদাহরণের প্রয়োজন দেখি না। সুকবির গ্রন্থে এরূপ নির্দ্দেশ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কাল্পনিক চরিত্রের পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনে নাট্যাচার্য্যের পথ দুরূহ নহে। যেখানে কবির সাহায্য পাইব না, সেখানে কাল, পাত্র ও দেশের ইতিহাস সাহায্য করিবে। বাস্তব চরিত্রের অভিনয়কালে ত কোনরূপ অসুবিধাই ঘটিতে পারে না, কারণ অভিনেয় চরিত্রের বেশভূষা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। নাট্যশাস্ত্র তাই কহিতেছে—"কুর্য্যাদঙ্গস্য রচনাং দেশ জাতি বয়ঃশ্রিতাম্।" য়ুরোপীয় নটকুল এতকাল পর এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া কহিতেছেন—"I should lay it down, in fact, the chief thing is that an actor should imagine himself to be the character and the audience will imagine that he is the character; that is the real art of make-up, I should say."

নাট্যশাস্ত্রের প্রধান নির্দ্দেশ—

এবং বুধঃ পরং ভাবং সোঽস্মীতি মনসা স্মরন্।
বেশবাগঙ্গলীলাভিশ্চেষ্টাভিশ্চ সমাচরেৎ।
যো যেন ভাবেনোদ্দিষ্টঃ সুখদেনেতরেণ বা।
স তদাহিত সংস্কারঃ সর্ব্বং পশ্যতি তন্ময়ম্॥

—আমিই সেই, এইরূপ ধারণা না জন্মিলে প্রকৃত অভিনয় হয় না। এই তন্ময়ত্ব বেশে, বাকে, অঙ্গলীলায় ও কণ্ঠভঙ্গীতে সাধন করিতে হয়। Richard III নাটক সমালোচন কালে একজন সুবিখ্যাত সমালোচক

কহিয়াছেন—Our highest conception of an actor is, that he shall assume the character once for all, and be it throughout.

H. H. Wilson প্রমুখ বিদেশীয় লেখকগণ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বদেশীয় সমালোচকগণ সন্দেহ করেন যে নাট্যশাস্ত্রের যুগে চিত্রপটের ব্যবস্থা থাকা সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"সেকালের চিত্রকলার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দূর নৈকট্যসূচক পরিপ্রেক্ষিত চিত্রলেখা-পদ্ধতি জানা ছিল কি না, কিম্বা প্রচলিত ছিল কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।" কিন্তু H. H Wilson স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"The scene may be considered to be marked, as in the French drama, by the entrance of one character and the exit of another, etc—

মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই যে স্থানে মৈত্রেয় প্রবেশ করিতেছেন তথায় দৃশ্য বর্ণনা এইরূপ আছে—দৃশ্যপটের একদিকে পথ এবং পথিপার্শ্বে দারুদত্তের গৃহচত্বর। চত্বরের বহিরংশের এক দিক পথ হইতে দেখা যাইতেছে। এইস্থান সমালোচনকালে H. H. Wilson বলিয়াছেন—

We have already observed that it does not seem probable that the Hindus ever knew what scenes were; and that they substituted curtains for them, ইত্যাদি। উক্ত নাটকের অনেক স্থানেই এইরূপ সমালোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার অনুমান হয়, এই কারণেই আমরাও অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি যে সেকালে দৃশ্যপটের ব্যবস্থাই ছিল না।

"পরিপ্রেক্ষিত চিত্রলেখা পদ্ধতি" বা perspective drawing সেকালে ছিল কি না তাহা সত্যই এখনো প্রমাণিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও বোধ হয় নাই। কারণ সেরূপ কোন চিত্র এতকাল পর আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন চিত্রশিল্পের যথেষ্ট পরিচয় আছে। রামায়ণে ও সংহিতায় চিত্র-ব্যবসায়ী জাতির উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্বেদের ত্রিংশ অধ্যায়ে বৈশ্যগণ যে চিত্রকর ছিল তাহার প্রমাণ আছে। রামায়ণে চিত্রপটে সুশোভিত গৃহাদির যথেষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে পর্য্যন্ত চিত্র-প্রতিকৃতির বর্ণনা আছে। পাণ্ডব-সভায় চিত্রপট বিলম্বিত ছিল এরূপ কথা মহাভারতে লিখিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও হরিবংশে চিত্রলেখা কর্ত্তৃক লিখিত চিত্রের বর্ণনা আছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন অজন্তার গুহায় আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ভারতের স্থাপত্য গৌরব বহু প্রাচীন। তাহা হইতেই ইংলণ্ডের শিল্পজগতে নূতন আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে। Imperial Indian gazetteer গ্রন্থে লিখিত আছে—

The English decorative art in our day has borrowed largely from Indian forms and patterns. The exquisite scrolls of the rock-temples of Carli and Ajunta, the delicate marble tracery and flatwood carving of western India, the harmonious blending of forms and colours in the fabrics of Kashmere, have contributed to the restoration of taste in England.

কোলম্যান তাঁহার Hindu Mythology নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন— The remains of their architectural art might furnish the architects of Europe with new ideas of beauty and sublimity.

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের কথা এই জন্য বলিতেছি যে হিন্দুগণ ললিতকলায় সুনিপুণ না হইলে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারিত না। চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা না থাকিলে প্রস্তরে বা দারুগাত্রে অথবা হস্তিদন্তে তক্ষণ করাও সম্ভব নহে বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী তাঁহার Arts and Crafts of India and Ceylon নামক গ্রন্থের একস্থানে অতীত হিন্দু স্থাপ-

ত্যের কালনির্ণয় করিয়া ইহার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। সেই তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—

Gupta (style) 320 to 600 A. D. sculpture and architecture (stupa etc) at Sarnath ; at Anuradhapura (2nd century B. C. to 9th century A. D.) ; sculpture and painting at Ajanta ; painting and secular architecture at Sigiriya (Ceylon, 5th century).

সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেও যে উন্নত শিল্প বর্ত্তমান ছিল তাহার নিদর্শন আজিও লুপ্ত হয় নাই। যে শিল্প খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই এত প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই এক বৎসরের সাধনার ফল ছিল না। সুতরাং ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ললিতকলার পূজা আরব্ধ হইয়াছিল, এবং যে যুগে ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল (অর্থাৎ মৃচ্ছকটিক নাটক রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে) সেই যুগেই স্থাপত্য পূজার আসন লাভ করিয়াছিল। তখন যে চিত্রশিল্পের দিকটা একেবারে অন্ধকারেই ছিল এরূপ অনুমান ঠিক নহে। কারণ চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এরূপ ভাবে সম্বন্ধ-বদ্ধ যে তিনটীই একসঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে—বিকশিত হয়। তবে কুসুমস্তবকে কোনটী যেমন পূর্ণসৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া নয়নের শোভা বর্দ্ধন করে আর কোনটী অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মাণ হইয়া রহে, জাতীয় জীবনে ললিতকলার বিকাশেও অনেক সময় সেইরূপই দেখা যায়, বলিয়া মনে করি। রামায়ণ, মহাভারত বা হরিবংশে যে সকল চিত্রের কথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিলে ইহাই বলিতে হয় যে হিন্দুনাট্যশাস্ত্ররচনার যুগে ভারতবর্ষে চিত্রকলারও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাই ঘটিয়াছিল। সুতরাং নাট্য অভিনয়কালে দর্শকের সম্মুখে চিত্রিত পটই প্রদর্শিত হইত। সে সকল পটে perspective drawing থাকিত কিনা তাহা অবশ্য জানিবার উপায় নাই—কিন্তু H. H. Wilson সাহেব কথিত curtain ই যে একমাত্র সম্বল ছিল তাহা নহে।

"সমুদ্র মন্থনের" উল্লেখ করিয়া Wilson সাহেব বলিতেছেন—A splendid subject for spectacle if well managed. We may doubt the success of the Hindu mechanicians in representing the mountain and the snake, the churning-staff and rope, or the agitation of the mighty main from which sprang the personifications of health and beauty, and the beverage of immortality; this was in all probability clumsily contrived [কেন যে এরূপ সিদ্ধান্ত হইল তাহার কারণ লিখিত নাই] but the gods and demons were well-dressed and better acted, and with the patronage of a Raja, the conflicts between the hosts of heaven and hell for the Goddess of beauty and the cup of ambrosia were no doubt got up with no want of numbers, or of splendour.

অথচ তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতের রঙ্গমঞ্চে ঝটিকা, যুদ্ধ, নগরবিজয়, অশ্ব, গজ, রথ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। [Tempests, combats, and the storming of towns, may be represented, and all the pride and pomp of war, as horses, elephants and cars, may be introduced.]

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে যন্ত্রচালিত দৃশ্যাদির ব্যবস্থার জন্য নাট্যশাস্ত্রে বিধি গঠন করিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হইয়াছিল সুতরাং সমুদ্রমন্থনের দৃশ্য যে প্রদর্শিত হইত না তাহা বলিব কিরূপে ? বর্ত্তমান মহা বিপ্লবের পূর্ব্বে যে মনে করিয়াছিল যে মেঘনাদ সত্যই মেঘান্তরাল হইতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন। সহস্র বৎসর পর যদি পৃথিবী হইতে এই সামরিক ব্যোমযানের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় আর থাকে কেবল তাহার কাহিনী মাত্র, তখন কি মনে হইবে না যে মেঘান্তরাল হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া শত্রু নির্ম্মূল করিবার ইতিহাস অলীক অসার অসম্ভব। যাঁহারা সৌষ্ঠবসম্পন্ন অভিনয় করিবার কৌশল শিক্ষা দিবার

নিমিত্ত বিরাট গ্রন্থ রচনা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন, যাঁহারা দৃশ্য প্রদর্শন ও পরিচ্ছদ গ্রহণ ব্যাপারকেও সেই গ্রন্থে যথোপযুক্ত স্থান দিয়া দৃশ্যাদির শ্রেণীবিভাগ ও প্রকরণভেদ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে অভিনয় কালে দৃশ্যাদি প্রদর্শন অভিনয়কে সফল করিবার একটী প্রধান উপায় মনে করেন নাই তাহা অনুমান করিতে পারি না। যথোপযুক্ত পরিচ্ছদাদি গ্রহণ, বর্ণানুলেপন এবং দৃশ্যাদি প্রদর্শনই নেপথ্য-বিধির অর্থাৎ আহার্য্যাভিনয়ের আলোচ্য বিষয়। রঙ্গালয়ে দৃশ্যাদি প্রদর্শন বলিলে স্বতঃই মনে হয় আসল এবং নকল উভয়বিধ দৃশ্য প্রদর্শন। সুতরাং অভিনয়ের এই অতি আবশ্যক অংশের অনেকটাই যে দর্শকের কল্পনার উপর ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন ইহা য়ুরোপীয় অধ্যাপকের উক্তি হইলেও সহসা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে expressions অর্থাৎ অনুভাব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাট্যশাস্ত্রের ভাবপ্রকাশের ব্যাপার-সমূহ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।"

নাট্যশাস্ত্রে নাট্য-অভিনয় সম্বন্ধে কিরূপ সূক্ষ্মভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার দুই একটী উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

'শোক অভিনয়ের এইরূপ উপদেশ আছে—প্রিয়-বিয়োগ, বিভব নাশ, বধ, বন্ধন ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিবেদন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহশৈথিল্য, ভূমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।" বিভাব কে cause or exciting circumstances বলা যাইতে পারে। অনুভাব অর্থে—manifestations বলা চলে।

"রোদন তিন প্রকার। আনন্দজ, কাতরতা-জনিত ও ঈর্ষাকৃত তন্মধ্যে যাহা আনন্দজ তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল এবং অনুসরণ হেতু অপাঙ্গ হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-জনিত, তাহাতে পর্য্যায়রূপে অশ্রুপাত, মুক্তকণ্ঠতা, অসুস্থ দেহের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিপাত ও বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ওষ্ঠ স্ফুরণ, শিরঃকম্প, ভ্রূকুটি ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতি মনুষ্যের দুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।"

বিষবৃক্ষ হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি—

"শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীর পীড়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য নগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিলেন তাহা অনেক বিলম্বে নগেন্দ্রের হস্তগত হইল। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া সর্ব্ব অবগত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তের জন্য আমার চেতনা রাখ"।

রাজসিংহে জেবউন্নিসা—আসিরুদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া যখন জেবউন্নিসাকে জানাইল যে কিছুতেই মবারককে বাঁচান গেল না, সে সাপের বিষে মরিয়াছে, "জেবউন্নিসা আতর মাখা রুমালখানা চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে মাথা লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল"।

সাহিত্যের ভাণ্ডারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ক্রোধ সম্বন্ধে ভরত মুনি বলিয়াছেন—"বিবাদ, কলহ ও প্রতিকূলাচরণ দ্বারা ক্রোধ জন্মে। শত্রু নির্য্যাতন করিবার সময় ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, করপরামর্ষণ, ঘন ঘন ভুজদণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও দম্ভ প্রকাশ করিবে। কোন গুরু লোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ঘর্ম্ম মুছিতে থাকিবে, এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত, ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠস্ফুরণ করিবে। পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রূরতা রহিত হইয়া তর্জ্জন, ভর্ৎসনা নেত্রবিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকার দৃষ্টিপাত করিবে।"

এই দুইটী উদাহরণ হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত মুনি নরচিত্তকে কিরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে একে একে দেখাইয়াছেন।

নরচিত্ত নাট্যের প্রাণ। নরচিত্তের ভাবরাশি অনন্ত। নাট্যশাস্ত্রও তাই বিপুল। এই বিষয়গুলীর সম্বন্ধে আমি সেই শাস্ত্রের অতি সামান্য একটু অংশই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনারা যে ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ পর্য্যন্তও এই অক্ষম চেষ্টাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। পরিশেষে নিবেদন, এই সুধীসমাজ যদি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার আয়োজন করেন তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের পরম উপকার করা হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। সেই উদ্দেশ্যেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ লইয়া, আমি অযোগ্য হইলেও, আজ এই পণ্ডিত-সমাজে উপস্থিত হইতে সঙ্কোচবোধ করি নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

বসন্ত।

(১)

বসন্তে আজ দিক্‌দিগন্তে
উঠ্‌ছে ফুটে তোমার হাসি।
উষা-কালে কিরণ-জালে
হেরি তোমার আঁচল নব,
সন্ধ্যাবেলা মেঘমালা—
এলায়িত অলক তব।
ধীর বাতাসে ভেসে আসে
তোমার কেশের গন্ধরাশি।
আজ তোমারে প্রিয়ে আমার।
মনের মত ভালবাসি।

(২)

সন্ধ্যা কালে যখন আসে
মধুর হাসি' তারারাশি,
আকুল-করা জ্যোৎস্নাধারা
ফুটায় যখন রূপার হাসি।
কোকিল ডাকে বকুল-ডালে
প্রাণমাতানো মধুর তানে,
তোমার কথা সুরে সুরে
বাজে আমার আকুল প্রাণে।

(৩)

বসন্ত আজ কুঞ্জবনে
তোমার রূপে উঠ্‌ল সাজি',
কোকিল-সুরে মর্ম্মপুরে
তোমারি স্বর উঠ্‌ছে বাজি।
বিশ্বজোড়া আনন্দ আজ
তোমায় স্মরি' জাগ্‌ছে প্রাণে,
এ আনন্দ বুঝবে কে আর—
সুধু আমারি মনে জানে।

(৪)

লতায় লতায় পাতায় পাতায়
তোমার ছবি ফুট্‌ছে আজি,
তোমার গন্ধ দেয় আনন্দ,
তোমার ছন্দ উঠ্‌ছে বাজি।
জানিনা কি উর্ম্মিদোলে
কোন্ আনন্দে চল্‌ছি ভাসি,—
আজ তোমারে প্রিয়ে আমার
মনের মত ভালবাসি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

চীন ও ভারতসন্তান।

চীন সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ। ভারত-সমাজে চীনের কোন কথাই প্রচারিত নয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বোধ হয় নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য ছাড়া ভারতবাসী চীনের আর কিছু জানেন না :—

প্রথমতঃ, আমরা জানি যে চীন একটা দেশের নাম। কোন লোকের নাম নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই দেশে ইয়াংশিকিয়াঙ্ নামে একটা নদী আছে। এই দেশের কোন পাহাড়ের নাম আমরা জানি কিনা বলিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, পিকিঙ্ এই দেশের রাজধানী অথবা একটা বড় সহর। কিন্তু মানচিত্রে দেখাইতে হইলে বোধ হয় ক্যাণ্টন বন্দরের নিকট হইতে অঙ্গুলি সরাইতে আরম্ভ করিব।

এখনই একটা কথা উঠিবে যে ছাত্রবৃত্তি অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বালকেরা চীনের ভূগোল শিখিয়া থাকে। তাহারা চীন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানে। অন্ততঃ "টংটিঙ্ পয়্যাঙ্ চীনদেশে" ইহাও সকলেরই জানা। বক্তব্য এই যে, পরীক্ষা দিবার কয়েক সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত মানুষের যতখানি বিদ্যা থাকে তাহার দুই বৎসর পরে ততখানি বিদ্যা থাকে না। অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি কিম্বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আমরা যতটা ভূগোলশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া থাকি, বি-এ, বি-এস্‌সি ক্লাশে উঠিতে উঠিতে তাহার দশমাংশ ও মনে রাখি না। কাজেই যখন প্রবীণ লেখক, জননায়ক অথবা মোড়ল দাঁড়াইয়া যাই তখন চীনদেশের হ্রদ অথবা পেবিলি উপসাগরের নাম স্মরণে থাকে না।

চতুর্থতঃ, একজন চীনা লোকের নাম জানি। এই নামটা বোধ হয় বহুকাল পর্য্যন্ত মনে থাকে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থ সাঙের (অথবা চুয়ান্ চাঙ্) গল্প বাল্যকালেই একজন টিকিধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেয়, যদিও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনারা বোধ হয় টিকি রাখিত না। পঞ্চম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের আমলে ফাহিয়ান ভারত পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় যে আমাদের চিন্তায় ফাহিয়ান অপেক্ষা হুয়েন্থ্‌সাঙের কথা বেশী স্থান পাইয়া থাকে।

চীনা ভূগোল ও ইতিহাসের বিদ্যা আমাদের এই পর্য্যন্ত। শেষে একদিন ১৯১১ সালে হঠাৎ এক চীনা নাম দুনিয়ায় ছাইয়া পড়িল। আজকালকার সংবাদপত্রের মুখে সেই নাম ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতারও কর্ণ-গোচর হইয়াছে। সান্-ইয়াৎ-সেনের কথা বলিতেছি। বোধ হয় য়ুয়ান্-শী-কাইয়ের নাম আমাদের বেশী লোক জানে না।

যাহা হউক, হুয়েন্থ-সাঙের পর আমরা সান্‌কে পাইয়াছি। মাঝে মাঝে কল্পনার আশ্রয় লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম "চীনকে কনফিউশিয়াসের দেশ বলিয়া কয়জন ভারতবাসীর জানা আছে? দুনিয়ার লোকেরা চীনকে কন্‌ফিউশিয়াসের দেশ বলিয়াই জানে।" ভাবিতে ভাবিতে স্থির করা গেল যে, কন্‌ফিউশিয়াস নামটা ভারত সমাজে সুবিদিত নয়। অনেকে অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন—কিন্তু ইহা কি বস্তু, পাহাড়ের নাম না দেবতার নাম সে সম্বন্ধে ধারণা বোধ হয় অস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্র্যাজুয়েট-গণকে লইয়া বর-ঠকান প্রশ্ন সুরু করিলে রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। এই ধরণের বর-ঠকান প্রশ্ন ইয়োরামেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে করা হয়—বলা বাহুল্য অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা ফেল মারেন।

আমরা মহম্মদ সম্বন্ধে যতই অজ্ঞ থাকি না কেন প্রয়োজন হইলে অন্ততঃ একটা পূর্ণ বাক্য (sentence) রচনা করিতে পারি। যথা "মহম্মদ * * * করিয়াছিলেন"। সেইরূপ, "যীশুখৃষ্ট * * * করিয়াছিলেন"। কিন্তু "করিয়াছিলেন" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক কন্‌ফিউশিয়াস্ সম্বন্ধে একটা গোটা 'সেণ্টেন্স' রচনা করিতে আমারা কয়জন পারি? কাজেই "কন্‌ফিউশিয়াস কে অথবা কি?' এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিব—"কন্‌ফিউশিয়াস কন্‌ফিউশিয়াস।"

এরূপ অজ্ঞতা লজ্জাজনক আদৌ নয়। সেদিন রীড্ সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আপনার দেশ সম্বন্ধে আমি এতখানি মনে রাখিয়াছি যে আপনি ব্রহ্মদেশের অধিবাসী নন।" বস্তুতঃ তিনি ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ছাপিবার সময়ে একবার আমি বোম্বাইয়ের লোক, একবার মাদ্রাজের লোক এবং একবার বেঙ্গলের লোক বলিয়া জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। আমেরিকার কোন কোন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিতেন—"মহাশয়, বেঙ্গলের রাজধানী কলিকাতা? না, কলিকাতার রাজধানী বেঙ্গল? আর কয়েকদিন হইল একজন ইংরাজ অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"মহাশয়, ভারতবর্ষের 'ঠাকুর' কি মধ্যযুগের লোক, না প্রাচীনযুগের লোক?" অধ্যাপক মহাশয় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইনি "মিষ্টিক" নামে পরিচিত এবং চীনা মিষ্টিক সাহিত্যের সেরা গ্রন্থ 'তাও-তে-কিঙ্' ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন!

ধরিয়া লইলাম যে কন্‌ফিউশিয়াস শব্দটা ভারতবর্ষের কোন কোন মহলে কথঞ্চিৎ পরিচিত। অতএব চীনের তিনটা ভৌগোলিক নামে এবং তিনটা ঐতিহাসিক নামে ভারতবাসীর "চীনা বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ। আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। আজকাল আমাদের লোক-সাহিত্যে নিম্নলিখিত পদটা সুপ্রচলিত, "সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ।" অর্থাৎ আমরা ছেঁড়া চটে শুইয়াও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিয়া থাকি যে আমরা চীনাদের গুরু—চীনারা আমাদের শিষ্য—ভারতবর্ষ চীনা বৌদ্ধগণের স্বর্গভূমি।

চীন সম্বন্ধে এই সাত দফা জ্ঞান, মাত্র আমাদের উচ্চ-শিক্ষিত মহলে অনেকের সম্বল। বিশেষজ্ঞগণের কথা বলিতেছি না। অথবা যাঁহারা ম্যাক্‌স্‌মুলার সম্পাদিত Sacred Books of the East গ্রন্থমালার হিন্দু ছাড়া অন্যান্য জাতীয় গ্রন্থ ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। অথবা যাঁহারা তিব্বত, নেপাল এবং কাশ্মীর পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য অন্বেষণে আসিয়া হিমাচলের অপর পারের অবস্থাও কল্পনায় আনিয়াছেন তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। এই সাত দফা জ্ঞান লইয়াই চীনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। চীনতত্ত্বের অ, আ, ক, খ চীনেই সুরু করিয়াছি বলিতে বাধ্য।

আমার বিশ্বাস, ভারতবাসীর পক্ষে চীনা মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌতুহলোদ্দীপক। বস্তুতঃ চীনে মুসলমান আছে এই তথ্যটা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের জানা নাই বলিতে পারি। এই কারণে চীনাদের খাঁটি স্বদেশী কন্‌ফিউশিয়াস অথবা ধারকরা বুদ্ধাবতার বা "ফো" ভারত সন্তানের দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট করে না। সত্য বলিতে কি, চীনের বৌদ্ধ সমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজকেই যেন বেশী আত্মীয় মনে হইতেছে। কন্‌ফিউশিয়াস নিতান্ত অজানা বস্তু—বুঝিতে সময় লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বুদ্ধ আমাদেরই আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যের দেশে আসিয়া পরধর্ম্মী মুসলমানকে অধিকতর আপনার ভাবিতেছি কেন? বোম্বাইয়ে পার্শী এবং মুসলমান সহযাত্রী জাহাজে ছিলেন—পার্শী অপেক্ষা মুসলমানকে অধিকতর নিজের বোধ হইয়াছিল। অথচ পার্শীরা ধর্ম্ম হিসাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরই জ্ঞাতি ও কুটুম্ব। মুসলমান সহযাত্রীরা যখন মক্কায় যাইবার জন্য অর্দ্ধপথে নামিলেন তখন কয়েকবার ইচ্ছা হইয়াছিল মক্কা দেখিয়া যাইব। তাহার পর মিশরে যখন মুসলমানদিগকে দেখিলাম, তাহারা "হিন্দ"বাসীকে পাইয়া যেন কোলাকুলি করিতে আসিল। আমিও তাহাদিগের সঙ্গে যেন নিজের সহরেই বাস করিতেছিলাম। কাইরো ছাড়িতে সত্যসত্যই কষ্ট হইয়াছিল। মিশরীয় মুসলমানেরা ভারতীয় মুসলমানের কোন সংবাদই রাখে না, কিন্তু "হিন্দী"কে পাইয়া তাহারা ঘরের ছেলেকে পাইয়াছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে পারসীক মুসলমানের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা। মুসলমানের নাম বিদেশে যেখানেই শুনিয়াছি সেইখানেই ঘরোয়ালোকের কথা মনে পড়িয়াছে। অন্য কোন জাতি বা ধর্ম্মের নরনারীকে এইরূপ ভাবিতে পারা যায় নাই—ইহা সত্য কথা। জাপানে আসিয়া বৌদ্ধ দেখিলাম—বুঝিলাম আমাদেরই কয়েকঘর যজমানের সংস্পর্শে আসিয়াছি। চীনেও সেইরূপ শিষ্যবাড়ীতেই রহিয়াছি। কিন্তু এখানে

মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র হৃদয়ের যে তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল শাক্যসিংহের উপাসক চীনা জাপানী বৌদ্ধগণকে দেখিয়া সে তন্ত্রী বাজিল না কেন?

চীনা মুসলমান আমার ধর্ম্ম কি, জানে না। কথোপকথনের পর বুঝিতে পারে যে আমি মুসলমান নহি—কিন্তু মুসলমানের দেশ হইতে আসিয়াছি। মিশরীয় মুসলমানদিগের অনেক কায়দা ভারতীয় মুসলমানী রীতি-নীতি হইতে যথেষ্ট পৃথক। মিশরের মুসলমান হয়ত ভারতের মুসলমানকে স্বধর্ম্মী বলিয়া না চিনিতেও পারে। কিন্তু তাহারা একজন অ-মুসলমানকে, মুসলমানের দেশের লোক বলিয়া, আত্মীয় বিবেচনা করে। এই ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধনে মুসলমানেরা এশিয়াকে সত্য সত্যই ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আর আমি পার্শীকেও ইচ্ছানুরূপ আত্মীয় ভাবিতে পারিলাম না এবং বৌদ্ধকেও যথেষ্ট আপনার ভাবিতে পারিতেছি না কেন? দুনিয়ার যে-কোন লোককে আপনার করিয়া লইতে পারি, এবং লইয়াছিও সেকথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চীনের, পারস্যের এবং মিশরের মুসলমানকে যেরূপ বিশেষভাবে আপনার ভাবিয়াছি সেই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা কি?—বোধ হয় এই যে ভারতবর্ষ, (অতবড় দেশটার চতুঃসীমা মনে থাকে না—কেবল বাঙ্গলা দেশটার কথাই বলি), অথবা বাঙ্গলাদেশ কেবল হিন্দুস্থান নহে, মুসলমান-স্থানও বটে। ইহা পার্শীস্থানও নহে এবং বৌদ্ধস্থানও নহে। ইতিহাসের নজির আনিলে "হিন্দু পার্শী জৈন ইসাহি শিখ মুসলমান" সকলের স্থান এই হিন্দুস্থান। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চিন্তায় ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানস্থান। জন্মিয়া অবধি বাঙ্গালী হিন্দু, ডাহিনে মুসলমান বন্ধু এবং বাঁয়ে মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে খেলা করে। আবার মুসলমান শিশুও, ডাহিনে হিন্দুসখা এবং বামে হিন্দুসখার সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর বাজারে, দোকানে, হাটে, গোচারণমাঠে, কৃষিক্ষেত্রে, পরবে, মেলায়, ধর্ম্ম-কর্ম্মে, "উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে শ্মশানে" হিন্দুর সাহচর্য্য মুসলমান করে, মুসলমানের সাহচর্য্য হিন্দু করে। হিন্দুর রক্তের সঙ্গে মুসলমানের নিশ্বাস মিশিয়া আছে—মুসলমানের রক্তে হিন্দুর নিঃশ্বাস লক্ষিত হয়। এই সাহচর্য্য, সহবাস এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুশ্ছেদ্য। এই মায়া কাটাইয়া উঠা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

বৌদ্ধেরা হিন্দু এবং হিন্দুরা বৌদ্ধ। পার্শীরা বৈদিক এবং বৈদিকেরা পার্শী। মাথা খাটাইয়া, দর্শনালোচনা করিয়া, ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য দেখাইয়া এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের আবিষ্কারে কি হৃদয়ের টান, মায়ার শৃঙ্খল সৃষ্টি করিতে পারে? চোখে না দেখিতে না দেখিতে অতিপ্রিয়জনও অন্তরের বাহির হইয়া যায়—তাহার স্থান আর একজন দখল করে। বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে মুসলমান যেভাবে বসিয়াছে বৌদ্ধ সেভাবে বসিবে কোথা হইতে? আবার এই জন্যই বঙ্গীয় মুসলমানও তাইগ্রিস বা নাইল নদের ধারা অপেক্ষা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের ধারেই মরিতে চাহে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সখা।

যাছিল সকলি সখা দেছি তোমা ঢেলে
কিবা আছে কিবা দিব গৃহলক্ষ্মী এলে?
কাজ নাই প্রজাপতি, ফুটাইয়ে ফুল
যে মধু দিয়েছ বঁধু, কোথা তার তুল?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

কণ্ঠহার।*

(গল্প)

(১)

নিয়তির ভ্রমবশতঃই যেন সুন্দরী প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী বালিকা চারুশীলাকে দরিদ্র কেরাণীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহার পিতার না ছিল সম্পদ, না ছিল ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা। এমন কোনও সংস্থানই ছিল না যে তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা চারুশীলাকে কোনও অবস্থাপন্ন বিদ্বান সৎপাত্রে দান করিতে পারেন। সওদাগর আফিসের কেরাণী সতীশচন্দ্রের সহিতই তার বিবাহ সম্পন্ন হইল।

চারু গরীবের মেয়ে, গরীবের গৃহিণী। আশৈশব দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া স্বভাবতঃই তাহার অন্তরে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিত।

সতীশের পিতা বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। পিতার মৃত্যুকালে সতীশ মাত্র দশবৎসরের বালক। সে আজ প্রায় বার বৎসরের কথা।

তাহার পিতা মৃত্যুকালে সামান্য কিছু নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; আর রাখিয়া গিয়াছিলেন, কলিকাতায় একখানি ভাল দোতালা বাড়ী। পিতার সেই নগদ টাকাতেই এতকাল সংসার চলিয়া আসিয়াছে।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সতীশ যখন কলেজে পড়িতেছিল তখন তাহার স্নেহময়ী মাতাও ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। এইরূপ আরও নানাবিধ সাংসারিক দুর্ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। অবশেষে সে চাকুরীর খোঁজে বাহির হইয়া সওদাগর আফিসে ত্রিশটাকা বেতনে সামান্য একটী কেরাণীর কাজ পাইল। সতীশ তখনও অবিবাহিত। তাহার সংসারে আর কেহই নাই, সে একা। পরে যখন সে নব-বধূ চারুশীলাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল তখন তাহার আঁধার ঘরে আবার আলো ফুটিল।

(২)

তখন অপরাহ্ণ। আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সতীশ তাহার স্ত্রীকে ডাকিল "চারু।"

চারু রান্নাঘর হইতে উত্তর করিল "কেন?"

"দেখে যাও"।

"বল না কি?"

সতীশ আবার কহিল "দেখে যাওনা; তুমি কচ্ছ কি?"

"র'সো আমি তোমার জলখাবার তৈরী ক'রে নিয়ে আসৃছি।"

চারু যখন জল খাবারের থালা লইয়া সতীশের নিকট আসিল, সতীশ একখানা সুন্দর খাম তাহার হাতে দিয়া কহিল "দেখ তোমার একটা জিনিষ।" চারু ব্যগ্র ভাবে খাম খানি ছিন্ন করিয়া দেখিল, একখানি সোনার জলে মুদ্রিত কার্ড। তাহা সতীশের বাল্যবন্ধু কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার-পুত্র অমিয়কুমারের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র।

স্বামীর আশানুরূপ আনন্দিত না হইয়া চারু পত্রখানি অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল "এতে কি হবে?" সতীশ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "কেন, সেদিনও তো তুমি বলেছিলে 'আমি কোথাও যেতে পারি না। শুধু শুধু ব'সে থাক্‌তে কার ইচ্ছা করে?—কারো বাড়ীতে গিয়ে তাদের মেয়েদের সাথে কথাবার্ত্তা গল্পসল্প কিছুই কর্ত্তে পারি না।' তাই তোমাকে এই চিঠিখানা দিচ্ছিলাম। সেখানে অনেকে যাবে। অনেক বাছা বাছা লোকের নিমন্ত্রণ। তুমি যেতে চাচ্ছনা কেন? বিশেষতঃ অমিয় আমার বাল্যবন্ধু, সমপাঠী; তার ওখানে না গেলে ভারি অন্যায় হবে। আর সে-ই বা কি মনে কর্ব্বে?"

চারু সতীশের মুখপানে চাহিয়া কহিল, "আমি যাব কেমন ক'রে?"

সতীশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন, কি হয়েছে?" চারু তখন অস্ফুট স্বরে কহিল, "আমার যে কিছুই নাই, পরবার একখানা ভাল কাপড় নাই, হাতে একগাছিও চুড়ী নাই। আমি সেখানে কেমন ক'রে যাব?"

---

* ফরাসী কবি Guy de Maupassant অবলম্বনে।

সতীশ একথা ভাবে নাই। সে ক্ষণকাল নীরব রহিয়া কহিল "কেন, যে পোষাক প'রে তুমি ঘোষেদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলে? সেটী তো আমার মনে হয়, বেশ।"

চারু কি বলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ তার চোখদুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। দুইটী বড় বড় অশ্রুবিন্দু আঁখি কোণ হইতে ধীরে ধীরে গড়াইয়া তার অধর স্পর্শ করিল।

স্ত্রীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সতীশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে চারু?"

তরুণী প্রবল চেষ্টায় আপন দুঃখাবেগ দমন করিয়া, সিক্ত কপোল অঞ্চলে মুছিয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে কহিল "কিছুই না; আমার ভাল কাপড় চোপড় নেই তাই আমি যেতে পার্ব্ব না।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া সতীশ হতাশ হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, তোমার মনোমত অথচ সাদাসিদে, অন্য সময়ও ব্যবহার কর্ত্তে পার এমন একখানা ভাল সাড়ী কিন্‌তে কত প'ড়বে?"

চারু কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল, কত টাকা হইলে একখানা হয়। আবার তাহার স্বামী প্রার্থিত অর্থের কথা শুনিয়া একেবারে অস্বীকার না করে, তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "ঠিক্ জানি না; তবে আমার বিশ্বাস ১৫৲ টাকাতেই বেশ একখানা মানানসই ভাল সাড়ী পাওয়া যাবে।"

সতীশের মুখখানা যেন একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। কেন না, আজ কয়েক মাস যাবত তাহার বেতন হইতে দুই একটা টাকা বাঁচাইয়া মাত্র সেই ১৫৲ টাকাই সে একটী ভাল ঘড়ী কিনিবে বলিয়া জমাইয়া রাখিয়াছিল। চারুর কথা শুনিয়া সে বলিল, "বেশ, আমি তোমায় ১৫৲ টাকাই দিব। কি রকম সাড়ী কিন্‌বে বল।"

(৩)

ক্রমে উৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু চারুকে যেন আরও বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন দেখাইতে লাগিল। অথচ তাহার পোষাক তো প্রস্তুত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল "চারু, তোমাকে আজ এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনও অসুখ করে নাই তো?" চারু যেন অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "না, কৈ আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"২০ শে অমিয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ। মনে আছে তো?"

চারু মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি তো যাব না।"

সতীশ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল "কেন, আবার কি হ'ল?"

চারু অভিমানভরে মুখ ফুলাইয়া কহিল, "আমার একখানিও গয়না নাই। হাতে একগাছিও চুড়ী নাই। মাত্র দু'গাছি শাঁখা প'রে এত লোকের ভিতর যেতে আমার ভারি লজ্জা হচ্ছে। কত লোকে কত গয়না পরে আস্‌বে, তাদের মধ্যে আমাকে নেহাত ভিখারীর মত দেখাবে। তার চেয়ে বরং সেখানে না যাওয়াই ভাল।"

"আচ্ছা বেশ, আমি তোমার জন্য কয়েক গাছি সুন্দর বেলোয়াড়ী চুড়ী আন্‌ব। তাতে হবে তো?"

চারুর তাহাতে মন উঠিল না। সে কহিল "না, ধনী মেয়েদের কাছে গরীবের মত থাকার চেয়ে অপমান আর নাই।"

সতীশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল "একটা কাজ কর্লে হয় না?" চারু কহিল "কি কাজ?"

"অনিল বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তো তোমার বেশ ভালবাসা আছে।"

"হাঁ আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। ছোটবেলা-থেকেই তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব।"

"তবে তাঁর কাছে থেকে কয়েকখানা গয়না চেয়ে আন না।

চারু মুখ ফিরাইয়া বলিল "ছিঃ, আমি কি লজ্জার মাথা খেয়েছি?"

সতীশ কহিল, "তাতে কি, তাঁর সঙ্গে তোমার যেরূপ বন্ধুতা তাতে তুমি অনায়াসে চাইতে পার।"

স্বামীর কথায় চারুশীলা স্বীকৃত হইল। এবং পরদিন সখীর কাছে যাইয়া আপনার বিপদের কথা বলিল।

বিমলা সিন্দুক হইতে আপনার গহনার বাক্স নামাইয়া আনিল, এবং চারুর সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "নাও বোন, তোমার পছন্দমত বেছে নাও।"

চারু তাহা হইতে কয়েকখানি গহনা আপনার মনোমত বাছিয়া লইল। তাহার পর দেখিল বাক্সের এক কোণে একটী সুন্দর কৌটা রহিয়াছে। সে কৌতুহল বশতঃ তাহা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে একগাছি অতি চমৎকার মুক্তাহার! অদম্য আকাঙ্ক্ষায় তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইল। তুলিবার সময় তার হাত কাঁপিয়া উঠিল।

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিল "এইটে—এই হারগাছি—"

"হারগাছি চাচ্ছ? বেশতো, নাও না।" চারু সখীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিউচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে চুম্বন করিল ও সেই রত্নহার লইয়া ছুটিয়া পলাইল।

(৪)

আজ সতীশের বন্ধু অমিয়কুমারের বিবাহোৎসব। অনেক লোক আসিয়াছে। চারিদিকেই কোলাহল। চন্দ্রমুখী বামার দলে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। কেউ বা 'পাছা-পেড়ে' পরিয়াছেন, কেউ বা সাড়ী পরিয়াছেন; কেউ বা উলুধ্বনি দিতেছেন, কেউ বা মিলন-গীত গাইতেছেন, কেউ বা বরণডালা সাজাইতেছেন। আবার কেউ বা গাল ভরিয়া পান খাইতেছেন, কেউ বা গল্প নিয়া বসিয়াছেন।

বিবাহোৎসবের এই মহিলা-সভায় চারুও আসিয়া যোগদান করিল। তখন সকলের চক্ষু তাহার সেই হারগাছির উপর পড়িল। কেউ বা তার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কেউ বা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন বাড়ী ফিরিয়াই প্রিয়জনের কাছে ঠিক এমনি একগাছি হারের দাবী করিবেন।

বিবাহ গোধূলি লগ্নেই হইয়াছিল। কিন্তু চারু ও সতীশের বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গেল। চারু আজ অনেক দিন পরে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিবার সুযোগ পাইয়াছে। এবং সতীশও তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে বসিয়াছিল; সুতরাং যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি ১২ টা।

বাড়ী আসিয়া পোষাক খুলিতে খুলিতে চারু অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল—"একি, আমার হারগাছি তো গলায় নাই!"

সতীশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি, কি হয়েছে?"

"আমি বিমলার হারগাছি হারিয়ে ফেলেছি!"

"সেকি? কেমন ক'রে?—অসম্ভব।"

"হাঁ, দেখ্‌ছো না আমার গলায় যে হারগাছি নেই!"

"তাইতো, হায় কি হ'ল!" বলিয়া অকস্মাৎ বজ্রাহতের ন্যায় তাহারা পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে সতীশ উঠিয়া কাপড় ও জামার ভাঁজে ভাঁজে এবং চারু বাড়ী আসিয়া যে যে জায়গায় গিয়াছিল তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল; কোথাও পাইল না। সতীশ তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঠিক জান, গাড়ীতে উঠ্‌বার সময় সেটা তোমার গলায় ছিল?"

চারু কহিল "আমার ঠিক মনে হয় না। তবে মেয়েকে বরণ করে আন্‌বার সময় একবার আমি হাতে স্পর্শ করেছিলাম। বরণ করা হ'য়ে গেলে প্রায় আধঘণ্টা পরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।"

"যদি পথে হারাতো তবে বোধহয় পড়বার শব্দ টের পেতাম। যখন ঘুমিয়েছিলে তখন হয়ত কেউ খুলে নিয়েছে।"

"সম্ভবতঃ তাই। কিম্বা গাড়ীতেও ফেলে আস্‌তে পারি। তুমি কি গাড়োয়ানের নম্বর জান?"

"না।"

এখন তাহারা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। উভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সতীশ কহিল, "আমরা যে পথে এসেছি সেই পথেই আবার আলো নিয়ে যাই; দেখি পাই কিনা।"

স্বামী চলিয়া গেল। চারু সেই অবস্থাতেই অবসন্ন ভাবে চেয়ারে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। শুইতে যাইবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না।

সতীশ পরদিন ভোরবেলা ৪টার সময় ফিরিয়া আসিল।—হার পায় নাই।

সে পুলিসে গেল। পুরস্কার ঘোষণা করিতে সংবাদ-পত্র কার্য্যালয়ে গেল। গাড়ীওয়ালাদের আড্ডায় ঘুরিল। বস্তুতঃ যেখানে সামান্য মাত্র সন্দেহ হইল সেই খানেই গেল। কোথাও পাইল না।

চারু একাকী ঘরে বসিয়া আশঙ্কায় উন্মত্তের মত সমস্তদিন যাপন করিল। সতীশ আবার রাত্রিতে ফিরিয়া আসিল।—কোনও সন্ধান পায় নাই।

সে তাহার স্ত্রীকে কহিল, "তোমার বন্ধুকে লিখে দেওয়া উচিত যে, তুমি, তার হারগাছির 'আঁকরাটী' ভেঙ্গে ফেলেছ। তাই উহা সারাতে দিয়েছ। ইতিমধ্যে যদি কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারা যায়।"

স্বামীর উপদেশ মত সে তাহাই করিল।

(৫)

এক সপ্তাহের শেষে তাহাদের সকল আশাই ফুরাইল। চারু ও সতীশকে দেখিলে মনে হয়, যেন এই কয় দিনেই তাহাদের বয়স আরও দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

যখন হারগাছি পাইবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না, তখন সতীশ চারুকে কহিল "এখন আমাদের গহনাগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় দেখ্‌তে হচ্ছে।" বাক্সটীতে দে কোম্পানীর নামাঙ্কিত ছিল, পরদিন সতীশ তাহাদের নিকট গেল। দোকানদার কহিল "মহাশয়, আমি মালা বিক্রয় করিনি; কেবল মাত্র বাক্সটী প্রস্তুত ক'রেছিলাম।

তাহার পর স্মৃতির সাহায্যে তদনুরূপ একগাছি কণ্ঠহার কিনিবার জন্য সে কত দোকান ঘুরিল; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। পরিশেষে বিরক্তি ও মনস্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

অবশেষে একদিন সে একটী দোকানে ঠিক সেই রকম একছড়া মুক্তাহার দেখিতে পাইল। তার দাম দশহাজার টাকা।

সতীশ দোকানদারকে তিন দিনের জন্য মালাগাছি বিক্রয় না করিতে অনুরোধ করিল। স্থির হইল তাহারা যদি ১৫ দিনের মধ্যে হারাণো মালা ছড়া খুঁজিয়া পায়, তাহা হইলে দোকানদার তাহার মালাগাছি আবার তাহাদের নিকট হইতে নয়হাজার টাকায় কিনিয়া লইবে।

পিতা যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার কিছু এখনও সতীশের হাতে অবশিষ্ট আছে। বাকী টাকা ধার করিতে হইবে।

একজনের নিকট হইতে এক হাজার, অপরের নিকট দেড় হাজার, এখানে পাঁচশত, সেখানে তিনশত এমনি করিয়া সে ধার করিতে লাগিল। পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা তাহা একবারও ভাবিল না। ভাবিয়াই বা কি হইবে? সুদখোরদের সহিত— সমস্ত কুসীদজীবদের সহিত তাহাকে কারবার খুলিতে হইল। আপনার অবশিষ্ট জীবন সে বন্ধক রাখিল। ভাবী কষ্টরাশি, অন্ধকারময় দৈন্য, অচির-ভোগ্য দুঃসহ ক্লেশ ও আজীবন মানসিক যন্ত্রণার কথা একবারও চিন্তা না করিয়া সে বণিকের টেবিলের উপর দশ হাজার টাকা রাখিয়া নূতন হারগাছি লইয়া আসিল।

যখন চারু গহনার বাক্স বিমলাকে ফিরাইয়া দিতে গেল, তখন সে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তোমার আরও পূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল। যদি আমার ইতিমধ্যে প্রয়োজন হ'ত?" সে কিন্তু বাক্সটী আর খুলিল না। চারুরও শুধু তাহাই ভয় হইতেছিল। বিমলা যদি বদল বুঝিতে পারিত তাহা হইলে কিছু মনে করিত না কি?

চারু এখন নিঃস্ব জীবন বুঝিল। কিন্তু নির্ভীক হৃদয়ে সে আপনার কষ্টভার বহন করিতে লাগিল। এ ভয়ঙ্কর দেনা তাহাদের পরিশোধ করিতে হইবেই। তাহারা ভৃত্য ছাড়াইল। বাসা পরিত্যাগ করিয়া একটী গৃহস্থের বাড়ীতে উপরের একটী ছোট ঘর লইয়া বাস করিতে লাগিল। দরিদ্রের সৌখীনতা কি ভীষণ সর্ব্ব-নাশের মূল হতভাগিনী তাহা বুঝিল। তৈলাক্ত বাটী ও থালাগুলি সে আপনার 'অরুণ' নখ দিয়া পরিষ্কার করিত। ময়লা কাপড় জামা প্রভৃতি স্বহস্তে ধৌত করিয়া শুকাইতে দিত। পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন-বাস। হাতে শুধু দু'গাছি শাখা ও কপালে সিন্দুর,

এ ছাড়া তাহার আর কোনও বেশভূষা নাই কিন্তু এখন আর তাহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

আর সতীশের এখন কি পরিবর্ত্তন! তাহার দেহের আর সে কান্তি নাই। সে বলিষ্ঠ দেহ এখন কঙ্কাল-সার। চোখে গাঢ় কালিমা। সাধারণ লোকের মত ময়লা ধুতি জামা পড়িয়া ঝুড়ি হাতে করিয়া সে বাজারে যাইত। দোকানদারদের নিকট দর কশাকশি করিয়া অপমানিত হইয়া আপনার অতি কষ্টের ধন বাঁচাইতে চেষ্টা করিত। যেদিন ঘরে চাল থাকিত সেদিন খাইত; আর যেদিন না থাকিত সেদিন উপবাস। ইহার উপর আবার মহাজনের টাকার জন্য পীড়াপীড়ি। সে একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; পৃথিবীটা যেন তাহার চক্ষে ঘোর অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দশ বৎসর! তাহাদের জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর এইরূপেই কাটিল।

দশ বৎসরের অবসানে তাহারা সুদ ও আসল এবং রাশীকৃত সুদের সুদ সমেত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিল।

চারুকে দেখিলে এখন বৃদ্ধা বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার সে যৌবনোৎফুল্ল কমনীয় কান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সে এখন দীনের গৃহিণী। এখন আর সে সৌন্দর্য্য, সে লাবণ্য নাই! সে এখন দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কঠোর। চুলগুলি তৈলাভাবে একান্ত রুক্ষ! দর্পণে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সে নিজেই শিহরিয়া উঠে! কিন্তু সময়ে সময়ে যখন তাহার স্বামী আফিসে থাকিত, সে জানালায় বসিয়া সেই বহুপূর্ব্বকার হর্ষোৎফুল্ল যামিনীর কথা ভাবিত,—যেদিন সে নানাবিধ বহুমূল্য বেশভূষা ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া বিবাহোৎসবে গিয়াছিল, সে দিন তাহাকে কত না সুন্দর দেখাইয়াছিল!

সে যদি কণ্ঠহার না হারাইত, তাহা হইলে কি হইত? কে জানে কি হইত? জীবন কি বিস্ময়কর! কি পরিবর্ত্তনশীল! মরিতে বাঁচিতে কতটুকুর প্রয়োজন!

(৬)

ক্রমে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন সতীশ চারুকে লইয়া আলিপুরের পশুশালা দেখিতে গেল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে চারু হঠাৎ একজন পরিচিতা মহিলাকে দেখিতে পাইল।—"বিমলা তো? হাঁ, বিমলাই বটে!" সে এখনও যৌবনোৎফুল্ল, এখনও সুন্দরী, এখনও মনোহারিণী।

চারুর হৃদয় বিচলিত হইল। সে তাহার সহিত কথা কহিবে কি? হাঁ নিশ্চয়ই। কেন না কহিবে? এখন তো তাহারা ঋণমুক্ত। এখন তাহাকে সমস্তই বলিবে।

চারু তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "ভাল তো বোন্?"

যুবতী প্রৌঢ়াদ্বারা এরূপভাবে সম্বোধিত হইয়া বিস্মিত হইল। সে চারুকে চিনিতে না পারিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি তো আপনাকে চিনি বলিয়া মনে হয় না। আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন।"

"না, আমি ভুল করিনি বিমলা, তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি চারু।"

"ও—আমার চারু! তোমার একি পরিবর্ত্তন?"

"হাঁ, তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ অবধি আমাদের বড়ই কষ্টে দিন গিয়েছে। বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। আর সে তো তোমারই জন্য।"

"আমার জন্য? কেমন ক'রে?"

"তোমার কি মনে আছে, তুমি অমিয় বাবুর বিবাহের নিমন্ত্রণের দিন আমাকে তোমার মুক্তার মালা-গাছি ধার দিয়ে ছিলে!"

"হ্যাঁ, তারপর?"

"তারপর আমি সে গাছি হারিয়ে ফেলে ছিলাম।"

"তুমি কি ব'লছ? আমাকে তো সেটী ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমি তোমাকে ঠিক্ তেমনি আর একগাছি দিয়েছিলাম। তার জন্য দশ বৎসর ধ'রে দেনা শোধ ক'রেছি। তুমি তো বুঝ্‌তেই পার আমাদের পক্ষে উহা কত কষ্টসাধ্য। যা'হোক এখন সমস্তই পরিশোধ ক'রেছি। এখন আমরা নিশ্চিন্ত।

"তুমি কি ব'লছ? আমার হারের বদলে আর একছড়া মুক্তার মালা কিনে দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, তা' হ'লে তুমি লক্ষ্য করনি? দু'ছড়া এমনি সমান!"

চারুর কথা শুনিয়া বিমলা অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে তাহার হাত দুইটী ধরিয়া কহিল "হায় চারু, আমার হার যে নকল! বড় বেশী যদি হয়, তার দাম পঁচিশ টাকা!"

শ্রীসুশীলকুমার দাশ গুপ্ত।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

(৩)

অপমানিত হইয়া আদালতের সাহায্য গ্রহণ করায় যে কোন বিশেষ পৌরুষ আছে তাহা তো মনে হয় না। অপমানকারীর ক্ষমাপ্রার্থনায় নষ্ট সম্মান ফিরিয়া আসে না। জষ্টিস্ আমীর আলী যখন ব্যারিষ্টার, তখন হাইকোর্টের সোপান-শ্রেণীর উপর একজন তাঁহাকে অপমানিত করে। পুলিশ কোর্টে মোকর্দ্দমাও হয়, আসামীর দশটাকা অর্থদণ্ডও হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহার প্রাণের অলন্ত আগুণে শান্তিবারি বর্ষিত হইয়াছিল? বস্তুতঃ এক পক্ষের দোষে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মানহানি করিতে কেহ সাহস করে না। জ্বালাও চাই, তাহার উপর যন্ত্রণাও চাই; তবে লোকে গর্হিত কার্য্য সম্পন্নে সাহসী হইয়া উঠে। কথায় আছে, এক হাতে তালি বাজে না। শচীশ বাবু (১৬৮ পৃষ্ঠা) কর্ণেল ডফিন্ কর্ত্তৃক বঙ্কিম বাবুর অপমান করা এবং পরে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনাকরার কথা উত্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্কিম বাবুর কি পৌরুষ বাড়িয়াছে তাহা তো বুঝিলাম না। এমন মামলা মোকর্দ্দমা তো রামা শ্যামাও করিয়া থাকে, আর ক্ষমাপ্রার্থনাও বিরল নহে। শচীশ বাবু কর্ণেল সাহেবের দোষ যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তত দোষ তাঁহার ছিল না বলিয়াই শুনিয়াছি। কেন না এই বিষয় লইয়া সে সময় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং আমারও কিছু স্মরণ আছে। যাহা স্মরণ আছে তাহা উল্লেখ না করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে এই অংশটুকু পরিত্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শুধু এইটী নয়। একবার ট্রেজারি গার্ডের সহিতও বঙ্কিম বাবুর একটু ধস্তাধস্তি হইয়াছিল। এই দুইটী ব্যাপার নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে পারিব না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার স্বভাব উদ্ধত ছিল, রাগের সময় তিনি হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইতেন। অতএব তিনি রাগ করিয়া কখন কি করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করাই অকর্ত্তব্য। বঙ্কিম বাবুর কলহপ্রিয়তার কথা লোকে জানিতে চায় না, চায় তাঁহাকে ভক্তি করিতে—পূজা করিতে আর তাঁহার অর্চ্চনা করিতে। আমি এমন, আমি তেমন, আমি ইংরাজের দর্পহারী ভারত-উদ্ধারকারী—এই সব ভাবের পরিপোষণে মনুষ্যের সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না, স্বস্তি থাকে না; তাহার পর ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়া লোকে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন সুখসচ্ছন্দতা আসে, স্বস্তি আসে। আমরা বঙ্কিম বাবুতে সে সুখশান্তি দেখিয়াছি তাই তাঁর প্রথম জীবনের দুই একটী পদস্খলনের সংবাদ রাখিতে আদৌ ইচ্ছা করি না।

শচীশ বাবু নিম্নোক্ত বিষয়টী লিখিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না, আশা করি তিনি ক্ষমা করিবেন। তিনি লিখিতেছেন:—

"যাঁহার আত্মসম্মানবোধ আছে, তিনি সচরাচর সকলের নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন, যাঁহার সে বোধ নাই, তিনি অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ—বেরা। বেরা উৎসব খুব ধূমধামের সহিত প্রতিবৎসর সম্পন্ন হইত—এখনও হয়; তবে সে জাঁকজমক আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ডকায় ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—স্তম্ভে স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমল-মণ্ডিত ভেলার উপর রূপযৌবনপ্রফুল্লা নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত অতিথিবৃন্দের ভেলা;

তার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই, শুধু কলাগাছ। কলাগাছের গায়ে মাথায় অসংখ্য আলো। সুন্দর দৃশ্য! মাথার উপর ভাদ্র মাসের নির্ম্মল আকাশ, পদ-নিম্নে ভরা গাঙ্গের প্রেমময় উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়—সমারোহ নবাবের প্রাসাদে—ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন। জেলার বড় বড় জমিদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান আদর বড় একটা জুটিত না। সাহেবেরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরির মালা পাইতেন—বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে সবজজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস ও নবাবের উকীল (স্যার) শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু হ্যাটকোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া পাইতেন, গুরুদাস বাবু, নবাবের উকীল বলিয়া পাইতেন। অন্যান্য উকীল, ডিপুটী ও মুন্সেফদের ভাগ্যে মালা জুটিতনা। মালা যে বহুমূল্য, তা নয়, তবে মালায় একটা সম্মান। তা ছাড়া ভোজে ও অভ্যর্থনায় একটা পার্থক্য রক্ষিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া এ সকল ব্যাপার শুনিলেন।

তার কয়েকমাস পরে নবাবের কর্ম্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, 'আপনি আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—আমি রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া। শুনিতে পাই, আপনারা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সম্মান প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।'

কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেলেন, এবং নবাব ও দেওয়ানের নিকট সকল কথা বলিলেন। তাঁহাদের তখন নয়ন উন্মীলিত হইল। নবাবের আজ্ঞা-ক্রমে দেওয়ান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিলেন; বলিলেন, 'আমাদের ত্রুটী হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর হইবে না, সাহেবেরা যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।'

কথাটার ভিতর যাহাই থাকুক, সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস (আমার পিতৃদেব) মালা পাইতেন, কেন না তিনি হ্যাটকোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া—একথাটা তিনি কেমন করিয়া লিখিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আর গ্রন্থকারের না জানিয়া এরূপ লেখা কতদুর সত্য তাহাও বলিতে পারি না। লেখার ভাব ও ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে দিগম্বর যেন হ্যাটকোটধারী সাহেব-সাজা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই নবাব-বাটীতে সম্মানিত হইতেন, অন্য কোন কারণে নহে। কিন্তু তাহা নহে। যাঁহারা এখনও তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা কি গুণে তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন তাহা বলিতে পারেন। গ্রন্থকার আরও গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন টিপ্পনি কাটিয়া। সেটা এই (১৮২ পৃষ্ঠা)—"এই শেষোক্ত গল্প তিনটী স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গটা নাকি সর্ব্বপ্রথম প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সুযোগ্য পার্শ্বনাল এসিস্টাণ্ট রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় উহা উল্লেখ করিয়া একদিন আমায় বলিয়াছিলেন "তোমার বাপ্‌কে তো খুব জানিতাম, কিন্তু তিনি তো জীবনে কখন হ্যাটকোট পরেন নাই। তবে এমন কথা শচীশ বাবু কেন লিখিলেন?" তাহার পর দেখিলাম ইহা বঙ্কিমজীবনী মধ্যে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং আমায় অগত্যা পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিতে হয়। তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
২৭এ ভাদ্র, ১৩২৩।
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গতকল্যকার পত্র পাইয়াছি। আপনার

কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। "দিগম্বর বাবু হ্যাটকোট পড়িয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া (মালা) পাইতেন" এই কথা শ্রীযুক্ত শচীশ বাবু "বঙ্কিম-জীবনীতে" লিখিয়াছেন, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, এবং আরও অধিকতর দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, তিনি ঐ কথা আমার নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন।

মুরশিদাবাদে বেরা উৎসবের গল্প আমি বলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় সম্বন্ধে উক্তরূপ কথা আমি কখন বলি নাই, এবং বলা আদৌ সম্ভবপর নহে, কারণ আমি তাঁহাকে কখনও হ্যাটকোট পরিতে দেখি নাই। যতদূর স্মরণ হয় আমি এইরূপ বলিয়া থাকিব, 'দিগম্বর বাবু সুযোগ্য এবং তৎকালে বহরমপুরে সর্ব্বোচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, সাহেবেরা তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিত, তিনিও সাহেবদের সহিত মিশিতেন, এইজন্য সাহেবদের সঙ্গে তিনিও বেরাতে মালা পাইতেন।' দিগম্বর বাবু একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহেবদের নিকট যথেষ্ট আদর পাইতেন বলিয়াই তাঁহাদের সহিত মিশিতেন, তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী কখনই ছিলেন না। শচীশ বাবু হ্যাটকোটের কথা কোথা পাইলেন জানি না। আমি ভাল আছি। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শচীশ বাবুর কথায় কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকিল না, কিন্তু তিনি এমনটা কেন লিখিলেন তাহাই বুঝাইব। বিনা কারণে একজন রাজকর্ম্মচারী সম্মান পাইতেন অথচ তাঁহার খুল্লতাত বঙ্কিম বাবু তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন একথা লিখিতে বোধ হয় কুণ্ঠা বোধ হইয়াছিল। এটা মহত্বের পরিচায়ক নহে। ডেপুটী তো অনেক ছিলেন, অনেক আছেন। তাঁহাদের মানসম্ভ্রমের সহিত বঙ্কিম বাবুর মান তুলনা হয় না। কেন না বঙ্কিম আমাদের নিজস্ব। কত ডেপুটীর নাম কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়া কোথায় বিলীন হইবে; কিন্তু বঙ্কিম আমাদের প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, অস্থিমজ্জায়, অনন্ত কালের জন্য স্থান পাইবে। কেন না তিনি আমাদের নিজস্ব। ভাবানুগামী শব্দের ঘটা, সমাসের ছটা ও উপমার আড়ম্বর ভরা বালিকা বঙ্গভাষাকে তিনি পাশ্চাত্য রত্নালঙ্কার-ভূষিতা অমল ধবলকান্তি সুন্দরী যুবতীতে পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং যতদিন বাঙ্গালীর দেহে রক্তমাংস থাকিবে ততদিন বাঙ্গালী ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাপ্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব বঙ্কিমচন্দ্রের পূজা করিবেন। বস্তুতঃ তাঁহারই কৃপায় আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলা ভাষার আদর হইতেছে। সার রাসবিহারী ঘোষ, জাষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা হইতেছে। এই সকল সুখের নিয়ন্তা বঙ্কিমচন্দ্র, কেননা তাঁহারই কৃপায় বঙ্গবাসীগণ "সখ্‌" করিয়া বাঙ্গলা পড়িতে শিখিয়াছিলেন, আজকাল তাহারই ফলে তাঁহারা লেখক হইয়া নূতন সাজে নূতন ভাবভঙ্গিতে মাতৃভাষাকে সাজাইতেছেন। কিন্তু সাজানর শেষ হয় নাই। মা যে কি সাজে সাজিলে ভাল দেখাইবেন, তাহা এখনও নির্ণিত হয় নাই। "কাদম্বরী"র জনসোনিয়ান ভাষা গিয়াছে বটে, কিন্তু আজকাল আবার নানাভঙ্গিতে ইংরাজি ভাষার ছাঁচুনি দেখা দিতেছে। তাই ভাবিতেছি মাতৃভাষার যে সাজসজ্জা যে ভাবভঙ্গি বঙ্কিম বাবুর নিকট পাইয়াছি তাহাই ভাল, না যে নূতন সাজ, যে সাজের ইংরাজি ছাড়া বাঙ্গলা নাম নাই, যে ভাব ইংরাজি না জানিলে বুঝা যায় না, তাই ভাল? তাই বলি এহেন বঙ্কিম বাবুর মানসম্ভ্রম বাড়াইতে যাইয়া সেকেলে ভাবে ভরা আমার পিতৃদেবকে শচীশ বাবু অযথা হ্যাটকোট পরাইলেন কেন?

কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইস্থলে আমার পিতৃদেবের সামান্য পরিচয় না দিয়া পারিলাম না—পাঠক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। তিনি সেকালের সিনিয়ার স্কলার ছিলেন। যেদিন হুগলী কলেজ প্রথম খোলে সেই দিনই তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তখন তিনি নবমবর্ষীয় বালক, তায় পিতৃহীন। অসীম অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি তৎকালীন শিক্ষকদের

চিত্তাকর্ষণ করেন এবং যথাসময়ে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৪৬ সালে সিনিয়ার স্কলারসিপ লাইব্রেরী ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরাজি সাহিত্যে প্রবন্ধ (essay) লেখার জন্য স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ৺গঙ্গাচরণ সরকার সেই বৎসর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মেডেল প্রাপ্ত হয়েন।

পিতৃদেব পাশ হইয়া বিপন্ন হইলেন। তিনি নাবালক, অতএব তাঁহাকে আবার আইনের পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া কথা উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালীন দেবহৃদয় শিক্ষকদিগের চেষ্টায় তিনি সে দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই সময় কৃষ্ণনগর কালেক্টরীর সেরেস্তাদারীর পদ শূন্য থাকায় তৎকালীন কলেক্টর D. Money সাহেব তাঁহাকে সেই পদে বাহাল করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন। মনি সাহেব তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল "I can truly predict, if Providence permits he will soon attain the highest grade in the judicial department."

ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছিল। তিনি ইংরাজি ১৮৫৮ সালে আলিপুরে এক্‌টীনি সবজজ হইয়াছিলেন, তাহার পর কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পাকা সবজজ হইয়া ক্রমান্বয়ে ১১ বৎসর বহরমপুরে সবজজের কার্য্য করেন। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে বদলী হন। ১৮৭৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭১ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালীকে জেলার জজিয়তি দিবার কল্পনা হওয়ায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম জেলার জজ হইয়াছিলেন।

তিনি জীবনে কখন হ্যাটকোট পরেন নাই। নিতান্ত সাদাসিদা লোক ছিলেন। লাটসাহেব বা লর্ড বিসপ্ হইতে সামান্য কেরাণীর সহিতও সদালাপ করিতেন। পরোপকার করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সহিসুপারিশ করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত লোকের কত চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। কত অপরিচিত লোকের জন্য সাহেব সুবার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু এমনি তাঁহার যশোভাগ্য ছিল যে কখন চেষ্টা বিফল হয় নাই। তাঁহার সুপারিশ বড় সুপারিশ ছিল। যখন রুরাল সবরেজিষ্ট্রারের সৃষ্টি হয় তখন বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন হুইনফিল্ড সাহেব। পিতৃদেব ৺ শ্যামাচরণ দেব রায়কে ইন্দাসের এবং একটী মুসলমানকে মন্ত্রেশ্বরে চাকরী করিয়া দেন। সেই সময় আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ৺ অমৃতলাল বিশ্বাস উক্ত পদ প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি সাহেবকে বলেন নাই, বলিতে বলেন তাঁহার বন্ধু বর্দ্ধমানের তৎকালীন স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার বঙ্কিম বাবুর মধ্যম সহোদর সঞ্জীব বাবুকে।

কথাবার্ত্তায় রসবিস্তারে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার দখল ছিল এবং সকল বিষয় এমন গুছাইয়া বলিতে পারিতেন যে শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাহার উপর সময়ে সময়ে গল্পের ছটায় হাসির ফোয়ারা ছুটিত। তিনি পদগৌরবে যত না হউক গুণগৌরবে সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কি মুসলমান, সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিতেন। সকলেরই নির্ভীক পরামর্শদাতা ও মধ্যস্থ বন্ধু ছিলেন। তাই তিনি চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া সকলের ভালবাসা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি নিরভিমান হইয়া সহাস্য বদনে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বন্ধু ভাবে বিরাজ করিতেন। সকলেই ভাবিতেন তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। বস্তুতঃ তেমন লোক আজকাল বিরল। এক জনকে দেখি, কিন্তু তাঁহার নাম করিলে হয়ত কেহ মনে করিবেন আমি তোষামদ করিতেছি, তাই নাম করিব না, তবে চুপি চুপি বলি যে তিনি আমাদের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। তবে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাসি তাঁহার অধরোষ্ঠে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় শোভা পাইয়া ভাসিয়া যায়, আর আমার পিতৃদেবের হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিত। শুনিতে পাই যাঁহারা মন

খুলিয়া হাসিতে পারেন তাঁহারা দীর্ঘজীবী হন কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে এ প্রবাদ-বাক্য সফল হয় নাই।

সাহেবেরা সাগ্রহে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনিও সাহেবদের সঙ্গে তাঁহাদেরই মত অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথা কহিতেন। ইংরাজি কথাবার্ত্তায় ভাষা, ভাব ও মাধুর্য্য যেন সহচরীর মত তাঁহার সাহায্যকারিণী ছিল। সাহেবরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন, আদর আপ্যায়নে প্রীত করিতেন, সমকক্ষের ন্যায় ভাবিতেন ও ভাবাইবার সুযোগ দিতেন। এখন আর এমনটী নিতান্ত বিরল কেন?

পিতার মৃত্যুর পর আমি একবার বহরমপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন লেনব্রিজ সাহেব তথাকার জজ। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি গিয়াছি শুনিয়া তাঁহার পত্নী আমাকে দেখিতে আসেন এবং বলেন "তোমার পিতা আসিতেছেন দেখিলে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতাম, কারণ তোমার পিতার কথার মাধুর্য্যে ও রঙ্গরসে আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতাম এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রভূত আনন্দ ও সুখানুভব করিতাম।"

ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিব। ইংরাজি ১৮৭৪ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজার উইল বাড়ীতে কলিকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক "নবীন তপস্বিনী"র অভিনয় হয়। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তখন নবীন যুবক। রঙ্গস্থল অতি সমারোহে সজ্জিত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের পরই ৫।৬ খানি চেয়ার ছিল, তাহার এক খানি কুশন দেওয়া, সম্ভবতঃ মহারাজা আসিবেন বলিয়াই সেটী রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আসেন নাই। সেই চেয়ারখানি অধিকার করেন তদানিন্তন স্বনামখ্যাত কমিশনার বাকল্যাণ্ড (C. T. Buckland) সাহেব। বাকল্যাণ্ড সাহেবের পার্শ্বস্থ চেয়ারগুলিতে তাঁহার ও জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবদিগের মহিলারা বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী চেয়ারগুলি আমার পিতৃদেব এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। জলধরের অভিনয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিতেছিল বটে কিন্তু মেম সাহেবেরা তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তাই পটক্ষেপের পর ব্যাপারখানা কি জানিতে চাহিলে পিতৃদেব ইংরাজিতে তাহা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। তখন মেমদের আর হাসি ধরে না; কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতি বাকল্যাণ্ড তাঁহার স্বামীকে উঠাইয়া দিয়া সেই আসনে পিতৃদেবকে বসাইলেন এবং সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া অভিনয়ের প্রকৃত রসাস্বাদন উপভোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ক্ষমতাবান পুরুষ আজকাল কয়জন মিলে?

আর একদিনের কথা। এ কথাটা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, অধুনা বাঁকুড়ার প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ উকীল বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। সার এ্যাসলি ইডেন যখন বঙ্গেশ্বর হইয়া আসেন তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে রাজকর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বর্দ্ধমান ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। বিনোদবাবু বলেন "লাট সাহেব গাড়ী হইতে নামিবামাত্র কমিশনার সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার করমর্দ্দনকালীন হাতটা ধরিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেই মনে হয় যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহার পর দিগম্বর বাবুকে দেখিতে পাইয়া যাইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। দিগম্বর বাবু অবশ্য জজ সাহেবের পিছনেই ছিলেন, সামনে আসেন নাই। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তার পর অন্যান্য সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ পরিচয় হয়।" এ সম্মান একজন সবজজের পক্ষে নিতান্ত কম নহে। এরূপ বলিবার অনেক কথা ছিল তবে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইল না।

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি। তখনকার সবজজ এবং আধুনিক সবজজে অনেক পার্থক্য আছে। তাঁহারা ছিলেন সমাজের নেতা, জেলার মধ্যে প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তি, আর এখনকার অনেক সবজজই পাঁচজনের একজন হইয়া পড়িয়াছেন। সম্মানে, সমাদরে, সারল্যে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে এখন তাহার অভাবই বেশী। তাহার উপর সে উদার ভাব, সে দয়া, যত্ন,

শিষ্টাচার বড়ই কমিয়া গিয়াছে। আর কমিয়া গিয়াছে কর্ম্মে নিষ্ঠা। কাজ করিতে হয় করি, সম্বন্ধ যেন বেতনের সহিত; কিন্তু তখন কাজ করিতে স্ফূর্ত্তি ছিল, সুবিচার করিবার স্পৃহা ছিল, নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মের উপর অনুরাগ ছিল, তাই তাহাতে সাধারণের ও সমাজের উপকার দর্শিত। কিন্তু সেটী আর নাই, তাই তাঁহারা আর জেলার অগ্রণী না হইয়া পাঁচজনের একজন হইয়া পড়িয়াছেন। একথা সাহেবরাও বুঝে—তাই আদর, যত্ন ও সম্মানেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আর এককথা যে তাহাদের মধ্যে অনেকে সাহেবি মজলিস গরম করিয়া রাখিবার ক্ষমতাহীন। তাই সাহেবদের প্রীতি সম্মান আকর্ষণে অসমর্থ।

সাহেবরা এখন আর বাঙ্গালীর কাছে প্রাণের হাসি হাসেন না। আমরা দায়ে পড়িয়া যেন তাঁহাদের দ্বারস্থ হই। এখন বাধ্য হইয়া সম্মান (respect) দিতে হয়, তখন অনুরাগে লইয়া যাইত। বাহিরে আমাদের খুব ধাঁকা আওয়াজ আছে, সাহেবের কাছে খাতির আছে বলিয়া নিজের ঢকা নিজে বাজাই, কিন্তু ভিতরে সব ফাঁক। মনে হয়, না যাইতে হইলেই বাঁচি। হ্যাটকোট পরিলে কি হইবে, 'গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল' হইয়া পড়িতেছি। সরলতা সেইজন্য উভয় পক্ষেই নিতান্ত কম হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর সেইজন্যই দু' পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখাসাক্ষাৎ আর দুটা কাজের কথা কহিয়া বিদায় গ্রহণ। অধস্তন কর্ম্মচারীকে বন্ধুভাবে দেখা, পূর্ব্বের মত অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এটা ভাল কি মন্দ হইয়াছে, তাহার উত্তর কে দিবে?

আর বেশী কিছু বলিব না; তখনকার সাহেবরা বাঙ্গালীকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহার নিদর্শন St. George Fenimore B. A. (Oxon.) প্রণীত Essay on Justice নামক কাব্যগ্রন্থ।

এক প্রকার বাজে কথা লইয়াই এ প্রসঙ্গটী শেষ হইল। বারান্তরে বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

বর্ষ-বিদায়।

(১৩২৩ সালের পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য বিবরণ।)

১৩২৩ সালের বৈশাখের 'ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনে' আমি বর্ষবোধন লিখিয়া নববর্ষের শুভ বন্দনা করিয়াছিলাম; আজ চৈত্রের শেষদিনে তাহাকে বিদায় দিতে বর্ষ-বিদায় লিখিতে বসিয়াছি। এ বর্ষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বিগত বর্ষের সাহিত্য সৃষ্টির একটা হিসাব নিকাশ দেওয়ার ও চেষ্টা করিলাম। তৎপ্রসঙ্গে আমি একটু ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিব। এ ব্যাপারটী অতীব গুরুতর, বিশেষ অধ্যয়ন ও শ্রমশীলতার প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় ইহার একটীও আমার নাই। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য বিবরণী স্বতন্ত্রভাবে ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহা আমার জানা নাই, আর যদি ইহাই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের প্রথম চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই পাঠক সাধারণ ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। কারণ যে কাজ দশজনের সহানুভূতি ও শ্রমের অপেক্ষা রাখে, তাহা কখনও একা একজনের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। এমতাবস্থায় আমার এই বিবরণী যে সম্পূর্ণ হয় নাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই তাহা অবধারিত। এবিষয়ে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে—এবিবরণীতে যে সকল বহির উল্লেখ করা হইল তাহার সবগুলিই আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহা নহে; এমন পুস্তকালয় ও এখানে নাই, যে স্থানে লেখকগণ সকলেই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ গ্রন্থরাজি উপহার দিয়া থাকেন, কাজেই যে-সকল বহি আমার পড়িবার সুযোগ হয় নাই তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, সে সব বহির শুধু নামোল্লেখ এবং শ্রেণী বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। এ বৎসর আমি এই কঠিন কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইলাম, আশা করি ভবিষ্যতে কোনও সুযোগ্য ব্যক্তি স্বকীয় অসীম প্রতিভা বলে ইহাকে প্রশস্ত, সুন্দর ও সুশোভন রাজপথে পরিণত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যের গৌরবশ্রীমণ্ডিত চিত্র সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন। আলোচ্য বর্ষে নানা শ্রেণীর মোট ৬৩ খানা বহি প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উহার শ্রেণী বিভাগ করিলাম।

জীবন চরিত	৫	পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য চরিত-কথা, নবি-কাহিনী ইত্যাদি।
নাটক	৩	অবিমারক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, সতী সুকন্যা।
গল্প ও উপন্যাস	৭	সরমার অদৃষ্ট, ধূপদান, পুষ্পমঞ্জরী, রিপভানউইন্‌কোল; স্বর্ণকুটীর গায়ে-হলুদ ও রবিদাদা।
ইতিহাস	৪	"প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের ছায়া দর্শন", সত্যমিথ্যা, বিংশশতাব্দীর মহাসমর, খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস।
ভূগোল	০	
সাহিত্য	৩	রামায়ণী সুধা, সংযম ও প্রতিষ্ঠা, (২য় সংস্করণ) শৈব্যা।
আইন	১	আইন ও দলিল শিক্ষা-আব্দুলআসক প্রণীত।
চিকিৎসা	২	গৃহ চিকিৎসা (মথুরচক্রবর্ত্তী), গৃহচিকিৎসা (পার্ব্বতী কবিশেখর) সর্প চিকিৎসা।
দর্শন	৫	সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।
কাব্য	৩	ইন্দুমতী, হিন্দুর জীবনসন্ধ্যা।
খণ্ড কবিতা	২	শতদল, আলোকণা।
ধর্ম্ম বিষয়ক	১৮	
ভ্রমণ	২	হরিদ্বারে কুম্ভমেলা, বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ।
শিল্প ও বাণিজ্য	০	
বিজ্ঞান	০	
বিবিধ	৭	
সমালোচনা	২	বঙ্গবাণী, সমাজ-চিত্র।
স্বাস্থ্য	০	
শিশু সাহিত্য	৯	নানা গল্প, মহরম, মহাভারতের কথা

ঘুমের গল্প, চামুণ্ডার শিক্ষা, সুদখোর সওদাগর, রবিন হুড, অডিসির গল্প, শৈব্যা।

এই বিবরণী হইতে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থই মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গের গ্রন্থের তালিকায়ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। আবার ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়া ব্রাহ্মধর্ম্মের এক খানা, খ্রীষ্টধর্ম্মের দুইখানা এবং শৈব গ্রন্থ একখানা। এতদ্ব্যতীত বাকী সমগ্র গ্রন্থই বৈষ্ণব ধর্ম্মবিষয়ক। এসকল গ্রন্থমধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত "গ্রন্থখানা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। চৈতন্যচরিতামৃতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব দার্শ-নিকতার সহিত আলোচিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই গ্রন্থে বহু বৈষ্ণব ভক্তগণের কথা সবিশেষ নিপুণতা ও নিরপেক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ পাঠে জানাযায় যে বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অনুমতি ক্রমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হইবে যে চৈতন্যচরিতামৃতের মত গ্রন্থ এপর্য্যন্ত কোন দেশের কোন সাহিত্যে রচিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। "চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এই,—যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত ভক্তি গ্রন্থনিচয় প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামি গ্রন্থের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থখানি সকল গ্রন্থের উপরে রহিয়াছে, যদিও শ্রীজীব উহা অনেক গ্রন্থের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীজীব সেন ইহাতে বড় বিরক্ত হইয়াছেন; ইহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের অনেক ভাটীতে যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ ডুবিল না। ভাসিতে ভাসিতে উজান বাহিয়া মদনগোপালের ঘাটে আসিয়া লাগিল। ইহাতে শ্রীজীব বৈষ্ণব জগতে দেখাইলেন উক্ত গ্রন্থ মদনগোপালের প্রিয় সামগ্রী ও অমর।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে কতদুর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা সামান্য দু এক কথায় হয় না এবং সে যোগ্যতার অতবড় স্পর্দ্ধাও আমাদের নাই। নগেন্দ্র বাবু এইরূপ গ্রন্থের সম্পাদনে যেরূপ ধর্ম্মানুরাগ, পাণ্ডিত্য গবেষণাও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ বিরাট গ্রন্থের টীকাটিপ্পনি ও ছাপা যেরূপ নিপুণতার সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে বলিতে পারি ইহা যে শুধু পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে গৌরব প্রকাশ করি-য়াছে তাহা নহে ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ বিভাগের অভাব চিরদিনের জন্য দূরীভূত হইল। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে শশীভূষণ মল্লিক বিরচিত "যুগধর্ম্ম ও যুগাবতার" এবং সুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা"—উল্লেখ যোগ্য।

জীবনচরিত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক বিরচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস ও ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন," শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত রচিত "শ্রীশ্রী লোকনাথ মাহাত্ম্য" উল্লেখ যোগ্য। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবন কথা যত বেশী আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। এগ্রন্থ খানা অতিশয় নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত বিরচিত হইয়াছে। ভাষা অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষক। আমরা এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচারের পক্ষপাতী। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত-চরিত 'কথা' ও কাজি ইমদাদুল হক্ প্রণীত-নবি 'কাহিনী' বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। চরিত কথায় দেশের কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তির জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছে। নবি-কাহিনীতে হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্ব সময়ের দ্বাদশ জন নবি বা শ্রেষ্ঠ মহাজনের জীবন কথা বিবৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থ প্রণেতা কাজি ইমদাদুল হক বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বিশেষ রূপ সুপরিচিত, এগ্রন্থ খানা তাঁহার নামের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইতিহাস শাখার একখানা গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য নহে। কলাবিদ্যা, ভূগোল, দর্শন, শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান

প্রভৃতি শ্রেণীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অভয় কুমার গুহ প্রণীত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" নামক গ্রন্থখানা ভাষা-জননীর কণ্ঠে মধ্যমণি সদৃশ, এবৎসর বঙ্গসাহিত্যে দর্শনবিভাগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সাহিত্যবিভাগে শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের "রামায়ণীসুধা" ও "সংযম ও প্রতিষ্ঠার" দ্বিতীয় সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। "রামায়ণীসুধায়" রামচরিত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। "সংযম ও প্রতিষ্ঠা" একখানা নিবন্ধ-পুস্তক। এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্প। ইংরেজীতে যেমন Smile's Self-Help, Duty, Character, Lord Aveburyর Pleasures of Life, Use of Life প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ জীবনের গতি লক্ষ্য ও কর্ম্মপ্রবণতার দিকে যুবকগণকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, একটা নবীন প্রেরণা প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, সেই শ্রেণীর বহি বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুষ্টিমেয় বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসের "সৌভাগ্য সোপান", শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "চরিত্র গঠন" ও "ঋদ্ধি"র ন্যায় "সংযম ও প্রতিষ্ঠা" বঙ্গীয় যুবকগণের কর্ম্মজীবনের পথপ্রদর্শক রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার আমাদের ন্যায় অলস ও নির্জ্জীব জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

এখন কাব্যের কথা বলিব। কাব্য শাখায় "হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা" ও "ইন্দুমতী"র নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। "ইন্দুমতী" রামায়ণের ঘটনাবলম্বনে রচিত; নামটী বিভীষণের পুত্রবধূর নামে কল্পিত। কবি তরণী-সংহারের বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। "হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা" পৃথ্বিরাজের পরাজয় লইয়া বিরচিত। এই উভয় গ্রন্থেই লেখকদ্বয়ের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র চিত্রণে কেহই তেমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তথাপি প্রথমোক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা শেষোক্ত গ্রন্থে চরিত্র-সৃষ্টির উৎকর্ষতা অধিকতর রূপরিলক্ষিত হয়।

খণ্ড কবিতার মধ্যে কোন গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য নহে। ভ্রমণ শ্রেণীতে দুইখানা গ্রন্থ-"হরিদ্বারে কুম্ভমেলা" ও "বঙ্গ-দেশের-তীর্থ" বিবরণ উল্লেখযোগ্য। শিশু-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত "নানা গল্প" শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "মহরম" ও "মহাভারতের কথা" শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী প্রণীত "ঘুমের গল্প", "চামুণ্ডার শিক্ষা", "সুদখোর সওদাগর", "রবিনহুড্", "অডিসির গল্প" প্রভৃতি কয়খানি গ্রন্থই শিশুসাহিত্যের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। একদিকে যেমন ছবি, ছাপা ও বাঁধাই এই তিনটীতে গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তেমনই লিপি-কুশলতায়ও এই বহিগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য শ্রেণীতে "স্বাস্থ্যশিক্ষা" নামক বিদ্যালয়-পাঠ্য একখানা গ্রন্থ ব্যতীত সারগর্ভ অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এখন গল্প, উপন্যাস ও নাটকাদির বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিব। ছোটগল্পের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "পুষ্পমঞ্জরী" ও "ধূপদান" শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্তের "গায়ে হলুদ" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "সত্য ও মিথ্যা" এবং তরুণ লেখক প্রফুল্লচন্দ্রের "রবিদাদা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "সরমার অদৃষ্ট" ও "স্বর্ণ-কুটীর' আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কাজেই মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গল্প শাখায় একখানা অনুবাদ গ্রন্থ আছে। সেখানা Washington Irving এর Rip Van Winkle নামক ইংরেজী গল্পের অনুবাদ। এখানা অনুবাদ হইলেও বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে এবং অনুবাদেও মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই—বলা যাইতে পারে। নাটক শ্রেণীতে মাত্র তিনখানা বহি প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি সংস্কৃতের অনুবাদ আর অপরখানি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই পৌরাণিক নাটক খানা কবি কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। অনুবাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনকথা বলার আবশ্যক মনে করি না। কারণ উহাতে লেখক নিজের কোনও প্রতিভা দেখাইবার সুযোগ পান নাই। কেবল যথাযথ মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর বঙ্গানুবাদ যে পূর্ববঙ্গের একজন

লেখক কর্ত্তৃক প্রথমে সুসম্পাদিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি।

এখন পূর্ব্ববঙ্গের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও করিতে চাহি। রঙ্গালয় সভ্যতার একটী প্রধানতম নিদর্শন। নাটক রচনাও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমাদের দেশে রঙ্গালয়গুলির বয়স অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম না করিলেও এ সময়ের মধ্যেই দেশের উপর উহা একটা স্থান করিয়া লইয়াছে। যিনি যাহাই বলুন না কেন আর কোনরূপেই আমাদের দেশ হইতে রঙ্গালয় জিনিষটা উঠিয়া যাইতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, মতিরায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মহামনীষীগণ অনেকেই বিবিধ নাটক রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের একটী বিভাগকে বৈভবশালী করিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ অতি পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের প্রতি সাধারণের এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের যেরূপ প্রীতি ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের এ অঞ্চলে তদ্রূপ রঙ্গাভিনয়ের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ ঢাকা নগরীতে দুইটী রঙ্গালয় বিদ্যমান। সাহিত্য জিনিষটাকে রঙ্গালয়ের হাত হইতে দূরে রাখিলে কোনরূপেই উহার একদিকের পুষ্টিসাধন হইতে পারে না। রঙ্গালয় দ্বারা আমরা দেশের বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস পূর্ব্ববঙ্গের নাট্যসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে এই দিকেও আমাদের দৃষ্টিটা একটু ফিরান আবশ্যক। তাহা হইলে রঙ্গালয়ের উন্নতি ও নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ এক যোগেই সাধিত হইবে। একসময়ে ঢাকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষরূপ উৎসাহশীল ছিলেন, তাহার ফলে সেই সময় কয়েকখানা উচ্চাঙ্গের নাটকও বিরচিত এবং অভিনীত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নীলদর্পণও ঢাকা নগরীতেই প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়। কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর", প্রসন্ন বিদ্যারত্নের "মালতী মাধব" ও ৺রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "শকুন্তলা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উন্নতি অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। অতীতের গৌরব সকল সময়ে কল্যাণপ্রদ হয় না। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি প্রধাবিত হয় তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ বহু প্রতিভাশালী নাট্যকারের উদ্ভবও হয়ত দেখিতে পাইব। নতুবা এই একটী বিশেষ বিষয়ে চিরদিনই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ প্রণীত ইবসেনের বঙ্গানুবাদ "বীরবিক্রম" নামক নাটকখানি স্থানীয় রঙ্গালয়ে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। ইব্‌সেনের নাটকের ইহাই প্রথম বঙ্গানুবাদ। নলিনী বাবুর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কেদার রায়", "ফুলবাই", শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত "আনারকলি" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় রচিত "নাদির সাহ" প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক ও গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছে।

দর্শন শাখায় শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ প্রণীত "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" গভীর গবেষণামূলক পুস্তক। এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। আমরা এখানে মাত্র এইটুকু বলিতে পারি যে লেখক নানা দেশের মনীষীগণের সৌন্দর্য্যজ্ঞানানুশীলনের মন্তব্যের সহিত আমাদের দেশের মনীষীগণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় দিতে যাইয়া যে সূক্ষ্মমনোবৃত্তির পরিচালনা সহকারে অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য ও দার্শনিক জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এইরূপ বিবরণীতে শুধু দুই একটা কথায় বুঝান সম্ভবপর নয়। এ গ্রন্থখানা ১৩২৩ সনের বঙ্গসাহিত্যের গৌরবমণি।

অবশেষে সমালোচনার গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সমালোচনা শ্রেণীর গ্রন্থ-বিভাগে মাত্র দুই খানা বহি কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক খানার নাম "বঙ্গবাণী।" অপর খানার নাম "সমাজ-চিত্র"—প্রণেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। শশাঙ্ক বাবু একাধারে কবি, দার্শনিক ও সমালোচক। "বঙ্গবাণীর" ন্যায় সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ বিগত দশ পনর বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা—তাহা আমাদের

জানা নাই। আর যদিই বা হইয়া থাকে তবে তাহার একখানাও যে "বঙ্গবাণীর" সমকক্ষ নহে তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ, বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ, ও বাঙ্গলার ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব, এই ভাষার উপর বিবিধ ধর্ম্মের প্রভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যের বিশ্বমুখ আদর্শ, আর্য্য আদর্শের প্রভাব, মুসলমান আদর্শের প্রভাব, বঙ্গসাহিত্যে ইংরেজীর ভাব ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, নিরপেক্ষতা এবং সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাজনের ন্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রলাল, ও রবীন্দ্রনাথ নবযুগের এই ছয়জন সাহিত্য মহারথীর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ধর্ম্মতত্ত্ব, পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-জীবন, সমাজে তাঁহাদিগের স্থান ও প্রভাব, আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহামনীষীগণের বিবিধ গ্রন্থরাজির উল্লেখ ও আলোচনা দ্বারা তিনি প্রত্যেক বক্তব্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস শশাঙ্কবাবুর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনার এইরূপ অভিনব বৈজ্ঞানিকপন্থার অনুসরণ কেহ করেন নাই। তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। এস্থানে সমালোচনা করিবার অবকাশ নাই, নচেৎ এই গ্রন্থের একটী বিস্তৃত সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিতাম।

বর্ত্তমান সমাজের বিবিধ ত্রুটী বিচ্যুতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া "সমাজ-চিত্র" বিরচিত হইয়াছে; ইহাতে লেখকের মানবচরিত্রানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ যে কতরূপে কত ভাবে প্রতারণার জালে জড়িত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজ-হিতৈষণার নামে যে কত প্রকার ব্যাধি দ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এ গ্রন্থে সে সকলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সুন্দর, সরস ও বিশুদ্ধ। লেখকের ভাষার উপর অসাধারণ দখল—এইরূপ ক্ষমতাশালী লেখক পূর্ব্ববঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক আছেন। ভরসা করি লেখক ভবিষ্যতে নব নব গ্রন্থ রচনা দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

কোনও কার্য্যের প্রথম আরম্ভ সকলের তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে না। বিশেষ এইরূপ একটী গুরুতর বিষয়ের। আলোচ্য বর্ষে আমার উপর এই গুরুতর বিষয় সঙ্কলনের ভার এরূপ সঙ্কীর্ণ সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে যে আমি কোনরূপেই পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-বিবরণীটি ভালরূপে সঙ্কলন করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেজন্য আমার নিজেরও অত্যন্ত অতৃপ্তি ও ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালকগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যদি নিজ নিজ পরিষদ বা সমাজের পুস্তকালয়ে নিজ নিজ জেলা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয়ের এক একটী তালিকা প্রস্তুত করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে যিনি এইরূপ সাহিত্য-বিবরণী সঙ্কলন করিবেন তাহার পক্ষে কেবল মাত্র গভর্মেণ্টের প্রকাশিত বিবরণীর উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণের সহযোগীতায় কার্য্যটী অধিকতর সহজসাধ্য হইতে পারে। আশা করি এইরূপ বিবরণী সংগ্রহে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহাদের সকলের সাহায্য পাইলে আমরা আগামী বারে নিশ্চয়ই একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণী প্রকাশে সমর্থ হইব। বলিতে ভুলিয়াছি ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে এবৎসর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এর সম্পাদকতায় শ্যামদাস সেনের "মীনচেতন" প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার শেষ কথা এই যে আমার এইরূপ বিবরণী প্রকাশে কেহ যেন একথা মনে না করেন আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যসমাজের মধ্যে একটা ভেদ-বুদ্ধি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। যিনি এইরূপ মনে করিবেন তিনি আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝিবেন। আমি এইটুকু শুধু আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণকে দেখাইতে চাহি যে, এখনও তাঁহারা কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের যদি উঠিতে হয়, তাহা হইলে সংকীর্ণতার দ্বারা তাহা হইবে না, আত্মম্ভরিতার দ্বারা তাহা

হইবে না এবং কলহের দ্বারা তাহা হইবে না, তাহা শুধু হইবে—পরস্পরের সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রীতি ও মিলন দ্বারা। নতুবা তোমরা তর্কই কর, ঝগড়াই কর, সাহিত্য-সভায় স্থান পাইবার জন্য বালকের ন্যায় ক্রন্দনই কর—তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না। যদি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে তোমাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাও তাহা হইলে ঝড়ের মত, বন্যার মত, ভাগীরথীর উৎসের ন্যায় বাধার ঐরাবতকে আশা-বাহিনীর প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বিজ্ঞানে, দর্শনে, কলাবিদ্যায়, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, কাব্যে, নীতিকবিতায় বিবিধ গ্রন্থ রচনাদ্বারা মাতৃচরণে অঞ্জলি প্রদান কর। নতুবা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন।—মুখপত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার অঙ্কিত "শিবপূজা" নামক চিত্র—সুন্দর হইয়াছে। এই চিত্রখানি প্রাচ্যকলানুযায়ী কি না তাহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন, কিন্তু প্রাচ্য-কলার দোহাই দিয়া যাঁহারা কলালক্ষ্মীকে কদলীপ্রদর্শন করেন তাঁহারা আমাদের প্রশংসাবাদে সায় দিবেন কিনা সন্দেহ। "শ্রীরাধা"—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমনাথ ভট্টাচার্য্যের কবিতা, প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। যে শ্রীরাধার সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,--

"তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ;"—

আধুনিক কবির সেই "বৃন্দাবনানন্দবালা"র বর্ণনা তাঁহার ছন্দের কারসাজী ও ভাবের ভেল্কীতে যেন্নার আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। "বেদে কালের বিভাগ"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি, বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস "মহা-নিশা"র এই সংখ্যায় অবসান হইল। "শিলং-ভ্রমণ"—শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবীর সুলিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ছবিগুলি প্রবন্ধের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। "বায়ু ও তাহার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ"—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত রায়-বাহাদুরের কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত প্রবন্ধ, শেষভাগে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হই-য়াছে। আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটিগুলির কর্তৃ-পক্ষগণের—বিশেষ করিয়া ঢাকার মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাদের—এই প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। "গুম্ফবধ"—শ্রীযুক্তা কাঞ্চনমালা দেবীর গল্প, মন্দ হয় নাই ; কিন্তু লেখিকার বিশেষত্ব তো এই ধরণের গল্প লেখায় নয়। "কল্পতরু" অংশে প্রাচীন মোগলদের নির্ম্মিত বহু বিখ্যাত উদ্যানের সংক্ষিপ্ত বিব-রণ ও ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। "পাটনার কথা"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ,—পাটনার ঐতিহাসিক বিবরণ ও দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা। "বিবিধ প্রসঙ্গে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়ের "অয়ন বিচার" বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। "পারের যাত্রী"—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের বিশেষত্বহীন কবিতা। "শ্রীপঞ্চমীর পল্লী"—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রমণীয় পল্লীচিত্র। তাঁহার "পল্লীচিত্র" ও "পল্লীবৈচিত্র্য" নামক গ্রন্থ দুইখানা আজকাল আর বাজারে দেখিতে পাইনা। পল্লীচিত্র অঙ্কণে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। নগেন্দ্র বাবুর পরম চিত্তাকর্ষক "মধু-স্মৃতি" চলিতেছে। "ফলিত-জ্যোতিষ"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পূর্ণিমা সম্মিলনে' পঠিত রস-রচনা, ভাল লাগিলনা। "ডাক্তার"—শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গ-চিত্র, ভাল হয় নাই।—"আমি call call বলে ফুকারি বেড়াই, মেলেনা Nature's Call ছাড়া"—নিতান্তই বিভৎস।

জলধর সেনের "বীরভূমের কথা" তাঁহার লেখার মাধুর্য্যে ও ছবিগুলির সংযোগে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "কুমার গুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রশাসন"—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। গত পৌষ মাসের "সাহিত্যে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পত্তি এই তাম্রশাসনখানির যে পাঠোদ্ধার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ একটি পরিবর্ত্তিত পাঠ প্রকাশ করিতে যাইয়া রাখাল বাবু রাধাগোবিন্দ বাবুর গবেষণা কার্য্য সম্বন্ধে অনেক অনাবশ্যক অবান্তর কথা বলিয়াছেন। "দিশাহারা" —শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প; 'প্লট' পুরাতন হইলেও লেখকের লেখার সলীল ভঙ্গীর গুণে গল্পটি মন্দ হয় নাই। "সাহিত্য-প্রসঙ্গে" ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালি পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহার "সুবর্ণবণিক জাতির বর্ণনির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া যে কথা কাটাকাটি চলিতেছে তাহার মধ্যে সমালোচক বিমলা বাবুকে পরোক্ষভাবে "সামান্য অপরিচিত লেখক", "সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্র" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। পরের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিতে যাইয়া প্রতিবাদ সহ্য করিবার মত স্থৈর্য্য যাহার নাই সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা নহে কি? সাহিত্যিক সমালোচনার একটা বিশিষ্টতা আছে—সংযম তাহার প্রাণ। এই সংযম সাধনসাপেক্ষ। 'কাব্যে নীতি' সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটির যে বিশদ অর্থ করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই নিজমত সমর্থনের নিমিত্ত। "ভারতী"র মতও যে নির্ভুল তাহা বলিতেছি না। বঙ্কিম বলিয়াছেন,—"কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা।—কিন্তু নীতি দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"—কবি 'জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন'—একথায় কি ইহাই বুঝায় যে জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধানের নিমিত্তই কবি কবিতা লেখেন? কবির রচনায় কোন প্রকার সংকল্পিত স্থির উদ্দেশ্যের আরোপ করা ভুল, ইহা রসজ্ঞ সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই যে কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের প্রধান পরিমাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সৃষ্টি—"creation, not manufacture." কবি ডিজাইন্ করিয়া, প্ল্যান্ আঁকিয়া পরে ছবি আঁকিতে বসেন না; তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি পুষ্পবিকাশের মত আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে এবং বিশ্বের অন্তরে আনন্দের পীযুষধারা সঞ্চারিত করিয়া দেয়। যাহা সুন্দর তাহা শাশ্বত—আনন্দময়, জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধানের তাহাই প্রধান উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই বুঝাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথাটি লইয়া যেভাবে তর্ক চলিতেছে তাহার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। "ultimate end," "means to an end" প্রভৃতি বুলি কাব্য সমালোচনায় খাটে না।

প্রবাসী, ফাল্গুন।—মুখপত্র রবীন্দ্রনাথের "ভ্রষ্টলগ্নের" নিশাবসানে নিদ্রোত্থিতা তরুণীর সুন্দর চিত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত। আজকাল বাংলা মাসিকপত্রগুলির চিত্রসম্পদ দেখিলে বাস্তবিকই বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। "বিবিধ প্রসঙ্গ"ই "প্রবাসীর" বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে, নতুবা প্রবন্ধসম্পদে "প্রবাসীর" পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কবিতাকে "প্রবাসী"তো একরূপ নির্ব্বাসিত করিয়াই বসিয়াছেন; মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ছাড়া যাহা বাহির হয়, তাহা হয় ভাঁড়ামী নতুবা রাবিশ। সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতাও আজকাল খুব ভাল হইতেছে একথা বলা যায় না। সংকলন, সমালোচন ও অনুবাদের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদেরও একটা সীমা আছে। মৌলিক রচনা কি বঙ্গদেশে এতই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে? "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক মহাশয় "বিলাতে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয়" সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "বিলাতে প্রাচ্য শিক্ষালয়টিতে বাংলা শিখাইবার জন্য একজন বাঙ্গালীকেই নিযুক্ত করা উচিত",—একথা সম্পূর্ণরূপে শোভন ও সঙ্গত এবং

আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এবিষয়ের চেষ্টা হইবে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবত "প্রবাসী" কলম চালাইতেছেন; তাঁহার তো কোন দোষ দেখিতেছিনা। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। "প্রবাসী"-সম্পাদক মহাশয়ও বোধহয় সেবিষয়ে সন্দিহান নহেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করায় অন্যায় নির্ব্বাচন হইয়াছে একথায় কেহই সায় দিবে না। পণ্ডিত নবকুমার কয়টী ভাষায় অভিজ্ঞ জানিনা, কিন্তু "বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে শ্রোতব্য কথা বলিতে সমর্থ" এমন লোকের নাম করিতে যাইয়া অন্য বহু পরিমাণে যোগ্যতর ব্যক্তিদিগকে বিস্মৃত হইয়া সম্পাদক মহাশয় এই তরুণ কবির নাম উল্লেখ করিলেন কেন? "শিল্প ও ধর্ম্ম" শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মের সহিত শিল্পের সম্বন্ধ ও বঙ্গদেশে শিল্পের নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ" —শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক Emile Senart হইতে সঙ্কলিত তথ্যপূর্ণ কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ। জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। "চায়ের হায়"—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সুন্দর কবিতা-গুচ্ছ। বহুকাল "প্রবাসী"তে এরূপ কবিতার সন্ধান পাই নাই; "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় ইহা দেখিয়া অনেকেরই 'ওয়েসিসের' কথা মনে হইবে। কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:—

"তুমি কিগো মধুগন্ধা এলে এ ধরায়
বিষ্ণুপাদপদ্মযুগে জনম লভিয়া;
সুধাসিন্ধু বিমথিত মন্দার-শাখায়
তোমার অঙ্গুলীগুলি ফুটিল কি প্রিয়া?
কটুতিক্ত কষায়ের সপ্তবর্ণ রসে
সঞ্জাত তোমার দুগ্ধহৃদয় অমল,
রক্তিম আনন্দে হাস্য অধর বরষে,
দুগ্ধ-সরোবরে যেন কোকনদ-দল!
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহনীয়তম,
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের সম।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীর্ঘ নাম যুক্ত প্রবন্ধ তাঁহার অপরূপ মৌলিকতা ও বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল। "চীনের তৃতীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব"—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের প্রবন্ধদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "আলোচনা" অংশে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই সংখ্যার "প্রবাসী"তে আর কোনও উল্লেখযোগ্য কবিতা বা প্রবন্ধ নাই।

শ্রীসমালোচক।